মনোবিদ্যা

ডক্টর প্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়,

এম্. এ., এল্. এল্. বি, ডিপ্. জার্মাণ, ডি. ফিল্,

অধ্যাপক, দর্শন-বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ;

প্রাক্তন অধ্যাপক, স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলিকাতা।

পরম স্নেহভাজন ছাত্রছাত্রীদের

করকমলে

অর্পিত হইল

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

আধুনিক মনোবিদ্যা একটি ক্রমবর্ধমান প্রগতিশীল বিজ্ঞান। প্রধান প্রধান পাশ্চাত্ত্য ভাষায় ইহার উপর বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে; কিন্তু বাংলা ভাষায় মনোবিদ্যার উপর সুচারু গ্রন্থের অভাব—বিশেষতঃ ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা নগণ্য। প্রধানতঃ তাহাদের এই অভাব দূরীকরণের জন্যই এই গ্রন্থ রচনায় প্রয়াসী হইয়াছি।

কলিকাতা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রৈবার্ষিক স্নাতক শ্রেণীর দর্শনের পাঠ্যসূচী অনুযায়ী গ্রন্থটি রচিত হইয়াছে। তবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন দ্বিবর্ষ পাঠ্যসূচী অনুসারে যে সকল ছাত্রছাত্রী স্নাতক পরীক্ষা দিবে, তাহারাও ইহা পাঠে উপকৃত হইবে।

এই গ্রন্থে মনোবিদ্যার বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে আধুনিক মতবাদগুলি আলোচিত হইয়াছে এবং বহু তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। পাদটীকায় ইংরাজী গ্রন্থ হইতে অনেকস্থলে উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে—উৎসাহী ছাত্রছাত্রীরা উহা পাঠ করিয়া পাশ্চাত্ত্য লেখকদের রচনার সহিত পরিচয় লাভের সুযোগ পাইবে। বিষয়বস্তুকে সরল ও সরস করিবার মানসে বহুস্থলে রেখাচিত্র দেওয়া হইয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রবর্তিত পরিভাষা গৃহীত হইয়াছে।

পুস্তকটি দ্রুত রচনার ফলে ভ্রমপ্রমাদ থাকিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। সহৃদয় অধ্যাপকবৃন্দ ও ছাত্রছাত্রীগণ এ বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে আমি বাধিত হইব।

এই পুস্তক প্রণয়নে আমার পিতৃদেব ও আমার কয়েকজন প্রাক্তন অধ্যাপক কয়েকটি বিষয়ে আমাকে মূল্যবান্ উপদেশ দান করিয়াছেন। আমি তাঁহাদের নিকট চিরঋণী; সুতরাং নূতন করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবকাশ নাই।

পরিশেষে আমি মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ-এর উৎসাহী পরিচালক শ্রীদীনেশচন্দ্র বসু ও শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য এবং বাণী প্রেসের মুদ্রাকর শ্রীসমরেন্দ্রভূষণ মল্লিককে ধন্যবাদ জানাই এবং সেই সঙ্গে এই দুই সংস্থার যে সকল নীরব কর্মী সবার অলক্ষ্যে থাকিয়া আমার সহিত নানাভাবে সহযোগিতা করিয়াছেন তাঁহাদেরও ধন্যবাদ দিই।

দার্শনবিভাগ—
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
কলিকাতা।
আগষ্ট, ১৯৬১

শ্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

মাত্র ২।৩ সপ্তাহের মধ্যে মনোবিদ্যার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যাওয়ায় অবিলম্বে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এত অল্প সময়ের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করা সম্ভব হয় নাই। তবে প্রথম সংস্করণের কয়েকটি মুদ্রণ-প্রমাদ সংশোধন করা হইয়াছে এবং দু'একটি স্থানে নূতন তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে।

পুস্তকখানি যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকা-দিগের নিকট সমাদর লাভ করিয়াছে, সেজন্য আমি শ্রম সার্থক জ্ঞান করিতেছি এবং সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

অতি দ্রুত দ্বিতীয় সংস্করণের মুদ্রণ ও প্রকাশনে সহায়তা করার জন্য যাঁহারা ঐকান্তিক চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের সকলকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

দর্শনবিভাগ—
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
অক্টোবর, ১৯৬১

শ্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইবার কয়েক মাসের মধ্যেই তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিবার সুযোগ লাভ করায় আমি পুস্তকটিকে যথাসম্ভব পরিমার্জিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বর্তমান সংস্করণে বিবিধ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে—স্থানে স্থানে ভাষার পরিবর্তন করা হইয়াছে, কয়েকটি অধ্যায়ে নূতন বিষয় সংযোজিত হইয়াছে, একটি নূতন পরিশিষ্ট যুক্ত হইয়াছে, কয়েকটি চিত্রের ত্রুটি সংশোধন করা হইয়াছে এবং একটি রঙীন চিত্র দেওয়া হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে বলিতে পারি যে, যদিও গ্রন্থটি প্রধানতঃ স্নাতকশ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রচিত হইয়াছে, তাহা হইলেও যে কোন পরীক্ষার জন্যই বাংলা ভাষার মাধ্যমে যে সকল ছাত্র-ছাত্রী মনোবিদ্যা পাঠ করিতে চায়, তাহারা এই গ্রন্থপাঠে উপকৃত হইবে।

যে সকল অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এই গ্রন্থটি পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্বাচন করিয়াছেন, তাঁহাদের আমি সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ দিতেছি। তাহা ছাড়া, আমার সহিত বহু বিষয়ে সহযোগিতা করার জন্য পুনর্বার আমি প্রকাশক ও মুদ্রাকর বং তাঁহাদের সংস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট কর্মীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

দর্শনবিভাগ—
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
মে, ১৯৬২

প্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দশ অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায়

ষোড়শ অধ্যায়

বিষয় পৃষ্ঠা

সপ্তদশ অধ্যায়

অষ্টাদশ অধ্যায়

উনবিংশ অধ্যায়

বিংশ অধ্যায়

একবিংশ অধ্যায়

দ্বাবিংশ অধ্যায়

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

পরিশিষ্ট (ক)

পরিশিষ্ট (খ)

পরিশিষ্ট (গ)

মনোবিদ্যা

প্রথম অধ্যায়

মনোবিদ্যার স্বরূপ

১। মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী (Psychological point of view) :

মনোবিদ্যা 'মন' সম্বন্ধে আলোচনা করে। আমরা সকলেই মনোবিশিষ্ট জীব এবং প্রত্যেকেই নিজের মনকে প্রত্যক্ষভাবে অল্পবিস্তর জানিতে পারি বলিয়া বিশ্বাস করি। এইজন্য মনঃ-সম্বন্ধীয় কোন আলোচনা নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়। কিন্তু মনের স্বরূপ কি? দেহ ও মনের সম্বন্ধ কি? মনের প্রকাশ কিসের মাধ্যমে হয়? মনকে জানিবার পদ্ধতি কি? —এই সকল প্রশ্ন যতই উদিত হয়, ততই আমরা বুঝিতে পারি যে, মনঃ-সম্বন্ধীয় আলোচনা নিতান্ত জটিল। মনের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে হইলে একটি সুচিন্তিত, সুনির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করা উচিত। সেইজন্য সর্বাগ্রে প্রশ্ন উঠে : মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী কিরূপ হওয়া উচিত?

একদিন ছিল যখন মনোবিদ্যা দর্শনের একটি বিশেষ শাখা মাত্র ছিল। তখন মনোবিদ্যায় তাত্ত্বিক আলোচনার প্রাধান্য ছিল; মনোবিদ্যার মধ্যে 'আত্মা'-সম্বন্ধীয় দার্শনিক আলোচনাই বিশেষ স্থান পাইত। আজ মনোবিদ্যা দর্শনশাস্ত্র হইতে পৃথক্ হইয়া 'বিজ্ঞান' হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।[১] বিজ্ঞান অর্থে এখানে অভিজ্ঞতা-মূলক (empirical) ও পরীক্ষণমূলক (experimental) বিজ্ঞান বুঝিতে হইবে। সুতরাং **আধুনিক মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী।**

---

১ মনোবিদ্যা 'স্বাধীন' বিজ্ঞান হিসাবে নিতান্ত নবীন; এবং এইভাবে ইহা কতদূর সার্থক হইয়াছে, সে সম্বন্ধে মনোবিদ্গণের মধ্যেই মতভেদ রহিয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইল: এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য কি কি? এই প্রশ্নের উত্তরদান করিতে হইলে প্রথমে বিজ্ঞান-লব্ধ জ্ঞান ও সাধারণজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে হইবে। উভয়েই পারিপার্শ্বিক জগৎ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান হইলেও উহাদের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। বিজ্ঞান হইল প্রকৃতির কোন বিশেষ বিভাগ লইয়া সুষ্ঠু, সামঞ্জস্যপূর্ণ যথাযথ আলোচনা। বিজ্ঞান-লব্ধ জ্ঞান যথার্থ (accurate) এবং বস্তুনিষ্ঠ (factual) এবং উহার মধ্যে অসার কল্পনা (vain speculation)-এর স্থান নাই। সাধারণ জ্ঞানে সকল সময় যাথার্থ্য ও বস্তুনিষ্ঠতা থাকে না—উহা অনেক সময় কল্পনাশ্রয়ী হয়। বিজ্ঞানে প্রাকৃত ঘটনা (natural event)-কে অতিপ্রাকৃত (supernatural) দ্বারা ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা থাকে না; কিন্তু সাধারণ জ্ঞানে অনেকক্ষেত্রে ঐরূপ করা হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক তাঁহার আলোচ্য বিষয়বস্তুকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করেন; কিন্তু সাধারণজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা বাহ্য স্থূল আকৃতি লইয়া অনেক সময় সন্তুষ্ট থাকি। বৈজ্ঞানিক যখন সত্যনির্ধারণের চেষ্টা করেন, তখন তিনি নিরপেক্ষ মনোভাব (impartial attitude) গ্রহণ করেন, অর্থাৎ তিনি তাঁহার অনুসন্ধানকে ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা বা একদেশদর্শিতা দ্বারা প্রভাবিত হইতে দেন না। সাধারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে এইরূপ দৃঢ়তা ও সাবধানতা সচরাচর অবলম্বন করা হয় না। বৈজ্ঞানিক বিশেষ বিশেষ বস্তু পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এক একটি সাধারণ নিয়ম (general law) আবিষ্কারের চেষ্টা করেন; কিন্তু সাধারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, আমরা বিশেষ কোন বস্তু ও উহার ব্যাখ্যা লইয়া সন্তুষ্ট থাকি। বিজ্ঞান-লব্ধ জ্ঞান সুসংবদ্ধ এবং ইহার কারণ এক এক দল বৈজ্ঞানিক এক একটি উদ্দেশ্য লইয়া সুগঠিত পরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক তাঁহাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন।[২] সাধারণজ্ঞানে ইহার অভাব আছে—উহা অধিকাংশ সময় সুসংবদ্ধ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এবং উহার মধ্যে পূর্বপ্রকল্পিত উদ্দেশ্য-জনিত ঐক্যের অভাব আছে।

এই লক্ষণগুলি যদি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য হয়, তাহা হইলে **বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিদ্যা সত্যাশ্রয়ী, বস্তুনিষ্ঠ, অসারকল্পনা-বিমুখ,**

২ টিচ্‌নারের (E. B. Titchener) ভাষায়: "...what holds a science together, and brings its observations into relation, is just the fact that all the work has been done under the guidance of the same principles and from the same point of view." (*A Text-book of Psychology*, p. 4).

সুপরিকল্পিত এবং রীতিসম্মত হইবে। উহা বাস্তব মানসিক ঘটনাগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করিয়া সাধারণসূত্র (general principles) বা সার্বিক নিয়ম (universal laws) আবিষ্কারের চেষ্টা করিবে।

মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু মন, এবং মন বাহ্য-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্যবিশেষ নহে। মনের প্রকাশ দেহের মাধ্যমে ঘটে। একমাত্র নিজের মনকেই প্রত্যক্ষভাবে জানা সম্ভব এবং অপরের মনকে অনুমানের মাধ্যমে জানিতে হয়।[৩] এইজন্য বিজ্ঞানরূপে স্বীকৃতিলাভের পরও মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিরোধের অবকাশ থাকিয়া গিয়াছে।

আমরা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত না হইয়া এখানে মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গীর কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত দান করিব।

(ক) মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী **ব্যক্তি-কেন্দ্রিক** (individualistic)। বিজ্ঞান হিসাবে 'নিরপেক্ষ' হইলেও ইহার আলোচ্য বিষয়বস্তু, অর্থাৎ মানসিক ঘটনা, ব্যক্তি-মন হইতে সংস্রবহীন হইতে পারে না। যে কোন মানসিক অবস্থা বা ক্রিয়া পর্যালোচনা করিতে হইলে উহাকে ব্যক্তি-বিশেষের মানসিক অবস্থা বা ক্রিয়া হিসাবে পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে।[৪]

(খ) এক একটি মানসিক ঘটনার একটি করিয়া 'সামগ্রিকরূপ' আছে। সেইজন্য আলোচনার সুবিধার জন্য উহাদের বিশ্লেষণ করিলেও বিশ্লেষণের মধ্যেই আলোচনা সমাপ্ত রাখা যায় না; ঐরূপ করিলে মানসিক ঘটনাসমূহের স্বরূপকে বিকৃত করা হইবে। এইজন্য মনোবিদ্যার আলোচনাকালে **বিশ্লেষণ** (analysis) ও **সংশ্লেষণের** (synthesis) **সমন্বয়-সাধন** বাঞ্ছনীয়।[৫]

---

৩ ম্যাক্‌ডুগ্যাল্ বলেন: "The structure of the mind is a conceptual system that we have to build up by inference from the data of the two orders, facts of behaviour and facts of introspection." (*An Outline of Psychology,* p. 42).

৪ বর্তমান অধ্যায়ের ৪র্থ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৫ টিচ্‌নার প্রমুখ অবয়ববাদী মনোবিদ্‌গণ (structuralists) মানসিক অবস্থাগুলিকে সরল উপাদান (simple elements)-এ বিশ্লেষণ করাকেই মনোবিদ্যার প্রধান করণীয় কার্য মনে করিতেন। টিচ্‌নার বলেন: "The aim of the psychologist is threefold. He seeks (1) to analyse concrete (actual) mental experience into its simplest components, (2) to discover how these elements combine, what are the laws which govern their combination, and (3) to bring them into connection with their physiological (bodily) conditions." (*An Outline of Psychology,* p. 15)। বর্তমানকালের অধিকাংশ মনোবিৎই অবয়ববাদের বিরোধী এবং ক্রিয়াবাদ (functionalism)-এর সমর্থক। (অবয়ববাদ ও ক্রিয়াবাদের পার্থক্য ৪র্থ অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।)

(গ) মনের প্রকাশ যেহেতু দেহের মাধ্যমে ঘটিয়া থাকে, সেই হেতু দৈহিক প্রকাশগুলির পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন; কিন্তু তাই বলিয়া মনকে অস্বীকার করিয়া মানুষকে যন্ত্রবিশেষে রূপান্তরিত করা চলিবে না।[৬]

(ঘ) মানসিক ঘটনার কারণ নির্ধারণের জন্য পূর্বগামী অবস্থাসমূহ (antecedent condition) অনুসন্ধান করিলেই পর্যাপ্ত হইবে না। মন নিষ্ক্রিয় পদার্থ নহে—উহা ক্রিয়াশীল সত্তাবিশেষ। এইজন্য মানসিক ঘটনা-সমূহের ব্যাখ্যাকালে উহারা **কী উদ্দেশ্য সাধনের বা কোন্ লক্ষ্যে পৌঁছিবার** প্রচেষ্টা করিতেছে তাহাও দেখিতে হইবে।[৭]

(ঙ) বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিদ্যা বাস্তব পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষণের মাধ্যমে উপাত্ত (data) সংগ্রহ করে। উপাত্ত-সংগ্রহকালে উহাদের **অর্থ** (meaning), **তাৎপর্য ও দ্যোতনা** (significance) এবং **মূল্যবোধ** (value-sense) একেবারে অগ্রাহ্য করিলে চলিবে না, কারণ এইগুলি মানুষের মনে প্রেরণা যোগাইয়া থাকে।[৮]

(চ) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিয়া মনোবিদ্যা যখন প্রগতির পথে অগ্রসর হয়, তখন সে মানসিক ঘটনাগুলির পরিমাণগত ব্যাখ্যা দানের (quantitative explanation) চেষ্টা শুরু করে। তাই বলিয়া মনো-রাজ্যের ঘটনা ব্যাখ্যা করিবার জন্য কেবলমাত্র পরিমাণের ও সংখ্যার সাহায্য লওয়া সম্ভব নহে, কারণ মন পরিমাণ-সাপেক্ষ পদার্থ নহে। এইজন্য মানসিক ঘটনাসমূহকে **'গুণগত দৃষ্টিভঙ্গী'** (qualitative standpoint) হইতেও ব্যাখ্যা করিতে হইবে এবং মানসিক ঘটনাগুলির মাধ্যমে মন কোন্ অর্থ প্রকাশ করিতে চাহিতেছে তাহা নিরূপণ করিতে হইবে।[৯]

৬ চেষ্টিতবাদ (Behaviorism)-এর সমর্থক ওয়াট্‌সন্ (Watson) মনকে বাদ দিয়া যান্ত্রিকতাবাদের ভিত্তিতে মনোবিদ্যা রচনার প্রয়াস করেন। (৪র্থ অধ্যায়, পৃঃ ৯৬-১০৪ দ্রষ্টব্য)।

৭ উদ্দেশ্য-সাধনবাদ (৪র্থ অধ্যায়, পৃঃ ১১১-৩৫) দ্রষ্টব্য।

৮ টিচ্‌নার মনোবিদ্যার আলোচনাক্ষেত্র হইতে 'অর্থ' ইত্যাদি বহির্ভূত রাখার সমর্থক ছিলেন। সাম্প্রতিককালের লেখকগণ (যথা, ম্যাক্‌ডুগাল্, কফ্‌কা ইত্যাদি) ইহা সমর্থন করেন না। তুলনীয়: "A psychology which has no place for the concepts of meaning and value connot be a complete psychology." (Koffka, ***Principles of Gestalt Psychology***, p. 19).

৯ কফ্‌কা মনে করেন যে, পরিমাণবাদ ও গুণবাদ, এই দুই দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে মূলগত পার্থক্য নাই। তিনি বলেন: "In my opinion this famous antithesis of quantity and

(ছ) মনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল যে, চেতনার (consciousness) ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া মনের প্রসার। বাস্তবিক মনোরাজ্যের অল্প অংশকেই চেতনা অধিকার করিয়া আছে এবং মনের উপর নির্জ্ঞানস্তর (unconscious)-এর প্রভাব অপরিসীম। সুতরাং মনোবিদ্যা যখন কোন মানসিক ঘটনাকে ব্যাখ্যা করিবে, তখন কেবল চেতন-রাজ্যের অভিজ্ঞতার মধ্যে সকল সময় সীমাবদ্ধ থাকা সমীচীন হইবে না; প্রয়োজন হইলে **নির্জ্ঞানস্তরেও** কারণ আবিষ্কারের জন্য অনুসন্ধান কার্য চালাইতে হইবে।[১০]

(জ) ব্যক্তি-বিশেষকে পর্যবেক্ষণ করিবার সময় তাহাকে সমাজ হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না। সামাজিক পরিবেশের মধ্যেই ব্যক্তি-মনের প্রকাশ ঘটে।[১১] ব্যক্তি-বিশেষের প্রত্যক্ষ, আবেগ, ইচ্ছা ইত্যাদি যাহা কিছুই পর্যবেক্ষণ করা যাউক্ না কেন, তাহাতেই সমাজ-মনের প্রভাব দেখা যায়। সুতরাং ব্যক্তি-মনকে আলোচনা করিবার সময় **সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর** উপরও গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে।

২। মনোবিদ্যার বিষয়-বস্তু (Subject-matter of Psychology):

মনোবিদ্যা **মনের কথা** আলোচনা করে। মনের প্রকাশ বিভিন্নভাবে হয় এবং মনোবিদ্যা মনের এই বিভিন্ন প্রকাশ লইয়া আলোচনা করে। মনের সুপরিস্ফুট প্রকাশ ঘটে মানুষের মধ্যে এবং এইজন্য বলা যাইতে পারে যে, মানুষের মনই মনোবিদ্যার প্রধান আলোচ্য বিষয়। মানুষ সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বিচরণ করে এবং এই পরিবেশের বাহিরে তাহার সম্পূর্ণ স্বাধীন বা পৃথক্ সত্তা নাই। ব্যক্তি-বিশেষ এবং তাহার

quality is not a true antithesis at all." মনোবিদ্যা বা Psychology সম্বন্ধে তিনি বলেন: "It may be perfectly quantitative without losing its character as a qualitative science." (*Op. cit.*, pp. 13 & 15).

১০ মনের উপর নির্জ্ঞানস্তরের প্রভাবের প্রতি আধুনিককালে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ফ্রয়েড্ (Freud) ও তাঁহার অনুগামিগণ। (৪র্থ অধ্যায়, পৃঃ ১০৯-১১৬ দ্রষ্টব্য)।

১১ উড্‌ওয়ার্থ বলেন: "From the psychological point of view, the human being is a 'social animal'. He is a biological organism dealing with an environment that is largely social." (*Psychology*, 12th. Ed., p. 589).

পরিবেশ এই দুইয়ের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলেই 'সমগ্র মানুষ' এবং মনোবিদ্যা যখন মানুষের মন লইয়া আলোচনা করে, তখন এই পরিপ্রেক্ষিতেই ইহা মানুষকে বিচার করে। [১ম অনুচ্ছেদ (জ) দ্রষ্টব্য]

মানুষ ও তাহার পরিবেশ পরস্পরের উপর কিরূপ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে দেখা যাউক্। বাহিরের জগৎ মানুষের পঞ্চেন্দ্রিয়ের উপর কেবলই প্রভাব বিস্তার করিতেছে এবং ফলে বিভিন্ন বস্তু সম্বন্ধে মানুষের প্রতীতি ঘটিতেছে; এইভাবে বহির্জগৎ সম্বন্ধে সে জ্ঞান আহরণ করে। আবার জ্ঞান আহরণ করিয়াই সে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে না। তাহার মনে কতকগুলি অনুভূতি জাগরিত হয় এবং প্রেরণার সৃষ্টি হয়। ইহারই ফলে ঘটে কার্যের অভ্যুদয়। এই কার্যগুলি সাধারণতঃ অনিয়মিত বা এলোমেলো নহে। বাহ্য পরিবেশের সহিত নিজেকে মানাইয়া লইবার জন্য মানুষ কার্য করে। এই কার্যগুলিকে বলা হয় প্রতিযোজক (adaptive) ক্রিয়া।

একটি উদাহরণ লওয়া যাউক্। ক্লাসে অধ্যাপক বক্তৃতা করিতেছেন এবং ছাত্র-ছাত্রীরা তাহা শুনিতেছে। এখানে অধ্যাপক যাহা বলিতেছেন এবং বোর্ডে যাহা লিখিতেছেন, সে সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান জন্মিতেছে যথাক্রমে শ্রবণেন্দ্রিয় এবং দর্শনেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে—ইহা হইল প্রত্যক্ষজ্ঞান। আবার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি অনুভূতিও জাগিতেছে, যেমন, বক্তৃতা যদি ভাল লাগে, তাহা হইলে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে প্রীতির অভ্যুদয় হইবে বা সুখকর অনুভূতি জাগিবে, নহিলে একটা বিরক্তির ভাব আসিবে; আবার কেহ কেহ বা সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিবে। এই সমস্ত অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে আসিবে প্রতিযোজক ক্রিয়া— যেমন, কেহ বা স্থিরচিত্তে বক্তৃতা শুনিবে এবং হয়ত' বক্তৃতার সারাংশ লিখিয়া লইবার চেষ্টা করিবে; আবার কেহ বা বিমনা থাকিবে বা গোপনে গল্পের বই পড়িবার চেষ্টা করিবে।

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, মনের প্রকাশ সাধারণতঃ তিন প্রকারের—**চিন্তন** (thought, cognition), **অনুভূতি** (feeling, affection) এবং **ক্রিয়া** (willing, volition বা conation)। 'চিন্তন' পদটি মনোবিদ্যায় একটু ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'চিন্তন' বলিতে সংবেদন (sensation), প্রত্যক্ষ (perception), প্রতিরূপ (image), স্মৃতি (memory), কল্পনা (imagination), ধারণা (conception)

এবং যুক্তি (reasoning) বুঝায় ; অর্থাৎ যাহা কিছু জ্ঞানদান করে তাহাকেই ব্যাপক অর্থে চিন্তন (thought) বা জ্ঞান (cognition) বলে। এইগুলি সবই মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়।

অনুভূতি আবার সরল (simple) বা জটিল (complex) হইতে পারে। জটিল অনুভূতিকে প্রক্ষোভ বা আবেগ (emotion) বলে। এইগুলি মনোবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত।

ক্রিয়া ঐচ্ছিক (voluntary) বা অনৈচ্ছিক (non-voluntary) হইতে পারে। এই ক্রিয়াগুলি সবই মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু।

একথা মনে রাখিতে হইতে যে, এই সমস্ত মানসিক প্রকাশগুলি সম্পূর্ণ পৃথক্ বা স্বাধীন থাকে না—ইহারা পরস্পরের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে। অবশ্য এক এক সময় একটি বিশেষ অবস্থার প্রাধান্য থাকে। কোন সময় চিন্তনের প্রাধান্য থাকে, কোন সময় অনুভূতির প্রাধান্য থাকে, আবার কোন সময় ক্রিয়ার প্রাধান্য থাকে।

মানুষের এই বিভিন্ন প্রত্যক্ষ, আবেগ, আশা, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, প্রেরণা সবেরই পশ্চাতে থাকে **'অহং'-জ্ঞান**। দার্শনিক আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করেন, কিন্তু মনোবিদ্যায় আত্মার স্বরূপাবস্থার আলোচনার স্থান নাই ; তবে প্রতি মানুষের অন্তরে যে 'আমিত্ব'-ভাব বা অহং-জ্ঞান আছে (যাহার ফলে সে মনের বিভিন্ন প্রকাশগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ বা সুসংবদ্ধ করে), সে সম্বন্ধে মনোবিদ্যাবিৎ আলোচনা করেন। প্রকাশ-ভঙ্গিমার শৃঙ্খলার অভাবেই মানসিক সুস্থতা নষ্ট হইয়া যায় এবং বিভিন্ন প্রকারের মানসিক রোগ দেখা দেয়। মনোবিদ্যার একটি বিশেষ বিভাগ (যাহাকে Abnormal Psychology বা অস্বভাবি-মনোবিদ্যা বলা হয়) অসুস্থ মনের বৈশিষ্ট্য লইয়া আলোচনা করে। (পৃঃ ৭৪-৮১)।

এই 'অহং' (self)-কে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে মানুষের **ব্যক্তিত্ব** (personality)। 'ব্যক্তিত্ব' পদটির সংজ্ঞা দান করা কঠিন ; তবে ব্যক্তিত্ব বলিতে সমগ্র মানুষটিকেই বুঝায়—তাহার বুদ্ধিবৃত্তি, অনুভূতি, কর্মদক্ষতা, ভাব, ধারণা সব কিছুই ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত। সুতরাং ব্যক্তিত্বের স্বরূপ, বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া উহার প্রকাশ, উহার বিভিন্ন উপাদান ইত্যাদি সমস্তই মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়-বস্তু।

বিভিন্ন মানুষের ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ তাহাদের বুদ্ধি, কর্মক্ষমতা, আবেগশীলতা ইত্যাদি অনুধাবন করিলে সহজেই দেখা যায় যে, সকল মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ সমান নহে—কাহারও বুদ্ধি বেশী, কাহারও বা কর্মক্ষমতা বেশী ইত্যাদি; অর্থাৎ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যেমন মিল আছে, সেইরূপ পার্থক্যও আছে। এই পার্থক্যগুলিকে বলা হয় **ব্যক্তিগত পার্থক্য** (individual differences)। সুতরাং ব্যক্তিগত পার্থক্যের পরীক্ষা ও পরিমাপও মনোবিদ্যা-বিদের কার্যসূচীর অন্তর্গত।

দেহ ও মন পরস্পর পৃথক্ থাকিতে পারে না। দেহ ও মনের পরস্পরের উপর প্রভাব অপরিসীম। বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে মন যে জ্ঞান আহরণ করে, তাহা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সম্ভব হয়; আবার এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে সংবেদন হয়, সেগুলিকে সুসম বা সংগঠিত করিয়া জ্ঞানের অভ্যুদয়ে সহায়তা করে মস্তিষ্ক। আবার মানুষের বিভিন্ন আবেগ বা অনুভূতির, কর্মকুশলতা, বুদ্ধি ইত্যাদি কতকাংশে নির্ভর করে শরীরের অন্তঃস্থিত নালিকাবিহীন গ্রন্থি (ductless or endocrine glands)-এর উপর। এই সমস্ত উদাহরণ ব্যতীত দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেই আমরা জানিতে পারি যে, দেহ ও মনের সম্বন্ধ সুনিবিড়—দেহ সুস্থ থাকিলে মন সুস্থ থাকে, আবার মন সুস্থ থাকিলে দেহে স্ফূর্তি ভাব জাগে; আবার দৈহিক অসুস্থতা মনের উপর রেখাপাত করে এবং মানসিক অসুস্থতা দেহকে অনেকটা পঙ্গু করিয়া তুলে। সুতরাং মনস্তত্ত্ববিৎ দেহের যে যে অঙ্গ বা অংশ মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে (যেমন, পঞ্চেন্দ্রিয়, মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ, স্নায়ুতন্ত্র ইত্যাদি), সেইগুলি বিশেষভাবে আলোচনা করিবেন।

মনোবিদ্যা একটি নবীন বিজ্ঞান এবং বর্তমানে মনোবিদ্যার বহু বিভাগ দেখা গিয়াছে। মনোবিদ্যার প্রকৃত বিষয়-বস্তু লইয়া মতভেদ আছে এবং বহু ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। অনেকে মনে করেন যে, মনোবিদ্যা পাঠ করিলেই অপরের চিন্তা সমীক্ষণ করা যায়, অপরের মনকে সম্মোহিত করা যায় ইত্যাদি।[১২] সাধারণ মনোবিজ্ঞান এ সমস্ত আলোচনা পরিহার করিয়া চলে এবং অভিজ্ঞতার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে মন সম্বন্ধে শুদ্ধ জ্ঞান (theoretical

[১২] M. R. Harrower, *The psychologist at work*, পৃঃ ১-৪ দ্রষ্টব্য।

knowledge) দান করে। অবশ্য এই তাত্ত্বিক জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয় এবং তাহার ফলে মনোবিদ্যার বিভিন্ন শাখা গড়িয়া উঠিয়াছে।
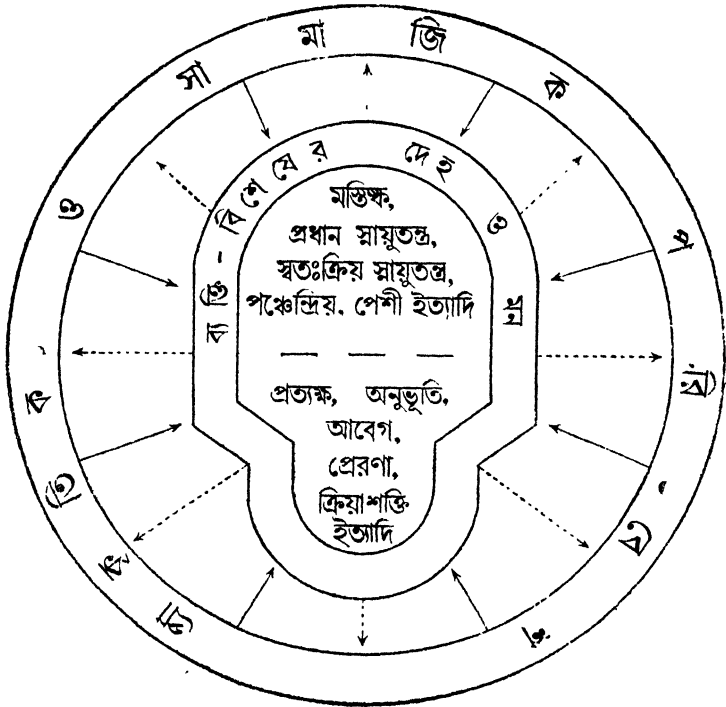
ব্যক্তি ও তাহার পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া উপরের চিত্রে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ব্যক্তি-বিশেষকে মনোবিদ্যা এই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করে।

সংযোজন :

(ক) **ব্যবহারের ব্যাখ্যা-সূত্র :**

আমরা উপরে বলিয়াছি যে, বাহ্য পরিবেশ মানুষের মনের উপর সর্বদা প্রভাব বিস্তার করিতেছে এবং মানুষও নিজেকে তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত মানাইয়া লইবার জন্য নানাপ্রকার কার্য করিতেছে।

মানুষের মনের এই প্রতিক্রিয়াকে বুঝাইবার জন্য অধ্যাপক উড্‌ওয়ার্থ যে সাংকেতিক-সূত্র (symbolic formula) দিয়াছেন তাহাই আমরা এখানে ব্যাখ্যা করিব।

বাহ্যজগৎ মানুষের উপর ক্রিয়া করিতেছে এবং তাহারই প্রভাবে জগতের উপর মানুষ প্রতিক্রিয়া করিতেছে। যেমন, শীতের আবির্ভাবে যখন আমরা ঠাণ্ডা বোধ করিলাম, তখন আমরা গরম জামা ব্যবহার করিলাম। আবার গ্রীষ্মের আবির্ভাবে আমরা ঐ প্রকার জামার ব্যবহার ত্যাগ করিলাম। সুতরাং বাহ্য পরিবেশ (environment বা world) দেহধারী জীব (organism)-এর মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং তাহারই ফলে বিভিন্ন প্রকার প্রতিযোজক প্রতিক্রিয়া (adaptive reaction) দেখা দেয়। ইহাকে সংক্ষেপে সাঙ্কেতিক ভাষায় বলা যায়ঃ

W→O→W বা জ→দে→জ

('W' বা 'জ' অর্থে world, জগৎ বা বাহ্য পরিবেশ ; 'O' বা 'দে' অর্থে organism বা দেহ)।

বাহ্য জগতের যে প্রভাব আমাদের মনের উপর কার্য করে, তাহাকে বলে উদ্দীপক (stimulus) এবং তাহার ফলে আমাদের মন যে-ভাবে উহার উপর কার্য করে, তাহাকে বলে প্রতিক্রিয়া (reaction)।

এই প্রতিক্রিয়ার জন্য প্রয়োজন হয় প্রস্তুতি (preparation বা set) ; বিভিন্ন প্রকার প্রতিক্রিয়ার জন্য দেহমধ্যে পূর্ব হইতেই প্রস্তুতি থাকে। এই সব বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার দ্বারা কি উদ্দেশ্য সাধিত হয়? পূর্বেই বলা হইয়াছে, ইহা দ্বারা বাহ্য জগতের সহিত দেহ-মনকে মানাইয়া লওয়ার চেষ্টা হয়, অর্থাৎ 'প্রতিক্রিয়া' হইল 'প্রতিযোজক ক্রিয়া'।

ব্যক্তি-বিশেষকে কেন্দ্র করিয়া যদি তাহার ব্যবহারকে সাংকেতিক ভাষায় বর্ণনা করিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে :

S→R বা উ→প্র

('S' বা 'উ' অর্থে stimulus বা উদ্দীপক এবং 'R' বা 'প্র' অর্থে reaction বা প্রতিক্রিয়া)।

ব্যক্তি বিশেষের উপর উদ্দীপক কার্য করিল এবং সে তাহারই ফলে প্রতিক্রিয়া করিল।

যদি প্রশ্ন উঠেঃ 'এই উদ্দীপক কোথা হইতে আসিল?', তাহা হইলে বলিতে হইবে 'বাহ্য জগৎ হইতে' অর্থাৎ W→S বা জ→উ। এই উদ্দীপক দেহ-মনোবিশিষ্ট জীবের উপর কার্য করিল। ঐ দেহ আবার অবস্থানুযায়ী প্রতিযোজক ক্রিয়া করিবার জন্য প্রস্তুত থাকে। ইহাকে বুঝাইবার জন্য OW বা দে-জ সংকেত ব্যবহার করা হয়; ইহার অর্থ হইল 'organism' ready for adaptation to the 'world', অর্থাৎ যে দেহ বাহ্য জগতের উপযুক্ত প্রতিযোজক ক্রিয়া করিবার জন্য প্রস্তুত। অবশ্য সকল ক্ষেত্রেই যে ব্যক্তি-বিশেষ প্রস্তুত থাকে বা প্রস্তুত থাকিলেও উপযুক্ত ক্রিয়া করিতে সমর্থ হয়, তাহা নহে। যাহা হউক, দেহ-মনের যদি 'প্রস্তুতি' থাকে, তাহা হইলে বলিতে পারিঃ

W→S→OW→R→W

বা জ →উ→দে-জ→প্র→জ।

মোট কথা, দেহ ও মন উদ্দীপকের ফলে প্রতিক্রিয়া করে, এবং তাহার ফলে আবার বাহ্য জগতে কোন-না-কোন পরিবর্তন সাধিত হয়।

(খ) চিন্তন, অনুভূতি ও ক্রিয়ার পারস্পরিক সম্বন্ধঃ

চিন্তন, অনুভূতি ও ক্রিয়ার মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা যেমন আছে, সেইরূপ ইহাদের মধ্যে বৈপরীত্যও আছে।

ইহাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা আছে, কারণ একটি অপরটি ব্যতীত থাকিতে পারে না। মনের এমন কোন অবস্থা থাকিতে পারে না যেখানে কেবলমাত্র চিন্তন আছে, বা কেবলমাত্র অনুভূতি আছে বা কেবলমাত্র ইচ্ছা আছে। চিন্তন থাকিলেই কিছু-না-কিছু অনুভূতি ও ইচ্ছা থাকিবে, অনুভূতি থাকিলেই অল্পবিস্তর চিন্তন ও ইচ্ছা তাহার সহিত জড়িত থাকিবে; আবার ইচ্ছা থাকিলেই তাহার সহিত সংযুক্ত থাকিবে চিন্তন ও অনুভূতি। আমরা পূর্বেই (পৃঃ ৬, ৭) উদাহরণ দিয়াছি কিরূপে চিন্তা হইতে অনুভূতি ও ইচ্ছা জাগরিত হয়। এইদিক্ হইতে দেখিলে চিন্তন

অনুভূতি ও ইচ্ছা ইহাদের পরস্পরের মধ্যে অন্যোন্য-আশ্রয়বৃত্তি এবং অন্যোন্য-জননবৃত্তি আছে।

আবার উহাদের মধ্যে পারস্পরিক বৈপরীত্যও আছে। উহাদের মধ্যে একটির আধিক্য ঘটিলে অন্য দুইটির প্রভাব অনেকাংশে কমিয়া যায়। যদি চিন্তন বাড়ে, তাহা হইলে অনুভূতি ও ইচ্ছার আধিক্য থাকে না। অতিরিক্ত চিন্তাশীল ব্যক্তির কর্মপটুতা থাকে না (বা thought paralyses action)—ইহা আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখিতে পাই। আবার যাহারা অত্যন্ত অনুভূতি-প্রবণ তাহাদের অধিক চিন্তন-শক্তি থাকে না। সেইরূপ যাহাদের আবেগ ও ইচ্ছা-শক্তি অত্যন্ত প্রবল তাহারা অনেক সময় হঠকারী হয়—তাহাদের যুক্তিসম্মত উপায়ে চিন্তা করিবার বা সূক্ষ্ম অনুভূতি বোধ করিবার ক্ষমতা বিশেষ থাকে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে চিন্তন, অনুভূতি ও ইচ্ছা, এই তিনটির মধ্যে একের অন্যকে অভিভূত করিবার ক্ষমতা আছে, অর্থাৎ ইহাদের অন্যোন্য-অভিভববৃত্তি আছে।

ইহাদের পরস্পরকে তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, অনুভূতি প্রধানতঃ ব্যক্তিগত ব্যাপার, বাস্তবচিন্তা অনেকাংশে নৈর্ব্যক্তিক ও বস্তুমুখী এবং ইচ্ছার ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিক উপাদান দুইই আছে। আবার ইহাও বলা হয় যে, অনুভূতি সর্বাধিক নিষ্ক্রিয়, ইচ্ছা সর্বাধিক সক্রিয় এবং চিন্তনের মধ্যে নিষ্ক্রিয়তা ও সক্রিয়তা দুই-ই আছে।[১৩]

৩। মনোবিদ্যার সংজ্ঞা (Definition of Psychology):

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিদ্যা বা মনস্তত্ত্ব নিতান্তই তরুণ এবং মনস্তাত্ত্বিকদের মধ্যে মনোবিদ্যার প্রকৃত সংজ্ঞা লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে। তবে এই প্রকার মতবিরোধ দেখিয়া হতাশ হইবার বা মনোবিদ্যাকে ব্যঙ্গ করিবার কোন কারণ নাই। সকল বিজ্ঞানের আদিতেই অনেক মতভেদ, অনেক স্থূলধারণা থাকে, কালক্রমে ঐ সমস্ত মত বা

১৩ ইংরাজীতে বলা হয়: "Feeling is subjective, Thought is objective and Will is both"; আবার, "Feeling is supremely passive, Will is supremely active and Thought both."

ধারণাগুলি পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত ও পরিশোধিত হয়। মনোবিদ্যা সম্বন্ধেও এইরূপ আশা পোষণ করিতে হইবে।[১৪]

আমরা এখানে প্রথমে কয়েকটি প্রচলিত সংজ্ঞার আলোচনা করিব।

(ক) প্রাচীনকালে মনোবিদ্যা দর্শনের অঙ্গ হিসাবেই পরিগণিত হইত এবং মনোবিদ্যার অর্থ ছিল **আত্মা-সম্বন্ধীয় আলোচনা** (*science of soul*)। আধুনিককালের বিজ্ঞান বাহ্য অভিজ্ঞতার উপর গড়িয়া উঠিয়াছে; কিন্তু প্রাচীন মনোবিদ্যা বাহ্য অভিজ্ঞতার উপর গুরুত্ব আরোপ না করিয়া আত্মা সম্বন্ধীয় তাত্ত্বিক আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিত। মনোবিদ্যার ইংরাজী প্রতিশব্দ Psychology এবং উহা 'Psyche' ও 'Logos' এই দুই পদের সমন্বয়। 'Psyche' বলিতে বুঝায় 'Soul' বা আত্মন্ এবং 'Logos' অর্থে বিজ্ঞান। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত অর্থে psychology বলিতে বুঝায় science of soul বা আত্মাসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান।

আধুনিককালের মনোবিদ্‌গণ মনোবিদ্যার এই সংজ্ঞা পরিহার করিয়াছেন। তাঁহারা মনোবিদ্যাকে দর্শনের অধীন বা অন্তর্গত বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা বলেন, আত্মার প্রকৃত স্বরূপ কি এবং উহার ভাবী পরিণতি কি হইতে পারে, তাহা তত্ত্বসম্বন্ধীয় আলোচনা এবং উহা তত্ত্ববিদ্যা (Metaphysics) ও দর্শন (Philosophy)-এর বিষয়বস্তু। মনের যে সমস্ত বাহ্যপ্রকাশ দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতায় জানা যাইতে পারে এবং মনের নির্জ্ঞান বা অবচেতন

১৪ বিখ্যাত দার্শনিক ও মনোবিৎ উইলিয়াম জেম্‌সের ভাষায় "Psychology is not a science, but the hope of a science."

একদিন ছিল যখন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রসায়নশাস্ত্র (Chemistry)-এর বিশেষ কোন পৃথক্ স্থান ছিল না এবং উহা alchemy বলিয়া পরিগণিত হইত। বিভিন্ন প্রকার প্রাণিবিজ্ঞান ও দেহবিজ্ঞান (biological and psychological sciences)-এরও আদিতে তাহাদের আলোচ্য বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে যথেষ্ট মতবিরোধ ছিল।

O. L. Zangwill-এর কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য : "To the eye of an unsympathetic critic, contemporary psychology might well appear as an ill-defined sphere of inquiry. lacking a clear-cut frame of reference......At the same time, it must be borne in mind that similar criticisms could be made of every biological science in the formative period of its development......yet from the crude and animistic speculations of early medicine has arisen the highly refined modern science of experimental physiology. Is it too much to hope that psychology will achieve an equally distinguished position... ?" (*An Introduction to Modern Psychology*, pp. 1, 2).

স্তরে থাকিয়া দৈনন্দিন জীবনের উপর যে সব ধারণা ও বাসনা প্রভাব বিস্তার করে, বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিদ্যা সেইগুলি আলোচনা করে—কোন অতীন্দ্রিয় সত্তা তাহার বিষয়-বস্তু নহে। তাহা ছাড়া, দার্শনিকদের নিজেদের মধ্যেই আত্মা সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে এবং অনেকে আত্মাকে অস্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং মনোবিদ্যা হইতে আত্মার আলোচনা পরিত্যাগ করাই উচিত।[১৫]

(খ) আধুনিক যুগের প্রারম্ভে মনোবিদ্যাকে **মনঃ-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান** (*science of mind*) আখ্যা দেওয়া হইত।

এই সংজ্ঞাও সকল মনোবিৎ গ্রহণ করেন না। 'আত্মা' পদটি লইয়া যেমন বহু বিতর্ক দেখা দিয়াছে, সেইরূপ 'মন' পদটি লইয়াও কিছু কিছু মতবিরোধ আছে। তাহা ছাড়া 'মন' বলিয়া কোন সত্তা অন্যের ক্ষেত্রে সরাসরি জানা যায় না—'মন' অপেক্ষা মনের প্রকাশই আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয়-বস্তু। আবার মনোবিদ্যাকে যদি কেবলমাত্র মনঃ-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান (mental science) বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তাহা হইলে যুক্তিশাস্ত্র (logic), নীতিশাস্ত্র (ethics) ইত্যাদি মনঃ-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান হইতে ইহার পার্থক্য সুস্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করা হইল না।

(গ) কেহ কেহ মনোবিদ্যার সংজ্ঞা দিয়াছেন যে, ইহা **চেতনা-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান** (*science of consciousness*); ইহারা মনে করেন, চেতনাই মনের সারধর্ম।[১৬]

এই সংজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি হইল যে, ইহা মন ও চেতনাকে কতকটা তুল্যার্থবোধক করিয়াছে; কিন্তু কেবলমাত্র চেতনাকে লইয়া মন নহে —আধুনিক মনোবিদ্‌গণের মতে মনের মধ্যে একটা চেতনাতিরিক্ত স্তর আছে, উহাকে বলা হয় নির্জ্ঞান স্তর (unconscious level) এবং মনের চেতনাময় অবস্থার বহু ধারণা, ইচ্ছা ইত্যাদি নির্জ্ঞান স্তরদ্বারা প্রভাবিত হয়।

---

১৫ প্রাচীন যুগের এই মনোবিদ্যাকে অনেক সময় Rational Psychology বলা হয়, কারণ প্রাচীনপন্থীরা reason বা যুক্তিকেই আত্মার সারাংশ (essence of soul) মনে করিতেন। আধুনিকপন্থীরা মনোবিদ্যাকে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিয়াছেন—এইজন্য ইহাকে Empirical Psychology বলা হয়।

১৬ দার্শনিক দেকার্ত বলিয়াছেন, চৈতন্য মনের সারধর্ম এবং বিস্তার জড়ের সারধর্ম।

সুতরাং যে সংজ্ঞা মনের এক বিরাট্ অংশকে বাদ দিয়া থাকে, তাহা আমাদের গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। আবার যাঁহারা মনোবিদ্যাকে কেবলমাত্র চেতনার বিজ্ঞান বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা চেতনার বিশ্লেষণ করিয়াই তাঁহাদের কার্য সমাপ্ত মনে করেন, কিন্তু ইহা দ্বারা বাহ্য জগতের সহিত মানব-মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কারণ কি বা উদ্দেশ্য কি, তাহা নিরূপিত হয় না।

(ঘ) অতি-আধুনিক মনোবিদ্‌গণ মনে করেন যে, মানুষের মনের প্রকাশ মানুষের কার্যের বা ব্যবহারের মাধ্যমে; সেইজন্য মনোবিদ্যাকে আজকাল **ব্যবহার-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান** (*science of behaviour*) বলা হয়।

'ব্যবহার' পদটি লইয়া মনোবিদ্‌গণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। মানুষের ক্রিয়াকে দুই ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়—যান্ত্রিকতাবাদের দৃষ্টিভঙ্গী (mechanical standpoint) হইতে এবং অভিপ্রায়বাদ বা উদ্দেশ্য-সাধনবাদের দৃষ্টি-ভঙ্গী (purposive বা teleological standpoint) হইতে। প্রথমোক্ত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিয়াছেন জে, বি, ওয়াট্‌সন্ (J. B. Watson) ইত্যাদি যান্ত্রিকতাবাদী মনোবিদ্‌গণ। ওয়াট্‌সন্ মানুষের বাহ্য ক্রিয়ার অন্তরালে 'মন' বলিয়া কোন পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না—বিদ্যুৎচালিত পাখা যেমন বিদ্যুতের সঞ্চার হইলেই ঘুরিতে থাকে, বাষ্পযান যেমন বাষ্পের প্রভাবে চলিতে থাকে, সেইরূপ বাহ্যজগতের বিভিন্ন বস্তুর সংস্পর্শে আমরা (অর্থাৎ দেহধারী জীবেরা, 'মনঃ'-বিশিষ্ট জীব নহে) প্রতিক্রিয়া করি। 'উদ্দীপক→প্রতিক্রিয়া' (Stimulus→Response, সংক্ষেপে S→R) এই সূত্রের সাহায্যে মানুষের সকল কার্যের ব্যাখ্যা করা যায়। (পৃঃ ৯৮)। এইজন্য ইঁহারা মনোবিদ্যার ইতিহাসে ব্যবহারবাদী বা চেষ্টিতবাদী (Behaviorist) নামে পরিচিত। 'ব্যবহার'-পদটির এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে মানুষকে দেহ-বিশিষ্ট যন্ত্রে রূপান্তরিত করা হয় এবং মনোবিদ্যা তখন শারীরবিদ্যা (Physiology)-তে পর্যবসিত হয়।

সুতরাং মনোবিদ্যাকে যদি ব্যবহার-বিজ্ঞান বলিয়া বর্ণনা করিতে হয়, তাহা হইলে 'ব্যবহার'-পদটিকে উপর্যুক্ত যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ব্যাখ্যা দেওয়া যাইবে না; উহাকে কোন উদ্দেশ্যসাধন-প্রয়াসী মনের প্রকাশ বলিয়া দেখিতে হইবে। বাস্তবিক 'ব্যবহার' পদটিকে এই অর্থে গ্রহণ করিয়া উইলিয়াম ম্যাক্‌ডুগাল (William McDougall) আধুনিককালে মনোবিদ্যার সংজ্ঞা

'ব্যবহার-বিজ্ঞান' (science of human conduct or behaviour) দিয়াছেন।[১৭] পরে ওয়াট্‌সন্‌ ম্যাক্‌ডুগালের এই সংজ্ঞা গ্রহণ করেন এবং ফলে 'ব্যবহার'-পদটির অপব্যাখ্যার সৃষ্টি হয়।[১৮]

ম্যাক্‌ডুগালের এই সংজ্ঞার বিশেষ গুণ হইল যে, ইহা মনের যে সকল প্রকাশ অন্যের নিকট সুপরিস্ফুট, অর্থাৎ বাহ্যক্রিয়াবলী, তাহাকেই মনোবিদ্যার প্রধান আলোচ্য বিষয় বলিয়া নির্দেশ দিয়াছে এবং ইহা আত্মা, মন, চৈতন্য ইত্যাদি বিতর্কমূলক বা দ্ব্যর্থমূলক পদ পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহা ছাড়া, বাহ্যক্রিয়া বা ব্যবহার সাধারণ অর্থে গ্রহণ করিলে মন এবং চেতনার কথা তাহার সহিত জড়িত থাকে, কিন্তু চেতনা বা মনের ব্যাখ্যা করিবার জন্য ব্যবহারের কথা নাও উঠিতে পারে।[১৯]

---

১৭ McDougall-রচিত *Primer of Physiological Psychology* (1905) এবং *Psychology, the study of Behavior* (1912) দ্রষ্টব্য।

১৮ ম্যাক্‌ডুগাল তাঁহার ব্যবহৃত এই সংজ্ঞা সম্বন্ধে তাঁহার *Outline of Psychology* (১৯২৩ সালে প্রথম প্রকাশিত) গ্রন্থে মন্তব্য করিয়াছেন :

"I still regard this definition as a good one, logically parhaps the best. But since my suggestion was made, it has been adopted and carried to an extreme by the 'behaviorists'. In protesting against a too exclusive study of the introspective data, and rightly insisting on the importance of the study of behavior as a psychological method, they have overshot the mark... Hence I am disposed to say, 'If you are going to get on, it's time for me to get off." তাহার পর তিনি সাধারণভাবে বলিয়াছেন : "This question of the definition of psychology is after all one of minor importance. All our lines of separation between the sciences are provisional only and liable to readjustment as knowledge grows. We ought to aim not so much at perfectly logical definitions, which will only be possible when the sciences are completed, but at definitions stated in terms of the practical purposes with which we pursue the several sciences. Accepting this principle, we may define physiology, as it exists to-day, as the science which aims to give us better understanding and control of the chemical and physical processes of the various organs of the body ; and psychology as the science which aims to give us better understanding and control of the behaviour of the organism as a whole." (*Outline of Psychology*, 5th Ed., p. 38 fn.)

১৯ "...if we start with behaviour it is easier to find a place for consciousness and mind than it is to find a place for behaviour if we start with mind or consciousness." (K. Koffka, *Principles of Gestalt Psychology*, p. 25).

ওয়াট্সন্ ও ম্যাকডুগালের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য বুঝিবার জন্য একটি উদাহরণ লওয়া যাউক্।[২০] যখন একটি মোটরগাড়ী ছুটিতে থাকে, তখন বাহির হইতে আমরা যে গতি দেখি, তাহা ঐ বস্তুর সামগ্রিক গতি; কিন্তু ঐ গতি সম্ভব হয় উহার জ্বালানী পেট্রোলের জন্য, অর্থাৎ পেট্রোলের অণুগুলির মধ্যে সংঘাতের বা গতির সৃষ্টি হয় বলিয়া। এই গতি হইল আণবিক গতি। এখন যদি গাড়ীটির গতিকে ব্যাখ্যা করিতে হয়, তাহা হইলে চালক উহাকে যে লক্ষ্যের পথে লইয়া যাইতেছে, সেই লক্ষ্যের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ঐ গতিকে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। অথবা, পেট্রোলরূপ জ্বালানী কার্য করার ফলে গাড়ীর অভ্যন্তরীণ যন্ত্রের কিরূপ পরিবর্তন সাধিত হইতেছে, কেবলমাত্র তাহা বর্ণনা করিয়া ঐ গতিকে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। সেইরূপ মানুষের ব্যবহার বা কার্য ব্যাখ্যা করিবার কালে আমরা ঐ কার্যের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের সাহায্যে উহাকে ব্যাখ্যা করিতে পারি, অথবা কেবলমাত্র দেহ-যন্ত্রের পরিবর্তন হিসাবে উহাকে বর্ণনা করিতে পারি। এইবার মানুষের কোন কার্যের উদাহরণ লওয়া যাউক্। মনে করা যাউক্, ছাত্রেরা ক্লাসে ঢুকিয়া মনোযোগ সহকারে শিক্ষকের বক্তৃতা শুনিতেছে। ম্যাক্ডুগ্যাল্ যখন ছাত্রদের এই কার্য ব্যাখ্যা করিবেন, তখন তিনি ছাত্রদের বাহ্য কার্যাবলীকে (যাহা আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতে পারি) মনঃ-সঞ্জাত বলিয়া বর্ণনা করিবেন; যেমন, তাহারা এক বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া বিশেষ ভঙ্গিমা লইয়া বক্তৃতা শুনিতেছে এবং তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতেছে। ওয়াট্সন্ যখন ব্যাখ্যা করিবেন, তখন তিনি বলিবেন, শিক্ষকের বক্তৃতা ছাত্রদের নিকট এক বিশেষ উদ্দীপক,—ঐ উদ্দীপকের ফলে কর্ণ হইতে মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রে পরিবর্তন আসিল, আবার অন্য কতকগুলি স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে মস্তিষ্ক হইতে দেহের বিভিন্ন পেশীতে শক্তিসঞ্চার হইল এবং ছাত্রেরা এক বিশেষ ভঙ্গিমায় বসিল।

মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আমরা ওয়াট্সনের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না, কারণ ইহা মনকে অস্বীকার করিয়া মানুষকে দেহবিশিষ্ট-যন্ত্রে রূপান্তরিত করিয়াছে। মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সহিত যে দৈহিক

---

২০ Koffka, *Principles*, পৃঃ ২৫—২৭ দ্রষ্টব্য। কফ্কা ও টোলমান (Tolman) এই প্রসঙ্গে পদার্থবিদ্যা হইতে molar ও molecular motion-এর পার্থক্যের উপমা দিয়াছেন।

পরিবর্তন থাকে না, তাহা আমরা বলিতেছি না—আমাদের মত হইল যে, কেবলমাত্র দেহযন্ত্রের নামে মানসিক ক্রিয়ার ব্যাখ্যা করিলে উহা এক-দেশদর্শী ও অসম্পূর্ণ থাকিবে। মনোবিদ্যার ব্যাখ্যা হইবে মনকে কেন্দ্র করিয়া—দেহকে কেন্দ্র করিয়া নহে। আমরা যখন মনোবিদ্যায় 'ব্যবহার'-পদটি গ্রহণ করি, তখন বুঝি **মনের ব্যবহার বা ক্রিয়া**—মন যখন পরিবেশের সংস্পর্শে আসে তখন, অর্থাৎ মন ও পরিবেশ এই দুইয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে, এই ক্রিয়া সঞ্জাত হয়। এই ক্রিয়ার পশ্চাতে থাকে মনের সংযোগ অথবা প্রভাব ; অর্থাৎ মন ইহার অর্থ বুঝে, ইহার মাধ্যমে কোন উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করে এবং উদ্দেশ্য সাধিত হইলে ঐ ক্রিয়া সমাপ্ত হয় ; আবার মন অনেক-ক্ষেত্রে প্রয়োজনমত ইহার পরিবর্তন ও উন্নতিসাধনও করিতে পারে।[২১]

(ঙ) উপসংহার :

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে : এই সমস্ত বিভিন্ন সংজ্ঞাগুলির মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য ? উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, কোন সংজ্ঞাই সম্পূর্ণ ভুল নহে। এক একটি সংজ্ঞায় এক একটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। যদি আমরা মনের বিভিন্ন পরিবর্তনের পশ্চাতে অন্ততঃ আপেক্ষিকভাবে কোন স্থায়ী সত্তা (তাহা দার্শনিকের আত্মা হউক্ বা না হউক্) কল্পনা না করি, তাহা হইলে সুস্থ মনের বিভিন্ন প্রকাশগুলির সংগঠন ও শৃঙ্খলা বুঝাইতে পারি না (পৃঃ ২৭৫)। সুতরাং মনোবিদ্যা মনঃ-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান (science of self or mind)। আবার আমাদের মানসিক জীবনে চেতন ও নির্জ্ঞান স্তর উভয়ের অবদান থাকিলেও, মনের যে অংশকে আমরা জানিতে পারি তাহা চেতনাময় অংশ ; যখন আমাদের চিন্তা, অনুভূতি বা ইচ্ছা বাহ্যতঃ প্রকাশ পায়, তখন আমরা সে সম্বন্ধে সচেতন হই এবং অনেকক্ষেত্রে এইসব চিন্তা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারি। এই দিক্ হইতে বিচার করিলে মনোবিদ্যা 'চেতনার বিজ্ঞান' বা 'অভিজ্ঞতার বিজ্ঞান' (science of consciousness or experience) এই সংজ্ঞারও যৌক্তিকতা আছে।

তবে বর্তমানকালে অধিকাংশ মনোবিৎ ওয়াট্‌সনীয় যান্ত্রিকতাবাদ সমর্থন না করিলেও ব্যবহারের উপরই বিশেষ প্রাধান্য আরোপ করিয়াছেন ;

২১ মানসিক ব্যবহার ও যান্ত্রিক ব্যবহারের পার্থক্য বুঝিবার জন্য McDougall, *Outline*, ২য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সেইজন্য তাঁহারা মনোবিদ্যাকে 'ব্যবহারের বা বাহ্য ক্রিয়ার বিজ্ঞান' (science of behaviour) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।[২২] বর্তমানকালের মনোবিদ্‌গণ মনে করেন যে, বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয় কোন 'ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বাস্তব ঘটনা' হওয়া উচিত; যেহেতু ব্যবহারের মাধ্যমে মনের যে প্রকাশ ঘটে, তাহা সকলের নিকট সমানভাবে প্রকাশমান, সেইহেতু ইহা লইয়া আলোচনা করিলে বাস্তব ঘটনা (real fact) লইয়াই আলোচনা করা হইবে।

পরিশেষে আমাদের মন্তব্য এই যে, মনোবিদ্যার সর্বজনগ্রাহ্য একটি সংজ্ঞা দান করা কঠিন। এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, বিভিন্ন পুরাতন

২২ আমরা উদাহরণস্বরূপ কয়েকজন আধুনিক লেখক প্রদত্ত সংজ্ঞার উল্লেখ করিতেছি—ইহারা সকলেই 'ব্যবহার' বা 'ক্রিয়া' পদটির প্রয়োগ সমর্থন করিতেছেন :

(১) R. S. Woodworth : "Psychology undertakes to make a scientific study of the ***activities*** of the individual considered as a unit, as he really is in his dealings with other individuals, and with the world." (*Psychology*, 12th. Ed., p. 19).

(২) K. Koffka : "It (Psychology) is the study of ***behaviour*** in its causal connection with the psycho-physical field". (*'Principles of Gestalt Psychology*, p. 67.)

(৩) N. L. Munn : "When Psychology is defined as the scientfic investigation of behaviour, (it) is as good a definition as any." "Psychology thus studies certain functions of organism, as these are ***objectified*** through instruments or language or other forms of ***behaviour***." (*Psychology : The fundamentals of human adjustment*, p. 16).

(৪) O. L. Zangwill : "Psychology has been aptly defined as the study of the general ***activity*** and ***behaviour*** of organisms in their relations with the environment." (*An Introduction to Modern Psychology*, p. 12).

(৫) Boring, Langfeld & Weld : "Psychology deals with both the ***behaviour*** of men as it appears in his responses and with consiousness as he finds it in his immediate experience." (*Foundations of Psychology*, p. 4).

(৬) C. T. Morgan : "Psychology is the study of behaviour". (*Introduction to Psychology*, p. 9).

(৭) Stagner and Karwoski : "Operationally...we can define Psychology ***as the study of human behaviour and experience***." (*Psychology*, p. 20).

(৮) Wenger, Jones & Jones : "Psychology is usually defined today as the science of the ***behaviour*** of organisms. In other words, it involves a study of what organisms do, whether it be thinking, remembering, or moving." (*Physiological Psychology*, p. 1).

সংজ্ঞার মধ্যে কিছু-না-কিছু সত্য নিহিত আছে, তাহা না হইলে পুরাতন সংজ্ঞার ভিত্তিতে আজিকার বিজ্ঞান গড়িয়া উঠিতে পারিত না।[২৩]

তবে বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা মনোবিদ্যার আধুনিক সংজ্ঞা গ্রহণ করিলাম। মনোবিদ্যার এই আধুনিক সংজ্ঞা হইল মনোবিদ্যা কোন মনোবিশিষ্ট জীবের **ব্যবহার-সম্বন্ধীয় বস্তু-নিষ্ঠ বিজ্ঞান**। নিম্নলিখিত কয়েকটি সর্তে ইহা গ্রহণযোগ্য : (১) ব্যবহার বা ক্রিয়া সঙ্কীর্ণ অর্থে বুঝিলে চলিবে না। ব্যবহার বা ক্রিয়া বলিতে আমরা যেমন চলাফেরা, খেলাধূলা ইত্যাদি বুঝিব, সেইরূপ চিন্তা করা, আবেগ বা অনুভূতিবোধ করাও বুঝিব। (২) এই ব্যবহারের পশ্চাতে 'মন' আছে এবং ব্যবহার ঐ মনেরই কোন-না-কোন অবস্থার বাহ্য প্রকাশ অর্থাৎ উহা মনঃসঞ্জাত। (৩) এই বাহ্য প্রকাশের সহিত ব্যক্তি বা জীবের অভিজ্ঞতা বর্তমান থাকিবে। (৪) ব্যবহার বা ক্রিয়ারূপে জীবের মনের প্রকাশ যখন ঘটে, তখন বুঝিতে হইবে জীব ও তাহার পরিবেশের মিথষ্ক্রিয়া (interaction)-এর ফলেই উহার উদ্ভব হইয়াছে। জগতে কোন জীবেরই সম্পূর্ণ পৃথক্ অস্তিত্ব নাই—জীব ও তাহার পরিবেশ লইয়াই তাহার সমগ্রত্ব (৫) এই ব্যবহারকে যদিও কেবলমাত্র দেহ-যন্ত্রের ব্যবহার বলিয়া বর্ণনা করা সমীচীন হইবে না, তথাপি উহার সহিত দেহ-যন্ত্রের পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট থাকে।

৪। বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিদ্যার বৈশিষ্ট্য (Nature of Psychology as a science):

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি প্রকৃতির কোন বিশেষ অংশ লইয়া সুশৃঙ্খল আলোচনার নাম বিজ্ঞান (১ম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। প্রকৃতিকে আমরা সুবিধার জন্য তিন ভাগে ভাগ করিয়া থাকি—অচেতন জড়, প্রাণ ও চেতনা বিশিষ্ট মন (matter, life and mind)। কতকগুলি বিজ্ঞান জড় প্রকৃতির আলোচনা করিয়া থাকে, যেমন, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন-বিদ্যা, ভূতত্ত্ব ইত্যাদি। কতকগুলি বিজ্ঞান কেবলমাত্র প্রাণশক্তির বিভিন্ন প্রকাশ লইয়া আলোচনা করে, যেমন শারীরবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, জীববিদ্যা, ইত্যাদি। আবার কতকগুলি বিজ্ঞান মনের প্রকাশ লইয়া আলোচনা করে : ইহারা মনঃকেন্দ্রী বিজ্ঞান, যেমন, মনোবিদ্যা, নীতিবিদ্যা, সমাজবিদ্যা ইত্যাদি।

---

২৩ **কফ্‌কার ভাষায়:** "It would be strange indeed if a science had developed on entirely wrong assumptions." (*Gestalt Psychology*, p. 25).

অবশ্য প্রকৃতির এই শ্রেণীকরণ অনেকটা কৃত্রিম ব্যাপার, কারণ বাস্তবক্ষেত্রে জড়, প্রাণ ও মনের সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ সম্ভব নহে; যেমন, মানুষেরই ভিতর এই তিনটির সমন্বয় আমরা দেখিতে পাই। মানুষের দেহ পৃথক্‌ভাবে ধরিলে উহা জড়পদার্থ; তাহা ছাড়া, মানুষ যতক্ষণ জীবিত থাকে, ততক্ষণ উহার ভিতর প্রাণশক্তি বিরাজমান, আবার মানুষ সচেতন মনোবিশিষ্ট জীব।

এখন বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিদ্যার বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যাউক্।

(১) যদি সুবিধার জন্য আমরা প্রকৃতির এই কৃত্রিম বিভাগ মানিয়া লই, তাহা হইলে বলা বাহুল্য মনোবিদ্যা **মনঃকেন্দ্রী বিজ্ঞান** (mental science) হিসাবে স্বীকৃত হইবে।

তবে এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, মনোবিদ্যা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর ব্যবহারমূলক বিজ্ঞান এবং প্রাণীর ভিতর (বিশেষতঃ মানুষ ইত্যাদি উচ্চস্তরের জীবের ভিতর) জড়, জীবন ও মন (matter, life ও mind)-এর অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে; এবং এই কারণ বিজ্ঞানের জগতে মনোবিদ্যা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি জড়বিজ্ঞানে প্রাণ ও মনের কথা উঠে না, সেইরূপ প্রাণিবিদ্যাতে মনের কথা আলোচিত হয় না; কিন্তু মনোবিদ্যা যখন মনের কথা আলোচনা করে, তখন সে মনের 'আধার' স্বরূপ প্রাণময় দেহের রাসায়নিক উৎপত্তি ও গঠন এবং জৈব ব্যবহার—এই দুইটির আলোচনা না করিয়া পারে না। তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে, মনোবিদ্যা এমনই একটি বিজ্ঞান যাহার আলোচ্য বিষয়-বস্তুর মধ্যে তথাকথিত 'জড়', 'জীব' ও 'মন' সম্বন্ধীয় আলোচনার সমন্বয় ঘটিয়াছে, যদিও অবশ্য মনকে কেন্দ্র করিয়াই মনোবিদ্যা তাহার আলোচনায় ব্যাপৃত থাকে।

২৪ অধ্যাপক কফ্‌কা বলিয়াছেন যে, বৈজ্ঞানিক জড় পদার্থের আলোচনা করেন তাহার পরিমাণের (quantity) দিক্ হইতে; জীবদেহের আলোচনায় তিনি লক্ষ্য করেন উহার সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠু ব্যবহার (order) এবং মনের বেলায় দেখেন অর্থ নিরূপণ (meaning বা understanding)-এর ক্ষমতা। দেহধারী সজীব সচেতন মানুষের মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্যই দেখা যায় বলিয়া মনোবিদ্যা এই তিন বিষয়েরই আলোচনা করে। তাঁহার ভাষায়, "Looking at the sceinces of Nature, Life and Mind, we may extract from each one specific and particularly important concept, viz., from the first: quantity, from the second: order, and from the third: meaning or signi-

(২) আলোচনার সুবিধার জন্য বিজ্ঞানকে আমরা বর্ণনামূলক বিজ্ঞান (positive science) এবং আদর্শমূলক বিজ্ঞান (normative science) এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া থাকি। প্রথমটি, যে বস্তু বা ঘটনা যেমনটি আছে সেইরকম বর্ণনা করে এবং দ্বিতীয়টি, যাহা যে রকম হওয়া উচিত সেই আদর্শের কথা বলে। যেমন, নীতিবিদ্যা (ethics) আমাদের আদর্শ চরিত্র, অর্থাৎ চরিত্র যেমন হওয়া উচিত, তাহা বলিয়া থাকে ; অতএব ইহা আদর্শমূলক বিজ্ঞান।

মনোবিদ্যা **বর্ণনামূলক বিজ্ঞান**। আমাদের মনের অভিজ্ঞতা ও ব্যবহার বাস্তবক্ষেত্রে যে রকম হইয়া থাকে, তাহাই মনোবিদ্যা বর্ণনা করিয়া থাকে। আমাদের কি প্রকার চিন্তা করা উচিত, বা কি-প্রকার অনুভূতি থাকা উচিত বা কি-রকম কার্য করা উচিত, তাহা মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়-বস্তু নহে ; আমরা বাস্তবক্ষেত্রে কি-রকম ভাবে চিন্তা করি বা অনুভূতি বোধ করি বা কার্য করি তাহাই মনোবিদ্যা বর্ণনা করে।

(৩) বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিদ্যা যে সব সাধারণ নিয়মের প্রবর্তন করে, সেইগুলি অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ নহে। যে সব মানসিক ঘটনা আমাদের অভিজ্ঞতার ফলে জানা যায়, সেইগুলির ভিত্তিতেই মনোবিদ্যা সাধারণ সূত্র (general law) প্রবর্তন করিয়া থাকে ; অর্থাৎ ইহা **আরোহ-মূলক বিজ্ঞান** (inductive science)।

(৪) মনোবিদ্যার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা যাহা কিছু আলোচনা করে তাহা এক বা একাধিক ব্যক্তির মনের সহিত সংশ্লিষ্ট বস্তু বা ঘটনা হিসাবে আলোচনা করে। এইজন্য বলা হয়, মনোবিদ্যা **ব্যক্তি-কেন্দ্রিক** (individualistic)। পদার্থবিৎ (physicist) যখন বিদ্যুৎ বা তড়িৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন, তখন তিনি ব্যক্তিগত-মনোনিরপেক্ষ থাকেন, অর্থাৎ

---

ficance (in German *Sinn*). Our Psychology, then, must have a place for all of these." (*Gestalt Psychology*, p. 13).

এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, সকল মনোবিৎই এই দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন না। ব্যবহারবাদী বা চেষ্টিতবাদীরা (behaviorists) মনকে কোন পৃথক্ মর্যাদা দান করেন না। সুতরাং তাঁহারা মনোবিদ্যাকে মনঃকেন্দ্রিক বলিবেন না। ব্যবহারবাদী না হইয়াও একদল মনোবিৎ মনোবিদ্যাকে একপ্রকার জীববিদ্যা (biological science) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। Zangwill বলেন, "...Modern Psychology is gradually taking shape as a branch of biological science". (*Introduction to Modern Psychology*, p. 19).

উহাতে তাঁহার কী মনে হইল সে সম্বন্ধে তিনি উদাসীন। মনোবিৎ যখন উহা আলোচনা করিবেন, তখন তিনি লক্ষ্য করিবেন যে, বিদ্যুতের প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিয়া বা তড়িৎ শক্তির সংস্পর্শে আসিয়া **ব্যক্তি-বিশেষের মনে** কী প্রতিক্রিয়া দেখা দিল; অর্থাৎ মনোবিৎ যখন কিছু বস্তু বা ঘটনা সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তখন তিনি দেখেন যে, উহা কোন মানুষের মনে কী সংবেদন ঘটাইল বা কী আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিল বা সুখদুঃখের সৃষ্টি করিল বা অন্য কোনরূপ প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব করাইল।

ইহার অর্থ এমন নহে যে, মনোবিৎ তাঁহার নিজের বা কোন একজনের মনকে অনুধাবন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন; তাহা হইলে মনোবিদ্যা বিজ্ঞান পদবাচ্য হইতে পারিত না, কারণ বিজ্ঞান চেষ্টা করে এমন কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করিতে যাহা সর্বকালীন, সর্বজনীন সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইবে। মনোবিদ্যাকে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক বলার উদ্দেশ্য হইল যে, ব্যক্তির মনের সহিত সংস্রবহীন অর্থাৎ ব্যক্তির মনের উপর কোন প্রকার পরিবর্তন বা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে না এমন কোন কিছু মনোবিদ্যা আলোচনা করে না।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিদ্যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা ব্যক্তি-কেন্দ্রিক অথচ অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় ইহা সার্বিক নিয়মের অনুধাবন করে।[২৫] (পৃঃ ২৯ দ্রষ্টব্য)।

(৫) বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিদ্যার আর একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যে মনোবিদ্যাই একমাত্র বিজ্ঞান যাহা তাহার **বিষয়বস্তু আলোচনা করার জন্য দুইটি**

২৫ **তুলনীয় :** (১) "Psychology may be individualistic without being confined exclusively to the introspective method. There is nothing to hinder the psychologist from employing materials furnished by his observations of other men, of infants, of the lower animals, or of the insane; nothing, to hinder him taking counsel with the philologist or even the physiologist, provided always he can show the psychological bearings of these facts which are not directly psychological. But by whatever methods, from whatever sources its facts are ascertained they must—to have a psychological import—be regarded as having a place in, or as being a constituent of, ***someone's experience.***" (James Ward, ***Psychological Principles***, p. 27).

(২) "...it is the subjective point of view which is distinctly characteristic of Psychology as contrasted with other branches of human

পদ্ধতি (method) অনুধাবন করিয়া থাকে ; এই দুইটি পদ্ধতি হইল **অন্তর্দর্শন** (introspection) এবং **বিষয়গত পদ্ধতি** (objective method)। মন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ দুইটি উপায়ে হয়—অন্তর্দর্শন দ্বারা নিজের মনকে জানা যায় এবং বিষয়গত পদ্ধতি দ্বারা অপরের মনকে জানা যায়। মনোবিদ্যা ব্যতীত অন্যান্য সকল বিজ্ঞান মাত্র একটি পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারে এবং তাহা হইতেছে বিষয়গত পদ্ধতি। পদার্থবিৎ যখন বিদ্যুৎ, চুম্বক ইত্যাদি লইয়া আলোচনা করেন, অথবা উদ্ভিদ্‌বিৎ যখন উদ্ভিদের গঠনাদি লইয়া আলোচনা করেন, তখন কোন মানসিক অভিজ্ঞতার কথা উঠে না, অর্থাৎ এখানে অন্তর্দর্শনের কোন প্রশ্ন নাই। মনোবিদ্যায় কিন্তু অন্তর্দর্শন প্রয়োজন —অপরের মনকে জানিতে হইলে প্রথমে নিজের মনকে জানা প্রয়োজন ; আবার মনোবিৎ যদি কেবল নিজের মন লইয়াই আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে কখনও বিজ্ঞান গড়িয়া উঠিত না।[২৬] সেইজন্য মনোবিদ্যায় অন্তর্দর্শন ও বিষয়গত পদ্ধতি বা বাহ্যদর্শন এই দুইটি পদ্ধতিই অনুসৃত হয়।

(৬) অন্যান্য বিজ্ঞানের তুলনায় মনোবিদ্যার সহিত দর্শনের সম্পর্ক বিশেষ ঘনিষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়। যদিও সকল বিজ্ঞানের সহিতই দর্শনের সম্পর্ক আছে, **দর্শনের সহিত মনোবিদ্যার সম্পর্ক অধিকতর নিকট,** কারণ মনোবিদ্যা জ্ঞানের উৎপত্তি ও স্বরূপ লইয়া আলোচনা করে এবং দর্শনও (বিশেষতঃ ইহার যে অংশ জ্ঞানবিদ্যা বা epistemology বলিয়া পরিচিত) ঐ বিষয়ের আলোচনায় সমধিক আগ্রহান্বিত। তাহা ছাড়া, মনোবিদ্যার আলোচনা দর্শনের বিবিধ শাখাকে—যথা, নীতি-দর্শন (moral philosophy), সমাজ-দর্শন (social philosophy), রাষ্ট্রনীতি-দর্শন political philosophy), নন্দন-তত্ত্ব (aesthetics) ইত্যাদিকে—স্ব স্ব বিষয়-

knowledge.........it should be clear that this cannot involve an entire refusal to take account of objects......What is really distinctive of its procedure is that it takes account of objects only in their relation to a subject......only in so far as some mind *minds* them, or in so far as someone immediately experiences them". (G. F. Stout, *A Manual of Psychology*, pp. 3, 4).

২৬ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ব্যবহারবাদী মনোবিদ্‌গণ অন্তর্দর্শনের সম্ভাবনাকে স্বীকার করেন না, কারণ তথাকথিত দেহ-যন্ত্রের অন্তরালে 'মন' বলিয়া কোন কিছুর অস্তিত্ব তাঁহারা মানেন না।

বস্তু আলোচনায় সাহায্য করে। সুতরাং মনোবিদ্যা যে সমস্ত বিষয় আলোচনা করে তাহা দর্শনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।[২৭]

(৭) এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে মনোবিদ্যা **প্রাকৃতিক বিজ্ঞান** (natural science) কি না।

এই বিতর্কমূলক প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করিতে হইবে।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হইল যে, (ক) ইহা প্রকৃতির কোন বিশেষ অংশ লইয়া সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে আলোচনা করে; (খ) ইহা প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি প্রাকৃত উপায়ে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করে অর্থাৎ প্রাকৃত ঘটনাকে অতিপ্রাকৃত উপায়ে ব্যাখ্যা দান করে না; (গ) ঐ সব প্রাকৃত ঘটনাগুলির পশ্চাতে যে সমস্ত নিয়ম আছে, ইহা সেইগুলি আবিষ্কারের চেষ্টা করে এবং এইজন্য প্রকৃতির একরূপতা এবং কার্যকারণ-সম্বন্ধ-নীতির উপর নির্ভর করে; (ঘ) ইহার বিষয়বস্তু আলোচনা করিবার জন্য ইহা পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ইত্যাদি উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। [বর্তমান অধ্যায়ের ১ম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।]

এখন দেখা যাউক যে এখানে 'প্রকৃতি' পদটি আমরা কি অর্থে গ্রহণ করিয়া থাকি। সাধারণতঃ 'প্রকৃতি' কথাটির দ্বারা জড় এবং জৈব প্রকৃতি বুঝায়, কিন্তু তাহা দ্বারা চেতনা বা মন সূচিত হয় না। সেইজন্য প্রকৃতি-বিজ্ঞানের সাধারণ পুস্তকে জড়ের বিভিন্ন প্রকাশ এবং উদ্ভিদ্ ও বিভিন্ন প্রাণী সম্বন্ধে আলোচনা থাকে। 'প্রকৃতি' পদটি আবার ব্যাপক অর্থেও ব্যবহৃত হইতে পারে এবং প্রকৃতির ভিতর জড় ও প্রাণ ব্যতীত মনকেও অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। যদি

২৭ অধ্যাপক জেম্‌স্ এই বিষয়ে ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছেন: "...She (Psychology) assumes additional data peculiarly her own, and leaves it to more developed parts of philosophy to test their ulterior significance and truth. These data are—

1. *Thoughts and feelings*, or whatever other names transitory *states of consciousness* may be known by.

2. *Knowledge*, by these states of consciousness, of other things......... The *full* truth about states of mind cannot be known until both Theory of Knowledge and Rational Psychology have said their say." (*Psychology : Briefer Course*, p. 2.).

এইরূপ ব্যাপক অর্থে 'প্রকৃতি' পদটি গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে মনোবিদ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অন্যান্য প্রচলিত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের তুলনায় মনোবিদ্যার স্থান বিশেষ প্রকারের; কারণ অন্যান্য বৈজ্ঞানিক যে মনের সাহায্যে তাঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ বিষয়বস্তু আলোচনা করিয়া থাকেন, সেই মন লইয়াই মনোবিদ্‌গণ আলোচনা করেন এবং মনকে তাঁহাদের প্রধান বিষয়বস্তু করার জন্য একমাত্র মনোবিদ্‌গণই অন্তর্দর্শন ও বাহ্যদর্শন এই দুইটি পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তাহা ছাড়া, জড়বিজ্ঞানে কার্যকারণসম্বন্ধীয় নিয়ম (causal laws) যান্ত্রিকতাবাদের দৃষ্টিভঙ্গী (mechanistic standpoint) হইতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ সাধারণ জড়বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন যে, একই কারণ যতবারই দেখা দিবে ততবারই একই প্রকার কার্য উৎপাদিত হইবে এবং যখন অচেতন জড় কারণ ভাবে কাজ করিয়া থাকে, তখন পূর্ব পরিকল্পিত উদ্দেশ্য-সাধনের প্রশ্ন উঠে না; কিন্তু মানুষের বাহ্য ব্যবহারে (বিশেষতঃ ঐচ্ছিক ক্রিয়ার পশ্চাতে) পূর্বপ্রকল্পিত উদ্দেশ্যসাধনের প্রচেষ্টা থাকে। সেই কারণ, মনোবিদ্যা যান্ত্রিকতাবাদ দ্বারা মনের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা করিতে পারে না—যে সমস্ত মনোবিৎ যান্ত্রিকতাবাদ গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের ব্যাখ্যা ত্রুটিপূর্ণ।

জড়বাদী ও ব্যবহারবাদী লেখকগণ মনোবিদ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলিয়াছেন। তাহা ছাড়া, অন্য মতাবলম্বী লেখক যাঁহারা মনের সত্তা স্বীকার করেন, তাঁহারাও অনেকে মনোবিদ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলিয়াছেন।[২৮] আমরা উপরে যাহা বলিয়াছি তাহারই পুনরুল্লেখ করিয়া বলিব যে, যদি মনোবিদ্যাকে নিতান্তই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলিতে হয়, তাহা হইলে

২৮ আমেরিকার ব্যবহারবাদী মনোবিৎ ওয়াট্‌সন্ ইত্যাদি মনোবিদ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ওয়াট্‌সন্ মনোবিদ্যার সংজ্ঞা-দান কালে বলিয়াছেন: "Psychology is that division of *natural science* which takes human behavior......as its subject-matter." সেইরূপ J. F. Dashiell কারণ দেখাইয়াছেন: "The study of psychology aims to get at......knowledge by the procedure of natural science. This procedure is not one of observing concrete persons as wholes in complex social situations. Rather, it involves very painstaking *analysis* of man's behavior to determine specific *causal sequences* from which to develop *formal laws, principles*, even *formulae* which......form the subject matter of a pure science." (***Fundamentals of***

'প্রকৃতি' পদটি ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে এবং মানসিক ব্যবহারের ব্যাখ্যা-পদ্ধতি যে যান্ত্রিক ব্যবহারের ব্যাখ্যা-পদ্ধতি হইতে পৃথক্ তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে।

একদল লেখক এইজন্য মনে করেন যে, এইরূপ বিশেষ অর্থে বা সর্তাধীনে মনোবিদ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান আখ্যা দেওয়া অপেক্ষা উহাকে শুধু বিজ্ঞান বলাই সমীচীন হইবে। তাঁহারা মনে করেন যে, মনোবিদ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলিলে জড় ও মন, অচেতন ও চেতন, এই দুইয়ের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা অবলুপ্ত হইয়া অকারণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে। জড় বিজ্ঞান-গুলির মধ্যে গতি-বিজ্ঞান (dynamics) ঠিক জড় লইয়া আলোচনা করে না বলিয়া যেমন উহা বিশেষ প্রকারের বিজ্ঞান, সেইরূপ মনঃকেন্দ্রী বিজ্ঞানগুলির মধ্যে মনোবিদ্যা এক **বিশেষ প্রকারের অনুপম বিজ্ঞান**।[২৯] এই বিজ্ঞানকে কোন বিশেষণে বিশেষিত করিবার প্রয়োজন নাই।

তবে সাম্প্রতিক কালে মনোবিদ্‌গণের মধ্যে (বিশেষতঃ একদল জার্মান মনোবিদ্‌গণের মধ্যে) আর একটি আন্দোলন দেখা দিয়াছে। একদল লেখক (যথা, Dilthey, Spranger ইত্যাদি) বলেন যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান কেবলমাত্র কার্যকারণ-সম্বন্ধ-নীতি দ্বারা ঘটনার ব্যাখ্যা করিয়া থাকে; কিন্তু মনোবিদ্যা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মূল্য বা অর্থ (value বা significance) নিরূপণের চেষ্টা করে এবং এইজন্য যে কৃষ্টির মধ্যে ব্যক্তি-বিশেষ জীবন অতিবাহিত করে, সেই কৃষ্টির সহিত তাহার সম্বন্ধ নির্ধারিত করা প্রয়োজন। ব্যক্তিত্বের পরীক্ষণের জন্য গাণিতিক পরিমাপ সম্ভব নহে; সুতরাং সাধারণ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি

Objective Psychology. pp. 8, 9).

ব্যবহারবাদী না হইয়াও অনেক আধুনিক মনোবিৎ মনোবিদ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলেন। মনোবিদ্যা যখন বিজ্ঞান হিসাবে স্বীকৃতি পাইল, তখন হইতেই ইহাকে অনেক লেখক অন্যান্য বিজ্ঞানের সমপর্যায়ভুক্ত করিবার জন্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বিগত শতাব্দীর শেষভাগে W. James তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছিলেন, "Psychology is to be treated as a natural science." পরবর্তী অনেক লেখক ব্যবহারবাদী বা জড়বাদী না হইয়াও এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

২৯ এই বিষয়ে Villa-র মত লক্ষণীয়; Villa বলেন: "The position of the special sciences is as follows:—On the one hand, the physical, chemical, and biological sciences, and above them all, the science of Dynamics; on the other hand, the moral, historical, philological and social sciences, with Psychology at their head...Psychology among the mental sciences

এখানে প্রযুক্ত হইতে পারে না। এই জন্য ইঁহারা বলেন যে, মনোবিদ্যা একপ্রকার কৃষ্টিমূলক বিজ্ঞান[৩০] (*Kulturwissenschaft*—কুল্‌টুর্‌ভিসেন্‌শাফ্‌ট্‌—অর্থাৎ Science of culture, অথবা *Geisteswissenschaft*—গাইস্‌টেস্‌ ভিসেন্‌শাফ্‌ট অর্থাৎ Science of the Spirit)। জার্মানী পাশ্চাত্য ভাববাদী দর্শন (idealistic philosophy)-এর জন্মস্থান এবং যদিও ভুণ্ড্‌ট্‌ (Wundt) ইত্যাদি মনীষীর প্রচেষ্টায় মনোবিদ্যা একদিন পরীক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তথাপি ভাববাদী দর্শনের প্রভাবে আজিকার দিনের মনোবিদ্যা জার্মানীতে এক নবরূপ ধারণ করিতে চলিয়াছে। এই নব্য মনোভাব আমেরিকার লেখকদের উপর কিছু কিছু প্রভাব বিস্তার করিতেছে।[৩১] জাতি ও সমাজের কৃষ্টি হইতে ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ব্যক্তির বিশ্লেষণ করা মনোবিদ্যার পক্ষে সম্ভব নহে, এই অভিমত অনেক আধুনিক লেখকই প্রকাশ করিয়াছেন।

---

would be analogous to Dynamics among the physical, being a special science like the latter, although of a very general character." (*Contemporary Psychology*, p. 81).

৩০ তুলনীয়: (১) "Whereas these sciences (natural sciences)...legitimately sought to 'explain', Psychology should endeavour only to 'describe' or 'understand', through a sort of intuitive apprehension of 'meaning' or of the relations of parts to a greater whole, often the whole that is provided by the cultural milieu—a view which has become associated with the names *Geisteswissenschaft* or *Kulturwissenschaft*." (J. C. Flugel, *A Hundred Years of Psychology*, p. 381).

(২) "Professor E. Spranger of the University of Berlin is a prominent representative of what is called the 'understanding psychology' in distinction from explanatory or causal psychology. To 'understand is to grasp the meaning of something...To understand an individual, we have not to dissect him nor even to consider him as a whole apart from his environment, but to see him in his social relationships and to see his present in relation to his past." (R. S. Woodworth, *Contemporary Schools of Psychology*, p. 222).

৩১ যথা, স্প্রাঙ্গের (Spranger)-এর লেখা আমেরিকাবাসী আল্‌পোর্ট (Allport) ও ভার্ণন্‌ (Vernon)-কে প্রভাবিত করিয়াছে।

আমরা ২৬ পৃষ্ঠায় Dashiell-এর পুস্তক হইতে যে উদ্ধৃতি দিয়াছি, তাহাতে তিনি ব্যক্তিকে জটিল সামাজিক পরিবেশের সহিত সংশ্লিষ্ট দেখিতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমানের বহু লেখকই (যথা, Murphy, Young, Krech, Crutchfield ইত্যাদি) সমাজ-মনোবিদ্যা (Social Psychology)-র প্রগতির সহিত মানবমনকে সমাজের পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচনা করিয়াছেন।

বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রাকৃতিক' বা 'কৃষ্টিমূলক' এইরূপ কোন বিশেষণ দ্বারা মনোবিদ্যাকে অভিহিত করা দুরূহ। এইজন্য মনোবিদ্যাকে এক বিশেষ প্রকারের বিজ্ঞান বলিতে হইবে—ইহা এমনই এক বিজ্ঞান যাহা সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি অনুসরণ করিতে পারে না, অথচ ঐ পদ্ধতি দ্বারা প্রগতির পথে, অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিদ্যার যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গী কি হইবে তাহা আজও ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত[৩২]—বর্তমানে আমাদের পক্ষে উদার দৃষ্টিভঙ্গী রাখাই বাঞ্ছনীয়।

সংযোজন ঃ

মনোবিদ্যার নিয়মগুলির স্বরূপ কি ?

একদল লেখক (যথা, অল্‌পোর্ট ইত্যাদি) মনে করেন যে, ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করিয়া মনোবিদ্যার আলোচনা এবং যেহেতু ব্যক্তিমাত্রেরই একটা অদ্বিতীয়ত্ব (uniqueness) আছে, সেইহেতু ব্যক্তিকে ভিত্তি করিয়া মনোবিদ্যা কোন সার্বিক নিয়ম দান করিতে পারে না।[৩৩]

এই আপত্তির উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য (যাহাকে ইংরাজীতে বলা হয় individual differences) থাকিলেও ব্যক্তিমাত্রই কতকগুলি সাধারণ ধর্ম (common characteristics)-এর ধারক। ব্যক্তিমাত্রেরই আহার, পান, চিন্তা, বিশ্রাম ইত্যাদির প্রয়োজন আছে; ব্যক্তিমাত্রেরই প্রত্যক্ষ, স্মৃতি, শিক্ষণ ইত্যাদির ক্ষমতা আছে। সুতরাং মনোবিদ্যার সার্বিক নিয়মগুলির আকার এইরূপ হইবে ঃ "যদি ক খ গ অবস্থার মধ্যে 'অ' উপাদানের পরিবর্তন হয়, তাহা হইলে 'আ' উপাদানেরও পরিবর্তন ঘটিবে।" যেমন-অনুষঙ্গের ফলে স্মৃতি জন্মে ; সুতরাং সহ-অবস্থানকারী দুইটি বস্তুর একটি মনে পড়িলে আর একটি মনে

৩২ আমরা এখানে ফ্লুগেল (Flugel)-এর অভিমতের প্রতিধ্বনি করিতেছি। তিনি বলেন : "Only the future can conclusively show whether the experimentalists have rashly embraked upon what must eventually prove to be a hopeless enterprise or whether *Geisteswissenschaft* is a timid and reactionary movement that has unreasonably sought to deprive psychology of all the advantages that follow from the attainment to full scientific status." (*A Hundred Years of Psychology*, p. 383).

৩৩ Allport-এর মতে মনোবিদ্যার অনুসন্ধান-প্রণালী হইবে idiographic (ব্যক্তি-কেন্দ্রিক), nomothetic (সার্বিক নিয়মানুগ) নহে।

পড়িবে। সাধারণ মানুষ ক্ষুধার অধীন; অতএব কেহ যদি ২।৩ দিন উপবাসী থাকে বা স্বল্পাহারে থাকে, তাহা হইলে তাহার ক্ষুধার তাড়না তীব্র হইবে। মানুষ মাত্রেরই পরিশ্রম করিলে বিশ্রামের প্রয়োজন হয়; অতএব যে ক্রমান্বয়ে কয়েকদিন পরিশ্রম করিয়াছে, সে সহজেই গভীরভাবে নিদ্রামগ্ন হইবে। এইভাবে আমরা মনোবিদ্যায় সার্বিক নিয়মের প্রয়োগ করিতে পারি।[৩৪] এই ব্যাপারে মনোবিদ্যা অন্যান্য বিজ্ঞান অপেক্ষা পশ্চাৎপদ নহে।

তাহা ছাড়া, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র ইত্যাদি বিজ্ঞানেরও তথাকথিত সার্বিক নিয়মের সর্বজনীনত্ব লইয়া মতভেদ আছে। সূক্ষ্ম অনুসন্ধানের ফলে ইহাদেরও সার্বিক নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়।[৩৫]

মনোবিদ্যার নিয়মের সার্বিকতা সম্বন্ধে মতভেদের অন্যতম কারণ হইল যে, কেহ কেহ মনোবিদের নিকট আশা করেন যে, তিনি যেন ব্যক্তি-বিশেষের সুদূর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সঠিক নির্দেশ দেন। ইহাদের আমরা এই কথা বলিতে পারি যে, হস্তরেখাবিৎ জ্যোতিষীর নিকট যে মনোভাব লইয়া লোকে যায় সেই মনোভাব লইয়া মনোবিদের নিকট যাওয়া উচিত

৩৪ ব্যক্তিগত পার্থক্য থাকার জন্য কাহার স্মৃতি প্রখর হইবে বা কে কী স্মরণ করিবে, উপবাসের পর কাহার ক্ষুধার তাড়না কত তীব্র হইবে, বা পরিশ্রমের পর কাহার কতক্ষণ বিশ্রামের প্রয়োজন, তাহা সাধারণভাবে আমরা বলিতে পারি না। তবে সকল মানুষের ক্ষেত্রেই যে অনুষঙ্গবদ্ধ বস্তুগুলির একটি অপরটিকে মনে করাইয়া দিতে পারে, বা উপবাসের পরে ক্ষুধার তাড়না দেখা দিবে (যদিও কেহ কেহ উহাকে সংযত করিতে পারেন), বা অতিরিক্ত পরিশ্রমে ক্লান্তি আসিবে—সাধারণভাবে এই কথা আমরা বলিতে পারি।

৩৫ তুলনীয়: Brett's *History of Psychology* (পৃঃ ৭১৯) :"...it is very doubtful whether they (other sciences) have many laws in the sense of statements expressing functional relationships which hold universally, and which have been rigorously tested. And, incidentally. there are very few sciences which have laws in this sense."

পদার্থবিজ্ঞান ইত্যাদি বিজ্ঞানের 'সার্বিক' নিয়ম সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গী আলোচনা করিয়া প্রখ্যাতনামা দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড্ রাসেল্ নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছেন: "Modern Physics does not use induction in the old sense at all. It makes enormous theories without pretending that they are in any exact sense true and uses them only hypothetically until new facts turn up which require new theories." কারণ-সম্বন্ধীয় নীতির তথাকথিত একরূপতার বিষয় তিনি বলেন: "...let us not be too dogmatic. There are those who say that...the apparent regularities of the world are only due to the law of averages..."(*Portraits from Memory*, p. 116).

নহে। তাহা ছাড়া, বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুর ব্যবহার সম্বন্ধে নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করা কোন বিজ্ঞানেরই কার্য নহে।[৩৬]

মনোবিদ্যার নিয়ম সম্বন্ধে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যদি কোন বৈশিষ্ট্য আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করি এবং উহাকে নিছক আকস্মিক বলিয়া অগ্রাহ্য করা না যায়, তাহা হইলেই উহাকে মনোবিদ্যার সাধারণ নিয়মের পর্যায়ভুক্ত করা উচিত।[৩৭]

৫। মনোবিদ্যার পরিসর বা অনুসন্ধানক্ষেত্র (Field or Scope* of Psychology):

মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু মন, এবং মনের ব্যাপকতা যতদূর মনোবিদ্যার আলোচনার পরিধিও ততদূর। আমরা বিশ্বাস করি, মনুষ্য ব্যতীত মনুষ্যেতর প্রাণীরও মন আছে, আবার ব্যক্তি-বিশেষকে অতিক্রম করিয়া সামাজিক-গোষ্ঠীরও এক বিশেষ অর্থে নিজস্ব মানসিক বৈশিষ্ট্য আছে। সুতরাং প্রাণি-মন এবং সমাজ-মন মনোবিদ্যার পরিধির অন্তর্গত। আবার সাধারণ মনের বৈশিষ্ট্য জানিবার জন্য অস্বভাবী মনের পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। তাহা ছাড়া, মনোবিদ্যার উন্নতির সহিত শিক্ষা, শিল্প ইত্যাদি বহুক্ষেত্রে মনোবিদ্যার প্রয়োগ হইতেছে। এইভাবে মনোবিদ্যার পরিধি ক্রমবর্ধমান।

৩৬ তুলনায়: "Obejectors to psychology often muddle prediction with prophecy and ridicule psychologists because they cannot prophesy whether a boy will choose an academic career or whether a politician will break a promise. But...our metereologists are not derided because they cannot predict for a long time ahead the particular type of weather in a particular place... Yet psychologists are often accused of being pseudo-scientists because they cannot make analogous prophecies. A scientific law· asserts a functional relation between variables ; it is not a Revelation of Destiny." (Brett's ***History of Psychology***, p. 220).

৩৭ ওয়ের্নার উল্‌ফ্‌ (Werner Wolff) বলেন: "What we call laws in psychology are derived from a majority of cases based on occurrences which are more frequent than the laws of chance would allow. Thus a psychological result is significant if it occurs in, say, 60 per cent of the cases when chance would allow 35 per cent, but insignificant when chance would allow 50 per cent." (***Essentials of Psychology***. p. 20).

* ইংরাজী 'scope' শব্দটি বিষয়বস্তু বা subject-matter এই অর্থে সাধারণতঃ গ্রহণ করা হয়; আবার 'scope' পদটি বিস্তৃতি বা প্রয়োগ-ক্ষেত্রেও বুঝায়। অধ্যাপক টিচ্‌নার এই শেষোক্ত অর্থে 'scope' পদটি ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার *A text-book of Psychology*, পৃঃ ২৫–৩০ দ্রষ্টব্য। বর্তমান গ্রন্থের ৫-৯ পৃষ্ঠায় মনোবিদ্যার সাধারণ বিষয়বস্তু আলোচিত হইয়াছে।

এইজন্য ক্রমে প্রাণি-মনোবিদ্যা, সমাজ-মনোবিদ্যা, অস্বভাবি-মনোবিদ্যা, শিশু-মনোবিদ্যা, শিক্ষা-মনোবিদ্যা, শিল্পীয়-মনোবিদ্যা ইত্যাদি বিভিন্ন শাখার উদ্ভব হইয়াছে।

মনোবিদ্যার বিভিন্ন শাখার আবার বহু উপশাখা থাকিতে পারে। যেমন, সাধারণ মনোবিদ্যার আলোচ্য প্রতিটি বিষয় সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ আলোচনা চলিতে পারে; যথা, চিন্তন-সম্বন্ধীয় মনোবিদ্যা (Psychology of Thinking), কল্পনা-সম্বন্ধীয় মনোবিদ্যা (Psychology of Imagination) ইত্যাদি। সেইরূপ সমাজ-মনোবিদ্যার বিভিন্ন উপশাখা থাকিতে পারে; যথা, জাতি-মনোবিদ্যা (Psychology of Race), জনতা-মনোবিদ্যা (Psychology of Crowd), সামাজিক প্রথা-সম্বন্ধীয় বা রীতি-সম্বন্ধীয় মনোবিদ্যা (Psychology of Customs, Psychology of law) ইত্যাদি। আবার অস্বভাবি-মনঃপর্যালোচনার যেমন একটি তাত্ত্বিক দিক্ আছে, সেইরূপ প্রায়োগিক দিক্ও আছে; এইজন্য মনোরোগবিদ্যা (Psychiatry), চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় মনোবিদ্যা (Medical Psychology) ইত্যাদি বিভাগ দেখা দিয়াছে। শিল্পোন্নতির সহিত উপযুক্ত কর্মি-নির্বাচন, কর্মীদের মধ্যে শান্তিসংরক্ষণ ইত্যাদি সমস্যার ক্ষেত্রে মনোবিদ্যার প্রভূত প্রয়োগ হইতেছে; সেইরূপ শিক্ষা-সংক্রান্ত সমস্যা দূরীকরণকল্পে নানাভাবে মনোবিদ্যার সাহায্যগ্রহণ করা হইতেছে। এইভাবে শিক্ষা-মনোবিদ্যা ও শিশু-মনোবিদ্যার আবার প্রচুর বিস্তৃতি ঘটিতেছে। বর্তমান শতাব্দীতে দুইটি মহাযুদ্ধের ফলে মনোবিদ্যার বিস্তৃততর প্রয়োগ ঘটিয়াছে—কি করিয়া স্ব-দলে নৈতিক দৃঢ়তা রক্ষা করা যায়, কিভাবে শত্রুমনকে প্রভাবিত করা যায়, কিভাবে প্রচারকার্য চালান যায়, কিভাবে সৈনিক-নির্বাচন করিতে হয়, কিভাবে সেনানায়ক তাঁহার নেতৃত্ব রক্ষা করিতে পারেন, কি ভাবে ক্লান্তি নিবারণ করা যায় ইত্যাদি বহু বিষয়ে যুদ্ধকালে মনোবিদের পরামর্শ গ্রহণ করা হইয়া থাকে। এই সব বিভিন্ন কারণে মনোবিদ্যার প্রয়োগ-ক্ষেত্র অধিকতর ব্যাপক হইয়াছে।

[এই সকল বিভিন্ন শাখার বিষয়বস্তুর বিস্তারিত আলোচনা তৃতীয় অধ্যায়ে করা হইবে]।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পর্যবেক্ষণ-পদ্ধতি

১। উপাত্ত ও পর্যবেক্ষণ-পদ্ধতি (Data and methods of Observation) :

সুসংবদ্ধ, সামঞ্জস্যপূর্ণ, সাধারণ জ্ঞান দান করাই বিজ্ঞানের লক্ষ্য। এইজন্য বিজ্ঞানমাত্রই বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া কতকগুলি উপাত্ত (data) সংগ্রহ করে এবং সেইগুলিকে ধীরচিত্তে সুষ্ঠুভাবে পর্যবেক্ষণ করে ও পরিশেষে উহাদের বিশেষ বিশেষ গুণাবলী এবং সাধারণ-ধর্ম নিরূপণের চেষ্টা করিয়া থাকে।

মনোবিদ্যার 'উপাত্ত' বলিতে আমরা বুঝি মানসিক অবস্থা ও কার্যধারা (subjective mental states and processes) এবং উহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট উদ্দীপক ও প্ররোচক বস্তু বা বিষয় (object)। এই 'বস্তু' বা 'বিষয়' কাহাকে বলে? যাহা কিছু আমাদের মন 'মানসিক পরিবর্তন সূচনাকারী' বলিয়া নির্দেশ করে বা ইঙ্গিত করে, তাহাই মনোবিদ্যার পরিপ্রেক্ষিতে 'বিষয়' নামে অভিহিত।[১] এই 'বিষয়' বাস্তবজগতের বস্তু হইতে পারে আবার নিছক কাল্পনিক বস্তুও হইতে পারে। যখন একটি ছাত্র জাগ্রত অবস্থায় কোন পুস্তক পাঠ করে, তখন ঐ পুস্তকও যেমন একটি 'বিষয়', সেইরূপ স্বপ্নাবস্থায় যখন সে একটি পুস্তক 'অবলোকন' করে, তাহাও মনোবিদ্যার দৃষ্টিতে একটি 'বিষয়'। আবার বর্তমান উদাহরণে উপাত্ত বলিতে বুঝিব 'পুস্তক-দ্বারা-উদ্দীপিত মানসিক-অবস্থা', অর্থাৎ পুস্তক (উদ্দীপক) এবং মানসিক অবস্থা ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বুঝিলে চলিবে না।

---

১ তুলনীয় : G. F. Stout, *A Manual of Psychology*, pp. 34, 35 : "...these data include not only subjective states, but also, as inseparable from these, their objects, ***as such***.

"Whatever any conscious individual means or intends to refer to is an object for that individual at the moment at which he means or intends to refer to it."

পূর্বেই (পৃঃ ২৪) বলা হইয়াছে, মনঃপর্যবেক্ষণের পদ্ধতি দুইটি—অন্তর্দর্শন (subjective method বা introspection) এবং বিষয়গত পদ্ধতি (objective method বা inspection)। প্রথমটি দ্বারা পর্যবেক্ষক স্বীয় মানসিক অবস্থা ও ক্রিয়া পরিদর্শন করিতে পারেন এবং দ্বিতীয়টি দ্বারা অন্যের মনকে জানিবার চেষ্টা করেন। প্রথমটি সাক্ষাৎ-পদ্ধতি (direct method)—ইহা দ্বারা ব্যক্তি-বিশেষ সরাসরি নিজের মনকে জানিতে পারেন; দ্বিতীয়টি গৌণ পদ্ধতি (indirect method)—ইহা অনুমান সাপেক্ষ, কারণ অপরের মনের বাহ্য প্রকাশ দর্শন করিয়া ঐ মন সম্বন্ধে অনুমান করা হয়।

২। অন্তর্দর্শন (Introspection):

(ক) অন্তর্দর্শন কাহাকে বলে?

ব্যক্তি-বিশেষ যখন নিজের মনকে নিজে জানে, তখন তাহাকে অন্তর্দর্শন বলে।[২] মনে কোন অবস্থার উদ্ভব হইলেই তাহাকে অন্তর্দর্শন বলে না; কিন্তু ঐ অবস্থা কি করিয়া আসিল, উহার বৈশিষ্ট্য কি অথবা উহা মনের মধ্যে কোন্ কোন্ পরিবর্তন সূচনা করিল ইত্যাদি বিষয় যখন সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করা যায়, তখন তাহাকে অন্তর্দর্শন করা বলে। যেমন, দর্শকেরা ফুটবল খেলা দেখিতেছেন—ইহার অর্থ নহে যে, দর্শকদের অন্তর্দর্শন ঘটিতেছে: কিন্তু কোন দর্শক চিন্তা করিতে পারেন যে, ঐ ফুটবল খেলা দেখিয়া তাঁহার মনে কি কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিতেছে—অর্থাৎ কি কি ভাবের উদয় হইতেছে, কিরূপ মানসিক উত্তেজনার মধ্যে তিনি আছেন, তিনি যে পক্ষ সমর্থন করেন, সেই দল গোল করিলে তাঁহার কিরূপ আনন্দ হইতেছে, সেই দলের বিপক্ষে গোল হইলে তাঁহার কিরূপ দুঃখ হইতেছে, গোল করিতে অসমর্থ হইলে তাঁহার কিরূপ নৈরাশ্য জাগিতেছে, ইত্যাদি। এই সকল ব্যাপার যখন তিনি পর্যবেক্ষণ করেন, তখন তিনি অন্তর্দর্শন করিতেছেন বলা যায়।

---

২ অন্তর্দর্শনের স্বরূপ বুঝিবার জন্য ইহা কি নহে তাহাও এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিতে হইবে:
(১) ইহা নিজের ব্যক্তিগত অতীত জীবনের সুখদুঃখ লইয়া চিন্তা (reminiscences) নহে;
(২) ইহা নিজের কৃত কোন কার্য সম্বন্ধে ব্যাখ্যা নহে;
(৩) ইহা 'আত্মা' নামক কোন অতীন্দ্রিয় সত্তা সম্বন্ধীয় জ্ঞান নহে।

সুতরাং **অন্তর্দর্শন** আত্ম-চেতনার একটা বিশেষ অবস্থা—ইহা স্বীয় মনের প্রতি মনোনিবেশ করা, অর্থাৎ **নিজের মন দ্বারা নিজের মনকে জানা।**

এই আত্ম-চেতনার বিভিন্ন ক্রম বা স্তর আছে। আমরা কোন কিছু সম্বন্ধে সচেতন, কেবলমাত্র এই বিষয় সম্বন্ধে অবহিত হইতে পারি—ইহাই হইল সর্বনিম্ন স্তর। আমরা নিজেদের মানসিক অবস্থা লইয়া যখন চিন্তা করি, তাহা হইল দ্বিতীয় স্তর—ইহা অপেক্ষাকৃত উচ্চপর্যায়ের। আর তৃতীয় বা সর্বোচ্চ স্তর হইল যখন আমরা ব্যক্তিগত মানস অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য ঐ অবস্থা-সম্বন্ধীয় প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দানের চেষ্টা করি। যেমন, মনোবিদ্যার পরীক্ষণাগারে পরীক্ষণ-পাত্রকে (subject of experiment) পরীক্ষক (experimenter) দুইটি বস্তু দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, "আপনি কি দুইটি বস্তুর প্রতি সমান মনোযোগ দিতেছেন?" অথবা পরীক্ষণ-পাত্রকে তিনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, "আপনি যখনই চিন্তা করেন, তখনই কি প্রতিরূপ (image)-এর মাধ্যমে চিন্তা করেন?"—এই প্রকার প্রশ্নের উত্তরদানের জন্য পরীক্ষণ-পাত্র স্বীয় মন অনুধাবন করিয়া যখন সুচিন্তিত উত্তরদানের চেষ্টা করেন, তখন আত্ম-চেতনা সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে।[৩] স্বীয় মনের অবস্থা সম্বন্ধে এইরূপ প্রশ্নের উত্তরদানের জন্য যেরূপ সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ আবশ্যক, সেইরূপ পর্যবেক্ষণের শক্তি ধীরে ধীরে শিক্ষণ ও অভ্যাসের মাধ্যমে আয়ত্ত করিতে হয়।

(খ) অন্তর্দর্শন সম্বন্ধে বিরুদ্ধ যুক্তি ও উহাদের সমালোচনা :

উপরের এই আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে, অন্তর্দর্শন একটি আয়াস-সাধ্য কার্য; কিন্তু একদল মনোবিৎ অন্তর্দর্শনের সম্ভাব্যতা স্বীকার করেন না। অন্তর্দর্শনের বিরুদ্ধে তাঁহারা নিম্নলিখিত যুক্তির অবতারণা করেন :

(১) আমাদের মনের সাধারণ ধর্ম হইলে যে, ইহা বহির্মুখী। বাহিরের সামান্য গোলযোগেও আমাদের মন চঞ্চল বা বিক্ষিপ্ত হয়। সেইজন্য আত্মস্থ হইয়া স্বীয় মন পর্যবেক্ষণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

ইহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, মনের বহির্মুখিতা আমরা অস্বীকার করি না এবং সেইজন্য অন্তর্দর্শন যে কঠিন কার্য সে কথাও স্বীকার করি।

৩ G. F. Stout, *A Manual of Psychology*, pp. 38, 39 দ্রষ্টব্য।

কিন্তু এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য অভ্যাস ও শিক্ষণ প্রয়োজন; ইহার ফলে মনের বিক্ষিপ্তভাব ক্রমশঃ দূরীভূত হয়। তাহা ছাড়া, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবেষণাগারে যখন অন্তর্দর্শন করা হয়, তখন বাহ্য-পরিবেশ এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয় যে, মানসিক বিক্ষিপ্ততার সুযোগ খুবই কমিয়া যায় এবং পরীক্ষণ-পাত্রদিগকে উপযুক্ত শিক্ষাদান করিয়া ঐ কার্যের যোগ্য করিয়া তোলা হয়। সুতরাং অন্তর্দর্শন আয়াসসাধ্য কার্য হইলেও উহা অসম্ভব নহে।

(২) অন্তর্দর্শনের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, কোন মানসিক ক্রিয়া বা অবস্থাকে অন্তর্দর্শন করিলে উহা অন্তর্হিত হইয়া যায়; যেমন, ক্রোধের সময় আমরা যদি অন্তর্দর্শন করিবার চেষ্টা করি, অর্থাৎ তখন যদি ভাবিতে বসি ক্রুদ্ধাবস্থায় আমাদের কিরূপ মানসিক পরিবর্তন ঘটিতেছে, তাহা হইলে ক্রোধের মাত্রা ক্রমশঃই কমিয়া যায়।

এই যুক্তির বিরুদ্ধে আমরা প্রথমতঃ বলিব যে, এই কথা সকল মানসিক অবস্থায় (যথা, সংবেদনের ক্ষেত্রে) খাটে না। আবার সকল অনুভূতিও অন্তর্দর্শনের ফলে চলিয়া যায় না (যেমন, দাঁতের যন্ত্রণা, মাথার যন্ত্রণা ইত্যাদির উপর মনোনিবেশ করিলে উহারা কমিয়া যায় না)। দ্বিতীয়তঃ, প্রক্ষোভ বা আবেগ প্রশমিত হইলে তৎকালীন মানসিক অবস্থা চিন্তা করা যায়। তৃতীয়তঃ, পরীক্ষণাগারে একটি আবেগকে বার বার জাগরিত করিয়া এক একটি স্তর এক একবার পর্যবেক্ষণ করা যাইতে পারে।[৪]

(৩) অন্তর্দর্শনের বিরুদ্ধে ইহাও বলা হয় যে, মনের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা সর্বদাই বিষয়ী (subject) বা জ্ঞাতা (knower) এবং সেইজন্য ইহা কখনই বিষয় (object) বা জ্ঞেয় (known) হইতে পারে না। ফরাসী দার্শনিক কোঁৎ (Comte) চক্ষুর উপমা দিয়া বুঝাইয়াছেন যে, প্রতি ব্যক্তিই

৪ অধ্যাপক টিচেনার এই অসুবিধার প্রতিকারকল্পে বলিয়াছেন: "...the observations in question may be repeated. There is, then, no reason why...in whom the emotion is set up should not report at once upon the first stage of his experience...It is true that this report interrupts the observation. But, after the first stage has been accurately described, further observations may be taken, and the second, third and following stages similarly described; so that presently a complete report upon the whole experience is obtained." (*A Text-book of Psychology*, pp. 22, 23).

নিজের চক্ষুর দ্বারা যেমন অন্য বস্তু দর্শন করে, কিন্তু নিজের চক্ষু দেখে না, সেইরূপ প্রতি ব্যক্তিই নিজের মন দ্বারা অন্য বস্তু জানিতে পারে, কিন্তু নিজের মনকে জানিতে পারে না।[৫]

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে জানি যে, মন কেবলমাত্র জ্ঞানের বিষয় নহে, উহা বিষয়ীও হইতে পারে। আমাদের আত্ম-চেতনা বিশ্লেষণ করিলে ইহা দেখিতে পাই। যেমন, যখন আমি কোন দ্রব্য প্রত্যক্ষ করি, তখন আমি ঐ দ্রব্যকে জানি আবার ইহাও জানি যে, **আমিই** জানি। এইভাবে আমার "আমি" বিষয়ী ও বিষয় উভয়ই।

(৪) কেহ কেহ ইহাও বলিয়া থাকেন যে, যদিও অন্তর্দর্শন অসম্ভব, তাহা হইলেও স্বীয় মনঃ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান একেবারে অসম্ভব নহে। এই জ্ঞান পাওয়া যায়, 'অতীত-দৃষ্টি' (retrospection) দ্বারা ; অর্থাৎ যখন আমরা ক্রুদ্ধ হই, তখন অন্তর্দর্শন সম্ভব নহে, তবে ক্রোধ প্রশমিত হইলে অতীতের সেই ক্রুদ্ধ অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া তখন যে সব 'মানসিক ঘটনা' ঘটিয়াছিল আমরা সে সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারি।

এই যুক্তি সম্বন্ধে আমরা বলিতে চাই যে, 'অতীত-দৃষ্টি' অসম্ভব বা অবাস্তব ইহা আমরা মোটেই বলি না। আমাদের বক্তব্য হইল যে, 'অন্তর্দর্শন অসম্ভব এবং অতীত-দৃষ্টি ইহার বিকল্প' (retrospection is a substitute for introspection), এইরূপ কথা বলা যুক্তিযুক্ত নহে। বরং 'অতীত-দৃষ্টি' সম্ভব হইতে পারে যদি পূর্বে অন্তর্দর্শন হইয়া থাকে। 'অতীত-দৃষ্টি' হইল স্মৃতি-মন্থন এবং কোন বিষয় সম্বন্ধে স্মৃতি তখনই সম্ভব হইতে পারে যখন ঐ বিষয় সম্বন্ধে পূর্বে কোন অভিজ্ঞতা হইয়া থাকে। মনের ক্ষেত্রেও ঐ একই

---

৫ কোঁতের ভাষায় :

"......this pretended direct contemplation of the mind by itself is a pure illusion. ......It is in fact evident that, by an invincible necessity, the human mind can observe directly all phenomena except its own proper states. ......The thinker cannot divide himself into two, of whom one reasons and the other observes him reason. The organ observed and the organ observing being, in this case, identical, how could observation take place ? This pretended psychological method is then radically null and void." (*Cours de Philosophie Positive*, I).

কথা প্রযোজ্য। স্বীয় মনের অতীত অবস্থা সম্বন্ধে যে স্মৃতি হইতেছে, তাহা হইতেই বুঝা যায় যে, ঐ অবস্থা যখন ঘটিয়াছিল তখন ব্যক্তি-বিশেষ উহা পর্যবেক্ষণ করিয়াছিল। অতীতে ঐ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ না ঘটিলে বর্তমানে উহার স্মৃতি হইত না এবং বর্তমানে স্মৃতি হইতেছে বলিয়া বুঝা যায় যে, অতীতে উহা প্রত্যক্ষগোচর হইয়াছিল। মানস-অবস্থা সম্বন্ধে 'অতীত-দৃষ্টি'ই হইল মানস-অবস্থার অন্তর্দর্শনের প্রমাণ।

৩। বাহ্যদর্শন বা বিষয়গত পদ্ধতি (Inspection, Extrospection, Objective method) :

(ক) বাহ্যদর্শন বা বিষয়গত পদ্ধতি কাহাকে বলে ?

নিজের মনকে জানিলেই মন সম্বন্ধে পর্যাপ্ত জ্ঞান পাওয়া যায় না। অপরের মনকে জানা একান্ত প্রয়োজন। অপরের মনকে সাক্ষাৎভাবে জানা সম্ভব নয়—**অপরের মনের প্রকাশের মাধ্যমে অপরের মনকে জানিতে হয়।** অতএব এই জ্ঞান অনুমানের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠে।

আমরা পরস্পরের নিকট ভাষার মাধ্যমে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করি; সুতরাং অপরের ভাষা শ্রবণ করিয়া এবং তাহার তাৎপর্য বুঝিয়া আমরা অপরের মনকে কিছু পরিমাণে বুঝিতে পারি। কেবল ভাষা নহে, আকার-ইঙ্গিতের দ্বারাও আমরা নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করি—যেমন, যন্ত্রণা হইলে আমরা মুখ বিকৃত করি, আবার আনন্দ হইলে আমাদের মুখমণ্ডল একপ্রকার হাস্যমধুর সজীবতা প্রকাশ করে; কাহাকেও নীরব হইতে বলিলে নিজেদের মুখের উপর তর্জনী আঙ্গুলটি রাখি; সম্মতি বা অসম্মতি প্রকাশ করিবার জন্য নানাভাবে মাথা নাড়ি; নানারূপ রস-সৃষ্টি করিবার জন্য কলাবিজ্ঞান-সম্মত বিবিধ মুদ্রা প্রকাশ করিতে পারি—সুতরাং এই সমস্ত ভাবব্যঞ্জনাত্মক আকার-ইঙ্গিত দেখিয়া আমরা অন্যের মন জানিতে পারি। ইহা ছাড়া, সাহিত্য, কাব্য, চিত্র, ভাস্কর্য-নিদর্শন, স্থাপত্য-নিদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন মনের বিভিন্ন প্রকাশের পরিচয় পাই।

আবার বিভিন্ন স্তরের সমাজ-মন, শিশু-মন, প্রাণি-মন, অস্বভাবি-মন, ইত্যাদি পর্যালোচনার জন্য বিষয়গত পদ্ধতিই একমাত্র পদ্ধতি।

সমাজ-মনকে জানিতে হইলে সামাজিক আচার-ব্যবহার, সংস্কার, জাতীয় কাহিনী, উপকথা, গাথা ইত্যাদি আলোচনা করিতে হয়। শিশুর মন এবং

মনুষ্যেতর প্রাণীর মন জানিতে হইলে তাহাদের প্রকাশমান ব্যবহার লক্ষ্য করা এবং শিশু-মন ও প্রাণি-মনের সহিত পরিণতবয়স্কদের মন(adult mind)-এর তুলনা করা প্রয়োজন। সেইরূপ, অস্বভাবি-মন (abnormal mind)-এর প্রকাশের মাধ্যমেই অস্বভাবি-মনকে জানিতে হইবে।

(খ) বিষয়গত পদ্ধতির অসুবিধা :

বিষয়গত পদ্ধতির প্রধান অসুবিধা হইল দুই প্রকার :

(১) পর্যবেক্ষক অপরের মনের প্রকাশগুলি ব্যাখ্যা করিবার সময় ভুল করিতে পারেন। তিনি নিজের আদর্শ, ধারণা, ভাবাবেগ ইত্যাদি অনুসারে অপরের মনকে ব্যাখ্যা করিতে পারেন, অর্থাৎ নিজের মত করিয়া অপরকে ভাবিতে পারেন এবং এখানেই ভুলের সম্ভাবনা দেখা দেয়। যেমন, যিনি নিজে সাধু ও সরল, তিনি অপরের সকল ব্যবহারকেই সাধুভাবের প্রকাশ বলিয়া মনে করেন, আবার অসাধু ব্যক্তি অপরের ব্যবহারকে সর্বদা সন্দেহ করিয়া থাকে।[৬]

(২) আবার এরূপও হইতে পারে যে, যাহার মনকে জানিতে হইবে সে নিজের প্রকৃত মনোভাবকে এরূপ সুকৌশলে গোপন করিতে পারে যে, উহা বুঝা যায় না। যেমন, যে ব্যক্তি পরের সর্বনাশ করিতে যাইতেছে সে এমনভাবে নিজের মনোভাব গোপন করিতে পারে যে, তাহার মনোভাব বুঝা দুঃসাধ্য।

এই দুই অসুবিধা দূর করিবার একমাত্র উপায় হইল সুনিপুণ পর্যবেক্ষণ। বারবার বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে পর্যবেক্ষণ করাই এই সব ভুল দূরীকরণের একমাত্র উপায়। তাহা ছাড়া, পরীক্ষণাগারে কৃত্রিম পরিবেশের মধ্যে একই

৬ এই জন্য চলতি ভাষায় অনেক সময় বলা হয় : 'আপনি সাধু, ত' জগৎ সাধু।' সেইরূপ সংস্কৃতে বলা হয় : 'আত্মবৎ মন্যতে জগৎ।'

এই প্রসঙ্গে একটি গল্পের উল্লেখ করা যাইতে পারে। একবার এক কৃপণ পথ চলিতে চলিতে দীর্ঘশ্মশ্রুবিশিষ্ট একটি লোককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার এত বড় দাড়ি কেন? আপনি কি শাল হারাইয়াছেন?" ভদ্রলোক এই প্রশ্নের মর্ম বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাড়ির সহিত শাল হারানোর কী সম্পর্ক?" কৃপণ তখন ব্যাখ্যা করিয়া বলিল, "আমি একবার গামছা হারাইয়াছিলাম; সাতদিন দাড়ি না কামাইয়া গামছার দাম তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আপনার যখন এত বড় দাড়ি, তখন নিশ্চয় শাল বা অন্য কোন দামী জিনিস হারাইয়াছেন এবং তাহার দাম উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন।" যে কৃপণ সে সকলকেই কৃপণ ভাবে!

উদ্দীপক যখন বিভিন্ন ব্যক্তিকে প্রয়োগ করিয়া তাহাদের মানসিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা হয়, তখন এইরূপ ভুলের সম্ভাবনা কমিয়া যায়।

৪। অন্তর্দর্শন ও বিষয়গত-পদ্ধতির পারস্পরিক সহযোগিতা (Mutual Relations of Subjective and Objective Method) ঃ

অন্তর্দর্শন ও বিষয়গত-পদ্ধতি এই দুইটির পারস্পরিক সহযোগিতা ব্যতীত মনোবিদ্যার উপযুক্ত উপাত্ত সংগ্রহ করা যায় না।

কেবলমাত্র অন্তর্দর্শনের উপর নির্ভর করিলে মনোবিদ্যা বিজ্ঞানের পর্যায়ে উঠিত না। বিজ্ঞান সর্বজনীন সত্য বা সার্বিক নিয়মের অনুসন্ধান করে; সেইজন্য ব্যক্তি-বিশেষের মনের উপর নির্ভর করিয়া বিজ্ঞান গঠন করা যায় না। যে সব মনোবিৎ (যথা, ভুণ্ড্ট, টিচেনার ইত্যাদি) অন্তর্দর্শনের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারা কোন একজন ব্যক্তির অন্তর্দর্শন-প্রাপ্ত উপাত্তের উপর নির্ভর করিতেন না—বিভিন্ন ব্যক্তির অন্তর্দর্শন-প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা তুলনা করিয়া তাঁহারা মানসরাজ্যের সার্বিক নিয়ম আবিষ্কারের প্রচেষ্টা করিতেন।

আবার কেবলমাত্র বিষয়গত-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াই মনোবিৎ অগ্রসর হইতে পারেন না। অপরের মনকে বুঝিতে হইলে নিজের মনকে জানা প্রয়োজন। যে নিজে কখনও দুঃখভারে ক্রন্দন করে নাই, সে অপরের ক্রন্দনের পশ্চাতে যে কী ব্যথা আছে তাহা বুঝিবে কি করিয়া? যাহার অন্তর কখনও ভক্তি-রসে আপ্লুত হয় নাই, সে ভক্তের আত্ম-নিবেদনের মর্ম কি করিয়া জানিবে?[৭]

চেষ্টিতবাদী মনোবিদ্‌গণ (Behaviorists) মনকে অস্বীকার করেন বলিয়া অন্তর্দর্শনে তাঁহারা একেবারেই আস্থাবান্ নহেন। মনকে অস্বীকার

---

৭ কবির ভাষায়:

"চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?"

সেইরূপ ডঃ মার্টিন্যু (Dr. Martineau) মন্তব্য করিয়াছেন: "Without suscepti' bility to love, how stupidly should we stare at the kiss of the mother to the child! Without openness to sorrow, at the prostrate and sobbing mourner! Without sense of religion, at the clasped hands of prayer!" (*Types of Ethical Theory*, Vol. II, 30).

সুতরাং এই হিসাবে মনোবিদ্যার ক্ষেত্রেও 'আত্মানং বিদ্ধি' এই বাণী প্রযোজ্য। (অবশ্য এইস্থলে 'আত্মা' পদটি অতীন্দ্রিয় সত্তা হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে না)।

করিয়া মনোবিদ্যা গঠনের তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা যে গ্রহণযোগ্য নহে তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি।[৮]

সুতরাং পরিশেষে আমরা বলিব যে, **অন্তর্দর্শন ও বাহ্যদর্শন এই দুইটি পদ্ধতির একটিকে বাদ দিয়া মনোবিদ্যা গঠনের প্রচেষ্টা সমীচীন নহে।**

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। আমরা উপরে বলিলাম যে, স্বীয় মন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিলে তাহারই উপমায় পরের মন জানিতে পারি। ইহার অর্থ এইরূপ নহে যে, সর্বদাই আমরা প্রথমে নিজ মন সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া থাকি। অনেক সময় অন্য লোকের প্রশ্নে বা সমালোচনায় আমরা আত্ম-সচেতন হইয়া উঠি এবং তখন নিজের মন সম্বন্ধে চিন্তা করিতে সুরু করি। অনেকক্ষেত্রে এইরূপ হয় যে, অন্য লোকে যদি প্রশ্ন করে 'তুমি আজ এত উল্লসিত কেন?' বা 'তুমি আজ এত বিমর্ষ কেন?', তখন আমরা ভাবিয়া দেখি সত্যই ঐরূপ কোন অনুভূতি আমাদের অন্তরে জাগিতেছে কি না। শৈশবে এইরূপ প্রশ্নের ফলেই শিশু ক্রমশঃ নিজের সম্বন্ধে ভাবিতে শেখে।

৫। পরীক্ষণ-পদ্ধতি (Experimental Method) ঃ

বিজ্ঞান যথার্থ ও বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানদানের চেষ্টা করে এবং পরীক্ষণের মাধ্যমে যে জ্ঞানলাভ করা যায় তাহার সত্যতা বা যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমরা বহুল পরিমাণে সুনিশ্চিত হইতে পারি। এইজন্য বর্তমানকালে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মাত্রই পরীক্ষণমূলক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।[৯] মনোবিদ্যার ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম নাই।

(ক) পরীক্ষণের সুবিধা ঃ

পরীক্ষণ বলিতে আমরা বুঝি **সুনিয়ন্ত্রিতভাবে সৃষ্ট কৃত্রিম অবস্থার মধ্যে সুনিপুণ পর্যবেক্ষণ।** পরীক্ষণের সুবিধা হইল যে, সমস্ত অবস্থা পরীক্ষকের আয়ত্তাধীন থাকার জন্য পরীক্ষক প্রয়োজনমত অবস্থার মধ্যে পরিবর্তন আনিতে পারেন এবং এই পরিবর্তন ঠিক কি প্রকারের বা কি পরিমাণের হইতেছে সে সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত থাকেন। আবার

---

৮ পৃঃ ১৫-১৮ দ্রষ্টব্য।

৯ F. W. Westaway-রচিত *Scientific Method* দ্রষ্টব্য।

পরীক্ষণ প্রয়োজনমত ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং উহা আমাদের সময়, সুযোগ এবং উদ্দেশ্য অনুযায়ী করা যাইতে পারে।

(খ) পরীক্ষণ-প্রক্রিয়া ঃ

পরীক্ষণ-পদ্ধতির একটি সাধারণ নিয়ম হইল পূর্ববর্তী অবস্থাগুলির মধ্যে মাত্র *একটির* পরিবর্তন ঘটাইয়া দেখা হয় অনুবর্তী অবস্থার মধ্যে কী পরিবর্তন সূচিত হইতেছে।[১০] পরীক্ষণ-পাত্রকে পরীক্ষার জন্য যে কৃত্রিম পরিবেশের সৃষ্টি করা হয় তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ঘটনা পরিবর্তনশীল আর কতকগুলি অপরিবর্তনশীল। যে সব ঘটনা পরিবর্তনশীল তাহাদের বলা হয় ভেদ্য (variable)—এই ভেদ্য নিরপেক্ষ (independent) অথবা সাপেক্ষ (dependent) হইতে পারে। **নিরপেক্ষ ভেদ্যর পরিবর্তন ঘটিলে সাপেক্ষ ভেদ্যর পরিবর্তন ঘটিবে।**

মনে করা যাউক 'ক' একজন পরীক্ষণ-পাত্র। 'ক'-কে এমন এক পরিবেশের মধ্যে রাখা হইল যে, তাহার উপর বিভিন্ন উদ্দীপক ক্রিয়া করিতেছে; এই সব উদ্দীপকের মধ্যে *একটি* হইল পরীক্ষণ-পাত্রের উপর যেটির প্রভাব পরীক্ষক লক্ষ্য করিতে চাহেন সেইটি। এই বিশেষ উদ্দীপকটি হইল নিরপেক্ষ ভেদ্য—ইহারই পরিবর্তন সাধন করিয়া পরীক্ষণ-পাত্রের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা হয়। উদ্দীপকের পরিবর্তনের সহিত প্রতিক্রিয়ারও পরিবর্তন ঘটিতে থাকিবে। অন্যান্য পূর্ববর্তী ঘটনাগুলি যদি অপরিবর্তিত থাকে, তাহা হইলে পূর্ববর্তী পরিবর্তনশীল ঘটনার সহিত অনুবর্তী পরিবর্তনশীল ঘটনার সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে।

পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত চিত্রে দেখা যাইতেছে যে, পরীক্ষণ-পাত্রের উপর যে সমস্ত উদ্দীপক কার্য করিতেছে, তাহাদের ভিতর $উ_১$, $উ_২$, $উ_৪$, এবং $উ_৫$ অভেদ্য ও অপরিবর্তনীয় (constant)। পরীক্ষক $উ_৩$ প্রয়োগ করিলেন এবং

১০ তুলনীয়: "The fundamental requirement of the experimental method is that all the factors which produce a given result be held constant, except the one whose effects you are examining. Otherwise it is impossible to tell what influence this one factor has on the situation." (F. L. Ruch, *Psychology and Life*, p. 30).

তাহার ফলে 'প্র২' প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। যেহেতু প্র২ হইল উ৩-এর উপর নির্ভরশীল, সেইহেতু প্র২ হইল সাপেক্ষ ভেদ্য।
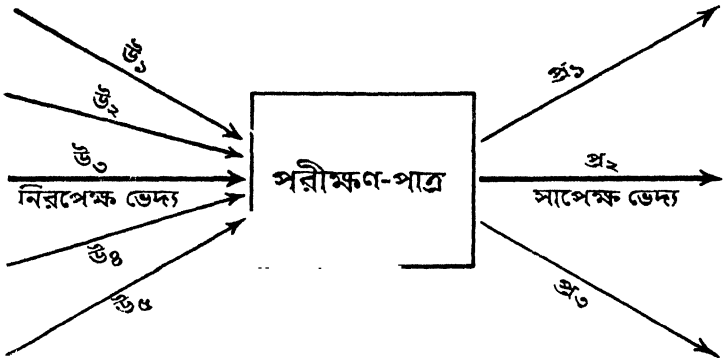
পরীক্ষণ-পদ্ধতি অন্তর্দর্শন ও বাহ্যদর্শন উভয়ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। উপরের উদাহরণে পরীক্ষক যদি কেবলমাত্র বাহ্য প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেন, তাহা হইলে পরীক্ষক বিষয়গত-পদ্ধতি অনুধাবন করিতেছেন বলা যায়; আর তিনি যদি পরীক্ষণ-পাত্রকে প্রশ্ন করেন যে, ঐ প্রতিক্রিয়ার সময় তাঁহার মনে কি কি পরিবর্তন হইতেছে এবং পরীক্ষণ-পাত্র যদি তাহা জানিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উহা হইবে পরীক্ষণের ভিত্তিতে অন্তর্দর্শন।

(গ) পরীক্ষণের অসুবিধা :

আমরা উপরে পরীক্ষণের সুবিধার কথা উল্লেখ করিয়াছি। আজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কিন্তু সর্বত্র পরীক্ষণের ব্যবহার হইলেও মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনাও হইয়াছে।

(১) পরীক্ষণ-পদ্ধতির বিরুদ্ধে একটি প্রধান আপত্তি হইল যে, ইহার দ্বারা নিতান্ত কৃত্রিম অবস্থার মধ্যে পরীক্ষা চালান হইয়া থাকে। এই কৃত্রিম বা অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে পরীক্ষণ-পাত্র নিজের 'স্বাভাবিক' ব্যবহার দেখাইতে পারে না।

ইহার উত্তরে বলা যায় যে, একেবারে স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে কোন পরীক্ষণই চালান সম্ভব নয়। তবে অভিজ্ঞ পরীক্ষক পরীক্ষণাগারের অবস্থার

সহিত বাস্তবজগতের তথাকথিত স্বাভাবিক অবস্থার যথাসম্ভব সমতা-বিধানের চেষ্টা করেন।[১১]

(২) পরীক্ষণ-পদ্ধতির আদর্শ হইল মাত্র একটি পূর্ববর্তী অবস্থার মধ্যে পরিবর্তন আনিয়া উহার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা। সজীব প্রাণীর ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ জটিল মনুষ্য-মনের ক্ষেত্রে, এইরূপ আদর্শ অবস্থার সৃষ্টি করা এক প্রকার অসম্ভব।[১২]

যে কোন জীবের ব্যবহার পর্যবেক্ষণ কালেই এই অসুবিধা দেখা দিবে। এই অসুবিধা কিয়ৎ-পরিমাণে দূর করা যায় যদি বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে একই উদ্দীপক (যাহাকে 'নিরপেক্ষ ভেদ্য' বলা হইয়া থাকে) প্রয়োগ করা যায়।

(৩) মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে আর একটি অসুবিধা হইল যে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য থাকার জন্য একজন বিশেষ ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিয়া কোন বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় না। পদার্থবিদ্যা বা অনুরূপ বিজ্ঞানে একটি পরীক্ষণ যথাযথ করিলে তাহার ভিত্তিতে একটি সার্বিক বচন করিলেও করা যাইতে পারে। মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে কিন্তু এইরূপ করিবার সুবিধা নাই।

এইজন্য প্রয়োজন বিভিন্ন ব্যক্তির উপর একই প্রকারের উদ্দীপক প্রয়োগ করিয়া তাহার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা।

(৪) মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে পরীক্ষণের বিষয়বস্তু এত বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে এবং পরীক্ষণ-পাত্রও এত বিভিন্ন প্রকারের ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন হইতে পারে

১১ এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, পদার্থবিদ্যার (Physics) ন্যায় বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞানও সকল ক্ষেত্রে "স্বাভাবিক" অবস্থার মধ্যে সকল পরীক্ষণ করিতে পারে না। উদাহরণ-স্বরূপ উডওয়ার্থ বলিয়াছেন যে, জড়পদার্থের পতন-সংক্রান্ত নিয়ম (law of falling bodies) নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন পরিমাণের জড়পদার্থ লইয়া সম্পূর্ণ শূন্যস্থানে (vacuum) পরীক্ষণ চালান হইয়া থাকে; কিন্তু প্রকৃতিতে কি 'সম্পূর্ণ শূন্যস্থান' বলিয়া কিছু থাকে? (Woodworth, 'Successes and failures of experimental psychology'-শীর্ষক প্রবন্ধ, *Science* 1941)। বাস্তবিক পরীক্ষণমাত্রই অল্পবিস্তর 'কৃত্রিম' হইবে—পরীক্ষণের সংজ্ঞাই হইল কৃত্রিম অবস্থার মধ্যে পর্যবেক্ষণ।

১২ Ruch বলেন: "The ideal of experimental method can never be completely attained in the social sciences. Psychology can never expect the precision of physics or chemistry, which do not study living organisms." (*Psychology and Life*, p. 30).

যে, সকল ক্ষেত্রে পরীক্ষণ পদ্ধতি যথাযথ প্রয়োগ করা যায় না। পরীক্ষণ-পদ্ধতির দ্বারা প্রক্ষোভ ও অনুভূতির বিষয়গত পর্যবেক্ষণ করার একটি প্রধান অসুবিধা হইল প্রয়োজনমত কৃত্রিম উপায়ে আবেগাদি সৃষ্টি করা যায় না। যেমন, অনুরোধ করা মাত্র রাগা বা হাসা সম্ভব নয়। সেইরূপ শিক্ষণ (learning), বর্ধন (growth) ইত্যাদি ক্ষেত্রেও পরীক্ষণ-পদ্ধতি প্রয়োগের নানা অসুবিধা আছে। আবার অনেকক্ষেত্রে সামাজিক পরিবেশ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে মানুষকে পরীক্ষা করিলে তাহার প্রকৃত ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না।

এই সব তথাকথিত অসুবিধা মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে থাকিয়া যাইবেই ; কারণ মনোবিদ্যার পরীক্ষণ-পাত্র হইল স্বেচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মনোবিশিষ্ট ক্রিয়াশীল মানুষ—পদার্থবিদ্যার ন্যায় ইহা অচেতন পদার্থ লইয়া আলোচনা করে না। এই জন্য মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সতর্কভাবে পরীক্ষণ-পদ্ধতি চালাইতে হইবে।[১৩]

৬। অন্যান্য কয়েকটি পদ্ধতি (Other Methods):

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, সজীব সক্রিয় মনকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আলোচনা করা যাইতে পারে। এই কারণে আলোচ্য বিষয়বস্তু এবং আলোচনার উদ্দেশ্যের পার্থক্য অনুসারে মনোবিদ্যায় বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করা যায়। আমরা বর্তমান অনুচ্ছেদে এইরূপ আরও কয়েকটি পদ্ধতির আলোচনা করিব।

(ক) উৎপত্তি-সম্বন্ধীয় পদ্ধতি বা জনি-পদ্ধতি (Genetic Method):

অন্যান্য সকল প্রাণীর ন্যায় মানুষও ক্রমবিকাশশীল। তাহার দেহ ও মন ধীরে ধীরে পরিবর্তনের মাধ্যমে পরিপক্কতার পথে অগ্রসর হয়। এক একটি বিশেষ বিশেষ স্তর বা পর্যায়ে তাহার মানসিক বৈশিষ্ট্য এক এক প্রকারের থাকে। সুতরাং মানুষকে জানিতে হইলে তাহার ক্রমবিবর্তনের ধারা জানা একান্ত প্রয়োজন। সেইসঙ্গে ইহাও জানিতে

১৩। মনোবিদ্যায় পরীক্ষণ-পদ্ধতির প্রয়োগের সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে T. G. Andrews-সম্পাদিত *Methods of Psychology*, ১ম অধ্যায়, দ্রষ্টব্য।

হইবে যে, মনুষ্যমনের এই বিবর্তনের মূলে বংশপ্রভাব (heredity) ও বাহ্য-পরিবেশ (environment)-এর প্রভাব কি প্রকার ও কতদূর। মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে উৎপত্তি-সম্বন্ধীয় পদ্ধতি প্রয়োগ দ্বারা মনোবিৎ মানসিক ধারা (অর্থাৎ এক একটি বিশেষ পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য ও কারণ এবং উহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পর্যায়ের সহিত সম্বন্ধ) বিষয়ে উপাত্ত সংগ্রহের চেষ্টা করেন।[১৪]

এই পদ্ধতির যদি পূর্ণ প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা হইলে ব্যক্তি-বিশেষকে আশৈশব পর্যবেক্ষণ করা উচিত। এরূপ সুযোগ সব সময় লাভ করা যায় না। তাহা ছাড়া, মানব-শিশুর ক্ষেত্রে কোন অনিষ্টকর পরিবেশ বা তদনুরূপ অন্য কোন অনিষ্টকর বিষয়ের প্রভাব লইয়া পরীক্ষণ বিপজ্জনক।[১৫]

এই পদ্ধতির সাহায্যে যে সব বিষয় সম্বন্ধে উপাত্ত সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়, তাহাদের কয়েকটির এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

(১) কোন জাতির জাতীয় মনের পরিবর্ধন ও বিবর্তন কি করিয়া ঘটিয়াছে ;

(২) ব্যক্তি-বিশেষের দেহ-মনের পরিবর্ধন শৈশব হইতে কৈশোর এবং কৈশোর হইতে যৌবন পর্যন্ত কি ভাবে ঘটে ;

(৩) কোন শিশুর মনে বিভিন্ন প্রত্যয় (general concepts or ideas) কিভাবে জন্মে ;

[পরীক্ষণমূলকভাবে কোন একটি বিশেষ প্রত্যয় লইয়া পর্যবেক্ষণ করা যাইতে পারে—যেমন, শিশুর মনে অহং-জ্ঞান (notion of self), বাহ্য-জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান (notion of the external world), স্থান ও কাল সম্বন্ধে ধারণা (notion of space and time) ইত্যাদি কিভাবে ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে।]

(৪) শিশু-মনে আবেগ, অনুভূতি কিভাবে ধীরে ধীরে প্রকাশ লাভ করে এবং কিভাবে শিশু সেইগুলি সামাজিক আদর্শের মাপকাঠিতে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে শিখে ;

১৪ কেহ কেহ এই পদ্ধতিকে বর্ধন-সম্বন্ধীয় পদ্ধতি (Developmental method) বলেন।

১৫ এইরূপ ক্ষেত্রে মনোবিৎ মনুষ্যেতর প্রাণী লইয়া পরীক্ষণ চালাইয়া থাকেন।

(৫) শিশু-জীবনকে সহজ-প্রবৃত্তি কিভাবে প্রভাবিত করে ;

(৬) সাধারণভাবে বুদ্ধির বিকাশ, শিক্ষণ-শক্তির বিকাশ, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ইত্যাদি কিভাবে ঘটে ;

(৭) কৈশোর ও যৌবন-সন্ধিক্ষণে সমগ্র ব্যক্তিত্বের কি পরিবর্তন দেখা দেয়। (পৃঃ ৫৭ দ্রষ্টব্য)।

(খ) রোগি-পরীক্ষা পদ্ধতি (Clinical[১৬] Method) ঃ

মানুষ সর্বদাই তাহার পরিবেশের সহিত প্রতিযোজন ও উপযোজনের প্রচেষ্টা করে ; কিন্তু সকলক্ষেত্রেই সে সুষ্ঠুভাবে এই কার্য করিতে পারে না— অর্থাৎ পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে না। এইসব ক্ষেত্রে মানসিক রোগ বা বিকার দেখা দিতে পারে। রোগি-পরীক্ষা পদ্ধতি দ্বারা এই বিষয়ে উপাত্ত সংগ্রহ করিয়া মনোবিদ্‌গণ মানসিক রোগ বা বিকারের কারণ এবং তাহা দূরীকরণের চেষ্টা করিয়া থাকেন।

মানসিক রোগ বা বিকার পদটি মনোবিদ্যায় ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করা হয়। যে কোন প্রকারের অপ-প্রতিযোজন (mal-adaptation) ও অপ-উপযোজন (mal-adjustment) হইতে বাহ্য-ব্যবহারে যে অসামঞ্জস্য দেখা দেয়, তাহাকেই মানসিক বিকার বা রোগ বা অস্বভাবি-মনের[১৭] লক্ষণ বলা যাইতে পারে।

রোগি-পরীক্ষা পদ্ধতির প্রয়োগক্ষেত্র যে কত ব্যাপক তাহা ইহার দ্বারা অনুসন্ধেয় বিষয়বস্তুর তালিকা পর্যালোচনা করিলে বুঝা যাইবে। আমরা উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করিতে পারি ঃ

অস্থিরতা, স্নায়ু-দৌর্বল্য, উত্তেজনা-প্রবণতা, অবাধ্যতা, ঔদ্ধত্য, দুর্বল-চিত্ততা, বুদ্ধি-দৌর্বল্য, নির্বুদ্ধিতা, উৎসাহের অভাব, চৌর্য-প্রবণতা, মিথ্যা-ভাষণের চেষ্টা, কলহপরায়ণতা, হস্তমৈথুন, স্কুল হইতে পলায়ন, গৃহ হইতে

১৬ ইংরাজী Clinical পদটি গ্রীক্ *Klinikos*, অর্থাৎ 'শয্যা' পদ হইতে হইয়াছে। ইহার সাধারণ অর্থ দাঁড়াইয়াছে 'রোগ-সম্বন্ধীয়'। মনোবিদ্যায় আবার ইহা বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয়। American Psychological Association-এর Clinical Section 'Clinical Psychology'-র সংজ্ঞা দিয়াছেন ঃ 'The term Clinical Psychology should be used to denote that art and technology which deals with the adjustment problems of human beings."

১৭ ৩য় অধ্যায়, ৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

পলায়ন, শিক্ষায় উন্নতির অভাব, অতিরিক্ত লজ্জাশীলতা, কৈশোর ও যৌবনেও শিশুসুলভ মনোবৃত্তি, অন্ধ, বধির ইত্যাদির শিক্ষণ-সমস্যা, বাক্‌শক্তির অপটুতা, উন্মাদ, বাতুলতা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ মানসিক রোগ।

(গ) ঘটনা-বিবরণ পদ্ধতি (Case History Method) :

এই পদ্ধতির লক্ষ্য হইল কোন ঘটনার ইতিহাস পর্যালোচনা করা। এই পদ্ধতি দ্বারা চেষ্টা করা হয় কোন বিশেষ মানসিক ঘটনার প্রয়োজনীয় বিবরণী সংগ্রহ করা। মনের কোন বর্তমান অবস্থা সুষ্ঠুভাবে জানিতে হইলে উহাকে অতীত হইতে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যায় না। সেই কারণে অতীতকে জানা প্রয়োজন এবং অতীতের ইতিহাস জানাই হইল ঘটনা-বিবরণ পদ্ধতির লক্ষ্য।

এই পদ্ধতি অনেক সময়ই উৎপত্তি-সম্বন্ধীয় পদ্ধতি অথবা রোগী-পরীক্ষণ পদ্ধতির সহকারী পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। যেমন, উৎপত্তি-সম্বন্ধীয় পদ্ধতির সাহায্যে যখন ব্যক্তি-বিশেষের মনের কোন এক পর্যায়ের পরিবর্ধন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হয়, তখন পূর্ববর্তী পর্যায়ের ক্রম-বিকাশের ইতিহাস জানিবার জন্য ঘটনা-বিবরণ-পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। সেইরূপ অস্বাভাবিক-মন বা রোগি-মন সম্বন্ধে রোগি-পরীক্ষা পদ্ধতি দ্বারা অনুসন্ধানকালে রোগীর পূর্বকালীন অবস্থা বা তাহার বংশের ইতিহাস জানা আবশ্যক হয়, এবং এই কারণে ঘটনা-বিবরণ পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়।

এই পদ্ধতি প্রয়োগকালে মনোবিৎকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়, কারণ প্রকৃত ইতিহাসের সহিত কাল্পনিক কাহিনী মিশাইয়া ফেলিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। তাহা ছাড়া, প্রয়োজন অনুসারে মনোবিৎকে অতীত ইতিহাসের এক বিশেষ বিশেষ পর্যায়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে হয়।

(ঘ) বিশ্লেষণ-পদ্ধতি (Analytic Method) :

এই পদ্ধতি অনুসারে মনোবিৎ জটিল মানসিক অবস্থা ও ক্রিয়াকে বুঝিবার সুবিধার জন্য উহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরল 'উপাদানে' ভাগ করেন (পৃঃ ৯৫)। তথাকথিত সরল উপাদানগুলির শ্রেণীকরণ করা হয় এবং তাহাদের সমন্বয়ের সাধারণ সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

মনোবিদ্যার বিভিন্ন শাখা

মনোবিদ্যার প্রসার ও উন্নতির ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ ঘটিতেছে এবং ইহার শাখাপ্রশাখা সুদূরপ্রসারী হইয়াছে। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা কয়েকটি শাখার আলোচনা করিব।

১। প্রাণি-মনোবিদ্যা (Animal Psychology):

(ক) বিষয়বস্তু:

প্রাণি-মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হইল **মনুষ্যেতর প্রাণীর মনের বিভিন্ন প্রকাশ**। মনুষ্যেতর প্রাণী বলিতে আমরা এককোষ-বিশিষ্ট ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব হইতে আরম্ভ করিয়া মূষিক, বিড়াল, কুকুর, অশ্ব, হস্তী, বানর ইত্যাদি উচ্চপর্যায়ের সমস্ত জীবকে বুঝি।[১]

প্রাণি-মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু মোটামুটি চারি ভাগে ভাগ করা যায়[২]:

(১) বিশেষ বিশেষ প্রাণীর—যথা, মূষিক, কুকুর, বানর ইত্যাদির—বাহ্য-প্রকাশগুলি আলোচনা;

(২) তুলনামূলক আলোচনা, অর্থাৎ এক জীবের ব্যবহারের সহিত অপর জীবের ব্যবহারের তুলনা;

(৩) জীব-জগতের বিবর্তনের আলোচনা (phylogenetic studies), অর্থাৎ ক্ষুদ্র এককোষ-বিশিষ্ট জীবের যদি চেতনা থাকে তাহা হইতে উচ্চতর পর্যায়ের জটিল অবস্থার উদ্ভব কিরূপে হইয়াছে তাহা অনুসন্ধান করা;

(৪) গবেষণার মাধ্যম (research tool) নিরূপণ ও পর্যবেক্ষণ, অর্থাৎ কোন বিশেষ প্রকারের প্রাণীকে আদর্শদৃষ্টান্ত বা নমুনা (typical example

---

১ এখানে 'প্রাণী' শব্দটি সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। প্রাণি-মনোবিদ্যায় বৃক্ষাদির কোন আলোচনা করা হয় না, আবার মনুষ্য-মনেরও আলোচনা নাই। (তবে মনুষ্য-মনের সহিত ইতর জীবের মনের তুলনা করা যাইতে পারে।)

২ N. L. Munn-রচিত *Handbook of Psychological Research on the Rat* দ্রষ্টব্য।

বা specimen) হিসাবে গ্রহণ করিয়া তাহার সাহায্যে সাধারণ-মনোবিদ্যার (general psychology) বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা।[৩]

মনোবিদ্যা নিজেই তরুণ বিজ্ঞান; সুতরাং প্রাণি-মনোবিদ্যা যে নিতান্তই তরুণ বিজ্ঞান হইবে তাহা আশ্চর্য নহে। প্রাণি-মনোবিদ্যার মূল সমস্যাগুলি এখনও অমীমাংসিত রহিয়াছে এবং গবেষণার ক্ষেত্র এখনও নিতান্ত সঙ্কীর্ণ।

(খ) পর্যবেক্ষণ-পদ্ধতি ঃ

প্রাণি-মন আলোচনাকালে আমাদের সম্পূর্ণরূপে বিষয়গত-পদ্ধতি (objective method)-এর উপর নির্ভর করিতে হয়। ইহার একটি অসুবিধা হইতেছে যে, এ ব্যাপারে যাহাদের মন লইয়া আলোচনা করি তাহাদের সহিত কথোপকথন করিয়া আমাদের অনুমানের সত্যাসত্য নির্ধারণ করিতে পারি না। আবার বিষয়গত-পদ্ধতির কিভাবে প্রয়োগ হইবে তাহা লইয়াও মতভেদ আছে ঃ

(১) উপকথা-পদ্ধতি (Anecdotal Method)—সাধারণ লোকে বিভিন্ন মনুষ্যেতর জীবের যে সব কাহিনী বর্ণনা করে, তাহার ভিত্তিতে প্রাণি-মনের আলোচনা করা হয়। বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্যের জন্য যখন কোন জীবের ব্যবহার আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তখন সাধারণতঃ আমরা উহা অন্যের নিকট বর্ণনা করিয়া থাকি এবং ঐ ভাবেই বিভিন্ন কাহিনী প্রচারিত হইয়া থাকে। রোমানেস (Romanes)-রচিত 'Animal Intelligence'-শীর্ষক পুস্তকখানির কথা উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে।

এই প্রকারের পদ্ধতির বিরুদ্ধে আপত্তি হইল যে, যে সব লোকের কাহিনীর উপর ভিত্তি করিয়া প্রাণি-মনোবিদ্যা রচিত হইবে, তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা

৩ প্রাণি-মনের গবেষণার মাধ্যম হিসাবে কোন্ জীবের মন সবিস্তারে আলোচনা করা কর্তব্য সে বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মান্ (Munn)-এর মতে ইঁদুর বা মূষিকের ব্যবহারকে জীবের ব্যবহার পর্যালোচনার আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। তিনি বলেন : "Indeed it can be said that material on the rat now covers every important area of psychological research." (*Handbook of Psychological Research on the Rat*, p. viii)। অনেকে এই প্রণালীর সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, Munn ইত্যাদি পিঞ্জরাবদ্ধ মূষিক পর্যবেক্ষণ করিয়া কিরূপে প্রাণি-মনের স্বাভাবিক ব্যবহার আলোচনা করিতে পারেন তাহা বোধগম্য নহে। (দ্রষ্টব্য : R. Christie, Experimental naivete' and experiential naivete', *Psychological Bulletin*, 1951, Vol. 48, p. 338).

নাই ; তাঁহারা অনেক সময় সত্যের সহিত কল্পনা মিশাইয়া ফেলেন—বিশেষতঃ যদি নিজের পোষা পশুপক্ষী সম্বন্ধে কিছু বলিতে হয়, তাহা হইলে উহাদের 'কৃতিত্ব' প্রকাশের জন্য তাঁহারা এমন অনেক কথা বলিয়া ফেলেন যাহা সত্য নহে, অর্থাৎ তাঁহাদের বর্ণনা পক্ষপাতিত্ব-দোষে দুষ্ট হইয়া পড়ে।

(২) পরীক্ষণ-পদ্ধতি (The Method of Experiment)—উপকথা-পদ্ধতির ঠিক বিপরীত হইল পরীক্ষণ-পদ্ধতি। পরীক্ষণকারী কৃত্রিম উপায়ে এমন একটা পরিবেশের সৃষ্টি করেন যাহার মধ্যে জীবেরা নিজেদের ব্যবহার প্রকাশ করিতে পারে। এই কৃত্রিম পরিবেশ এমনভাবে সৃষ্টি করিতে হইবে যে, ইহা যেন জীবের কোন স্বাভাবিক প্রবৃত্তির মূলে সাড়া জাগাইতে পারে।

এই প্রক্রিয়ার সুবিধা হইল যে, ইহা পক্ষপাতিত্বহীন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে পরিচালিত হয়। আর ইহার অসুবিধা হইল যে, কৃত্রিম উপায়ে যে পরিবেশের সৃষ্টি করা হয়, তাহা সম্পূর্ণরূপে সাধারণ প্রাকৃতিক পরিবেশের তুল্য হইতে পারে না—ফলে পরীক্ষিত জীবের সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করা যায় না।

(৩) আদর্শ-পদ্ধতি—আমাদের আদর্শ এইরূপ হওয়া উচিত যে, আমরা যেন কেবলমাত্র সাধারণ লোকের পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর না করিয়া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের সাহায্য লই। এই পরীক্ষণের সময় আমাদের কৃত্রিম পরিবেশকে যতদূর সম্ভব প্রাকৃতিক পরিবেশের সমতুল্য করিয়া তুলিতে হইবে। পরীক্ষণের উদ্দীপকগুলি এমনভাবে নির্বাচন করিতে হইবে যেন সেগুলি জীবের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি জাগরিত করিতে পারে। ইহাও দেখিতে হইবে যে, ঐ উদ্দীপকগুলি পরীক্ষিতব্য জীবগুলিকে অকারণ যেন ভীত করিয়া না ফেলে। আবার পরীক্ষা-কালে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিতে হইবে ; অকারণ আমরা যেন উহাদের উপর মনুষ্যোচিত গুণ আরোপ না করি বা উহাদের 'কৃতিত্বে' গৌরব বোধ না করি ; অপরপক্ষে আমরা যেন সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া না পড়ি। তাহা ছাড়া, পরীক্ষণের জন্য এক বিশেষ শ্রেণীর জীবকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা উচিত ; ঐ শ্রেণীর পরীক্ষিতব্য জীবগুলিকে ধৈর্যসহকারে (এবং সম্ভব হইলে, আজন্ম) পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে। এই সময় তাহাদের ব্যক্তিগত পার্থক্যগুলি (individual differences)-এর উপরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে[৪]।

৪ Washburn, *Animal Mind*, Ch. I, § 3 & 4 দ্রষ্টব্য।

(গ) সংক্ষিপ্ত ইতিহাস :

প্রাণি-মনোবিদ্যার অভ্যুদয়ের মূলে আছে ডারূউইনের বিবর্তনবাদ (doctrine of evolution)। ডারূউইনের প্রভাবে ইংলণ্ডে ইংরাজ লেখকেরা এবং জার্মানীতে শ্নাইডার (Schneider) গত শতাব্দীর শেষভাগে বিজ্ঞান হিসাবে প্রাণি-মনোবিদ্যার গোড়া পত্তন করেন। ১৮৮০ এবং ১৮৮২ সালে শ্নাইডারের রচনা প্রকাশিত হয়। ষ্টান্‌লি হল্ (Stanley Hall) ইত্যাদি শ্নাইডার দ্বারা প্রভাবিত হ'ন।

ডারূউনের পরে ভাইস্‌মান্ (Weismann)-এর বিবর্তন সম্বন্ধীয় মতবাদ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। ভাইস্‌মানের মতে জীবের অভিজ্ঞতালব্ধ বৈশিষ্ট্যগুলি পরবর্তী বংশধর উত্তরাধিকারসূত্রে পায় না; কেবলমাত্র ডিম্বকোষের মধ্যে পরিবর্তন (germinal variations) সাধিত হইলে তাহা পরবর্তী বংশধরের দেহে পরিবর্তন আনে। যাহা হউক্, এই মতবাদের সত্যাসত্য নির্ধারণ করিবার জন্য প্রাণি-মনোবিদ্‌গণ পরীক্ষণ আরম্ভ করেন। ম্যাক্‌ডুগাল এইজন্য মূষিকের উপর পরীক্ষা চালান এবং তিনি ভাইস্‌মানের মত ত্যাগ করেন। (পৃঃ ২৫৬)।

ফাব্‌রে (Fabre) কীট-পতঙ্গাদি পর্যবেক্ষণ সুরু করেন। তাঁহার পর্যবেক্ষণের বিভিন্ন সংবাদ ১৮৭৯ হইতে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পর দেখা দেয় লাবক্ (Lubbock)-এর গ্রন্থ *Ants, Bees and Wasps*; গ্রন্থের নাম হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহার পর্যবেক্ষণের বস্তু ছিল পিপীলিকা, মধুমক্ষিকা এবং বোল্‌তা।

উচ্চস্তরের জীব লইয়া আলোচনা সুরু করেন রোমানেস্ (Romanes)। তিনি বিভিন্ন পর্যবেক্ষকের কাহিনী সঙ্কলন করিয়া উচ্চস্তরের জীব সম্বন্ধে সুসংবদ্ধ বর্ণনা প্রস্তুত করেন। তাঁহার প্রণালীকে বলা হইত 'উপকথা-প্রণালী' (anecdotal method)। এই প্রণালীর অসুবিধা হইল যে, তিনি যাহাদের প্রদত্ত বর্ণনা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই জীবের বাহ্য-ব্যবহারগুলি বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে পর্যবেক্ষণ করেন নাই। (পৃঃ ৫০ দ্রষ্টব্য)।

সুতরাং ইহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় লয়েড্ মরগ্যান (Lloyd Morgan)-এর রচনায়। তিনিই সর্বপ্রথম প্রাণি-মনের আলোচনার

ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে পরীক্ষণ-প্রণালী (experimental method) প্রয়োগ করেন। প্রাণি-মনের আলোচনার ব্যাপারে তিনি এই সাবধান বাণী উচ্চারণ করিলেন: "যেখানে জীবের কোন ব্যবহারকে নিম্নতর সরল মানসিক বৃত্তির প্রকাশ হিসাবে ব্যাখ্যা করা যায়, সেখানে উহাকে উচ্চতর জটিল মানসিক বৃত্তির প্রকাশ হিসাবে ব্যাখ্যা করা সমীচীন হইবে না"।[৫]

লয়েড্ মরগ্যানের ভাবধারাকে অনুসরণ করিয়া চলেন হব্‌হাউস্ (L. T. Hobhouse)। ১৯০১ সালে ইঁহার *Mind in Evolution* প্রকাশিত হয়।

ক্ষুদ্র প্রাণী, যথা, কীটপতঙ্গাদি লইয়া আবার আলোচনা সুরু করেন লোয়েব (Jacques Loeb)। তিনি আভিমুখ্যবাদ (tropism) প্রচার করেন। এই মত অনুসারে উদ্দীপকের মধ্যে একটা শক্তি নিহিত থাকে যাহার ফলে কীটপতঙ্গাদি ঐ উদ্দীপকের প্রতি যান্ত্রিকভাবে আকৃষ্ট হয় অথবা উহাকে পরিহার করিয়া চলে। ১৮৯৬ সালে এই মত প্রচারিত হয়। তাঁহার মতকে বিয়ার (Beer), বেট্‌হে (Bethe) ইত্যাদি সমর্থন করেন।

আমেরিকায় এইচ্. এস্. জেনিংস্ (H. S. Jennings) যান্ত্রিকতাবাদ পরিহার করেন এবং তিনি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবের ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করিয়া এই সিদ্ধান্ত করেন যে, যেহেতু ইহাদেরও পারিপার্শ্বিক ব্যবস্থার তারতম্যে বাহ্য ব্যবহারের পরিবর্তন (variability) এবং প্রতিযোজন (adaptability) সাধিত হয়, ইহাদেরও ভিতরে মনের স্বল্প অস্তিত্ব আছে। তাঁহার মতবাদের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাঁহার *Behavior of Lower Organisms* নামক গ্রন্থে।

১৮৯৮ সালে ই. এল্. থর্ণডাইক (E. L. Thorndike) বিড়াল ইত্যাদির উপর গবেষণাগারে পরীক্ষণ চালান। তাঁহার সিদ্ধান্ত হইল

৫ মরগ্যানের ভাষায়: "In no case may we interpret an action as the outcome of the exercise of a higher psychical faculty, if it can be interpreted as the outcome of the exercise of one which stands lower in the psychological scale." (*Introduction to Comparative Psychology*, p. 5 3). ইহাই Lloyd Morgan's Canon নামে সুবিদিত।

এই সব জীবজন্তুদের শিক্ষণপদ্ধতি (learning) যান্ত্রিকভাবে সাধিত হয়। ইনি কৃত্রিম অবস্থার মধ্যে অর্থাৎ ধাঁধার (puzzle box) মধ্যে বিড়াল ইত্যাদি রাখিয়া পরীক্ষণ চালান।

এই সময়ে আর্. এম্. ইয়ারকেস্ (R. M. Yerkes) ক্ষুদ্র হইতে উচ্চ পর্যায়ের বহু জীব লইয়া পরীক্ষণ করেন। ইয়ারকেসের দুইটি উল্লেখযোগ্য পরীক্ষণ-পদ্ধতি হইল—'বহুনির্বাচন-পদ্ধতি' (multiple choice method) এবং 'বিলম্বিত প্রতিক্রিয়া পদ্ধতি' (delayed reaction method)। প্রথমোক্ত পদ্ধতি দ্বারা দেখা যায় যে, যখন কোন প্রাণী একাধিক উদ্দীপকের মধ্য হইতে একটি উদ্দীপককে বাছিয়া লয়, তখন ঐ উদ্দীপককে সে পৃথক্‌ভাবে না দেখিয়া অন্যান্য উদ্দীপকের সহিত সম্বন্ধযুক্তভাবে উহাকে দেখে। দ্বিতীয় পদ্ধতিটির ক্ষেত্রে প্রথমে একটি প্রাণীকে উদ্দীপক দেখান হইত এবং তৎক্ষণাৎ উহাকে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করিতে দেওয়া হইত না। কিছুক্ষণ যাইবার পর উহাকে ছাড়িয়া দিয়া দেখা হইত যে, উহা উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া দেখাইতে পারে কি না। যদি পারে, তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে, উদ্দীপকের প্রত্যক্ষ অবস্থিতির উপর প্রতিক্রিয়া সকল সময় নির্ভর করে না।

রাশিয়ার বেক্‌টেরেভ্ ও পাভ্‌লভ্ প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া লইয়া কুকুরের উপর পরীক্ষণ চালান। তাঁহারা দেখান যে, মূল উদ্দীপকের সহিত আর একটি উদ্দীপক যদি কয়েকবার প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে মূল প্রতিক্রিয়াটি বিকল্প উদ্দীপকের সহিত সংশ্লিষ্ট হয়। ইহারই নাম সাপেক্ষ প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া (conditioned reflex action)। (পৃঃ ৩৪৯)।

চেষ্টিতবাদী ওয়াট্‌সন্ থর্ণডাইক্ এবং বেক্‌টেরেভ্ ও পাভ্‌লভের পরীক্ষণ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হ'ন।[৬] ওয়াট্‌সনের নিজস্ব একটি পরীক্ষণের এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি কতকগুলি শাদা ইঁদুরকে গোলকধাঁধার মধ্য দিয়া দৌড়াইতে শিখান। পরে তিনি অস্ত্রোপচার দ্বারা এক একটি করিয়া বাহ্যেন্দ্রিয় বাদ দেন। দেখা গেল যে, ইহা সত্ত্বেও ইঁদুরগুলি গোলকধাঁধার পথে দৌড়াইতেছে

[৬] ৪র্থ অধ্যায়, ২য় অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

এবং তিনি অনুমান করেন যে, চেষ্টাবেদনের (kinæsthetic sensation) দ্বারা ইহা সম্ভব।[৭]

গেস্টাল্ট্‌বাদীরা বানর ইত্যাদির উপর পরীক্ষণ চালান। এই দলের সমর্থকেরা থর্ণডাইকের যান্ত্রিকতাবাদ পরিহার করেন। কোয়েলার বানরের উপর পরীক্ষণ চালান এবং তিনি ও তাঁহার সমর্থকেরা বলেন যে, প্রাণী যখন প্রতিক্রিয়া করে, তখন 'সমগ্র ক্ষেত্র' (total field)-এর উপরই প্রতিক্রিয়া করে। ইহাদের শিক্ষণ যান্ত্রিকতার পথে চলে না—উহার মূলে আছে পরিজ্ঞান (insight)[৮]।

২। শিশু-মনোবিদ্যা (Child Psychology):

শিশু-মনোবিদ্যা শিশুর মন লইয়া আলোচনা করে, অর্থাৎ **জন্ম হইতে কৈশোর পর্যন্ত মানবশিশুর ক্রমবর্ধমান মনই** হইল ইহার আলোচ্য বিষয়।

(ক) মনোবিদের দৃষ্টিতে শিশু:

শিশু-মনকে এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে মনোবিৎ আলোচনা করেন। (ক) শিশু এক বিশেষ শক্তিপুঞ্জ (energy system)-স্বরূপ। শিশু ও তাহার পরিবেশ প্রতিনিয়তই পরস্পরের উপর ঘাত-প্রতিঘাত করিতেছে। বাহ্য জগৎ হইতে উদ্দীপক আসিয়া তাহার ইন্দ্রিয়গুলিকে সক্রিয় রাখে এবং সে পেশীসমূহকে সঞ্চালিত করিয়া নানাভাবে প্রতিক্রিয়া করে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, বাহ্য জগৎ হইতে খাদ্য ইত্যাদির মাধ্যমে যে শক্তি সে সঞ্চয় করে, বাহ্য জগতের উপর প্রতিক্রিয়ার ফলে তাহা ব্যয়িত হয়। (খ) শিশু ক্রমবর্ধমান জীব। প্রতিনিয়তই তাহার দেহের ও মনের পরিবর্তন হইতেছে। তাহার দৈহিক গঠন সাধিত হইতেছে, সামাজিকতা-বোধ দেখা দিতেছে, পারিপার্শ্বিক ব্যক্তি ও বস্তুনিচয়ের প্রতি আগ্রহ জন্মিতেছে, বাহ্য পরিবেশের সহিত প্রতিযোজনের চেষ্টা চলিতেছে, ধী-শক্তি বাড়িতেছে, বহুবিধ আবেগ সে প্রকাশ করিতেছে, বিভিন্ন অনুভূতিবোধের

৭ পরে লাশ্‌লে (Lashley) এই পথে পরীক্ষণ চালান এবং শেষ পর্যন্ত মেরুদণ্ডের পরিবহন পথ (conduction path) নষ্ট করিয়া দেন, অর্থাৎ চেষ্টাবেদনের সম্ভাবনাও তিরোহিত হইল। আশ্চর্যের বিষয় ইঁদুরগুলি তাহা সত্ত্বেও দৌড়াইতে লাগিল!

৮ ৪র্থ অধ্যায়, ২য় অনুচ্ছেদ এবং ১৫শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ক্ষমতা জাগিতেছে। এক কথায় বলিতে গেলে, প্রতিক্ষেত্রেই শিশু নব নব শক্তি ও দক্ষতার উন্মেষের প্রমাণ দিতেছে। সে শৈশবের অক্ষম অবস্থা হইতে ধীরে ধীরে আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তিত্বের পথে চলিয়াছে। তাহার এই ক্রমবিকাশ অন্তর্নিহিত শক্তিদ্বারা নির্দিষ্টপথে চালিত হয়। (গ) প্রতি শিশু একটি বিশেষ কৃষ্টির মধ্যে বর্ধিত হয়। এই কৃষ্টি জাতিগত, সমাজগত ও পরিবারগত। যে জাতি, যে সমাজ, যে পরিবারের মধ্যে সে জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইতে তাহার ভাবধারা ও আদর্শ গঠনের উপাদান সে সংগ্রহ করে। এইজন্য বিভিন্ন শিশুর মনে বিভিন্ন আদর্শবোধ বা মূল্যবোধ (value consciousness) জাগে। (ঘ) বাহ্য জগতের সহিত আদান-প্রদানের সময় শিশুকে বিভিন্ন বিষয় নির্বাচন ও পরিত্যাগ করিতে হয়। সে দেখে যে, সে যখন একটি কাজ করিতেছে তখন অপর কাজ করা যায় না; যেমন, দুধ খাইবার সময় সে বল খেলিতে পারে না। আবার এমন অনেক কার্য আছে যাহা সে করিতে চায়, কিন্তু পরিণতবয়স্কেরা তাহাতে বাধা দেয়; অতএব বাধ্য হইয়া ক্রমশঃ সেগুলি পরিত্যাগ করিতে হয়। তাহা ছাড়া, কতকগুলি দ্রব্য আছে যেগুলি কষ্টদায়ক; যেমন, আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িয়া যায়। অতএব ঐ সব দ্রব্য পরিত্যাজ্য। (ঙ) শিশু তাহার দৈহিক গঠনের সহিত ক্রমশঃ বাহ্য অবস্থাগুলি আয়ত্তে আনিবার চেষ্টা করে। এক একটি কার্যে সাফল্য লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার উৎসাহ বাড়িয়া যায়। ক্রমশঃ সে আবিষ্কার করে যে, কাহারও সাহায্য না লইয়াই সে চলিতে পারিতেছে, নিজেই জামা পরিতেছে, উঁচু জায়গা হইতে জিনিষ নামাইতেছে। এইভাবে ধীরে ধীরে সে আত্মনির্ভরশীল ও আত্ম-মর্যাদাসম্পন্ন হইয়া পড়ে। (চ) বাহ্য-সমাজের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিতে সে সক্ষম হয়। সে দেখে অন্য লোকে তাহার কার্যাবলী লক্ষ্য করিতেছে এবং তাহার নিন্দা বা সুখ্যাতি করিতেছে। সুতরাং বাহ্য-সমাজের আদর্শের সহিত নিজেকে মিলাইয়া লইবার এবং ঐভাবে অপরের প্রশংসা লাভের সে চেষ্টা করে। (ছ) যে শিশু বাহ্য-সমাজের সহিত সমতা বিধান করিয়া চলিতে না পারে, সে ক্রমশঃ অস্বাভাবিক শিশুর (abnormal children) গোষ্ঠীভুক্ত হয়। ভাবী-জীবনে এইসব শিশুদের কেহ উদ্বায়ুগ্রস্ত, কেহ বা অপরাধপ্রবণ, কেহ বা নির্বোধ ব্যক্তিতে পরিণত হয়।

(খ) বিষয়-বস্তু ঃ

শিশু-মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়-বস্তুগুলি সাধারণভাবে এইরূপ বর্ণনা করা যাইতে পারে ঃ

(১) শিশুর মনের ক্রমবিবর্তন এবং মনের বিভিন্ন পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ ;

(২) শিশুর ব্যক্তিত্বের উপর বংশপ্রভাব ;

(৩) শিশুর ব্যক্তিত্বের উপর সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশের প্রভাব ;

(৪) শিশু-জীবনে বুদ্ধির বিকাশ ;

(৫) শিশু-জীবনে বিভিন্ন আবেগের উদ্বর্তন ;

(৬) শিশুর সহজ-প্রবৃত্তি ও প্রেরণা ;

(৭) শিশুর বিভিন্ন ক্রিয়া ও চেষ্টাধিষ্ঠান ;

(৮) শিশুর শিক্ষণ-পদ্ধতি ;

(৯) শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ;

(১০) শিশু, কিশোর ও পরিণতবয়স্কদের মনের তুলনা ও পার্থক্য।

আবার শিশু-মন সম্বন্ধে এইরূপ আলোচনালব্ধ সাধারণ জ্ঞান কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় ; ফলে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি আলোচিত হয়—

(১) শিশুর মানসিক সুস্থতা রক্ষা করিবার জন্য কিরূপ সুষ্ঠু পরিবেশ রচনা করা প্রয়োজন ?

(২) শিশুর বুদ্ধি বা ধী-শক্তি, স্মৃতিশক্তি ইত্যাদির প্রাখর্য-বৃদ্ধি কিরূপে সম্ভব ?

(৩) শিশুর ব্যক্তিত্বের কোন ক্ষতি না করিয়া তাহার আবেগ, ইচ্ছা ইত্যাদিকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যায় ?

(৪) শিশুর শিক্ষণ কোন্ পথে চালিত করা উচিত ?

(৫) শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য কিরূপে রক্ষা করা যায় ? অস্বাভাবিক শিশু, অর্থাৎ বিপথগামী শিশু, অল্পবুদ্ধি বা নির্বুদ্ধি শিশু, অপরাধপ্রবণ শিশু ইত্যাদি শিশুকে কিভাবে এবং কতদূর স্বাভাবিক পথে আনা যায় ? তথাকথিত 'দুষ্টু ছেলের' (problem children) সমস্যা কিরূপে সমাধান করা যায় ?

(গ) সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঃ

ডারউইনের বিবর্তনবাদের প্রভাবে বিভিন্ন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মনোবিদ্যার যে সব প্রয়োগ হইয়াছে তাহার ফলে মনোবিদ্যার কয়েকটি শাখার সৃষ্টি হইয়াছে ; এবং শিশু-মনোবিদ্যা তাহাদের অন্যতম। ডারউইন তাঁহার *Biographical Sketch of an Infant* নামক পুস্তকে শিশু-জীবন সম্বন্ধে পর্যালোচনা করেন। তবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সুষ্ঠুভাবে শিশু-মন লইয়া আলোচনা আরম্ভ করেন প্রেয়ার (W. T. Preyer) ; তাঁহার রচিত *Mind of the Child* বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে—তবে তিনি তাঁহার পুস্তকে বাস্তব পর্যবেক্ষণ ও তাঁহার স্বকীয় ব্যাখ্যা বা মত এই দুইটি পৃথক্‌ভাবে নির্দেশ করেন নাই।

ভুণ্ড্‌টের পরীক্ষণাগার হইতে আমেরিকায় প্রত্যাবর্তন করিয়া ষ্টান্‌লি হল্ (G. Stanley Hall) শিশুমন লইয়া গবেষণা চালাইতে থাকেন। ১৮৯১ সালে তিনি *Pedagogical Seminary* নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করেন—শিশুর মনোভাব, প্রতিন্যাস এবং ব্যক্তিত্ব (ideas, attitude and personalities) লইয়া আলোচনা করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৯৩ সালে সালি (Sully) শিশু-মন আলোচনার জন্য ইংলণ্ডে British Association for Child Study নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তিনি *Studies of Childhood* নামে এক পুস্তক রচনা করেন —ইহা ১৮৯৫ সালে প্রকাশিত হয়। কার্ল গ্রুজ (Karl Groos) *Play of Animals* এবং *Play of Man* প্রকাশ করেন। ১৯০০ সালে শিন্ (Shinn)-এর *The Biography of a Baby* এবং ১৯০৪ সালে হল্-এর *Adolescence* প্রকাশিত হয়।

এ দিকে ফ্রান্সে বিনে (Binet) ১৯০৪ সালে শিশুদের বুদ্ধি-পরিমাপের জন্য পরীক্ষণের উপায় উদ্ভাবন করেন এবং ময়মান্ (Meumann) জার্মানীতে ঐ পরীক্ষণ চালাইতে থাকেন। ইহার ফলে শিশু-মনের আলোচনা বিশেষ অগ্রসর লাভ করে।

১৯১৬ সালে জে. বি. ওয়াট্‌সন্ শিশুর ব্যবহার লইয়া আমেরিকার বাল্টিমোরস্থ ফিপ্‌স্ ক্লিনিক (Phipps Clinic)-এ গবেষণা চালান।

ইহার গবেষণায় স্বতঃই ব্যবহারের উপর—বিশেষতঃ শিশুর প্রচয় (**development**), শিক্ষণ ইত্যাদি লইয়া পরিমাণগত আলোচনার উপর—বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

ভিয়েনায় কার্ল বুয়েলার (**Karl Bühler**) এবং শার্লোট্ বুয়েলার (**Charlotte Bühler**) পরীক্ষণের উপর ভিত্তি করিয়া শিশু-মন লইয়া আলোচনা করেন।

জেনেভা বিশ্ববিস্থালয়ের অধ্যাপক জঁা পিয়াজে (**Jean Piaget**)-এর গবেষণাকার্য সুদূরপ্রসারী। ২ হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত বালক-বালিকা পরীক্ষা করিয়া তিনি বাহ্য পরিবেশ সম্বন্ধে শিশুর ধারণা কিরূপে গড়িয়া উঠে তাহা লইয়া নির্দিষ্ট পরীক্ষণ-পদ্ধতি উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা করেন।

পিয়াজে বলেন যে, শিশু প্রথমে থাকে আত্মকেন্দ্রিক (**egocentric**) এবং তাহার দৃষ্টিভঙ্গী থাকে বাস্তব (**realistic**), অর্থাৎ তাহার নিজের কাছে কোন কিছু যেমন প্রতিভাত হয়, অন্তের নিকটও সেইরূপ হইবে, ইহাই তাহার ধারণা। আবার সে মনে করে যে, সে যেরূপ দেখিতেছে, বাহিরের জগতের বস্তু বাস্তবিকই সেইরূপ। ইহার পর আসে জাগতিক বস্তুসমূহে 'মানসিক অংশগ্রহণ' (**mental participation**); সে তখন তাহার নিজের মত করিয়া বাহিরের সব কিছু দেখে, অর্থাৎ তাহার যেমন মন আছে বাহ্য বস্তুরও সেইরূপ আছে, ইহাই সে মনে করে। নিজের উপমা দ্বারা সে বাহ্য জগৎকে বুঝিতে চেষ্টা করে। তাঁহার রচিত *The Language and Thought of the Child* এবং *The Child's Conception of the World* গ্রন্থে তিনি ইহা আলোচনা করেন।

পিয়াজের আর একটি অবদান হইল যে, তিনি সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গী (**sociological standpoint**) হইতে শিশু-মনের আলোচনার পথ প্রদর্শন করেন। তাঁহার *The Moral Judgment of the Child* গ্রন্থে তিনি সামাজিক অনুশাসনে শিশুর ন্যায়-অন্যায় বোধ বা নৈতিক-জ্ঞান কিরূপে গড়িয়া উঠে তাহাই আলোচনা করেন।

এ দিকে ফ্রয়েডের নেতৃত্বে মনঃসমীক্ষণ (psychoanalysis)-এর প্রসারের সঙ্গে শিশুর মানসিক অসুস্থতার কারণ সম্বন্ধে বহুবিধ আলোচনা ও অনুসন্ধান সুরু হয়। ফ্রয়েডের পর তাঁহার কন্যা আনা ফ্রয়েড্ (Anna Freud) এবং এস্. আইজাক্স্ (S. Isaacs) এ বিষয়ে অনুসন্ধান চালাইয়া যান।

গেস্টাল্ট্ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে কফ্কা (Koffka) শিশুর মানসিক প্রচয় ও উন্নতি (development and progress) সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁহার *The Growth of Mind* পুস্তকটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।[১]

৩। সমাজ-মনোবিদ্যা (Social Psychology):

(ক) বিষয়-বস্তু ঃ

যদিও আমরা এক একজন ব্যক্তিকে পৃথকভাবে দেখি, তাহা হইলেও কোন ব্যক্তিকেই একেবারে অন্য হইতে বিচ্ছিন্ন বা সমাজচ্যুত অবস্থায় দেখা যায় না। মানুষ সামাজিক জীব—সুতরাং সমাজের অন্য ব্যক্তির সহিত ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে তাহার মন গড়িয়া উঠে। সমাজের প্রভাব প্রতি মানবেরই চিন্তা, অনুভূতি ও ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এইজন্য ব্যক্তি-মন আলোচনা করিতে যাইয়া মনোবিদ্যা ক্রমশঃ সমাজ-মনের আলোচনায় উপনীত হয়। অবশ্য সমাজ-মন বলিতে ব্যক্তি-মন হইতে পৃথক্ কোন সত্তা বুঝায় না। সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমেই এই সমাজ-মন গঠিত হয়।

সমাজ-মনোবিদ্যার বিষয়-বস্তু হইল **সমাজভুক্ত ব্যক্তির মিথষ্ক্রিয়া বা পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং ব্যক্তি-বিশেষের চিন্তা, অনুভূতি**

১ শিশু-মন সম্বন্ধে বহু পুস্তক রচিত হইয়াছে। তবে নিম্নলিখিত গ্রন্থদ্বয়ে বিভিন্ন লেখকের মনোজ্ঞ রচনা পাওয়া যাইবে :

(১) *Manual of Child Psychology* (Ed. by Leonard Carmichael); (২) *Handbook of Child Psychology* (Ed. by C. A. Murchison).

ও কার্যের উপর ঐরূপ মিথষ্ক্রিয়ার প্রভাব।[১০] পরিবার ও সমাজের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিবর্গের কৃষ্টি কিভাবে গড়িয়া উঠে, কিরূপে পরস্পরকে প্রভাবিত করে, কিরূপে জনমত গড়িয়া উঠে, কিরূপে সামাজিক আদর্শ ও কল্পনা রচিত হয়, জন-নেতৃত্ব কিরূপে সম্ভব হয়, জনতার ন্যায় ক্ষুদ্র জন-সমন্বয় হইতে আরম্ভ করিয়া জাতীয় মন পর্যন্ত বিভিন্ন জন-সমন্বয়ের মানসিক বৈশিষ্ট্য কি কি, উত্তেজনা, বিদ্রোহ, গণ-আন্দালন, যুদ্ধ ইত্যাদির সময় জন-মনের অবস্থা কিরূপ হয়, আন্তর্জাতিক উত্তেজনা বা তান (tension)-এর কারণ বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয় সমাজ-মনোবিদ্যার আলোচনার অন্তর্ভুক্ত।

মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, সমাজ-মনোবিদ্যার বিষয়-বস্তু হইল: (১) **ব্যক্তি-বিশেষের ব্যক্তিত্বের সহিত সমাজ ও সামাজিক কৃষ্টির সম্বন্ধ,** (২) **বিভিন্ন প্রকারের আন্তর্ব্যক্তিক ও আন্তর্গোষ্ঠীয় দ্বন্দ্ব** (inter-individual and inter-group conflict), (৩) **জন-ব্যবহার** (mass-behaviour)।

এই সব বিষয়ের আলোচনা-লব্ধ জ্ঞান ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর বা সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা করা হয়; যেমন,

(১) কিরূপে জনমত পরিমাপ করা যায়?

(২) কিরূপে প্রচার কার্য চালান হয়?

(৩) কিরূপে জনমত প্রভাবিত করা যায়?

(৪) কিরূপে জনগণের নৈতিক মনোবল (morale) রক্ষা করা যায়?

(৫) একদেশদর্শিতা, পক্ষপাতিত্ব (prejudice) ও কুসংস্কার (superstition) কতদূর প্রভাবশালী হয় এবং কিরূপে উহাদের দূর করা যায়?

(৬) বিভিন্নক্ষেত্রে—যথা ক্ষুদ্র দলের মধ্যে, পারিবারিক পরিবেশে, শিল্পায়তনে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে—তান বা উত্তেজনা (tension) কিভাবে প্রশমিত করা যায়?

১০ তুলনীয়: (১) Kimball Young, *A Handbook of Social Phychology*, p. 1: "Social Psychology is the study of persons in their interactions with one another and with reference to the effects of this interplay upon the individual's thoughts, feelings, emotions and habits."

(২) *Present-day Psychology*, Ed. by Roback, p. 376; "...Social Psychology has become increasingly concerned with the development of the individual in the broader context of the family and community with their complexity of cultural influences."

এ দিকে ফ্রয়েডের নেতৃত্বে মনঃসমীক্ষণ (psychoanalysis)-এর প্রসারের সঙ্গে শিশুর মানসিক অসুস্থতার কারণ সম্বন্ধে বহুবিধ আলোচনা ও অনুসন্ধান সুরু হয়। ফ্রয়েডের পর তাঁহার কন্যা আনা ফ্রয়েড্ (Anna Freud) এবং এস্. আইজাক্স্ (S. Isaacs) এ বিষয়ে অনুসন্ধান চালাইয়া যান।

গেস্টাণ্ট্ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে কফ্কা (Koffka) শিশুর মানসিক প্রচয় ও উন্নতি (development and progress) সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁহার *The Growth of Mind* পুস্তকটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।[১]

৩। সমাজ-মনোবিদ্যা (Social Psychology):

(ক) বিষয়-বস্তু :

যদিও আমরা এক একজন ব্যক্তিকে পৃথকভাবে দেখি, তাহা হইলেও কোন ব্যক্তিকেই একেবারে অন্য হইতে বিচ্ছিন্ন বা সমাজচ্যুত অবস্থায় দেখা যায় না। মানুষ সামাজিক জীব—সুতরাং সমাজের অন্য ব্যক্তির সহিত ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে তাহার মন গড়িয়া উঠে। সমাজের প্রভাব প্রতি মানবেরই চিন্তা, অনুভূতি ও ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এইজন্য ব্যক্তি-মন আলোচনা করিতে যাইয়া মনোবিদ্যা ক্রমশঃ সমাজ-মনের আলোচনায় উপনীত হয়। অবশ্য সমাজ-মন বলিতে ব্যক্তি-মন হইতে পৃথক্ কোন সত্তা বুঝায় না। সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমেই এই সমাজ-মন গঠিত হয়।

সমাজ-মনোবিদ্যার বিষয়-বস্তু হইল **সমাজভুক্ত ব্যক্তির মিথষ্ক্রিয়া বা পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং ব্যক্তি-বিশেষের চিন্তা, অনুভূতি**

১ শিশু-মন সম্বন্ধে বহু পুস্তক রচিত হইয়াছে। তবে নিম্নলিখিত গ্রন্থদ্বয়ে বিভিন্ন লেখকের মনোজ্ঞ রচনা পাওয়া যাইবে :

(১) ***Manual of Child Psychology*** (Ed. by Leonard Carmichael); (২) ***Handbook of Child Psychology*** (Ed. by C. A. Murchison).

ও কার্যের উপর ঐরূপ মিথষ্ক্রিয়ার প্রভাব।[১০] পরিবার ও সমাজের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিবর্গের কৃষ্টি কিভাবে গড়িয়া উঠে, কিরূপে পরস্পরকে প্রভাবিত করে, কিরূপে জনমত গড়িয়া উঠে, কিরূপে সামাজিক আদর্শ ও কল্পনা রচিত হয়, জন-নেতৃত্ব কিরূপে সম্ভব হয়, জনতার ন্যায় ক্ষুদ্র জন-সমন্বয় হইতে আরম্ভ করিয়া জাতীয় মন পর্যন্ত বিভিন্ন জন-সমন্বয়ের মানসিক বৈশিষ্ট্য কি কি, উত্তেজনা, বিদ্রোহ, গণ-আন্দালন, যুদ্ধ ইত্যাদির সময় জন-মনের অবস্থা কিরূপ হয়, আন্তর্জাতিক উত্তেজনা বা তান (tension)-এর কারণ বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয় সমাজ-মনোবিত্যার আলোচনার অন্তর্ভুক্ত।

মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, সমাজ-মনোবিত্যার বিষয়-বস্তু হইল: (১) **ব্যক্তি-বিশেষের ব্যক্তিত্বের সহিত সমাজ ও সামাজিক কৃষ্টির সম্বন্ধ**, (২) **বিভিন্ন প্রকারের আন্তর্ব্যক্তিক ও আন্তর্গোষ্ঠীয় দ্বন্দ্ব** (inter-individual and inter-group conflict), (৩) **জন-ব্যবহার** (mass-behaviour)।

এই সব বিষয়ের আলোচনা-লব্ধ জ্ঞান ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর বা সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা করা হয়; যেমন,

(১) কিরূপে জনমত পরিমাপ করা যায়?

(২) কিরূপে প্রচার কার্য চালান হয়?

(৩) কিরূপে জনমত প্রভাবিত করা যায়?

(৪) কিরূপে জনগণের নৈতিক মনোবল (morale) রক্ষা করা যায়?

(৫) একদেশদর্শিতা, পক্ষপাতিত্ব (prejudice) ও কুসংস্কার (superstition) কতদূর প্রভাবশালী হয় এবং কিরূপে উহাদের দূর করা যায়?

(৬) বিভিন্নক্ষেত্রে—যথা ক্ষুদ্র দলের মধ্যে, পারিবারিক পরিবেশে, শিল্পায়তনে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে—তান বা উত্তেজনা (tension) কিভাবে প্রশমিত করা যায়?

১০ তুলনীয়: (১) Kimball Young, *A Handbook of Social Phychology*, p. 1: "Social Psychology is the study of persons in their interactions with one another and with reference to the effects of this interplay upon the individual's thoughts, feelings, emotions and habits."

(২) *Present-day Psychology*, Ed. by Roback, p. 376; "...Social Psychology has become increasingly concerned with the development of the individual in the broader context of the family and community with their complexity of cultural influences."

উপরের বর্ণনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সমাজ-মনোবিদ্যাকে বহুবিধ বিজ্ঞানের সাহায্য লইতে হয়। সমাজের বিবর্তনের ইতিহাস ও গঠন-ভঙ্গিমা জানিবার জন্য সমাজবিদ্যা (sociology) এবং ইতিহাসের সাহায্য লইতে হয়। বিভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্য জানিবার জন্য নৃতত্ত্ব (Anthropology)-এর জ্ঞান প্রয়োজন। শৈশব অবস্থা হইতে সামাজিক পরিবেশের মধ্যে কিভাবে ধীরে ধীরে ব্যক্তির মনে "অহং"-জ্ঞান জাগিয়া উঠে, অর্থাৎ "সামাজিক অহং-বোধ" (social self) দেখা দেয়, তাহা জানিবার জন্য শিশু-মনোবিদ্যার জ্ঞানের প্রয়োজন। সামাজিক জীবনের উন্নতির জন্য শিক্ষার মান ও আদর্শ নির্ধারণ করা প্রয়োজন ; সেইজন্য শিক্ষা-মনোবিদ্যা (Educational Psychology) ও শিক্ষা-বিজ্ঞান (Pedagogics)-এর সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। সামাজিক জীবনে নৈতিক আদর্শ (moral ideal)-এর এবং জীবন-দর্শনের প্রভাব জানিতে হইলে নীতিবিদ্যা (ethics) এবং দর্শন (philosophy) সম্বন্ধেও কিছু জানা প্রয়োজন।

সমাজ-জীবন সর্বদাই গতিশীল। সুতরাং যে সব বিজ্ঞান সামাজিক জীবনের কোন না কোন বিষয়ের আলোচনা করে সেগুলি সর্বদাই প্রগতিশীল। এই কারণে সমাজ-মনোবিদ্যার বিভিন্ন লেখকেরা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী, আলোচ্য বিষয়বস্তু ও আলোচনা-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন।[১১]

(খ) সংক্ষিপ্ত ইতিহাস :

প্রাণি-মনোবিদ্যা ও শিশু-মনোবিদ্যার উদ্ভবের পশ্চাতে যেমন ডারউইনের বিবর্তনবাদের প্রভাব বিদ্যমান, সেইরূপ সমাজ-মনোবিদ্যার পশ্চাতেও ডারউইনের প্রভাব আছে। শিশু-মনোবিদ্যার অন্যতম বিষয়-বস্তু হইল শিশু-মন কিভাবে ধীরে ধীরে কৈশোর ও যৌবনের সীমারেখায় উপস্থিত হয় ; সেইরূপ জাতির মন কিরূপে ধীরে ধীরে

১১ তুলনীয় : "These developments (of allied sciences) have thrown social-psychological research into a state of flux and influx—flux of what is to be considered the rightful subject-matter of social-psychology study and the influx of a multiplicity of approaches, concepts, methodologies, and theoretical models for interpreting the old and investigating the new...And no one technique is adequate to obtain the necessary data." (*Present-day Psychology*, p. 378).

বিবর্তনের পথে যায় তাহা আলোচনা করিবার ফলে সমাজ-মনোবিদ্যার উদ্ভব হয়[১২]।

জেম্‌স্ মার্ক বল্‌ডুইন্ (James Mark Baldwin)-রচিত *Mental Development in the Child and the Race* (১৮৯৫) প্রকাশের পর হইতে মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে জাতির বিবর্তনকে আলোচনা করা আরম্ভ হয়।

হার্বার্ট স্পেন্সার[১৩] তাঁহার *Principles of Sociology* (তিন খণ্ড—১৮৯৯) গ্রন্থে মানব-সমাজের বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করিবার প্রচেষ্টা করেন। তাঁহার *Synthetic Philosophy*-তে ব্যাখ্যাত বিবর্তন-বাদকে তিনি সমাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক কালে ইহাই সমাজ-মনের উপর রচিত প্রথম প্রামাণিক গ্রন্থ।

ইহার পর নাম করা যাইতে পারে গেব্রিয়েল টার্ডে (Gabriel Tarde)-রচিত *Laws of Imitation*-এর। ইহাতে তিনি দেখাইতে চাহেন যে, মানুষের বিভিন্ন ক্রিয়া একে অন্যের অনুকরণের ফলে সঞ্জাত হইয়াছে। মানব-মনের ক্রিয়া তিন প্রকারের—বাহ্য-জগতের উপর প্রতিক্রিয়া, অপর মনের উপর প্রতিক্রিয়া এবং স্বকীয় মনের উপর প্রতিক্রিয়া। ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত দুইটিরই মানব-মনের উপর সর্বাধিক প্রভাব।

এই যুগের আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইল ল্য বঁ (Le Bon)-রচিত *The Crowd* (১৮৯৫)। ইনি জনতার ব্যবহার (যাহা অযৌক্তিক ও উচ্ছৃঙ্খল) লইয়া আলোচনা করেন। ইনি বলেন যে, জনতার মধ্যে ব্যক্তি-বিশেষের ব্যবহার সমাজ-জীবনে নিম্নস্তরের লোকের অনুরূপ হয়।

বর্তমান শতকের সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য পুস্তক হইল উইলিয়াম ম্যাক্‌ডুগ্যালের *An Introduction to Social Psychology* (১৯০৮)। ইহাতে তিনি সহজ-প্রবৃত্তি (instinct) সম্বন্ধে তাঁহার অভিনব মতবাদ

১২ এক হিসাবে ডারউইনের পূর্বে বিবর্তনের কথা বলিয়াছিলেন কোঁৎ (August Comte)। তিনি বলেন যে, মানব-সমাজ প্রথমে ধর্মের স্তর, তাহার পর দার্শনিক আলোচনার স্তর এবং শেষ পর্যন্ত বাস্তব বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতার স্তরে আসিয়াছে।

১৩ 'Comparative Psychology' (তুলনামূলক মনোবিদ্যা) এই নামটি স্পেন্সার ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত তাঁহার রচনার নামলিপি হিসাবে সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন।

প্রচার করেন। এই সহজ-প্রবৃত্তি বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যাইবে; (১) প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান, (২) আবেগ বা প্রক্ষোভ, (৩) কার্য করিবার প্রচেষ্টা। প্রতি আবেগের মূলে থাকে সহজপ্রবৃত্তির তাড়না এবং প্রতি সহজপ্রবৃত্তির অন্তঃস্থলে আছে কোন না কোন আবেগ বা প্রক্ষোভ। ম্যাক্‌ডুগাল বলেন যে, সামাজিক জীবনের কার্যাবলী সহজাত প্রবৃত্তি (যাহাকে বলা হয় 'গতীয় উৎস' বা dynamic source) হইতে উদ্ভূত। (পৃঃ ৪১৮)।

ম্যাক্‌ডুগালের প্রভাবে অন্যান্য লেখকেরাও সহজ প্রবৃত্তির কথা বলিতে লাগিলেন এবং সকলেই কোন না কোন 'নূতন' সহজবৃত্তির উল্লেখ করিতে লাগিলেন। সামাজিক জীবনের সকল ব্যবহারকে এই 'গতীয় দৃষ্টিভঙ্গী' হইতে ব্যাখ্যা করা হইতে লাগিল। থর্ণডাইক্ তাঁহার *The Original Nature of Man* এবং উড্‌ওয়ার্থ তাঁহার *Dynamic Psychology* গ্রন্থে এই দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন। উইলফ্রেড ট্রটার (Wilfred Trotter)-এর *Instincts of the Herd in Peace and War* (১৯১৬) গ্রন্থে সমাজ-মনোবিদ্যার আলোচনা সম্পূর্ণরূপে সহজপ্রবৃত্তির আলোকে চালান হয়।

১৯১৯ সালে ডান্‌লাপ্ (Dunlap) সর্বপ্রথম সহজ-প্রবৃত্তির মতবাদের বিরোধিতা করেন। ইহার ফলে কয়েক বৎসর অনেক লেখক আবার সহজপ্রবৃত্তির মতবাদকে সমালোচনা করিতে সুরু করেন।

সমাজ-মনোবিদ্যার আলোচনা এতদিন বাচনিক দৃষ্টিভঙ্গী (theoretical standpoint) হইতে পরিচালিত হইতেছিল। পরীক্ষণ-পদ্ধতি (experimental method)-এর উপর ভিত্তি করিয়া সমাজ-মনোবিদ্যার আলোচনা সুরু করেন ভাল্‌ট্‌হের মোয়েডে (Walther Möde), হিউগো মুয়েনস্‌টের্‌বের্গ (Hugo Münsterberg) এবং এফ্. এইচ্. অল্‌পোর্ট (F. H. Allport)। অল্‌পোর্ট এই বিষয়ে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করেন এবং আমেরিকার লেখকদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। গার্ডনার মার্‌ফি (Gardner Murphy), নিউকোম (Newcomb) ইত্যাদি অনেকে "পরীক্ষণমূলক সমাজ-মনোবিদ্যা" (Experimental Social Psychology)-র উপর গ্রন্থ রচনা করেন।

অনেক লেখক আবার এক একটি জাতি লইয়া পরীক্ষণমূলকভাবে গবেষণা করেন। যেমন, ম্যালিনোস্কি (Malinowski) পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের ট্রোব্রিয়াণ্ড্ দ্বীপের অধিবাসীদের সামাজিক জীবন, এবং মার্গারেট্ মিড্ (Margaret Mead) সামোয়া দ্বীপের বালিকা ও কিশোরীদের জীবনী পর্যালোচনা করেন।

আমেরিকার কয়েকজন মনোবিৎ আর একটি পরীক্ষণমূলক প্রচেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন—ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'সামাজিক প্রলক্ষণ পরিমাপ' (sociometry)। বিভিন্ন গোষ্ঠী বা দলের মধ্যে বাস্তবক্ষেত্রে ব্যক্তি-বিশেষের কার্যাবলী পরিমাপের প্রচেষ্টার জন্যই ইহার এইরূপ নাম দেওয়া হইয়াছে। যেমন, কাহার সহিত ব্যক্তি-বিশেষ একত্র আহার করিতে বা অন্য কোন কার্য করিতে চাহে বা চাহে না, ব্যক্তি-বিশেষ কোন কিছু কিভাবে নির্বাচন করে, ইত্যাদি এই পদ্ধতি দ্বারা নির্ধারণের চেষ্টা হয়। জে. এল্. মোরেনো (J. L. Moreno), জেনিংস ইত্যাদির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

সমাজ-মনোবিদ্যার আলোচনার ফলে অনেক প্রকার অস্বাভাবিক ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়; সেই কারণে অনেকে আবার সমাজ-মনের আলোচনায় রোগি-পরীক্ষাপদ্ধতিও প্রয়োগ করিয়াছেন।[১৪]

বিভিন্ন বিজ্ঞান সমাজ-মনোবিদ্যাকে সাহায্য করিয়া থাকে; এই সব বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত সমাজ-মনোবিদ্যাও পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে। তাই জ্ঞানরাজ্যে সমাজ-মনোবিদ্যার অবদান আরও অধিক হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৪। শিক্ষা-মনোবিদ্যা বা শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিদ্যা (Educational Psychology):

(ক) বিষয়বস্তু:

শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিদ্যার প্রয়োগের ফলে পৃথক্ বিষয় ভাবে শিক্ষা-মনোবিদ্যার উদ্ভব হইয়াছে।

১৪ W. D. McKinnon, 'The Use of Clinical Method', *Journal of Social Issues* (1946.2), pp. 47-54 দ্রষ্টব্য।

আমাদের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, কাহাকেও কোন বিষয় শিখাইবার ইচ্ছা করিলেই শিখান যায় না। যাহাকে কিছু শিখাইতে হইবে, সে সেই বিষয় শিখিবার উপযুক্ত কি না এবং কিভাবে শিখাইলে সে তাহা সহজেই শিখিতে পারিবে—এই দুইটি বিষয় প্রথমেই অনুসন্ধান করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, এইজন্য যাহাকে শিখাইতে হইবে তাহার মনের গঠন ও ক্ষমতা সম্বন্ধে জ্ঞান সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এইখানেই দেখা দেয় শিক্ষামনোবিদ্যার আবশ্যকতা। শিক্ষামনোবিদ্যার কার্য কি? ইহার উত্তরে বলা যায়ঃ **কোন বিষয় সম্বন্ধে সুষ্ঠুভাবে স্বল্পকালে দীর্ঘস্থায়ী শিক্ষা কিরূপে দান করা যায় এবং উহা গ্রহণকালে শিশু-মন ও কিশোর-মন কিভাবে কার্য করে, তাহা বর্ণনা করাই শিক্ষা-মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য।**

এখন শিক্ষা-মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু বিশদ্‌ভাবে আলোচনা করা যাউক্ ঃ

(১) শিক্ষা-মনোবিদ্যাকে শিশু-মন লইয়া আলোচনা করিতে হইবে, এবং এই প্রসঙ্গে প্রথমে আলোচনা করিতে হইবে শিশুর মন কি পরিমাণে নমনীয় ও পরিবর্তনশীল। শিশু-মনের উপর বংশপ্রভাব (heredity) কতদূর কার্যকরী এবং বাহ্য পরিবেশ (environment) দ্বারা উহা কি ভাবে প্রভাবিত হয়, তাহা জানিতে হইবে।

(২) শিক্ষাদান-কালে ইহা লক্ষ্য করা যায় যে, ছাত্র-ছাত্রীর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য জন্মগত বা সহজাত (innate), আবার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য অভিজ্ঞতা ও আয়াসলব্ধ (acquired)। সহজাত এবং অভিজ্ঞতালব্ধ বৈশিষ্ট্যগুলির ব্যাপকতা এবং উহাদের সহিত বুদ্ধি, অনুভূতি ও স্মৃতির সম্বন্ধ শিক্ষা-মনোবিদ্যার বিবেচ্য বিষয়।

(৩) বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন ছাত্র-ছাত্রীর সকল বিষয়ে শিক্ষালাভের ক্ষমতা থাকে না—এই কারণে শিক্ষণীয় বিষয়ের পর্যায় ও ক্রমবিভাগ প্রয়োজন। সুতরাং শিশু-মন কিরূপে বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে কিশোর মনে পরিণতি লাভ করে, তাহা শিক্ষা-মনোবিদ্যা আলোচনা করে।

(৪) যে-কোন বিষয় শিক্ষাদানের প্রধান পথ ইন্দ্রিয়সমুদয়। ইহাদের মাধ্যমেই আমরা প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করি। সুতরাং ইন্দ্রিয়লব্ধজ্ঞানের সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং উহাদের কিভাবে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা যায় তাহা শিক্ষা-মনোবিদ্যা আলোচনা করে।

(৫) শিক্ষিতব্য বিষয় একবার আয়ত্ত করাই যথেষ্ট নহে ; পঠিত বিষয়গুলি মনে রাখিতে হইবে। অর্জিত শিক্ষাকে মন কতদূর জাগরূক রাখিতে পারে তাহা জানিবার জন্য স্মৃতিশক্তির স্বরূপ, প্রাখর্য, উহার উন্নতির উপায় ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা-মনোবিদ্যা আলোচনা করে।

(৬) শিশু-মন কল্পনাপ্রবণ। এই কল্পনার ভাল-মন্দ দুইটি দিকৃই আছে। এই কল্পনাশক্তিকে কিভাকে নিয়ন্ত্রণাধীন করিয়া সুপথে পরিচালিত করা যায় তাহা শিক্ষা-মনোবিদ্যার একটি আলোচ্য বিষয়।

(৭) শিশু ও কিশোর মনে অনুভূতির প্রভাব অপরিসীম। সুতরাং শিক্ষককে দেখিতে হইবে কিভাবে সুখকর অনুভূতিগুলি জাগরিত করিয়া শিক্ষার সহায়ক হিসাবে উহাদের ব্যবহার করা যাইতে পারে। এইজন্য শিশু ও কিশোর মনে অনুভূতি ও আবেগের স্থান শিক্ষা-মনোবিদ্যাকে জানিতে হইবে।

(৮) শিক্ষাদানের সুষ্ঠু প্রণালী নিরূপণ করিতে যাইয়া শিক্ষা-মনোবিদ্যাকে শিক্ষণ (learning)-এর মূলনীতি কী তাহা জানিতে হইবে। আবার জানার বা শিক্ষণের পথে প্রধান অন্তরায় অবসাদ বা ক্লান্তি (fatigue) ও বিরক্তি (irritability) ; কি করিয়া এইগুলিকে দূর করিয়া শিশুর পক্ষে জ্ঞান-আহরণের পথ মসৃণ করিয়া তুলিতে পারা যায়, তাহাও শিক্ষা-মনোবিদ্যা আলোচনা করিবে।

(৯) শিক্ষাদান-কালে শিক্ষকমাত্রেই ছাত্র-ছাত্রীর বুদ্ধির বিভিন্নতা লক্ষ্য করেন। বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে শিক্ষাদান-ব্যাপারেও পার্থক্য করিতে হইবে। সুতরাং বুদ্ধি 'বস্তু'-টি কী, তাহার পরিমাপ কতদূর ও কিভাবে করা যায় তাহা শিক্ষা-মনোবিদ্যা আলোচনা করে।

(১০) বিভিন্ন ক্রীড়ার মধ্য দিয়া কর্মমুখর শিশুর মন আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে। ক্রীড়ার মধ্যে সে প্রাপ্তবয়স্কদের অনুকরণের চেষ্টা করে। সুতরাং ক্রীড়াচ্ছলে তাহাকে শিক্ষাদানের উপায় এবং তাহার অনুকরণীয় আদর্শনির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ও শিক্ষা-মনোবিদ্যা আলোচনা করিবে।

(১১) মানবমনের প্রক্ষোভ বা আবেগ, প্রেরণা ও সহজবৃত্তিগুলি যদি সম্যক্ প্রকাশলাভের পথ হইতে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে মানবমনের সাম্যভাব

নষ্ট হইয়া যায় এবং বিভিন্ন দুষ্প্রবৃত্তি ও অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। মানবমন সম্বন্ধে সাধারণভাবে যাহা বলা হইল, তাহা শিশু-মনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সুতরাং শিক্ষকের অন্যতম কর্তব্য হইল ছাত্র-ছাত্রীর মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখা। অতএব ইহাও শিক্ষা-মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়।

(১২) শিক্ষাসমাপনান্তে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে দেখা দেয় ভবিষ্যৎ বৃত্তি সম্বন্ধে চিন্তা। সকলেই সকল বৃত্তির উপযোগী নয়। আদর্শ শিক্ষকের কর্তব্য হইল কোন্ ছাত্রের কোন্ বৃত্তির প্রতি অনুরাগ আছে তাহা নিরূপণের প্রচেষ্টা এবং সেই অনুসারে তাহাকে সেই বৃত্তির উপযোগী করিয়া তোলা। সুতরাং কিভাবে ভবিষ্যতের বৃত্তিনির্ধারণে ছাত্রদের সাহায্যদান (vocational guidance) করা যাইতে পারে তাহার আলোচনাও শিক্ষা-মনোবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত।

(খ) সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:

শিক্ষাবিদ্যার (Pedagogy) উন্নতির ফলে শিক্ষাবিৎরা দেখিলেন যে, যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কতকগুলি তথ্য গলাধঃকরণ করানোর নাম শিক্ষা নহে। প্রকৃত শিক্ষা দান করিতে হইলে ছাত্র-ছাত্রীর মানসিক গঠন-বৈশিষ্ট্য এবং মানসিক ধর্ম জানা একান্ত প্রয়োজন।

জঁা জাক্ রুসো (Jean Jaques Rousseau), পেস্টালোৎসি (Pestalozzi) এবং ফ্রোয়েবেল (Froebel) ইত্যাদি শিক্ষাদানের নূতন পদ্ধতি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা এইজন্য মনোবিদ্যার সাহায্য লওয়া একান্ত প্রয়োজন বোধ করেন। এইভাবে শিক্ষাবিদ্যা মনোবিদ্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিদ্যার এই প্রয়োগের ফলে শিক্ষা-মনোবিদ্যা নামে মনোবিদ্যার এক পৃথক্ শাখার অভ্যুদয় হয়।

যোহান্ ফ্রীড্‌রিশ্‌ হারবার্ট (Johann Friedrich Herbart)-কে শিক্ষা-মনোবিদ্যার আদি পথিকৃৎদের অন্যতম বলা যাইতে পারে। মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে হারবার্টের প্রধান অবদান হইল সংপ্রত্যক্ষ (apperception)। তিনি দেখান যে, যখন কোন উদ্দীপকের ফলে সংবেদন হয়, তখন আমাদের অভিজ্ঞতা কেবলমাত্র ঐ উদ্দীপকেই সীমাবদ্ধ থাকে না; অবচেতনস্তরে ঐ উদ্দীপকের সহিত সংশ্লিষ্ট

পূর্ব-অভিজ্ঞতার আলোকে ঐ নূতন উদ্দীপকের ব্যাখ্যা হয়। পূর্ব-অভিজ্ঞতার আলোকে নূতন উদ্দীপকের ব্যাখ্যারই নাম সংপ্রত্যক্ষ। হারবার্ট মনে করেন যে, শিশুকে শিক্ষাদানের সময় যদি তাহার পুরাতন অভিজ্ঞতার সাহায্য লওয়া যায়, অর্থাৎ পুরাতন অভিজ্ঞতার মধ্যে যদি নূতন অভিজ্ঞতার আত্তীকরণ (assimilation) হয়, তাহা হইলে সে সহজেই নূতন উদ্দীপক বা নূতন ধারণার অর্থ বুঝিতে পারিবে। যেমন, যে সাগর দেখে নাই, তাহাকে পুষ্করিণী বা নদীর উপমার সাহায্যে উহা বুঝাইতে হইবে। সুতরাং প্রাক্তন অভিজ্ঞতার ভিন্নতা অনুসারে একই উদ্দীপকের প্রয়োগে বিভিন্ন ব্যক্তির মনে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। হারবার্ট সমগ্র শিক্ষা-প্রণালীকে সংপ্রত্যক্ষের উপর ভিত্তি করিয়া রচনা করেন।

কোন বিষয়ে সহজে শিক্ষালাভ করিতে হইলে স্মৃতির প্রাখর্য প্রয়োজন। এবিংহাউস (Ebbinghaus) স্মৃতিসম্বন্ধে অনুসন্ধান-কার্য চালান। তিনি স্বল্প আয়াসে কার্যকুশলতা (skill)-লাভের বিষয়ে এবং স্মৃতি-প্রসর (memory span)-বৃদ্ধি ইত্যাদি উপায়ে স্মৃতির উন্নতি বিধানের জন্য কতকগুলি সূত্র আবিষ্কার করেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে এইগুলি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

গ্যাল্‌টন্ (Galton)-এর গবেষণাও শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু সহায়তা করে। তিনি আধুনিক প্রশ্নাবলী-প্রণালী (questionnaire method)-এর অনুরূপ পদ্ধতিতে প্রতিরূপ-সমষ্টি (imagery) সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান চালান (পৃঃ ৬১৪)। তিনি ইন্দ্রিয়গুলি ও উহাদের শক্তি (faculty), স্মৃতি, ক্লান্তি (fatigue), যূথচারিতা বা দলবদ্ধ হইয়া থাকার সহজ প্রবৃত্তি (gregariousness) ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধান করেন, এবং ব্যক্তিগত পার্থক্য (individual differences) নিরূপণে তাঁহার গবেষণা বিশেষ সহায়তা করে। মানসিক প্রলক্ষণ (traits)-এর পারম্পর্য (correlation) সম্বন্ধে গ্যাল্‌টনের প্রদর্শিত পথে চলেন পিয়ারসন্, বার্ট, টম্‌সন্ এবং স্পিয়ারম্যান্।

আল্‌ফ্রেড্ বিনে (Alfred Binet) বুদ্ধি পরীক্ষার জন্য যে-সব উপায় উদ্ভাবন করেন, সেইগুলিও শিক্ষার ব্যাপারে সহায়তা করে। কারণ

বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে কে কোন্ বিষয়ে শিক্ষালাভের উপযোগী তাহা নির্ধারণ করার সুবিধা হয় (৭ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হইল অপরাধপ্রবণতা (delinquency)-নিরোধ এবং চারিত্রিক সংশোধন। এই বিষয়ে উইলিয়াম্ হিলি (William Healy) এবং সিরিল্ বার্ট (Cyril Burt)-এর উদ্যম উল্লেখযোগ্য।

শিশু-বিদ্যালয়ে কঠোর শাস্তি-বিধানের প্রথা তুলিয়া দিয়া "মুক্ত আব্-হাওয়ার" মাধ্যমে শিশুকে রাখিলে তাহার স্বাভাবিক বৃত্তি (natural faculties) প্রকাশ পায়। এই অভিমত রুশো, ফ্রোয়েবেল, মণ্টেসরি ইত্যাদি অনেকেই প্রকাশ করেন। ইংলণ্ডে এই মতবাদ সমর্থন করিয়া আন্দোলন চালান নীল্ (Neill), বার্ট্রাণ্ড রাসেল্ ও তাঁহার দ্বিতীয় পত্নী ডোরা রাসেল্।

সুসান আইজাক্স (Susan Isaacs) শিশুর বয়ঃক্রম অনুসারে তাহার মনের ও বুদ্ধির কিরূপ তারতম্য ঘটে তাহা লইয়া পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন তাঁহার *Intellectual Growth in Young Children* নামক গ্রন্থে।

কৈশোর ও বয়ঃসন্ধিক্ষণ (adolescence) সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করেন ষ্ট্যান্লি হল্ (১৯০৪ সালে); তাঁহার পরে কোলে (Cole), ক্রাম্পটন (Crampton), ডিয়ারবর্ণ (Dearborn), রথ্নে (Rothney), বার্ট ইত্যাদিও এই বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন।

শিশুর নির্জ্ঞান বা অবচেতনস্তর ও পরবর্তী জীবনে উহার প্রভাব সম্বন্ধে মনঃসমীক্ষণবাদীদের আলোচনা শিশু-শিক্ষার সমস্যা-সমাধানে যথেষ্ট আলোকপাত করিয়াছে।[১৫]

৫। শিল্পীয় মনোবিদ্যা (Industrial Psychology):

(ক) বিষয়বস্তু:

শিল্পীয় উৎপাদনের জন্য যে কেবল যন্ত্র ও উপাদানের প্রয়োজন তাহা নহে; প্রতি উৎপাদনের পশ্চাতে আছে মানবমন। শিল্পীয় উৎপাদনের

১৫ শিশু-মনোবিদ্যায় যাঁহাদের অবদানের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহারা সকলেই শিক্ষা-মনোবিদ্যার উন্নতিতে সহায়তা করিয়াছেন।

পশ্চাতে যে-সব মানুষেরা কাজ করে তাহারা আমাদেরই মত। আশা-আকাঙ্ক্ষা, আবেগ, প্রবৃত্তি, পটুত্ব ইত্যাদি সব কিছুই তাহাদের আছে; আবার এই সব বিষয়ে তাহাদের পরস্পরের পার্থক্যও আছে। **উৎপাদনের পশ্চাতে এই সব 'মানবীয় উপাদান' (human materials)-এর মানসিক শক্তি ও যোগ্যতা নির্ধারণ এবং তদনুসারে শিল্পোৎপাদনে সহায়তা দানের প্রচেষ্টা হইতে 'শিল্পীয় মনোবিদ্যার' উদ্ভব হইয়াছে।**

শিল্পীয় মনোবিদ্যার সমস্যাগুলি মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়—কতকগুলি কার্য-সম্বন্ধীয় এবং বাকীগুলি কর্মী বা শ্রমিক সম্বন্ধীয়। অবশ্য ইহারা পরস্পর জড়িত।

শ্রমিক বা কর্মীর কর্মদক্ষতা বাড়াইতে হইলে যাহা কর্মীর মনে ক্লান্তি ও বিরক্তির সৃষ্টি করে তাহা দূর করিতে হইবে এবং যাহা তাহাকে আকৃষ্ট করে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই অবস্থা কিভাবে আনয়ন করা যায় তাহা জানিবার জন্য মনোবিদ্যার সাহায্য লইতে হয়। সুতরাং মনোবিদ্যাকে নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দানের চেষ্টা করিতে হয়:

(১) শিল্পায়তন ও শিল্পক্ষেত্রের পারিপার্শ্বিক উন্নতিবিধান কি করিয়া করা যাইবে?[১৬]

(২) একই প্রকারের কার্য দিনের পর দিন করিয়া যাইলে শ্রমিকের মনে বিরক্তি দেখা দিবে; সুতরাং কিভাবে কার্যে বৈচিত্র্য আনা যায়?

(৩) উপযুক্ত কোন্ বেতনে শ্রমিকের মানসিক তৃপ্তি আসিতে পারে? শ্রমিকের আহার, বাসস্থান ইত্যাদির ব্যবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত?

(৪) শ্রমিকদের পরস্পরের মনে কিভাবে সৌহার্দ্য এবং সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার ভাব আনা যায়?

---

১৬ উত্তরে বলা যায় যে, প্রয়োজনমত শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণ, উজ্জ্বল আলোর ব্যবস্থা, কর্কশ ও তীক্ষ্ণ শব্দের হ্রাস ইত্যাদি দ্বারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতিবিধান করা যাইতে পারে।

আবার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হইতে পারে। যেমন, একজন খর্বাকৃতি লোককে হয়ত' কারখানায় পায়ে করিয়া একটি যন্ত্র ক্রমাগত টিপিতে হয় এবং টিপিবার জায়গাটি একটু উঁচুতে। ইহাতে তাহাকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয়। কিন্তু যদি ঐ শ্রমিকটির মাটিতে না দাঁড়াইয়া একটু উঁচু জায়গায় (ছোট 'প্ল্যাট্‌ফর্মে') দাঁড়াইবার ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে তাহার পা'কে কেবল উঁচুতে তুলিবার পরিশ্রম কম হয়; এবং এই ভাবে তাহার কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে, অন্ততঃ ক্লান্তির সম্ভাবনা কমিয়া যাইবে।

(৫) শ্রমিকের দেহযন্ত্রকে সবল রাখিবার জন্য ক্রীড়াদির ব্যবস্থা কিরূপ করা যাইতে পারে?

(৬) দেহযন্ত্রকে অটুট্ রাখিতে যেমন পরিশ্রমের প্রয়োজন, সেইরূপ দেহযন্ত্রের বিশ্রামেরও প্রয়োজন। এই বিশ্রামদানের জন্য কি করা উচিত? দিনে কয় ঘণ্টা পরিশ্রম করা উচিত? কয় ঘণ্টা নিদ্রার প্রয়োজন?

(৭) শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির ভাব কি করিয়া স্থাপন করা যায়? কি ভাবে ধর্মঘটের সম্ভাবনা প্রতিরোধ করা যায়?

(৮) আকস্মিক দুর্ঘটনা (accident) কেন ঘটে? উহার প্রতিরোধের কী উপায়?

এক একজন ব্যক্তির এক এক প্রকার কার্য করিবার ক্ষমতা আছে। সকলে সকল কার্যের উপযুক্ত নহে। সুতরাং শিল্পীয় মনোবিদ্যাকে আবার নিম্নলিখিত প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হয়:

(১) ব্যক্তিগত যোগ্যতা নির্ধারণের মান কি?

(২) কাহার কোন্ কার্যের প্রতি অনুরাগ আছে, তাহা কি করিয়া স্থির করা যাইবে?

(৩) শ্রমিকের আবেগ, প্রবৃত্তি ইত্যাদি কিভাবে এবং কতদূর তাহার কার্য-কুশলতাকে প্রভাবিত করে?

(৪) ব্যক্তিগত পার্থক্য কিরূপে নিরূপণ করা যায়? বয়সের পার্থক্য, যৌন পার্থক্য, জাতিগত পার্থক্য ইত্যাদির প্রভাব কিরূপ?

(৫) চা ও কফি পান, মদ্যপান, ধূমপান ইত্যাদির ফল শ্রমিক জীবনের উপর কিরূপ?[১৭]

---

১৭ আমরা উপরে শিল্পীয় মনোবিদ্যার কতকগুলি প্রধান সমস্যার উল্লেখ করিলাম। মনোবিদ্যার প্রসারের সহিত শিল্পীয় মনোবিদ্যাও ব্যাপকতা লাভ করিতেছে। **বিজ্ঞাপন দ্বারা** কিভাবে ক্রেতার **মনোযোগ আকর্ষণ** করা যায়, বিক্রয়কারী কিভাবে **বিক্রয়-কার্যে দক্ষতা** অর্জন করিতে পারে (অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে বলে salesmanship) তাহাও শিল্পীয় মনোবিদ্যা আলোচনা করে। মোট কথা, শ্রমিক, মালিক, বিক্রেতা ও ক্রেতা—এই চারি দলের মনোভাব লইয়াই শিল্পীয় মনোবিদ্যা অনুসন্ধান কার্য চালায়। আভেলিং (Aveling) এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন: "...Psychology has much to offer to worker, employer, distributor, salseman and even consumer.... Our increasing knowledge of will and character-qualities will be found as applicable to industrial conditions as our knowledge of intelligence and special aptitudes has already been...An illustration may already be found in the psychology of advertising and salesmanship." (*An Outline of Modern Knowledge*, Ed. by W. Rose, p. 346).

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস :

শিল্পী ও শ্রমিকদের সমস্যা লইয়া কিছু কিছু আলোচনা বহু পূর্ব হইতেই চলিতেছিল। ১৫৬৭ সালে *Miners' Sickness* নামে এক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে Ramazzini *Diseases of Tradesmen* নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তবে মনোবিস্তার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে শিল্পি-মন সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হয় অতি আধুনিক কালে। সাধন (practice) এবং তাহার ফলে ক্লান্তি (fatigue) লইয়া আধুনিক কালে আলোচনা স্বরু করেন এমিল্ ক্রেপেলিন্ (Emil Kraepelin)। ইনি ছিলেন ভুণ্ড্টের ছাত্র। ক্লান্তি, ক্ষুধা, মাদকদ্রব্য গ্রহণ ইত্যাদির ফলে কী মানসিক বৈলক্ষণ্য দেখা যায় তাহা লইয়া তিনি গবেষণা করেন। তাঁহার গবেষণাগারে সাধন ও ক্লান্তি সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান্ উপাত্ত পাওয়া যায়। তাঁহার পরে অনেকে—যথা, আরাই (Arai),[১৮] ফিলিপ্স্, এণ্ট্ভিস্লে (Entwistle), ফ্লুগেল (Flugel) ইত্যাদি—ক্লান্তি সম্বন্ধে গবেষণা চালান। তবে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হইতেই শিল্পীয় মনোবিস্তার পৃথক্ সত্তা স্বীকৃত হয়; কারণ, যুদ্ধের সময় বিশেষ বিশেষ কার্যের জন্য উপযুক্ত কুশলী লোকের নির্বাচন একান্ত প্রয়োজন। সেইজন্য যোগ্য লোকের নির্বাচনে মনোবিস্তার সাহায্য অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে।[১৯] তাহার পর আমেরিকা ও ইউরোপের প্রায় সকল দেশেই শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রে মনোবিদের সাহায্য লওয়া হইতে লাগিল। ইংলণ্ডে দুইটি প্রতিষ্ঠান আছে যাহা শিল্পক্ষেত্রে মনোবিস্তার প্রয়োগ লইয়া অনুসন্ধান চালায়। একটি হইল সরকারী প্রতিষ্ঠান—নাম Industrial Health Research Board; আর একটি হইল বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান, ১৯২০ সালে সি. এস্. মায়ার্স

১৮ আরাই ক্লান্তি সম্বন্ধে একটি অভিনব পরীক্ষা করেন। তিনি কয়েক দিন ধরিয়া বার ঘণ্টা করিয়া একটির পর একটি চতুরঙ্ক সংখ্যাকে অপর একটি চতুরঙ্ক সংখ্যা দিয়া গুণ করিয়া দেখিলেন মানসিক ক্লান্তি কতদূর আসে।

১৯ প্রথম মহাযুদ্ধের সময় শিল্পক্ষেত্রে ক্লান্তি ও দক্ষতা (efficiency) সম্বন্ধে বিভিন্ন পরীক্ষণের বর্ণনা পাওয়া যাইবে ভার্নন (Vernon)-প্রণীত *Industrial Fatigue and Efficiency*-নামক গ্রন্থে।

(C. S. Myers) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত—নাম National Institute of Industrial Psychology।

শিল্পীয় মনোবিদ্যা সম্বন্ধে প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইল মুয়েন্‌স্টের্‌বের্গ-রচিত *Psychology and Industrial Efficiency*—ইহা ১৯১৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার পর কর্মক্ষেত্রের বাস্তব সমস্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধান যাঁহারা চালান তাঁহাদের ভিতর টেলর এবং গিল্‌ব্রেথ (Taylor ও Gilbreth)-এর নাম উল্লেখযোগ্য; এবং কর্মীর মানসিক অবস্থার প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনাকারীদের মধ্যে এম্. কুল্‌পিন্ (M. Culpin) ও মে স্মিথ্ (May Smith)-এর নাম করা যাইতে পারে। দুর্ঘটনার কারণ ও প্রতিরোধ সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করেন আমেরিকার শ্লোকোম্ব (Slocombe) ও তাঁহার সহকর্মিগণ। প্রতি কর্মীর ব্যক্তিগত জীবন ও কার্যের উপর সমগ্র গোষ্ঠীর প্রভাব (group influence), কর্মক্ষেত্রে বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা, বৈচিত্র্যসৃষ্টির আবশ্যকতা ইত্যাদি বিষয়ে মৌলিক গবেষণা করেন হার্‌ভার্ডের জি. ই. মেয়ো (G. E. Mayo) এবং তাঁহার সহকর্মী রোয়েথ্‌লিস্‌বের্গের (Roethlisberger) ও ডিক্‌সন্ (Dickson)। বর্তমানে বহু মনোবিৎ মনোবিদ্যার এই শাখায় গবেষণা করিতেছেন।

৬। অস্বভাবি-মনোবিদ্যা (Abnormal Psychology):

(ক) বিষয়বস্তু:

মনোবিদ্যার যে শাখা অস্বভাবী বা অস্বাভাবিক মনের বৈচিত্র্য লইয়া আলোচনা করে, তাহাকে অস্বভাবি-মনোবিদ্যা আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে 'অস্বভাবি-মন' কাহাকে বলে?

সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিকের মধ্যে কোন স্পষ্ট সীমারেখা টানা যায় না। একজন এক বিষয়ে স্বাভাবিক ব্যবহার দেখাইতে পারে, অথচ অপর কোন ব্যাপারে সেই একই ব্যক্তি অস্বাভাবিক ব্যবহার দেখাইতে পারে। ব্যবহারের যে সাধারণ মান আছে তাহা হইল স্বাভাবিক, স্বভাবী বা স্বমিত (normal); আর তাহা হইতে অত্যধিক ব্যতিক্রমে যে ব্যবহার প্রকাশ পায়, তাহাই হইল অস্বাভাবিক বা অস্বভাবী

(abnormal)। যেমন, কোন গোষ্ঠীর সাধারণ ব্যবহারের (average behaviour of the group) তুলনায় কোন ব্যক্তি বিচিত্র ব্যবহার দেখাইলে তাহা অস্বভাবী ব্যবহার। আবার একজন ব্যক্তি দৈনন্দিন জীবনে সচরাচর যে ব্যবহার দেখাইয়া থাকেন, তাহাই হইল তাঁহার স্বাভাবিক ব্যবহার এবং উহার বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটিলে উহা হইবে তাঁহার পক্ষে অস্বভাবী ব্যবহার।

অস্বভাবী মন বলিতে অনেকে কেবলমাত্র অসুস্থ মন, বাতুল বা পাগলের মন বা অবাঞ্ছনীয় মানসিক অবস্থা বুঝিয়া থাকেন; এগুলি অস্বাভাবিকতার লক্ষণ সন্দেহ নাই—কিন্তু এইগুলি অবর-স্বভাবী (sub-normal)। অ-স্বভাবী মন বলিতে আবার পর-স্বভাবী বা অতিস্বভাবী (super-normal) মনও বুঝায়; যেমন, প্রতিভাশালী ব্যক্তিও (genius) 'স্বাভাবিক' ব্যক্তিদের গোষ্ঠীর বহির্ভূত বলিয়া 'অস্বভাবী' রূপে গণ্য হইবেন। স্মৃতিভ্রংশতা যেমন অস্বভাবী বৃত্তি, সেইরূপ স্মৃতির অতিপ্রাথর্যও অস্বভাবী।

অস্বভাবী বলিতে কেবলমাত্র মানসিক রোগগ্রস্ত (pathological) বুঝায় না। মানসিক রোগীরা অ-স্বভাবী বটেই; তাহা ছাড়া, সাধারণ বাতিক (চল্‌তি ভাষায় যাহাকে 'ছিটু' বলে এবং ইংরাজীতে যাঁহাকে idiosyncrasy বলে) ও মুদ্রাদোষও অস্বভাবী মনের পরিচায়ক। যে চিত্তভ্রংশী বাতুলতা (dementia præcox) বা খেদোন্মত্ত বাতুলতা (manic depressive insanity) রোগে ভুগিতেছে সেও যেমন অস্বভাবী, সেইরূপ কোন কিছু স্মরণ করিতে যে কেবলই মাথা চুলকায়, অথবা রোগের ভয়ে যে কেবলই ঔষধ খায়, বা পাছে নিজেকে অসুন্দর দেখায় বলিয়া যে সর্বদাই সাজপোষাক করিয়া থাকে সেও অস্বভাবী।

আবার কেহ কেহ মনে করেন যে, অস্বভাবী ব্যক্তি মাত্রই অবাঞ্ছিত ব্যক্তি। একথা সত্য যে, অপরাধপ্রবণতা ইত্যাদি অস্বাভাবিক মনোবৃত্তি অবাঞ্ছনীয়; কিন্তু স্মৃতিদৌর্বল্যে যিনি ভুগিতেছেন তাঁহাকে অবাঞ্ছিত লোক বলা অন্যায় হইবে।

এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে 'স্বাভাবিক' (normal) পদটির পরিমাণগত (quantitative) ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। কোন প্রলক্ষণ (trait)-কে স্বাভাবিক বলা হয়, যদি উহা

কোন 'গোষ্ঠীর কেন্দ্রিক প্রবণতা' (central tendency of the group) বা 'গড়পড়তা' (average) নির্দেশ করে। কোন গোষ্ঠীর মধ্যে কোন প্রলক্ষণ (trait) যখন স্বাভাবিকভাবে বণ্টিত (distributed) থাকে, তখন উহার বিভিন্ন পরিমাণের অস্তিত্বকে চিত্রলেখ বা গ্রাফ্ (graph)-এ যে সমস্ত বিন্দু দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, তাহাদের যোগ দিলে একটি ঘণ্টাকৃতি প্রতিসাম্য বিশিষ্ট-বক্ররেখা (bell-shaped symmetrical curve) পাওয়া যায়। উহাকে বলা হয় 'স্বাভাবিকতা নির্দেশক রেখা' (normalcy curve)। অবশ্য ইহা হইল আদর্শ; সকল বাস্তব ক্ষেত্রে যে রেখাটি প্রতিসাম্য বিশিষ্ট হইবে তাহা নহে—ইহা একদিকে অসমভাবে বক্র (skewed) হইয়া যাইতে পারে। যাহা হউক, যদি কোন প্রলক্ষণের পরিমাণ ঘণ্টাকৃতি রেখার বাহিরে পড়ে, তাহা হইলে উহা হইবে 'অস্বাভাবিক' (anormal বা abnormal)[২০]।
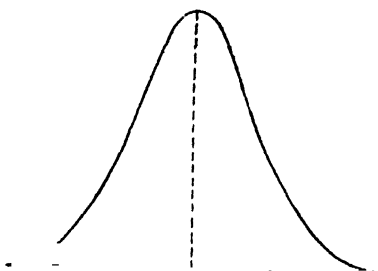
স্বাভাবিকতার নির্দেশক ঘণ্টাকৃতি বক্ররেখা
(Normalcy Curve)

আমরা উপরে 'অস্বভাবী' পদের ব্যাপক ও বৈজ্ঞানিক অর্থ আলোচনা করিলাম। তবে অস্বভাবি-মনোবিদ্যার লেখকেরা যে তাঁহাদের গ্রন্থে সকল ক্ষেত্রে অবর-স্বভাবী মনের সহিত পরস্বভাবী বা প্রতিভাশালী মনেরও আলোচনা করিয়াছেন তাহা নহে। বর্তমান শতকের প্রারম্ভে জ্যাস্ট্রো

২০ পরিসংখ্যান বিজ্ঞান (Statistics)-এর দৃষ্টিভঙ্গী হইতে 'স্বাভাবিকতা' ও 'অস্বাভাবিকতা' এই পদদ্বয়ের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দিয়াছেন J. W. Bridges তাঁহার *Psychology : Normal and Abnormal* নামক গ্রন্থে (উহার পৃঃ ১৪-২৭ দ্রষ্টব্য)।

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠিতে পারে : অস্বভাবী কে? উত্তরে বলা যাইতে পারে, আমরা প্রত্যেকেই অস্বভাবী—সবাই 'পাগল'। কেহ সাজপোষাকে, কেহ পড়াশুনায়, কেহ খাওয়া-দাওয়ায়, কেহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে, কেহ অপরের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টায়, কেহ নেশার ব্যাপারে, কেহ স্নেহ, প্রেম, ক্রোধ, ভয় ইত্যাদি আবেগের ক্ষেত্রে 'পাগল'! তবে সকল ক্ষেত্রেই এই 'পাগলামি' বা অস্বাভাবিকতা এরূপ তীব্র আকারের হয় না যে তাহার জন্য ব্যক্তি-বিশেষকে উন্মাদাগারে আশ্রয় লইতে হয়। (তুলনীয় : "*Every* person is abnormal in *some* respects")।

(Jastrow) অস্বভাবি-মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করিয়া বলিয়াছেন যে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ইহার অন্তর্ভুক্ত[২১] :

(১) বিভিন্ন প্রকারের অধ্যাস ও অমূল প্রত্যক্ষ (illusion and hallucination)।

(২) সমাধি (trance), সংবেশন (hypnotism), স্বতঃক্রিয়া (automatism)।

(৩) মাদকদ্রব্য গ্রহণ এবং মনের উপর উহার প্রতিক্রিয়া এবং অসুস্থ দেহের অবস্থা (psychic effects of drugs and intoxicants and of diseased bodily conditions)

(৪) বার্ধক্যাবস্থায় ক্ষমতার দৌর্বল্য (impairment of the faculties in old age)।

(৫) সামাজিক অব্যবস্থায় বা অন্য কোন তীব্র উত্তেজনার প্রভাবে (যথা, ভয় ও অন্য কোন 'মানসিক সংক্রমণ'-এর ফলে) ব্যক্তি-বিশেষের অথবা গোষ্ঠী-বিশেষের অস্বাভাবিক মানসিক বিকার।

(৬) সাধারণ নীতি বা বুদ্ধির অগোচর বাস্তব বা কাল্পনিক কোন অতীন্দ্রিয় সত্তার প্রকাশ। (যথা, আবেগ, দূরস্থ মনের সহিত সংযোগ বা telepathy)।

(৭) কোন মানসিক শক্তির ব্যাহত প্রকাশ অথবা বিনাশ, যাহার ফলে মানসিক অসুস্থতা বা বাতুলতা দেখা যায়।

বিভিন্ন লেখক কর্তৃক 'অস্বভাবী' পদটি এইরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে একমাত্র মানসিক রোগের এবং অবর-স্বভাবী (subnormal) লক্ষণের আলোচনাই অস্বভাবি-মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু হইয়া পড়িল।[২২]

যদিও বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে 'অস্বভাবি-মনোবিদ্যার' কথা খুব শুনা যাইত, অতি আধুনিক কালে এই নামটি বেশী ব্যবহৃত হয় না। মনঃসমীক্ষণ

২১ *Dictionary of Philosophy and Psychology* (Macmillan. New York, 1901) দ্রষ্টব্য।

২২ ডঃ ম্যাকডুগাল তাঁহার *Outline of Abnormal Psychology* গ্রন্থে (পৃঃ ১) 'abnormal psychology' পদটি সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন ; তিনি বলেন যে, ইহার বিষয়বস্তু হইল 'মনের কার্মিক বিকলতা'। তাঁহার ভাষায় : "I ask the reader to pardon my use of the expression 'abnormal psychology' in the restricted sense of psychology of functional disorders."

(psychoanalysis)-এর প্রসারের ফলে 'স্বভাবী' ও 'অস্বাভাবী'-র মধ্যে পার্থক্য ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে লাগিল এবং পৃথক্‌ভাবে অস্বভাবি-মনের আলোচনার প্রয়োজনীয়তা বেশী রহিল না। আবার রোগি-পরীক্ষামূলক মনোবিদ্যা (Clinical Psychology)-র উদ্ভবের সহিত অস্বভাবি-মনোবিদ্যার প্রয়োগের ক্ষেত্রে উহা আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল। অবশ্য মনোবিদ্যার এই দুই শাখার বিষয়বস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণরূপে এক হইতে পারে না, কারণ রোগি-পরীক্ষামূলক মনোবিদ্যা চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রসার বা বিভাগ এবং উহা চিকিৎসকের আলোচ্য বস্তু।

যাহা হউক, বর্তমান পরিস্থিতিতে অস্বভাবি-মনোবিদ্যার প্রভাব ও পৃথক্ অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে।[২৩]

(খ) সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:

মানুষের সৃষ্টি যতদিন হইয়াছে, ততদিনই কোন না কোন মানুষের মানসিক বিকার দেখা দিয়াছিল। এই বিকারকে বিভিন্ন সময়ে মানুষ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিয়াছে।[২৪] সাধারণ লোকের দৃষ্টিভঙ্গীর এই বিভিন্নতা মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গীকেও প্রভাবিত করিয়াছে।

পূর্বে মনোবিদ্‌রা মনে করিতেন যে, মন বলিতে স্বভাবী মন (normal mind)-ই বুঝায়; সুতরাং তাঁহারা অস্বভাবী মনের আলোচনা করিতেন না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মেস্‌মেয়ার্ (Mesmer) মানসিক রোগীদের উপর হস্ত সঞ্চালন করিয়া তাহাদের রোগনিরাময় করিতেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, এক অদৃশ্য শক্তি (যাহার নাম তিনি দিয়াছিলেন

---

২৩ A. A. Roback-এর ভাষায়: "Abnormal psychology has now been assigned a minor role in a larger organisation wheras before it constituted the whole division." (*Present-day Psychology*, p. 356).

২৪ পূর্বে মনে করা হইত যে, কোন অতীন্দ্রিয় সত্তার প্রভাবে (যেমন, দেবরোষে অথবা ভূত-প্রেতাদির দ্বারা আবিষ্ট হওয়ার ফলে) মানসিক রোগ দেখা যায়। এমন কি আধুনিক কালেও কাহারও কাহারও মনে এই বিশ্বাস ছিল। লাইপ্‌ৎসিগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেষজবিদ্যার অধ্যাপক হাইন্‌রথ্ ১৮১৮ সালে বলিয়াছিলেন: "Where God is, there is strength, light, love and life. An evil spirit abides, therefore, in the mentally deranged; they are the truly possessed."

animal magnetism বা জৈব চুম্বকত্ব) চিকিৎসকের দেহ হইতে রোগীর দেহে প্রবেশ করে। রোগনিরাময়ের তথাকথিত 'গোপন-তত্ত্ব' তিনি কিছুতেই উদ্‌ঘাটিত করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর 'মেস্‌মেরিজম্‌' সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া বিশেষজ্ঞরা বলেন, মেস্‌মেয়ারের 'চিকিৎসার' ফলে কিছু রোগী আরোগ্য লাভ করিলেও 'জৈব-চুম্বকত্ব' বলিয়া কিছু নাই।

বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মানসিক রোগীর প্রকৃত চিকিৎসা স্বরু করেন ফিলিপ্‌ পিনেল (Philippe Pinel)। তিনি বিভিন্ন প্রকার মানসিক রোগের শ্রেণী বিভাগ করেন। পূর্বে মানসিক রোগীকে নানাপ্রকার কষ্টদান করা হইত। ইহার বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, দৈহিক রোগের ক্ষেত্রে যেমন রোগীকে শাস্তিদান করা হয় না, সেইরূপ মানসিক রোগীর ক্ষেত্রেও সহানুভূতি ও সেবা প্রয়োজন।[২৫]

তাঁহার পর এস্‌কুইরল্‌ (Esquirol) তাঁহার প্রদর্শিত পথে রোগের শ্রেণীবিভাগ করেন। তিনি তাঁহার রচনায় একপ্রকার বায়ুরোগ বা উন্মত্ততার কথা বলেন (যাহার নাম তিনি *monomania* দিয়াছিলেন); উহার আক্রমণে রোগী জ্ঞানতঃ ইচ্ছা না করিলেও অদমনীয় ভ্রান্তি (delusions)-এর তাড়নায় অপরাধের পথে চালিত হয়।[২৬]

ইঁহাদের পর উল্লেখ করা যাইতে পারে এমিল্‌ ক্রেপেলিন্‌-এর নাম। তিনি রোগি-পরীক্ষা করিয়া মানসিক রোগের নানা শ্রেণীকরণ করেন,[২৭] এবং এই প্রসঙ্গে নূতন পরিভাষারও সৃষ্টি করেন। তাঁহার দ্বারা মানসিক রোগের বহু চিকিৎসকই প্রভাবিত হ'ন।

২৫ তাঁহার ভাষায়: "The mentally sick are far from being guilty people. They are ill. Their unhappy states deserve all the consideration which suffering men and women ought to receive."

২৬ ইংলণ্ডে আইনের ক্ষেত্রে অদমনীয় ভ্রান্তির প্রভাব স্বীকার করা হয় ১৮৪৩ সালে। এক ব্যক্তির 'পীড়ন ভ্রান্তি' (delusion of persecution) দেখা দেয়; সে বিশ্বাস করিত যে সে নিপীড়িত হইতেছে। এই ভ্রান্ত ধারণার ফলে সে ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী স্যার রবার্ট পীলকে হত্যার চেষ্টা করে এবং দৈবক্রমে প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তে তাঁহার সেক্রেটারী নিহত হ'ন। জুরীর বিচারে ঐ ব্যক্তি 'নিরপরাধী' বলিয়া সাব্যস্ত হয়, কারণ স্বাধীন ইচ্ছার প্রভাবে সে কোন অপরাধ করে নাই ইহাই স্থির হয়।

২৭ আধুনিককালে অনেক মনোবিৎ ক্রেপেলিনের শ্রেণীকরণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে রোগের শ্রেণীকরণই যথেষ্ট নহে—প্রতি রোগীরই ব্যক্তিগত

এই সময় ফরাসী দেশেও অস্বাভাবিক মন লইয়া মনোবিদ্‌গণের মধ্যে আলোচনা হয়। প্যারির শার্‌কো (Charcot)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি সংবেশন (hypnosis)-এর মাধ্যমে রোগচিকিৎসা লইয়া বিশেষভাবে আলোচনা করেন। তাঁহারই প্রত্যক্ষ প্রভাবে পিয়ের জানে ও ফ্রয়েডের মনোবিকার-তত্ত্ব (psychopathology) গড়িয়া উঠে।

রিবো (Ribot)-র অবদান যথেষ্ট। তিনিও মনোবিকার লইয়া নানা প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনা করেন।[২৮] আল্‌ফ্রেড্‌ বিনেও (যাঁহার নাম বুদ্ধিপরীক্ষা পদ্ধতির সহিত বিশেষভাবে জড়িত) তাঁহার প্রথম পুস্তকে (*The Psychology of Reasoning*) অস্বাভাবিক মন ও সংবেদন-সম্বন্ধীয় পরীক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

সহচেতন ব্যক্তিত্ব (co-conscious personality), বহুব্যক্তিত্ব (multiple personality), একান্তর ব্যক্তিত্ব (alternating personality), স্বতঃক্রিয়া (automatism) ইত্যাদির আলোচনায় বহুমূল্য উপাদান সংগ্রহ করেন মর্টন প্রিন্স (Morton Prince)। (পৃঃ ২৭৬-৭৮ দ্রষ্টব্য)।

অস্বাভাবিক মনের আলোচনার ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হইল সিগ্‌মুণ্ড্‌ ফ্রয়েডের। তিনি দেখান যে, রোগী যদি অভিস্ফোট (abreaction)-এর ফলে তাহার নির্জ্ঞান স্তরের অবদমিত ইচ্ছাগুলি প্রকাশ করে, তাহা হইলে তাহার মানসিক উত্তেজনা ও তজ্জনিত মানসিক বিকার হ্রাস পায়। ইহা ছাড়া তিনি দেখাইবার চেষ্টা করেন যে, নির্জ্ঞান স্তরের সুপ্ত ইচ্ছাগুলি আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করে এবং এই

মানসিক বৈশিষ্ট্য জানিতে হইবে। তুলনীয়ঃ "There is a general tendency to reject the Kræpelinian emphasis upon classificatory schemata as the end-all in psychiatry. Quite to the contrary, there is a growing interest in the psychodynamics of each individual patient." (*Present-day Psychology*, p. 367).

২৮ ইংরাজীতে অনূদিত তাঁহার রচিত কয়েকখানি পুস্তকের নামঃ *The Diseases of Memory*, *The Diseases of Will*, *The Diseases of Personality* ; এই পুস্তকগুলির নামগুলি হইতেই ইহাদের বিষয়বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায়।

ইচ্ছাগুলির মূলে আছে কাম (sex বা libido)। তাঁহার মতবাদ বহুধা বিস্তৃত হইয়াছে—তিনি এবং তাঁহার অনুসঙ্গিগণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই মতবাদকে প্রয়োগ করিয়াছেন। বাস্তবিক, ফ্রয়েডের মনঃ-সমীক্ষণবাদ উহার প্রচারের প্রাক্কালে মানবীয় চিন্তাধারায় এক বিরাট্ আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

ফ্রয়েডের প্রাক্তন সহকর্মিবৃন্দের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার দল ত্যাগ করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে য়ুঙ্, আড্‌লার, স্টেকেল্ ও অটো রাঙ্কের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে অনেক যোদ্ধা মানসিক বিকারগ্রস্ত হ'ন; ইঁহাদের সেবা ও আরোগ্যের কার্যে যে সব মনোবিৎ আত্মনিয়োগ করেন তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য হইলেন উইলিয়াম ম্যাক্‌ডুগাল্। ইনি মনোরোগবিদ্যা (psychiatry)-তে পারদর্শী ছিলেন। ইনি মনে করিতেন যে, মানুষের সকল কার্যের মূলে আছে চৌদ্দটি সহজ প্রবৃত্তি। সুষ্ঠু ব্যক্তিত্বের জন্য প্রয়োজন সুসমঞ্জস আত্মশ্রদ্ধা (well-balanced sef-regardıng sentiment) এবং ইহা গঠনের জন্য অত্যাবশ্যক আত্মসাম্মুখ্য (self-assertion) এবং আত্মনিবেদন (self-sub-mission) এই দুই প্রবৃত্তির সমন্বয়।[২৯]

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সম্প্রতি মনোবিকারতত্ত্ব, মনঃসমীক্ষণ ইত্যাদি অস্বভাবি-মনোবিদ্যার স্থান গ্রহণ করিয়াছে। সেইজন্য ইহার আলোচনার ক্ষেত্র বিশেষভাবে সঙ্কুচিত হইয়াছে এবং মনোবিদ্যার পৃথক্ শাখাভাবে ইহা তাহার পূর্বতন পৃথক স্থান হারাইয়াছে।[৩০]

২৯ McDougall, *Outline of Abnormal Psychology*, পৃঃ ৫২৬ দ্রষ্টব্য।

৩০ ডাঃ হ্যারিম্যানের ভাষায়: "The field of abnormal psychology, as its pioneers defined the subject, is now a matter of interest only to the historian of psychology. Many of the topics which were at one time of considerable importance have either been relegated to special fields or have been dropped out of treatises on abnormal phenomena." (*Present-day Psychology*, Ed. by Roback, p. 372.)

৭। শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যা (Physiological Psychology) :

(ক) বিষয়বস্তু :

শরীর ও মন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধযুক্ত। ইহারা পরস্পরকে প্রভাবিত করে। মনের সুষ্ঠু আলোচনার জন্য দেহের যে যে ক্রিয়া মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাহাদের জানা একান্ত প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয়তা বোধ হইতেই পৃথক্ শাখা হিসাবে শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যার উদ্ভব হইয়াছে।

শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যার আলোচনা-পরিধি শারীরবৃত্ত (Physiology)-এর আলোচনাক্ষেত্র হইতে অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ। শারীরবৃত্তে দেহের সকল অংশের গঠন ও ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। **শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যায় দেহের কেবলমাত্র সেই সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলী, ইন্দ্রিয়, পেশী ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লইয়া আলোচনা করা হয় যাহারা মানসিক কার্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং যাহারা মনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।** এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যায় আলোচিত হয়[৩১] :

(১) দেহের সকল কার্যের অধিষ্ঠান হইল প্রধান নার্ভতন্ত্র বা স্নায়ুতন্ত্র (central nervous system); ইহার অংশ হইল গুরুমস্তিষ্ক, মধ্যমস্তিষ্ক, লঘুমস্তিষ্ক ও সুষুম্নাশীর্ষক (cerebrum, mid-brain, cerebellum, medulla oblongata)। অতএব ইহাদের গঠন ও কার্যাবলী আমাদের আলোচ্য বিষয়বস্তু।

(২) মেরুদণ্ড প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার কেন্দ্র এবং নিম্নগামী ও ঊর্ধ্বগামী নার্ভের বা স্নায়ুর পরিবহন-পথ; অতএব মেরুদণ্ড আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত।

(৩) ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে বাহ্য জগৎ হইতে আমরা জ্ঞানলাভ করি; সুতরাং ইন্দ্রিয়গুলির গঠনবৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলী আলোচনা করিতে হইবে।

(৪) আমরা ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে বাহ্য জগৎ হইতে জ্ঞানলাভ করিয়াই ক্ষান্ত হই না—আমরা বাহ্য জগতের উপর প্রতিক্রিয়া করি। এই প্রতিক্রিয়ার

৩১ শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যার অবদান সম্বন্ধে সুষ্ঠু আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—*Psychological Review*, 1941, Vol. 6, পৃঃ ১০৫-১২৬ (R. B. Loucks-রচিত প্রবন্ধ)।

জন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা করিতে হয় এবং উহা সম্ভব হয় পেশীসমূহের কার্যক্ষমতার উপর। সুতরাং পেশী কয় প্রকারের আছে এবং কিভাবে গুরুমস্তিষ্ক প্রভৃতি হইতে সঞ্চারিত শক্তির প্রভাবে উহারা কার্য করে তাহা আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয়।

(৫) আমাদের ব্যক্তিত্ব-গঠনের মূলে যে সমস্ত 'উপাদান' আছে, তাহাদের মধ্যে 'দৈহিক উপাদানগুলি' অন্যতম। আমাদের ব্যক্তিত্বের কতকাংশ আমরা বংশপ্রভাব (heredity)-এর ফলে পূর্বপুরুষ হইতে পাইয়া থাকি। সুতরাং আমরা পিতামাতা ও উর্ধ্বতন পুরুষ হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে কী পাইয়া থাকি ও কিভাবে পাইয়া থাকি তাহা আমাদের শিক্ষিতব্য বিষয়। আবার আমাদের দেহস্থ নালিকাবিহীন গ্রন্থিগুলি (ductless gland) এর রসক্ষরণের ফলে আমাদের দৈহিকগঠন, বুদ্ধিবৃত্তি, কার্যক্ষমতা ইত্যাদি প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হয়। সুতরাং ইহাদের কার্যাবলীও আমাদের লক্ষ্য করিতে হইবে।

(৬) আমাদের মানসিক জীবনে প্রক্ষোভ বা আবেগ এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। আবেগের সময় আমাদের দেহের কতকগুলি অঙ্গ বিশেষভাবে কার্য করে; যেমন, ক্রোধের সময় হৃৎপিণ্ড ও শ্বাসযন্ত্র সবেগে চলিতে থাকে, সমস্ত দেহ (বিশেষতঃ পদযুগল) কম্পিত হয়, মুখাবয়ব রক্তাভ হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসব দৈহিক বিকারের জন্য স্বতঃক্রিয় স্নায়ু (autonomic nerves)-এর পথে বিশেষ শক্তি সঞ্চারিত হয়। সুতরাং ইহাদের সহিত আবেগের সম্বন্ধ কী তাহা আমাদের আলোচ্য বিষয়।[৩২]

(৭) কোন কিছু শিক্ষণকালে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ কার্য করে; সুতরাং শিক্ষণের পশ্চাতে স্নায়বিক কী পরিবর্তন আছে তাহা জানিতে হইবে।

(৮) কতকগুলি অস্বভাবী ব্যবহারের মূলে দৈহিক বিকার আছে বলিয়া বোধ হয়। যেমন, রক্তে শর্করার পরিমাণ অত্যন্ত কমিয়া গেলে

৩২ কেহ কেহ মনে করেন যে, আবেগের সময় দেহযন্ত্র সঞ্চালনের ফলে যে সংবেদন হয় তাহাই আবেগের কারণ। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্র (autonomic system) আবেগের 'অধিষ্ঠান' হইবে। ক্যাননপ্রমুখ বৈজ্ঞানিকরা এই মতবাদ পরিহার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, আবেগের অন্তর্ভুক্ত দৈহিক শক্তির 'অধিষ্ঠান' হইল হিপোথালামাস (hypothalamus)। (পৃ: ৫০৪-৫০৭)।

বা মস্তিষ্কে উপদংশরোগের বীজাণু প্রবেশ করিলে, অথবা যৌনগ্রন্থির বিকার ঘটিলে,[৩৩] অথবা অন্য কোন বিশেষ প্রকারের দৈহিক ব্যাধি ঘটিলে মানসিক ব্যবহার অস্বভাবী হইয়া পড়ে। সুতরাং মানসিক রোগের সহিত দৈহিক বিকারের সম্বন্ধও আমাদের আলোচনা করিতে হইবে।

(খ) সংক্ষিপ্ত ইতিহাস :

শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যার পৃথক্ আবির্ভাব ঘটিয়াছিল প্রায় একশত বৎসর পূর্বে। মনোবিদ্‌গণ সংবেদন-সম্বন্ধে আলোচনাকালে স্বতঃই ইন্দ্রিয়-গুলির গঠনবৈশিষ্ট্যের আলোচনায় লিপ্ত হ'ন এবং এইভাবেই শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যার পৃথক্ প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়।

কোন মানসিক অবস্থার প্রকাশের সহিত কোন না কোন দৈহিক পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট আছে এ বিশ্বাস বহু পুরাতন। বোধ হয় এই বিশ্বাসের প্রভাবেই দ্যকার্ত 'মনের অধিষ্ঠান' অনুসন্ধান করেন এবং 'পিনিয়াল গ্রন্থিকে' মনের অধিষ্ঠান (seat of mind) বলিয়া অভিহিত করেন।

বিশেষ বিশেষ মানসিক শক্তি (যথা, বুদ্ধি, আবেগ ইত্যাদির) অধিষ্ঠান মস্তিষ্কের এক এক অংশে আছে এবং মস্তিষ্কের বাহ্য আকৃতি হইতে এক একটি মানসিক অবস্থা অনুমান করা যায়—এই মতবাদ প্রচার করেন গাল্ (Gall) ও তাঁহার সহকর্মী স্পুর্‌ৎসহাইম্ (Spurzheim)। ইঁহাদের এই মতবাদ প্রচারিত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। এই মতবাদের নাম মস্তিষ্কবিদ্যা বা ফ্রেনোলজি (Phrenology)।[৩৪] অবশ্য এই মতবাদ এখন পরিত্যক্ত হইয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের মধ্যে যাঁহাদের শারীরবৃত্তীয় আলোচনা মনোবিদ্যাকে উন্নতির পথে লইয়া চলে তাঁহাদের ভিতর নাম করা চলে অন্ততঃ এই কয়েক জনের—বেল্ (Bell), মাজেণ্ডি (Magendie), মুয়েলার (Müller), ফ্লোরেন্স (Flourens), রোলাণ্ডো (Rolando) ও হল্ (Hall)।

---

৩৩ Sir Frederick Mott-এর মতে যৌনগ্রন্থির (gonads) অবনতি ঘটিলে চিত্তভ্রংশী বাতুলতা (schizophrenia) দেখা দিতে পারে।

৩৪ এই মতের প্রচারকেরা বলিতেন যে, মানবের মানসিক শক্তির (mental faculties) সংখ্যা ৩৭।

বেল্‌ ও মাজেণ্ডি দেখাইয়াছেন যে, মেরুদণ্ডে প্রবেশকালে নার্ভ বা স্নায়ু অন্তর্মুখী (afferent) ও বহির্মুখী (efferent) এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়—একই নার্ভ বা স্নায়ু দ্বারা উদ্দীপন-পরিবহন এবং শক্তি-চালনা, এই দুইটি কার্য সাধিত হয় না।

মুয়েলার দেখাইয়াছেন যে, এক এক প্রকারের উদ্দীপক দ্বারা উদ্দীপিত হইবার জন্য এক এক প্রকারের স্নায়ু আছে, অর্থাৎ, নার্ভ বা স্নায়ুগুলির মধ্যে 'শ্রমবিভাগ' আছে।

গুরুমস্তিষ্ক ও লঘুমস্তিষ্কের কার্যবিভাগ লইয়া পরীক্ষণ চালান ইতালির ফ্লোরেন্স। অনুরূপ বিষয়ে গবেষণা চালান রোলাণ্ডো।

পরাবর্তক-ক্রিয়া (reflex action) ও ঐচ্ছিক ক্রিয়ার প্রভেদ লইয়া গবেষণা করেন স্কট্‌ল্যাণ্ডের হল্‌।

ইঁহাদের পর সংবেদনের দৈহিক ভিত্তি লইয়া আলোচনা আরম্ভ করেন একদল জার্মান বৈজ্ঞানিক—ভেবের্‌ (Weber), ফেক্‌নার্‌ (Fechner), হেল্‌ম্‌হোলৎস্‌ (Helmholtz) ও ভুণ্ড্‌ট্‌ (Wundt)। ১৮৭৪ সালে ভুণ্ড্‌ট্‌ এক পুস্তক প্রকাশ করেন, তাহার নাম *Principles of Physiological Psychology* ; ইহার আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল সংবেদন ও প্রতিক্রিয়া এবং মস্তিষ্কের কার্যাবলী।

গুরুমস্তিষ্ক সমগ্রভাবে কার্য করে, অথবা উহার এক একটি অংশ এক একটি কার্য লইয়া নিযুক্ত থাকে—এই আলোচনার সূত্রপাত হয় মস্তিষ্কবিদ্যা (Phrenology)-র যুগ হইতে। 'ফ্রেনোলজি' বলে, ভিন্ন ভিন্ন কার্যের জন্য মস্তিষ্কের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ আছে ; আর উহার বিপক্ষে যায় ফ্লোরেন্সের গবেষণার ফল। ১৮৬০ সাল হইতে একদল বৈজ্ঞানিক ঐ বিষয়ে গবেষণা চালাইতে থাকেন। ইঁহারা সকলেই গুরুমস্তিষ্কে পৃথক্‌ পৃথক্‌ কার্যবিভাগ সমর্থন করেন। ইঁহাদের ভিতর উল্লেখযোগ্য হইতেছেন ব্রোকা (Broca), ফ্রিৎশ্‌ (Fritsch) ও হিৎসিগ্‌ (Hitzig)।

১৮৮০ সাল হইতে সুরু করিয়া বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Conditioned Reflex) লইয়া বিবিধ পরীক্ষণ চালান রাশিয়ার বেকটেরেভ ও প্যাভ্‌লভ।

বর্তমান শতকে স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের সহিত আবেগের সম্বন্ধ নিরূপণ করার জন্য বিভিন্ন পরীক্ষণ চালান ক্যানন্ ও শেরিংটন্।

গুরুমস্তিষ্কের কার্য লইয়া নূতন করিয়া পরীক্ষণ সুরু করেন ল্যাশ্‌লে (Lashley)। ইনি মনে করেন যে, গুরুমস্তিষ্ক সামগ্রিকভাবে কার্য করে। মধ্যমস্তিষ্ক (mid-brain and thalamus)-এর সহিত অনুভূতি ও আবেগের সম্বন্ধ লইয়া গবেষণা করেন হেড্ (Head) ও হোম্‌স্ (Holmes)।

[আমরা অতি সংক্ষেপে শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের কার্যের উল্লেখ করিলাম। যথাস্থানে ইঁহাদের অবদানের কথা আবার উল্লিখিত হইবে।]

৮। **পরীক্ষণমূলক মনোবিদ্যা (Experimental Psychology)ঃ**

(ক) বিষয়বস্তুঃ

যে অর্থে শিশু-মনোবিদ্যা, সমাজ-মনোবিদ্যা ইত্যাদি মনোবিদ্যার শাখা, সেই অর্থে পরীক্ষণমূলক মনোবিদ্যা মনোবিদ্যার শাখাবিশেষ নহে। **মনোবিদ্যার অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে পরীক্ষণের প্রয়োগের ফলেই পরীক্ষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর উদ্ভব হইয়াছে।** মনোবিৎ যে বিষয় লইয়াই আলোচনা করুন না কেন (তাহা শিশু-মন হউক্, সমাজ-মন হউক্, বা মনঃসম্বন্ধীয় অন্য কোন ক্ষেত্র হউক্) তাহাতেই তিনি পরীক্ষণ প্রয়োগ করিতে পারেন এবং এইভাবেই তথাকথিত পরীক্ষণমূলক মনোবিদ্যার সৃষ্টি হইয়াছে।

পরীক্ষণমূলক মনোবিদ্যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল মনোবিদ্যার আলোচনা পদ্ধতি হিসাবে পরীক্ষণকে (experiment) গ্রহণ এবং পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্তসমূহের ভিত্তিতেই মনোবিদ্যা রচনা করা।[৩৫]

পরীক্ষণ বলিতে আমরা বুঝি আমাদের আয়ত্তাধীন কোন কৃত্রিম পরিবেশের মধ্যে পরীক্ষণ-পাত্র (subject of experiment)-এর ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করা। যেমন, পরীক্ষণাগারে পরীক্ষণ-পাত্রকে কোন উদ্দীপক

৩৫ James Drever তাঁহার *Dictionary of Psychology*-তে 'Experimental Psychology'র ব্যাখ্যা দিয়াছেন: "employment of experimental methods to obtain psychological data or to solve psychological problems."

প্রয়োগ করিয়া দেখিতে পারা যায় কী প্রতিক্রিয়া ঘটে; মানব-শিশু বা মনুষ্যেতর জীবের উপর পরীক্ষণ করিয়া দেখা যাইতে পারে কিভাবে নূতন অবস্থায় তাহারা শিখিতে পারে; বিভিন্ন সামাজিক অবস্থার উপর পরীক্ষণ প্রয়োগ করিয়া দেখা যাইতে পারে কিভাবে জনমত গঠিত হয়, কিভাবে গুজব প্রসার লাভ করে, কিভাবে জনমত অভিভাবন (suggestion) দ্বারা প্রভাবিত হয় ইত্যাদি।

পরীক্ষণ আজ মনোবিস্থার বিশেষ কোন ক্ষেত্রে বা বিশেষ কোন শাখায় সীমাবদ্ধ নহে; আধুনিক মনোবিৎ সম্ভব হইলে যে-কোন ক্ষেত্রেই পরীক্ষণ প্রয়োগ করিতে অভিলাষী।[৩৬]

(খ) সংক্ষিপ্ত ইতিহাস :

পরীক্ষণমূলক মনোবিস্থার অভ্যুদয়ের সহিত যাঁহাদের নাম সংশ্লিষ্ট আছে, তাঁহাদের ভিতর সর্বপ্রথম উল্লেখ করা যাইতে পারে ভেবের (Weber)-এর নাম। জার্মানীতে বিভিন্ন জীববিস্থা-বিষয়ক বিজ্ঞানের প্রগতির দ্বারা উৎসাহিত হইয়া তিনি মনোবিস্থার ক্ষেত্রেও পরীক্ষণ প্রয়োগ সুরু করেন। তিনি যে সব বিষয় পরীক্ষণ চালান তাহাদের কয়েকটির এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি উত্তাপ-সংবেদন সম্বন্ধে পরীক্ষণ চালাইয়া এই মতবাদ প্রকাশ করেন যে, উত্তাপ-সম্বন্ধীয় সংবেদন উদ্দীপকের উপর নির্ভর করে না—চর্মের উত্তাপের হ্রাস-বৃদ্ধির উপর উহা নির্ভর করে। গরম জলের ভিতর হাত ডুবাইলে যে উত্তাপ বোধ হয় তাহার কারণ চর্মের উত্তাপ হঠাৎ বৃদ্ধি পায়। সেইজন্য কিছুক্ষণ গরম জলে হাত রাখিলে উত্তাপ-সম্বন্ধীয় সংবেদনের তীব্রতা হ্রাস পায়। ভেবেরের একটি বিখ্যাত পরীক্ষণ হইল উদ্দীপকের বৃদ্ধির সহিত সংবেদনের তীব্রতাবৃদ্ধির অনুতাপ নিরূপণ। তিনি পরীক্ষণ দ্বারা নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করেন যে, কী অনুপাতে উদ্দীপক বাড়াইলে সংবেদনের পার্থক্য ঠিক বোধগম্য হইবে। (ইহাকে ইংরাজীতে বলা হয় 'just noticeable difference', সংক্ষেপে j. n. d.। আমাদের পরিভাষায় ইহাকে

৩৬ দ্বিতীয় অধ্যায়ে পরীক্ষণ-পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

বলা হয় 'অবম গ্রাহ্যান্তর')। অতএব কোন্ সংবেদনের ক্ষেত্রে কোন্ ভগ্নাংশের দ্বারা উদ্দীপককে গুণ করিলে অবম গ্রাহ্যান্তর অনুভূত হইবে তাহা নিরূপণ করিতে ভেবের প্রচেষ্টা করেন।

ইহা ছাড়া, স্পর্শ-সংবেদনের ক্ষেত্রে তিনি আর-একটি পরীক্ষা করেন। চর্মের উপর দুইটি উদ্দীপক প্রয়োগ করিলে দ্বৈত সংবেদনের (doubleness-এর) জন্য উহাদের মধ্যে কিরূপ দূরত্বের পার্থক্য থাকা প্রয়োজন, সে সম্বন্ধেও তিনি পরীক্ষা চালান। সেইরূপ ঘ্রাণজ-সংবেদন লইয়া তিনি অনুসন্ধান করেন যে, তরল পদার্থ এবং গ্যাস ঐরূপ সংবেদনের উপযুক্ত উদ্দীপক হইতে পারে কি না।

ভেবেরের পর নাম করা যাইতে ফেক্‌নার (Fecchner)-এর।[৩৭] তিনি ভেবের-প্রদত্ত সংবেদন-সংক্রান্ত নিয়মটি লইয়া পরীক্ষণ চালান। তিনি বিভিন্ন পরীক্ষণের পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ন যে, উদ্দীপকের বৃদ্ধির জন্য উহাকে যদি একটি বিশেষ রাশি দ্বারা গুণ করা যায়, তাহা হইলে সংবেদন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইবে এবং এই বৃদ্ধির অনুপাত হইল মূল সংবেদনের সহিত একটি বিশেষ রাশি যোগ করা।

উদ্দীপক-বৃদ্ধির সহিত সংবেদন-বৃদ্ধির অনুপাত-নিরূপণ সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা ফেক্‌নার *Elemente der Psychophysik* গ্রন্থে প্রকাশ করেন এবং এইভাবে 'শারীর-মনোবিদ্যা' (psycho-physics) নামক এক বিশেষ শাখার উদ্বর্তন ঘটে।

এই যুগের আর একজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক হইলেন য়োহানেস্ মুয়েলার (Johannes Müller)। তিনি সংবেদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের (বিশেষতঃ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের) অবদান লইয়া অনুসন্ধান চালান। চক্ষু যে দূরত্ব প্রত্যক্ষ করে, তাহা জন্মগত কোন ক্ষমতাবলে অথবা অভিজ্ঞতালব্ধ কতকগুলি চিহ্নের মাধ্যমে, ইহা লইয়া তিনি আলোচনা

৩৭ ফেক্‌নারকে ভেবেরের অন্যতম অনুগামী মনে করিলে ভুল হইবে। ফেক্‌নার একজন প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ছিলেন। লাইপৎসিগে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। দর্শনশাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ অবদান ছিল। তিনি 'মরণোত্তর জীবন' (life after death) সম্বন্ধে পুস্তিকা রচনা করেন এবং দর্শনে 'সর্বচেতনবাদ' (panpsychism)-এ বিশ্বাসী ছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার আর-একটি পুস্তক হইল *Zend-Avesta.*

করেন। বিখ্যাত দার্শনিক কাণ্ট মনে করিতেন যে, উহা অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ (উহা *a' priori form of sensibility*), আর বার্কলি বলিতেন যে, উহা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রাপ্ত। মুয়েলার এই দুই মতবাদের সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা করেন।

তিনি প্রত্যাবর্তক-ক্রিয়া (reflex action) সম্বন্ধেও আলোচনা করেন এবং ভেক বা ব্যাঙের উপর পরীক্ষণ-কার্য চালাইয়া দেখান কিভাবে মেরুদণ্ড হইতে সঞ্চারিত শক্তিদ্বারা ঐ কার্য নিষ্পন্ন হয়।

তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ মতবাদ হইল যে, প্রতি নার্ভের বা স্নায়ুর এক এক বিশেষ প্রকারের সংবেদন বহন করিবার ক্ষমতা আছে। চাক্ষুষ সংবেদনের উদ্দীপক বহন করিবার জন্য চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত যে সমস্ত স্নায়ু বা নার্ভ সংযুক্ত থাকে তাহারা কেবলমাত্র ঐ কাযই করিতে পারে; তাহাদের উপযুক্ত উদ্দীপক হইল আলোক-তরঙ্গ (light-waves) এবং তাহা দ্বারা আলোক-সংবেদন (light-sensation) হয়—যদি কখনও অন্য প্রকারে চক্ষুদ্বয় উদ্দীপিত হয় তাহাতেও ঐ আলোক-সংবেদনই ঘটিবে; যেমন চক্ষুতে হঠাৎ আঘাত লাগিলে মনে হয় যেন একটা আলো দেখা গেল। (এই মতের নাম 'doctrine of specific energies')।

ইহা ছাড়া মুয়েলার অনুবেদন (after-image) এবং আলোক-প্রতিযোজন (light-adaptation) ও অন্ধকার-প্রতিযোজন (dark-adaptation) সম্বন্ধেও মূল্যবান্ পরীক্ষণ করেন।

এই সময় চাক্ষুষ-সংবেদন সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য বিভিন্ন পরীক্ষণের মাধ্যমে উদ্ঘাটিত হয়। কোন্ রঙের আলোর কোন্ সময় উজ্জ্বলতা-বৃদ্ধি পায়, সে সম্বন্ধে পরীক্ষণ চালান পুর্‌কিনয়ী (Purkinjie); বর্ণ-মিশ্রণ (colour-mixture)-সম্বন্ধে পরীক্ষণ করেন প্রথমে মুস্‌শেন্‌ব্রোয়েক্ (Musschenbrök) এবং পরে মাক্সভেল্ (Maxwell); বর্ণ-সংবেদনের জন্য চক্ষুর মধ্যে কয়টি উপাদান থাকিতে পারে সে সম্বন্ধে পূর্ব হইতেই টমাস ইয়ং (Thomas Young) এবং কবি গোয়েটুহে (Goethe)-র যে যে মতবাদ ছিল সেইগুলি

হেল্ম্‌হোলৎস্ (Helmholtz) এবং হেরিং (Hering) পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত করেন।

পরীক্ষণমূলক মনোবিদ্যার পথিকৃৎগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইলেন ভিল্‌হেল্‌ম্ ভুণ্ড্‌ট্ (Wilhelm Wundt)।[৩৮] বাস্তবিক, ইঁহাকেই পরীক্ষণলমূক মনোবিদ্যার জনক বলা যাইতে পারে। ইনিই সর্বপ্রথম ১৮৭৯ সালে লাইপ্‌ৎগিক্ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষণমূলক মনোবিদ্যার গবেষণাগার স্থাপন করেন। ইয়োরোপ ও আমেরিকার বহু প্রখ্যাতনামা মনোবিৎ তাঁহার গবেষণাগারে তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করেন।

ভুণ্ড্‌টের বিখ্যাত গ্রন্থ হইল *Principles of Physiological Psychology* ; তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, মনোবিদ্যা ও শারীরবৃত্তীয় বিদ্যাকে (Psychology এবং Physiology) পরস্পর হইতে পৃথক্ করা যায় না, কারণ দেখা যায় যে, যে উদ্দীপকের উপর আমরা প্রতিক্রিয়া করি, তাহা মনোরাজ্যে কোন না কোন পরিবর্তন সৃষ্টি করে। তিনি 'মানসিক উপাদানের' অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন।

যে সমস্ত মনস্তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় বিষয় লইয়া পূর্ব হইতেই বিভিন্ন গবেষণাগারে (বিশেষতঃ পদার্থবিদ্যার ও শারীরবৃত্তীয় বিদ্যার গবেষণাগারে) আলোচনা চলিতেছিল এবং বিভিন্ন পরীক্ষণের মাধ্যমে যাহাদের পরিমাপের প্রচেষ্টা চলিতেছিল ভুণ্ড্‌ট্ প্রধানতঃ সেইগুলিকেই সুসংবদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন। (ক) প্রথমে তিনি চাক্ষুষ ও শ্রৌত্র সংবেদন (sensations of vision and hearing) লইয়া গবেষণা করেন। (খ) হেল্‌মহোল্‌ৎস্ প্রমুখ-প্রদর্শিত পথে তিনি প্রতিক্রিয়াকাল (reaction time) সম্বন্ধে পরীক্ষণ চালান। তিনি লক্ষ্য করেন যে, বিষয়ী বা পরীক্ষণ-পাত্র (subject of experiment) যদি উদ্দীপকের প্রতি

৩৮ ভুণ্ড্‌ট্ ১৮৩২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাইডেল্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ্. ডি. এবং এম্. ডি. উপাধি লাভ করেন। তিনি প্রথমে হাইডেলবার্গে হেলম্‌হোলৎসের সহকারী হিসাবে কার্য করেন এবং ধীরে ধীরে শারীরবৃত্তীয় বিদ্যা হইতে মনোবিদ্যার প্রতি তাঁহার অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। ১৮৭৫ সালে তিনি লাইপ্‌ৎসিগের দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হ'ন এবং ১৯২০ সালে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত ঐ কার্যে তিনি নিযুক্ত ছিলেন।

মনোযোগ রাখেন তাহা হইলে একপ্রকার, আর প্রতিক্রিয়ার প্রতি মনোযোগ দান করিলে আর-এক প্রকার, প্রতিক্রিয়াকাল (reaction time) হইবে। (গ) তিনি ফেক্‌নার-অনুসৃত পথে শারীর-মনোবিদ্যা (Psycho-physics) সম্বন্ধে গবেষণা চালান; তবে উদ্দীপকের ন্যায় সংবেদনকে যে আঙ্কিক সংকেতে বা পরিমাণগতভাবে প্রকাশ করা যায়, ফেক্‌নারের এই মত তিনি গ্রহণ করেন নাই। (ঘ) অনুষঙ্গ (association)-সম্বন্ধে তিনি গ্যাল্‌টনের পন্থায় পরীক্ষণ চালাইতে থাকেন; তবে তিনি তাঁহার পরীক্ষণ-পাত্র বা বিষয়িগণের নিকট ইহাই বলিতেন যে, 'উদ্দীপক' হিসাবে কোন শব্দ বা পদ ব্যবহার করিলে তাঁহারা যেন অপর-একটি পদ 'প্রতিক্রিয়া' হিসাবে ব্যবহার করেন—প্রতিরূপ (image)-বহুল কোন বর্ণনা দিবার প্রয়োজন নাই।

এই সমস্ত ক্ষেত্র ব্যতীত 'সমষ্টি-মন' (group mind)-এর আলোচনায় তিনি প্রবৃত্ত হ'ন এবং তাঁহার *Folk Psychology* আধুনিক কালের সমাজ মনোবিদ্যার পথপ্রদর্শক বলা যায়।[৩৯]

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বিভিন্ন মনোবিদের উপর ভুণ্ড্‌টের প্রভাব ছিল অপরিসীম।[৪০] ইঁহাদের মধ্যে ক্রেপেলিন (Kraepelin) ও সম্মার (Sommer) অস্বভাবী মনের ক্ষেত্রে ভুণ্ড্‌টের প্রণালী প্রয়োগ করেন। অনুষঙ্গ এবং মনোযোগ সম্বন্ধে আলোচনাকে ক্যাটেল (Cattell) আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত করেন। আমেরিকায় তাঁহার মতের প্রচার করেন টিচেনার (Titchener)—ভুণ্ড্‌টের আদর্শে তিনিও ছিলেন গঠনবাদী (Structuralist) এবং ভুণ্ড্‌টের ন্যায় তিনিও মৌলিক মানসিক উপাদান (mental elements)-এর অস্তিত্বে

৩৯ ভুণ্ড্‌টের অবদান সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য গ্রন্থকার-রচিত প্রবন্ধ 'Wilhelm Wundt: His Contributions to Psychology and Philosophy' (*Calcutta Review*, June, 1961) দ্রষ্টব্য।

৪০ ভুণ্ড্‌টের অনুগামিগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন:—Stanley Hall, Cattell, Wolfe, Pace, Scripture, Angell, Witmer, Warren, Patrick, Stratton, Judd, Tawney, Titchener, Kræpelin, Münsterberg, Störring, Kirschmann, Lehmann, Külpe, Meumann, Marbe, Kiesow, Lipps, Krüger, Merkel, Lange, Martius.

বিশ্বাসী ছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে তিনি ভুণ্ড্‌টের মতকে সরল করেন।

আমরা এইখানেই পরীক্ষণমূলক মনোবিদ্যার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সমাপ্ত করিলাম। প্রথমে সংবেদনের ক্ষেত্রে পরীক্ষণের প্রয়োগ শুরু হয় এবং ক্রমশঃ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উহার প্রয়োগ প্রসার লাভ করে। বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে আজ মনোবিদ্যার সকল শাখাতেই পরীক্ষণ-পদ্ধতি অল্পবিস্তর প্রযুক্ত হইতেছে। তাই আজ আর মনোবিদ্যার কোন বিশেষ শাখাকে 'পরীক্ষণমূলক' বলিয়া অভিহিত করার সার্থকতা নাই।

চতুর্থ অধ্যায়

মনোবিদ্‌গণের বিভিন্ন সম্প্রদায়

পূর্বেই বলা হইয়াছে মনোবিদ্যা একটি নূতন বিজ্ঞান। সেইজন্য মনোবিদ্যা বিজ্ঞান হিসাবে সম্যক্ উন্নতি করিলেও ইহার বিষয়বস্তু, আলোচনা-পদ্ধতি এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ রহিয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলে কয়েকটি বিভিন্ন সম্প্রদায় (ইংরাজীতে যাহাকে বলে school of psychology) গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা ইহাদের মতবাদ আলোচনা করিব।

১। গঠনবাদ (বা অবয়ববাদ) এবং ক্রিয়াবাদ (Structuralism and Functionalism):

মনকে আলোচনা করা মনোবিদের কার্য; কিন্তু কোন্ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে মনকে দেখা উচিত? মন কি বিভিন্ন 'উপাদান' দ্বারা গঠিত বস্তুর ন্যায়, অথবা উহা সদা কার্যশীল সত্তা-বিশেষ?

(ক) একদল মনোবিৎ বলেন যে, বিভিন্ন মানসিক অবস্থার সুষ্ঠু ব্যাখ্যা করিতে হইলে উহাদের বিশ্লেষণ প্রয়োজন। তাঁহারা বলেন যে, মনোবিদের কার্য রসায়নশাস্ত্রবিদের কার্যের সহিত তুলনীয়—কোন মিশ্র-পদার্থের রাসায়নিক ব্যাখ্যা করিতে হইলে উহাকে বিভিন্ন উপাদানে বিশ্লেষণ করিতে হয়: যেমন, উদজান (hydrogen)-এর দুই অণু এবং অম্লজান (oxygen)-এর এক অণু লইয়া জল গঠিত—সুতরাং জলকে ব্যাখ্যা করিবার জন্য রাসায়নিক এই দুই উপাদানের উল্লেখ করিবেন। সেইরূপ **জটিল মানসিক অবস্থাগুলি কতকগুলি সরল উপাদান (elements)-এর সমন্বয়; অতএব উহাদের সম্যক্ ব্যাখ্যার জন্য ঐ সব উপাদানের উল্লেখ প্রয়োজন। এই মতবাদের নাম অবয়ববাদ বা গঠনবাদ** (Structuralism), কারণ এই মতের সমর্থকেরা বিবিধ মানসিক অবস্থাসমূহকে পৃথক্ পৃথক্ উপাদান দ্বারা সংগঠিত যৌগিক পদার্থ-বিশেষ মনে করেন।

অপরপক্ষে আর-একদল মনোবিৎ এই মতের প্রতিবাদ করিয়া বলেন, **মানসিক অবস্থাগুলি স্থিতিশীল জড়পদার্থ (static compound)**

নহে; উহারা ক্রিয়াধর্মী, উহারা গতিশীল (dynamic)। সুতরাং মনের ব্যাখ্যা করিবার জন্য মন কী কার্য করে তাহাই বলিতে হইবে। এই মতের নাম ক্রিয়াবাদ (functionalism); কারণ এই মতের সমর্থকেরা মানসিক ক্রিয়ার মাধ্যমেই মনের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

(খ) অবয়ববাদীরা কোন মানসিক অবস্থার স্বরূপ নির্ধারণের জন্য **অন্তর্দর্শন-প্রণালী (introspective method)-এর সাহায্য গ্রহণ করেন**; তাঁহারা মনে করেন যে, অন্তর্দর্শনের ক্ষমতা পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত করিবার জন্য মনোবিদের বিশেষভাবে শিক্ষাগ্রহণ প্রয়োজন এবং এইরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত মনোবিদরাই মানসিক অবস্থার বিশ্লেষণ সুষ্ঠুভাবে করিতে পারেন।

ক্রিয়াবাদীরা মনের বাহ্য ব্যবহার পর্যালোচনা করার জন্য **বাহ্যদর্শন-প্রণালী (extrospection বা objective method)-এর উপরই অধিকতর আস্থাশীল।**

(গ) অবয়ববাদীরা মনের অবস্থাগুলির নিরীক্ষণকার্যে নিযুক্ত থাকেন; **তাঁহারা কেবলমাত্র দেখেন মনের কি কি অবস্থা আছে এবং উহাদের মধ্যে আবার কি কি উপাদান আছে।** তাঁহারা মানসিক অবস্থার অস্তিত্বের উপর জোর দেন বলিয়া এই মতবাদকে আবার **অস্তিত্ববাদী** মনোবিজ্ঞান (existential psychology) বলা হয়।

ক্রিয়াবাদীরা মনের ক্রিয়াগুলি আলোচনা করেন বলিয়া তাঁহারা মনকে গতিশীল বলিয়া বর্ণনা করেন। এইজন্য তাঁহাদের মনোবিদ্যাকে **'গতীয় মনোবিদ্যা'** (dynamic psychology) এই আখ্যা দেওয়া হয়।

(ঘ) ব্যক্তি-বিশেষের মনকে আলোচনা করিবার কালে গঠনবাদী বা অবয়ববাদীরা বলিবেন উহার মনে কি কি চিন্তন, অনুভূতি বা প্রতিরূপ আছে, অর্থাৎ কোন **উপাদানের অস্তিত্বের** উপর তাঁহারা গুরুত্ব আরোপ করিবেন। ক্রিয়াবাদীরা কিন্তু ঐরূপ বর্ণনা করিবার জন্য বলিবেন যে, ব্যক্তি-বিশেষ চিন্তা **করিতেছে** বা অনুভূতি বোধ **করিতেছে,** অর্থাৎ তাঁহারা বলিবেন যে চিন্তা বা অনুভূতি বলিয়া কোন মানসিক উপাদান তাঁহারা জানেন না, তাঁহারা জানেন **চিন্তন-প্রক্রিয়া, অনুভূতি-প্রক্রিয়া।**

(ঙ) গঠনবাদীরা বা অবয়ববাদীরা **সাধারণতঃ যান্ত্রিকতাবাদ (mechanism)-এর মাপকাঠিতে মানসিক অবস্থাগুলির সংমিশ্রণ**

ব্যাখ্যা করেন; অপরপক্ষে, অনেক ক্রিয়াবাদী **মানুষের ব্যবহার বা ক্রিয়াকে কোন উদ্দেশ্য-সাধনের উপায় হিসাবে** দেখেন, অর্থাৎ ক্রিয়াবাদীদের অনেকে উদ্দেশ্য-সাধনবাদ (teleology)-এর সমর্থক।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:

উপরে আমরা এই মতবাদদ্বয়ের পার্থক্য বর্ণনা করিলাম। এখন আমরা উহাদের উদ্ভবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করিব।

উইলিয়াম জেম্‌স্‌ তাঁহার *Principles of Psychology* নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এক পাদটীকায় 'গঠন' (structure) এবং 'ক্রিয়া' (function) পদ দুইটি প্রথম ব্যবহার করেন। এক হিসাবে জেম্‌সের পূর্বেই জার্মান লেখকদের মধ্যে (১৮৭৪ খৃঃ অব্দে) এই দুইটি পৃথক্‌ দৃষ্টিভঙ্গী দেখা দিয়াছিল। ভুণ্ড্‌ট্‌ (Wundt) তাঁহার পুস্তকে (*Grundzüge der physiologischen Psychologie*) 'অন্তর্দর্শনপ্রাপ্ত অবস্থা' (observed states)-সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী স্পষ্টতঃই গঠনবাদমূলক। অপরপক্ষে, ব্রেণ্টানো (Brentano) তাঁহার পুস্তকে (*Psychologie vom empirischen Standpunkte*) 'মানসিক ক্রিয়া'র কথা বলিয়াছেন, যেমন, ধারণা করা, চিন্তা করা, ঘৃণা করা, স্নেহ করা। ভুণ্ড্‌ট্‌ যে সমস্ত মানসিক অবস্থার কথা বলিয়াছেন, সেইগুলি আন্তর অভিজ্ঞতা বা অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে প্রাপ্ত; ব্রেণ্টানো যে সমস্ত মানসিক ক্রিয়ার কথা বলিয়াছেন বাহ্যবস্তুর সহিত সেগুলি সম্পর্কযুক্ত, অর্থাৎ বাহ্যবস্তুর সহিত সম্পর্কের ফলেই এই সমস্ত ক্রিয়ার অভ্যুদয়।

ভুণ্ড্‌টের পথ অনুসরণ করেন কুয়েল্‌পে (Külpe) এবং এবিংহাউস্‌ (Ebbinghaus)। ভুণ্ডটের মতবাদ বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে আমেরিকায় প্রচার করেন ই. বি. টিচ্‌নার (E. B. Titchener)। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, তাঁহার মতে মনের বিভিন্ন অবস্থাগুলির বিশ্লেষণ করাই মনোবিদ্যার কাজ। তিনি বলেন **সংবেদন** (sensation), **প্রতিরূপ** (image), **অনুভূতি** (affection) এই তিনটি সকল মানসিক অবস্থার 'মূল উপাদান' (element) এবং ইহাদের 'সংমিশ্রণে' বিভিন্ন জটিল অবস্থার উদ্ভব হয়।

টিচ্‌নারের মতের প্রবর্তনের পর হইতেই মনোবিদ্যার উপর জীববিদ্যার

প্রভাব পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। জীববিদ্যার প্রভাবে মনোবিদ্‌গণ মনে করিতে লাগিলেন যে, বাহ্য অবস্থার সহিত প্রতিযোজনের জন্য প্রত্যক্ষ করা, চিন্তা করা, বিচার করা ইত্যাদি মানসিক ক্রিয়া দেখা দেয়। সেই সময় হইতে ক্রিয়াবাদের প্রসার ঘটিতে লাগিল। ক্রিয়াবাদ-প্রচারের ব্যাপারে অগ্রণী হইলেন জে. আর্. এঞ্জেল (J. R. Angell)। টিচ্‌নারের অনুগামিগণ কোন্ কোন্ মানসিক অবস্থা আছে তাহা নিরূপণ করিয়াই আলোচনা সমাপ্ত করিলেন, কিন্তু এঞ্জেল ইত্যাদি ক্রিয়াবাদিগণ কোন মানসিক ক্রিয়া কেন ঘটে এবং কিরূপে দেখা দিল তাহাই আলোচনা করিতে লাগিলেন।

ক্রিয়াবাদের প্রচলনের পর হইতেই অবয়ববাদের আন্দোলন ক্রমশঃ স্তিমিত হইয়া আসিল। আজিকার দিনের মনোবিদ্যার বিভিন্ন সম্প্রদায়—যথা, ওয়াট্‌সনের ব্যবহারবাদ, ম্যাক্‌ডুগালের উদ্দেশ্যসাধনবাদ, কফ্‌কা ইত্যাদির 'গেস্টাল্‌ট্'বাদ, ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণবাদ—সবই ক্রিয়াবাদের সমর্থক। এই দিক্ হইতে দেখিলে আমরা বলিব যে, অবয়ববাদ মনোবিদ্যার ইতিহাসে এক পরিসমাপ্ত অধ্যায়। তবে আধুনিক পরীক্ষণমূলক মনোবিদ্যার ভিত্তি-স্থাপনায় ইহার অবদান অপরিসীম ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে।

২। ব্যবহারবাদ বা চেষ্টিতবাদ (Behaviorism) ঃ

মনোবিদ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত করিবার প্রচেষ্টা করেন ভুণ্ড্‌ট্; কিন্তু তিনি কেবল চেতনার বিশ্লেষণ করিয়া বিভিন্ন মানসিক উপাদান আবিষ্কারের চেষ্টা করেন এবং এইজন্য প্রধানতঃ অন্তর্দর্শনের পন্থা তিনি অবলম্বন করেন; তাঁহার অনুসৃত পথ অবলম্বন করেন টিচ্‌নার। (পূর্ব অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

এইপ্রকার মনোবিদ্যার বিরুদ্ধে বর্তমান শতকের প্রারম্ভে যাঁহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন জন্ বি. ওয়াট্‌সন্ (John B. Watson) তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার মতবাদের নাম **চেষ্টিতবাদ বা ব্যবহারবাদ (Behaviorism)।** এই মতের সমর্থকেরা **মানুষকে একটি সজীব যন্ত্র মনে করেন।** যন্ত্রের পরিচয় উহার কার্য বা ব্যবহারের মাধ্যমে। সুতরাং মানুষেরও পরিচয় তাহার বাহ্য ক্রিয়া বা ব্যবহারের মাধ্যমে। 'মানুষকে জানিতে হইলে তাহার

বাহ্য ক্রিয়া পরিদর্শন করিতে হইবে'—এই কথা ভুণ্ডট্, টিচ্‌নার ইত্যাদি মনস্তাত্ত্বিকেরা বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া ওয়াটসন্ অভিযোগ করেন।[১] প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় মনস্তাত্ত্বিকেরা আত্মাকেই মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু মনে করিতেন; ভুণ্ডট্ ইত্যাদি 'আত্মা' শব্দের পরিবর্তে 'চেতনা' পদের ব্যবহার প্রচলন করিলেন—ওয়াট্‌সনের মতে ভুণ্ডটের দলের ইহাই একমাত্র 'অবদান'; কিন্তু ইহার সার্থকতা বিশেষ কিছুই নাই, কারণ তথাকথিত এই চেতনা-সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিতে পারি না।

ব্যবহারবাদের প্রসারে কেবলমাত্র ভুণ্ড্‌টীয় মনোবিদ্যার প্রতি বিরোধি-মনোভাবই ইন্ধন প্রদান করিয়াছিল তাহা নহে। প্রাণি-মনোবিদ্যা (animal psychology)-তে অন্তর্দর্শনের কোন স্থান নাই; সেই প্রাণি-মনোবিদ্যা ওয়াট্‌সনের সময়ে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল। সুতরাং তিনি ভাবিলেন যে, অন্তর্দর্শন পরিহার করিয়া প্রাণি-মনোবিদ্যা যেরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছে, সেইরূপ মানুষের মনের আলোচনাও অন্তর্দর্শন পরিহার করিলে সুফল পাইবে।[২] থর্নডাইক্ (Thorndike), বেক্‌টেরেভ্ (Bechterev), পাভ্‌লভ্ (Pavlov) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক মনুষ্যেতর বিভিন্ন জীবের উপর গবেষণা করিয়া যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, সেগুলি ব্যবহারবাদ গঠনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

এখন ব্যবহারবাদের মূল কথা আলোচনা করা যাউক্ঃ

(১) ব্যবহারবাদীরা তাঁহাদের আলোচনায় 'মন' ও 'চেতনা' পদ সর্বদাই পরিহার করিয়া চলেন; শুধু তাহাই নহে, যে পদ 'মন' ও 'চেতনার' অস্তিত্ব-মাত্রও ইঙ্গিত করে এমন পদের ব্যবহার তাঁহারা যুক্তিযুক্ত মনে করেন

১ "......visual observation of how people actually behave is a much more reliable way of testing assumptions about human behaviour than reliance on introspective evidence...After all, they said, what are these externally unobservable goings-on which were referred to as mental contents? Are not these queer 'imageless thoughts' very unsubstantial and impure data......?" (Brett's ***History of Psychology,*** Abridged Ed., p. 664).

২ **ওয়াট্‌সনের ভাষায়,** "......a statement in terms of objective results would be far more valuable......If this is done, work......on the human being will be directly comparable with the work on animals."

না। যেমন, তাঁহারা 'সংবেদন' (sensation) পদটি ব্যবহার না করিয়া 'প্রতিক্রিয়া' পদটি ব্যবহার করেন; অর্থাৎ আমরা যাহাকে চাক্ষুষ সংবেদন (visual sensation), রাসন সংবেদন (gustatory sensation) ইত্যাদি বলিব, ব্যবহারবাদীরা সেইগুলিকে চাক্ষুষ প্রতিক্রিয়া (visual reaction), রাসন প্রতিক্রিয়া (gustatory reaction) ইত্যাদি বলিবেন।

মোট কথা, **আমরা যেগুলিকে মানসিক অবস্থা বলিয়া থাকি, ব্যবহারবাদীরা সেইগুলিকে বাহ্য-উদ্দীপক-প্রসূত ব্যবহার বা ক্রিয়া** বলিয়া বর্ণনা করেন। তাঁহারা এইজন্য **'উদ্দীপক→প্রতিক্রিয়া'** (Stimulus→Response, বা সংক্ষেপে, S→R) এই সূত্র সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন।

(২) ব্যবহারবাদীরা কোন **সহজাত সংস্কার** (instinct)**-এ বিশ্বাসী নহেন।** কোন সহজাত সংস্কারে বিশ্বাস করিতে হইলে সংস্কারের ধারক ও বাহক হিসাবে মানসিক সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। এইজন্য তাঁহারা সহজ-প্রবৃত্তি বা সংস্কারে বিশ্বাসী নহেন।

(৩) আমরা সচরাচর বিশ্বাস করি যে, জন্মাবধি প্রতি ব্যক্তিই বংশ-পরম্পরায় কতকগুলি গুণের অধিকারী হয়। **ব্যবহারবাদীরা বংশ-প্রভাব** (heredity)**-এর পরিবর্তে পরিবেশ** (environment)**-কে ব্যক্তিত্বের একমাত্র উপাদান বলিয়া মনে করেন।** মন বলিয়া যদি কিছু না থাকে, তাহা হইলে কোন ব্যক্তি পূর্বপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মানসিক গুণের অধিকারী হইবে, এ কথা স্বীকার করা যায় না।[৩] যে-কোন শিশুকে যে-কোন পরিবেশের মধ্যে রাখিয়া আমরা তাহাকে আমাদের পছন্দমত

৩ পরিবেশবাদ (Environmentalism) যে কেবলমাত্র ব্যবহারবাদীরাই সমর্থন করেন, তাহা নহে; তবে ব্যবহারবাদ পুরাপুরি সমর্থন করিলে শেষ পর্যন্ত পরিবেশবাদকেই মানিতে হয়। ওয়াট্‌সন্ যে সহজ-প্রবৃত্তি ও বংশপ্রভাবের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলেন, তাহাও ধীরে ধীরে। ১৯১৪ সালে যখন তিনি প্রাণি-মনোবিদ্যার উপর পুস্তক রচনা করেন, তখনও তিনি সহজ প্রবৃত্তি-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯২৪ খৃঃ অব্দে যখন তাঁহার *'Behaviorism'* গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তখন তিনি পরিবেশবাদের পূর্ণ সমর্থক হ'ন। মানুষের ব্যক্তিত্বের উপর পরিবেশের একচ্ছত্র আধিপত্য ঘোষণা করিয়া তিনি বলেন, "......any type of specialist I might select—doctor, lawyer, artist merchant-chief and, yes, even beggar-man and thief, regardless of his talents, penchants, tendencies, abilities, vocations and race of his ancestors." (***Behaviorism,*** p. 82).

ব্যক্তিত্ব দান করিতে পারি, ইহাই ওয়াট্‌সন্‌ দাবী করেন। যদি আমরা কোন শিশুকে দার্শনিক করিতে চাহি, তাহা হইলে আশৈশব তাহাকে দার্শনিকদের গোষ্ঠীতে রাখিয়া দিলেই চলিবে। আবার যদি তাহাকে দস্যু বা ডাকাত করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাকে ডাকাতদের দলে রাখিলেই হইবে।

(৪) আবেগসম্বন্ধে ব্যবহারবাদীরা বলেন যে, উহা মনের অনুভূতি নহে। মনই নাই ত' মনের অনুভূতি থাকিবে কি করিয়া? **তথাকথিত আবেগ দেহযন্ত্রের পরিবর্তন বা আলোড়ন ব্যতীত আর কিছুই নহে।** আবেগের সময় আমাদের মুখমণ্ডল, স্বরযন্ত্র, বাহুযুগল, পদযুগল ইত্যাদি অবয়বে এক বিশেষ পরিবর্তন দেখা দেয়। তাহা ছাড়া, দেহের অভ্যন্তরে অন্ত্র ও গ্রন্থিগুলি দ্বারাও পরিবর্তন সাধিত হয়। **আবেগ অর্থে ঐ সমস্ত বাহ্য ও আভ্যন্তর (বিশেষতঃ, আভ্যন্তর) পরিবর্তনের সমন্বয় বুঝায়।**[৪]

(৫) স্মৃতিসম্বন্ধে সাধারণ বিশ্বাস এই যে, মনের অবচেতন স্তরে পুরাতন অভিজ্ঞতার প্রতিরূপগুলি (images) থাকে এবং অনুষঙ্গের (association) ফলে উহারা জাগরিত হয়। ব্যবহারবাদীরা মন এবং উহার চেতন-অবচেতন স্তরে আস্থাবান্‌ নহেন; এইজন্য তাঁহাদের পক্ষে স্মৃতির ব্যাখ্যাদান নিতান্ত দুরূহ। ব্যবহারবাদী ওয়াট্‌সন্‌ শেষ পর্যন্ত বলিলেন যে, **তিনি 'স্মৃতি' বলিয়া কোন মানস অবস্থা স্বীকার করেন না এবং তথাকথিত স্মৃতি এক প্রকার পূর্বরচিত বাক্‌যন্ত্রীয় বা আন্তরযন্ত্রীয় সংগঠন মাত্র।**[৫]

(৬) শিক্ষণ (learning) সম্বন্ধেও ব্যবহারবাদীরা এক বিচিত্র

---

৪ ওয়াট্‌সন্‌ প্রক্ষোভ বা আবেগকে প্রধানতঃ আন্তরযন্ত্রীয় পরিবর্তন বলিয়া মনে করেন। তাঁহার ভাষায়, "Notwithstanding the fact that in all emotional responses there are overt factors, such as the movement of the eyes and the arms and the legs and the trunk, visceral and glandular factors predominate." (*Behaviorism*, p. 130). আবেগ সম্বন্ধে ব্যবহারবাদীদের এই মতবাদ জেম্‌স্‌ ও লাঙ্গে প্রদত্ত মতবাদ (*James-Lange Theory of Emotion*)-এর সহিত তুলনীয়।

৫ ওয়াট্‌সন্‌ বলেন, "The behaviorist never uses the term 'memory'," "Memory in the behaviorist's sense is any exhibition of manual, verbal or visceral organization put on prior to the time of the test." (*Ibid.*, pp. 177, 190).

মতবাদ পোষণ করেন। তাঁহারা বলেন যে **সকল শিক্ষণই সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া** (conditioned reflex)-**এর ফল**।

প্রতিবর্ত ক্রিয়া এমনই একটি সরল অনৈচ্ছিক ক্রিয়া যাহাতে উদ্দীপকের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগমাত্র তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়; যেমন, চক্ষুর উপর হঠাৎ প্রখর আলোকপাত হইলে, আমরা তৎক্ষণাৎ চক্ষু মুদিত করি; আবার, হস্ত যদি হঠাৎ কোন উত্তপ্ত বস্তুর সংস্পর্শে আসে, তৎক্ষণাৎ আমরা উহা সরাইয়া লই। এইসব ক্রিয়ার উপর আমাদের ইচ্ছাশক্তির কোন প্রভাব নাই—আমাদের গঠনই এইরূপ যে ইন্দ্রিয় ও উদ্দীপকের সংযোগ ঘটিলে উপযুক্ত কার্য **করিতেই** হইবে।

বেক্‌টেরেভ্‌ ও পাভ্‌লভ নামক দুইজন রুশীয় শরীরতত্ত্ববিৎ প্রত্যাবর্তক বা প্রতিবর্তক ক্রিয়া লইয়া গবেষণা করেন। পাভ্‌লভ্‌ কুকুরের উপর পরীক্ষা চালাইয়া দেখেন যে, কুকুরকে মাংস দিবার সময় যদি কয়েক দিন ধরিয়া ঘণ্টা বাজান যায়, তাহা হইলে পরে ঘণ্টা বাজাইলেই কুকুরের লালানিঃসরণ হয়। এই কার্যকে বলে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত (conditioned reflex) ক্রিয়া। এখানে লালানিঃসরণ একটি প্রতিক্রিয়া। ইহার সাধারণ উদ্দীপক ভোজ্যদ্রব্য; কুকুরটির ক্ষেত্রে যখন দেখা গেল যে, ঘণ্টাধ্বনি শুনামাত্র লালানিঃসরণ হইতেছে, তখন উহা সাধারণ উদ্দীপকের 'প্রতিকল্প উদ্দীপক' (substitute stimulus) হিসাবে কার্য করিতেছে বুঝিতে হইবে।

পাভ্‌লভের এই পরীক্ষণ ওয়াট্‌সনের মনকে প্রভাবিত করে। সাধারণতঃ আমরা মনে করি যে, পুরাতন অভিজ্ঞতাকে নূতনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার শক্তি অর্জনই শিক্ষণের ফল। ওয়াট্‌সন্‌ মনকে স্বীকার করেন না। সুতরাং তাঁহার পক্ষে পুরাতন অভিজ্ঞতা সংরক্ষণের প্রশ্ন উঠে না। তিনি যান্ত্রিকতাবাদের সমর্থক; অতএব তিনি সকল কার্যকে যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া বলিয়া বর্ণনা করেন। তাঁহার মতে নূতন শিক্ষণ মাত্রই—তাহা বল খেলাই হউক্‌ বা দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নই হউক্‌—সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া। (পৃঃ ৩৫০)।

(৭) যেহেতু মন বলিয়া কিছু নাই, সেই হেতু 'চিন্তন' বলিয়া কোন মানসিক অবস্থা নাই। **যাহাকে আমরা সচরাচর চিন্তন বলি, তাহা**

৬ বেক্‌টেরেভ্‌ তাঁহার গবেষণার বিষয়বস্তুকে associated reflex or অনুষঙ্গ-প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া বলিতেন।

বাক্‌যন্ত্রের ক্রিয়া মাত্র। ইহাতে প্রশ্ন উঠিতে পারে: চিন্তন যদি বাক্‌যন্ত্রের ক্রিয়ামাত্র হয়, তাহা হইলে যখনই চিন্তা করি, তখনই কোন শব্দ শুনা যায় না কেন? উত্তরে ব্যবহারবাদিগণ বলিবেন: যখন আমরা নীরবে চিন্তা করি, তখনও বাক্‌যন্ত্র ক্রিয়া করে; তবে সে ক্রিয়া এত সূক্ষ্মভাবে পরিচালিত হয় যে কোন শব্দ শুনা যায় না। অতএব **নীরব চিন্তা হইল অনুচ্চারিত বাক্।**[৭]

সমালোচনা:

ব্যবহারবাদের সমালোচনা-কালে প্রথমেই আমাদের মনে হয় যে, ইহা **বিদ্রোহী মনের চরম মতবাদ।** ভুণ্ড্‌ট্ ও জেম্‌সের মনোবিদ্যার বিরোধিতা করিতে যাইয়া ওয়াট্‌সন্ যে কেবল অন্তর্দর্শনই পরিহার করিলেন তাহা নহে, শেষ পর্যন্ত তিনি মনকেই অস্বীকার করিয়া বসিলেন। আমরা কিন্তু বুঝিতে পারি না যে মনকে বাদ দিয়া কি করিয়া মনোবিদ্যা সম্ভব হয়? এ কথা সত্য যে, মন অন্যান্য জড়পদার্থের ন্যায় বাহ্য দ্রব্য নয় যে উহাকে কোন বাহ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যাইবে; কিন্তু তাই বলিয়া ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় না যে মনের কোন সত্তা নাই। **অন্তর্দর্শনের দ্বারা সকল মানসিক অবস্থা সকল সময় সঠিকভাবে জানা না যাইতে পারে, কিন্তু বিভিন্ন মানসিক অবস্থার পশ্চাতে যে 'অহং-জ্ঞান' আছে তাহা কি অস্বীকার করা যায়?**

ইহা সত্য যে, অন্তর্দর্শনের ক্ষেত্রে ভুলভ্রান্তি হইতে পারে, কিন্তু সেই কারণে কি অন্তর্দর্শন পরিহার করা যুক্তিসঙ্গত? মনোবিদ্যা এমনই একটি বিষয় যাহা কেবল বিষয়গত পদ্ধতি বা বাহ্যদর্শন (objective method)-এর উপর নির্ভর করিতে পারে না; কারণ অন্তর্দর্শন হইতে প্রাপ্ত জ্ঞানের আলোকে বাহ্যদর্শনের সুবিধা হয়। যে কখনও নিজের মনকে জানে না, সে অপরের মনের বাহ্য প্রকাশগুলিকে ব্যাখ্যা করিবে কি করিয়া?

৭ Thought=subvocal speech.

৮ যদি 'মন' বলিয়া কিছু না থাকে, তাহা হইলে ওয়াট্‌সন্ ১৯১৯ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত তাঁহার পুস্তকের নাম *Psychology from the Standpoint of a Behaviorist* দিলেন কেন? 'Psychology' পদটি psyche অর্থাৎ আত্মা শব্দ হইতে উদ্ভূত। তাহা হইলে কি বলিতে হইবে যে মনের সত্তা অস্বীকার করিলেও তিনি 'মন'-পদটির মায়া ত্যাগ করিতে পারেন নাই?

মানুষের ব্যবহার বা ক্রিয়া অতীব জটিল। এই সব জটিল ব্যবহারকে 'উদ্দীপক→প্রতিক্রিয়া' (বা S→R) এই সরল সূত্রদ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নহে। যেমন, যদি ব্যবহারবাদ সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, যখন অধ্যাপক 'ক্লাসে' প্রবেশ করিলেন, তখন 'উদ্দীপক' অর্থাৎ ছাত্রছাত্রী দর্শন মাত্র তাঁহার বিষয়বস্তু তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন এবং যেই ঘণ্টা শুনিলেন, তখন এই নূতন উদ্দীপক আসিয়া পুরাতন উদ্দীপকের কার্যকারিতা নষ্ট করিয়া দিল এবং অধ্যাপক ঘর হইতে বাহিরে চলিয়া যাইলেন (পৃঃ ১৭ দ্রষ্টব্য)। ব্যবহারবাদী ব্যতীত কেহই এই অদ্ভুত ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবেন না। অধ্যাপনা-রূপ উচ্চ স্তরের কার্য কেন, এমন কি অতি সাধারণ কার্যও (যেমন, ট্রামে বাসে উঠা-নামা ইত্যাদি), মনহীন যন্ত্রের দ্বারা সম্ভব নহে; কারণ **সকল ক্ষেত্রেই সমগ্র পরিস্থিতি বুদ্ধি দ্বারা বুঝিলে তবেই উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া সম্ভব**।[১]

ওয়াট্‌সন্‌ বংশপ্রভাবকে অস্বীকার করিয়া ব্যক্তিত্বের অন্যতম প্রয়োজনীয় 'উপাদান'-কে অস্বীকার করিয়াছেন। **মানুষের ব্যক্তিত্ব কেবলমাত্র পরিবেশ-দ্বারাই গঠিত নহে**। মানুষের ব্যক্তিত্বের উপর পরিবেশের প্রভাব আছে ইহা সুনিশ্চিত; কিন্তু তাই বলিয়া পরিবেশের পরিবর্তন ঘটাইয়া ব্যক্তিত্বের আমূল পরিবর্তন করা যায়, ইহা স্বীকার্য নহে। ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য (individual differences) লইয়া আধুনিক কালে যে সমস্ত বিজ্ঞান-সম্মত অনুসন্ধান করা হইয়াছে, তাহাতে **বংশপ্রভাব** যে **ব্যক্তিগত পার্থক্য বহুলাংশে ঘটাইয়া থাকে** ইহা স্বীকৃত হইয়াছে।

আবার, সহজবৃত্তিকে অস্বীকার করিয়া ওয়াট্‌সন্‌ ভুল করিয়াছেন। **মানুষের ভিতর সহজবৃত্তি বা সহজাত সংস্কার এবং বুদ্ধিশক্তির সমন্বয় ঘটিয়াছে**। যেমন, ক্ষুধা মানুষের একটি সহজবৃত্তি। বাহিরের কোন উদ্দীপকের সহিত সংযোগ স্থাপিত না হইলেও ক্ষুধার প্রবৃত্তি ভিতর হইতে আসে; অর্থাৎ ক্ষুধার তাড়না বাহ্য উদ্দীপক দ্বারা জাগরিত হয় না বা খাদ্যের প্রাথমিক আকাঙ্ক্ষার জন্য কোন প্রকার অভিজ্ঞতা বা শিক্ষার প্রয়োজন হয় না।

১ উড্‌ওয়ার্থের W—S—Ow—R—W এই সূত্রের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য (পৃঃ ৯—১১)।

আবেগের যে ব্যাখ্যা ওয়াট্‌সন্‌ দিয়াছেন, তাহাও **গ্রহণযোগ্য নহে।** সাধারণ মত হইল যে আবেগ মানসিক ধারণা হইতে উদ্ভূত বা উহার সহিত জড়িত। ওয়াট্‌সন্‌ মনকে অস্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং তিনি আবেগ বা প্রক্ষোভকে দৈহিক প্রকাশের সহিত এক করিয়া ফেলিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে, আমাদের স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতেই দেখিতে পাই যে, **এই দৈহিক প্রকাশ-গুলি মানসিক অনুভূতির অনুগমন করে। সুতরাং এই দুইটি এক নহে।**

শিক্ষণসম্বন্ধে ব্যবহারবাদী যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাও বিশেষ সুষ্ঠু নহে। সকল প্রকার শিক্ষণকার্যকে ওয়াট্‌সন্‌ যান্ত্রিক প্রতিবর্ত ক্রিয়ারই রূপান্তর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। **মানুষের ক্রিয়া অতীব জটিল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। তাহার এই ক্রিয়ার জটিলতা ও বৈচিত্র্যকে কোন একটি বিশেষ ক্রিয়াতেই রূপান্তরিত করা যায় না।** সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার জন্য প্রয়োজন আদি (original) উদ্দীপক এবং প্রতিকল্প (substitute) উদ্দীপকের অনুষঙ্গ। আমাদের প্রশ্ন হইলঃ যখনই আমরা কোন কিছু শিখিবার চেষ্টা করি, তখনই কি আদি উদ্দীপক ও প্রতিকল্প উদ্দীপক কিছু দিন বা কয়েকবার সর্বদাই পাশাপাশি থাকে? তাহা ছাড়া, সকল শিক্ষণেরই মূলে প্রতিবর্ত ক্রিয়া থাকে, ইহা কি সত্য? মোটরগাড়ী চালনা শিক্ষার কথা ধরা যাউক্‌। যে অর্থে হঠাৎ চোখের উপর তীব্র আলো পড়িলে সকলে চোখ বুজিয়া ফেলি, সেই অর্থে মোটরগাড়ী কি সকলের ক্ষেত্রেই সাধারণ উদ্দীপকভাবে একটি সাধারণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে? তাহা ছাড়া, এখানে আদি উদ্দীপকই বা কী, আর প্রতিকল্প উদ্দীপকই বা কী? বাস্তবিকই শিক্ষণমাত্রই সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া হইতে পারে না।

মনকে অস্বীকার করার ফলে চিন্তনসম্বন্ধে ওয়াট্‌সন্‌ অতি অদ্ভুত ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার মতে চিন্তন মাত্রেই বাক্‌যন্ত্রের ক্রিয়া (কখনও বা সরব আর কখনও বা নীরব)। ইহা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে আমরা অনেক সময় চিন্তা প্রকাশের জন্য উপযুক্ত শব্দের অভাব বোধ করিতাম না, কারণ যখনই চিন্তা করি তখনই ত' ওয়াট্‌সনের মতে বাক্‌যন্ত্র ক্রিয়া করিতেছে, আর বাক্‌যন্ত্রের ক্রিয়ার ফলেই ত' শব্দের সৃষ্টি। তাহা ছাড়া, যদিও বা 'চিন্তন=বাক্‌যন্ত্রের ক্রিয়া' ইহা সত্য হয়, তাহা

হইলেও কি আমরা বলিতে পারি 'বাক্‌যন্ত্রের ক্রিয়া=চিন্তা'? অনেক সময়, কিছু না বুঝিয়াও আমরা মুখস্থ বলিয়া যাইতে বা পড়িয়া যাইতে পারি; অর্থাৎ চিন্তা নাই, অথচ বাক্‌যন্ত্র ক্রিয়া করিয়া যাইতেছে।[১০] **বাস্তবিক চিন্তা কোন যান্ত্রিক ক্রিয়া নহে—ইহার মধ্যে বোধশক্তি বা ধী-শক্তির প্রয়োজন**। সুস্থ মনের চিন্তার মধ্যে একটি সুসামঞ্জস্য থাকে বা চিন্তাধারাগুলির মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র থাকে এবং চিন্তা বিভিন্নমুখী, বৈচিত্র্যময় ও অভিনবত্ব-পূর্ণ হইতে পারে। যান্ত্রিকতাবাদের সাহায্যে এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা সম্ভব নহে।

৩। গেস্টাল্ট্ মতবাদ (Gestalt Psychology):

'গেস্টাল্ট্' (gestalt) একটি জার্মান শব্দ। ইহার সঠিক প্রতিশব্দ নির্ণয় করা দুরূহ। ইহার মোটামুটি অর্থ হইল **'আকার'** বা **'রূপ'**। ইংরাজী 'ফর্ম' (form) 'প্যাটার্ন' (pattern) বা 'কন্‌ফিগারেশন' (configuration) ইহার প্রতিশব্দ ধরা হয়। ইহার পরিভাষা বা প্রতিশব্দ দুরূহ বলিয়া মূল জার্মান পদটিই সচরাচর ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

ব্যবহারবাদের ন্যায় গেস্টাল্ট্ মতবাদও পূর্বপ্রতিষ্ঠিত মতবাদের বিরোধিতা করিয়া অগ্রসর হয়। ভুণ্ড্ট্ ইত্যাদি মনোবিদ্‌গণ মানসিক অবস্থার বিশ্লেষণ করাকেই মনোবিদ্যার প্রধান কার্য মনে করিলেন। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে, যে-কোন জটিল মানসিক অবস্থা কতকগুলি মূল উপাদানের সমন্বয় এবং ঐ সমন্বয় অনুষঙ্গের ফলে সাধিত হয়।

গেস্টাল্ট্‌বাদীরা এই মতবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তাঁহারা বলেন যে, **বিশ্লেষণের ফলে মানসিক অবস্থার স্বরূপ জানা যায় না**। ইট, পাথর, চুণ, সুরকি ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ উপাদানের সাহায্যে যেভাবে

---

১০ উড্‌ওয়ার্থ বলেন: "I personally do not accept the equation, thought=speech......I often have difficulty in finding the word required to express a meaning which I certainly have 'in mind'. I get stuck, not infrequently, for even a familiar word. Another reason is that you certainly cannot turn the equation around and say that speech=thought." (*Contemporary Schools of Psychology*, p. 75).

একটি বাড়ী তৈয়ারী হয়, সেইভাবে **বিভিন্ন উপাদানের সাহায্যে কোন মানসিক অবস্থা গঠিত হয় না।**[১১]

গেস্টাল্ট্‌বাদ বনাম ব্যবহারবাদ ঃ

যদিও ব্যবহারবাদীদের ন্যায় গেস্টাণ্ট্‌বাদীরা পূর্বতন মতবাদের বিরোধিতা করেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক্।

(১) ব্যবহারবাদী এবং গেস্টাণ্ট্‌বাদীরা ভুণ্ডট্ ও টিচেনার দ্বারা অনুসৃত অন্তর্দর্শন-প্রণালী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু ব্যবহারবাদীরা অন্তর্দর্শন-প্রণালী ত্যাগ করেন, যেহেতু তাঁহাদের মতে 'মন' বলিয়া দেহ হইতে পৃথক্ কোন মানসিক সত্তা নাই; আর গেস্টাণ্টবাদীরা বলেন যে, অন্তর্দর্শন সম্ভব, কিন্তু অন্তর্দর্শনের উদ্দেশ্য যদি মানসিক অবস্থার বিশ্লেষণ হয়, তাহা হইলে ইহা নিরর্থক।

(২) ব্যবহারবাদী ও গেস্টাণ্ট্‌বাদীরা উভয়েই 'সংবেদন'-রূপ সরল উপাদান পরিত্যাগ করিয়াছেন। ব্যবহারবাদীরা বলেন, সংবেদন বলিয়া কোন মানসিক অবস্থা নাই, উহা প্রকৃতপক্ষে দৈহিক ক্রিয়া-বিশেষ; আর গেস্টাণ্ট্‌বাদীরা বলেন যে, সংবেদনরূপ কোন পৃথক্ 'সরল উপাদান' নাই।

(৩) ব্যবহারবাদী ও গেস্টাণ্ট্‌বাদীরা উভয়েই অনুষঙ্গবাদের বিরোধিতা করেন। ব্যবহারবাদীদের বিরোধিতার কারণ হইল যে, অনুষঙ্গবাদীরা অভিজ্ঞতা ও মানসিক অবস্থার উপর আস্থাশীল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেহাতিরিক্ত কোন মানসিক অবস্থা নাই। গেস্টাণ্ট্‌বাদীদের বিরোধিতার কারণ হইল যে, তাঁহাদের মতে মানসিক অবস্থাগুলিকে বিশ্লেষণ করা যায় না এবং অনুষঙ্গরূপ কোন বাহ্যশক্তি উহাদের সমন্বয় সাধন বা সংগঠন করিতে পারে না।

গেস্টাল্ট্ মতবাদের বৈশিষ্ট্য ঃ

গেস্টাণ্ট্ মতবাদের প্রথম অভ্যুদয় জার্মানীতে ১৯১২ খৃঃ অব্দে হইয়াছিল বলা যায়। এই মতের প্রবর্তক হইলেন মাক্স ভের্টহাইমের (Max

১১ অনুষঙ্গবাদী পূর্বতন মনোবিদ্‌গণের মনোবিদ্যাকে ইঁহারা 'Brick-and-mortar-psychology' বলিয়া ব্যঙ্গ করিতেন। গেস্টাণ্ট্ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে অনুষঙ্গবাদের সমালোচনার জন্য Köhler-প্রণীত *Gestalt Psychology* দ্রষ্টব্য।

Wertheimer), কুর্ট কফ্‌কা (Kurt Koffka) এবং ভোল্‌ফগাঙ্‌ কোয়েলার (Wolfganag Köhler)।[১২]

গেস্টাল্ট মতবাদের মূল কথা হইল যে, আমরা **সকল বস্তুকেই সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষ করি, কোন বস্তুর অংশগুলি পৃথক্ পৃথক্ প্রত্যক্ষ করি না** এবং যে সকল ক্ষেত্রে বিভিন্ন বস্তুগুলি পরস্পরের **অতি নিকটবর্তী** অথবা যাহাদের ভিতর **সাদৃশ্য** আছে, সেইরূপ বস্তুগুলি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে **না** দেখিয়া **সমষ্টিগতভাবে দেখি।**

গেস্টাল্ট্‌ বা সামগ্রিক আকার লইয়া যথাযথভাবে পরীক্ষণ শুরু করেন ভের্ট্‌হাইমের। তাঁহার বিষয়বস্তু ছিল নিশ্চল ছবির ভিতর গতি-প্রত্যক্ষ (perception of movement)। তিনি ছবির পরিবর্তে সরলরেখা ব্যবহার করিয়াছিলেন। যদি প্রথমে একটি সরলরেখা দেখান হয় এবং তাহার অব্যবহিত পরেই,—যেমন ১/১৬ সেকেণ্ড বা ০·০৬০ সেকেণ্ড বাদেই—যদি একই আকারের অপর একটি সরলরেখা দেখান হয়, তাহা হইলে মনে হয় যে একই রেখা যেন একস্থান হইতে অপর স্থানে সরিয়া গেল। ঐ দুইটি রেখা প্রক্ষেপণের সময় যদি আরও কমাইয়া দেওয়া হয় (যেমন, উহা যদি ১/৩০ বা ০·০৩০ সেকেণ্ড করা হয়), তাহা হইলে আর কোন গতি প্রত্যক্ষ করা যাইবে না, তবে দুইটি সরলরেখাকে একই সময়ে পাশাপাশি দেখা যাইবে। আবার; যদি একটি লম্বভাবে অবস্থিত সরলরেখার পরই একই আকারের আর-একটি সমান্তরাল রেখা অতি অল্প ব্যবধানের পরই দেখা যায়, তাহা হইলে মনে হয়, যেন একই রেখা ৯০° কোণ গঠন করিয়া পড়িয়া গেল (পৃঃ ৬০৪)।

তখন ভের্ট্‌হাইমের সিদ্ধান্ত করিলেন যে, এইরূপ ক্ষেত্রে আমাদের গুরুমস্তিষ্ক (cortex বা cerebrum) প্রথমে একটি রেখার অবস্থিতি, পরে আর-একটি রেখার অবস্থিতি প্রত্যক্ষ করিয়া পরে উহাদের সংশ্লেষণ করে না। এরূপক্ষেত্রে প্রথম সংবেদনের প্রতিক্রিয়া দ্বিতীয়টিতে অন্তর্হিত হইয়া যায়।

১২ এই তিন জনের পদবীর আদি অক্ষর লইয়া কেহ কেহ গেস্টাল্ট্‌-সম্প্রদায়কে K K. W. সম্প্রদায় বলেন। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, ইঁহাদেরও পূর্বে এরেন্‌ফেল্‌স্ (Ehrenfels) ১৮০০ খৃঃ অব্দে শব্দ-সংবেদন লইয়া গবেষণা করিবার সময় gestalt qualität পদটি ব্যবহার করিয়াছিলেন।

পূর্বতন মনোবিদ্‌গণ বলিতেন যে, একই বস্তুর অবস্থিতি আমরা যদি পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন বিন্দুতে প্রত্যক্ষ করিয়া যাই, তাহা হইলে অনুমান করি যে উহা গতিশীল। গেস্টাল্ট্‌বাদীরা কিন্তু বলেন যে, গতিসম্বন্ধে জ্ঞান প্রত্যক্ষলব্ধ। সেইরূপ প্রাক্তন মনোবিদ্‌রা বিশ্বাস করিতেন যে, দূরত্বসম্বন্ধে জ্ঞানও অনুমানলব্ধ, কিন্তু গেস্টাল্ট্‌বাদীরা বলেন যে উহা প্রত্যক্ষলব্ধ।[১৩]

গেস্টাল্ট্‌বাদীরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে যদি বিভিন্ন বস্তুকে সমষ্টিভুক্তভাবে বা 'সমগ্র'ভাবে দেখি (পৃঃ ৫৮৩-৮৪)—

(ক) যে সব বস্তু পরস্পরের **সন্নিকটবর্তী**—যেমন, একটি ক্ষেত্রে যদি অনেকগুলি বিন্দু থাকে, যেগুলি পরস্পরের নিকটবর্তী—সেইগুলিকে একত্র প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি।

(খ) যে সব বস্তুর মধ্যে **সাদৃশ্য** আছে, যেমন, একটি ক্ষেত্রে আমরা কতকগুলি ত্রিভুজ এবং কতকগুলি বৃত্ত অঙ্কিত থাকে, তাহা হইলে সদৃশ বস্তুগুলিকে—ত্রিভুজগুলিকে বা বৃত্তগুলিকে—আমরা সমষ্টিগতভাবে প্রত্যক্ষ করি।

(গ) যদি কোন সমগ্র বস্তুর অংশগুলি বিভিন্ন অবস্থায় পরস্পরের নিকটবর্তী থাকে, তাহা হইলে আমরা উহাদের **বিচ্ছিন্নতা অগ্রাহ্য** করিয়া একটি সমগ্রবস্তু প্রত্যক্ষ করি; যেমন, একটি বৃত্তকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখিলে উহাদের বৃত্তাংশরূপে না দেখিয়া সমগ্র বৃত্তরূপেই দেখি।

(ঘ) যদি বিভিন্ন বস্তু **একই দিকে গতিশীল** হয়, তাহা হইলে উহাদের একত্রে প্রত্যক্ষ করি, যেমন, অনেকগুলি মোটরগাড়ী যদি একই দিকে ছুটিতে থাকে, তাহা হইলে সমষ্টিগতভাবে উহাদের গতিকে দেখি।

তাহা ছাড়া, গেস্টাল্ট্‌বাদীরা **মূর্তি** (figure) এবং **পটভূমি বা ক্ষেত্র** (ground), এই দুইটির পারস্পরিক সম্বন্ধ লইয়াও আলোচনা করিয়াছেন। সাধারণ বিশ্বাস এই যে, আমরা এক একটি বস্তুকে পৃথক্‌ভাবে দেখি। কিন্তু গেস্টাল্ট্‌বাদীরা বলেন, যখন **কোন বস্তুর মূর্তি** (figure) **আমরা**

১৩ এরেন্‌ফেল্‌স্‌ ও অষ্ট্রীয় সম্প্রদায়ের মনোবিদ্‌গণ সংবেদন ও প্রত্যক্ষের মধ্যে পার্থক্য করিতেন। এরেন্‌ফেল্‌স্‌ বলিতেন যে, প্রত্যক্ষকারী ব্যক্তির ইন্দ্রিয় পৃথক্‌ পৃথক্‌ সংবেদন গ্রহণ করে এবং পরে প্রত্যক্ষকারী উহাদের মধ্য হইতে 'সমগ্র মূর্তি' গঠন করিয়া লয়। ভের্টহাইমের, কোয়েলার ও কফ্‌কা —অর্থাৎ বার্লিন সম্প্রদায়ের মনোবিদ্‌গণ—বলেন যে, যদিই বা সংবেদনের পৃথক্‌ অস্তিত্ব থাকে, গুরু-মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুমণ্ডলীতে উদ্দীপক পৌঁছিবামাত্র উহা সামগ্রিক আকার বা প্যাটার্নে রূপান্তরিত হয়।

প্রত্যক্ষ করি, তখন উহাকে উহার ক্ষেত্র বা পটভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি না। নদীতীরবর্তী কোন বৃক্ষকে প্রত্যক্ষ করিবার সময় আমরা বৃক্ষকে পৃথক্‌ভাবে দেখি না—বরং 'নদীতীর'-এই পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতেই বৃক্ষটিকে দেখি।[১৪]

সেইরূপ বিভিন্ন বিশেষ অবস্থার উপযুক্ত প্রতিযোজক কার্য (adaptive behaviour) করিবার সময়ও আমরা 'সমগ্র অবস্থা'র পরিপ্রেক্ষিতেই উপযুক্ত প্রতিযোজক ক্রিয়া উদ্ভাবন করিয়া থাকি। যখন কোন বুদ্ধিশীল জীব নূতন অবস্থার সম্মুখীন হয়, তখন কী ভাবে কার্য করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, সে সম্বন্ধে তাহার মনে অন্তর্দৃষ্টি বা পরিজ্ঞান (insight) জাগে। এক্ষেত্রে গেস্টাণ্ট্‌বাদীরা আরও বলেন যে, কোন কার্য অসিদ্ধ অবস্থায় থাকা এবং কার্য সিদ্ধ হইলে যেরূপ অবস্থা হইবে, এই উভয়ের মধ্যে যে 'অন্তরায়' (gap) আছে, তাহা আমরা মনে মনে বা কল্পনাদ্বারা পূরণ করি—এই পূরিত অবস্থা কী হইবে তাহা পূর্ব হইতে বুঝিতে পারার ক্ষমতাই হইল 'পরিজ্ঞান'।[১৫]

গেস্টাণ্ট্ মতবাদ ধীরে ধীরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রসার লাভ করিয়াছে। কুর্ট লেভিন্ (Kurt Lewin) এই মতবাদকে মানসিক ইচ্ছা (motivation)-এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রত্যক্ষের সময় যেমন ক্ষেত্র ও মূর্তি (ground and figure) পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে, সেইরূপ সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ ব্যক্তি-মনের ইচ্ছার উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই স্থলে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ হইল 'ক্ষেত্র'-বিশেষ।[১৬]

উপসংহার :

ব্যবহারবাদীদের বিদ্রোহ যেমন একটি বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া জাগাইয়া তুলিয়াছিল, গেস্টাণ্ট্‌বাদীদের বিদ্রোহ কিন্তু সেরূপ কোন তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে নাই। তবে গেস্টাণ্ট্‌বাদ যে সর্বত্র সমভাবে স্বীকৃত, তাহা নহে।

---

১৪ বর্তমান গ্রন্থের ঊনবিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৫ বর্তমান গ্রন্থের পঞ্চদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৬ Lewin-এর মতবাদের জন্য *A Dynamic Theory of Personality* এবং *Principles of Topological Psychology* দ্রষ্টব্য।

ইটালায় মনোবিৎ রিগ্‌নানো (Rignano) ইহার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, 'গেস্টাল্ট্‌' পদটির অর্থ সুনিশ্চিত নহে—ইহা কখনও বিভিন্ন সংবেদনের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ বুঝায়, আবার কখনও ইহা 'অর্থ' বা 'বস্তু' এই অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তাহা ছাড়া, প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী আবেগ ও অনুভূতি দ্বারা কিরূপ প্রভাবিত হয়, তাহা লইয়া গেস্টাল্ট্‌বাদীরা কোন আলোচনা করেন নাই।

যাহা হউক, গেস্টাল্ট্‌বাদ প্রত্যক্ষ ও শিক্ষণের ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা করিয়াছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

৪। মনঃসমীক্ষণ (Psychoanalysis) :

(ক) ফ্রয়েডীয় মতবাদ—

মনঃসমীক্ষণের উদ্ভব হইয়াছিল মানসিক রোগনিরাময়ের কৌশল হিসাবে, কিন্তু ক্রমশঃ ইহা হইতে একটি পৃথক্ মনঃ-সম্বন্ধীয় তত্ত্ব বা মতবাদ (theory) সৃষ্ট হয়।

মতের উদ্ভব :

এই মতবাদের প্রধান প্রবর্তক হইলেন জিগমুণ্ড্‌ ফ্রয়েড (Sigmund Freud)। ১৮৫১ সালে চেকোস্লোভাকিয়ায় ইঁহার জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতে তিনি ভিয়েনায় ছিলেন এবং সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ভেষজ-বিদ্যায় শিক্ষা গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি শারীরবিদ্যার গবেষণাগার (physiological laboratory)-তে দেহতত্ত্বসম্বন্ধে গবেষণা করিতে থাকেন; কিন্তু পরে জীবিকা অর্জনের জন্য তিনি ১৮৮১ সাল হইতে চিকিৎসকের বৃত্তি অবলম্বন করেন। সেই সময় ফ্রান্সের লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক শারকো (Charcot)-এর খ্যাতি বহুদূর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল এবং ১৮৮৫ সালে ফ্রয়েড তাঁহার নিকট গমন করেন। এই ফরাসী চিকিৎসকের নিকট ফ্রয়েড্‌ ক্রমাগত শুনিতে লাগিলেন যে, সকল মানসিক রোগেরই মূলে আছে কামপ্রবৃত্তি (sexuality)। পরবৎসর ভিয়েনা প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি হিষ্টিরিয়া রোগীর চিকিৎসা আরম্ভ করেন। তিনি তাঁহার চিকিৎসাকার্যে সম্মোহন বা সংবেশন (hypnosis) পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তিনি এই ব্যাপারে জোসেফ্‌ ব্রয়ার (Josef Breuer) নামক এক প্রবীণ

চিকিৎসকের সহযোগিতা লাভ করেন। তাঁহারা দুই জনেই চিকিৎসার জন্য সংবেশন-পদ্ধতি অবলম্বন করেন এবং লক্ষ্য করেন যে, সংবিষ্ট অবস্থায় (hypnotized state-এ) রোগী তাহার 'মনের কথা' বলিয়া যাইতে পারিলে অনেকটা সুস্থতা লাভ করে। তখন তাঁহারা 'মনের কথা' বলিয়া যাওয়া পদ্ধতি (talking out method)-এর উপকারিতা বুঝিতে পারিলেন। ইহার নামকরণ হইল **অভিস্ফোট** (abreaction) বা **বিরেচন** (catharsis)। বাস্তবিক, অভিস্ফোট হইল উপায় বা প্রক্রিয়া, এবং বিরেচন হইল তাহার ফল।

যাহা হউক্ ব্রয়ার পরে এইরূপ রোগীর চিকিৎসা পরিত্যাগ করিলেন; কারণ একটি বিশেষ ক্ষেত্রে ব্রয়ার লক্ষ্য করিলেন যে, এক রোগিণী ক্রমশঃ তাঁহার প্রতি আসক্তা হইয়া পড়িতেছে। ইহাতে ব্রয়ারের ভয় হইল যে, তাঁহার সুনামের ক্ষতি হইবে এবং সেইজন্য তিনি এইরূপ চিকিৎসাকার্য হইতে বিরত হইলেন। ফ্রয়েড্ কিন্তু বিচলিত হইলনে না। তিনি এই বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, চিকিৎসক এইরূপ ক্ষেত্রে প্রকৃত প্রেমাস্পদ হইতে পারেন না, তিনি প্রকৃত প্রেমাস্পদের প্রতিকল্প (substitute) মাত্র। সুতরাং দেখা ইতেছে যে, অবদমিত প্রেমাকাঙ্ক্ষা বা অন্য কোন আবেগ প্রকৃত 'বস্তুর' অভাবে অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুতে সংক্রমিত (transferred) হয়। ফ্রয়েড্ ক্রমশঃ সংবেশনের পদ্ধতি ছাড়িয়া দেন এবং অভিস্ফোটকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করেন। তিনি এই পদ্ধতিকে **'অবাধ ভাবানুষঙ্গ-পদ্ধতি'** (**Free association method**) এই নূতন নামে অভিহিত করেন। মোট কথা, ফ্রয়েড্ মনে করিলেন যে, যত সামান্য বা যত তুচ্ছই হউক্, রোগী যদি মনের বাঁধন আল্‌গা করিয়া দিয়া বিনা বাধায় তাহার মনের কথা বলিয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে সে সুস্থতার পথে যাইবে।

অবদমিত ইচ্ছার প্রাধান্য :

এইভাবে ধীরে ধীরে ফ্রয়েডের মতবাদ গড়িয়া উঠিতে লাগিল। ফ্রয়েড যে মনোবিদ্যার ভিত্তিস্থাপন করেন তাহার মূল কথা হইল যে, **আমাদের মানসিক সকল কার্যই কামজ** (libidinous বা erotic)। মন স্থিতিশীল

কোন সত্তা নহে—ইহা গতিশীল ; বাসনা, কামনা, ইচ্ছা ইত্যাদিই হইল মনের ধর্ম। যেহেতু আমাদের ইচ্ছা যৌনপ্রবৃত্তি (libido বা sex instinct) দ্বারা পরিচালিত এবং যেহেতু আমাদের সমাজব্যবস্থায় ইহার পূরণ সম্ভব নহে, সেইহেতু আমাদের অধিকাংশ ইচ্ছাই **অবদমিত** (repressed) থাকে। এইসব **অবদমিত ইচ্ছা** সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত না হইয়া **মনের নির্জ্ঞান স্তরে** (unconscious) থাকে এবং স্বপ্ন, মানসিক রোগের লক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে উহারা আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।

স্বপ্নে আমরা যে সব প্রতিরূপ (image) প্রত্যক্ষ করি বা রোগের মধ্যে যেসব লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকি, উহারা সকলেই অবদমিত ইচ্ছা (যাহা আসলে হইল যৌন-আকাঙ্ক্ষা) দ্বারা নির্ধারিত। স্বপ্নে যাহা পরিস্ফুট বা ব্যক্ত থাকে (যাহাকে ইংরাজিতে বলা যাইতে পারে *manifest content*), তাহাই উহার আসল অর্থ নহে ; উহার পশ্চাতে থাকে প্রকৃত অর্থ এবং উহা সুপ্ত বা লীন থাকে (ইংরাজিতে ইহাকে বলে *latent content*)। সুপ্ত বা অব্যক্ত অর্থ এতই 'মন্দ' বা সামাজিক আদর্শ-বিরোধী যে উহা আত্মগোপন করিয়া 'নিরপরাধী'র আকার ধারণ করিয়া থাকে, এবং ঐ সুপ্ত বাসনা 'প্রতীক' (symbol)-এর সাহায্যে নিজেকে প্রকাশ করে।[১৭] হিষ্টিরিয়া ইত্যাদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ করে (যেমন, হাত-পা ছোঁড়া ইত্যাদি) সে সমস্তই যৌনক্রিয়ারই রূপান্তর[১৮] এবং উহাদের মাধ্যমে অবদমিত যৌনাকাঙ্ক্ষা তৃপ্তিলাভের পথ খুঁজিয়া বেড়ায়।

মনের স্তর-বিভাগ :

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ফ্রয়েড্ অবদমিত ইচ্ছার আধাররূপে মনের মধ্যে নির্জ্ঞান স্তর (unconscious stage)-এর কল্পনা করিয়াছেন। মনকে তিনি তিনটি স্তরে ভাগ করিয়াছেন—**সংজ্ঞান বা চেতন** (conscious), **আসংজ্ঞান** (preconscious) এবং **নির্জ্ঞান বা অবচেতন**

১৭ বর্তমান গ্রন্থে 'স্বপ্ন' সম্বন্ধে আলোচনা (পৃঃ ৬৫৮-৬৬২) দ্রষ্টব্য।

১৮ এই সব লক্ষণগুলিকে বলা হইয়াছে pantomimic representations of sex act.

(**unconscious**)। যাহা সম্বন্ধে আমরা বর্তমানে জ্ঞাত আছি, তাহা লইয়া 'সংজ্ঞান'-স্তর গঠিত। উহার পরেই আছে 'আসংজ্ঞান-স্তর'।[১৯] যাহা এখন সংজ্ঞান-স্তরে আছে, তাহা আসংজ্ঞান-স্তরে যাইতে পারে এবং যাহা আসংজ্ঞান-স্তরে আছে তাহা সহজেই সংজ্ঞান বা চেতনের স্তরে উঠিতে পারে। তাহার পরে আছে **নির্জ্ঞান স্তর**। **অবদমিত বা সুপ্ত বাসনা-কামনার ইহাই আধার**। নির্জ্ঞান স্তরের উপাদানগুলি স্মৃতির দ্বারা সহজলভ্য নহে। ইহাদের যেন কতকটা জোর করিয়া এখানে পাঠান হইয়াছে।

আর একদিক হইতে মনকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—**অহং** (**ego**), **অদস্ বা ইদম্** (**id**) এবং **অধিশাস্তা** (**super-ego**) (১নং চিত্র)। 'অদস্' বা 'ইদম্' নির্জ্ঞান-স্তরকে ব্যাপিয়া আছে এবং ইহা হইল সহজপ্রবৃত্তির শক্তির উৎস। ইহা অহং এবং অধিশাস্তার বিপরীতধর্মী। 'অধিশাস্তা' আমাদের নৈতিক জ্ঞানের বা অনমনীয় বিবেক (**conscience**)-এর সহিত তুলনীয়। 'অহং' হইতেছে বিচক্ষণতা (**prudence**)-এর প্রতীক, আর 'অদস্'কে বলা যাইতে পারে সহজ প্রবৃত্তির আদিম বিদ্রোহী ভাব। 'অহং' যেন বাহ্য সমাজ ও অদসের দাবীর আপোষ-নিষ্পত্তির কার্যে ব্যাপৃত; অর্থাৎ উহা একবার অদসের দাবী মিটাইবার চেষ্টা করে, আর একবার বাহ্য জগতে সামাজিক আদর্শ পালন করার
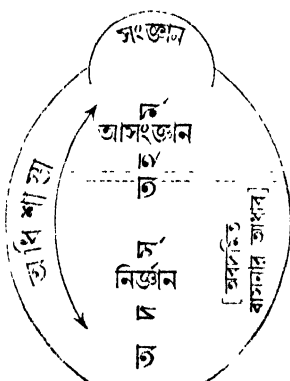
১ নং চিত্র
উপরের চিত্রে ফ্রয়েডীয় মতানুসারে মনের বিভিন্ন স্তরের নির্দেশ করা হইয়াছে।
[ফ্রয়েডের *New Introductory Lectures* দ্রষ্টব্য]।

১৯ আসংজ্ঞান-স্তরকে চিকিৎসকের গৃহের ante-chamber-এর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মনের এই স্তর-বিভাগ আপেক্ষিক। ফ্রয়েডের ভাষায় ইহাদের মধ্যে 'sharp dividing lines' নাই। (Freud, *New Introductory Lectures on Psychoanalysis*, p. 105 দ্রষ্টব্য)।

চেষ্টা করে। যে সব বাসনা সামাজিক আদর্শের একান্ত বিরোধী সেইগুলিকে "অহং' পুনর্বার 'অদস্'-এর রাজত্বে ফেরত পাঠাইয়া দেয়।

ঈডিপাস্ এষণা—

অধিশাস্তার উদ্ভব হইয়াছিল আদিম মানবের মধ্যে। প্রতি শিশুই কতকাংশে উত্তরাধিকারসূত্রে ইহা প্রাপ্ত হয়; আবার প্রতি শিশুর অন্তরে ইহা নূতন করিয়া সৃষ্ট হয়। শিশুর ব্যর্থ যৌন কামনা হইতে ইহার উদ্ভব হয়। শিশুও যৌন-কামনার প্রেরণায় কামনার বস্তু খুঁজিয়া বেড়ায় এবং তাহার যৌন অনুযায়ী পিতামাতার একজনের মধ্যে তাহার কামনার পাত্রকে পায়, অর্থাৎ পুং-শিশু মাতার প্রতি এবং স্ত্রী-শিশু পিতার প্রতি আসক্ত হয়। ইহারই নাম ফ্রয়েড্ দিয়াছেন **ঈডিপাস্ এষণা বা গূঢ়ৈষা** (Œdipus complex)।

গ্রীক্ উপাখ্যানে ঈডিপাস্ একটি করুণ চরিত্র। তিনি ছিলেন থীব্‌সের রাজার সন্তান। তাঁহার জন্মের সময় দৈববাণী হয় যে, ভাবীকালে তিনি পিতৃহন্তা হইবেন এবং পিতাকে হত্যা করিয়া মাতাকে বিবাহ করিবেন। সুতরাং জন্মের পর তাঁহার পিতা শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে নির্বাসন দিলেন। প্রতিবেশী রাজ্যের এক রাজা শিশুটিকে গ্রহণ করিয়া লালন-পালন করিতে লাগিলেন এবং শিশুও তাহার বংশপরিচয় সম্বন্ধে অজ্ঞ রহিল। যৌবনে একবার তিনি "দৈববাণী মন্দির" পরিদর্শন করেন এবং সেইখানে তিনি শুনিলেন যে, তিনি পিতাকে হত্যা করিয়া মাতাকে বিবাহ করিবেন। ইহাতে তিনি পালক-পিতার গৃহ পরিত্যাগ করেন, কারণ তিনি পালক-পিতাকেই প্রকৃত জনক বলিয়া জানিতেন। বিদেশে ভ্রমণকালে তাঁহার প্রকৃত পিতার সহিত সাক্ষাৎ হয়। পিতৃ-পরিচয় তাঁহার নিকট অজ্ঞাত রহিল। পিতার সহিত তাঁহার বচসা হয় এবং তিনি তাঁহাকে হত্যা করেন। ক্রমশঃ তিনি থীব্‌স্-এ পৌঁছিলেন এবং সেখানে তিনি এক গোপন সমস্যার সমাধান করিতে পারার জন্য রাজা বলিয়া নির্বাচিত হ'ন এবং মৃত রাজার বিধবাকে বিবাহ করেন। বহুদিন পরে (ঈডিপাস্ যখন এই বিবাহের ফলে চারিটি সন্তানের জনক হইয়াছেন) ঈডিপাস্ প্রকৃত সত্য জানিতে পারেন, অর্থাৎ তিনি তাঁহার প্রকৃত জনককে হত্যা করিয়া স্বীয় জননীকে বিবাহ করিয়াছেন! মনের দুঃখে তিনি নিজের চক্ষু উৎপাটন করিয়া ফেলেন এবং শেষ জীবন নিতান্ত দুঃখের মধ্যে অতিবাহিত করেন।

ঈডিপাসের এই করুণ আখ্যায়িকা হইতে ফ্রয়েড্ এই শিক্ষা গ্রহণ করিলেন: যে, পিতা বা মাতার প্রতি কামনা সকলেরই অন্তরে একান্ত তীব্র থাকে (যদিও ইহা একান্ত নিন্দনীয় বা সমাজ-বিগর্হিত বলিয়া পরিগণিত হয়)। ঈডিপাসের এই সমস্যা সকল শিশুরই অন্তরের একান্ত সমস্যা। বালক-শিশুর অন্তরে মাতার প্রতি আসক্তি জন্মে এবং পিতার প্রতি মন বিদ্রোহী হইয়া পড়ে; ইহাকে ফ্রয়েড আখ্যা দিয়াছেন ঈডিপাস্-এষণা (Œdipus complex) স্ত্রী-শিশুর অন্তরে ইহার বিপরীত এষণা (inverted œdipus complex)। থাকে। শিশুর অন্তরে এইজন্য একটা সংগ্রাম চলিতে থাকে এবং এই সংগ্রাম বা দ্বন্দ্ব চতুর্থ বা পঞ্চম বৎসর পর্যন্ত চলিতে থাকে। এই দ্বন্দ্বের সমাধান যদি সুষ্ঠুভাবে সাধিত হয়, তাহা হইলে উত্তর জীবনে শিশুর ব্যক্তিত্ব সুসমঞ্জস হইতে পারে; নহিলে তাহার ব্যক্তিত্বের গতি ব্যাহত হয়।

তবে এক্ষেত্রে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঈডিপাস্-এষণার গতি সর্বদাই সরল পথে চলে না; প্রতি শিশুরই ভিতর উভয়লিঙ্গত্ব (bisexuality) থাকে বলিয়া অবস্থা জটিল হয়। ইহার ফলে পুং-শিশু হয়ত' পিতার প্রতি বৈরীভাব ত্যাগ করে এবং মাতার সহিত একাত্মতা (identification) স্থাপিত করিয়া পিতার ভালবাসা পাইবার চেষ্টা করিতে পারে; অর্থাৎ শিশুর অন্তরে একটা উভয়মুখিতা বা উভয়বলতা (ambivalence) দেখা দেয়।[২০]

বিবিধ বৈপরীত্য:

ফ্রয়েড্ **আর-একটি দ্বৈতভাবের বা বৈপরীত্য** (polarity)-এর উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইল জীবনের আকাঙ্ক্ষা এবং মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা এই

---

২০ ফ্রয়েড বলিয়াছেন: "One gets the impression that the simple Œdipus complex is by no means its commonest form, but rather represents a simplification or schematization which, to be sure, is often enough or adequate for practical purposes...... A boy has not merely an ambivalent attitude towards his father and an affectionate object-relation towards his mother, but at the same time he also behaves like a girl and displays an affectionate feminine attitude to his father and a corresponding hostility and jealousy towards his mother. It is this complicating element introduced by bisexuality that makes it so difficult to obtain a clear view of the facts." (*The Ego and the Id*, pp. 42-43.)

দুইয়ের বৈপরীত্য। প্রথমটি হইল **প্রাণশক্তি** (Eros) আর দ্বিতীয়টির নাম **আত্মধ্বংস-বৃত্তি** (Death instinct); প্রাণশক্তি (eros)-এর মধ্যে কাম অন্তর্ভুক্ত—ইহারই জন্য মানুষের আত্মরক্ষার চেষ্টা দেখা যায়।[২১] ফ্রয়েড্ কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করেন যে, মানুষের মধ্যে যেমন আত্মরক্ষার চেষ্টা থাকে, সেইরূপ আবার তাহার মধ্যে আত্মধ্বংসেরও চেষ্টা থাকে। তাই মানুষ কখনও আত্মহত্যা করে, আবার কখনও কখনও মৃত্যু সুনিশ্চিত জানিয়াও সেই পথে যায়।[২২]

কামের মধ্যে আবার আর-একপ্রকার বৈপরীত্য আছে। ইহা হইতেছে **ধর্ষকাম** (sadism) এবং **মর্ষকামের** (masochism) বৈপরীত্য। কামের ক্ষেত্রে আমাদের ব্যবহারে বিপরীতধর্মিতা দেখা যায়। কখনও কখনও কেহ কেহ **প্রেমাস্পদকে যন্ত্রণা দিয়া সুখলাভ** করে—ইহারা হইল ধর্ষকামী; আবার কখনও কখনও কেহ কেহ **প্রেমাস্পদের নিকট যন্ত্রণা বা ব্যথা পাইয়া সুখলাভ** করে—ইহারা হইল মর্ষকামী।[২৩] ফ্রয়েড্ 'ধর্ষকামী' পদটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন এবং সকলপ্রকার

---

২১ প্রথমে ফ্রয়েড্ যৌনবৃত্তি এবং অহং-বৃত্তি (sexual instinct ও ego-instinct)—এই দুইয়ের মধ্যে বৈপরীত্যের কথা বলিতেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, যৌনবৃত্তি বাহ্য বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট এবং অহং-বৃত্তির লক্ষ্য আত্মরক্ষা ও আত্মগরিমা। মনঃসমীক্ষণের আরও প্রগতির ফলে ফ্রয়েড্ লক্ষ্য করিলেন যে, কামের বস্তু অহং নিজেই; সুতরাং অহং-বৃত্তির মধ্যেই কাম অন্তর্ভুক্ত এবং উহাদের মধ্যে বৈপরীত্যের কথা বলা সমীচীন নহে। আরও কিছু দিন পরে ফ্রয়েড্ বলিলেন কাম (libido) প্রাণশক্তি (Eros)-এর বিকাশ এবং ইহার সহিত বৈপরীত্য আছে আত্মধ্বংস-বৃত্তি (death instinct)। ফ্রয়েডের ভাষায়: "We are venturing on the further step of recognising the sexual instinct as the Eros, the all-sustaining......Our standpoint was a dualistic one from the beginning, and is so to-day more sharply than before, since we no longer call the contrasting tendencies egoistic and sexual instincts, but life-instincts and death-instincts." (*Beyond the Pleasure Principle*, p. 67.) তিনি আবার বলেন: "The picture which life presents to us is the result of the working of the Eros and the death-instinct together and against each other." (*The Problem of Lay Analysis*, p. 291.)

২২ এইজন্যই কি আমরা শিকারে যাই, যানবাহনপূর্ণ বিপদসঙ্কুল রাস্তায় বাইসাইকেল চড়ি, সমুদ্রে সাঁতার কাটি, পাহাড়ের চূড়ায় উঠিতে যাই? কে জানে!

২৩ নিপীড়নের মধ্য দিয়া যৌনতৃপ্তিলাভের বাসনার ইংরাজী নাম sadism হইয়াছে de Sade নামক এক ফরাসী ঔপন্যাসিকের নামানুসারে। কারাবস্থায় তিনি কতকগুলি উপন্যাস রচনা করেন যাহাতে তিনি এইরূপ বিকৃত যৌনরুচিসম্পন্ন চরিত্র অঙ্কন করেন। সেইজন্য এইরূপ বিকৃতি যৌনরুচির নাম হইয়াছে sadism।

অত্যাচার, নিপীড়ন বা যন্ত্রণাদানের পশ্চাতে ধর্ষকামের অস্তিত্ব আছে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন। তাহা ছাড়া, তিনি বলেন যে, প্রতি শিশুই তাহার জীবনের প্রথম তৃতীয়-চতুর্থ বৎসরে পায়ুকাম ও মর্ষকামের অবস্থা (anal-sadistic stage)-এর মধ্য দিয়া যায়। এই অবস্থায় যেমন নিজের মলমূত্রাদির প্রতি আসক্তি থাকে, সেইরূপ অন্যকে নিপীড়নেরও ইচ্ছা থাকে।

ধর্ষকাম ও মর্ষকাম সর্বদাই যে দৈহিক নিপীড়নের রূপ ধারণ করে, তাহা নহে—গৌণ বা বিকল্প উপায় (symbolic form)-এও ইহাদের তৃপ্তি হইতে পারে। যেমন, প্রেমাস্পদকে সর্বসমক্ষে তিরস্কার করিয়া বা হীন প্রতিপন্ন করিয়া ধর্ষকামী তৃপ্তিলাভ করে, আবার আত্মসমর্পণ বা আত্মত্যাগের মধ্য দিয়া মর্ষকামী চরিতার্থতা লাভ করিবার চেষ্টা করে।

মানসিক রোগীর চিকিৎসাকালে ফ্রয়েড্ এক বিকৃত ধরণের স্ব-কামী (auto-erotic) ব্যক্তি লক্ষ্য করেন। তিনি দেখেন যে, এইসব লোকের কাম বহির্মুখী নয়—ইহা অন্তর্মুখী। অর্থাৎ বাহ্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি কামাসক্ত না হইয়া ইহা নিজের প্রতি কামাসক্ত হয়। অতএব কামের মধ্যে স্ব-কাম ও পর-কামের বৈপরীত্য দেখা দেয়। এই **স্ব-কামের** নাম ফ্রয়েড্ দিয়াছেন **নার্সিসাসতুল্যকাম** (narcissism)।[২৪] স্বকামী ব্যক্তি নিজের রূপ বার বার অবলোকন করিয়া, নিজের চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া, নিজের কথা ভাবিয়া তৃপ্তি পায়।

সংক্ষেপে বলিতে পারা যায় যে, ফ্রয়েডের মতে মনের মধ্যে বহুবিধ বৈপরীত্য ও দ্বন্দ্ব বিদ্যমান ; যথা :

(১) সংজ্ঞান বনাম নির্জ্ঞান,

(২) প্রাণশক্তি বনাম আত্মধ্বংসকামনা,

(৩) ধর্ষকাম বনাম মর্ষকাম,

(৪) স্ব-কাম বনাম পর-কাম।

২৪ নার্সিসাস ছিলেন গ্রীক উপাখ্যানের এক আত্মবিভোর যুবক। তিনি এক তরুণীর প্রেম উপেক্ষা করেন। হতাশায় তরুণীটি ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন। আর ইহার ফলে নার্সিসাসের প্রতি শাস্তি হইল যে, তিনি এক ঝরণার ধারে আমরণ দাঁড়াইয়া নিজের প্রতিবিম্ব অবলোকন করিয়া জীবন অতিবাহিত করিবেন। মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ ফুলগাছে রূপান্তরিত হইল ; এই ফুলেরও নাম নার্সিসাস বা নার্সিস্।

(খ) আড্‌লারের মতবাদ—ব্যক্তি-মনোবিদ্যা বা প্রাতিস্বিক মনোবিদ্যা (Individual Psychology) :

ফ্রয়েড্‌কে কেন্দ্র করিয়া মনঃসমীক্ষণবাদীদের যে সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল ক্রমশঃ তাহাতে ভাঙ্গন দেখা দিল। ফ্রয়েডের ভিয়েনা সম্প্রদায় হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন ভিল্‌হেল্‌ম্‌ স্টেকেল (Wilhelm Stekel) ও ফ্রিৎস্‌ ভিটেল্‌স্‌ (Fritz Wittels)—তাঁহাদের সহিত সামান্য ব্যাপারেই ফ্রয়েডের মতবিরোধ হয়। পরে গভীরতর কারণে দুইজন অনুগামীর সহিত ফ্রয়েডের মতবিরোধ ঘটে—তাঁহারা হইলেন আল্‌ফ্রেড্‌ আড্‌লার (Alfred Adler) ও কার্ল য়ুঙ্গ্‌ (Carl Jung); ইঁহাদের পরে ফ্রয়েডের দল ত্যাগ করেন অটো র‍্যাঙ্ক (Otto Rank)। আমরা বর্তমান অনুচ্ছেদে আড্‌লারীয় মতবাদ আলোচনা করিব।

ভিয়েনার উপকণ্ঠে পেনৎসিঙ্গ (Penzing) নামক স্থানে ১৮৭০ খৃঃ অব্দে আড্‌লারের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা শস্যব্যবসায়ী ছিলেন এবং তাঁহার পিতামাতা উভয়েই হাঙ্গেরীর ইহুদী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রতি অনুরাগ ছিল। তিনি ১৮৯৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে চিকিৎসাশাস্ত্রে উপাধি লাভ করেন এবং ভিয়েনার হাসপাতালে কার্য গ্রহণ করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, তখনকার দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানে যে শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহাতে মানসিক রোগীর চিকিৎসা-ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা হইত না। তখনকার দিনে ফ্রান্সে শার্‌কো ও পিয়ের জানে (Pierre Janet)[২৫] মানসিক রোগীর চিকিৎসায় বিশেষ সাফল্য অর্জন করেন; এবং ফ্রয়েড্‌ও তখন ধীরে ধীরে খ্যাতিলাভ করিতেছিলেন। আড্‌লার ইঁহাদের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হ'ন এবং ক্রমশঃ তিনি ফ্রয়েডের অনুগামী হ'ন।[২৬]

২৫ পিয়ের জানে বলিতেন মানসিক রোগের অন্যতম কারণ অসম্পূর্ণতা-বোধ (***sentiment d'incompletude***)—ইহারই আলোকে আড্‌লার তাঁহার "হীনতাবোধ" বা হীনমন্যতা (inferiority feeling) সম্বন্ধীয় মতবাদ গঠন করেন। তিনি বলেন : 'Janet's emphasis upon the neurotic's ***sentiment d' incompletude*** is so wholly in harmony with the results offered by me that I am justified in seeing in my work an extension of this most important fundamental fact of the mental life of the neurotic." (***The Neurotic Constitution*** : Introduction.)

২৬ একটি মত হইতেছে, ফ্রয়েড্‌ যখন একবার Vienese School of Medicine-এ

১৯০৭ সালে আড্‌লার 'অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সম্বন্ধে হীনতাবোধ' (*Minderwertigkeit von Organen* বা Inferiority of Organs) এই বিষয়ে পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তখন হইতে ফ্রয়েড্ ও তাঁহার ভক্তবৃন্দ সন্দেহ করিতে লাগিলেন যে, আড্‌লার যদিও ফ্রয়েডের গ্রন্থ হইতে তাঁহার পুস্তকে উদ্ধৃতি দিয়াছিলেন, তিনি পূর্ণভাবে ফ্রয়েডীয় কামবাদ (doctrine of libido) গ্রহণ করেন নাই। ফ্রয়েড্ বলিতেন যে, শিশুর সকল কার্যাবলী সুখান্বেষণ-প্রবৃত্তি (pleasure-seeking) হইতে উদ্ভূত এবং 'সুখ' অর্থে তিনি কামজ সুখ বুঝিতেন। আড্‌লার যদিও বলিলেন যে, সুখান্বেষণ-প্রবৃত্তির সহিত শিশুর কু-অভ্যাস সংশ্লিষ্ট, তাহা হইলেও উহা মুখ্য কারণ নহে; মুখ্য কারণ হীনতাবোধ (inferiority complex)। **কোন অসুস্থ বা বিকৃত অঙ্গ থাকার জন্য শিশুর মনে হীনতাবোধ দেখা দেয় এবং তাহারই প্রতিবাদে শিশুর কু-অভ্যাস বা অন্য কোন মানসিক রোগের উদ্ভব হয়।**[২৭]

বাস্তবিক কোন অঙ্গ বিকৃত বা অসুস্থ নাও থাকিতে পারে; কিন্তু মানসিক অসুস্থতার জন্য এক মানসিক হীনতাবোধ গড়িয়া উঠে। মনের দিক্ হইতে একটা অভাব বোধ থাকিলে তাহারই প্রতিকারকল্পে নানারূপ কার্য দেখা দেয়। মোট কথা, **শক্তির বা ক্ষমতা লাভের আকাঙ্ক্ষা** (will for power) **হইতেই কার্যের উৎপত্তি। ফ্রয়েড্ বলেন, কামই সকল কার্যের প্রেরণা দান করে; কিন্তু আড্‌লার বলেন, আত্মপ্রতিষ্ঠার বাসনা, ক্ষমতালাভের আকাঙ্ক্ষা বা সকলের উপর প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারের ইচ্ছা সকল কার্যের মূল উৎস-স্বরূপ। আমাদের ব্যক্তিত্ব ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে।**

বক্তৃতা দেন, তখন যদিও শ্রোতৃবর্গের অনেকেই বিরুদ্ধ মত পোষণ করিয়াছিলেন, আড্‌লার তাঁহার স্বপক্ষে যান এবং তাঁহাকে সমর্থন করিয়া একটি প্রবন্ধ লেখেন।

আর একটি মত হইতেছে যে, ফ্রয়েডের *Interpretation of Dreams* পড়িয়া আড্‌লার ফ্রয়েডের প্রতি আকৃষ্ট হ'ন।

২৭ আড্‌লার বলেন, "all forms of neurosis and developmental failure are expressions of inferiority and disappointment." (*The Practice & Theory of Individual Psychology.*)

ফ্রয়েডীয় মনোবিদ্যায় মানবমনের নির্জ্ঞান স্তরকে সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে এবং ফ্রয়েডীয়েরা সাধারণতঃ মনে করেন যে, চেতন-স্তর ইহার প্রভাবাধীন। আড্‌লার মনে করেন যে, **চেতন-স্তর এবং নির্জ্ঞান-স্তর কোন ব্যক্তির পরস্পর-বিরোধী দুইটি অংশ নহে, বরং দুইটি মিলিয়া একটি সমগ্র সত্তা। নির্জ্ঞান-স্তরে যাহা হীনতাবোধরূপে দেখা দেয়, চেতন-স্তরে তাহাকেই দূর করিবার ইচ্ছা বা প্রযত্ন দেখা দেয়।**

আবার ফ্রয়েড্‌ বলিয়াছেন যে, কাম তাহার চরিতার্থতার জন্য 'বাস্তবতার সূত্র' (reality principle) ধরিয়া চলে; কিন্তু আড্‌লার বলেন যে, শক্তির আকাঙ্ক্ষার জন্য আমরা বাস্তবের প্রতি দৃষ্টি রাখি না। বরং অবাস্তব কল্পনার মাধ্যমে আমরা আত্মতৃপ্তি লাভের চেষ্টা করি এবং হীনতাবোধের হাত হইতে বাঁচিবার চেষ্টা করি।[২৮]

আড্‌লারের মতে, আমাদের জীবনের **তিনটি প্রধান সমস্যা** হইল **প্রেম, জীবনযাত্রানির্বাহ বৃত্তি ও সামাজিক জীবন** (love, occupation and social life)। ফ্রয়েড্‌ বলেন যে, এই প্রেম সর্বদাই কামজ এবং ইহার চরিতার্থতার বাসনা শৈশব হইতেই দেখা দেয়। তাই শিশুর জীবনে ঈডিপাস্‌-এষণা [২৯] দেখা দেয় এবং ইহারই সুষ্ঠু সমাধানের উপর নির্ভর করে তাহার ভাবী জীবনের ব্যক্তিত্ব। আড্‌লার ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, যৌন-প্রবৃত্তি আমাদের জীবনের একটা বৃহৎ অংশ অধিকার করিলেও ইহাই সব কিছু নহে। শিশু তাহার জীবনে প্রধানতঃ সামাজিক জীবনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। যদি শিশু তাহার সামাজিক জীবনে পরাজয়ের ভাব (defeatism) বোধ না করে, যদি সে আশাবাদী হয়, তাহা হইলে উত্তর জীবনে তাহার যৌনবৃত্তি সুষ্ঠু চরিতার্থতা লাভ করিবে। অপরপক্ষে যদি শৈশব

২৮ Woodworth আড্‌লারীয় মতবাদের ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন: "Where Freud conceived the ego as well-attuned to the reality principle. Adler held that it was specially prone to falsify reality. The phantasies of the individual...consist mainly in...ways of escape from the sense of inferiority." (*Contemporary Schools of Psychology*, p. 173.)

সেইরূপ Lewis Way বলেন: "The individual...adapts not to reality, but to the picture he has formed of reality. He goes through life acting 'as if' his guiding fiction were the reality." (*An Introduction to Adler's Psychology*, p. 91.)

হইতেই সামাজিক জীবনের দৈনন্দিন আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে সে নিজেকে হীন মনে করে এবং তাহার ফলে প্রতিপক্ষের (কাল্পনিক বা বাস্তব) প্রতি যদি সর্বদা একটা ভীতিসঙ্কুল মনোভাব গড়িয়া উঠে, তাহা হইলে তাহার যৌনবৃত্তিও ভাবীকালে সুষ্ঠুভাবে সুনিয়ন্ত্রিত (adjusted) হইতে পারে না।

আড্‌লার বলেন যে, ব্যক্তিমনের প্রকৃত পরিচয় পাইবার জন্য তাহার অতীতের বা শৈশবের যৌন-ইতিহাস পর্যালোচনা করিবার প্রয়োজন নাই— **ব্যক্তির পরিচয় তাহার জীবনযাত্রা-প্রণালীর (style of life) মাধ্যমে। এই জীবনযাত্রা-প্রণালী এবং জীবনাদর্শ কেবলমাত্র বংশ-প্রভাব (heredity) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে—ইহা সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশ (social and family environment) দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবিত।**[৩০]

প্রতি ব্যক্তিরই একটি জীবনাদর্শ থাকে এবং তাহার সকল কার্য ঐ আদর্শের আলোকেই পরিচালিত হয়। সামাজিক জীবনে, উপার্জনের ক্ষেত্রে এবং প্রেমের ব্যাপারে সকল ক্ষেত্রেই ঐ আদর্শ পরিস্ফুট হইয়া পড়ে। জীবনাদর্শ ও জীবনযাত্রা-প্রণালী (style of life) পারিবারিক পরিবেশের মধ্যেই গঠিত হয়। **পারিবারিক জীবনে যে সন্তানের যে স্থান তাহার দ্বারা ব্যক্তিগত আদর্শ অনেকাংশে নিরূপিত হয়।** জ্যেষ্ঠ সন্তানের ইচ্ছা হয় যাহা কিছু পুরাতন আছে, তাহাকে রক্ষা করা—তাই সে রক্ষণশীল। দ্বিতীয় সন্তান প্রথম হইতেই পিছনে পড়িয়া আছে, তাই সে অন্য সকলকে পরাভূত করিবার ইচ্ছা পোষণ করে। কনিষ্ঠ সন্তানেরও এই রকম মনোভাব থাকে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'অতিরিক্ত আদরে' তাহার নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা বেশী। 'আদুরে' ছেলের লক্ষ্য হইল ন্যায়-অন্যায় যে-কোন পন্থায় (অথবা 'আব্দার' দ্বারা) অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করা এবং তাহার হীনতাকে চাপা দেওয়া। আবার প্রতিভাশালী ব্যক্তির সন্তানের মনে পিতা বা মাতার সহিত তুলনার ফলে একটা নৈরাশ্যের ভাব জাগে এবং তাই সে শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার

৩০ দ্রষ্টব্য : Lewis Way—"Adler's Psychology pays equal attention to both heredity and environment. But it makes neither factor into a cause which inescapably determines a person's behaviour." (*Alfred Adler*, p. 82.)

করিয়া অলস হইয়া পড়ে। ঘৃণিত বা অবাঞ্ছিত সন্তান ক্রমশঃ নিজেকে স্বীয় পরিবার হইতে সরাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করে।[৩১]

ব্যক্তিগত জীবনের আদর্শের ও জীবনযাত্রা-প্রণালীর সন্ধান যে কেবলমাত্র পারিবারিক জীবনে ব্যক্তি-বিশেষের স্থান হইতেই জানা যায়, তাহা নহে। **ব্যক্তি-বিশেষের কল্পনা, তাহার শৈশবের ও যৌবনের 'স্বপ্ন', তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভিরুচি, বিতৃষ্ণা, আবার তাহার উঠা-বসা, চলাফেরা এমনকি নিদ্রাকালীন দৈহিক ভঙ্গিমা হইতেও তাহার জীবনাদর্শের খবর পাওয়া যায়।** আড্‌লারের মতে যে ব্যক্তি চিৎ হইয়া ঘুমাইতে ভালবাসেন, তিনি খুব বড় হইতে চান; আবার যিনি চাদর ঢাকা দিয়া কুঁকড়াইয়া শুইতে ভালবাসেন, তিনি যেন সাহস করিয়া কিছু করিতে পারেন না। আবার যিনি উপুড় হইয়া শুইতে ভালবাসেন, তিনি যেন কতকটা একগুঁয়ে স্বভাবের।[৩২]

মানসিক রোগীর চিকিৎসাকালে দেখা যায় যে, সমাজ-জীবনের সহিত প্রতিযোজন (adapt) করিতে না পারিয়া সে নানারকম প্রতিক্রিয়া সুরু করে। **রোগীর মনে প্রথমে হীনতাবোধের সৃষ্টি হয়—এই হীনতাকে দূর করিবার জন্য মিথ্যা মহত্ত্ববোধ (superiority complex)-এর আবির্ভাব হয়। রোগীর রোগের বিভিন্ন লক্ষণগুলি হইতেছে হীনতাকে দূর করিবার প্রচেষ্টা মাত্র।**[৩৩] হীনতাবোধের বিরুদ্ধে

---

৩১ এই দিক্ হইতে বিচার করিলে ইহা কি মনে হয় না যে, ফ্রয়েডের ন্যায় আড্‌লারও পারিবারিক জীবনকে শিশুর ব্যক্তিত্বের প্রধান উপাদান মনে করেন ?

৩২ আড্‌লারের ভাষায় : "When we see a person sleeping upon the back, stretched out like a soldier at attention, it is a sign that he wishes to appear as great as possible. One who lies curled up like a hedgehog with the sheet drawn over his head is not likely to be a striving or courageous character...A person who sleeps on his stomach betrays stubbornness and negativity." (*Problems of Neurosis*, p. 215.)

৩৩ ম্যাক্‌ডুগাল্ ইহাকে ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন : "The neurotic disorder, then, is the product of this morbidly exaggerated desire for superiority, for godlikeness. It is a morbid development or issue of a conflict present in every child." (*An Outline of Abnormal Psychology*, p. 430.)

আবার : "The neurotic, then, aims at an unattainable and fictitous goal and uses fictitious means, his symptoms, in his struggle to reach it." (*Ibid.*, p. 431.)

রোগীর মন যে প্রতিবাদ জানায়—আড্‌লার তাহার নাম দিয়াছেন **পৌরুষ প্রতিবাদ** (**masculine protest**)। আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার ফলে পুরুষ নারী অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী। তাই আড্‌লার হীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নাম দিয়াছেন পৌরুষ প্রতিবাদ।

অনেক সময়ই দেখা যায় যে, মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি মানসিক চিকিৎসা পছন্দ করে না, এমন কি তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। ফ্রয়েডের মতে এই বিরোধিতার উৎস হইতেছে শৈশবের অবদমিত ইচ্ছা। আড্‌লার বলেন যে, এই বিরোধিতা হইতেছে সমগ্র চিকিৎসা-প্রণালীর বিরুদ্ধে—রোগীর অবচেতনস্তরে আশঙ্কা হয় যে, যেহেতু রোগের লক্ষণগুলির মাধ্যমেই নিজের মহত্ত্ব (superiority) প্রতিষ্ঠার সে চেষ্টা করিতেছে, রোগ সারিয়া যাইলে সে কী করিবে, অর্থাৎ কিরূপে তাহার হীনতা দূর হইবে? অথবা, যেহেতু সে হীন, বাস্তব জীবনের কর্তব্য করিতে হইলে কি করিয়া সে সফলতা অর্জন করিবে?

ফ্রয়েডের ন্যায় আড্‌লারও স্বপ্ন-বিশ্লেষণ (dream analysis)-এর প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। তবে ফ্রয়েড্ স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিয়া অতীত জীবনের অবদমিত আকাঙ্ক্ষা জানিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু আড্‌লার মনে করেন যে, **স্বপ্নের মাধ্যমে ব্যক্তির ভবিষ্যতের কল্পনা জানা যায়**—অর্থাৎ **জীবনের সমস্যা সমাধানের জন্য জীবনের আদর্শ কি ভাবে প্রযুক্ত হইতেছে** তাহা বুঝিতে পারা যায়।

পরিশেষে আমরা আড্‌লারের মনোবিদ্যার আর-একটি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিব। ইহা হইল সামাজিকতা-বোধের[৩৪] উপর তাঁহার গুরুত্ব আরোপ। যদিও তিনি তাঁহার মতবাদকে 'ব্যক্তি'-মনোবিদ্যা আখ্যা দিয়াছেন তাহা হইলেও তিনি 'ব্যক্তি' পদটি সাধারণ অর্থে গ্রহণ না করিয়া এক বিশেষ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। **তিনি ব্যক্তিকে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে**

৩৪ আড্‌লার এই প্রসঙ্গে যে জার্মান শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন তাহা হইল *gemeinschaftsgefühl*; ইহার সঠিক অনুবাদ দুরূহ। 'Social feeling', 'social interest', 'human solidarity', 'the connectedness of man to man' ইত্যাদি পদদ্বারা ইহার অর্থ ইংরাজীতে প্রকাশ করা হয়।

দেখেন নাই—'ব্যক্তি' বলিতে তিনি সামাজিক পরিবেশের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত ব্যক্তিই বুঝিয়াছেন।[৩৫]

জীবনের প্রকৃত অর্থ নষ্ট হইয়া যায় যদি সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ দেখান না যায়। যে ব্যক্তি অপরের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে অপরকে দেখে না, যে সব কিছুই নিজের স্বার্থানুসারে ব্যাখ্যা করে, সে পারিবারিক জীবন বা কর্মক্ষেত্রে কোথাও সাফল্য অর্জন করিতে পারিবে না। সামাজিকতাবোধের একান্ত অভাব ঘটিলে পরিণাম নিতান্ত ভয়াবহ হইবে। **সামাজিকতাবোধের অভাব ব্যক্তি-বিশেষকে মানসিক রোগগ্রস্ত বা অপরাধপ্রবণ করিয়া তুলে আর বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জাতির মধ্যে সংঘাত বা সংঘর্ষের সৃষ্টি করে।**[৩৬] ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের উত্তেজনা অনেক পরিমাণে হ্রাস পায় যদি সামাজিকতাবোধের সম্যক্ কৃষ্টিসাধন করা যায়।

আড্‌লার এই প্রসঙ্গে নারীর সমতা বিধানের কথাও বলিয়াছেন। তিনি মনে করেন যে, আমাদের সমাজ জীবনে নারীকে হীন স্থান দান করা হইয়াছে এবং তাহার ফলে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে অনেক অশান্তি দেখা দেয়। পুরুষের সহিত নারীর প্রকৃত সমতাবিধান না করিলে এই অশান্তি দূরীভূত হইবে না।[৩৭]

(গ) য়ুঙের মতবাদ—বৈশ্লেষিক মনোবিদ্যা (Analytical Psychology):

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ফ্রয়েডের প্রাক্তন অনুগামীদের ভিতর যাঁহারা

৩৫ **আড্‌লারের ভাষায়:** "Individual Psychology tries to see individual lives as a whole." (*The Science of Living*, p. 31.)

আড্‌লারীয় দৃষ্টিভঙ্গীকে ব্যাখ্যা করিয়া ড্রাইকুর্স (Dreikurs) **বলেন:** "Adler's system provides the general frame of reference of which a holistic concept of the personality becomes feasible and applicable, through the socio-teleological approach......It implies a recognition of man's social nature and purposive character of all his actions." (*Present-day Psychology*, Ed. by Roback, p. 713).

৩৬ **আড্‌লার বলেন:** "Lack of social interest, always due to an inferiority feeling, drives the individual into neurosis or crime, and groups and nations towards the abyss of self extermination." (Ansbacher & Ansbacher, *The Individual Psychology of Alfred Adler*, p. 140.)

৩৭ **তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন:** "Our civilization is not only a right-handed but a masculine one." (*Problems of Neurosis*, p. 66). **এই প্রসঙ্গে চিত্ত-পত্রিকার (১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যায়) আড্‌লার সম্বন্ধে গ্রন্থকার-রচিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।**

তাঁহার দল ত্যাগ করেন, তাঁহাদের ভিতর একজন বিখ্যাত মনোবিৎ হইলেন **কার্ল গুস্তাভ্ য়ুঙ্**(Carl Gustav Jung)।

সুইৎসারল্যাণ্ডে ১৮৭৫ সালে ২৬শে জুলাই তাঁহার জন্ম হয়। তিনি বাসেলে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সেখানে শিক্ষা সমাপনান্তে মনোরোগ বিদ্যা-বিশেষজ্ঞ (psychiatrist) ভাবে তিনি মানসিক রোগীর চিকিৎসা সুরু করেন। এইভাবে কার্য করার সময় তিনি ফ্রয়েডীয় চিকিৎসা-পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হ'ন এবং উহাকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া সাফল্যলাভ করেন। ১৯০৭ সালে ফ্রয়েডের সহিত ব্যক্তিগতভাবে তিনি পরিচিত হ'ন এবং তিনি ক্রমশঃ ফ্রয়েডের গুণমুগ্ধ অনুগামী হইয়া উঠেন; আবার ফ্রয়েড্ও তাঁহার প্রতি এমন অনুরক্ত হ'ন যে, তিনি য়ুঙ্কে আন্তর্জাতিক মনঃসমীক্ষণবাদ সমিতির সভাপতি করিতে তৎপর হ'ন এবং সফলকামও হ'ন। ফ্রয়েডের সহিত য়ুঙ্গের হৃদ্যতা দীর্ঘস্থায়ী হইল না। য়ুঙ্ ফ্রয়েড্কে শ্রদ্ধা করিলেও তাঁহার মতবাদ পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই—তিনি ফ্রয়েড্কে একদেশদর্শী মনে করিতেন। ১৯১২ সালে তিনি *Psychology of the Unconscious* প্রকাশ করেন—ইহাতে তিনি ফ্রয়েডীয় মতবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেন। ১৯১৩ সালে ফ্রয়েডের সহিত য়ুঙ্গের বিচ্ছেদ ঘটে। ইহার পর হইতে তিনি স্বাধীনভাবে তাঁহার মতবাদ প্রচার করিতে থাকেন। ১৯৬১ সালে ইনি পরলোক গমন করেন।

য়ুঙ্গের মনোবিদ্যার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা এখানে আলোচনা করিব—

(ক) য়ুঙ্ 'কাম' (libido) সম্বন্ধে ফ্রয়েডের মতবাদের পরিবর্তন সাধন করেন। 'Libido' বা কাম বলিতে ফ্রয়েড্ কেবলমাত্র যৌনশক্তিকেই বুঝিয়াছিলেন। য়ুঙ্গ উহাকে ব্যাপক অর্থদান করেন। য়ুঙ্ বলেন যে, উহা **সকল প্রকার সহজ বৃত্তিজনিত শক্তিকেই** (instinctive energy) বুঝায়।[৩৮] তবে তিনি ইহাও বলেন যে, libido-এর দুইটি প্রধান বৃত্তি

---

[৩৮] **য়ুঙ্ বলেন :** "From a broader standpoint ***libido*** can be understood as vital energy or as Bergson's ***elan vital.***"

ল্যাটিন ব্যুৎপত্তির দিকে দেখিলে ইহাই যথার্থ মনে হয়। "The Latin word ***libido*** has

আছে—একটি যৌনবৃত্তি আর একটি পোষণবৃত্তি।[৩৯]

(খ) মানসিক রোগীর রোগনির্ণয়ের ব্যাপারে ফ্রয়েড সাধারণতঃ রোগীর ঈডিপাস-এষণার বা গূঢ়ৈষার কিরূপ সমাধান হইয়াছিল তাহা অনুসন্ধান করিতেন। যুঙ্‌ লক্ষ্য করেন যে, শৈশবে সুষ্ঠু প্রতিযোজনের অভাব হইলেই যে ভবিষ্যতে লোকে মানসিক রোগে আক্রান্ত হইবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। যুঙ্‌ মনে করেন যে, **মানসিক রোগের অব্যবহিত পূর্ববর্তী কারণ হইল নূতন অবস্থায় ব্যক্তি-বিশেষের প্রতিযোজনের অভাব।** ফ্রয়েড্‌ মনে করেন যে, রোগের লক্ষণের মাধ্যমে শৈশবের কল্পনার রাজ্যে রোগীর প্রত্যাবৃত্তি (regression) ঘটে। কিন্তু এরূপ প্রত্যাবৃত্তির কারণ কি? ইহার কারণ শৈশবের অতৃপ্ত কামনা নহে—ইহার কারণ বর্তমানের সমস্যা-সমাধানের ক্ষমতা অভাবে পশ্চাদপসরণ। সুতরাং ফ্রয়েড্‌ যেখানে রোগীর অতীতের মধ্যে রোগের কারণ অনুসন্ধান করেন, যুঙ্‌ সেখানে **বর্তমানের সমস্যাগুলির মধ্যে রোগের কারণ** আবিষ্কারের চেষ্টা করেন।[৪০]

মানসিক রোগীর চিকিৎসার ব্যাপারে যুঙ্‌ ফ্রয়েডের ন্যায় অবাধ ভাবানুষঙ্গ (free association) এবং স্বপ্ন-বিশ্লেষণ (dream-analysis) পদ্ধতি অবলম্বন করেন (অবশ্য যুঙ্‌ **স্বপ্ন-বিশ্লেষণের দ্বারা রোগীর অতীতের ঈডিপাস-এষণা অপেক্ষা বর্তমানের সমস্যার আভাসই পান**)।

(গ) নির্জ্ঞানের স্বরূপ ও বিস্তৃতি লইয়া ফ্রয়েড্‌ ও যুঙের মধ্যে মতভেদ আছে। ফ্রয়েড্‌ নির্জ্ঞানকে প্রতি ব্যক্তিরই ব্যক্তিগত (individual) ব্যাপার মনে করেন—ব্যক্তিগত অতৃপ্ত অবদমিত বাসনা লইয়া উহা গঠিত। যুঙ্‌ মনে করেন যে, **নির্জ্ঞান-স্তরে যে কেবলমাত্র অবদমিত ইচ্ছাই থাকে তাহা নহে, উহার মধ্যে সংজ্ঞান বা চেতন-স্তর হইতে বিচ্ছিন্ন**

by no means an exclusively sexual meaning (though it is frequently used in this way) but has the general sense of desire, longing, urge." (Frieda Fordham, ***An Introduction to Jung's Psychology***, p. 17 fn.).

৩৯ ম্যাকডুগালের ভাষায়: "Jung distinguishes two great instincts as fundamental, two principal differentiations of the ***libido***, namely, sexual and the nutritive." (***Abnormal Psychology***, p. 189)

৪০ যুঙের ভাষায়: "I no longer find the cause of the neurosis in the past but in the present. I ask, what is the necessary task which the patient will not accomplish?" (***Collected Papers on Analytical Psychology***, p. 232.)

উপাদান থাকে ; আবার মনের অগোচরে যাহা শিক্ষা করা হইয়াছে, তাহাও নির্জ্ঞান-স্তরে স্থান পায়।

এই প্রসঙ্গে য়ুঙ্গের মতবাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইল **'সমষ্টিগত বা জাতিগত নির্জ্ঞান'** (*collective or racial unconscious*) সম্বন্ধে মতবাদ। (২নং চিত্র)। আমাদের নির্জ্ঞানের মধ্যে যে কেবল মাত্র ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষার সন্ধান পাওয়া যায় তাহা নহে—**উহার মধ্যে জাতির বা বিশেষ বিশেষ মানবগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষারও সন্ধান পাওয়া যায়।** এক একটি জাতি এক বিশেষ ধরণে বা আদর্শে ভাবিয়া থাকে—ঐ পথেই সমগ্র জাতির চিন্তাধারা প্রবাহিত হয়—ইহাকেই য়ুঙ্গ্ আখ্যা দিয়াছেন **আদিম প্রতিরূপ** (primordial images) ; পরে উহার নামকরণ করেন **মূল-আদর্শ** (Archetypes)। জাতিগত নির্জ্ঞানের মধ্যে ইহারা অবস্থান করে, অর্থাৎ একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত সকল ব্যক্তিরই নির্জ্ঞান স্তরে ইহারা সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে এবং ব্যক্তি-বিশেষের জীবনধারাকে একটি সাধারণ লক্ষ্যের পথে বহুল পরিমাণে চালিত করে। **জাতিগত বা সমষ্টিগত নির্জ্ঞান ব্যক্তি-বিশেষ পূর্বপুরুষগণের নিকট হইতে বংশপ্রভাব হিসাবে উত্তরাধিকার-সূত্রে** পাইয়া থাকে। আদিম প্রতিরূপ মস্তিষ্কের গঠনের ভিতরেই সুপ্ত থাকে। এই কারণে বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রচলিত উপকথা, কাহিনী, আখ্যায়িকা ইত্যাদির মধ্যে অনেক সামঞ্জস্য দেখা যায়।[৪১]
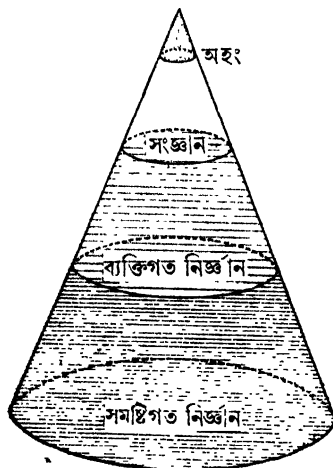
২নং চিত্র য়ুঙ্গের মতানুসারে মনের স্তরবিভাগ।
(Jacobi, *Psychology of C.G. Jung* দ্রষ্টব্য)।

য়ুঙ্গ মনে করেন যে, 'মূল-আদর্শ' যুগ-যুগান্তর ধরিয়া মানুষের মনে গঠিত হইয়াছে। মানুষ যখন ধরণীর বক্ষে প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিল, তখন হইতে আজ পর্যন্ত কত

---

৪১ য়ুঙ্গের ভাষায় : In every individual, in addition to the personal

অগণিত বিষয়ে কত বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সে লাভ করিতেছে, আর এই সবের সহিত জড়িত আছে তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ। ইহাদের সব কিছুরই আলেখ্য পড়িয়াছে জাতিগত বা সমষ্টিগত নির্জ্ঞানের উপর। এই সব 'মূল-আদর্শ'গুলি প্রতিরূপ (images) ও আবেশ বা প্রক্ষোভের মাধ্যমে মানবমনে আবির্ভূত হয়।[৪২]

যুঙ্গ্‌ মনে করেন, **ব্যক্তিগত মন জানিতে হইলে ব্যক্তিগত নির্জ্ঞানের সহিত সমষ্টিগত নির্জ্ঞানকে জানিতে হইবে।** সমষ্টিগত নির্জ্ঞানের স্তর হইতে ব্যক্তিমনে চেতনার উদ্ভব হয়। এইজন্য প্রয়োজন **জাতীয় উপকথা, অতিকথা বা পৌরাণিকী কাহিনীর (myth) সম্যক্ আলোচনা।**

(ঘ) স্বপ্ন-বিশ্লেষণের ব্যাপারে যুঙ্গ্‌ ফ্রয়েডের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। ফ্রয়েড্‌ স্বপ্ন-বিশ্লেষণ করিয়া যখন উহার সুপ্ত-অর্থ (latent content) উদ্‌ঘাটিত করিতেন, তখন সাধারণতঃ উহার মধ্যে 'ঈডিপাস'-স্তরের অতৃপ্ত কামনা আবিষ্কার করা যায়, ইহা বিশ্বাস করিতেন। যুঙ্গ্‌ কিন্তু এই মত গ্রহণ করেন না। প্রথমতঃ, তিনি বিশ্বাস করেন না যে, মাতা ও পুত্রের বা পিতা ও পুত্রীর সম্বন্ধ মূলতঃ যৌনসম্পর্ক। তাহা ছাড়া, যুঙ্গ্‌ মনে করেন যে, **স্বপ্নের ভিতর** অতীতে ব্যক্তিবিশেষের কোন্ বাসনা পূর্ণ হইতে পারে নাই তাহা অপেক্ষা **বর্তমানে কোন্ সমস্যার সে সম্মুখীন হইয়াছে,** তাহাই ভাল করিয়া জানিতে পারা যায়। অতএব যুঙ্গের মতে তাঁহার স্বপ্ন-বিশ্লেষণ প্রণালী **প্রগতিশীল** (progressive) বা **ভবিষ্যৎমুখী** (futuristic), কিন্তু ফ্রয়েডীয় প্রণালী প্রত্যাবর্তনশীল (regressive)। আবার, ফ্রয়েডের মতে স্বপ্ন-বিশ্লেষণ করিয়া ব্যক্তিগত

memories, there are also...the great 'primordial images', the inherited potentialities of human imagination. They have always been potentially latent in the structure of the brain. The fact of this inheritance also explains the otherwise incredible phenomenon, that the matter and themes of legends are met with all the world over in identical forms." (Quoted by McDougall, *Ibid.*, p. 193.)

৪২ শ্রীমতী ফর্ডহ্যাম তাঁহার পুস্তিকায় 'মূল-আদর্শের' অভ্যুদয় সম্বন্ধে সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছেন :

"The archetypes are the result of the many recurring experiences of life ; like the rising and setting of the sun, the coming of spring and autumn in temperate climates and of the rains in more torrid zones, birth and death, the finding of mate, or of food, or escape from danger ; it is, however, fantasies rather than actual images of the experience that remain. They typify the triumphs and disasters, hopes and fears, joys and sorrows of our remote ancestors." (*An Introduction to Jung's Psychology*, p. 25.).

নির্জ্ঞানকে কিছু পরিমাণে জানা যায়, কিন্তু য়ুঙ্গের মতে **ইহার মধ্যে ব্যক্তিগত নির্জ্ঞানের সহিত সমষ্টিগত নির্জ্ঞানকে জানা যায়।** এইজন্য স্বপ্ন-বিশ্লেষণের জন্য জাতীয় জীবনে প্রচলিত উপকথা (myth)-এর জ্ঞান প্রয়োজন।

(ঙ) ফ্রয়েড্ যেমন ব্যক্তির মনোজীবনে দ্বৈতভাবের (polarites) কথা বলিয়াছেন, য়ুঙ্গ ও সেইরূপ দুইটি বিরুদ্ধ দিকের (opposite) কথা বলিয়াছেন। তবে ফ্রয়েড 'কাম'কে (libido) প্রাণশক্তির (Eros) অন্তর্ভুক্ত করিয়া উহার সহিত আত্মধ্বংস প্রবৃত্তির (death instinct) বৈপরীত্য করিয়াছেন। য়ুঙ্গের মতে 'কামের' (libido—ব্যাপক অর্থে) গতি দুইটি 'বিপরীতের' মধ্যে থাকে। বিপরীতের সংঘাত ব্যতীত শক্তি বাড়ে না। মানুষের স্বভাবের মধ্যেই বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রকারের 'বিপরীত বৃত্তি' আছে।

(চ) য়ুঙ্গ্ মনে করেন যে, ব্যক্তিত্বের দুইটি দিক্ আছে—একটি প্রকাশমান এবং বাহ্য জগতের সহিত প্রতিযোজনের কার্যে সর্বদা নিযুক্ত; দ্বিতীয়টি অপ্রকাশমান এবং সমষ্টিগত নির্জ্ঞান-স্তরের অংশ। য়ুঙ্গ্ প্রথমটির নাম দিয়াছেন 'ব্যক্তিত্বের আবরণ বা মুখোস' (*Persona*) এবং দ্বিতীয়টির নাম দিয়াছেন 'জৈবতত্ত্ব' (*Anima*)। 'বাহ্য আবরণ' বলিতে বুঝায় **যেভাবে আমরা অপরের নিকট প্রতীত হই**—ইহা যেন **ব্যক্তি ও সমাজের দাবী বা আদর্শের সহিত আপোষ-মীমাংসার ফলে গঠিত** (*compromise between the individual and society*)। আবার ইহাদের ভিতর একটি বৈপরীত্য[৪৩] আছে—যে বাহ্য আবরণ বা প্রকাশে (অর্থাৎ Persona-তে) 'পুরুষ', সে নির্জ্ঞান স্তরে বা Anima-তে 'স্ত্রীলোক' এবং যে বাহ্য আবরণে (Persona-তে) স্ত্রীলোক, সে নির্জ্ঞানে (Anima-তে) পুরুষ।

প্রসঙ্গতঃ আমরা য়ুঙ্গের ব্যক্তিত্ব বিভাগের কথা আলোচনা করিতে পারি। মানুষ সাধারণতঃ দুই শ্রেণীভুক্ত—**অন্তর্বৃত্ত বা আত্মকেন্দ্রিক** (introvert) এবং **বহির্বৃত্ত বা বাহ্যকেন্দ্রিক** (extrovert)। যাহারা অন্তর্বৃত্ত তাহাদের 'কাম' তাহাদের নিজেদের উপর আরোপিত হয়। তাহারা **নিজেদের কথা** আলোচনা করিতে, চিন্তা করিতে বড় ভালবাসে ; অপর

৪৩ কেহ কেহ মনে করেন যে, য়ুঙ্গের মতে Anima ও Persona এই দুয়ের যে পার্থক্য তাহা ঠিক বৈপরীত্য নহে। উহারা পরস্পরের পরিপূরক (complementary) এবং উভয়ে মিলিয়া ব্যক্তি-বিশেষের সমগ্র ব্যক্তিত্ব নির্ধারণ করে।

পক্ষে যাহারা বহির্বৃত্ত তাহারা **'বাহিরের জগতের কথা'** বেশী ভাবে। তাহারা সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায়, মেলা-মেশায় বেশী তৃপ্তি পায়। য়ুঙ্‌ আরও বলেন যে, বহির্বৃত্ত ও অন্তর্বৃত্তের মধ্যে একটি বৈপরীত্য আছে। যে সংজ্ঞান-স্তরে বহির্বৃত্ত, সে নির্জ্ঞান স্তরে অন্তর্বৃত্ত এবং যে নির্জ্ঞান স্তরে অন্তর্বৃত্ত, সে সংজ্ঞান-স্তরে বহির্বৃত্ত। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে (questionairre method দ্বারা) এই বিষয়ে ব্যক্তিত্বের স্বরূপ নির্ণয় করা যায়। (পৃঃ ২৮১-৮৩)। নিম্নে কয়েকটি প্রশ্ন এবং উহাদের উত্তরে অন্তর্বৃত্ত ও বহির্বৃত্ত কী বলিবেন বলিয়া আশা করা যায়—তাহার ইঙ্গিত দেওয়া হইল :

	প্রশ্ন	অন্তর্বৃত্তের উত্তর	বহির্বৃত্তের উত্তর
(১)	আপনি কি নিজেকে লইয়া ব্যস্ত থাকিতে ভালবাসেন ?	হাঁ	না
(২)	আপনি কি ট্রামে, বাসে, ট্রেণে অপরিচিত যাত্রীর সহিত আলাপ করা পছন্দ করেন ?	না	হাঁ
(৩)	আপনি কি জনসমক্ষে বক্তৃতা দিতে পছন্দ করেন ?	না	হাঁ
(৪)	আপনি কি নীরবে নিজের অতীত চিন্তা করিতে পছন্দ করেন ?	হাঁ	না
(৫)	আপনি কি বনভোজন ইত্যাদি পছন্দ করেন ?	ন	হাঁ

এই ব্যাপারে মানব-মনের আর-একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, সংজ্ঞান-স্তর (conscious level)-এ যে ব্যক্তি অন্তর্বৃত্ত, নির্জ্ঞান-স্তরে সেই আবার বহির্বৃত্ত ; আবার যে সংজ্ঞান-স্তরে বহির্বৃত্ত, নির্জ্ঞান-স্তরে সে অন্তর্বৃত্ত। কারণ নির্জ্ঞান-স্তর আবার সংজ্ঞান-স্তরের দোষত্রুটির ক্ষতিপূরণ করে।[৪৪]

---

[৪৪] "In the case of an introvert, for example, there exists alongside, or rather behind his conscious attitude, an unconscious extroverted attitude which automatically compensates his conscious one-sidedness......The unconscious, so far as we can now see, has a compensatory function in respect to consciousness." (Jung, *Contributions to Analytical Psychology*, pp. 306-07.)

সমালোচনা ঃ

ফ্রয়েডের মতবাদ যে যুগান্তকারী তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। মানুষের জীবনের উপর নির্জ্ঞান-স্তরের (এবং তৎসহ যৌনবৃত্তির) প্রভাব যে কি অপরিসীম সে বিষয়ে তিনিই সর্বপ্রথম বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক কার্যের পূর্বে সুষ্ঠু ব্যাখ্যা করা যাইত না; উহাদের অনেক সময় 'অদ্ভুত', 'অস্বাভাবিক' ইত্যাদি আখ্যা দিয়া অব্যাখ্যাত রাখা হইত। কেহ কেহ আবার ঐসব ব্যবহারের 'মানসিক' ব্যাখ্যা দান করিতে না পারিয়া উহাদের দেহযন্ত্রের বৈকল্য বলিয়া বর্ণনা করিতেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐসব ব্যাখ্যা পর্যাপ্ত হয় নাই। এই দিক্ হইতে বিচার করিলে 'নির্জ্ঞান' সম্বন্ধীয় সংজ্ঞার যথেষ্ট মূল্য আছে।

তবে ফ্রয়েডীয় মনোবিদ্যার প্রধান দোষ হইল যে, উহা অতিশয়োক্তি এবং একদেশদর্শিতাদোষে দুষ্ট। তিনি মানবজীবনের সকল কার্যেরই যৌনবৃত্তির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করিবার যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা সর্ববাদিসম্মত নহে। **যৌনবৃত্তি আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করিলেও শৈশব হইতে উহাই একমাত্র নিয়োজক বা প্ররোচক ইহা বলা যায় না।** ফ্রয়েড্ সকল ক্ষেত্রেই যৌনবৃত্তির কথা বলার জন্য তাঁহার ব্যাখ্যা কোন কোন ক্ষেত্রে কষ্টকল্পিত, এমনকি অবাস্তব হইয়া পড়িয়াছে মনে হয়।

ফ্রয়েডের অনুগামিগণের মধ্যেই এইজন্য কেহ কেহ (যথা, আড্‌লার, য়ুঙ্, রাঙ্ক, স্টেকেল্) তাঁহার দল পরিত্যাগ করিয়া নূতন সম্প্রদায় স্থাপন করেন। 'নির্জ্ঞান' ও 'কাম', এই দুইটি পদের য়ুঙ্-প্রদত্ত ব্যাপক অর্থ অনেকে ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা অপেক্ষা শ্রেয়ঃ মনে করেন। তবে 'নির্জ্ঞান' সম্বন্ধে য়ুঙের সংজ্ঞার সর্বত্র সামঞ্জস্য নাই। তিনি এমন কথাও বলিয়াছেন যে, নির্জ্ঞান হইতে জ্ঞানের অভ্যুদয় হয়, শিশুর 'অহং-জ্ঞান' হইবার পূর্বে সে 'নির্জ্ঞান'-স্তরে থাকে[৪৫]; কিন্তু এইসব মতবাদ সর্বজনগ্রাহ্য নহে। আড্‌লারের ব্যাখ্যারও অভিনবত্ব আছে—মানুষের জীবনে ক্ষমতালাভের ইচ্ছা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার বাসনা কিরূপ দৃঢ় থাকে, সামাজিকতাবোধ মানবজীবনকে কিরূপ নিয়ন্ত্রিত করে ইত্যাদি বিষয়ে তিনি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ

৪৫ C. G. Jung, *Contributions to Analytical Psychology*, পৃঃ ৩১৫ দ্রষ্টব্য।

করিয়াছেন। তাঁহারও ব্যাখ্যা অনেক ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত হইয়াছে। মানুষের কার্যকে হীনতাবোধের প্রতিক্রিয়া হিসাবে সকল ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাহা ছাড়া, ব্যক্তি-বিশেষ পারিবারিক জীবনে যে স্থান অধিকার করে তাহার প্রভাব সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন বা জীবনযাত্রা-প্রণালী (style of life) বা নিদ্রাকালে শয়নপদ্ধতি হইতে ব্যক্তিত্ব নির্ধারণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সার্বিক নিয়ম হিসাবে স্বীকৃত হইতে পারে না।

৫। অভিপ্রায়-বাদ, উদ্দেশ্যসাধনবাদ বা 'হরমিক্' মনোবিদ্যা (Purposivism or Hormic Psychology):

আমরা যে সমস্ত কার্য করি উহাদের পশ্চাতে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কোন-না-কোন উদ্দেশ্য থাকে। উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়কে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, উহার মধ্যে আছে কোন কার্যের ফল সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্দৃষ্টি এবং উহা পাইবার জন্য তীব্র কামনা বা বাসনা। অভিপ্রায়বাদী মনোবিদ্‌গণ তাঁহাদের মতবাদে ভবিষ্যদ্দৃষ্টি বা দূরদৃষ্টি অপেক্ষা কামনা-জনিত তাড়না বা প্রচেষ্টার উপরই প্রাধান্য আরোপ করিয়াছেন।

অভিপ্রায়ের প্রাধান্য অনেক মনোবিদ্‌ই স্বীকার করিয়াছেন। মনঃ-সমীক্ষণবাদীরা (যথা, ফ্রয়েড্, আড্‌লার, য়ুঙ্গ্), এমন কি গেস্টাল্ট্‌বাদীরা অভিপ্রায়ের কথা বলেন। তবে আধুনিককালে ইহাকে সর্বাধিক প্রাধান্য দান করিয়া ইহারই নামে স্বীয় মতবাদের নামকরণ করিয়াছেন **উইলিয়াম্ ম্যাক্‌ডুগাল্**। তাঁহার মতবাদের অপর নাম 'হরমিক্' (hormic) মনোবিদ্যা। 'হর্‌মে' (*horme*) পদটি গ্রীক্ হর্-মে (*hor-may*) হইতে উদ্ভূত এবং এই গ্রীক পদটির অর্থ হইল 'তীব্র তাড়না' (strong urge)। ১৯০৮ সালে ম্যাক্‌ডুগালের *Introduction to Social Psychology* প্রকাশিত হয় এবং এই সময় হইতেই তাঁহার হর্‌মিক্ মতবাদ প্রচারিত হইতে থাকে।[৪৬]

হরমিক্ মতবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল সহজপ্রবৃত্তিকে সর্বাধিক প্রাধান্য দান। তিনি বলেন যে, আমাদের সকল ব্যবহারের

৪৬ ১৯০৮ সালের পূর্বে ম্যাক্‌ডুগাল চেষ্টিতবাদের সমর্থক ছিলেন; এবং তিনি প্রধানতঃ দেহ-সম্বন্ধীয় আলোচনায় রত ছিলেন। তাঁহার *Physiological Psychology* নামক পুস্তিকায় এবং কয়েকটি প্রবন্ধে তিনি প্রান্তসন্নিকর্ষ (synapse)-কে চেতনা (consciousness)-এর অধিষ্ঠান (seat) বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

মূলে আছে সহজ-প্রবৃত্তির তাড়না অর্থাৎ আমাদের কার্যের মাধ্যমে কোন-না-কোন সহজ-প্রবৃত্তি উহার উদ্দেশ্য-সাধনের উপায় অনুসন্ধান করে।

সমাজ-মনোবিদ্যার উপর ম্যাক্‌ডুগালের এই বিখ্যাত পুস্তক রচনার একটি উদ্দেশ্য হইল সামাজিক বিজ্ঞানসমূহে মন সম্বন্ধে যথেষ্ট চিন্তা ব্যতীত যে সব উক্তি করা হইত তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা এবং মনোবিদ্যাকে বুদ্ধিবাদের একচ্ছত্র আধিপত্য হইতে মুক্তি দান করা। পূর্বতন মনোবিদ্যায় আবেগ ও প্রেষণা (emotion and motivation) সম্বন্ধে পর্যাপ্ত আলোচনা হয় নাই এবং কেবলমাত্র অন্তর্দৃষ্টি-প্রণালী ব্যবহার করার ফলে[৪৭] উহা প্রাণি-মন, শিশু-মন, অস্বভাবি-মন এবং সমাজ-মন সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করে। বুদ্ধিবাদের প্রভাবে মানুষের সকল ব্যবহারকে ভবিষ্যদ্দৃষ্টি ও যুক্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত মনে করা হইত। কিন্তু আমাদের বিভিন্ন ক্রিয়ার মূলে আছে কতকগুলি যুক্তি-নিরপেক্ষ তাড়না বা প্রেরণা (irrational impulses)—বুদ্ধিবৃত্তিগুলি ইহাদেরই নির্দেশে পরিচালিত হয়[৪৮]; অর্থাৎ **সহজ প্রবৃত্তিসমূহই** (instincts) **হইল আদিম প্রেরণা বা প্রধান চালক।**

সহজ-প্রবৃত্তিকে বিশ্লেষণ করিয়া ম্যাক্‌ডুগাল্ বলেন যে, উহার তিনটি দিক্ (aspect) আছে :

(ক) প্রথমে **গ্রাহক** (receptor) **ভাবে** আমাদের সহজ বৃত্তিগুলি কার্য করে এবং বিশেষ বিশেষ উদ্দীপক **প্রত্যক্ষ করে** ও আমাদের বিশেষপ্রকার কার্যে প্ররোচিত করে।

(খ) ইহাদের **সারধর্ম হইল আবেগ** (emotion); প্রতি সহজ প্রবৃত্তিই কোন-না-কোন আবেগের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত।

৪৭ এ কথা কেবলমাত্র ভুণ্ড্‌ট্, টিচেনার ও তাঁহাদের অনুগামিগণ সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

৪৮ ম্যাক্‌ডুগালের ভাষায় : "It is the mental forces, the sources of energy, which set the ends and sustain the course of all human activity—of which forces the intellectual processes are but the servants, instruments, or means—that must be clearly defined and whose history in the race and in the individual must be made clear, before the social sciences can build upon a firm psychological foundation." (*Introduction to Social Psychology*, p. 3.)

(গ) উহারা আবার ব্যক্তি-বিশেষকে এমন **কার্যে প্ররোচিত করে** যাহার সাধনের মাধ্যমে ঐ প্রবৃত্তিগুলি তৃপ্তিলাভ করে বা উহাদের উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

ম্যাক্‌ডুগাল বলেন যে, সর্বসমেত **চৌদ্দটি সহজ প্রবৃত্তি**[৪৯] (যাহারা প্রত্যেকে এক একটি আবেগের সহিত সংশ্লিষ্ট) আমাদের বিভিন্ন কার্যে প্ররোচিত করে। **প্রতি কার্যেরই উদ্দেশ্য হইল কোন লক্ষ্যে উপনীত হওয়া; উহার জন্য প্রয়োজন প্রেরণা এবং উহার পশ্চাতে 'চালক' ভাবে কার্য করে কোন সহজ-প্রবৃত্তি।** এই দিক্ হইতে বিচার করিলে সহজ-প্রবৃত্তি মাত্রেরই লক্ষ্য হইল কোন উদ্দেশ্য সাধন বা লক্ষ্যে উপনীত হওয়া (goal-seeking)।

এই সহজ-প্রবৃত্তিগুলি প্রতি মানবের পক্ষে সহজাত অর্থাৎ উহারা অভিজ্ঞতালব্ধ নহে, পরন্তু উহারা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত।

সহজ-প্রবৃত্তিগুলির সমন্বয়ে বিভিন্ন রস (sentiment)-এর উদ্ভব হয়। আত্ম-সাম্মুখ্য এবং আত্ম-নিবেদন করার সহজ প্রবৃত্তির সমন্বয়ে আত্মাভিমুখী বা অহংপ্রত্যয়ী রস (self-regarding sentiment)-এর উদ্ভব হয়। (পৃঃ ৮১ দ্রষ্টব্য)।

ম্যাক্‌ডুগালের হরমিক্ মতবাদ সকল প্রকার **যান্ত্রিকতাবাদের পূর্ণ-বিরোধী**। উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের প্রতি আভিমুখ্যই মনের প্রধান বৈশিষ্ট্য।[৫০]

সমালোচনা:

ম্যাক্‌ডুগালের হরমিক্ মতবাদের বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা অনেকগুলি বিষয়ের প্রতি মনোবিৎ-সম্প্রদায়ের মনোযোগ আকর্ষণ করে। উদাহরণস্বরূপ আমরা কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করিতে পারি:

৪৯ ১৯২৩ সালে প্রথম প্রকাশিত *Outline of Psychology* গ্রন্থে ম্যাক্‌ডুগাল চৌদ্দটি সহজ-প্রবৃত্তির কথা বলেন।

৫০ Murchison-সম্পাদিত *Psychologies of 1930* গ্রন্থে স্ব-মত ব্যক্ত করিয়া ম্যাক্‌ডুগাল বলেন: "(...hormic psychology) asserts that active striving towards a goal is a fundamental category of psychology, and is a process of a type that cannot be mechanistically explained or resolved into mechanistic sequences." (p. 4.)

(১) যান্ত্রিকতাবাদের সাহায্যে মনের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা চলে না। মানসিক ক্রিয়ার এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যাহা অচেতন জড়ের ব্যবহারে প্রকাশ পায় না। মানসিক ক্রিয়ার ব্যাখ্যার জন্য মন কী **লক্ষ্যে উপনীত** হইবার প্রচেষ্টা করিতেছে তাহা জানা প্রয়োজন।

(২) মন কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তি-বিশিষ্ট সত্তা নহে। উহা **যুক্তি-নিরপেক্ষ আবেগ ও প্রেরণার দ্বারা চালিত** হয়। সহজ-প্রবৃত্তি ও আবেগের প্রভাবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তিনি মনোবিৎদের এক নূতন পথের সন্ধান দিয়াছেন।

(৩) অন্তর্দৃষ্টি-প্রণালীর সাহায্যে শুধু কয়েকজন ব্যক্তির অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া মনোবিদ্যা গড়িয়া উঠিতে পারে না। মনোবিদ্যার প্রগতি ও ব্যাপকতার জন্য বিভিন্ন স্তরের মনের (যথা, প্রাণি-মন, শিশু-মন, সমাজ-মন ইত্যাদির) আলোচনা প্রয়োজন। এই কারণে **বিষয়গত পদ্ধতি** (objective method) **অবলম্বন** একান্ত প্রয়োজন।

যদিও ম্যাকৃডুগালের মতের অভিনবত্ব আছে এবং যদিও বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে উহা এক আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা হইলেও উহা **কতকাংশে একদেশদর্শী** বলিয়া মনে হয়।

(১) মনের ক্ষেত্রে যেমন আবেগ ও প্রেরণার অবদান আছে, সেইরূপ বুদ্ধিরও স্থান আছে। **মনের সকল প্রকার বাহ্যপ্রকাশকেই যুক্তি-নিরপেক্ষ চৌদ্দটি আদিম সহজ-প্রবৃত্তির আত্মতৃপ্তির প্রয়াস বলিলে ভুল হইবে।**

(২) **সহজ-প্রবৃত্তির সংখ্যা নির্ধারণ কতকটা যথেচ্ছ** বলিয়া বোধ হয়। ম্যাকৃডুগাল সহজ প্রবৃত্তির যে তালিকা দিয়াছেন তাহাদের সবগুলিই যে অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ সহজাত প্রবৃত্তি তাহা নহে। তাহাদের অনেকগুলিই শিক্ষণ বা অভিজ্ঞতা হইতে প্রাপ্ত না হইলেও উহা দ্বারা পরিমার্জিত, ইহা অনেক মনোবিৎই মনে করেন। বার্ণাড প্রমুখ লেখকেরা ম্যাকৃডুগালের মতের বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, তথাকথিত আদিম প্রবৃত্তিগুলি (যেমন, যৌন প্রবৃত্তি, পিতামাতার বাৎসল্য ইত্যাদি) সামাজিক পরিবেশের সহিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে গঠিত জটিল কার্যপ্রণালী—উহারা উত্তরাধিকারসূত্রে

প্রাপ্ত সরল প্রবৃত্তি নহে।[৫১] উড্‌ওয়ার্থ বলেন যে, এমন অনেক মানসিক বৃত্তি আছে যেগুলি মানবের আবেগ ও প্রেরণা অপেক্ষা বুদ্ধির সহিত ঘনিষ্ঠতরভাবে সংশ্লিষ্ট; সুতরাং ম্যাক্‌ডুগাল-বর্ণিত আদিম সহজ-প্রবৃত্তির দ্বারা উহাদের সুব্যাখ্যা হয় না।[৫২]

৫১ L. L. Bernard, *Instinct : A study of Social Psychology* দ্রষ্টব্য।

৫২ ম্যাক্‌ডুগাল ও উড্‌ওয়ার্থের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য এড্‌না হাইড্‌ব্রেডার (Edna Heidbreder)-রচিত *Seven Psychologies* পৃঃ ৩১৭–৩১৯ দ্রষ্টব্য।

পঞ্চম অধ্যায়

মনোবিদ্যা-পাঠের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা

১। সাধারণ উপকারিতা (General Utility) :

বুদ্ধিশীল মানুষ হিসাবে আমাদের কৌতূহল অপরিসীম। এই কৌতূহল কেবলমাত্র বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান-আহরণের কার্যেই পরিসীমিত নহে। নিজের এবং অপরের মনকে জানা এবং ঐ জ্ঞানের সাহায্যে মনকে নিয়ন্ত্রণ করার বাসনা মানুষের অন্তরে চিরজাগরূক। মানুষের এই বাসনাকে সফল করার বৈজ্ঞানিক চেষ্টা করে মনোবিদ্যা।

মানুষের বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের মধ্যে যে মিথষ্ক্রিয়া বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিয়াছে তাহাতে মানুষের জ্ঞানলাভ হয়। কিন্তু এই জ্ঞানলাভ করিয়াই মানুষ সন্তুষ্ট হয় না। এই জ্ঞানলাভ কি করিয়া বা কিসের মাধ্যমে সম্ভব হয়, মানুষ তাহাও জানিতে চায়। **জ্ঞানের উদ্ভব, জ্ঞানের প্রকারভেদ, জ্ঞানের উপাদান ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে জানিতে হইলে মনোবিদ্যার সাহায্য প্রয়োজন।**

আবার জ্ঞান-আহরণ করাই মানবমনের একমাত্র ধর্ম নহে। মানুষের মনে আছে বিভিন্ন অনুভূতিবোধ। এই সব **অনুভূতি এবং প্রক্ষোভ বা আবেগের উদ্ভব কি করিয়া হয়, কিভাবে ইহারা জটিল রূপ ধারণ করে, মনের উপর ইহাদের প্রভাব কত সুদূরপ্রসারী, কিভাবে ইহাদের নিয়ন্ত্রণ করা যায় ইত্যাদি** বিষয় মনোবিদ্যা জ্ঞানদান করে।

আবার আমরা যে সব কার্য করি, তাহারা কতদূর আমাদের ইচ্ছাধীন আর কতদূর ইচ্ছাধীন নহে, উহাদের প্রেরণাশক্তি কোথা হইতে আসে, বিভিন্ন কর্মে কিভাবে দক্ষতা লাভ করা যায়—**ক্রিয়ার এই সকল বহুমুখী বৈচিত্র্য** সম্বন্ধে মনোবিদ্যা যথেষ্ট আলোকপাত করিয়া থাকে।

জ্ঞান, অনুভূতি এবং কর্ম—মনের এই বিভিন্ন প্রকাশকে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে আলোচনা করিয়া **মানুষের আত্মজ্ঞানলাভ** (self-

knowledge)-এর পথকে সুগম করিয়া তোলে মনোবিদ্যা। আবার, এইরূপ আত্মজ্ঞানলাভ করিলে মানুষ নিজের আত্মিক উন্নতি (self-culture) করিতে পারে।

ব্যক্তি-বিশেষের মন অপর মন হইতে বিচ্ছিন্নভাবে থাকিতে পারে না। অন্য মন হইতে নিজেকে পৃথক্ করিয়া কেহ আত্মজ্ঞানলাভ করিতে পারে না। এইজন্য **অপরের মনকে জানা** তাহার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। তাহা ছাড়া, প্রতি মানুষই চায় কোন-না-কোন মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে, কোন-না-কোন মনকে শিক্ষিত ও সমুন্নত করিয়া তুলিতে, কোন-না-কোন ব্যক্তির মানসিক শক্তির গোপন উৎস অনুসন্ধান করিতে। বলা বাহুল্য, মনোবিদ্যা এইরূপ ইচ্ছা পূরণের সহায়তা করে।

উপরের আলোচনা হইতেই আভাস পাওয়া যাইতেছে যে, অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় মনোবিদ্যারও **তাত্ত্বিক** (theoretical) এবং **প্রায়োগিক** (practical) এই দুইটি দিক্ই আছে; অর্থাৎ মনোবিদ্যা কেবলমাত্র শুদ্ধজ্ঞান আহরণ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে না, উহা আবার কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। বাস্তবিকই বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিদ্যা পৃথক স্বীকৃতি পাইবার পর হইতেই মানুষের **ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ ঘটিতেছে।**[১] আমরা নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদদ্বয়ে ইহার প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এক্ষেত্রে অবশ্য ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যা পরস্পরের সহিত বিজড়িত।

১ মনোবিদ্যা-সম্বন্ধীয় গবেষণাগারে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনোবিদ্যার প্রয়োগের কথা প্রথম চিন্তা করিতে শুরু করেন ১৮৯০ সালে ক্যাটেল্ ও ভিট্মার। বিনে কর্তৃক বুদ্ধি-পরীক্ষণ পদ্ধতির উদ্ভাবনের পর হইতে (বিশেষতঃ ১৯১১ সালে গড্ডার্ড কর্তৃক তাঁহার পুস্তক ইংরাজীতে অনূদিত হইবার পর) বিভিন্ন মানসিক শক্তি পরিমাপের ক্ষেত্রে মনোবিদ্যার বিশেষ প্রয়োগ হইতে থাকে।

বর্তমানকালে American Psychological Association-এর ৮টি শাখা প্রয়োগ-মনোবিদ্যা (Applied Psychology) লইয়া আলোচনা করে—যথা, Clinical Psychology, Consulting Psychology, Industrial & Business Psychology, Educational Psychology, School Psychology, Counselling & Guidance Psychology, Psychology in Public Service ও Military Psychology. এইগুলি ব্যতীত সমাজ-মনোবিদ্যা লইয়া একটি পৃথক্ সংস্থা আছে।

২। ব্যক্তিগত জীবনে মনোবিদ্যার প্রয়োগ (Application of Psychology to Individual Life) :

বিভিন্ন প্রকারের অসুস্থ বা অ-স্বভাবী মনের চিকিৎসার জন্য মনোবিদ্যায় অভিজ্ঞ চিকিৎসকের প্রয়োজন। অসুস্থ মনের অসুস্থতার মূল কারণ জ্ঞানের অগোচরে নির্জ্ঞান স্তরে নিহিত থাকে—সাধারণ অভিজ্ঞতা দ্বারা উহাদের জানা যায় না। এই সকল অন্তর্নিহিত কারণকে উদ্‌ঘাটিত করিতে হইলে মনঃসমীক্ষণ ইত্যাদি মনোবিদ্যা-সম্মত প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি যে, মানসিক রোগের চিকিৎসার ব্যাপারে ফ্রয়েড্, য়ুঙ্, ম্যাক্‌ডুগাল্ ইত্যাদি মনোবিদ্যা-বিশারদগণের অবদান অতুলনীয়।

মানসিক সমস্যা যে কেবল অসুস্থ মনেরই থাকে তাহা নহে, তথাকথিত সুস্থ মনেরও বহুবিধ সমস্যা আছে। ইহাদের সমাধানে মনোবিদ্যার সাহায্য অপরিহার্য।

আমাদের মধ্যে যাহারা নিজেদের সুস্থমনঃসম্পন্ন মনে করে, তাহাদেরও বহু সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় এবং ইহাদের সকলগুলির সহজ সমাধান সম্ভব নয়; বরং ইহাদের কতকগুলি প্রকট হইয়া আমাদের জীবনে দেখা দেয়। এই সকল ক্ষেত্রে **মনোবিদ্যা-বিশারদগণ বিচক্ষণ পরামর্শদান দ্বারা আমাদের সমস্যা সমাধানে বা দূরীকরণে প্রভূত সহায়তা করিয়া থাকেন।**

উদাহরণস্বরূপ বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তির জীবনে যে সব সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে (এবং মনোবিদ্যা যাহাদের সমাধানে সাহায্য করিতে পারে) সেইরূপ কতকগুলি সমস্যার কথা আমরা এখানে উল্লেখ করিতে পারি :

পারিবারিক জীবনের সমস্যা :

১। কেন আমার ছোট ছোট ভাই-বোনেরা আমাকে বিদ্রূপ করে ?

২। কেন আমি আমার বাড়ীর 'অমুক'-কে (ভাই বা বোন বা অন্য কেহ) মোটেই সহ্য করিতে পারি না ?

৩। এত চেষ্টা করিয়াও কেন বাড়ীর লোকের (সাধারণভাবে সকলের অথবা পরিবারস্থ কোন বিশেষ ব্যক্তির) 'মন' পাই না ?

৪। আমার বাবা-মা অত্যন্ত প্রাচীনপন্থী বা 'সেকেলে'; আমি আমার নিজের 'আধুনিক' মতবাদ লইয়া কি করিয়া তাঁহাদের সহিত নিজেকে মানাইয়া লইতে পারি? ইত্যাদি ইত্যাদি।

ছাত্রজীবনের সমস্যা :

১। আমার স্মরণশক্তি দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। কিভাবে উহার উন্নতি করিব?

২। আমি কি সহপাঠী বা সহপাঠিনীদের বিদ্রূপের পাত্র হইয়া পড়িতেছি? কেন আমার উহাদের ভাল লাগে না?

৩। আমি কেন ক্লাসে সকলের সামনে দাঁড়াইয়া কিছু বলিতে ভয় পাই বা লজ্জা পাই?

৪। আমি বাড়ী হইতে দূরে ছাত্রাবাসে থাকি। বাড়ীর জন্য সর্বদাই চিন্তিত থাকি। এই চিন্তা কি করিয়া দূর করিতে পারি?

৫। আমার কেমন যেন ভয় হয় যে, আমি লেখাপড়া শিখিয়া 'মানুষ' হইতে পারিব না! আমি কি আমার পিতামাতার অধম সন্তান?

ইত্যাদি ইত্যাদি।

কর্মজীবনের সমস্যা :

১। আমি কেন কাজে কোন উৎসাহ পাই না? আমি প্রত্যহ যন্ত্রচালিতবৎ কাজ করি কেন?

২। আমি সহকর্মীদের সহিত মিশিতে পারি না কেন?

৩। এত চেষ্টা করিয়াও আমি কেন 'উপরওয়ালার' মন পাই না?

৪। কাজ করিতে করিতে আমার মাথার মধ্যে সব যেন গোলযোগ হইয়া যায়। হঠাৎ ভয় হয় আমার যেন কী হারাইয়া যাইতেছে।[২] এর কারণ কি? ইত্যাদি ইত্যাদি।

সাধারণ কতকগুলি সমস্যা :

১। আমার যেন সকলের উপরই বিরক্তিভাব জাগে;

বা আমার যেন সকল কাজেই লজ্জা আসে;

২ সুকুমার রায়-রচিত 'আবোল তাবোল'-এ বর্ণিত 'হেড্ অফিসের বড়বাবু' বাস্তব জীবনে বোধ হয় একেবারে অসম্ভব নয়!

বা আমার যেন সকল কাজেই ভয় হয় ;
বা আমি যেন আত্মবিশ্বাস হারাইয়া ফেলিতেছি ;
বা আমি যেন সকলকেই সন্দেহ করি—
এমন কেন হয় ?

২। আমি কেন লোকের নাম মনে রাখিতে পারি না ?

৩। আমি এখন বড় হইয়াছি ; অথচ আঙ্গুল চুষিবার অভ্যাস ছাড়িতে পারিতেছি না কেন ?

৪। মাঝে মাঝে কথা কহিতে কহিতে আমার কেন কথা আটকাইয়া যায় ?

৫। আমার সর্বদাই ভয় হয় যে, আমি যেন কোন অসুখে ভুগিতেছি !

৬। মনোবিদ্‌দের উপর আমার ভীষণ রাগ হয়! তাহারা যেন জোর করিয়া আমার নিকট হইতে 'গোপন কথা' বাহির করিবার চেষ্টা করে।

৭। অতি সামান্য ব্যাপারেও আমি যেন অতিরিক্ত চিন্তা করি !

৮। আমার মাথার মধ্যে বহু 'স্কীম' বা পরিকল্পনা আছে ; কিন্তু কোনটাই কার্যে পরিণত করিতে পারি না কেন ? ইত্যাদি ইত্যাদি।

উপরে যে সমস্ত উদাহরণ দেওয়া হইল তাহা হইতে ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যার জটিলতা ও বহুমুখিতার কিছু আভাস পাওয়া যায়। এই সব সমস্যার সমাধানে মনোবিদ্যা আমাদের প্রভূত সাহায্য দান করে।

৩। সামাজিক জীবনে মনোবিদ্যার উপকারিতা (Utility of Psychology in Social Life):

সামাজিক জীবনের বহুক্ষেত্রে মনোবিদ্যার প্রয়োগ ঘটিতেছে। সমাজের বিস্তৃতির সহিত সামাজিক সমস্যার সংখ্যা ও জটিলতা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং তদনুসারে মনোবিদ্যার প্রয়োগ-ক্ষেত্রও ব্যাপকতর হইতেছে।[৩] এখানে আমরা কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রের উল্লেখ করিব :

শিক্ষা: শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিদ্যার প্রয়োগ সুদূরপ্রসারী। শিক্ষাদান-কালে শিক্ষককে বহুপ্রকার সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। বিভিন্ন

৩ প্রথম অধ্যায়, ৫ম অনুচ্ছেদ

বয়ঃক্রমের ছাত্রছাত্রীর মানসিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য জানা না থাকিলে কোন্ স্তরের ছাত্রছাত্রীদের মানসিক ক্ষমতা কিরূপ হইবে—কি প্রকারে শিক্ষাদান করিলে শিক্ষিতব্য বিষয় সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে—তাহা নির্ণয় করা কঠিন হইবে। এইজন্য মনোবিদ্যার (বিশেষতঃ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিদ্যা ও শিশুমনোবিদ্যার) সম্যক্ জ্ঞান প্রয়োজন। তাহা ছাড়া, শিক্ষিতব্য বিষয় কিরূপে চিত্তাকর্ষক করা যায়, কিরূপে ছাত্রছাত্রীর স্মৃতি ও মনঃসংযোগের ক্ষমতা বাড়িতে পারে, কিভাবে তাহারা স্বাধীন চিন্তা করিতে পারে, কিভাবে তাহাদের মানসিক স্বাস্থ্য সমুন্নত করা যায় ইত্যাদি শিক্ষা-সংক্রান্ত বিবিধ সমস্যার সমাধানে সাহায্য করেন শিক্ষা-মনোবিদ্যা-বিশারদগণ (পৃঃ ৬৫-৬৮ দ্রষ্টব্য)।

যদি বিদ্যালয়ের ছাত্র-জীবন বাস্তব জীবনের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া চলিতে পারে, যদি ছাত্রছাত্রীদের মানসিক প্রবণতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়, তবেই শিক্ষা সুষ্ঠুভাবে সাধিত হইতে পারে। তাই এই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মনোবিৎ শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনা করিতে উপদেশ দেন।

(২) **শিল্পসংস্থা**ঃ মনোবিদ্যার প্রয়োগের আর-একটি ক্ষেত্র হইতেছে ব্যবসায় ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান। ব্যবসায় ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অন্যতম লক্ষ্য হইল স্বল্পব্যয়ে অধিক উৎপাদন; কিন্তু এই ইচ্ছা পূরণ করিতে হইলে **কর্মীদের নিয়োগ** এবং **তাহাদের কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ**[৪], **কর্ম-ব্যবস্থা, কর্ম-বণ্টন ইত্যাদি** বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে অর্থাৎ **মনোবিদ্যা-নির্দিষ্ট পন্থায়** নির্ধারিত হওয়া উচিত (পৃঃ ৭০-৭৫ দ্রষ্টব্য)।

৪ মনোবিদ্যার দৃষ্টিকোণ হইতে কারখানার পরিবেশের সামান্য পরিবর্তন করিলে অনেক সময় কিরূপ সুফল পাওয়া যায় তাহার উদাহরণ নিম্নলিখিত কাহিনী হইতে পাওয়া যায়:

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকায় টেক্সাসের (Texas) উপকণ্ঠে এরোপ্লেন তৈয়ারীর একটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। গোপনে এই কারখানার কার্য চলিত। বাহির হইতে যাহাতে আলো দেখা না যায়, সেইজন্য বড় কোন জানালা ছিল না। ছাতগুলি ছিল খুব উঁচু (মাটি হইতে প্রায় ৫০ ফিট উঁচু), এবং ছাতের কাছে ছোট ছোট 'ভেন্টিলেটর' ছিল। ভিতরের উত্তাপের সমতা-বিধানের জন্য শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণ (air-conditioning)-এর ব্যবস্থা হয়। আশা করা হইয়াছিল যে, উহাতে শ্রমিকদের কোন অসুবিধা হইবে না। আশ্চর্যের বিষয়, কিছুদিন পরেই শ্রমিকরা অভিযোগ করিতে লাগিলেন যে, বাতাসের অভাবে ভীষণ গরম বোধ হইতেছে। শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা পুনরায় পরীক্ষা করিয়া দেখা হইল যে, তাহাতে কোন ত্রুটি নাই। তখন কর্মাধ্যক্ষ সমস্ত ব্যাপারটি

সকল লোক সকল কর্মের উপযুক্ত নহে—যে যে কর্মের উপযুক্ত, সে যদি তাহাতে নিযুক্ত না হইয়া অন্য কর্মে নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে সে আশানুরূপ কর্মকুশলতা দেখাইতে পারিবে না। এইজন্য মনোবিদ্যাসম্মত উপায়ে মানসিক ক্ষমতা নির্ণয় করিয়া কর্মি-নিয়োগ একান্ত বাঞ্ছনীয়।

শিল্পজাত দ্রব্যের কিভাবে বহুল প্রসার হয়, ঐ সব দ্রব্য কিভাবে ক্রেতাদের 'মনোহরণ' করিতে পারে, ক্রেতাদের অবগতির জন্য উপযুক্ত বিজ্ঞাপন দান কিভাবে করা যায়, ইত্যাদি বিষয়ের পর্যালোচনা করিবার জন্য মনোবিদ্যার সাহায্য একান্ত প্রয়োজন।[৫]

আবার শিল্প ও ব্যবসায় ক্ষেত্রে শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে মনোমালিন্যের জন্য নানারূপ শ্রমিক-বিরোধ দেখা দেয়—এই সব **বিরোধের কারণ দূরীকরণের জন্য** এবং কর্মক্ষেত্রে সাধারণভাবে **শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টির** ব্যাপারে মনোবিদ্যা-বিশারদের পরামর্শ গ্রহণ আবশ্যক।[৬]

(৩) **সমাজের সাধারণ সমস্যা: সমাজের সাধারণ সমস্যার মানসিক কারণ নির্ধারণ এবং উহার সমাধান,** এই দুই ব্যাপারে মনোবিদ্যার অবদান অপরিসীম। সামাজিক গোষ্ঠী (social groups) বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে, যথা, জনতা, বিভিন্ন সঙ্ঘ, জাতি ইত্যাদি। **ব্যক্তি-মন এবং বিভিন্ন প্রকারের সমাজ-মনের পারস্পরিক প্রভাব কিরূপ তাহা মনোবিদ্যাসম্মত উপায়ে জানা প্রয়োজন।** জনসাধারণের

মনোবিদ্যার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়া দেখিলেন। তিনি আদেশ দিলেন যে, দেওয়ালের উঁচু 'ভেন্টিলেটর'-গুলির কাছ দিয়া কাগজের শিকলি ঝুলাইয়া দেওয়া হউক্। ফলে, শ্রমিকগণ যখনই বাতাসের আশায় উপর দিকে চাহিয়া দেখিতেন, তখনই দেখিতেন যে কাগজের শিক্লিগুলি বেশ জোরেই বাতাসে দুলিতেছে। ইহার ফলে ক্রমশ: 'বাতাসের অভাব' সম্বন্ধে অভিযোগ কমিয়া গেল। (Keith Davis, *Human Relations in Business*, পৃ: ৩ দ্রষ্টব্য।)

৫ অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানে গ্রাহকগণের চাহিদা ইত্যাদি আলোচনা করিবার জন্য Market Research Officer নিযুক্ত হ'ন—তাঁহারা অনেক ব্যাপারে মনোবিদ্‌দের সাহায্য লইয়া থাকেন।

৬ আজকাল আমেরিকা ও ইউরোপের অনেক স্থানে শিল্পমনোবিদ্যা-বিশারদ্গণ সংস্থা গঠন করিয়া (যাহাদের 'Firms of Industrial psychologists' নামে অভিহিত করা হয়) বিভিন্ন ব্যবসায় ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে পরামর্শদান করিয়া থাকেন। (C. T. Morgan, *Introduction to Psychology*, p. 21.)

এই প্রসঙ্গে আমরা বলিতে পারি যে, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক বা 'মানবীয় সম্পর্ক' (human relations) অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টায় অনেক প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক-মঙ্গল কারণিক (Labour Welfare Officer) নিযুক্ত হ'ন।

বিভিন্ন বিশ্বাস ও সংস্কার ('কু' এবং 'সু')-এর মূল কারণ কি, একদেশদর্শিতা কেন হয়, জনসাধারণের মনে কেন উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং উত্তেজনাকালীন মনের অবস্থা কিরূপ হয়, জনমত কিরূপে গঠিত হয়, জনমত নির্ধারণের উপায় কী ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিতে হইলে মনোবিদ্যার সাহায্য গ্রহণ একান্ত আবশ্যক (পৃঃ ৬০-৬২ দ্রষ্টব্য)।

(৪) **রাষ্ট্র :** সুশৃঙ্খল সমাজে ক্রমশঃ রাষ্ট্রের বিবর্তন হয়। **রাষ্ট্র ও নাগরিকের মধ্যে কিরূপে সৌহার্দ্যের সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় এবং উহা কিভাবে অব্যাহত রাখা যায়,** রাষ্ট্র কিভাবে জনসাধারণের আস্থা লাভ করিবে, রাষ্ট্র কিভাবে জনমত নির্ধারণ করিয়া জনগণের প্রয়োজনের কথা অবহিত হইবে ইত্যাদি বিষয়ে মনোবিদ্যাসম্মত উপায়ে চিন্তা করা রাষ্ট্রনায়কগণের উচিত।

তাহা ছাড়া, **রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগে যাহাতে যোগ্যতা-অনুসারে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত হয়,** সেই বিষয় লক্ষ্য রাখা প্রতি রাষ্ট্রেরই কর্তব্য। এই যোগ্যতা-নিরূপণের জন্য বিভিন্ন প্রকারের ব্যক্তিত্ব-পরীক্ষা প্রয়োজন এবং এই বিষয় মনোবিদ্যাসম্মত প্রণালী গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়।

আবার **এক রাষ্ট্র যখন অন্য রাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তখন নানা কারণে মনোবিদ্যার সাহায্যের প্রয়োজন হয়।**[৭] সৈন্যবিভাগে যাহাতে উপযুক্ত লোক নির্বাচিত হ'ন, সৈন্য-পরিচালনার কার্য যাহাতে নায়কত্ব-গুণবিশিষ্ট লোকের হস্তে ন্যস্ত হয় ইত্যাদি ব্যাপারে মনোবিদের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়া থাকে।[৮] রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে নাগরিকদের

৭ আধুনিককালে যুদ্ধ-ব্যাপারে মনোবিদ্যার প্রয়োগের প্রচেষ্টা হইতে 'সমর-সম্বন্ধীয় মনোবিদ্যা' (Military Psychology) নামক এক পৃথক্ শাখা হইয়াছে। (*Psychological Bulletin*, June, 1941, দ্রষ্টব্য)।

৮ সাম্প্রতিক কালে নাৎসী জার্মানিতে সেনানায়ক নির্বাচনের সময় কঠোরভাবে ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা করা হইত। এইসব পরীক্ষাদ্বারা দৈহিক ও মানসিক কর্মক্ষমতা নিরূপণের চেষ্টা হইত। (W. C. Varnum, *Psychology in Everyday Life*, pp. 8-12 দ্রষ্টব্য।) তদানীন্তন জার্মানির লোক নির্বাচনের আদর্শের উল্লেখ করিয়া W. Lubrich বলিয়াছেন: "...technical skill must naturally be tested—but the prime requisite is the search for soldierly qualities which can be determined through the study of the *whole personality*."

সৈন্যবিভাগ বা অপর যে-কোন বিভাগে লোক নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সকল লোকের সকলপ্রকার কার্যের যোগ্যতা নাই। বিশেষ প্রকার কার্যের জন্য বিশেষ প্রকারের ক্ষমতা প্রয়োজন।

মধ্যে স্বপক্ষে প্রচার ও শত্রুরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপ-প্রচার ইত্যাদি কার্য মনোবিদ্যাসম্মত উপায়েই সুষ্ঠুভাবে সাধিত হয়।[৯]

যুদ্ধকার্যে ব্যবহৃত যন্ত্রাদি কি করিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করা যায়, অর্থাৎ ঐ সকল যন্ত্র কিভাবে ব্যবহার করিলে সহজে ক্লান্তি না আসে বা দৈহিক ও মানসিক কোন অসুবিধা না হয়, সেই জন্য মনোবিদ্যার সহায়তা প্রয়োজন।[১০]

মনোবিদ্যা যে কেবল যুদ্ধ পরিচালনায় সাহায্যদান করে তাহা নহে। **যুদ্ধনিবারণ কি করিয়া করা যায়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কিভাবে শান্তি রক্ষা করা যায়** ইত্যাদি ব্যাপারেও মনোবিদ্যা পরামর্শ দান করে।[১১]

মনোবিদ্যার যে শাখা বিশেষ প্রকার যোগ্যতার আলোচনা করে বর্তমানের অনেক লেখক উহার বিষয়বস্তুর নাম দিয়াছেন *Human Engineering* (মানবীয় যন্ত্রবিদ্যা)। যুদ্ধক্ষেত্রে বা শিল্পক্ষেত্রে যন্ত্র ব্যবহার করাই পর্যাপ্ত নহে—উপযুক্ত দক্ষতাবিশিষ্ট লোকের দ্বারা ব্যবহৃত হইলেই উহার সার্থকতা।

৯ গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যুধ্যমান রাষ্ট্রগুলি স্বদেশে ও বিদেশে কিরূপ প্রচারকার্য চালাইত, সে সম্বন্ধে একটি প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন P. M. A. Lineberger—নাম *Psychological Warfare.*

১০ এই প্রসঙ্গে আমরা একটি উদাহরণ দিতে পারি :

আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতে দেখিতে পাই যে, অত্যুজ্জ্বল আলোকে কোন কাজ করিবার পর হঠাৎ কোন অন্ধকার স্থানে কাজ করিতে যাইলে প্রথমে কিছুক্ষণ কিছুই দেখা যায় না। তাহার পর ক্রমশঃ অন্ধকার-প্রতিযোজন (dark-adaptation) হয়। যুদ্ধকালে অনেক সময় এমন হইত যে, আলোকিত স্থান হইতে অন্ধকারে হঠাৎ কাজ করা প্রয়োজন হইত ; অথচ সুষ্ঠু প্রতিযোজনের জন্য কিছু সময় (প্রায় ৩০ মিনিট) নষ্ট হইয়া যাইত। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য ওয়ালটার মাইলস্ (Walter R. Miles) এক উপায় উদ্ভাবন করেন। অন্ধকারে কাজে যাইবার পূর্বে যদি কিছুক্ষণ লালরঙের চশমা (red goggles) পরিয়া আলোকিত স্থানে কাজ করা যায় তাহা হইলে আলোকিত স্থান হইতে অন্ধকার স্থানে যাইলে কাজ করিবার কোন অসুবিধা হয় না।

উপরের এই উদাহরণ হইতে দেখা যায় যে, কত 'সামান্য' পরিবর্তনের পরামর্শ দিয়া মনোবিদ্‌রা বিভিন্ন কার্যের সুবিধা করিয়া দেন। (Mann & Pirie, *The Science of Seeing*, p. 102 এবং H. Ruja, *Psychology for Life*, p. 7 দ্রষ্টব্য।)

১১ Krech and Crutchfield, *Theory & Problems of Social Psychology*, Ch. XV দ্রষ্টব্য।

উপসংহার :

আমাদের জীবনের সকল ব্যাপারেই মনোবিদ্যার সাহায্য প্রয়োজন।[১২] নিজের সম্বন্ধে ও অপরের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ, বহির্জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ, নিজের ও অপরের মানসিক অস্বাভাবিকতা বা অসুস্থতা দূরীকরণ এবং মানসিক উন্নতিসাধন, অপরাধ-প্রবণতা নিরাকরণ, পরস্পরের সহিত সুষ্ঠু মানসিক সম্বন্ধ-স্থাপন, শিল্পোন্নতি, সামাজিক উন্নতি, শিক্ষার মান উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি-স্থাপন ইত্যাদি বহু বিষয়েই মনোবিদ্যা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সাহায্য দান করিয়া থাকে।[১৩]

১২ নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকটি এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে :

"চিত্তং কারণমর্থানাং তস্মিন্নস্তি জগত্রয়ম্।

তস্মিন্ ক্ষীণে জগৎ ক্ষীণম্ তচ্চিকিৎস্যং প্রযত্নতঃ॥"

১৩ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনোবিদ্যার প্রয়োগ ও উহার উপকারিতা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য। J. S. Gray-সম্পাদিত *Psychology in Use.*

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্নায়ুতন্ত্র

১। মনের দৈহিক 'ভিত্তি' (Physiological basis of mental life):

দেহ ও মনের সম্বন্ধ যে কত নিবিড় তাহা আমরা দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা হইতে জানিতে পারি। দেহের সুস্থতা বা অসুস্থতা মনের উপর যেরূপ ছায়াপাত করে, সেইরূপ মনের সুস্থতা বা অসুস্থতা দেহের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই কারণে মানসিক অবস্থা ও প্রক্রিয়াগুলিকে সুষ্ঠুভাবে জানিতে হইলে উহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট দৈহিক অবস্থা ও ক্রিয়াগুলিকে জানিতে হইবে। বাহ্য জগতের জ্ঞান আহরণ করিবার জন্য মনকে দেহের উপর নির্ভর করিতে হয়, আবার বাহ্য জগতে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করিবার জন্যও মনকে দেহের মাধ্যমেই কাজ করিতে হয়; অর্থাৎ শারীরিক অবস্থা দ্বারাই সাধারণ মানসিক অবস্থা অভিব্যক্ত হয়। সুতরাং মনকে জানিবার জন্য দেহকে জানা আবশ্যক।[১]

২। নিউরোনের গঠন ও কার্য (Structure and function of a neuron):

আমাদের দেহের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অংশ হইল প্রধান স্নায়ুতন্ত্র (central nervous system)। ইহা মস্তিষ্ক (brain) এবং সুষুম্নাকাণ্ড (spinal cord) লইয়া গঠিত। এই স্নায়ুতন্ত্রকে বুঝিতে হইলে ইহার ক্ষুদ্রতম অংশকে প্রথমে জানিতে হইবে। **স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষুদ্রতম অংশ বা 'একক'** (unit) **হইল নিউরোন** (neuron)।

সাধারণতঃ নিউরোনের তিনটি অংশ থাকে: (১) একটি কোষ-দেহ (cell-body), এবং ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট (২) এ্যাক্সন (axone) ও (৩) ডেনড্রাইট-সমূহ (dendrites)। (১ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

---

১ পৃঃ ৮ ও পৃঃ ৮২-৮৪ দ্রষ্টব্য।

(১) এই **কোষ-দেহ** (cell-body)-এর গঠন-বৈশিষ্ট্য আবার এইরূপ :

(ক) ইহার একটি কেন্দ্র বা সারাংশ (nucleus) আছে ;

(খ) ঐ সারাংশটি একপ্রকার তরল পদার্থের মধ্যে অবস্থিত ;

এবং (গ) ঐ তরল পদার্থের মধ্যে আবার অতি সরু সরু পদার্থ (যাহাদের বরফের কুঁচির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে) ভাসিতে থাকে।

(২) **এ্যাক্সন্** (axone) :

ইহা কোষ-প্রকোষ্ঠ হইতে বর্ধিত দীর্ঘ ও সরু সূত্র-বিশেষ। ইহার দৈর্ঘ্য বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে—এক মিলিমিটার অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইতে পারে, আবার এক মিটার অপেক্ষাও দীর্ঘ হইতে পারে। সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্তু (neurofibril) লইয়া ইহা গঠিত। সাধারণতঃ একটি কোষের একটিমাত্র এ্যাক্সন থাকে।

আবরণ (cover) :—এ্যাক্সনের আবরণ দুই প্রকারের হইতে পারে :

(ক) কোষ-দেহ হইতে নির্গমনের কিছু পরে উহা একটি স্নেহ-বিশিষ্ট আবরণে আবৃত হয়। (উহাকে myelin sheath বা medullary sheath বলে)। অন্তরণ বা আবরণের কার্য (insulation) ব্যতীত অন্য কার্যও ইহা দ্বারা সাধিত হয় বলিয়া মনে হয় ; যথা, পুষ্টি-সাধন (nutrition) এবং স্নায়বিক শক্তি-পরিবহন (conduction of nervous impulse)।

(খ) অনেক এ্যাক্সনের আবার উপরে বর্ণিত এই আবরণ ব্যতীত আর-একটি প্রাথমিক আবরণ থাকে (ইহাকে sheath of Schwann বা neurilemma বলে)। কোন কোন এ্যাক্সনের কেবলমাত্র এই আবরণটি থাকে, অথচ প্রথমোক্ত আবরণ থাকে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কোন কোন এ্যাক্সনের প্রথমোক্ত আবরণ আছে, দ্বিতীয়টি নাই ; কাহারও কাহারও দ্বিতীয়টি আছে, প্রথমটি নাই ; আবার কতকগুলি এ্যাক্সনের দুইটি আবরণই আছে।

অন্তভাগ (terminus বা end) :—অন্তভাগে আসিয়া অ্যাক্সন্ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখায় বিভক্ত হয় (ইহাদের বলা হয় end brushes)। এই সব ক্ষুদ্র শাখাগুলির পরিসমাপ্তি ঘটিতে পারে (ক) অপর কোন নিউরোনের ডেন্ড্রাইট্-পুঞ্জের মধ্যে, অথবা (খ) কোন পেশীর মধ্যে, অথবা (গ) কোন গ্রন্থির মধ্যে, অথবা (ঘ) কোন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে।
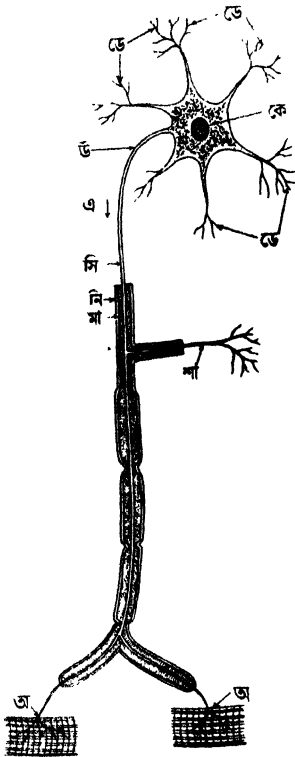
১ নং চিত্র। নিউরোন (উপরের এইটি ক্রিয়াবাহী বা motor)। কে=কেন্দ্র ; উ=এ্যাক্‌সনের উদ্গমন (axone hillock) ; এ=এ্যাক্‌সন্ ; সি=অনাবৃত সিলিণ্ডার (cylinder) এবং উহার নিম্নগমন (পেশী-অভিমুখে) ; নি=নিউরিলিমা ; মা=মাইলীন আবরণ। ডে=ডেনড্রাইট্‌পুঞ্জ ; শা=শাখা ; অ=অন্তভাগ।

শাখা (collaterals) :—প্রধান স্নায়ুতন্ত্রে ইহার অগ্রগমনের পথে এ্যাক্‌সন্ বাহু বিস্তার করিতে পারে ; এই সব নূতন শাখার পরিসমাপ্তি ঘটে অন্য কোন নিউরোনের ডেন্‌ড্রাইট্‌-পুঞ্জের মধ্যে।

(৩) ডেনড্রাইট্ (Dendrites) :

ইহারা কোষ-দেহ হইতে বর্ধিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-বিশেষ। ইহারা সংখ্যায় বহু এবং কোষ-দেহের সন্নিকটেই বহু শাখা-প্রশাখা সমেত একটি 'গুল্ম' (bush) রচনা করিয়াই পরিসমাপ্ত হয়।[২] ডেন্‌ড্রাইট্‌সমূহ পুষ্টি-সাধন এবং পরি-বহনের কার্যে লিপ্ত থাকে বলিয়া অনুমিত হয়।

এ্যাক্‌সনের তুলনায় ডেন্‌ড্রাইট্‌-গুলির আকারগত পার্থক্য এইরূপ :

(ক) একটি কোষের একটি এ্যাক্‌সন্ থাকে, কিন্তু ডেন্‌ড্রাইট্‌গুলি সংখ্যায় বহু।

(খ) এ্যাক্‌সন্ আকারে লম্বা, কিন্তু ডেন্‌ড্রাইট্‌গুলির দৈর্ঘ্য ক্ষুদ্র বা

---

২ ইহার একটি ব্যতিক্রম আছে। সুষুম্নার অন্তর্মুখী নিউরোন (afferent spinal neuron)-এর ডেনড্রাইট্ আকারে দীর্ঘ, মসৃণ এবং আচ্ছাদিত। এই পর্যন্ত এ্যাক্‌সনের সহিত ইহার মিল আছে। কিন্তু শক্তি-পরিবহনের ব্যাপারে ইহা অন্যান্য ডেনড্রাইটের ন্যায়—কোষ-দেহের প্রতি ইহা শক্তি চালিত করে, কোষ-দেহ হইতে শক্তি চালিত করে না। (কোষ-দেহ হইতে শক্তি-চালনা এ্যাক্‌সনের কার্য)।

(গ) এ্যাক্‌সনের ব্যাস বা পরিধি মোটামুটি সুসম, কিন্তু ডেন্‌ড্রাইট্‌-গুলির পরিধি অসম।

(ঘ) এ্যাক্‌সন্‌ আকারে মসৃণ, কিন্তু ডেন্‌ড্রাইট্‌সমূহ অমসৃণ।

(৪) নিউরোনের প্রকার ভেদ :

নিউরোনের অংশগুলি পরিবহনের কার্য করে, সুতরাং সমগ্রভাবে নিউরোন এই কার্য করে বলা যাইতে পারে।[৩]

তবে পরিবহনের পার্থক্য অনুসারে নিউরোনগুলি বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। নিউরোনগুলি মস্তিষ্কের শক্তি-কেন্দ্র হইতে পেশীসমূহে শক্তি সঞ্চালিত করে, অথবা ইন্দ্রিয় হইতে মস্তিষ্কে উদ্দীপন বহন করে, অথবা মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে নিউরোন যথাক্রমে তিন প্রকারের হইতে পারে :

(ক) বহির্মুখী (efferent বা motor) [১ নং চিত্র] ;

(খ) অন্তর্মুখী (afferent) [২(ক) নং চিত্র] ;

(গ) মস্তিষ্করাজ্যে সংযোগ-স্থাপন-কারী (interconnecting central neurone) [২(খ) নং চিত্র]।

আকারের দিক হইতে নিউরোনের কোষ-দেহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় : (ক) দ্বিমুখী (Bipolar cells) এবং (খ) বহুমুখী (Multipolar cells)।

২নং চিত্র। দুই প্রকারের নিউরোন।
ক—অন্তর্মুখী নিউরোন;
খ—গুরুমস্তিষ্কের নিউরোন (১—কোষদেহ, ২—এ্যাক্‌সন্‌, ৩—ডেন্‌ড্রাইট্‌ সমুদয়)।

৩ নিউরোন সম্বন্ধে বলা হয় : "It is an *anatomical, functional* and *tropic* unit."

(ক) দ্বিমুখী কোষ—এই কোষ আকারে সুতা কাটিবার "টাকু" (spindle)-এর ন্যায় এবং ইহার দুইটি বিপরীত দিক্ হইতে যথাক্রমে একটি এ্যাক্সন্ এবং ডেন্ড্রাইট্পুঞ্জ নির্গত হয়। এই কোষগুলি অন্তর্মুখী নিউরোন শ্রেণীভুক্ত।

(খ) বহুমুখী কোষ—এই কোষগুলির অধিকাংশ আকারে বহুভুজক্ষেত্র (Polygon)-এর ন্যায়; অপরগুলি পিরামিড্ (Pyramid)-এর ন্যায়, অথবা বর্তুলাকার (spherical)। এইগুলি বহির্মুখী নিউরোন শ্রেণীভুক্ত।

৩। **প্রান্তসন্নিকর্ষ (Synapse)ঃ**

যে সঙ্গমস্থলে একটি নিউরোনের এ্যাক্সনের অন্তভাগ অপর এক নিউরোনের ডেন্ড্রাইট্গুলির সহিত মিলিত হয়, সেই মিলন-স্থলকে প্রান্তসন্নিকর্ষ (synapse) বলে। (৩ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

৩নং চিত্র।
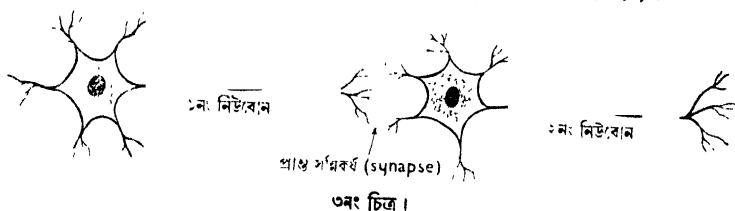
১নং নিউরোনের এ্যাক্সন্ ও ২নং নিউরোনের ডেনড্রাইটের মিলনস্থল বা প্রান্তসন্নিকর্ষ।

প্রান্তসন্নিকর্ষীয় সম্বন্ধের স্বরূপ লইয়া মতভেদ আছে এবং উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও এই সংযোগস্থলের স্বরূপ সম্পূর্ণভাবে বুঝা যায় না। তবে অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকেরই মতে **এক নিউরোনের এ্যাক্সনের অন্তভাগের সহিত অপর নিউরোনের ডেনড্রাইটের এই সংযোগ বা সংস্পর্শ অবিচ্ছিন্ন (continuous) সম্বন্ধ নহে—ইহা সান্নিধ্যের (contiguity) সম্বন্ধ**।[৪] যেমন, দুইটি সুবৃহৎ বৃক্ষ পাশাপাশি থাকিলে তাহাদের শাখা-প্রশাখা এমনভাবে পরস্পরের সহিত জড়াইয়া থাকে যে, দূর হইতে দুইটি বৃক্ষের দুইটি পৃথক্ শাখাকে একটি অবিচ্ছিন্ন শাখা মনে হয়, সেইরূপ এক নিউরোনের এ্যাক্সনের প্রান্তভাগের সহিত অপর নিউরোনের ডেনড্রাইট্গুলি এমনভাবে ঘন-সন্নিবেশিত হইয়া থাকে যে, উহাদের মধ্যে এক নিরবচ্ছিন্ন সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয়। প্রকৃত-

৪ এই কারণ Synapse-কে 'place of functional contact' বলা হয়।

পক্ষে কিন্তু এই সম্বন্ধ ঘন-সান্নিধ্যের সম্বন্ধ। এই মতবাদকে **'নিউরোন-মতবাদ'** (neurone doctrine) বলা হয়।[৫]

এইরূপ সম্বন্ধ যে ঘন-সান্নিধ্যের সম্বন্ধ, এই অভিমতের সপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তির অবতারণা করা হইয়া থাকে :

(১) একটি প্রত্যাবর্তক বৃত্তাংশ (reflex arc)-এর মধ্য দিয়া স্নায়বিক শক্তি (nerve-impulse) পরিবাহিত হইতে যে সময় লাগে, তাহা ঐ প্রত্যাবর্তক বৃত্তাংশের ন্যায় একই দৈর্ঘ্যের স্নায়ুকাণ্ড (nerve trunk)-এর মধ্য দিয়া যাইবার জন্য যে সময়ের প্রয়োজন, সেই সময় অপেক্ষা অধিক। ইহার কারণ প্রত্যাবর্তক বৃত্তাংশের মধ্যে এক বা একাধিক প্রান্তসন্নিকর্ষীয় সংযোগস্থল থাকে; সুতরাং স্নায়ুকাণ্ডের ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন গতিপথ না থাকায় প্রত্যাবর্তক বৃত্তাংশপথে স্নায়বিক শক্তি পরিবাহিত হইতে একটু বেশী সময়ের প্রয়োজন।

(২) একটি স্নায়ু-তন্তু (nerve-fibre)-তে স্নায়বিক শক্তি যে-কোন দিকেই যাইতে পারে, কিন্তু প্রত্যাবর্তক বৃত্তাংশপথে উহা সম্ভব নহে ; কারণ ঐ পথে এক বা একাধিক প্রান্তসন্নিকর্ষ থাকে এবং স্নায়বিক শক্তি সর্বদাই এ্যাক্‌সন্ হইতে ডেন্‌ড্রাইটের অভিমুখে যায়, উহার বিপরীত দিকে নহে। যদি এক নিউরোনের এ্যাক্‌সন্ ও অপর নিউরোনের ডেন্‌ড্রাইটের মধ্যে নিরবচ্ছিন্নতা থাকিত, তাহা হইলে উভয় দিকেই স্নায়বিক শক্তি প্রবাহিত হইতে পারিত।

(৩) স্নায়ু-তন্তুকে বার বার উদ্দীপিত করিলেও সহজে ক্লান্তি আসে না, কিন্তু প্রত্যাবর্তক-বৃত্তাংশকে কয়েক বার উদ্দীপিত করিলেই সহজে ক্লান্তি আসে। কারণ উদ্দীপনার ফলে এ্যাক্‌সন্ ও ডেনড্রাইট্‌সমূদয়ের মধ্যে সান্নিধ্য কমিয়া যায়।

এই সকল কারণে প্রান্তসন্নিকর্ষীয় সম্বন্ধকে নিরবচ্ছিন্নতার সম্বন্ধ না বলিয়া **সান্নিধ্যের সম্বন্ধ** (relation of contiguity) বলাই ভাল।

সান্নিধ্য-জনিত যে ঘনিষ্ঠতা তাহার তারতম্য ঘটিতে পারে। এই তারতম্য মোটামুটি তিন প্রকারের হইতে পারে[৬] ; যথা :

৫ তুলনীয় : "The arrangement has been aptly compared to that of two trees growing alongside one another with their branches intermingling and touching, but obviously not continuous. This conception is usually termed the *neurone doctrine*." (Lickley, *The Nervous System*, p. 12.)

৬ G. L. Freeman, *Physiological Psychology*, p. 129 দ্রষ্টব্য।

(ক) সুষুম্নাকাণ্ডে যে সান্নিধ্য দেখা যায় তাহা হইল এ্যাক্‌সন্ ও ডেনড্রাইট্‌সমুদয়ের মধ্যে স্থূল সান্নিধ্য—অর্থাৎ একটি নিউরোনের এ্যাক্‌সন্ অপর নিউরোনের ডেনড্রাইট্‌পুঞ্জের অতি নিকটে আসিয়া পরিসমাপ্ত হয়।

(খ) গুরুমস্তিষ্ক (cerebrum)-এ এক নিউরোনের অন্তভাগগুলি অপর নিউরোনের ডেনড্রাইটের প্রায় প্রতিটি শাখা-সূত্রের সন্নিধিলাভের চেষ্টা করে। অতএব এই সান্নিধ্য অতি নিবিড়।

(গ) লঘুমস্তিষ্ক (cerebellum)-এ দেখা যায় যে, একটি নিউরোনের এ্যাক্‌সনের প্রান্ত-শাখাসমূহ একাধিক নিউরোনের ডেনড্রাইট্‌পুঞ্জের সহিত সান্নিধ্য-স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে। অতএব এইরূপ স্থলে সান্নিধ্য অতি ব্যাপক।

৪। স্নায়বিক শক্তির বৈশিষ্ট্য (Nature and characteristics of neural or nervous impulse) ঃ

স্নায়ু-তন্তুর দুইটি বিশেষ কার্য হইল—উদ্দীপন (excitation) এবং পরিবহন (conduction)। সুতরাং স্নায়ু-তন্তু উদ্দীপিত হইবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে এবং উদ্দীপিত হইলে যে শক্তি সঞ্চারিত হয় তাহা উহা বহন করে।

স্নায়বিক উত্তেজনা বলিতে আমরা নিউরোনের **উদ্দীপিত অবস্থা** বুঝি; এই উদ্দীপন বাহ্য উদ্দীপক দ্বারা জাগরিত হয়। আমরা স্নায়বিক উত্তেজনার স্বরূপ পূর্ণভাবে জানি না; তবে এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মতবাদ গৃহীত হইয়াছে।

স্নায়বিক শক্তি **বিদ্যুৎ-শক্তির সহিত তুলনীয়**। এই শক্তি স্নায়ুপথে সঞ্চারিত হয়। অন্তর্মুখী নিউরোন উদ্দীপিত হইলে সংবেদন (sensation) এবং বহির্মুখী নিউরোন উদ্দীপিত হইলে পেশী-সংকোচন (muscular contraction) হয়। যদিও বাহ্য উদ্দীপকের দ্বারা নিউরোন উদ্দীপিত হয়, তাহা হইলেও উদ্দীপক হইতে দেহমধ্যে কোন শক্তি সঞ্চারিত হয় না—ঐ শক্তি দেহমধ্যেই সৃষ্ট হয়।

এই শক্তি-সঞ্চারণ কালে কিছু রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। মানুষের বহির্মুখী নিউরোনে এই শক্তির গতি প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১২৫ মিটার। নানা কারণে (যথা, উত্তাপ-পরিবর্তনে) এই গতির পরিবর্তন ঘটিতে পারে।

নিউরোনগুলিতে একটি বিশেষ নিয়মে স্নায়বিক শক্তি পরিবাহিত হয়। একটি বিশেষ নিউরোনে ঐ শক্তি সর্বদাই ডেনড্রাইট্ হইতে অ্যাক্‌সন্ অভিমুখে যায়; **কিন্তু যখন এক নিউরোন হইতে অপর নিউরোনে প্রান্তসন্নিকর্ষীয় সংযোগের মধ্য দিয়া স্নায়বিক শক্তি বাহিত হয়, তখন উহা সর্বদাই এ্যাক্‌সন্ হইতে ডেনড্রাইটের পথে যায়**—অর্থাৎ স্নায়বিক শক্তি এক নিউরোন হইতে উহার এ্যাক্‌সনের পথে অপর নিউরোনে উহার ডেন্‌ড্রাইটের মাধ্যমে পৌছে ($a \rightarrow d$)। ইহাকে **সম্মুখ-পরিবহন-নীতি (Law of Forward Conduction)** বলে।

অন্তর্মুখী নিউরোনকে উদ্দীপিত করিতে হইলে উদ্দীপক এক বিশেষ পরিমাণের হওয়া চাই, অর্থাৎ উহা যদি অতি ক্ষীণ হয়, তাহা হইলে উহা নিউরোনকে উদ্দীপিত করিতে পারিবে না। আবার উদ্দীপকের তীক্ষ্ণতার একটা সর্বোচ্চ সীমারেখা আছে যাহার পরে আর নিউরোনকে উদ্দীপিত করা যাইবে না। তাহা ছাড়া, একটি নিউরোন কতক্ষণ উদ্দীপিত থাকিতে পারিবে তাহা উদ্দীপকের অস্তিত্বের উপরই কেবলমাত্র নির্ভর করে না। উদ্দীপনের কার্যকারিতার সময় নির্ভর করে স্নায়ু ও পেশীর ক্ষমতার উপর। একটি নিউরোন উদ্দীপিত হইতে যে সর্বনিম্ন সময়ের প্রয়োজন, তাহাকে বলে ক্রোনাক্সি (chronaxie)।

এই প্রসঙ্গে আমরা **পূর্ণ-বা-ব্যর্থ-সূত্র (All-or-None Law)** আলোচনা করিব।

কোন একটি স্নায়ুতে উদ্দীপক প্রয়োগ করিলে উহার সহিত সংশ্লিষ্ট পেশীর সঙ্কোচন ঘটে। কিন্তু এই সঙ্কোচন কী পরিমাণের হইবে, তাহা কি উদ্দীপকের তীব্রতা বা তীক্ষ্ণতা (intensity)-র উপর নির্ভর করে? পূর্বে বিশ্বাস করা হইত যে, প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা ও ব্যাপকতা নির্ভর করে উদ্দীপকের তীব্রতার উপর; এখন কিন্তু এই বিশ্বাস পরিত্যক্ত হইয়াছে। **যখনই কোন স্নায়ু প্রতিক্রিয়া করে, তখনই ঐ স্নায়ু হয় উহার পূর্ণশক্তি অনুসারে প্রতিক্রিয়া করে, আর নয় একেবারেই কোন প্রতিক্রিয়া করে না।** অর্থাৎ স্নায়ু-বিশেষে যতটা শক্তি উদ্দীপক-প্রয়োগের সময় পাওয়া যায়, তাহার সবটাই প্রতিক্রিয়া-কালে ব্যয়িত হইবে, অথবা মোটেই কিছু ব্যয়িত

হইবে না। (যাহার ফলে কোন প্রতিক্রিয়াই হইবে না)। কোন আতসবাজী পুড়াইবার সময় আমরা এমন ব্যবস্থা করিতে পারি না যে, অল্প আগুন দিলে অল্প বারুদ পুড়িবে, আবার বেশী আগুন দিলে বেশী বারুদ পুড়িবে; স্নায়ুর প্রতিক্রিয়ার কালেও তদনুরূপ হয়—উদ্দীপকের পরিমাণের তারতম্যের
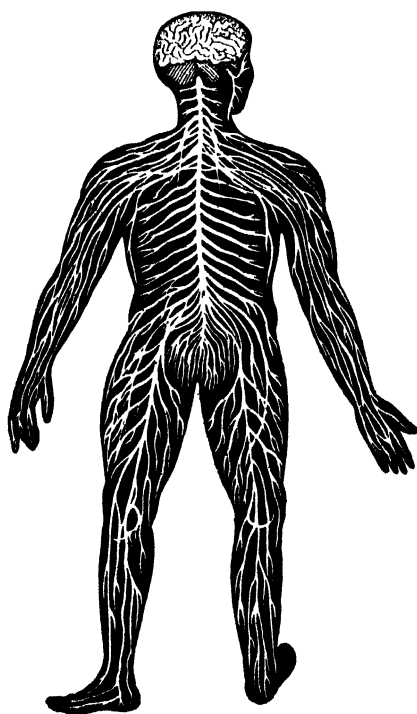
৪নং চিত্র।

স্নায়ুতন্ত্র

উপরের চিত্রে মস্তিষ্ক, সুষুম্নাকাণ্ড এবং স্নায়ুরাশি দেখা যাইতেছে

উপর প্রতিক্রিয়ার তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভর করে না। প্রতিক্রিয়ার তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভর করে প্রতিক্রিয়াকারী নিউরোনের সংখ্যার উপর—অধিক

সংখ্যক নিউরোন এককালে প্রতিক্রিয়া করিলে প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা বৃদ্ধি পায়।[৭]

৫। স্নায়ুতন্ত্রের বিভাগ (Division or Parts of the Nervous System) :

দেহযন্ত্রের বিভিন্ন কার্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়া উহাদের সুনির্দিষ্ট পথে চালিত করে স্নায়ুতন্ত্র। মস্তিষ্ক, সুষুম্নাকাণ্ড বা দণ্ডরজ্জু এবং স্নায়ুবৃন্দ
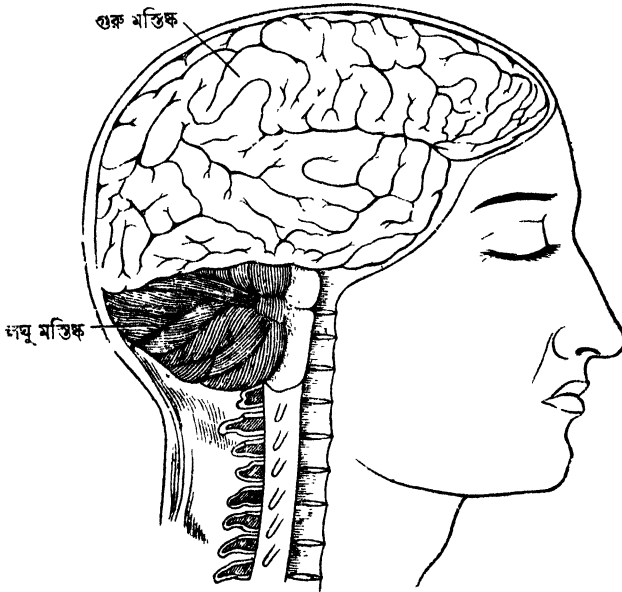
৩নং চিত্র।

উপরের চিত্রে গুরুমস্তিষ্ক, তন্নিম্নে লঘুমস্তিষ্ক এবং তাহার পর দীর্ঘীভূত মজ্জা ও মেরুদণ্ড দেখা যাইতেছে।

লইয়া প্রধান স্নায়ুতন্ত্র গঠিত। ইহা অন্তর্মুখী স্নায়ুদ্বারা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত এবং বহির্মুখী স্নায়ুদ্বারা পেশীসমূহের সহিত সংযুক্ত। (৪নং চিত্র)।

৭ তুলনীয় : "You cannot graduate the force of the explosion (of dynamite) by varying the force of the spark with which you set it off. The charge can differ in amount, but whatever amount is present explodes as a unit......Similarly, a single nerve fibre discharges all of its available energy when it discharges at all. A stimulus may be too weak to arouse the fibre, but if it is strong enough to arouse any response, it arouses the full response of which the fibre is capable at that particular moment." (Woodworth, *Psychology*, 12th. Ed., pp. 253-4.).

স্নায়ুতন্ত্রকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়: প্রধান (central), স্বতঃক্রিয় (autonomic) এবং প্রান্তবর্তী (peripheral)।

(ক) প্রধান স্নায়ুতন্ত্র হইল মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড লইয়া গঠিত। মস্তিষ্কের আবার বিভিন্ন অংশ আছে, যথা, সুষুম্নাশীর্ষক বা দীর্ঘীভূত মজ্জা (medulla oblongata), লঘুমস্তিষ্ক (cerebellum), মধ্য-মস্তিষ্ক (mid-brain), গুরুমস্তিষ্ক (cerebrum) (৫নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

(খ) স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের দুইটি প্রধান বিভাগ—সমবেদী (Sympathetic) এবং পরাসমবেদী (Parasympathetic)।

(গ) প্রান্তবর্তী স্নায়ুতন্ত্রের দুইটি বিভাগ হইল: মস্তিষ্ক-স্নায়ু (cranial nerves) এবং সুষুম্না-স্নায়ু (spinal nerves)।

নিম্নলিখিত তালিকাতে স্নায়ু-তন্ত্রের বিভিন্ন বিভাগকে দেখান হইতেছে:
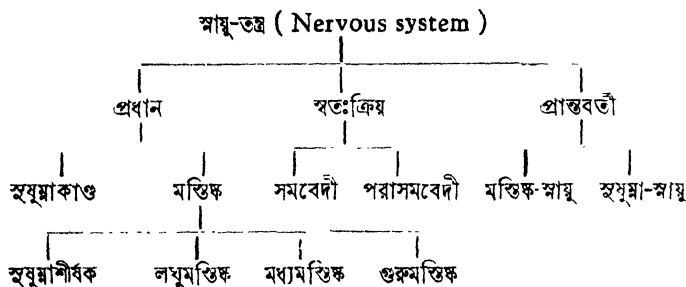
৬। প্রধান স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের গঠন ও ক্রিয়া (Structure and function of the different parts of the central nervous system):

আমরা পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে স্নায়ু-কেন্দ্রের বিভিন্ন অংশগুলির অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়াছি। বর্তমান অনুচ্ছেদে আমরা প্রধান স্নায়ু-কেন্দ্রের এক একটি অংশের পৃথক্ পৃথক্ বর্ণনা দিব।

(ক) সুষুম্নাকাণ্ড বা কশেরুমজ্জা বা দণ্ডরজ্জু (Spinal Cord):

গঠন-বৈশিষ্ট্য (Structure)—

আমাদের পৃষ্ঠভাগে বস্তিগহ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া স্কন্ধদেশ পর্যন্ত যে অস্থিমালা বিদ্যমান তাহাকে বলে মেরুদণ্ড। এই অস্থিমালা

উপর্যুপরি স্থাপিত অস্থি লইয়া সংগঠিত। এই অস্থিগুলিকে দণ্ডাস্থি বলা হয় (৬নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

এই অস্থিগুলির অভ্যন্তরে গহ্বর আছে এবং অস্থিগুলি এমনভাবে সজ্জিত যে, একটির গহ্বর-মুখ অপরটির গহ্বর-মুখের উপর স্থাপিত; সুতরাং উহাদের মধ্য দিয়া সর্বোচ্চ অস্থি হইতে সর্বনিম্ন অস্থি পর্যন্ত একটি নালিকার সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ নালিকা-পথে একটি কোমল সূত্রবৎ পদার্থ মস্তিষ্ক হইতে সর্বনিম্ন অস্থি পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে—উহাকে বলে দণ্ডরজ্জু বা সুষুম্নাকাণ্ড (Spinal Cord)।

মেরুদণ্ড দুইটি অর্ধনালী দ্বারা দক্ষিণ ও বাম এই দুই অংশে বিভক্ত মেরুদণ্ডের পরিধির সর্বত্র সমরূপতা (uniformity) নাই—গ্রীবাদেশ (cervical region)-এ এবং কটিদেশ (lumbar region)-এ ইহার পরিধি অপেক্ষাকৃত ব্যাপক।

সুষুম্না স্নায়ুসমূহ (spinal nerves) মস্তিষ্ক ব্যতীত দেহের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত সকল গ্রাহক (receptor) এবং সাধনযন্ত্র (effector)-এর সহিত সংযুক্ত। **প্রতিটি স্নায়ু মেরুদণ্ডে প্রবেশ-মুখে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া গিয়াছে।** পশ্চাৎবর্তী (dorsal) মূল-অংশ দিয়া প্রবেশ করিয়াছে অন্তর্মুখী বা উদ্দীপন-পরিবহনকারী (incarrying, afferent বা sensory) স্নায়ু এবং সম্মুখবর্তী (ventral) মূলাংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে ক্রিয়াবাহী (efferent বা motor) স্নায়ু। সুষুম্না-স্নায়ুর গঠন ও কার্যের এই বিভাগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন চার্লস্ বেল্ (Sir Charles Bell) এবং ম্যাজেণ্ডী (Magendie); এইজন্য সুষুম্নার এই ব্যবস্থার নামকরণ করা হইয়াছে **বেল্-ম্যাজেণ্ডী-নীতি (Bell-Magendie Law)**
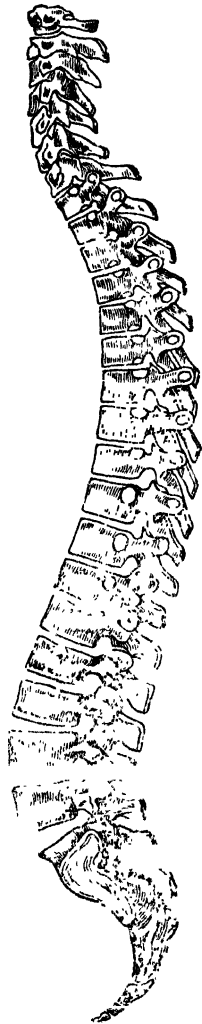
৬নং চিত্র। মেরুদণ্ড।

সুষুম্নাকাণ্ডের প্রতি দিকে ৩১টি স্নায়ু আছে; সুতরাং সর্বসমেত ৩১ জোড়া বা ৬২টি সুষুম্না-স্নায়ু আছে। ইহারা নিম্নলিখিতভাবে সজ্জিত আছে: প্রতি দিক্ হইতে (ক) ৮টি প্রবেশ করে সুষুম্না-কাণ্ডের গ্রীবাংশে (cervical region-এ); (খ) ১২টি প্রবেশ করে উহার বক্ষঃভাগে (thorasic region-এ); (গ) ৫টি প্রবেশ করে কটিদেশের (lumbar region-এর) পথে; (ঘ) ৫টি প্রবেশ করে ত্রিকাস্থির অংশে (sacral region-এ) এবং (ঙ) ১টি প্রবেশ করে অনুত্রিকাস্থির অংশে (coccygeal region-এ)।

প্রস্থচ্ছেদ (cross-section) করিলে দেখা যাইবে যে, ইহার বাহিরের অংশ শ্বেতবর্ণের এবং অভ্যন্তরীণ অংশ ধূসরবর্ণের।[৮] ধূসরবর্ণ-রঞ্জিত অংশটি আকারে কতকটা ইংরাজী 'H' অক্ষরের ন্যায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মেরুদণ্ডটি দক্ষিণ ও বাম অংশে অর্ধনালী দ্বারা বিভক্ত; প্রতি অংশের ধূসর এবং শ্বেত প্রত্যেক ভাগটি সম্মুখবর্তী (ventral), পশ্চাদ্‌বর্তী (dorsal) এবং পার্শ্ববর্তী (lateral), এই তিন ভাগে বিভক্ত। (৭নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।
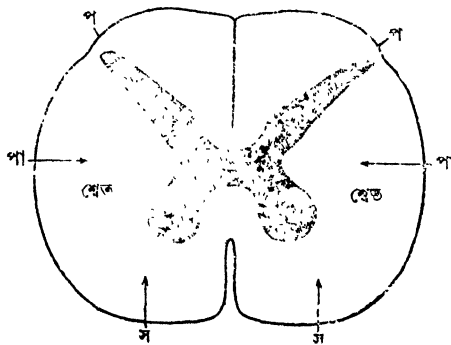
৭নং চিত্র। মেরুদণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ।
(স=সম্মুখবর্তী; প=পশ্চাদ্‌বর্তী; পা=পার্শ্ববর্তী)।

ধূসরপদার্থের এক এক অংশের সহিত দেহযন্ত্রের এক এক অংশ সম্বন্ধযুক্ত আছে। যথা, সুষুম্নাকাণ্ডের গ্রীবাংশে অবস্থিত আছে মধ্যচ্ছদা (diaphragm)-র

৮ এই ব্যবস্থা গুরুমস্তিষ্কের ব্যবস্থার বিপরীত। গুরুমস্তিষ্কে অভ্যন্তরীণ অংশ শ্বেতবর্ণ এবং বহিরংশ ধূসরবর্ণ।

স্নায়ু-কেন্দ্র; সুতরাং ইহা নষ্ট হইলে মধ্যচ্ছদার সঙ্কোচন-কার্য বন্ধ হইয়া যাইবে।

কার্য (Function)—

সুষুম্নাকাণ্ড দুইভাবে কার্য করিয়া থাকে—**ইহা প্রতিবর্তক ক্রিয়ার কেন্দ্র** (reflex centre) এবং **অন্তর্মুখী এবং বহির্মুখী স্নায়ুর পরিবহন-পথ** (conduction path for afferent and efferent nerves)।

(১) সুষুম্নাকাণ্ড নিম্নলিখিতভাবে প্রতিবর্তক ক্রিয়ার কেন্দ্ররূপে কার্য করিয়া থাকে।

গ্রাহক (receptor) বা ইন্দ্রিয় (sense-organ) উদ্দীপিত হইলে উদ্দীপনা অন্তর্মুখী স্নায়ুপথে সুষুম্নাকাণ্ডের ধূসর পদার্থের পশ্চাদংশ দিয়া প্রবেশ করিয়া উহার সম্মুখস্থ স্নায়ুমূলে আসিয়া উপনীত হয় এবং তথাকার উপযোজক কোষগুলি (adjustor cells) বহির্মুখী স্নায়ুপথে পেশীতে শক্তি সঞ্চালিত করে এবং তাহারই ফলে প্রতিক্রিয়া (reaction) সম্ভব হয়। এই পথটি আকারে বৃত্তাংশের ন্যায় বলিয়া ইহাকে **প্রতিবর্তক বৃত্তাংশ** বা **প্রতিবর্তনের চক্রপথ** (reflex arc) বলে। (৮নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।
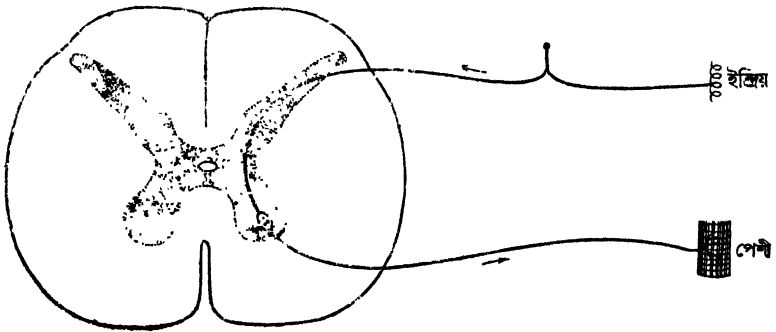
৮নং চিত্র। প্রতিবর্তক বৃত্তাংশ।

ধরা যাউক্‌, আমার দক্ষিণ হস্ত হঠাৎ একটি উত্তপ্ত পাত্র স্পর্শ করিল; তৎক্ষণাৎ আমি আমার হস্ত সরাইয়া লইলাম। ইহা হইল সমদেশীয় প্রতিক্রিয়া (ipsilateral reaction)। আবার এই প্রতিক্রিয়া পর্যাপ্ত না হইতে পারে। দক্ষিণ হস্তটি সরাইয়া লইবার পরও যন্ত্রণার হয়ত' উপশম হইল না—উদ্দীপনা ধূসর পদার্থের দক্ষিণ অংশ হইতে বাম অংশের সম্মুখস্থ

স্নায়ুমূলে প্রবেশ করিল এবং তথা হইতে ক্রিয়াশক্তি প্রবাহিত হওয়ার ফলে বাম হস্ত দিয়া হয়ত' দক্ষিণ হস্তের ক্ষতস্থান চুলকাইতে লাগিলাম। ইহাকে বলা যায় বিপরীতদেশীয় প্রতিক্রিয়া (contralateral reaction)।

আবার যন্ত্রণা এত বেশী হইতে পারে যে, আমি যন্ত্রণায় কাতর হইয়া হাত-পা ছুঁড়িতে পারি। এখানে উদ্দীপন সুষুম্নার বিভিন্ন বিভাগে (segment) প্রসারিত হইয়া পড়িল। ইহাকে বলা যায় আন্তর্বিভাগীয় প্রতিক্রিয়া (inter-segmental reaction)।[১]
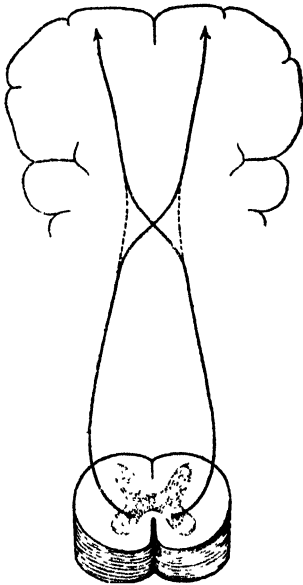
৯নং চিত্র। সুষুম্নার মধ্য দিয়া নিম্নমুখী পথ।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, নিউরোনগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ (correlation) থাকে এবং তাহার জন্য একটি মাত্র উদ্দীপকের ফলেও ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

(২) সুষুম্নাকাণ্ডের আর একটি কার্য হইল যে, উহা পরিবহন-পথ (conduction path)। এই পথেই বহির্মুখী স্নায়ুসমূহ নামিয়াছে এবং অন্তর্মুখী স্নায়ুসমূহ উঠিয়াছে।

নিম্নমুখী পথে (descending tract) গুরুমস্তিষ্ক হইতে পেশীসমূহে শক্তি সঞ্চারিত হয়। নিম্নমুখী শক্তিবাহী স্নায়ুসমূহের উদ্গমন হয় গুরুমস্তিষ্কের পিরামিড্ কোষগুলি (Pyramidal cell) হইতে। নিম্নগমনের পথে ইহাদের কতকগুলি সুষুম্নাশীর্ষকের নিকট পথ পরিবর্তন করে, আর বাকীগুলি সোজা নামিয়া আসে। প্রথমোক্ত শ্রেণীর স্নায়ুগুলির দ্বারা গঠিত হইয়াছে বক্র পিরামিড-পথ (crossed pyramidal tract) এবং দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর স্নায়ুগুলি দ্বারা গঠিত হইয়াছে সরল পিরামিড-পথ (direct pyramidal tract) (৯নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

---

১ G. L Freeman, ***Physiological Psychology***, p 157 দ্রষ্টব্য।

উধ্বর্মুখী পথ (ascending tract) রচিত হইয়াছে পেশী ও চর্মেন্দ্রিয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট স্নায়ুদ্বারা—ইহারা গুরুমস্তিষ্কে অথবা মস্তিষ্কের অন্য কোন উচ্চ স্তরে উদ্দীপন বহন করে। ইহাদের আবার কয়েকটি বিভাগ আছে :

(ক) ব্যথা-সংবেদন স্নায়ু (pain nerve fibre) চর্মের ব্যথা-বিন্দুগুলি (pain spot) হইতে উদ্দীপন বহন করিয়া স্নায়ু-কাণ্ডের ধূসরাংশের
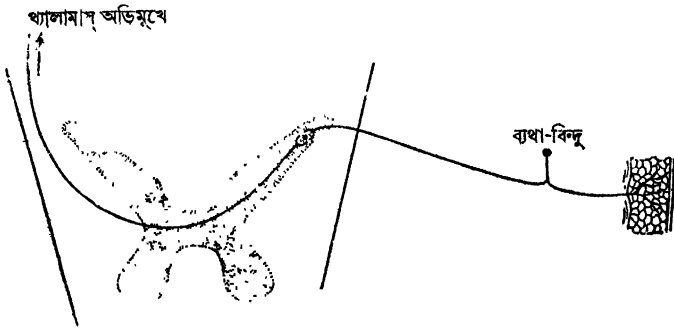
১০নং চিত্র। ব্যথা-সংবেদন স্নায়ু।
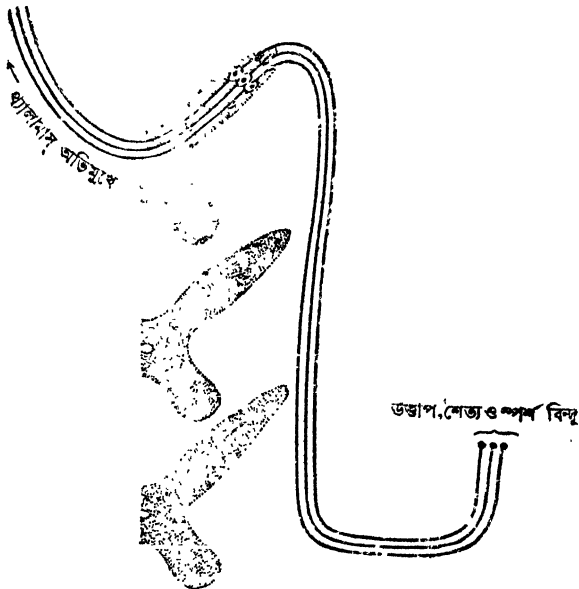
১১নং চিত্র। উত্তাপ, শৈত্য ও স্পর্শ-বিন্দু হইতে উধ্বর্মুখী স্নায়ু।

পশ্চাদ্‌ভাগ (posterior horn)-এ প্রবেশ করে এবং তথা হইতে বিপরীত দিকে যায় (যেমন, যেগুলি দক্ষিণ দিক্ দিয়া প্রবেশ করে, সেগুলি বাম দিকে যায়) ও মধ্যমস্তিষ্কে অবস্থিত থ্যালামাস্ (thalamus)-এ পৌছে এবং তথা হইতে গুরুমস্তিষ্কে যায়। (১০নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

চর্মের উত্তাপ, শৈত্য এবং স্পার্শ-বিন্দুগুলি হইতে অন্তর্মুখী স্নায়ুসমূহ সুষুম্নাকাণ্ডে প্রবেশ করিয়া কিছুপথ উর্ধ্বদিকে চলিতে থাকে এবং তাহার পর ধূসরাংশের পশ্চাদ্‌ভাগ দিয়া প্রবেশ করিয়া বিপরীত দিকে যায়; পরে শ্বেতাংশে প্রবেশ করিয়া উর্ধ্বমুখে চলিয়া থ্যালামাসে পর্যবসিত হয় এবং তথা হইতে গুরুমস্তিষ্কে যায় (১১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

এই চারিপ্রকার স্পার্শন-সংবেদন-স্নায়ুগুলি দ্বারা **সুষুম্না-থ্যালামাস্ পথ** (spino-thalamic tract) রচিত হইয়াছে।

(খ) পেশী (muscles), সন্ধিস্থল (joints) এবং পেশীবন্ধ (tendons) হইতে উদ্দীপন বহন করিয়া কতকগুলি স্নায়ু সুষুম্নাকাণ্ডে প্রবেশ করিয়া শ্বেতভাগের মধ্য দিয়া সুষুম্নাশীর্ষকের স্নায়ুকেন্দ্রে (যথা, নিউক্লিয়াস্ কিউনেটাস্ ও গ্রেসাইলিস্-এ) উপনীত হয় এবং তথা হইতে বিপরীত দিকে যায় ও ক্রমশঃ থ্যালামাসে পৌছায়।

এই স্নায়ুগুলি লইয়া যে পথ রচিত হইয়াছে তাহাকে **গল্** ও **বুর্ডাকের পথ** (Column of Gall and Burdach) বলে। (১২নং চিত্র)।
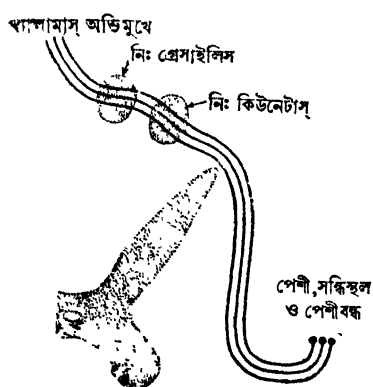
১২নং চিত্র। পেশী, সন্ধিস্থল ও পেশীবন্ধ হইতে উর্ধ্বমুখী স্নায়ু।

(গ) আবার পেশী, সন্ধিস্থল এবং পেশীবন্ধ হইতে অপর স্নায়ুসমূহ স্নায়ুকাণ্ডের ধূসরাংশের সম্মুখভাগের ক্লার্ক-কোষ (Clarke cell)-সমূহের নিকট উপনীত হয় এবং তথা হইতে নূতন স্নায়ু আবার শ্বেতভাগে প্রবেশ করিয়া ঊর্ধ্বমুখে যায় ও শেষ পর্যন্ত লঘুমস্তিষ্কে পর্যবসিত হয়। ইহাদের দ্বারা গঠিত পথকে বলে **সরল লঘুমস্তিষ্ক-পথ** (direct cerebellar tract) (১৩ নং চিত্র)।
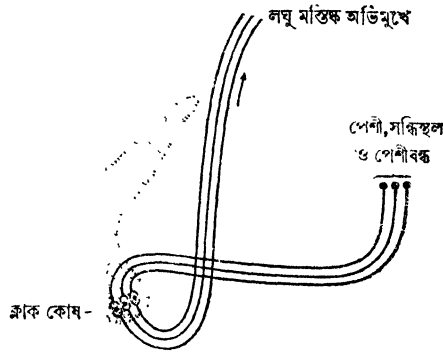
১৩ নং চিত্র। সরল লঘুমস্তিষ্ক পথ।

এতদ্ব্যতীত অন্তর্মুখী স্নায়ুসমূহ তাহাদের গতিপথে শাখা বিস্তার করিয়া চলে।

(খ) **সুষুম্না-শীর্ষক** (**Medulla Oblongata**) :

গঠন-বৈশিষ্ট্য :

সুষুম্নাকাণ্ড দীর্ঘীভূত হইয়া যেখানে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে তাহাকে **সুষুম্না-শীর্ষক** বলে। আকারে ইহা নিম্নমুখী শীর্ষকহীন (truncated) শঙ্কু (cone)-এর ন্যায় দেখিতে। ইহার ভূমি যাহার উপর স্থাপিত, তাহাকে বলে উষ্ণীষক (Pons Varollii)। (১৪নং চিত্র)। এই উষ্ণীষক একটি নলাকৃতি স্ফীতি।

কার্য :

সুষুম্না-শীর্ষকে সংবেদনবাহী (sensory) এবং ক্রিয়াবাহী (motor) স্নায়ুর কেন্দ্রগুলি অবস্থিত; ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, ইহা **উচ্চস্তরের কার্যের মধ্যে অনুবন্ধ** (correlation) এবং **সমন্বয়** (co-ordination) **স্থাপন করে।**

তাহা ছাড়া, সুষুম্না-শীর্ষক **শ্বাসগ্রহণ** (respiration) এবং **রক্ত-সঞ্চালন** (circulation)-এর কার্যে সহায়তা করে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যদি কোন জীবের সুষুম্না-শীর্ষকের নিম্নভাগ কাটিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে শ্বাসগ্রহণ বন্ধ হইয়া যায়, রক্তচাপের হঠাৎ অস্বাভাবিক পতন ঘটে, এবং ঐ জীব মৃত্যুমুখে পতিত হয়।
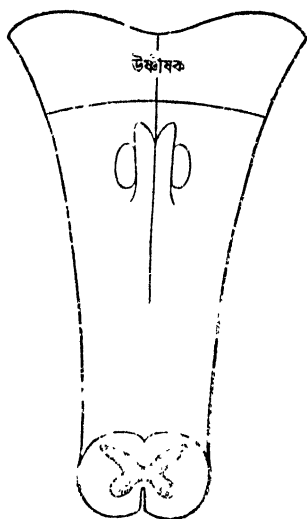
১৪ নং চিত্র। সুষুম্না-শীর্ষক

ডঃ হেস্ (Dr. Hess) মনে করেন যে, ইহা নিদ্রা-কেন্দ্র (sleep-centre) রূপেও কার্য করে। তিনি বিড়ালের সুষুম্না-শীর্ষককে বিদ্যুৎ দ্বারা উদ্দীপিত করিয়া দেখিয়াছেন যে, উহা ক্রমশঃ নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে।

(গ) লঘুমস্তিষ্ক (Cerebellum, Hind Brain বা Little Brain :)

গঠন-বৈশিষ্ট্য :

সুষুম্না-শীর্ষকের পিছনে লঘু-মস্তিষ্ক অবস্থিত। ইহা গুরুমস্তিষ্কের পশ্চাদ্ভাগ হইতে লম্ববান্ এবং ইহা হইতে আবার সুষুম্না-শীর্ষক লম্ববান্। ইহা
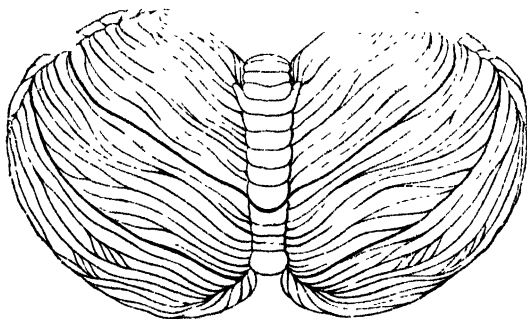
১৫ নং চিত্র। লঘুমস্তিষ্কের উপরিভাগ (upper surface)। দুই পার্শ্বে দুই গোলার্ধ এবং মধ্যে ভার্মিস।

আকারে বৃহৎ এবং ওজনে প্রায় ১৪০ গ্রাম। ইহা দুই গোলার্ধে বিভক্ত হইয়া মস্তিষ্কের পশ্চাতে অবস্থিত; আবার এই দুই গোলার্ধের মধ্যস্থলে একটি সঙ্কীর্ণ সংযোজক আছে, উহাকে বলে ভার্মিস্ (vermis)। (১৫নং চিত্র)।

ইহার প্রতি গোলার্ধ মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশের সহিত তিনটি তন্তুগুচ্ছ (peduncle) দ্বারা সংযুক্ত। ইহাদের একটি গুচ্ছ উপরিভাগের (superior peduncle), একটি গুচ্ছ মধ্যভাগের (middle peduncle) এবং বাকীটি নিম্নভাগের (inferior peduncle)। (১৬ নং চিত্র)।
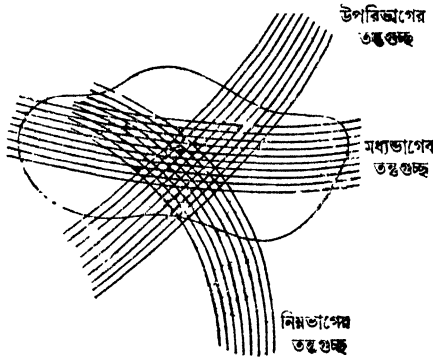
১৬ নং চিত্র। লঘুমস্তিষ্কের তন্তুগুচ্ছ।

লঘুমস্তিষ্কের সহিত অন্যান্য অংশের সংযোগ নিম্নলিখিত পথে সাধিত হইয়াছে:

(ক) সুষুম্না-শীর্ষক হইতে আগত তন্তুগুচ্ছ সমুদয় সংবেদনবাহী (sensory) স্নায়ুরূপে কার্য করে। (খ) কতকগুলি ক্রিয়াবাহী বা চালক স্নায়ু (motor nerve) লঘুমস্তিষ্ক হইতে উদ্গত হইয়াছে—ইহাদের মধ্যে কতকগুলি মধ্যমস্তিষ্কের রক্তাভ স্নায়ু-কেন্দ্রে গিয়াছে এবং বাকীগুলি থ্যালামাসের চালকস্নায়ু-কেন্দ্রের (motor nuclei) সহিত সংযুক্ত আছে। প্রথমোক্তগুলি দ্বারা 'লঘুমস্তিষ্ক-রক্তাভস্নায়ুকেন্দ্র-পথ' (cerebellorubral tract) রচিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয়োক্তগুলি দ্বারা 'লঘুমস্তিষ্ক-থ্যালামাস্ পথ' (cerebellothalamic tract) গঠিত হইয়াছে। (গ) লঘু-মস্তিষ্কের সহিত গুরুমস্তিষ্কের সংযোগ রচনা করিয়াছে 'গুরুমস্তিষ্ক-পন্টিস্-লঘুমস্তিষ্ক পথ' (cortico-ponto-cerebellar tract)। এই

স্নায়ু-পথের স্নায়ুগুলি নির্গত হইয়াছে গুরুমস্তিষ্কের চেষ্টাধিষ্ঠান (motor area) হইতে।

কার্য ঃ

লঘুমস্তিষ্কের প্রকৃত কার্য লইয়া শারীরতত্ত্ব-বিশারদ্গণ (physiologists) নানা পরীক্ষণ চালাইয়াছেন। তবে পূর্বতন ও সাম্প্রতিক পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে।

এই সব পরীক্ষণে সাধারণতঃ তিনটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়:

(ক) **অপসারণ পদ্ধতি** (method of ablation) — ইহা হইল একটি অংশকে অপসারিত করিয়া তাহার ফল লক্ষ্য করা ;

(খ) **উদ্দীপন পদ্ধতি** (method of stimulation) — ইহা হইল একটি অংশকে উদ্দীপিত করিয়া উহার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা ;

(গ) **রোগি-পরীক্ষা পদ্ধতি** (clinical method) — ইহা হইল চিকিৎসাকালে অসুস্থ ব্যক্তির বৈলক্ষণ্যের কারণ অনুসন্ধান করা।

আধুনিক কালে ফ্লোরেন্স (Flourens) এবং লুসিয়ানি (Luciani) বিবিধ পরীক্ষণ চালান। ফ্লোরেন্স পায়রার এবং লুসিয়ানি কুকুর, বানর, ইত্যাদি কয়েকটি স্তন্যপায়ী জীবের লঘুমস্তিষ্ক অপসারণ করেন। ইহার ফলে পরীক্ষাধীন পায়রাগুলির উড়া, চলা বা লাফানোর মধ্যে একটা অসামঞ্জস্য বা 'এলোমেলো' ভাব দেখা দেয়। সেইরূপ লুসিয়ানি বলেন যে, তাঁহার পরীক্ষাধীন জীবের মধ্যে লঘুমস্তিষ্ক অপসারণের ফলে তিন প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পায়ঃ কর্মশক্তির দৌর্বল্য (aesthenia বা weakened motor power), পেশীসমূহের সতেজভাবের হ্রাস (atonia বা loss of muscle tone) এবং দেহ-ভঙ্গী রক্ষণের অক্ষমতা (astasia বা loss of postures)।

মানুষের ক্ষেত্রেও দেখা গিয়াছে যে, লঘুমস্তিকে আঘাত লাগিলে বা কোনপ্রকারে উহা অসুস্থ হইলে সিয়ানি-বর্ণিত ঐ লক্ষণ-ত্রয় প্রকাশ পায়।[১০]

এই সব পরীক্ষণ ও তথ্যের ফলে মনে করা হইত যে, দেহভঙ্গী ও দেহের অবস্থান রক্ষণের 'কেন্দ্র' (centre) হইল লঘুমস্তিষ্ক।

---

১০ বোল্ক্ (Bolk) এতদুর বিশ্বাস করিতেন যে, গুরুমস্তিষ্কে যেমন এক এক অংশ এক একটি কার্য করে, লঘুমস্তিষ্কেও ঐরূপ বিভাগ আছে। তবে অন্যান্য পর্যবেক্ষকেরা এই মত গ্রহণ করেন নাই।

তবে গুরুমস্তিষ্কে কোন উদ্দীপন পৌছিলে উহা যেমন সংবেদনের সৃষ্টি করে, লঘুমস্তিষ্কে সেইরূপ কোন ব্যবস্থা নাই।

সাম্প্রতিক কালে বৈজ্ঞানিকগণ যে সব পরীক্ষণ চালাইয়াছেন তাহার ফলে লঘুমস্তিষ্কের 'গুরুত্ব' যেন কতকটা হ্রাস পাইয়াছে। এই সব পরীক্ষণের ফলে মনে হয় যে, লঘুমস্তিষ্ক দেহভঙ্গী এবং সাম্যাবস্থা রক্ষণের একমাত্র কেন্দ্র (*the* centre for the maintenance of bodily postures and equilibrium) নহে। **দেহভঙ্গী ও সাম্যাবস্থার জন্য প্রারম্ভিক শক্তি মস্তিষ্কের অন্য অংশ হইতে আসে; তবে ঐ কার্য সুষ্ঠুভাবে করিতে এবং উহা অব্যাহত রাখিতে সহায়তা করে লঘুমস্তিষ্ক।** তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে, ঐরূপ কার্যের 'প্রধান' উৎস-কেন্দ্র (primary centre) লঘুমস্তিষ্ক নহে, তবে উহা 'অপ্রধান' কিন্তু সাহায্যকারী কেন্দ্র (secondary source)।[১১]

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, গুরুমস্তিষ্কের চেষ্টাধিষ্ঠানের সহিত তন্তুগুচ্ছের মাধ্যমে লঘুমস্তিষ্কের সংযোগ আছে। সুতরাং লঘুমস্তিষ্ক **ঐচ্ছিক ক্রিয়ার উপর সামান্য কিছু প্রভাব বিস্তার করে ইহা বলা যাইতে পারে।**

তাহা ছাড়া, যে সব ঐচ্ছিক ক্রিয়া পুনঃ পুনঃ করার ফলে অভ্যাসে রূপান্তরিত হয়, সেগুলি পরিচালনার ভার ক্রমশঃ লঘুমস্তিষ্কে ন্যস্ত হয় বলিয়া মনে হয়।

আমাদের ঐচ্ছিক ক্রিয়াগুলি অনেক সময় পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকে না—ইহারা পরস্পরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া একটি জটিল কার্য করে। এই **একত্রীকরণের কার্যে লঘুমস্তিষ্ক প্রধান অংশ গ্রহণ করে বলিয়া অনেকে মনে করেন।**[১২]

---

১১ এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, লুসিয়ানি নিজেই মনে করিতেন যে, যে সব জীবের লঘুমস্তিষ্ক তিনি অপসারণ করিয়াছিলেন, তাহারা কিছু দিন পরে তাহাদের নষ্টশক্তি অনেক পরিমাণে পুনরুদ্ধার করিয়াছিল। এইজন্য তিনি লঘুমস্তিষ্ক পেশীশক্তি ইত্যাদি 'বৃদ্ধি' (augment) করে বলিয়াছিলেন।

তুলনীয়: (১) "The cerebellum has no primary centres for the regulation of any bodily movements. They are amply provided elsewhere...*The cerebellum influences these processes as going concerns.* It initiates no behavior patterns on its own account." (Herrick).

(২) "The motor function of the cerebellum is entirely one of strengthening and smoothing, since complete loss of the cerebellum weakens but does not destory movement". (Wenger, Jones & Jones, ***Physiological Psychology***, pp. 278-79).

১২ ইংরাজিতে ইহাকে ***synergic action*** বলিয়া বর্ণনা করা হয়। ইহার বিপরীত অবস্থা হইল ***asynergia***, অর্থাৎ বিভিন্ন ক্রিয়ার মধ্যে অনৈক্য।

লঘুমস্তিষ্কের কার্যের সহিত মানসিক বোধশক্তির কোন সম্বন্ধ আছে কি না তাহা নিশ্চয়তার সহিত বলা যায় না। তবে লুসিয়ানি, রাসেল ইত্যাদি মনে করেন যে, এক অনির্বচনীয় উপায়ে উহা মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে।[১৩]

পরিশেষে আমরা উল্লেখ করিতে পারি যে, অতি আধুনিক অনেক শারীরতত্ত্ববিৎ মনে করেন যে, যদিও পেশীসঞ্চালনমূলক কার্যের সহিত লঘুমস্তিষ্কের সংস্রব আছে, তাহা হইলেও ঐ কার্যের জন্যই ইহার উদ্ভব হয় নাই; তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, **সমগ্র দেহের প্রয়োজন অনুসারে সুসংবদ্ধ কার্য করার জন্য দেহকে সহায়তা করার ব্যাপারে লঘুমস্তিষ্ক বিশেষ অংশ গ্রহণ করে।**[১৪]

(ঘ) মধ্যমস্তিষ্ক ও থ্যালামাস্ (Mid-brain & Thalamus) :

গঠন-বৈশিষ্ট্য :

মধ্যমস্তিষ্ক হইল পশ্চাদ্দেশীয় মস্তিষ্কের ক্রম-বিস্তৃতি। মস্তিষ্কের বৃন্তদণ্ড (brain stem)-এর পশ্চাতে ইহা অবস্থিত এবং ইহার চারিটি উচ্চস্থান আছে—তাহাদের 'কলিকুলি' (colliculi) বলে। যে তন্তুগুচ্ছ লঘুমস্তিষ্ককে উষ্ণীষক এবং গুরুমস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে তাহা দ্বারা মধ্যমস্তিষ্কের সম্মুখভাগ আবৃত। সম্মুখ ও পশ্চাদ্‌ভাগের মধ্যে কতকগুলি স্নায়ু-কেন্দ্র ও স্নায়ু আছে—ইহাদের একত্রে টেগ্‌মেন্টাম্ (tegmentum) বলে।

কার্য :

এই মধ্যমস্তিষ্ক দিয়া অন্তর্মুখী স্নায়ুর পথ রচিত হইয়াছে, যথা, 'সুষুম্না-কাণ্ড-থ্যালামাস্ স্নায়ু-পথ' (spinothalamic tract)। সেইরূপ পিরামিড স্নায়ু-কেন্দ্র হইতে নির্গত ক্রিয়াবাহী স্নায়ু এই মধ্যমস্তিষ্কের মধ্য দিয়া নামিয়া গিয়াছে।

১৩ দ্রষ্টব্য—W. H. Howell, *A Text-book of Physiology*, p. 251: "All observers agree that there is no apparent loss of sensations after removal of the cerebellum; but Luciani, Russell and others state their belief that in some indefinable way the mentality of the animal is affected by such operations."

১৪ তুলনীয়: "The cerebellum has been evolved to meet the needs of the organism *as a whole*" (Freeman).

লঘুমস্তিষ্ক ও থ্যালামাসের সহিত টেগ্‌মেন্‌টাম্‌-ও দেহভঙ্গী রক্ষণের (maintenance of postures) কার্যে অংশ গ্রহণ করে।

থ্যালামাসের গঠন-বৈশিষ্ট্য ঃ

পশ্চাদ্‌ দিক হইতে থ্যালামাস্‌কে মস্তিষ্কের মধ্যস্থলে অবস্থিত তুইটি সংযুক্ত ডিম্বের ন্যায় প্রতীত হয়। (১৭ নং চিত্র)।

ইহার চারিটি ভাগ আছে; যথা—পশ্চাৎ থ্যালামাস্‌ (dorsal thalamus), এপিথ্যালামাস্‌ (epithalamus), হিপোথ্যালামাস্‌ (hypothalamus) এবং সাব্‌-থ্যালামাস্‌ (sub-thalamus)।
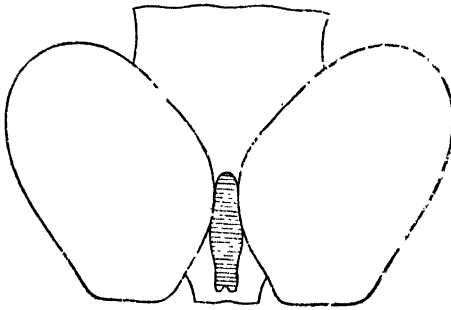
১৭নং চিত্র। থ্যালামাস্‌।

কার্য ঃ

পশ্চাৎ থ্যালামাস্‌ই প্রকৃত থ্যালামাস্‌। বিভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয় (sense-organ) হইতে অন্তর্বাহী স্নায়ুগুলি থ্যালামাসের স্নায়ু-কেন্দ্রসমূহে উপনীত হয় এবং তথা হইতে আবার নূতন স্নায়ুরাশি গুরুমস্তিষ্কে যায়। অতএব, এই অংশগুলিকেও এক হিসাবে **সংবেদন-কেন্দ্র** (sensory centres or areas) বলা যাইতে পারে।

হিপোথ্যালামাস্‌, এপিথ্যালামাস্‌ ও সাব্‌-থ্যালামাস্‌—এইগুলি হইল **ক্রিয়াশক্তির কেন্দ্র বা চেষ্টাধিষ্ঠান** (motor centre)। এইগুলি হইতে সঞ্জাত শক্তি স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রে যায়। প্রক্ষোভ বা আবেগের সময় স্নায়ুতন্ত্র উত্তেজিত হয় এবং হিপোথ্যালামাস্‌ ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট

থাকে বলিয়া অনেকে **হিপোথ্যালামাস্‌কে 'আবেগের কেন্দ্র'** (seat of emotion) বলিয়া বর্ণনা করেন।

(৬) **গুরুমস্তিষ্ক** (Cerebrum and Cortex) ঃ

গঠন-বৈশিষ্ট্য ঃ

মস্তিষ্কের সর্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল অংশ হইল গুরুমস্তিষ্ক। (১৮নং চিত্র)। **গুরুমস্তিষ্ক দুই গোলার্ধে বিভক্ত এবং ইহারা বিপরীতভাবে দেহের নিম্নাংশের সহিত সংযুক্ত** ; অর্থাৎ গুরুমস্তিষ্কের বাম গোলার্ধ দেহের দক্ষিণ অংশের সহিত সংযুক্ত এবং দক্ষিণ গোলার্ধ দেহের বাম অংশের সহিত সংযুক্ত। গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্সে অনেকগুলি ভাঁজ ও স্ফীতি (fissures and convolutions) দেখা যায়।[১৫]

গুরুমস্তিষ্ক বিভিন্ন **অঞ্চলে** (lobes) বিভক্ত ঃ (১) **ললাট-অঞ্চল** (frontal lobe), (২) **রগ-অঞ্চল** (temporal lobe), (৩) **শিরকুম্ভ-অঞ্চল** (parietal lobe), (৪) **শিরনিম্ন-অঞ্চল** (occipital lobe) এবং (৫) **হিপোক্যাম্পাল অঞ্চল** (hippocampal lobe)।

গুরুমস্তিষ্কে দুইটি বৃহৎ খাঁজ (fissure) আছে—একটির নাম **রোলাণ্ডো খাঁজ** (fissure of Rolando) এবং অপরটির নাম **সিল্‌ভিয়াস্‌ খাঁজ** (fissure of Sylvius)।

কার্য ঃ

চেষ্টাধিষ্ঠান (motor area) ঃ **রোলাণ্ডো-খাঁজের সম্মুখে এবং ললাট-অঞ্চলের পশ্চাতে যে অংশ তাহাই হইল চেষ্টাধিষ্ঠান বা ক্রিয়াশক্তির কেন্দ্র** (motor area)। এইস্থানে কয়েকটি বৃহদাকার স্নায়ু-কেন্দ্র আছে যাহা হইতে বহির্মুখী স্নায়ুগুলি উদ্গত হইয়াছে। গুরুমস্তিষ্কে বিভিন্ন পেশী-উদ্দীপক কেন্দ্রগুলি এমনভাবে সজ্জিত আছে যে, মুখ, জিহ্বা ইত্যাদির সহিত সংযুক্ত কেন্দ্রগুলি চেষ্টাধিষ্ঠানের নিম্নভাগে আছে এবং পদ ইত্যাদির সহিত সংযুক্ত কেন্দ্রগুলি ঐ অঞ্চলের সর্বোপরি আছে

১৫ মানুষের কর্টেক্স নিতান্ত জটিল। কর্টেক্সের সমস্ত ভাঁজগুলি খুলিয়া ফেলিলে উহার আয়তন হইবে প্রায় ২,০০০ বর্গ সেন্টিমিটার। কর্টেক্সের স্নায়ু-কোষগুলির সংখ্যা হইবে প্রায় ১৪,০০০,০০০,০০০।

অর্থাৎ **দেহে যে যে রীতিতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি সজ্জিত আছে, উহাদের চালনা-কেন্দ্রগুলি গুরুমস্তিষ্কে ঠিক বিপরীত পদ্ধতিতে সজ্জিত আছে।**

যেহেতু গুরুমস্তিষ্কের গোলার্ধদ্বয় দেহের নিম্নভাগের সহিত বিপরীতভাবে সংযুক্ত আছে, সেই হেতু বাম গোলার্ধের চেষ্টাধিষ্ঠানে অতিরিক্ত আঘাত লাগিলে দেহের দক্ষিণাংশে অঙ্গসঞ্চালনের ক্ষমতা ব্যাহত হইবে বা লোপ পাইবে এবং দক্ষিণ গোলার্ধের চেষ্টাধিষ্ঠানে অতিরিক্ত আঘাত লাগিলে দেহের বাম অংশের ক্ষতি হইবে।

সংবেদন-অধিষ্ঠান (sensory areas)**: রোলাণ্ডো-খাঁজের পশ্চাতে এবং শিরকুম্ভাঞ্চলের সম্মুখে বিভিন্ন চার্ম-সংবেদন ও পেশী-সংবেদনের কেন্দ্র** (tactile and kinaesthetic area) অবস্থিত। অর্থাৎ চর্মস্থ স্পর্শ, উত্তাপ, শৈত্য বা ব্যথন বিন্দুগুলি উদ্দীপিত হইলে ঐ উদ্দীপন যখন মস্তিষ্কের এই অঞ্চলে পৌঁছে, তখন তদুপযুক্ত সংবেদন হয়।

শিরনিম্নাঞ্চল (occipital lobe)-এর **পশ্চাদ্ভাগ এবং উহার অন্তরভাগ ব্যাপিয়া যে অঞ্চল তাহা হইল দর্শনসংবেদন-অঞ্চল** (visual area)।

রগ-অঞ্চলের ভিতর দিকে **সিল্ভিয়াস্ খাঁজের পার্শ্বে আছে শ্রবণ-কেন্দ্র** (auditory area)। ইহার নিম্নভাগে **হিপোক্যাম্পাল অঞ্চলে** (hipocampal area) **ঘ্রাণ ও রাসন কেন্দ্র** (smell and taste areas) অবস্থিত। (১৮নং চিত্র)।

নীরব অঞ্চল (silent areas)**:** চেষ্টাধিষ্ঠান ও সংবেদন-অধিষ্ঠান ব্যতীত অপর অংশগুলি প্রত্যক্ষভাবে কোন কার্যে লিপ্ত নহে—এইজন্য ইহাদের নীরব অঞ্চল (silent area) বলে। **এই নীরব অঞ্চল অন্যান্য অংশগুলির সহিত নানাভাবে নিউরোন দ্বারা সংযুক্ত। এইজন্য মনে হয় যে, এই অঞ্চল সংহতি-সাধন ও সঙ্ঘবদ্ধকরণের কার্যে** (organisational work-এ) **লিপ্ত আছে—ইহা বিভিন্ন সংবেদন এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে ঐক্যবদ্ধ বা সংযুক্ত** (integrated বা unified) **করে।**

আবার **ললাট-অঞ্চল** অন্যান্য অঞ্চলের সহিত অনুষঙ্গী স্নায়ুদ্বারা সংযুক্ত বলিয়া ইহা গুরুমস্তিষ্ক দ্বারা সাধিত বিবিধ ক্রিয়ার মধ্যে **ঐক্য-সাধন** করে বলিয়া মনে করা হয়। অনেকে আবার ইহাও মনে

করেন যে, ইহা **বৌদ্ধিক ক্রিয়ার কেন্দ্র** (centre for intelligent acts)।[১৬]

কেহ কেহ মনে করেন যে, পুরাতন স্মৃতি জাগরিত করার কার্যে সহায়তা করে রগ-অঞ্চল (temporal lobe) ; অতএব ইহা **স্মৃতির কেন্দ্র** (memory centre)।[১৭]

গুরুমস্তিষ্কের কার্য সম্বন্ধে বিভিন্ন পরীক্ষণের বর্ণনা ঃ

আমরা উপরে গুরুমস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের কার্যাবলী বর্ণনা করিলাম। এই বিষয় যে-সমস্ত পরীক্ষণ চালান হইয়াছে তাহা আমরা এইবার উল্লেখ করিব।

(১) গাল্ (Gall) এবং স্পুর্‌ৎস্‌হাইম্ (Spurzheim) বিশ্বাস করিতেন যে, করোটি বা মাথার খুলির (skull) বিভিন্ন স্ফীতি (bumps বা protuberances) দেখিয়া মস্তিষ্কের অভ্যন্তরীণ কার্য বুঝা যায়। এক

১৬ ব্রিক্‌নার (Brickner) এই প্রসঙ্গে নিউইয়র্কের এক ব্যবসায়ীর কথা বলিয়াছেন। ঐ ব্যক্তি বহুদিন যাবৎ মস্তিষ্কের যন্ত্রণা, অমনোযোগিতা, স্মৃতিভ্রংশতা ইত্যাদি রোগে ভুগিতেছিলেন। রঞ্জন-রশ্মিদ্বারা দেখা যায় যে, ঐ ব্যক্তির ললাট-অঞ্চলের ভিতর 'আব' (tumour) হইয়াছিল। অস্ত্রোপচার দ্বারা উহা দূর করা হইলে তিনি আরোগ্য লাভ করেন, কিন্তু নূতন উপসর্গের সৃষ্টি হইল। তাঁহার বাহ্য আচরণে সু-সঙ্গতি, সংযম ও ঐক্যের অভাব দেখা দিল। উড্‌ওয়ার্থ (Woodworth) ইহা ব্যাখ্যা করিয়া বলেন : "He (the businessman) was over-active in trifling ways, unwilling to sit still, preferring to walk or dance round the room and to sing, whistle or shout on all occasions. He had lost his customary restraint and control of such natural impulses as those of sex and self-aggrandisement." (*Psychology*, 12th. Ed., pp. 278-79)

১৭ ডঃ পেন্‌ফিল্ড্ (Dr. W. Penfield) পরীক্ষণ করিয়া দেখিয়াছেন যে, যদি রগ-অঞ্চল (temporal lobe)-কে কৃত্রিম উপায়ে উদ্দীপিত করা যায়, তাহা হইলে প্রকৃত উদ্দীপক ব্যতীতও 'মানসিক অবস্থা'র সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন যে, একবার এক তরুণীর রগ-অঞ্চলের উপরিভাগ উদ্দীপিত করায় ঐ তরুণী বাদ্যযন্ত্রের সুর শুনিতেছিলেন বলেন। আবার আর এক ভদ্রলোকের ঐ অঞ্চল উদ্দীপিত হওয়ায় তিনি তাঁহার ভ্রাতা-ভগিনীর কণ্ঠস্বর শুনিতেছেন বলেন। এইজন্য পেন্‌ফিল্ড্ মনে করেন যে, গুরুমস্তিষ্কের এই অঞ্চল পুরাতন অভিজ্ঞতা 'সংগ্রহ' করিয়া রাখে (*Proceedings of the American Philosophical Society*, Vol. 98, 5. 19:4, pp. 295-296—Wilder Penfield, 'Some observations on the Functional organisation of *the* Human Brain' নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

এক অংশের স্ফীতি দেখিয়া তাঁহারা অনুমান করিতেন যে, উহারা এক একটি মানসিক বৃত্তির—যথা, বুদ্ধি, প্রেম, করুণা ইত্যাদির—কেন্দ্র। এই মতের তাঁহারা নাম দিয়াছিলেন **মস্তিষ্ক-বিদ্যা** (Phrenology)। (পৃঃ ৮৪ দ্রষ্টব্য)। এই মতবাদ সত্য হইলে বলিতে হইবে যে, মস্তিষ্কের
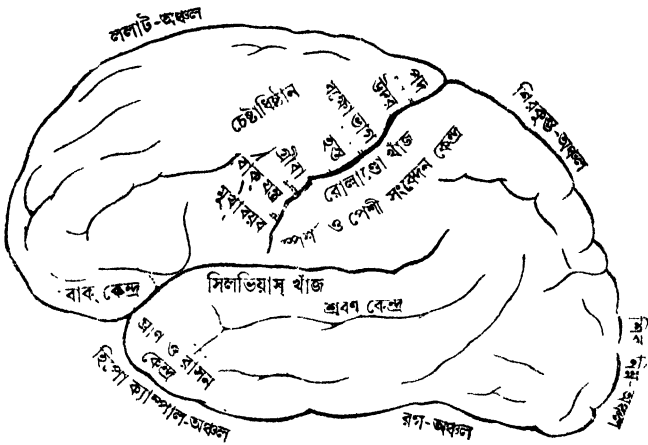
১৮নং চিত্র। গুরুমস্তিষ্ক

অভ্যন্তরে বিভিন্ন অংশের মধ্যে 'শ্রম-বিভাগ' (division of labour) আছে। তবে এই মতবাদের মূলে কোন সুনিয়ন্ত্রিত গবেষণা বা পরীক্ষণ ছিল না এবং অল্পদিনের মধ্যেই এই মতবাদকে কল্পনা-বিলাস বলিয়া পরিত্যাগ করা হয়।

(২) পরীক্ষণের ভিত্তিতে এ বিষয় আলোচনা সুরু করেন ফ্লোরেন্স (Flourens)। তিনি পায়রার উপর পরীক্ষা করেন এবং কতকগুলি পায়রার গুরুমস্তিষ্কের অংশ-বিশেষ অপসারণ করেন। ফলে দেখা যায় যে, উহাদের কার্যক্ষমতা হ্রাস পাইয়াছে, কিন্তু কোন ক্ষমতাই একেবারে তিরোহিত হয় নাই। আবার তিনি ইহাও দেখেন যে, যদি সমগ্র গুরুমস্তিষ্ক অপসারণ করা যায়, তাহা হইলে জীবের বুদ্ধিনাশ হয়।[১৮]

১৮ গোলৎস্ (Goltz)-ও অনুরূপ পরীক্ষণ কুকুরের উপর করেন। তিনি আরও লক্ষ্য করেন যে, সমগ্র গুরুমস্তিষ্ক অপসারণ করিলেও পূর্ণভাবে চেতনা লোপ পায় না।

সুতরাং **ফ্লোরেন্সের সিদ্ধান্ত** হইল যে, গুরুমস্তিষ্ক **একটি একক বা সমগ্র সত্তা** হিসাবে কার্য করে (the brain acts as a unit or as a whole) এবং সকল সংবেদন এবং সকল ক্রিয়ার 'কেন্দ্র' **একত্রে কার্য করে**।[১৯]

(৩) ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের সময় ফ্রিট্‌শ্‌ (Fritsch) নামক সেনাবাহিনীর এক চিকিৎসক মস্তিষ্কে আঘাতপ্রাপ্ত এক অচেতন সৈনিকের করোটির কয়েকটি উন্মুক্ত স্থান বিদ্যুৎশক্তির দ্বারা উদ্দীপিত করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, 'রোলাণ্ডো-খাঁজের' সন্নিকটবর্তী কয়েকটি স্থান উদ্দীপিত করিলে দেহের বিপরীত অংশের কয়েকটি স্থানের পেশী সংকোচন ঘটিতেছে।

এই আবিষ্কারের পর হইতে অনেকে ফ্লোরেন্সের বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন; অর্থাৎ তাহারা বলেন যে, গুরুমস্তিষ্কে শ্রম বিভাগের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে—অর্থাৎ **এক একটি অংশ এক একটি কার্যের জন্য সুনির্দিষ্ট** ('There is a division of labour in the brain—certain functions are localised in certain areas of the cerebrum')।

(৪) ফ্রিট্‌শের পরে যে সমস্ত গবেষণা হইয়াছিল তাহা ফ্রিট্‌শের মতেরই সপক্ষে। এই সমস্ত অনুসন্ধানগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইল **ব্রোকা** (Broca)-র **আবিষ্কার**। তিনি এক রোগীর ক্ষেত্রে দেখেন যে, রোগীটির বাক্‌শক্তিরোধ (aphenia) হইয়াছে—তাহার বোধশক্তি এবং প্রতিরূপ-গঠনের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সে কথা বলিতে পারিত না। ব্রোকা অস্ত্রোপচার করিয়া দেখেন যে, ঐ রোগীর ললাট-অঞ্চলের তৃতীয় ভাঁজ (third frontal convolution)-এ ক্ষত ছিল এবং মস্তিষ্কের অন্যান্য অঞ্চল সুস্থ ছিল। সুতরাং তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, ঐ অঞ্চলটি বাক্‌-যন্ত্র চালনার সহিত সংশ্লিষ্ট এবং অপর কোন অংশ ঐ কার্যভার গ্রহণ করিতে পারে না।

ইহার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইল যে, গুরুমস্তিষ্কের এক একটি অংশে এক একটি কার্য সাধিত হয়। অর্থাৎ ফ্রিট্‌শের পরবর্তী কালে অধিকাংশ শরীরতত্ত্ববিশারদ গুরুমস্তিষ্কের ক্ষেত্রে **'আঞ্চলিক ক্রিয়া'-বাদ** (doctrine of localisation of function) সমর্থন করিতেন।

---

১৯ **তাঁহার ভাষায়:** "all the perceptions, all the volitions, occupy concurrently the same seat in the organs."

(৫) কিছুকাল পরে এই মতবাদ সম্বন্ধে আবার প্রশ্ন উঠিতে লাগিল। ফ্রানৎস্ (Franz) বিড়াল ও বানরের উপর, পাভ্লভ্ কুকুরের উপর এবং ল্যাশ্লে (Lashley) ইঁদুরের উপর যে সমস্ত পরীক্ষা চালান তাহাতে দেখা যায় যে, কোন প্রাণীর গুরুমস্তিষ্কের কোন অংশের ক্ষতি সাধিত হইলে বা কোন অংশ অপসারিত হইলে সাময়িকভাবে অভ্যাস ও বৌদ্ধিক কার্য করিবার ক্ষমতা লোপ পায়, কিন্তু কিছুদিন পরে আবার লুপ্তক্ষমতার পুনরাবির্ভাব ঘটে। ইহা সত্য হইলে বলিতে হইবে, গুরুমস্তিষ্ক সমগ্রভাবে কার্য করিয়া থাকে, অর্থাৎ ইহা **'সামগ্রিক কার্য'-বাদ** (doctrine of whole-function or mass action) সমর্থন করে। ল্যাশ্লে এই মতবাদের অপর নাম দিয়াছিলেন 'সমশক্তি-সম্ভাব্যতাবাদ' (doctrine of equipotentiality)।[২০]

আমরা এখানে ল্যাশ্লের পরীক্ষা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিব। তিনি কতকগুলি সাদা ইঁদুরকে একটি ধাঁধাঁর বাক্স (puzzle box)-এ আলোকিত পথ (lighted path) নির্বাচন করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই বাক্সে দুইটি পথ ছিল, একটি আলোকিত আর অপরটি অন্ধকার। আলোকিত পথে যাইলে ইঁদুরগুলি পুরস্কৃত হইত, অর্থাৎ তাহাদের খাবার মিলিত। অপরপক্ষে যদি তাহারা অন্ধকার পথে যাইত, তাহা হইলে শাস্তি মিলিত, অর্থাৎ তাহাদের বিদ্যুতের ধাক্কা (electric shock) দেওয়া হইত। (১৯নং চিত্র)।

প্রায় এক শতটি পরীক্ষা (trial)-এর মাধ্যমে ইঁদুরগুলি আলোকিত পথে যাইয়া খাদ্য পাইবার অভ্যাস আয়ত্ত করিল। ইহার পর ল্যাশ্লে এই সমস্ত ইঁদুরগুলির শিরনিম্ন-অঞ্চল (occipital lobe)-এর বিভিন্ন অংশ

২০ ইহার অর্থ হইল গুরুমস্তিষ্কের এক অংশে অপর অংশের কার্য করিবার শক্তি সুপ্ত থাকে। সুতরাং অসুস্থ অংশের কার্যভার সুস্থ অংশ গ্রহণ করিতে পারে। এইচ্. ই. গ্যারেট্ (H. E. Garett) ইহার ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন: "Lashley has used the term 'equipotentiality' to designate the capacity of an uninjured part of the brain to take over functions lost by the destruction of other areas. Equipotentiality is subject to the law of 'mass action'; that is the deficiency of performance of any complex activity is reduced in proportion to the amount of brain injury —the mass of cortex destroyed—but is not dependent upon the integrity of any particular region." (*Great Experiments in Psychology*, p. 32).

(অর্থাৎ দর্শন-সংবেদন কেন্দ্র বা visual centre) অপসারণ করিয়া দেন। এই অস্ত্রোপচারের পর ইঁদুরগুলি যখন সুস্থ হইল, তখন তাহাদের পুনর্বার
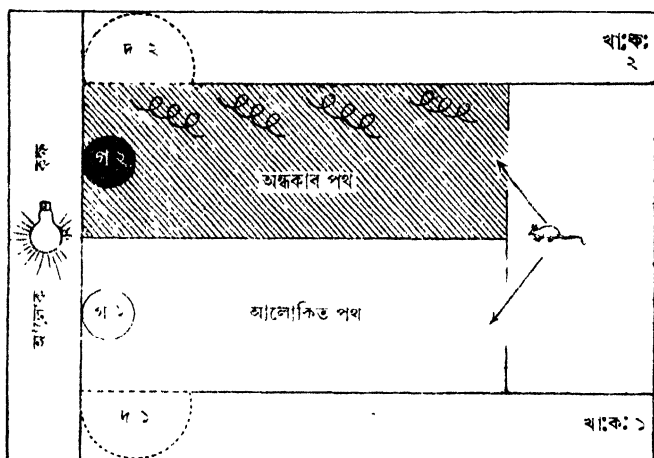
১৯নং চিত্র। ল্যাশ্লের পরীক্ষণ-বাক্স।

[উপরের চিত্রে ল্যাশ্লের 'পরীক্ষণ-বাক্সে'র বৈশিষ্ট্য দেখান হইয়াছে। উহার মধ্যে ইঁদুরটিকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। উহার অন্ধকার বা আলোকিত যে কোন পথে যাইবার স্বাধীনতা আছে। ডান দিকে যাইলে উহা অন্ধকার পথে যাইবে—কারণ গবাক্ষ-পথ ($গ_২$) বন্ধ থাকায় আলোক-কক্ষ হইতে আলোক আসিতে পারিতেছে না। আবার ঐ পথে প্রবেশ করিলে ইঁদুরটি বিদ্যুতের ধাক্কা (electric shock) খাইবে; অর্থাৎ 'শাস্তি' পাইবে। অপর পথটি আলোকিত, কারণ $গ_১$ খোলা আছে। ঐ পথে প্রবেশ করিলে শেষ পর্যন্ত '$দ_১$'-চিহ্নিত দরজা দিয়া খাঃকঃ$_১$-চিহ্নিত খাদ্য-কক্ষে ইঁদুরটি প্রবেশ করিবে; অর্থাৎ উহা 'পুরস্কৃত' হইবে।]

পরীক্ষণ-বাক্সে রাখা হইল। প্রথমে দেখা গেল, ইঁদুরগুলি আলোকিত ও অন্ধকার পথের পার্থক্য ঠিক করিতে পারিতেছে না, অর্থাৎ তাহারা অন্ধ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কিছুদিন পরে আবার তাহারা আলোকিত পথ নির্ভুলভাবে চিনিয়া লইতে পারিল।

ল্যাশ্লে অপর একটি পরীক্ষা এই প্রসঙ্গে করেন। আর এক দল ইঁদুর কোন প্রকার শিক্ষা লাভ করিবার পূর্বেই ল্যাশ্লে অস্ত্রোপচার করিয়া তাহাদের শিরনিম্ন-অঞ্চল (occipital lobe) অপসারিত করেন। উহারা

সুস্থ হইলে ল্যাশ্‌লে উহাদের পরীক্ষণ-বাক্সে রাখিয়া আলোকিত পথ-নির্বাচন শিক্ষা দেন। ফলে দেখা যায় যে, অন্যান্য ইঁদুরের মতই তাহারা ঐ কার্য শিক্ষা করিতেছে।

সুতরাং **ল্যাশ্‌লে** নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত করেন: **(১) শিরনিম্ন-অঞ্চলে আলো ও অন্ধকারের পার্থক্য সম্বন্ধে সংবেদন জন্মায়, কিন্তু এই অঞ্চল ঐ কার্যের জন্য একেবারে অপরিহার্য নহে; (২) ঐ অঞ্চলের ক্ষতি হইলে অন্য অঞ্চল উহার কার্যভার গ্রহণ করে; (৩) ঔজ্জ্বল্য-বিনিশ্চয়তা (brightness discrimination)-এর কার্যে সমগ্র গুরুমস্তিষ্কই অংশ গ্রহণ করে—সেইজন্য শিরনিম্ন অঞ্চলের ক্ষতি হইলে ঐ শক্তি ক্ষীণ হইয়া যায়, কিন্তু একেবারে লোপ পায় না।**[২১]

ল্যাশ্‌লের এই সিদ্ধান্ত অনেকে গ্রহণ করেন না; তাঁহারা ল্যাশ্‌লের সমালোচনা করিয়া নিম্নলিখিত প্রতি-প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন:

(১) শিরনিম্ন অঞ্চল নষ্ট হইবার পর অপর কোন্ অংশ উহার কার্যভার গ্রহণ করে?[২২] ল্যাশ্‌লে ইহার কোন সুস্পষ্ট উত্তর দেন নাই।

(২) অপেক্ষাকৃত সরল গঠন-বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ইঁদুরের উপর পরীক্ষণ কার্য চালাইয়া যে ফল লাভ করা যায়, তাহার আলোকে মনুষ্যের **জটিল** গুরুমস্তিষ্ক সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করা কি উচিত?[২৩]

এখন প্রশ্ন হইল: গুরুমস্তিষ্কের কার্য ব্যাখ্যা করিবার জন্য কোন্ মতবাদ গ্রহণযোগ্য—আঞ্চলিক ক্রিয়াবাদ (doctrine of localisation), অথবা সামগ্রিক ক্রিয়াবাদ (doctrine of 'whole-function')? বিজ্ঞান আজও এই প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর দিতে সমর্থ নহে।[২৪] তবে এই দুই মতের সমন্বয় করিয়া আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারি:

(১) **গুরুমস্তিষ্কের যে বিভিন্ন অংশ বা বিভাগ আছে** এবং এক এক অংশ যে এক একটি কার্যে ব্যাপৃত থাকে, তাহা অস্বীকার করা যায় না;

২১ Garrett, *op. cit.*, p. 28.

২২ ফ্রীম্যান্ (Freeman) ও পাপেস্ (Papez) বলেন যে, মস্তিষ্কের নিম্নাঞ্চল (sub-cortical areas) বিকল্প হিসাবে ঐ কার্যভার গ্রহণ করে। ল্যাশ্‌লে ইহা অস্বীকার করিয়া বলেন: "There is no indication that subcortical nuclei have taken over any part of the reaction."

২৩ নিশ্চয়ই মানুষ ইঁদুর নহে (Men are not rats)!

২৪ এই মতদ্বৈধতার বিশদ্ আলোচনার জন্য H. H. Jasper, *Psychological Bulletin*, 1937, pp. 425-28 দ্রষ্টব্য।

(২) কিন্তু এইরূপ বিভাগের অর্থ ইহা নহে যে, বিভিন্ন অংশগুলি পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকে ; বরং এই বিভিন্ন **অংশগুলির কার্যবিভাগ আপেক্ষিক**—ইহাদের **পার্থক্যের পশ্চাতে একটি ঐক্য** আছে ;

(৩) বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে সহযোগিতা ও ঐক্য থাকার জন্য **একটি অংশের কোন ক্ষতি হইলে অপর অংশ বা সমগ্র গুরুমস্তিষ্ক উহার বিকল্প হিসাবে সম্ভবতঃ কার্য করিতে পারে।**[২৫]

এই স্থলে গুরুমস্তিষ্কের কার্যকে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মন্ত্রিসভা (cabinet)-এর কার্যের সহিত কতকাংশে তুলনা করা যাইতে পারে। মন্ত্রিসভার প্রত্যেক মন্ত্রীই সাধারণতঃ এক একটি দপ্তরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, অথচ সমগ্র মন্ত্রিসভা 'একক' ভাবে কার্য করেন। আবার একজন মন্ত্রী পদত্যাগ করিলে বা অসুস্থ হইলে বা অন্য কোন কারণে কোন দপ্তর মন্ত্রিহীন হইলে, অপর কোন মন্ত্রী ঐ কার্যভার গ্রহণ করিতে পারেন। সেইরূপ, গুরুমস্তিষ্কে বিভিন্ন কার্যের বিভিন্ন কেন্দ্র আছে, অথচ উহাদের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ বা ঐক্য আছে।

এই প্রসঙ্গে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সাধারণ অবস্থায় কেবলমাত্র গুরুমস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের মধ্যেই যে ঐক্য ও সংহতি থাকে তাহা নহে, গুরুমস্তিষ্ক ও ইহার নিম্নাঞ্চলগুলি (cortex and subcortical areas)-ও ঐক্যবদ্ধভাবে কার্য করে ; অর্থাৎ সমগ্র মস্তিষ্কের মধ্যেই একটি সংহতি (organization) আছে।

৭। স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র (Autonomic Nervous System বা A. N. S.)

স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র হইল বহির্মুখী (efferent) স্নায়ুতন্ত্র। এই পথে যে শক্তি পরিবাহিত হয়, তাহা গ্রন্থি, হৃৎপিণ্ড এবং আন্তরযন্ত্র (viscera)-এর অনৈচ্ছিক পেশীসমূহকে চালিত করে। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে,

---

২৫ ফ্রীম্যান্ বলিয়াছেন যে, সমশক্তি-সম্ভাব্যতাবাদ ও আঞ্চলিক ক্রিয়াবাদ পরস্পরবিরোধী মতবাদ নহে। (Freeman, *Physiological Psychology*, p. 224)।

সেইরূপ গ্যারেট্ বলিয়াছেন : "The brain, to be sure, is not a sponge, the parts of which are totally undifferentiated. Localisation is an established fact. But our concepts of cortical areas must apparently be modified to allow for wide flexibility, and extended to permit of much functional identity of one part with another." (*Great Experiments in Psychology*, pp. 34, 35).

ইহা প্রধান স্নায়ুতন্ত্র (Central Nervous system বা C. N. S.) হইতে স্বাধীন। যে সমস্ত স্নায়ুকোষের (nerve cells) মধ্য দিয়া স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র হইতে উদ্ভূত শক্তি পরিচালিত হয়, সেগুলি মেরুদণ্ডের বাহিরে থাকে।

স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্তুসমূহ মেরুদণ্ডের ধূসর পদার্থের 'পার্শ্ববর্তী বহুমুখী কোষ' (lateral multipolar cells) হইতে উদ্গত হইয়া সরাসরি অনৈচ্ছিক পেশীসমূহে প্রবেশ করে না—প্রথমতঃ, উহা মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত স্নায়ু-গ্রন্থি (ganglion)-তে প্রবেশ করে এবং তথা হইতে অনৈচ্ছিক পেশী ইত্যাদিতে প্রবেশ করে। যদিও ৩১ জোড়া সুষুম্না-স্নায়ু আছে, তাহা হইলেও প্রতি দিকে ৩১টি অনুরূপ স্বতঃক্রিয় স্নায়ু-গ্রন্থি নাই। গ্রীবাদেশে প্রথম চারিটি স্নায়ুর সহিত সমান্তরাল একটি স্নায়ু-গ্রন্থি এবং দ্বিতীয় চারিটি স্নায়ুর সমান্তরাল আর একটি স্নায়ুগ্রন্থি আছে। আবার বক্ষোদেশের বারটির প্রথম তিনটির সহিত সংশ্লিষ্ট মাত্র একটি স্নায়ু-গ্রন্থি আছে। বাকী স্নায়ুগুলির প্রত্যেকটির অনুরূপ একটি করিয়া স্নায়ু-গ্রন্থি থাকে।

পার্শ্বস্থ স্নায়ু-গ্রন্থি (lateral ganglion) ব্যতীত আবার অপ্রধান সহায়ক স্নায়ু-গ্রন্থি (Collateral ganglion) থাকিতে পারে। (২০নং চিত্র)।
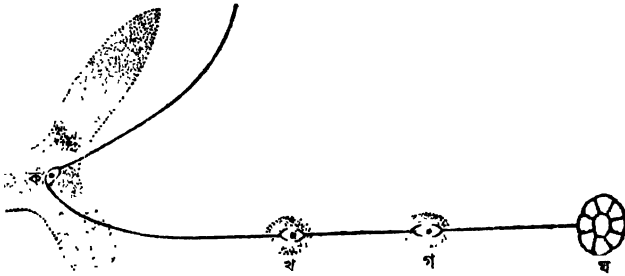
২০ নং চিত্র। স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্তু (autonomic nerve-fibre)।

(ক) — পার্শ্বদেশীয় বহুমুখী স্নায়ু-কোষ। (lateral multipolar cells)

(খ) — পার্শ্বস্থ স্বতঃক্রিয়স্নায়ু-গ্রন্থি (lateral autonomic ganglion)

(গ) — সহায়ক (কিন্তু অপ্রধান) স্নায়ু-গ্রন্থি (collateral ganglion)

(ঘ) — অনৈচ্ছিক পেশী (involuntary muscle)

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি (পৃঃ ১৫৬) স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের দুইটি প্রধান বিভাগ আছে—সমবেদী (sympathetic) এবং পরাসমবেদী (para -

sympathetic)। বক্ষোদেশ ও কটিদেশের স্বতঃক্রিয় স্নায়ু লইয়া 'সমবেদী' বিভাগ রচিত এবং গ্রীবাদেশ, ত্রিকাস্থি এবং অনুত্রিকাস্থি লইয়া পরাসমবেদী বিভাগ গঠিত।

দেহের নিম্নলিখিত অংশের সহিত ইহাদের সংযোগ আছে :

১। পরাসমবেদী :

(ক) মস্তিষ্ক ও গ্রীবাদেশ (cranial-cervical division)-এর স্বতঃক্রিয় স্নায়ুর সহিত নিম্নলিখিত অঙ্গসমূহের সংযোগ আছে :

(১) মস্তিষ্ক, মুখমণ্ডল, বাহুযুগল ;

(২) বক্ষোদেশের আন্তরযন্ত্র, যথা, হৃৎপিণ্ড, ফস্‌ফস্‌ ;

(৩) উদর, পাকস্থলী, মূত্রাশয়।

(খ) বক্ষোদেশ ও কটিদেশ (thorasico-lumbar region)-এর স্বতঃক্রিয় স্নায়ুর সহিত নিম্নলিখিত অঙ্গগুলির সংযোগ আছে :

(১) মস্তিষ্ক, মুখমণ্ডল, বাহুযুগল ;

(২) বক্ষোদেশের আন্তরযন্ত্র ;

(৩) উদর ইত্যাদি ;

(৪) শ্রোণচক্র বা বস্তিদেশ (pelvic region),

(৫) পদযুগল ;

(৬) ত্রিকাস্থিদেশ (sacral division),

(৭) বস্তিদেশের আন্তরযন্ত্র (pelvic-visceral region)।

নিম্নলিখিত তালিকায় স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের সহিত দেহের বিভিন্ন অংশের সংযোগ দেখান হইয়াছে :—
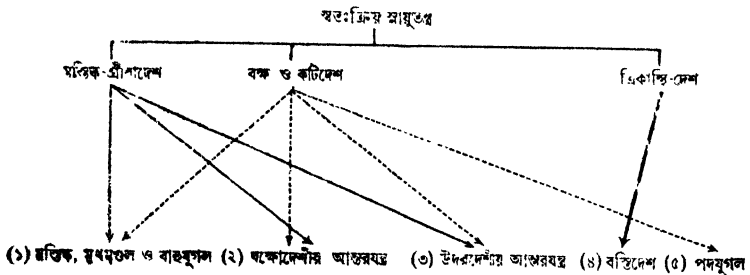
উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, সমবেদী ও পরাসমবেদী

বিভাগের সহিত অনেকক্ষেত্রে দেহের একই অংশের সংযোগ আছে। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উহাদের **কার্যের বৈশিষ্ট্য পৃথক্‌**। যথা :—

(ক) সমবেদী বিভাগের স্নায়ু-গ্রন্থি মেরুদণ্ডের নিকটবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত; কিন্তু পরাসমবেদী বিভাগের স্নায়ু-গ্রন্থি ঐ বিভাগ দ্বারা যে সমস্ত পেশী উদ্দীপিত হয়, তাহাদের নিকটবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত।

(খ) **সমবেদী** স্নায়ুতন্তু দ্বারা পরিবাহিত শক্তি **উত্তেজক** (excitatory); কিন্তু **পরাসমবেদী** স্নায়ুতন্তু দ্বারা পরিবাহিত শক্তি **নিরোধক** (inhibitory)।

(গ) **তীব্র উত্তেজনার সময়—বিশেষতঃ ক্রোধ ও ভয়, এই দুই প্রক্ষোভ বা আবেগের ক্ষেত্রে—সমবেদী বিভাগ কার্য করে।** সমবেদী বিভাগের ক্রিয়ার ফলে রক্ত-সঞ্চালনের গতি বাড়ে; শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া বাড়ে, পরিপাক-যন্ত্রের কার্য ব্যাহত হয় (কারণ পাকযন্ত্রের সহিত সংযুক্ত নিরোধক স্নায়ু-তন্তু বা inhibitory nerve-fibre উদ্দীপিত হয়),[২৬] অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি (adrenal gland) উদ্দীপিত হয় এবং ইহার ফলে যকৃৎ (liver) হইতে শর্করা নির্গত হয় (ঐ শর্করা আবার দেহযন্ত্রের 'জ্বালানী' বা fuel-রূপে ব্যবহৃত হয়) এবং দেহ হইতে স্বেদ বা ঘর্ম নির্গত হয়।

মনে যখন কোন আনন্দ বা তৃপ্তিবোধ জাগে বা প্রীতিরসের সঞ্চার হয়, তখন পরাসমবেদী কার্য করে—যেমন, শ্রুতিমধুর সঙ্গীত শ্রবণে, মনোরম সৌন্দর্য দর্শনে, সুস্বাদু আহার্য দর্শনে, ঘ্রাণে এবং ভোজনে—স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের এই বিভাগটি ক্রিয়াশীল হয়। ইহার ফলে দেহে নিম্নলিখিত পরিবর্তন দেখা দিতে পারে—যথা, অক্ষিযুগলের বিস্তৃতি, হৃদ্‌যন্ত্রের মৃদুক্রিয়া, পরিপাক-যন্ত্রের দ্রুত এবং স্বচ্ছন্দ কার্য, পরিপাক-কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় রসক্ষরণ (flow of digestive juices), লালানিঃসরণ, যৌনগ্রন্থির সক্রিয়তা ইত্যাদি।

২৬ ভোজনকালে কৃত্রিম উপায়ে বিড়াল ইত্যাদিকে ক্রুদ্ধ বা ভীত করিয়া রঞ্জন-রশ্মির মাধ্যমে দেখা গিয়াছে যে, উহার পরিপাক-যন্ত্রের কার্য ব্যাহত হইয়াছে। সেইরূপ আহারের পর আত্মহত্যা করিয়াছে এইরূপ ব্যক্তির দেহকে মৃত্যুর পর পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহার পরিপাকযন্ত্রের কার্য বন্ধ ছিল। (এইজন্য শিশুকে খাওয়াইবার সময় ভয় দেখান বা কাঁদান উচিত নহে; উহাতে পরিপাক-কার্যের ব্যাঘাত ঘটে)।

(ঘ) সমবেদী-স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা উদ্দীপিত ক্রিয়া (যেমন, রাগ বা ভয়ের প্রতিক্রিয়া) সমগ্র দেহ-যন্ত্রের কোন উদ্দেশ্য সাধন করে (যথা, দেহকে বিপদ হইতে রক্ষার চেষ্টা করে), কিন্তু পরাসমবেদী বিশেষ বিশেষ অঙ্গের কোন উদ্দেশ্য সাধন করে।

৮। **প্রান্তবর্তী স্নায়ুতন্ত্র (Peripheral Nervous System):**

প্রান্তবর্তী স্নায়ুতন্ত্রের দুইটি ভাগ—**মস্তিষ্ক-স্নায়ু** (cranial nerve) এবং **সুষুম্না-স্নায়ু** (spinal nerves)

আমরা পূর্বেই (পৃঃ ১৫৯-৬২) সুষুম্না-স্নায়ুর উল্লেখ করিয়াছি। বর্তমান অনুচ্ছেদে আমরা মস্তিষ্ক-স্নায়ুর সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদান করিব।

করোটি-স্নায়ু বা মস্তিষ্ক-স্নায়ুঃ

মস্তিষ্ক-স্নায়ুসমূহ দ্বারা প্রধান স্নায়ুতন্ত্রের সহিত দেহের প্রান্তস্থ বিভিন্ন ইন্দ্রিয় বা 'গ্রাহক' (sense-organs বা receptors) **এবং পেশী বা 'সাধন-যন্ত্র'** (**muscles** বা **effectors**)-এর **সংযোগ থাকে।** সুষুম্নার প্রতি অংশের (segment-এর) সহিত যেমন সুষুম্না-স্নায়ু সংযুক্ত আছে, সেইরূপ কোন ব্যবস্থা মস্তিষ্ক-স্নায়ুর ক্ষেত্রে নাই। আবার প্রতি সুষুম্না-স্নায়ু যেমন অন্তর্মুখী এবং বহির্মুখী এই দুইভাগে বিভক্ত হয়, প্রতি মস্তিষ্ক স্নায়ু সেইরূপ বিভক্ত হয় না। মস্তিষ্ক-স্নায়ুগুলির **কোন কোনটি কেবল বহির্মুখী** (efferent বা motor), **কোন কোনটি কেবল অন্তর্মুখী** (afferent বা sensory), আর **বাকীগুলি মিশ্র** (mixed), অর্থাৎ বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী উভয়ই বা সংবেদ-চেষ্টীয় (sensory-motor)।

সর্বসমেত ১২ জোড়া করোটি-স্নায়ু বা মস্তিষ্ক-স্নায়ু আছে :

(১) ঘ্রাণজ স্নায়ু (olfactory nerves)—ইহারা অন্তর্মুখী বা সংজ্ঞাবাহী। ইহারা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহিত যুক্ত।

(১) চাক্ষুষ স্নায়ু (optic nerves)—ইহার অন্তর্মুখী বা সংজ্ঞাবাহী। ইহারা অক্ষিপট (retina)-এর সহিত যুক্ত।

(৩) চক্ষুঃ-সঞ্চালক স্নায়ু (oculo-motor nerves)—ইহারা বহির্মুখী বা চালক এবং অক্ষি-গোলকের কয়েকটি পেশীর সহিত যুক্ত। ইহারা মধ্যমস্তিষ্ক হইতে উদ্গত।

(৪) চক্ষুঃ-পেশী স্নায়ু (trochlear বা pathetic nerves)—ইহারা চালক এবং চক্ষুর পেশীর সহিত যুক্ত। ইহারা মধ্যমস্তিষ্ক হইতে উদ্গত।

(৫) স্নায়ুত্রয় (trigeminal বা trifacial nerves)—ইহারা মিশ্র বা সংবেদ-চেষ্টীয়। ইহারা মুখমণ্ডল, জিহ্বা এবং চর্বণকার্যের পেশীর সহিত যুক্ত। প্রথম দুইটির সহিত সংযুক্ত স্নায়ু অন্তর্মুখী, কিন্তু শেষোক্তটির সহিত সংযুক্ত স্নায়ু বহির্মুখী।

(৬) সুষুম্না-শীর্ষক-স্নায়ু (abducent)—ইহারা সুষুম্না-শীর্ষকের উপরিভাগ হইতে উদ্গত। ইহারা বহির্মুখী এবং অক্ষির পেশীর সহিত সংযুক্ত।

(৭) মুখমণ্ডলের স্নায়ু (facial nerves)—ইহার মিশ্র এবং জিহ্বা ও মুখমণ্ডলের সহিত যুক্ত।

(৮) শ্রৌত্র স্নায়ু (auditory বা acoustic nerves)—ইহারা সংজ্ঞাবহ এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত যুক্ত।

(৯) রাসন স্নায়ু (glossopharyngeal nerves)—ইহারা মিশ্র। ইহারা জিহ্বা হইতে উদ্দীপন বহন করে এবং গলবিল (pharynx)-এ শক্তি প্রেরণ করে।

(১০) ভ্রাম্যমাণ স্নায়ু (vagus nerves)—ইহারা মিশ্র। ইহারা বিভিন্ন আন্তরযন্ত্রের সহিত যুক্ত। ইহারা দেহের বিভিন্ন অংশে পরিব্যাপ্ত বলিয়া ইহাদের ভ্রাম্যমাণ (wanderers) বলে।

(১১) সুষুম্না-সহায়ক স্নায়ু (spinal accessory nerves)—ইহারা বহির্মুখী এবং গ্রীবার সহিত যুক্ত।

(১২) ক্ষুদ্র রাসন স্নায়ু (hypoglossal nerves)—ইহারা সুষুম্না-শীর্ষক হইতে উদ্গত। ইহারা চালক বা বহির্মুখী এবং জিহ্বার সহিত যুক্ত।

[আমরা বর্তমান অধ্যায়ে বিভিন্ন স্নায়ুতন্ত্র ও উহার কার্যাবলী আলোচনা করিলাম। বিভিন্ন ইন্দ্রিয় এবং পেশীর গঠন ও কার্যের আলোচনার জন্য ১৩শ এবং ১৮শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।]

৯। দেহ ও মনের পারস্পরিক সম্বন্ধ (Relation between Body and Mind) :

দেহ ও মনের নিবিড় সংযোগ সম্বন্ধে আমরা সাধারণভাবে সকলেই

অবহিত আছি। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করি এবং পেশীসমূহের সাহায্যে আমরা বাহ্য জগতে প্রতিক্রিয়া করি। আবার ইন্দ্রিয় ও পেশীই এই কার্যদ্বয়ের জন্য যথেষ্ট নহে—বিভিন্ন স্নায়ুতন্ত্র, বিশেষতঃ প্রধান স্নায়ুতন্ত্র, ব্যতীত মন নিজেকে প্রকাশ করিতে পারে না। আমরা পূর্বের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের কার্য বিশদ্‌ভাবে বর্ণনা করিয়াছি; ইহার আলোকে আমরা বুঝিতে পারি যে, দেহের সকল অংশের মধ্যে মস্তিষ্কের গুরুত্ব সমধিক এবং মনের সহিত ইহার সম্বন্ধ অতীব নিবিড়।

বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলি স্নায়ুতন্তুগুলির সাহায্যে মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত এবং মস্তিষ্কে উদ্দীপন না পৌছিলে সংবেদন জন্মে না। আবার মস্তিষ্ক হইতে শক্তি উদ্ভূত না হইলে পেশীসমূহ সঞ্চালিত হইতে পারে না। চিন্তনশক্তি এবং স্মৃতিশক্তি মস্তিষ্কের সুস্থ অবস্থার উপর নির্ভরশীল। মস্তিষ্কে আঘাত লাগিলে অথবা মস্তিষ্কে অতিরিক্ত রক্তবৃদ্ধি বা রক্তাল্পতা ঘটিলে চেতনাশক্তি লোপ পায় এবং দেহ কার্যক্ষমতা হারাইয়া ফেলে।

এখন প্রশ্ন হইল: দেহ ও মনের এই নিবিড় সম্বন্ধকে কি-ভাবে ব্যাখ্যা করা যাইবে?

উপরের এই প্রশ্নটির একটি দার্শনিক দিক্ আছে এবং আধুনিক কালের পাশ্চাত্ত্য দর্শনে ইহা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।[২৭] বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা প্রশ্নটিকে কেবল মনোবিদ্যার দৃষ্টি হইতে আলোচনা করিব, এবং ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার বহির্ভূত কোন সত্তার আলোচনা আমরা করিব না। সাধারণ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া এই বিষয়ে প্রধানতঃ দুইটি মতবাদ গঠিত হইয়াছে: (ক) **মানস-স্নায়বিক-সমান্তরবাদ (Psycho-physical parallelism)** এবং (খ) **অন্যোন্যক্রিয়াবাদ বা মিথষ্ক্রিয়াবাদ (Interactionism)**।[২৮]

২৭ দ্যকার্ত, স্পিনোজা ও লাইব্‌নিৎস্‌-এর দর্শনে দেহ-মনের সম্বন্ধ লইয়া প্রচুর আলোচনা হইয়াছে।

২৮ বলা বাহুল্য, জড়বাদী ও ব্যবহারবাদী চিন্তানায়কগণের মতে দেহ-মনের সম্বন্ধ লইয়া আলোচনার বিশেষ গুরুত্ব নাই, কারণ তাঁহাদের মতে দেহাতিরিক্ত মনের কোন পৃথক্ সত্তা নাই।

কেহ কেহ মনে করেন যে, দেহ ও মনের সম্বন্ধের আলোচনা নিরর্থক, কারণ দেহ ও মন পৃথক্ সত্তা নহে। দেহ ও মন মিলিয়া একটি সামগ্রিক সত্তা এবং উহাকে 'দেহ-মানস সত্তা' (mind-body complex) বলা যায়।

(ক) **মানসস্নায়বিক-সমান্তরবাদ** (Parallelism)—এই মতবাদ অনুসারে দেহ ও মন একেবারে পৃথক্—একটি অপরটির উপর কোনপ্রকার আধিপত্য বা প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। অতএব মনের কার্য এবং দেহের কার্য পরস্পর নিরপেক্ষ। অথচ দেখা যায় যে, স্নায়ুতন্ত্রের কার্যের সহিত মানসিক কার্যের অদ্ভুত মিল আছে। যদিও একটির কার্য অপরটির উপর নির্ভর করিতেছে না, তাহা হইলেও একটি কার্য করিলেই অপরটি কার্য করিবে। ইহার অর্থ এই নহে যে, দেহ মনের কারণ এবং মন দেহের কারণ। কেবলমাত্র, **স্নায়ুক্রিয়াপ্রবাহ এবং মানসক্রিয়াপ্রবাহ সমান্তরালভাবে চলিতেছে।**

তবে এই মতবাদের কয়েকটি অসুবিধা আছে:

(১) আমাদের মানসরাজ্যের ঠিক অনুরূপ প্রতিলিপি (counterpart) দেহের কোন্ অংশকে বলা যায়?

(২) আমরা যখন বিমূর্ত ধারণা (abstract concept) লইয়া আলোচনা করি (যেমন, আত্মা ইত্যাদি সম্বন্ধে যখন চিন্তা করি), তখন মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে কী পরিবর্তন সূচিত হয় তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

(৩) আমাদের মনে যে সমস্ত অর্থবোধ (consciousness of meaning) বা মূল্যবোধ (consciousness of value) আছে, সেগুলির সমান্তরাল কী দৈহিক অবস্থা আছে, তাহা আমরা জানি না।

(৪) আমাদের দেহের সকল কার্যেরই সমান্তরাল মানসিক অবস্থা আছে কি না, তাহা আমরা জানি না। যেমন, যখন আমাদের হৃদ্‌যন্ত্র স্বাভাবিকভাবে কার্য করে, তখন তাহার সমান্তরাল কোন মানসিক অবস্থার কথা আমরা অবগত নহি।[২৯]

(খ) **মিথক্রিয়াবাদ** (Interactionism)—দেহ ও মন পরস্পর হইতে পৃথক্ হইলেও দেহ মনের উপর এবং মন দেহের উপর কার্য করে, অর্থাৎ **দেহ ও মন পরস্পরের উপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে।** দেহ কার্য করিলেই মনের উপর উহার কোন-না-কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে, আবার

২৯ মনের সহিত সমান্তরালভাবে কার্য করিবার কালে মস্তিষ্কে কী পরিবর্তন হয় জানা না থাকায় আমাদের প্রভূত অজ্ঞতা স্বীকার করিতে হয়। এইজন্য Stout মন্তব্য করিয়াছেন: "...parallelism must appeal to our immense ignorance of what takes place in the brain." (*A Manual of Psychology*, p. 84).

মন কার্য করিলেই উহা দেহের উপর প্রতিক্রিয়া করিবে। অবশ্য দেহ ও মনের সকল তথ্য জানা না থাকায় আমরা এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সকল বৈশিষ্ট্য বুঝিতে পারি না।

এই মতবাদের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত আপত্তি উঠিতে পারে:

(১) মন ও দেহ যদি পৃথক্ সত্তা হয়, তাহা হইলে তাহাদের ভিতর মিথস্ক্রিয়া কিরূপে সম্ভব হয়? যদি তাহারা বিভিন্ন প্রকারের বা স্তরের সত্তা হয়, তাহা হইলে একটি অপরটির উপর কী ভাবে কার্য করে?

(২) দেহ ও মনের সীমারেখা কোথায় তাহা এই মতবাদে স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করা হয় না। কোন্ পর্যায়ে আসিয়া দেহ ও মন পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিার জন্য মিলিত হয়, সেই প্রশ্নের সদুত্তর এই মতবাদ দান করিতে পারে না।[৩০]

(গ) উপসংহার:

দেহ ও মনের সম্বন্ধ পূর্ণভাবে বাহ্য অভিজ্ঞতার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ব্যাখ্যা করা যায় না। বাস্তবিকপক্ষে এই সমস্যাটি মূলতঃ দার্শনিক। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে মনোবিদ্যা রচিত হইয়াছে, তাহার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আমরা সমান্তরবাদ বা মিথস্ক্রিয়াবাদ যাহাই গ্রহণ করি না কেন, তাহাই কতকাংশে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। তবে মনোবিদ্যা-বিশারদকে একটি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে—তাহা হইল মনের উদ্দেশ্য-মুখিতা বা **কোন উদ্দেশ্য সাধনের প্রতি মনের লক্ষ্য**। সুতরাং মিথস্ক্রিয়াবাদ যখন বলে যে, মন দেহের উপর প্রতিক্রিয়া করে এবং দেহ ও মনের উপর ক্রিয়া করে, তখন স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মন কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেহের মাধ্যমে ক্রিয়া করে এবং মনের উপর দেহের ক্রিয়া যে পরিবর্তন সূচনা করে, মন তাহার অর্থ বা তাৎপর্য বুঝিবার চেষ্টা করে।

অপর পক্ষে, সমান্তরবাদ যখন বলে, দেহ ও মন সমান্তরালভাবে কার্য করিতেছে, তখন উহার অর্থ এই নহে যে, দেহের কার্যধারা মন হইতে

৩০ এইজন্য স্টাউট্ (Stout) বলিয়াছেন: 'If interaction occurs, it is of an entirely different kind from the interaction of physical things, and ultimately the connection is as mysterious as it is on the alternative theory." (*Ibid.*, p. 91).

সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং মন ব্যতীতও দেহ সকল সময় কার্য করিয়া যাইবে। দেহ মনের সহিত সমান্তরালভাবে কার্য করিয়া যায়, কারণ ঐরূপ কার্যের মাধ্যমে দেহ দ্বারা মনের উদ্দেশ্য সাধিত হয়।[৩১]

৩১ জেম্‌স্ এই প্রসঙ্গে উদাহরণস্বরূপ বলিয়াছেন যে, 'বিশুদ্ধ' সমান্তরবাদের মতে শেক্সপীয়র যখন হ্যাম্‌লেট্ লিখিতেছিলেন, তখন তাঁহার মনের সহিত মস্তিষ্কও পৃথক্ অথচ সমান্তরালভাবে কার্য করিয়া চলিতেছিল ; সুতরাং তাঁহার মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্তুগুলিকে বুঝিতে পারিলেই তাঁহার লেখার সকল কারণ বুঝিতে পারা যাইত। (*Principles of Psychology* Vol. 1, p. 132 দ্রষ্টব্য)।

নিশ্চয় সমান্তরবাদীদের এই মত গ্রহণ করা যায় না। নিশ্চয়ই হ্যাম্‌লেট-রচনার মাধ্যমে শেক্সপীয়রের মনের চিন্তাধারা প্রকাশ পাইতেছে। Stout-এর কথা এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য : "What is essential here is the mind, not the brain of Shakespeare : what is essential is Shakespeare as a subject, thinking, feeling, willing, and adapting means to ends. It is this *teleological* point of view which is distinctive of Psychology : and whether we adhere to the hypothesis of parallelism or to that of interaction, this teleological point of view remains unaffected." (*Op. cit.*, p. 96).

সপ্তম অধ্যায়

বুদ্ধির পরীক্ষা ও পরিমাপ

১। বুদ্ধির স্বরূপ ও সংজ্ঞা (Nature and Definition of Intelligence) ঃ

আমরা আমাদের বিভিন্ন কার্যের মধ্যে বুদ্ধির পরিচয় দিবার চেষ্টা করি এবং আমরা নিজেদের ও অপরের কার্যকে বুদ্ধি বা নির্বুদ্ধিতার প্রকাশক মনে করি। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা যায়ঃ 'বুদ্ধি কাহাকে বলে?' 'বুদ্ধির সংজ্ঞা কী?', তাহা হইলে উহার উপযুক্ত উত্তর আমরা দিতে পারি না। বুদ্ধি একটি মৌলিক গুণ এবং ইহার যুক্তিশাস্ত্র-সম্মত সংজ্ঞা দেওয়া দুরূহ। বিভিন্ন মনোবিৎ বুদ্ধির বিভিন্ন সংজ্ঞা দান করিয়াছেন; কিন্তু কোনটিই সম্পূর্ণভাবে সন্তোষজনক নহে।[১]

বিভিন্ন মনোবিৎ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বুদ্ধির যে সমস্ত বিভিন্ন সংজ্ঞা দান করিয়াছেন, আমরা এখানে উহাদের কয়েকটি আলোচনা করিব ঃ

(১) প্রাণীমাত্রই বাহ্য পরিবেশের সহিত প্রতিযোজনের চেষ্টা করে এবং **প্রাণিবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী** (biological standpoint) হইতে একদল মনোবিৎ বুদ্ধিকে **বাহ্য পরিবেশের সহিত প্রতিযোজনের ক্ষমতা** বলিয়া অভিহিত করেন। বুদ্ধি হইল নূতন অবস্থা, নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইয়া উহার সহিত প্রতিযোজনের ক্ষমতা। স্টের্ণ, ওয়েল্‌স্‌, উড্‌ওয়ার্থ, উইটমার, এড্‌ওয়ার্ড্‌[২] ইত্যাদি এইভাবে বুদ্ধির সংজ্ঞা দিয়াছেন। বাহ্য পরিবেশ এবং আমাদের মন সদাসর্বদা পরস্পরের উপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করিতেছে এবং ইহার ফলে বিভিন্ন **নূতন নূতন সমস্যার উদ্ভব হইতেছে। ইহাদের সমাধানেই বুদ্ধির প্রয়োজন হয় এবং উহা প্রকাশ পায়।**

---

১ *Journal of Educational Psychology*-র সম্পাদকমণ্ডলী ১৯২১ সালে বুদ্ধির সংজ্ঞা লইয়া একটি আলোচনা-চক্র (symposium)-এর ব্যবস্থা করেন। উহাতে বহু প্রখ্যাতনামা মনোবিৎ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বুদ্ধির স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

২ তুলনীয় ঃ (১) Stern : "Intelligence is a general capacity of an individual consciously to adjust his thinking to new requirements."

এই সংজ্ঞার গুণ হইল যে, ইহা বুদ্ধির প্রায়োগিক দিক্ (practical aspect)-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করে। তাহা ছাড়া, এই সংজ্ঞা বুদ্ধি হইতে বিশেষ দক্ষতা (talent), জ্ঞান ও স্মৃতির পার্থক্য নির্দেশ [illegible]
এই সংজ্ঞা হইতে জানিতে পারি যে, বুদ্ধি [illegible]
দক্ষতা বা কুশলতা নহে ; তাই বলিয়া [illegible]
জ্ঞান (general information)-ও [illegible]
কেবলমাত্র অতীত ঘটনা সম্বন্ধে জ্ঞান নহে ([illegible]
অভিজ্ঞতাকে নূতন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়)।

তবে এই সংজ্ঞার অসুবিধা হইল যে, ইহা বুদ্ধিকে খুব বেশী সুনির্দি করিয়া বুঝায় না। প্রতিযোজনের ক্ষমতা বা সমস্যা-সমাধানের শক্তি বলিয়া বিশেষ কোন মানসিক শক্তি নাই। রাস্তায় চলন্ত গাড়ীর সম্মুখে পড়িলে আমরা একভাবে প্রতিযোজনের চেষ্টা করি, আবার চলন্ত গাড়ীতে উঠিতে হইলে আমরা আর একভাবে প্রতিযোজনের চেষ্টা করি। সেইরূপ কোন্ ছবিতে কী রঙ দিলে ভাল দেখায়, এই সমস্যার সমাধানে যে মানসিক শক্তির প্রয়োজন হয়, জ্যামিতির কোন সমস্যা সমাধানে কি ঠিক সেই প্রকার মানসিক শক্তির প্রয়োজন হয় ?

"It is a general mental adaptability to new problems and conduct of life" (*The Psychological Methods of Testing Intelligence*).

(২) Wells: "Intelligence means the property of so recombining our behaviour-patterns as to act better in a novel situation." (*Mental Adjustments*).

(৩) Edwards: "Intelligence is the capacity for variability and versatility of response." (*Psychological Review*, Vol. 35).

(৪) Woodworth: "Intelligence means *intellect put to use* It is the application of intellectual abilities in handling a situation or accomplishing any task." (*Psychology*).

(৫) Witmer: "Intelligence I define as the ability of the individual to solve what for him is a new problem." (*The Psychological Clinic*, Vol. IX, 1915).

(৬) Garrett: "Intelligence includes at least the abilities demanded in the solution of problems which require the comprehension and use of symbols." (*American Psychology*, 1946: A developmental Theory of Intelligence)

এ কথা সত্য যে, সকল ক্ষেত্রেই বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য মানসিক শক্তির প্রয়োজন, কিন্তু কোন একটি 'শক্তি' দ্বারা কি সকল সমস্যার সমাধান হয়? যেমন, কালিদাস-রচিত কোন রচনার ঠিক কী ব্যাখ্যা হইবে, সেই বিষয়ে যখন মতভেদ হয়, তখন সংস্কৃত ভাষাবোধের শক্তি চাই, আবার সুসংবদ্ধভাবে চিন্তা করিবারও ক্ষমতা চাই; সেইরূপ গণিত-শাস্ত্রের কোন সমস্যা-সমাধানের জন্য ঐ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি চাই; আবার সমস্যাটির বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্বন্ধ বুঝিবার ক্ষমতা চাই।

প্রতিযোজন বা সমস্যা-সমাধানের জন্য যে বুদ্ধির প্রয়োজন তাহা সকলেই স্বীকার করিবে; কিন্তু প্রতিযোজন বা সমস্যা-সমাধানের শক্তি বলিয়া কোন একটি বিশেষ শক্তি নাই যাহার সহিত বুদ্ধিকে সমার্থক বা একাত্মবোধক ধরা যায়।

(২) **শিক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গী** (educational standpoint বা standpoint of learning) হইতে একদল মনোবিৎ বলেন যে, বুদ্ধি হইল **জ্ঞানলাভের ক্ষমতা** (ability to acquire knowledge) বা **শিক্ষালাভের ক্ষমতা** (ability to learn)।[৩]

এই সংজ্ঞা পূর্ববর্তী সংজ্ঞারই অনুরূপ। ইহাও বুদ্ধির একটিমাত্র বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দিয়াছে; ইহা সত্য যে, বুদ্ধি ব্যতীত কোন বিষয়ে সুষ্ঠু শিক্ষালাভ করা যায় না এবং শিক্ষালাভের শক্তির মাধ্যমে বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

তবে পূর্ববর্তী সংজ্ঞার ন্যায় এই সংজ্ঞার বিরুদ্ধেও যুক্তি হইল যে, ইহা বুদ্ধির কোন সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দেয় না। সমস্যা-সমাধানের শক্তি বলিয়া যেমন একটি কোন বিশেষ শক্তি নাই, সেইরূপ শিক্ষালাভের ক্ষমতা বলিয়া একটি কোন বিশেষ মৌলিক ক্ষমতা নাই।

(৩) কেহ কেহ আবার বুদ্ধিকে কেবলমাত্র এক **বিশেষ শক্তি** (faculty)

---

৩ **তুলনীয়:** (১) Buckingham: "Intelligence is the capacity to learn."

(২) Colvin: "An individual possesses intelligence in so far as he has learned or can learn to adjust himself to his environment".

(৩) Dearborn: "Intelligence is the capacity to profit by experience."

(৪) Woodrow "Intelligence is acquiring capacity or a capacity to acquire capacity." (*Journal of Educational Psychology*, Vol. XII, 1921).

বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইঁহারা বুদ্ধি কী সাধন করে তাহা না বলিয়া বুদ্ধি স্বরূপতঃ কী তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

টার্‌মান্ (Terman) ইত্যাদি মনে করেন যে, বুদ্ধি হইল **বিমূর্ত চিন্তা (abstract thinking) করিবার শক্তি বা ক্ষমতা**।[৪]

এই সংজ্ঞাও একদেশদর্শী। বিমূর্তচিন্তার জন্য বুদ্ধির প্রয়োজন; কিন্তু বিমূর্তচিন্তার ক্ষমতাই বুদ্ধির একমাত্র পরিচায়ক নহে।

বিমূর্তচিন্তার জন্য যে মানসিক শক্তির প্রয়োজন তাহা অন্যান্য মানসিক ক্রিয়ার জন্য প্রয়োজন হইতে পারে; সুতরাং বিমূর্ত চিন্তাকেই বুদ্ধির একমাত্র প্রকাশক মনে করা সঙ্গত হইবে না।

তাহা ছাড়া, এই সংজ্ঞায় কল্পনা করা হইয়াছে যে, বিমূর্তচিন্তা করিবার ক্ষমতা একটি 'মৌলিক', 'অবিশ্লেষণীয়' শক্তি; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে 'বিমূর্ত চিন্তার শক্তি' একাধিক মানসিক কার্যের সমন্বয়ে গঠিত।

আবার, বুদ্ধি যেখানেই প্রযুক্ত হয়, সেইখানেই একটি উদ্দেশ্য সাধনের বা লক্ষ্যে পৌছিবার প্রচেষ্টা দেখা যায়। সুতরাং বুদ্ধির কোন সুষ্ঠু সংজ্ঞায় ইহার উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়।

বুদ্ধি-শক্তির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিয়া **বিনে** বলিয়াছেন যে, ইহার ভিতর চিন্তার তিনটি লক্ষণ প্রকাশ পায়: (ক) বুদ্ধি এক **বিশেষ লক্ষ্য** বা **উদ্দেশ্য** গ্রহণ করিয়া তাহা মানিয়া চলে; (খ) বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌছিবার জন্য বুদ্ধির **প্রতিযোজনের ক্ষমতা** আছে এবং (গ) বুদ্ধির ফলে **আত্ম-সমালোচনা** সম্ভব হয়।[৫]

---

৪ টার্‌মানের ভাষায়: "An individual is intelligent in proportion as he is able to carry on abstract thinking." (*Journal of Educational Psychology,* Vol. XII).

৫ বিনে-প্রদত্ত সংজ্ঞার ইংরাজী মর্মার্থ দাঁড়ায়: "Intelligence has three characteristics of the thought process, namely, that it (1) tends to maintain and take a definite direction ; (ii) has a capacity to make adaptations for the purpose of attaining a desired end ; and (iii) has the power of auto-criticism." (*L'Annee Psychologique*).

বিনে তাঁহার অপর একটি পুস্তকে নিম্নলিখিত চারিটি ক্ষমতাকে বুদ্ধির প্রকাশক বলিয়াছেন: অবধারণ, আবিষ্কার, আভিমুখ্য ও সমালোচনা। তাঁহার ভাষায়: "Comprehension, invention, direction and censorship—intelligence lies in these four words."

বুদ্ধি উদ্দেশ্য-সাধনের চেষ্টা করে এবং তাহার জন্য প্রতিযোজন করিয়া থাকে—এই দুইটি বিষয়ের প্রতি বিনে-প্রদত্ত সংজ্ঞা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে কিন্তু নিম্নলিখিত অভিযোগ উপস্থাপিত করা যাইতে পারে :

(ক) কেবলমাত্র কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে গ্রহণের মধ্যে সর্বদাই বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না। অনেক সময় উহা আয়ান বা মেজাজ (tampera-ment)-এর উপর নির্ভর করে।

(খ) আবার প্রতিযোজনের জন্য উপায়-নির্বাচন এবং আত্ম-চিন্তন বা আত্মসমালোচনা, এই দুইটিকে বিনে পৃথক্‌ভাবে বলিয়াছেন; কিন্তু ইহারা বিচ্ছিন্নভাবে থাকে না। কোন উদ্দেশ্যে পৌছিবার জন্য যখন আমরা উপায় নির্বাচন করি, তখন আমরা ঠিক কী চাই জানিবার জন্য অনেক সময় আত্মচিন্তনও করিয়া থাকি।

(৪) **অভিজ্ঞতার দৃষ্টিভঙ্গী** (empirical standpoint) হইতে অনেক বলেন যে, বুদ্ধিকে কার্যের পশ্চাতে লুক্কায়িত শক্তি না বলিয়া উহাকে **কার্যের মাধ্যমে প্রকাশিত ফল** বলাই শ্রেয়ঃ; এই ফল আমরা বাহ্য অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে পারি। অর্থাৎ যেহেতু বুদ্ধির প্রকাশ কার্যের মাধ্যমে ঘটে, সেই হেতু বলা যায় যে, **বুদ্ধি হইল তাহাই যাহা আমাদের কার্যে প্রকাশিত হয়।**[৬]

বুদ্ধির প্রকাশ যে কার্যের মাধ্যমে হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেইজন্য বুদ্ধি কার্যের ফলে প্রকাশ পায়, কেবলমাত্র ইহা বলিলে বুদ্ধির

---

৬ তুলনীয় : (১) Pieron : "Intelligence does not exist in the mental mechanism, it is only an effect, a functional resultant under certain defined conditions, a *behavior value.*" ('The Problem of Intelligence', *Pedagogic Seminar*, Vol. 33).

(২) Pintner : "We must free ourselves from the idea that there is a specific faculty of intelligence...Intelligence is merely an evaluation of the efficiency of a reaction or a group of reactions under specific circumstances." ('An empirical view of Intelligence', *Journal of Educational Psychology*, Vol. 17).

স্বরূপ অস্পষ্ট ও অব্যাখ্যাত থাকিয়া যায়। নিশ্চয়ই বুদ্ধির এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যাহার জন্য কোন কার্যের মাধ্যমে উহাকে আমরা চিনিতে পারি। সেইজন্য বুদ্ধির সংজ্ঞা মাত্রেরই বুদ্ধির স্বরূপ ও উহার উদ্দেশ্যের প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করা উচিত।

(৫) **অনুষঙ্গবাদের দৃষ্টিভঙ্গী** (associationistic standpoint) হইতে থর্ণডাইক্ (Thorndike) বলেন যে, **অনুষঙ্গ অথবা বিভিন্ন বস্তুর বা বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ-নিরূপণের ধারকত্ব বা ক্ষমতাই** (capacity for mere association or connection-forming) হইল বুদ্ধি।[৭]

থর্ণডাইক্ বলেন যে, তাঁহার এই অভিমত অনেকগুলি পরীক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, বুদ্ধিশক্তির সহিত অনুষঙ্গের ক্ষমতার সর্বাধিক পারম্পর্য বা অনুবন্ধ (correlation) আছে।

এই মত সম্বন্ধে আমরা বলিতে পারি যে, অনুষঙ্গের ক্ষমতাকে বুদ্ধির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য বলা উচিত হইবে না, কারণ স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরও অনুষঙ্গের ক্ষমতা থাকে। অনুষঙ্গ হওয়াই যথেষ্ট নহে—ঐ অনুষঙ্গের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে কি না তাহাই দেখিতে হইবে।

তাহা ছাড়া, বুদ্ধি পরীক্ষার জন্য থর্ণডাইক্ যে সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন তাহাদের অনেকগুলি এইরূপ হইত যে, তাহাদের যথাযথ উত্তর দিতে হইলে অনুষঙ্গ ব্যতীত উচ্চস্তরের মানসিক শক্তিরও প্রয়োজন হইত।[৮]

(৬) **মানসিক প্রলক্ষণ** (mental trait) হিসাবে বুদ্ধিকে বর্ণনা করিয়া থার্স্টোন (Thurstone) বলেন যে, **বুদ্ধি হইল এমনই এক ক্ষমতা যাহার ফলে ব্যক্তি-বিশেষ তাহার বিভিন্ন প্রেরণাগুলিকে** (impulses) **উহাদের উদ্ভবের প্রারম্ভে বুঝিতে পারিয়াই উহাদের**

৭ Thorndike, ***The Measurement of Intelligence***, p. 415 দ্রষ্টব্য।

থর্ণডাইক্ ইহাও বলিতেন যে, "there is no doubt that the appreciation and management of relations is a very important feature of intellect."

৮ বুদ্ধি-পরীক্ষার জন্য থর্ণডাইক্ যে সব প্রশ্ন করিতেন, তাহাদের কয়েকটি হইল এইরূপ: (ক) ৫০-কে ৭ দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল কত হয়? (খ) ২০০ ডলারের ৫·২৫% কত? (গ) ১ ইঞ্চিতে কত সেন্টিমিটার হয়?—নিশ্চয়ই এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে অনুষঙ্গ অপেক্ষা উচ্চতর মানসিক শক্তির প্রয়োজন।

পূরণের চেষ্টা করে।[১] যাহার বুদ্ধি অধিক, সে অপেক্ষাকৃত অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি অপেক্ষা শীঘ্র তাহার প্রেরণাগুলির 'দাবী' বুঝিতে পারে।

একথা সত্য যে, অধিকতর বুদ্ধিশালী ব্যক্তি অল্পবুদ্ধিশালী ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর দ্রুতগতিতে নিজের প্রেরণার 'প্রয়োজন' বুঝিতে পারে; কিন্তু সেই কারণে ইহাই বুদ্ধির একমাত্র পরিচায়ক হইতে পারে না। এই মতের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত যুক্তি উত্থাপন করা যাইতে পারে:

(ক) বুদ্ধির পরিচয় কি কেবলমাত্র আন্তর প্রেরণা (internal impulses)-কে বুঝিবার প্রচেষ্টাতে প্রকাশ পায়? বাহির হইতে যখন কোন উদ্দীপক প্রদত্ত হয়, তখন উহা বুঝিবার শক্তিতে কি বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না? 'আকাশে লাল রঙের মেঘ দেখা দিয়াছে, অতএব শীঘ্র ঝড় উঠিবে'—ইহা মনে করিয়া যখন কেহ ইচ্ছা সত্ত্বেও বাড়ীর বাহিরে না যায়, অথবা কোন বড় শহরে গাড়ী চালাইবার সময় 'লাল আলোর সঙ্কেত' (red signai) দেখিয়া চালক যখন গাড়ী থামায়, তখন কি সামান্য কিছু বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না? আবার, গণিত বা দর্শন বা অর্থনীতি অথবা অন্য কোন বিজ্ঞানের সমস্যা লইয়া যখন আমরা আলোচনা করি, তখন আমাদের ভিতর আন্তর প্রেরণার প্রয়োজন মিটাইবার কী প্রচেষ্টা থাকে?

(খ) তাহা ছাড়া, আন্তর প্রেরণাসমূহকে বুঝিতে পারাই বুদ্ধির যথেষ্ট পরিচায়ক নহে। উহাদের প্রয়োজন বুঝিয়া উহাদের তৃপ্ত করিবার উপযুক্ত উপায় নির্ধারণ করা এবং সেই উপায়গুলিকে কার্যক্ষেত্রে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করিতে পারার মধ্যেই বুদ্ধির উপযুক্ত পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, ব্যক্তি-বিশেষের যখন ক্ষুধার উদ্রেক হয়, তখন ক্ষুধার তাড়না বুঝিতে পারাই যথেষ্ট নহে; কিভাবে ক্ষুধা নিবৃত্তি করা যাইতে পারে, তাহার উপায় বাহির করিয়া উপযুক্তভাবে প্রয়োগ করাতেই বুদ্ধির সম্যক্ পরিচয়।

---

১ তুলনীয়: "Intelligence, considered as a mental trait, is the capacity to make impulses focal at their early, unfinished stage of formation" (*The Nature of Intelligence*, p. 159).

থার্স্টোনের মতের ব্যাখ্যা করিয়া রেক্স নাইট্ (Rex Knight) বলিয়াছেন: "......people differ in intelligence by differing in the speed with which they become clearly aware of any impulse that is seeking satisfaction. The person who becomes fully conscious of his impulses at any early stage in the process of satisfying them is more intelligent than the person whose awareness is delayed..." (*Intelligence and Intelligence Tests*, 1st Ed., p. 27).

(৭) **শারীরবৃত্তীয় বিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী** (physiological standpoint) হইতে একদল লেখক বুদ্ধিকে **প্রধান স্নায়ুতন্ত্রের কার্য—বিশেষতঃ গুরুমস্তিষ্কের কার্য** (function of the cerebrum)—বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।[10]

চেষ্টিতবাদী ওয়াট্‌সন্ এবিষয়ে অগ্রণী। আমরা জানি যে, তিনি মনকে অস্বীকার করিয়া মানুষকে অচেতন যন্ত্র হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন; তাঁহার রচনায় কল্পনা, স্মৃতি, চিন্তা ইত্যাদি কোন মানসিক প্রক্রিয়ার স্থান নাই। সুতরাং 'বুদ্ধি'-কে তিনি কোন মানসিক শক্তি বা প্রক্রিয়া বলিয়া স্বীকার করেন না।

ওয়াট্‌সনের মতবাদ গ্রহণযোগ্য নহে। (পৃঃ ১০১-১০৪ দ্রষ্টব্য)। **নিছক যান্ত্রিকতাবাদের সাহায্যে বুদ্ধিকে বর্ণনা করা চলে না।** মনকে অস্বীকার করিয়া চিন্তন ইত্যাদির সুষ্ঠু ব্যাখ্যা হয় না। বাস্তবিক, যদি চেষ্টিতবাদ সত্য হইত—অর্থাৎ যদি বৌদ্ধিক কার্য এবং মস্তিষ্কের কার্য অপৃথক্ হইত—তাহা হইলে প্রত্যেক মানসিক ক্রিয়ার সময় আমরা মস্তিষ্কের ক্রিয়া সম্বন্ধে অবহিত হইতাম। বাস্তবক্ষেত্রে কিন্তু এইরূপ হয় না—যখন আমরা কোন বৌদ্ধিক কার্য করি, তখন মস্তিষ্কের কার্য বলিয়া কোন কিছু সম্বন্ধে পৃথক্ প্রতীতি জন্মে না।

আর এক দল লেখক (যথা, থর্ণ্‌ডাইক্) ওয়াট্‌সনের ন্যায় চরমপন্থী নহেন, অথচ বুদ্ধির ব্যাখ্যাকালে ইঁহারা দেহের ক্রিয়ার উপরই গুরুত্ব

১০ যথা, স্যাণ্ডিফোড (Sandiford) বুদ্ধিকে 'function of the central nervous system' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (*Educational Psychology*, p. 143)।

সেইরূপ থর্ণডাইক্ মনে করেন যে 'শেষ পর্যন্ত' ("in the last analysis") শারীরবৃত্তীয় দৃষ্টিভঙ্গী হইতেই বুদ্ধির ব্যাখ্যা দান করিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, কোন কোন বৈজ্ঞানিক মহলে এবং সাধারণভাবে কিছু কিছু লোকের বিশ্বাস আছে যে, দেহের—বিশেষতঃ মস্তিষ্কের গঠন এবং গুরুমস্তিষ্কের ওজনের—সহিত বুদ্ধির প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ আছে। (Freeman, *Physiological Psychology*, pp. 491—502, এবং O. O. Norris, 'A behaviorist's account of intelligence' *Journal of Philosophy*, 1928, দ্রষ্টব্য)।

ইহা লক্ষণীয় যে, আমরা নির্বুদ্ধি লোক সম্বন্ধে অনেক সময় বলি যে, 'তাহার মাথায় কিছু নাই।'

আরোপ করেন। ইঁহারা মানসিক ক্রিয়া অস্বীকার করেন না; তবে ইঁহারা মনে করেন যে, মানসিক ক্রিয়ার চরম ও সুষ্ঠু ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে দৈহিক কার্যাবলীর মধ্যে। **থর্ণডাইক্** মনে করেন যে, বুদ্ধি নির্ভর করে **নিউরোন** (neurone)-**গুলির পারস্পরিক সংযোগ ও সামঞ্জস্যের উপর**।[১১]

এই মতও ত্রুটিপূর্ণ। নিউরোনগুলি সকল দৈহিক কার্যের সময়ই ক্রিয়াশীল থাকে; অথচ সকল দৈহিক কার্য মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে না। সুতরাং নিউরোনের মাধ্যমে যদি বুদ্ধি বা তদনুরূপ মানসিক বৃত্তি বা অবস্থাকে ব্যাখ্যা করিতে হয়, তাহা হইলে যে সব নিউরোনের কার্য মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে এবং যাহারা পারে না, তাহাদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা যাইবে কি প্রকারে? আবার, নিউরোনগুলির কার্য যেহেতু একই প্রকারের (অর্থাৎ শক্তি পরিবহন করা), সেই হেতু বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়ার পার্থক্য কেবলমাত্র নিউরোনের সাহায্যে বুঝান যায় না।[১২]

মোট কথা, মানসিক ক্রিয়া দেহের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়; তাই বলিয়া দেহকে মানসিক ক্রিয়ার কারণ বলা যায় না। তাহা ছাড়া, মানসিক ক্রিয়ার পশ্চাতে সমান্তরালভাবে কোন না-কোন দৈহিক কার্য থাকিলেও, উহার স্বরূপ ঠিক কী প্রকারের তাহা আমরা জানি না; সুতরাং দৈহিক ক্রিয়ার মাধ্যমে বুদ্ধির ব্যাখ্যা করা সমীচীন হইবে না।[১৩]

---

১১ **থর্ণডাইকের ভাষায়:** "In their deeper nature the higher forms of intellectual operation are identical with mere association or connexion-forming, depending upon the same sort of physiological connexions but requiring many more of them." (Thorndike, *The Measurement of Intelligence*, p. 415). তিনি আরও বলেন যে, নিউরোনগুলিকে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধযুক্তভাবে কার্য করাইবার ক্ষমতা ('capacity for having the neurones act with reference to one another')-এর মধ্যে বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

১২ যাঁহারা বলেন যে, বুদ্ধি হইল স্নায়ু ও পেশীর ক্রিয়া (function of the neuro-muscular mechanism), তাঁহাদের মতের সপক্ষে বিশেষ উপাত্ত পাওয়া যায় নাই। দৈহিক অবনতি বা বৈকল্য (physiological deficiency)-র উপর বুদ্ধির অধোগতি নির্ভর করে না; তবে প্রধান স্নায়ুতন্ত্রের অবনতি ঘটিলে কেবল বুদ্ধি কেন সকল মানসিক ক্রিয়া বা অবস্থাই ব্যাহত হইতে পারে (Freeman, *op. cit.*, p. 496); কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, 'বুদ্ধি = স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়া'।

১৩ **তুলনীয়:** "It is impossible to describe intelligence by reference to physiology, for the very simple reason that its physiological counterpart is still unknown." (Rex Knight, *op. cit.*, p. 37).

(৮) একদল মনোবিৎ বুদ্ধির কোন সাধারণ সংজ্ঞা দান না করিয়া উহার **'উপাদান'** (factor)-এর সাহায্যে উহার ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন। এবিষয়ে অগ্রণী হইলেন **স্পিয়্যারম্যান্** (Spearman)।

পূর্বে বিশ্বাস ছিল যে, একজনের যদি এক বিষয়ে বুদ্ধির প্রাখর্য থাকে, তাহা হইলে অপর কোন বিষয়ে তাহার বুদ্ধির স্বল্পতা থাকিবে—অর্থাৎ প্রকৃতি যেন চলে 'ক্ষতিপূরণের নীতি' (compensatory principle) অনুসরণ করিয়া। স্পিয়ারম্যান এবিষয়ে প্রতিবাদ করেন। ১৯০৪ সালে তিনি গাণিতিক যুক্তি দ্বারা দেখান যে, বিভিন্ন মানসিক শক্তিগুলি পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট। তিনি অঙ্কশাস্ত্রে বুৎপত্তি, সঙ্গীতে ব্যুৎপত্তি, যন্ত্রবিদ্যায় দক্ষতা ইত্যাদি পর্যালোচনা করিয়া দেখান যে, উহাদের মধ্যে একটা পারম্পর্য (correlation) আছে এবং এই পারম্পর্য হইল সদর্থক (positive)।[১৪]

এইজন্য স্পিয়ারম্যান সিদ্ধান্ত করেন যে, **বিভিন্ন মানসিক ক্ষমতার** (mental abilities) **পশ্চাতে একটি সাধারণ উপাদান আছে**—ইহাকে বলা যায় **'সাধারণ উপাদান'** (general factor, সংক্ষেপে 'g')। এইজন্য স্পিয়ারম্যান আরও বিশ্বাস করেন যে, একজনের এক বিষয়ে দক্ষতা থাকিলে অপর বিষয়েও কিছু দক্ষতা দেখাইবার **সম্ভাবনা** আছে। এই 'সাধারণ উপাদান' ব্যতীত বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দক্ষতা দেখাইবার জন্য একটি **'বিশেষ উপাদান'** (special ability, সংক্ষেপে 's') আছে। যিনি বল-বিজ্ঞান বা যন্ত্রবিদ্যা (mechanical sciences)-এ পারদর্শী, তাঁহার 'সাধারণ উপাদান, বা 'g'-ত' আছেই, উপরন্তু একটি **বিশেষ ক্ষেত্রে**, যেমন যন্ত্রবিদ্যায়, তাঁহার পারদর্শিতা আছে, অর্থাৎ ঐ বিশেষ বিষয়ে তাঁহার 's' আছে। সুতরাং, **বুদ্ধি হইল সাধারণ উপাদান ও বিশেষ উপাদান**—'g' এবং 's'—**এই দুই উপাদানের সমন্বয়ে 'গঠিত'**। এইজন্য

১৪ পারম্পর্য সদর্থক অথবা নঙর্থক সম্বন্ধ ইঙ্গিত করিতে পারে, অথবা কোন সম্বন্ধই নাই, এরূপ হইতে পারে। যেমন, উত্তাপবৃদ্ধি এবং তাপমান যন্ত্রে (thermometer-এ) পারদ উপর দিকে উঠা, এই দুইয়ের যে পারম্পর্য, তাহা হইলে সদর্থক (positive)। দ্রব্যমূল্য বাড়িলে, উহার চাহিদা কমিয়া যায় ; দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধি এবং চাহিদা-হ্রাস, এই দুইয়ের পারম্পর্য হইল নঙর্থক। আর মাথার চুলের রঙ, এবং বুদ্ধি, এই দুইয়ের তথা-কথিত পারম্পর্য হইল নিতান্ত তুচ্ছ (insignificant)। বিবিধ পারম্পর্যকে অঙ্কে প্রকাশ করা যায়। সম্পূর্ণ সদর্থক পারম্পর্যের অঙ্ক (co-efficient of correlation) হইল '+১', সম্পূর্ণ নঙর্থক পারম্পর্যের অঙ্ক হইল '—১'। মধ্যবর্তী সদর্থক পারম্পর্য +১ এবং ০-এর মধ্যে থাকিবে, এবং মধ্যবর্তী নঙর্থক পারম্পর্য ০ এবং —১-এর মধ্যে থাকিবে।

স্পিয়ারম্যানের এই মতবাদের নাম **'দ্বি-উপাদান মতবাদ'** (Two-factor Theory)।[১৫]

ট্রাইঅন্ (Tryon),[১৬] টম্‌সন্ (Godfrey Thompson) ইত্যাদি লেখক স্পিয়ারম্যানের মতবাদের সমালোচনা করেন। তাঁহাদের সমালোচনার প্রধান বক্তব্য হইল যে, সকল বৌদ্ধিক কার্যের মধ্যে একটি 'সাধারণ উপাদান' ('g') কার্য করিতেছে, ইহা বলা যায় না। বরং এক জাতীয় কার্যের জন্য কতকগুলি উপাদান একত্রে সঙ্ঘবদ্ধ থাকিয়া বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়ার মধ্যে প্রকাশ পায়। ইঁহারা 'সাধারণ উপাদান' অপেক্ষা 'সঙ্ঘ-উপাদান' (group factor)-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

এই কথা স্পিয়ারম্যানও শেষকালে স্বীকার করিয়াছেন। যেমন, যে সব ক্ষেত্রে অর্জিত জ্ঞানকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হয়, সেই সব ক্ষেত্রে দক্ষতা যাহারা লাভ করে, তাহাদের 'g'-উপাদান এবং 's'-উপাদান ব্যতীত আবার **প্রায়োগিক উপাদান** (practical factor) আছে, সেইরূপ যে সব ক্ষেত্রে ভাষার দক্ষতার প্রয়োজন, সেই সব ক্ষেত্রে 'g', 's' এবং তাহার উপর **'বাচিক উপাদান'** (verbal factor) আছে।

আমরা এই প্রসঙ্গে থার্স্টোনের মতের উল্লেখ করিতে পারি।

থার্স্টোন বিবিধ মানসিক শক্তির পারম্পর্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বুদ্ধির **সাতটি উপাদানের** কথা বলিয়াছেন [১৭] ; যথা—

(১) বাক্যের অর্থ সম্যক্‌ভাবে বুঝিবার ক্ষমতা (ability to define and understand words, *i.e.*, Verbal Comprehension—'*V*') ;

(২) বাক্‌পটুত্ব, অর্থাৎ দ্রুত উপযুক্ত বাক্য প্রয়োগ বা ব্যবহারের ক্ষমতা (ability to think rapidly of words, *i.e.*, Word Fluency—'*W*') ;

১৫ স্পিয়ারম্যানের মতবাদের গাণিতিক প্রমাণের জন্য তাঁহার ***Abilities of Man***, Ch. X, Appendix দ্রষ্টব্য। সংক্ষিপ্ত বর্ণনার জন্য Rex Knight-রচিত ***Intelligence and Intelligence Tests***, Ch. II দ্রষ্টব্য।

১৬ Tryon, 'Multiple Factors vs. Two factors as determinants of Abilities', ***Psychological Review***, Vol. 36, pp. 324-351 দ্রষ্টব্য।

১৭ L. L. Thurstone, 'Primary Mental Abilities', ***Psychometrika Monograph***, 1938, No. 1.

ইঁহার মতের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার জন্য Munn, ***Psychology*** pp. 78, 79 দ্রষ্টব্য।

(৩) অঙ্কশাস্ত্রীয় সমস্যা-সমাধানের ক্ষমতা (ability to do arithmetic problems, *i.e.*, problems relating to Number—'*N*') ;

(৪) স্মৃতির সাহায্যে কোন কিছু অঙ্কন বা স্থানগত সম্বন্ধ নিরূপণের ক্ষমতা (ability to draw a design from memory or to visualize relationships in Space—'*S*') ;

(৫) স্মৃতি-শক্তি (memory—'*M*') ;

(৬) প্রত্যক্ষ করিবার শক্তি, অর্থাৎ প্রত্যক্ষগোচর বস্তুসমূহের পার্থক্য ও সাদৃশ্য নিরূপণের ক্ষমতা (ability to see difference and similarities among objects, *i.e.*, perceptual ability—'*P*') ;

(৭) কোন কিছু বুঝিবার জন্য বা কোন সমস্যা-সমাধানের জন্য মূলসূত্র ও প্রত্যয়সমূহ সম্যক্ অবধারণের ক্ষমতা (ability to discover principles or concepts for understanding or solving problems, *i.e.*, reasoning—'*R*') ।

উপসংহার :

আমরা উপরে বুদ্ধির বিবিধ সংজ্ঞা আলোচনা করিয়া দেখিলাম যে, ইহাদের কোনটিই সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য নহে, আবার কোনটিই একেবারে পরিত্যাজ্য নহে। এক একটি সংজ্ঞায় বুদ্ধির এক একটি বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে; ফলে সংজ্ঞাগুলি অসম্পূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে এবং বুদ্ধির স্বরূপ সম্বন্ধে মতভেদ বৃদ্ধি পাইয়াছে।[১৮] বাস্তবিক বুদ্ধিকে যদি একটি মৌলিক গুণ ধরা যায়, তাহা হইলে ইহার সংজ্ঞাদানের চেষ্টা বৃথা।

আমরা বুদ্ধির একটি বিশেষ সংজ্ঞাদানের চেষ্টা পরিহার করিয়া উহার কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিব :

(১) বুদ্ধির প্রকাশ **কার্যের মাধ্যমে**।

(২) স্থায়ী বুদ্ধিবৃত্তি (intellect[১৯])-কে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার ফলে বুদ্ধির প্রকাশ হয়।

---

১৮ এইজন্য Bernard (বার্ণার্ড) বলিয়াছেন : "While the teacher tried to cultivate intelligence, and the psychologist tried to measure intelligence, nobody seemed to know precisely what intelligence is." (*Mental Tests*, p. 23).

১৯ তুলনীয় : Woodworth—"Intelligence means *intellect put to use*." (*Psychology*, p. 97).

ইংরাজী *Intellect* এবং *Intelligence* এই দুই পদের পার্থক্য হইল যে, intellect একটি

(৩) বাহ্য পরিস্থিতির সহিত **প্রতিযোজনের** প্রচেষ্টা হইতে কার্যের উদ্ভব—সুতরাং সুষ্ঠু ও সম্যক্ প্রতিযোজনের মধ্যে বুদ্ধির পরিচয়।

(৪) কোন অবস্থায় সুষ্ঠু প্রতিযোজনের জন্য প্রয়োজন **সমগ্র পরিস্থিতিটি অবধারণ** এবং **উহার বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্বন্ধ নিরূপণ**; সুতরাং ইহারা বুদ্ধির পরিচায়ক।

(৫) বৌদ্ধিক কার্যের লক্ষ্য থাকে কোন **উদ্দেশ্য সাধন করা**; সুতরাং **উদ্দেশ্য ও তাহার উপযুক্ত উপায়-নির্বাচনেও** বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

(৬) সুষ্ঠু প্রতিযোজনের জন্য প্রয়োজন নূতন অবস্থায় উদ্ভূত **সমস্যার উপযুক্ত সমাধান** এবং এই বিষয়ে **পুরাতন অভিজ্ঞতাকে নূতন অবস্থায় প্রয়োগ**; সুতরাং এইগুলির ক্ষমতা বুদ্ধির প্রকাশক।

(৭) উচ্চ পর্যায়ের মানসিক ক্রিয়ার জন্য বিমূর্ত চিন্তা করিবার প্রয়োজন হয়; সুতরাং **বিমূর্ত চিন্তার শক্তি** বুদ্ধির প্রকাশক।

(৮) বুদ্ধির প্রাখর্য বৃদ্ধি পাইলে **কঠিনতর কার্য** করিবার ক্ষমতা, **অধিক সংখ্যক কার্য** করিবার ক্ষমতার, **বিস্তৃততর ক্ষেত্রে** কার্য করিবার ক্ষমতা এবং **অধিকতর দ্রুততার** সহিত কার্য করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়[২০]; সুতরাং ইহারা বুদ্ধির প্রাখর্যের নির্দেশক।

(৯) বৌদ্ধিক কার্য সম্পাদনের জন্য **দেহের—বিশেষতঃ প্রধান স্নায়ু-তন্ত্রের—সুস্থতা ও কার্যক্ষমতা** প্রয়োজন (অবশ্য ইহার অর্থ এই নহে যে, বুদ্ধি কেবলমাত্র স্নায়ুতন্ত্রেরই ক্রিয়া-বিশেষ)।

২। বুদ্ধি-অভীক্ষা বা বুদ্ধি-পরীক্ষা (Intelligence Test):

উপরের আলোচনায় আমরা দেখিলাম যে, বুদ্ধির যথাযথ সংজ্ঞাদানের

স্থায়ী মানসিক বৃত্তি যাহা অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার ফলে স্থায়ীভাবে গড়িয়া উঠে এবং উহাকে বর্তমান কার্যে প্রকাশের মধ্যে intelligence বা বুদ্ধির প্রকাশ ঘটে। স্পিয়ারম্যান্ ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন:

'The word 'intelligence' is obviously akin to 'intellect'; the two derive from the same Latin *intelligo*. They only differ in that the former comes from the active present participle, the latter from the passive past participle. ...the sole original difference between the two was that the 'intellect' meant the faculty, whilst, intelligence' was its actual exercise." (*The Nature of Intelligence and the Principle of Cognition*, pp. 18, 19).

২০ থর্নডাইক্ বুদ্ধির চারিটি গুণের উল্লেখ করিয়াছেন; যথা, Level, Range, Area ও Speed.

চেষ্টা বৃথা; কিন্তু তাই বলিয়া বুদ্ধি-পরীক্ষা অসম্ভব নহে।[২১] এইজন্য বর্তমান শতকের প্রারম্ভ হইতেই বিভিন্ন মনোবিৎ নানা উপায়ে বুদ্ধি-পরীক্ষার প্রচেষ্টা করেন। আমরা প্রথমে ইঁহাদের বিভিন্ন প্রচেষ্টার সংক্ষিপ্ত বিবরণী দান করিব।

(ক) সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:

বুদ্ধি-পরীক্ষা পদ্ধতির উদ্ভাবক হিসাবে ফরাসী মনোবিৎ আল্‌ফ্রেড্‌ বিনে (A. Binet)-এর নাম জড়িত। বিনের পূর্বে বিভিন্ন মানসিক শক্তি পরিমাপের প্রচেষ্টা হয় (যেমন, মনোযোগ, প্রত্যক্ষ, স্মৃতি ইত্যাদি লইয়া কিছু কিছু পরীক্ষা চলিতে থাকে); কিন্তু পৃথক্‌ ভাবে বুদ্ধি সম্বন্ধে বিনে সর্বপ্রথম পরীক্ষা সুরু করেন। ১৯০৪-০৫ সালে ফ্রান্সের বিদ্যালয়ে বহু ছাত্র-ছাত্রী যখন তাহাদের পরীক্ষায় কৃতকার্য হইতে পারিতেছিল না, তখন ফ্রান্সের তদানীন্তন শিক্ষা-অধিকর্তা বিনেকে ছাত্র-ছাত্রীর বুদ্ধি-বৈষম্য লইয়া অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করেন। ইহারই ফলে বিনে তাঁহার সহকর্মী সিমোঁ (Simon)-কে লইয়া শিশুদের বুদ্ধি পরিমাপের জন্য এক উপায় উদ্ভাবন করেন। তাঁহারা ১৯০৫ সালে শিশুদের উপযুক্ত করিয়া সরল হইতে জটিল ৩০টি প্রশ্ন রচনা করেন এবং ঐ প্রশ্নাবলীর সাহায্যে তাহাদের বুদ্ধি পরীক্ষা আরম্ভ করেন। তাঁহারা সাধারণতঃ শিশুদের বিভিন্ন বস্তুর নাম জিজ্ঞাসা করিতেন, বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের রেখা তুলনা করিতে বলিতেন, বাক্যের পাদপূরণ করিতে বলিতেন, এবং আরও কতকগুলি অনুরূপ প্রশ্ন করিতেন। কিন্তু এই সময় বিনে ও সিমোঁ প্রশ্নগুলি শিশুদের বয়ঃক্রম অনুযায়ী বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করেন নাই। ১৯০৮ সালে তাঁহারা আবার প্রশ্নাবলীর একটি নূতন তালিকা প্রস্তুত করেন এবং সেইগুলিকে শিশুর বয়ঃক্রম অনুসারে এক একটি দলে ভাগ করেন। ইহা **বিনে-সিমোঁ পরীক্ষা-পদ্ধতি** (Binet-Simon Test) নামে পরিচিত। ক্রমশঃ বিভিন্ন ভাষায় এই সব প্রশ্নগুলি অনূদিত হইতে লাগিল। ১৯১১ সালে বিনে পুনরায় প্রশ্নগুলিকে কিছু পরিমাণ সংশোধিত ও মার্জিত করেন।

১৯০১ সালে আমেরিকায় গড্‌ডার্ড (Goddard) বিনে-প্রবর্তিত প্রশ্নগুলি

২১ এইজন্য হিল্‌গার্ড (E. R. Hilgard) বুদ্ধির "ব্যবহারিক সংজ্ঞা" (practical definition) দিয়াছেন: "বুদ্ধি-পরীক্ষা পদ্ধতির দ্বারা যাহার পরিমাপ করা যায়, তাহাকে বুদ্ধি বলে।" (*Introduction to Psychology*, পৃঃ ৪৩০ দ্রষ্টব্য)।

অনুবাদ করেন এবং পরবর্তী সালে হিলি (Healy) এবং ফের্নাল্ড আরও কতকগুলি নূতন পদ্ধতি প্রবর্তন করেন।

জার্মানীতে ময়মান্ (Meumann) এবং স্টের্ণ (Stern) এই বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করেন। স্টের্ণ 'বুদ্ধ্যঙ্ক' (Intelligence Quotient) পদটি প্রবর্তন করেন।

ইহার পর ১৯১৬ সালে আমেরিকার স্টান্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টার্‌মান্ (Terman) বিনে-প্রদত্ত প্রশ্নাবলীকে পরিমার্জিত করিয়া আর একটি নূতন তালিকা দেন। ইহা **স্টান্‌ফোর্ড-বিনে পরীক্ষা** (Stanford-Binet Test) বা **স্টান্‌ফোর্ড-সংস্করণ** (Stanford Revision) নামে খ্যাত।

ব্রিটেনের অবস্থার উপযোগী করিয়া বার্ট (Burt) বিনে-পদ্ধতির কিছু সংস্কার সাধন করিয়া *Mental and Scholastic Tests* নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

১৯২২ সালে বিনে-পদ্ধতির সংস্কার করেন কুল্‌মান্ (Kuhlmann)। তিনি ভাষার উপর কম গুরুত্ব আরোপ করেন এবং তিন বৎসরের নিম্ন বয়স্কদের উপযোগী প্রশ্ন রচনা করেন।

১৯৩৫ সালে স্টান্‌ফোর্ড্-বিনে পদ্ধতির পুনরায় সংস্কার সাধন করেন টার্‌ম্যান্ (Terman) এবং মেরিল্ (Merrill)।

ভাষার মাধ্যমে মনোভাব প্রকাশের ক্ষমতা যাহাদের নাই, তাহাদের পরীক্ষার জন্য কৃতি-পরীক্ষা বা কৃত্যভীক্ষা (Performance Tests)-এর পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন সেগুঁই (Seguin), উইট্‌মার (Witmer) এবং হিলি (Healy)।

পরিণতবয়স্কদের পরীক্ষার জন্য কতকগুলি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন বেলেভ্যু ইন্‌ষ্টিটিউট্ (Bellevue Institute)-এর ডেভিড্ ওয়েক্‌শ্‌লের (David Wechsler)। ইহা ওয়েক্‌স্‌লের-বেলেভ্যু পরীক্ষা (Wechsler-Bellevue Test) নামে পরিচিত। ১৯৩৯ সালে ওয়েক্‌শ্‌লের প্রণীত *The Measurement of Adult Intelligence* প্রকাশিত হয়।

ইতোমধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এবং ইংরাজী ভাষা-ভাষী অঞ্চলে সৈন্য নির্বাচনের জন্য ১৯১৭ সালে এক পরীক্ষা-পদ্ধতি

উদ্ভাবিত হয়; ইহাকে **আর্মি আল্‌ফা পরীক্ষা** (Army Alpha Test) বলা হয়। নিরক্ষর অথবা ইংরাজীতে অনভিজ্ঞদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় **আর্মি বিটা পরীক্ষা** (Army Beta Test)। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যে পদ্ধতি প্রচলিত হয়, তাহাকে Army Individual Test of General Mental Ability বলে।

(খ) পরীক্ষা-পদ্ধতি (Method of testing) :

আমরা উপরে বলিয়াছি যে, বিনে-পদ্ধতি অনুসারে বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে বুদ্ধি পরীক্ষার চেষ্টা করা হয়। এক একটি বয়ঃ-পর্যায়ের অনুযায়ী কতকগুলি প্রশ্ন আছে। যদি পরীক্ষণ-পাত্র তাহার বয়সের উপযুক্ত আদর্শ (standard) প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে তাহার বুদ্ধি সাধারণ মানের সমান (upto the normal standard); যদি সে তাহার বয়স অপেক্ষা অধিক বয়সের উপযুক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে তাহার বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত বেশী; আর যদি সে তাহার বয়স অপেক্ষা কেবলমাত্র নিম্ন বয়সের উপযুক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে তাহাকে স্বল্পবুদ্ধি বলিতে হইবে।

বিনে-পদ্ধতি :

১৯১১ সালে বিনে **বয়ঃক্রম অনুসারে যে-সব আদর্শ প্রশ্নের তালিকা** রচনা করেন, তাহাদের কিছু উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

(১) **তিন বৎসরের** শিশুর নিকট আশা করা যায় যে, সে—

(ক) চোখ, মুখ ও নাক দেখাইতে পারিবে,

(খ) দুই অঙ্কের সংখ্যা শুনিয়া পুনর্বার বলিতে পারিবে,

(গ) ছবি দেখিয়া উহা বর্ণনা করিতে পারিবে,

(ঘ) তাহার পদবী বলিতে পারিবে,

(ঙ) একটি ছয় সিলেবেলের বাক্য শুনিয়া পুনর্বার বলিতে পারিবে।

(২) **চারি বৎসরের** শিশুর নিকট আশা করা যায় যে, সে—

(ক) নিজে ছেলে কিংবা মেয়ে বলিতে পারিবে,

(খ) চাবি, ছুরি ও ত্রার নাম বলিতে পারিবে,

(গ) তিন অঙ্কের সংখ্যা শুনিয়া পুনর্বার বলিবে,

(ঘ) দুইটি রেখা তুলনা করিতে পারিবে।

(৩) **পাঁচ বৎসরের** শিশুর নিকট আশা করা যায় যে, সে—

(ক) দুইটি ওজন তুলনা করিতে পারিবে।

(খ) একটি সমবাহু চতুর্ভুজ দেখিয়া নকল করিতে পারিবে,

(গ) দশটি পদের একটি বাক্য শুনিয়া পুনর্বার বলিতে পারিবে,

(ঘ) চারিটি পেনি (বা অনুরূপ মুদ্রা) গুণিতে পারিবে,

(ঙ) একটি সমকোণের দুইটি অর্ধাংশ যোগ করিতে পারিবে।

(৪) **ছয় বৎসরের** শিশুর নিকট আশা করা যায় যে, সে—

(ক) সকাল ও সন্ধ্যার পার্থক্য বলিতে পারিবে,

(খ) পরিচিত পদের ব্যবহারের সাহায্যে কোন কিছুর বর্ণনা দিতে পারিবে,

(গ) হীরকের আকার নকল করিতে পারিবে,

(ঘ) তেরটি পেনি (বা অনুরূপ মুদ্রা) গণনা করিতে পারিবে,

(ঙ) সুন্দর ও কুৎসিত মুখের ছবি পৃথক্ করিতে পারিবে।

(৫) **দশ বৎসরের** বালক বা বালিকার নিকট আশা করা যায় যে, সে—

(ক) ওজনের ক্রম অনুসারে পাঁচটি দ্রব্য সাজাইবে,

(খ) দুইটি ছবি স্মৃতি হইতে আঁকিবে,

(গ) কোন অসার বা অবাস্তব বর্ণনার সমালোচনা করিবে,

(ঘ) "দুরূহ প্রশ্নের" উত্তর দিতে বা অর্থ অবধারণ করিতে পারিবে,

(ঙ) দুইটির অনধিক বাক্যের মধ্যে তিনটি প্রদত্ত পদ ব্যবহার করিতে পারিবে।

(৬) **পঞ্চদশ বৎসরের** বালক বা বালিকার নিকট আশা করা যায় যে, সে—

(ক) সাত অঙ্কের একটি সংখ্যা শুনিয়া পুনর্বার বলিতে পারিবে,

(খ) একটি প্রদত্ত পদ লইয়া তিনটি ছড়া এক মিনিটে বলিতে পারিবে,

(গ) ২৬ সিলেবল্‌-বিশিষ্ট একটি বাক্য পুনর্বার বলিতে পারিবে,

(ঘ) ছবি দেখিয়া উহার অর্থ বুঝাইতে পারিবে,

(ঙ) প্রদত্ত ঘটনা (facts) ব্যাখ্যা করিতে পারিবে।

(৭) **১৫ বৎসরের উর্ধ্বে** সকলকে **পরিণত-বয়স্ক** (adult) ধরা হইবে।[২২] পরিণত-বয়স্কদের নিকট আশা করা যায় যে, তাহারা—

(ক) বিশেষ আকার অনুযায়ী কাগজ কাটিতে পারিবে,

(খ) কল্পনায় একটি ত্রিভুজকে পুনরায় সাজাইবে,

(গ) তুইটি গুণবাচক পদের পার্থক্য বলিতে পারিবে,

(ঘ) রাষ্ট্রপতি (President) এবং রাজা (King)-এর কার্যের তিনটি পার্থক্য বলিতে পারিবে।

(ঙ) একটি পঠিত অংশের সারমর্ম বলিতে পারিবে।

স্টান্‌ফোর্ড্-বিনে পদ্ধতি :

আমরা পূর্বেই (পৃঃ ২০১-২০৩) বলিয়াছি যে, বিনে-প্রদত্ত প্রশ্নাবলীর অনেকেই বিভিন্ন সময় সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। স্টান্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের টার্‌মান যে সব পরিবর্তন ও সংশোধন করিয়াছিলেন, তাহা মোটামুটি বিনে কর্তৃক ১৯০৮ ও ১৯১১ সালে রচিত প্রশ্নাবলীকে কেন্দ্র করিয়া। তাঁহার দ্বারা প্রস্তুত প্রশ্নাবলীর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, তিনি প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে শিশুর পক্ষে বিশেষ পরিস্থিতি অবধারণ এবং উহার সহিত সংশ্লিষ্ট সমস্যার সমাধানের ক্ষমতা কিরূপ আছে, তাহা নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেন। যেমন, আট বৎসরের বালক-বালিকাকে প্রশ্ন করা যাইতে পারে : (ক) "যদি তুমি অপরের কোন জিনিষ ভাঙ্গিয়া ফেল, তোমার কি করা উচিত?" (খ) "যদি তোমার বন্ধু অসাবধানতাবশতঃ তোমাকে আঘাত করে, তুমি কি করিবে?" "সেইরূপ দশ বৎসর বয়স্কদের জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে : (ক) "তুমি যাহাকে খুব ভাল করিয়া জান না, তাহার সম্বন্ধে তোমার মতামত জিজ্ঞাসা করা হইলে তুমি কী বলিবে?" (খ) "খুব প্রয়োজনীয় কিছু করিবার পূর্বে তোমার কী করা উচিত?" আবার কতকগুলি প্রশ্নের দ্বারা **পৃথক্ বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য** কোথায় সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়; যথা, দ্বাদশবর্ষ বয়স্কদের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলির অন্যতম হইল : (ক) সাপ, গরু,

২২ বিনের ন্যায় টার্‌মান্ মনে করেন যে, পরিণত বয়স্কদের মান ১৬ বৎসর ধরা উচিত। পিন্‌ট্‌নার (Pintner) এই মত গ্রহণ করেন না—তিনি ১৪ বৎসর বয়সকে পরিণত বয়স (adulthood)-এর মান হিসাবে গ্রহণ করেন।

চড়াই, (খ) বই, শিক্ষক, খবরের কাগজ, (গ) পশম, তুলা, চামড়া······
এগুলির মধ্যে সাদৃশ্য কোথায়?[২৩]

বিনে-কুল্‌মান্ পদ্ধতি :

বিনে তিন বৎসর ও তাহার অধিক বয়স্কদের জন্য প্রশ্নাবলী রচনা করিয়াছিলেন; কুলমান্ (Kuhlmann) বিনে-পদ্ধতির যে সব সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন, তাহাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল যে, তিনি তিন বৎসরের কম বয়সের শিশুর (যথা, তিন মাস, ছয় মাস, এক বৎসর, দেড় বৎসর ও দুই বৎসরের শিশুর) উপযোগী প্রশ্ন রচনা করেন। তাঁহার মতে—

(১) **তিন মাসের** শিশুর নিকট আশা করা যায় যে, 'আদেশ' ব ইঙ্গিত অনুসারে সে—

(ক) হাত বা কোন জিনিষ মুখের নিকট লইয়া যাইতে পারিবে,

(খ) হঠাৎ শব্দ শুনিয়া এক বিশেষ ভাবে প্রতিক্রিয়া (যথা, হাততালি) করিতে পারিবে,

(গ) দুই চক্ষু দ্বারা একত্রে কোন চলমান বা ঘূর্ণায়মান জিনিষ দেখিবে,

(ঘ) দূরস্থ কোন জিনিষ দেখিবার চেষ্টা করিবে,

(ঙ) ভয় দেখাইবার জন্য কোন কিছু চক্ষুর নিকটে আনিলে চক্ষু মুদিত করিবে।

(২) আবার, **দুই বৎসরের** শিশুর নিকট আশা করা যায় যে, সে—

(ক) কোন ছবির বিভিন্ন অংশ দেখাইতে পারিবে,

(খ) অন্যের অঙ্গসঞ্চালন (যথা, উপরে হাত তোলা, হাততালি দেওয়া ইত্যাদি) অনুকরণ করিতে পারিবে,

(গ) সাধারণ আদেশ (যথা, 'বলটি ধর' বা 'বলটি ছোড়') পালন করিতে পারিবে,

(ঘ) একটি বৃত্ত মোটামুটিভাবে নকল করিতে পারিবে,

(ঙ) খাইবার পূর্বে লজেন্স ইত্যাদির কাগজের মোড়ক খুলিতে পারিবে।

২৩ একেত্রে (ক) প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, 'সাপ, গরু, চড়াই—ইহারা সকলেই প্রাণী'।

কৃতি-পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

বিনে-সিমোঁর আদি পদ্ধতি অথবা উহার বিবিধ পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য হইল যে, উহাতে সাধারণতঃ প্রশ্নাবলী-পদ্ধতির উপর নির্ভর করা হয়; অর্থাৎ শিশুর বাচিক প্রতিক্রিয়া (verbal response) দেখিয়া তাহার বুদ্ধির পরিমাপ নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তী অনেক মনোবিৎ এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, শিশু তাহার মনের কথা সকল সময় ভালভাবে বলিতে পারে না। শিশুর মনের প্রকাশ সুষ্ঠুভাবে ঘটে তাহার কার্যের মাধ্যমে। সুতরাং শিশুর বুদ্ধির পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন **কৃতি-পরীক্ষা** বা **কৃত্যভীক্ষা** (Performance Test)। তাহা ছাড়া, মূক-বধির ইত্যাদির জন্য ইহাই একমাত্র পরীক্ষা-পদ্ধতি। এইজন্য পিন্‌ট্‌নার (Pintner) ও প্যাটারসন্‌ (Patterson), ড্রেভার (Drever) ও কলিন্‌স্‌ (Collins), আর্থার (Arthur), কেণ্ট (Kent) ও শাকাও (Shakow) ইত্যাদি অনেকে বিবিধ কৃতি-পরীক্ষা-পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন।[২৪]

উদাহরণস্বরূপ আমরা পিন্‌ট্‌নার-প্যাটারসন্‌-পদ্ধতির কথা বলিতে পারি। তাঁহারা ১৫টি পরীক্ষার উপায় উদ্ভাবন করেন। যথা—৫টি জ্যামিতিক আকারবিশিষ্ট চিত্রকে কাটিয়া উহাদের স্বাভাবিক আকার মত সাজাইতে বলা, চারিটি ত্রিভুজাকার কাষ্ঠের অংশকে একটি 'কাঠামো' বা ফ্রেমের মধ্যে ঠিকভাবে আটকাইতে বলা, পাঁচটি বিভিন্ন আকারের অংশকে একটি সমকোণী চতুর্ভুজাকার কাঠামোর (rectangular frame-এর) মধ্যে আটকাইতে বলা—এইসব পরীক্ষায় 'কার্যসম্পাদনের সময়' (time required for completion) এবং 'ভুলের সংখ্যা' (number of errors) বুদ্ধি-পরিমাপের জন্য হিসাব করা হয়। আবার, মানুষের দেহের বিভিন্ন অংশ অঙ্কিত বিভিন্ন কাষ্ঠ-খণ্ডকে জুড়িয়া একটি সম্পূর্ণ মানুষের আকার তৈয়ারী করা, একটি জাহাজের দশটি বিভিন্ন অংশের ছবি জুড়িয়া একটি কাঠামোর মধ্যে লাগান, অসম্পূর্ণ একটি ছবিকে সম্পূর্ণ করার জন্য উপযুক্ত অংশ নির্বাচন করা ইত্যাদি কার্য করিতে বলা হয়—এই সব পরীক্ষায় সম্পাদিত কার্যের গুণ (quality of performance)-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তাহা ছাড়া, প্রতিযোজনের শক্তি নিরূপণের

---

২৪ এবিষয়ে সেগুঁই (Seguin) ইত্যাদি পথ প্রদর্শন করেন। (পৃঃ ২০২ দ্রষ্টব্য)।

জন্য একটি ঘূর্ণায়মান চক্রের উপর মনঃসংযোগ করিতে বলা হয়—এ ক্ষেত্রে সঠিকভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার ক্ষমতা লক্ষ্য করা হয়।

অন্যান্য পদ্ধতি :

তাহা ছাড়া, সাধারণভাবে অন্য কতকগুলি পরীক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত আছে—যেমন, ছবি আঁকিতে বলা, ধাঁধাঁর পথে (maze or puzzle) সংক্ষিপ্ত পথ আবিষ্কার করিতে বলা, কয়েকটি ছবি দেখিয়া একটি সুসংবদ্ধ কাহিনী রচনা করিতে দেওয়া, সরল গাণিতিক সমস্যা-সমাধান করিতে বলা ইত্যাদি।

আমরা এখানে অন্যান্য কয়েকটি পদ্ধতির উল্লেখ করিতে পারি—

(ক) ছবি আঁকার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন গুড্‌এনাফ (Goodenough)। তাঁহার মতে শিশুকে তাহার "ক্ষমতা-অনুযায়ী" মানুষের ছবি আঁকিতে বলিতে হইবে, এবং ছবির 'বিচার' সৌন্দর্য-তত্ত্বের দিক হইতে না করিয়া দেখিতে হইবে, ছবিতে কোন অসামঞ্জস্য আছে কি -না, অথবা কোন অংশ বাদ পড়িয়াছে কি না। গুডএনাফ্‌ মনে করেন যে, ৩ হইতে ১৩ বৎসর বয়স পর্যন্ত বালক-বালিকার ক্ষেত্রে এই পরীক্ষা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

(খ) ধাঁধাঁ (maze)-এর মধ্যে নির্দিষ্ট পথ আবিষ্কারের ক্ষমতার উপর
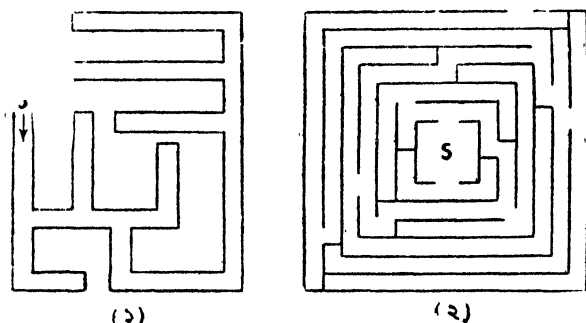
১নং চিত্র।
পোর্টিয়াস্‌-পরিকল্পিত দুইটি ধাঁধাঁ-পথ।
প্রথমটি, ৮ বৎসর বয়স্কদের জন্য এবং দ্বিতীয়টি, ১৪ বৎসর বয়স্কদের জন্য। প্রতি ক্ষেত্রে 'S' চিহ্নিত স্থান হইতে সুরু করিয়া খোলাপথে বাহিরে আসিতে হইবে।

গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন পোর্টিয়াস্‌ (S. D. Porteus)। তিনি ৩ হইতে ১২ এবং ১৪ বৎসর পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সের উপযুক্ত ধাঁধাঁ-পথ

(maze-path) রচনা করিয়াছিলেন। (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। তিনি বলেন যে, এই পরীক্ষার দ্বারা 'বিচক্ষণতার পরিচায়ক এইরূপ পূর্ব-প্রকল্পিত কার্য করিবার ক্ষমতা' (ability for prudent and pre-considered action) বিচার করা যায়।[২৫]

(গ) সংখ্যা-শ্রেণী (number-series)-এর মধ্যে সম্বন্ধ নির্ধারণের জন্য পরীক্ষণ-পাত্রকে একটি সংখ্যা-শ্রেণীকে বিস্তৃত (expand) করিতে বলা যাইতে পারে ; যেমন,

"৩, ৬, ১০, ১৫, ২১......এই সংখ্যাগুলির মধ্যে যে সম্বন্ধ বিদ্যমান তাহার আলোকে উহাকে আরও তিন ঘর বিস্তৃত কর।"

পরিণতবয়স্কদের বুদ্ধি-পরীক্ষা—ওয়েক্‌স্‌লের-বেলেভ্যু পদ্ধতি ঃ

এখন প্রশ্ন হইল ঃ পরিণতবয়স্ক (adult)-দের বুদ্ধি পরিমাপের জন্য প্রশ্নের মান কিরূপ হইবে? বিনে-সিমোঁ, স্টানফোর্ড-বিনে বা কুহ্‌ল্‌মান্-বিনে পদ্ধতি সাধারণতঃ শিশু ও বালক-বালিকাদের জন্য উদ্ভাবিত হইয়াছিল। শিশুদের জন্য যে সব প্রশ্নাবলী রচিত হইয়াছিল, পরিণত বয়স্কদের সেইরূপ প্রশ্ন করিলে তাহারা পরীক্ষকদের সহিত সহযোগিতা করে না। এইজন্য নিউ ইয়র্কের বেলেভ্যু সাইকিয়াটিক হস্‌পিটালের (Bellevue Psychiatric Hospital-এর) ডাঃ ডেভিড্ ওয়েক্‌স্‌লের (Dr. David Wechsler) কতকগুলি পরীক্ষা-পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। ইহা **ওয়েক্‌স্‌লের-বেলেভ্যু পদ্ধতি** (Wechsler-Bellevue Test) নামে পরিচিত।

এই পরিকল্পনা অনুসারে যে সব পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় তাহাদের দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—বাচিক (verbal) ও কৃতি (performace)-সম্বন্ধীয়। এই সব পরীক্ষা দ্বারা সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যের বিচার করা হয় ঃ

(ক) সাধারণ জ্ঞান (common information and knowledge) ;

(খ) বোধ-শক্তি বা অবধারণের ক্ষমতা (understanding or comprehension) [প্রশ্নোত্তরের বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে ইহা বিচার করা যাইতে পারে] ;

(গ) সংখ্যা সম্বন্ধে স্মৃতি-প্রসর (memory span for series of numbers) ;

২৫ *Journal of Psycho-Aesthenics*, Vol. 19 (S. D. Porteus-রচিত প্রবন্ধ) দ্রষ্টব্য।

(ঘ) সাদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞান (knowledge of similarities) [এক এক জোড়া পদ (pair of words) লইয়া ইহা পরীক্ষা করা যায়] ;

(ঙ) যুক্তির প্রকাশ [অঙ্কশাস্ত্রের মৌখিক প্রশ্নের দ্বারা ইহা পরীক্ষা করা হয়।] (Reasoning shown in the mental solution of arithmetic problems presented orally by the examiner) ;

(চ) কতকগুলি অপূর্ণ বা অসমাপ্ত ছবির অসম্পূর্ণ অংশ (missing parts) দেখাইবার ক্ষমতা ;

(ছ) সুসংবদ্ধ কাহিনী প্রকাশ করিতে পারে এইভাবে কতকগুলি ছবি সাজান ;

(জ) বিভিন্ন অংশের সমন্বয়ে একটি 'হাত', 'মুখ', 'মানুষ', ইত্যাদি তৈয়ার করিতে পারা ;

(ঝ) বিভিন্ন প্রকারের রঙীন কাষ্ঠখণ্ড (cubes) সহযোগে বিভিন্ন 'ডিজাইন' গঠন ;

(ঞ) অনুষঙ্গের মাধ্যমে শিক্ষণের ক্ষমতা ;

(ট) বিভিন্ন পদের সংজ্ঞাদান।

সেনা-বাহিনীতে প্রচলিত প্রথা :

এপর্যন্ত আমরা যে-সব পরীক্ষার উল্লেখ করিলাম, সেগুলি এক এক জন ব্যক্তির ক্ষেত্রে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু এমন অনেক পরিস্থিতি আছে, যেখানে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ব্যক্তির পরীক্ষা করা কষ্টসাধ্য ; এই সকল ক্ষেত্রে সঙ্ঘবদ্ধভাবে অনেক লোককে একত্রে পরীক্ষা করিয়া তাহাদের মান নির্ধারণ করা যায়। ইহাকে বলা হয় **সঙ্ঘাভীক্ষণ বা সঙ্ঘ-পরীক্ষা** (Group Test)।[২৬]

২৬ সঙ্ঘ-পরীক্ষা (Group Test)-এর একটি দোষ হইল যে, ইহাতে পরীক্ষক ব্যক্তি-বিশেষের কোন অসুবিধা (যেমন, ক্লান্তি, অবসাদ, ভীতি) ইত্যাদির প্রতি মনোযোগ দান করিবার কোন অবসর পান না ; তাহা ছাড়া, সকল ব্যক্তিই সঙ্ঘ বা গোষ্ঠীর মধ্যে নিজের বুদ্ধির প্রকৃত পরিচয় দিতে পারে না। তবে এই প্রকার পরীক্ষার সুবিধা হইল যে, এইরূপ পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করিলে ব্যক্তি-বিশেষের অন্যের সহিত সহযোগিতার ক্ষমতা আছে বুঝা যায়। Pintner বলেন : 'The group test is not as pure a measure of intelligence as the individual test. The group test contains in its score not only a measure of the intelligence of the individual, but also a measure of his willingness to co-operate and put forth his best effort... Each is good for its particular purpose." (*Intelligence Testing*, p. 183).

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কয়েক সহস্র সৈন্যকে তাহাদের বুদ্ধি অনুযায়ী শ্রেণী-করণের প্রয়োজন হয়। এইজন্য দুই প্রকার পরীক্ষা-পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়; একটির নাম **আর্মি আল্‌ফা** (Army Alpha) এবং আর একটির নাম **আর্মি বিটা** (Army Beta)—প্রথমোক্তটি শিক্ষিতদের জন্য এবং দ্বিতীয়টি অশিক্ষিতদের জন্য

'আর্মি আল্‌ফা'-তে **আট প্রকার** বিষয় পরীক্ষা করা হইত ; যথা—

(ক) পরীক্ষকের .আদেশ অনুসারে একটি বিশেষ দিকে কোন কিছু অঙ্কন ; (খ) সাধারণ জ্ঞানের ছোট অঙ্ক কষা ; (গ) ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিচার (practical judgment) ; (ঘ) প্রতিশব্দ এবং বিপরীত শব্দ বিচার-ক্ষমতা ; (ঙ) অসংবদ্ধ পদসমষ্টিকে সুসংবদ্ধ বাক্যে আনয়ন ; (চ) কোন বিশেষ নির্দেশক্রমে একটি সংখ্যা-শ্রেণী পূরণ : (ছ) উপমা-লব্ধ জ্ঞান ; (জ) সাধারণ জ্ঞান।

যুদ্ধের পর এই সব পরীক্ষা বিভিন্ন শিক্ষা-কেন্দ্রে ছাত্র-ছাত্রীর ভিন্ন ভিন্ন দলের উপর প্রযুক্ত হয়।

'আর্মি বিটা'-তে **সাত প্রকার** বিষয় পরীক্ষা করা হয়। ইহাতে ধাঁধাঁপথ আবিষ্কার, অসম্পূর্ণ ছবি সম্পূর্ণ করা, জ্যামিতিক চিত্র-গঠন ইত্যাদি সম্বন্ধে কৃতি-পরীক্ষা করা হয়।[২৭]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই সব পরীক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার সাধন করিয়া এক নূতন পদ্ধতি প্রচলিত করা হয়। ইহাকে **সৈন্যবিভাগীয় সাধারণ মান নির্ধারক পরীক্ষা** (Army General Classification Test, সংক্ষেপে AGCT) বলা হয়। ইহাতে বাচিক অবধারণ (Verbal Comprehension), পরিমাণ সম্বন্ধীয় ব্যাপারে যুক্তির প্রয়োগ (quantitative reasoning) এবং দেশ-প্রত্যক্ষ (spatial perception)-এর ক্ষমতা এই তিন বিষয়ে ১৫০টি পরীক্ষা করা হয়।

(গ) পরীক্ষা-পদ্ধতির আদর্শ নির্ধারণ (Determination of Standard Tests) :

আমরা বর্তমান অনুচ্ছেদে বিবিধ পরীক্ষা-পদ্ধতি আলোচনা করিলাম—

২৭ এই পদ্ধতিদ্বয় ১৯১৭-১৮ সালে ১,৭৫০,০০০ ব্যক্তির উপর প্রযুক্ত হইয়াছিল। ইহার ফলে প্রায় ৮,০০০ ব্যক্তিকে অযোগ্যতা হেতু কর্মচ্যুত করিতে বলা হয় ; ১০,০০০ ব্যক্তিকে স্বল্প বুদ্ধির প্রয়োজন এরূপ কার্যে নিযুক্ত করিতে বলা হয় এবং আরও ১০,০০০ লোককে বিশেষ প্রকার শিক্ষা দিবার কথা বলা হয়।

ইহা ছাড়া, নানা মনোবিৎ নানাবিধ পদ্ধতির কথা বলিয়াছেন। এখন প্রশ্ন হইল, এই সব পদ্ধতির যাথার্থ্য কিভাবে নির্ধারণ করা যায়? যে-সব প্রশ্ন পরীক্ষণ-পাত্রকে করা যায় বা যে-সব কার্য তাহাকে করিতে দেওয়া হয়, সেগুলি সাধারণ অবস্থায় ঐ বয়সের সকলে জানে কি না তাহা নির্ধারণ না করিয়া বুদ্ধির বৈজ্ঞানিক বিচার করা সম্ভব নয়। যেমন, ভারতীয় পরিবেশে যে শিশু বিচরণ করে এবং লালিত-পালিত হয়, তাহার যে-সব বিষয় জানা আছে, ইউরোপীয় পরিবেশে যে লালিত-পালিত হয়, তাহার সে সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিতে পারে; সেইরূপ, যে সহরে বাস করে তাহার জ্ঞানের পরিধি গ্রামবাসকারীর জ্ঞানের পরিধি হইতে পৃথক্।[২৮] সুতরাং **যাহাকে পরীক্ষা করা হইতেছে তাহার অনুরূপ অবস্থায় সাধারণভাবে তাহার সমপর্যায়ভুক্তদের কী জানা উচিত,** তাহা না জানিয়া পরীক্ষা-পদ্ধতির মান নির্ধারণ করা যায় না।

পরীক্ষা-পদ্ধতির আদর্শীকরণ (standardization[২৯])-এর জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা হয়:

(ক) **যাথার্থ্য বা সত্যতা** (Validity)—বুদ্ধি-পরিমাপের যে প্রশ্ন-তালিকা বা কার্যতালিকা রচিত হয়, দেখিতে হইবে যে তাহা যেন **বুদ্ধিরই** পরিমাপ করিতেছে—বুদ্ধি-পরীক্ষার নামে উহা যেন অন্য কোন প্রলক্ষণ (যেমন, আবেগ-প্রবণতা ইত্যাদি) পরিমাপ না করে। ইহা ব্যতীত অন্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে; যেমন,

(১) প্রকৃত বয়সের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া যেন পরীক্ষা-প্রশ্ন ইত্যাদি রচিত হয় (কারণ সাধারণ বিশ্বাস এই যে, কিছু দূর পর্যন্ত বয়সের অনুপাতে বুদ্ধি বৃদ্ধি পায়);

(২) পরিচিত বিভিন্ন দলের বা গোষ্ঠীর উপর প্রয়োগ করিয়া পরীক্ষা-পদ্ধতির ফলাফল দেখিতে হইবে। সাধারণতঃ যাহারা বুদ্ধিমান্ এবং যাহারা স্বল্পবুদ্ধি

---

২৮ Garrett বলিয়াছেন, "Psychologists have been well aware that intelligence tests do not measure 'innate' ability completely divorced from the influences of environment. They believe that a comparison of the mental ages of two children is valid *only* when both children have had approximately the same schooling and the same common background of experience." (*Great Experiments in Psychology*, p. 233).

২৯ পিন্‌টনার 'standardization' পদের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দিয়াছেন: "By standardization we mean the establishment of a certain definite method of giving a test and establishment of adequate forms for the interpretation of them."

বলিয়া পরিচিত, এই উভয় দলের উপর একই পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া যদি ফলাফলের বিশেষ পার্থক্য না পাওয়া যায়, তাহা হইলে বলা যায় যে, ঐ পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ; কিন্তু যদি উহার বিপরীত হয়, অর্থাৎ স্বল্পবুদ্ধিদের সাফল্যাঙ্ক (score) কম হয় এবং বুদ্ধিমান্‌দের সাফল্যাঙ্ক বেশী হয়, তাহা হইলে ঐ পদ্ধতি যথার্থ বলা যায়।

অবশ্য ইহার অসুবিধা হইল যে, আমরা যাহাদের স্বল্পবুদ্ধি বলিয়া পূর্ব হইতে মনে করি, তাহারা প্রকৃতই স্বল্পবুদ্ধি কি না সে বিষয় কি ভাবে সুনিশ্চিত হইতে পারি তাহা বলা কঠিন।

(৩) এই প্রসঙ্গে শিক্ষকের বিচার এবং বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফলও বিচার করিতে হইবে; অর্থাৎ যদি পরীক্ষা-পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত সাফল্যাঙ্কের সহিত বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বিচার এবং সাধারণ পরীক্ষার ফলের পারম্পর্য (correlation) থাকে, তাহা হইলে বুদ্ধি-পরীক্ষা-পদ্ধতি যথার্থ বলিয়া ধরিতে পারা যায়।[৩০]

(৪) বৈজ্ঞানিক মহলে স্টান্‌ফোর্ড-বিনে পদ্ধতিকে আদর্শরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং নূতন কোন পদ্ধতির যাথার্থ্য বিচার করিতে হইলে উহার মাধ্যমে প্রাপ্ত সাফল্যাঙ্কের সহিত স্টান্‌ফোর্ড-বিনে পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত সাফল্যাঙ্কের পারম্পর্য আছে কি না দেখিতে হইবে।

(খ) **নির্ভরযোগ্যতা** (Reliability)—যদি কোন পরিমাপের আদর্শ সর্বদা পরিবর্তনশীল হয়, তাহা হইলে তাহার উপর নির্ভর করা যায় না। যেমন, একই দৈর্ঘ্যের বস্তুকে যদি তথাকথিত একই মানের বিভিন্ন ফিতা দিয়া বিভিন্ন বার মাপিয়া বিভিন্ন ফল পাওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ মান নির্ভরযোগ্য নহে, সেইরূপ যদি একই প্রকারের বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত একই ব্যক্তির সাফল্যাঙ্ক-সমূহের পারম্পর্য না থাকে, তাহা হইলে উহারা নির্ভরযোগ্য নহে।[৩১]

(গ) **নৈর্ব্যক্তিকতা** (impartiality বা objectivity)—পরীক্ষকের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী বা ব্যক্তিগত অভিমত যেন তাঁহার মাপকাঠি বিকৃত না

৩০ অবশ্য বিদ্যালয়ে বা কোন শিক্ষকের নিকট পাঠকারী বালক-বালিকাদের ক্ষেত্রেই ইহা প্রযোজ্য।

৩১ অনেকে মনে করেন যে, এই পারম্পর্য (correlation) যদি ০·৯০ বা তাহার অধিক হয়, তাহা হইলে ঐ পরীক্ষা-পদ্ধতিগুলি গ্রহণযোগ্য।

করে। যেমন, পরীক্ষক যদি প্রথম হইতেই এই ধারণা লইয়া আরম্ভ করেন যে, অমুক জাতের লোক বা অমুক ব্যক্তির পুত্র বা কন্যার বিশেষ কোন বুদ্ধি থাকিতে পারে না, তাহা হইলে তিনি সাফল্যাঙ্কের যে বিচার করিবেন তাহা গ্রহণযোগ্য নহে।

মোট কথা, পরীক্ষা-পদ্ধতির জন্য নির্বাচিত প্রশ্নাবলীর সত্যতা ও নির্ভর-যোগ্যতা থাকাই যথেষ্ট নহে—পরীক্ষকের একটা নিরপেক্ষ ও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা উচিত।

৪। বুদ্ধির পরিমাপ (Measurement of Intelligence):

(ক) বুদ্ধ্যঙ্ক-নির্ধারণ (Determination of I. Q.):

পূর্ব অনুচ্ছেদে আমরা বহুবিধ পরীক্ষা-পদ্ধতি আলোচনা করিয়াছি। এখন প্রশ্ন হইল: কি ভাবে বুদ্ধির পরিমাপ করিয়া উহার ফল প্রকাশ করা যাইবে ?

টারম্যান যখন বিনে-পদ্ধতির সংস্কার করেন, তখন তিনি এক উপায় উদ্ভাবন করেন। তাঁহার মতে, যে ব্যক্তি যে বয়সের উপযুক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে, তাহাই হইল তাহার **মানসিক বয়স** (mental age, সংক্ষেপে M. A.)। মানসিক বয়সকে প্রকৃত বয়স (chronological age, সংক্ষেপে C. A.) দ্বারা ভাগ করিলে যে ভাগফল হয়, তাহাকে বলে **বুদ্ধ্যঙ্ক** (Intelligence Quotient,[৩২] সংক্ষেপে I. Q.)—ইহাই বুদ্ধির পরিমাণের নির্দেশক। অর্থাৎ,

$$\text{বুদ্ধ্যঙ্ক (I. Q.)} = \frac{\text{মানসিক বয়স (M. A.)}}{\text{প্রকৃত বয়স (C. A.)}} \times ১০০$$

[সাধারণতঃ বুদ্ধ্যঙ্ক, অর্থাৎ, ভাগফল দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ না করিয়া উহাকে ১০০ দ্বারা গুণ করা হয়]।

(ক) ধরা যাউক, একটি ৮ বৎসরের বালকের বুদ্ধি পরীক্ষা করা হইবে। সে ৮ বৎসরের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দান করিতে সক্ষম হইল, কিন্তু ৮-এর ঊর্ধ্ব বয়স্কদের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নাবলীর উত্তর দিতে পারিল না। সুতরাং তাহার বুদ্ধ্যঙ্ক (I. Q.) হইবে: $\frac{\text{M.A.}}{\text{C.A.}}$ বা $\frac{৮}{৮} \times ১০০ = ১০০$।

(খ) কিন্তু যদি ঐ বালক মাত্র ৬ বৎসরের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিতে

৩২ স্টের্ণই বোধ হয় মানস-প্রচয় (mental development)-এর প্রকাশক হিসাবে Intelligence Quotient-পদটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন।

পারে এবং যদি ঐ মানের উপর উঠিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার প্রকৃত বয়স ৮ হইলেও মানসিক বয়স হইবে মাত্র ৬ এবং তাহার বুদ্ধ্যঙ্ক হইবে : $\frac{M.A.}{C.A.}$ বা $\frac{৬}{৮}$ × ১০০ = ৭৫।

(গ) আবার যদি ঐ বালক ৮ বৎসরের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর ত' দিতেই পারে, তাহা ছাড়া ১০ বৎসর বয়স্কদের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নের পর্যন্ত উত্তর দিতে পারে, তাহা হইলে তাহার প্রকৃত বয়স ৮ বৎসর হইলেও মানসিক বয়স হইবে ১০, এবং বুদ্ধ্যঙ্ক (I. Q.) হইবে :

$$\frac{M.A.}{C.A.} \text{ বা } \frac{১০}{৮} \times ১০০ = ১২৫।$$

যদি বুদ্ধ্যঙ্ক ১০০-কে সাধারণ মান হিসাবে ধরা হয়, তাহা হইলে উদাহরণ (ক)-এর ক্ষেত্রে বালকটিকে বলা হইবে, সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন; (খ)-এর ক্ষেত্রে বলা হইবে, বালকটি স্বল্প-বুদ্ধি এবং (গ)-এর ক্ষেত্রে বলা যায় যে, বালকটি অধিক বুদ্ধিশালী।[৩৩]

(খ) বুদ্ধির বণ্টন (Distribution of Intelligence) :

বহু শিশুকে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, **প্রতি বয়ঃপর্যায়ে মোটা-মুটি একই অনুপাতে** বুদ্ধ্যঙ্ক ১০০-এর নিম্নে ও ঊর্ধ্বে **বণ্টিত** থাকে। এ বিষয়ে টার্‌মান্ ইত্যাদি [৩৪] যে অনুসন্ধান চালান, তাহার ফলাফল নিম্নরূপ :

১০০-এর নিম্নে বুদ্ধ্যঙ্ক	কয় জনের ?	১০০-এর ঊর্ধ্বে বুদ্ধ্যঙ্ক
৭০ বা উহার নিম্নে	←১%→	১৩০ বা উহার উপরে
৭৩ ,, ,, ,,	←২%→	১২৮ ,, ,, ,,
৭৬ ,, ,, ,,	←৩%→	১২৫ ,, ,, ,,
৭৮ ,, ,, ,,	←৫%→	১২২ ,, ,, ,,
৮৫ ,, ,, ,,	←১০%→	১১৬ ,, ,, ,,
* * *	* *	* * *

৩৩ যদি কাহারও প্রকৃত বয়স হিসাবে বৎসর ও মাস উভয়ই দেওয়া থাকে, তখন মানসিক বয়স ও প্রকৃত বয়সকে মাসে রূপান্তর করিতে হইবে। যেমন,

$$\frac{M.A.}{C.A.} = \frac{\text{৪ বঃ ৬ মাঃ}}{\text{৩বঃ ১০মাঃ}} = \frac{৫৪}{৪৬} \times ১০০ = ১১৭ \text{ (I. Q.)}$$

৩৪ *The Stanford Revision and Extension of the Binet-Simon Scale for Measuring Intelligence* দ্রষ্টব্য।

বুদ্ধি জনসাধারণ (population)-এর মধ্যে কি ভাবে বণ্টিত আছে, তাহা না জানিলে ব্যক্তি-বিশেষের বুদ্ধ্যঙ্কের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝা যায় না। যেমন, যদি বলা যায় যে, একজনের বুদ্ধ্যঙ্ক ৮০, তাহা হইলে ইহার কী অর্থ হয় ?

বুদ্ধির পৌনঃপুন্য-বণ্টন (frequency distribution) হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহা ১০০-এর নিম্নে ও ঊর্ধ্বে প্রায় সমভাবে বণ্টিত। নিম্নাঙ্কিত (২নং চিত্র) চিত্র হইতে জনসাধারণের মধ্যে বুদ্ধির বণ্টন বুঝা যাইবে :

২নং চিত্র
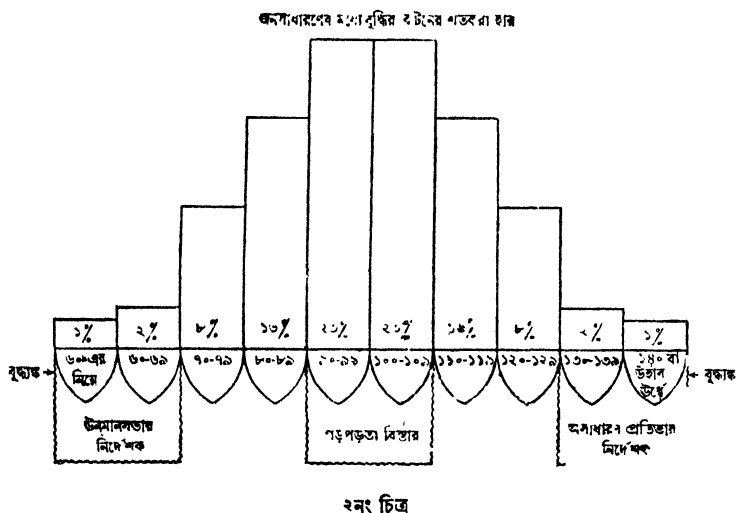
উপরের বিস্তার হইতে দেখা যায় যে, জনসাধারণের সর্বাধিক অংশের (শতকরা ২৩+২৩=৪৬) **বুদ্ধ্যঙ্ক** ৯০—১০৯ ; অতএব **ইহাকেই গড়পড়তা বিস্তার** (**average range**) বলা যায়।[৩৫]

এখন যদি বলা যায় যে, কাহারও বুদ্ধ্যঙ্ক ৮০, তাহা হইলে উহার অর্থ হইবে যে, জনসাধারণের শতকরা (১+২+৮) বা ১১ ভাগ লোক তাহা

৩৫ কেহ কেহ (যথা, Garrett) বলেন যে, ৪৮% লোকের বুদ্ধ্যঙ্ক হইল ৯০ হইতে ১০৯-এর ভিতর। (উপরে লিখিত বণ্টনের হার Woodworth, *Psychology* হইতে গৃহীত)।

অপেক্ষাও অধিকতর নিম্নবুদ্ধিশালী। আবার যদি বলা যায় যে, কাহারও বুদ্ধ্যঙ্ক ১২০, তাহা হইলে উহার অর্থ হইবে যে, জনসাধারণের শতকরা (৮+২+১) বা ১১ ভাগ তাহা অপেক্ষাও বেশী বুদ্ধিসম্পন্ন।

(গ) বুদ্ধ্যঙ্কের পরিমাণ অনুসারে শ্রেণীবিভাগ (Classification according to the degree of I. Q.) :

বিভিন্ন বুদ্ধ্যঙ্কের অধিকারী বিভিন্ন ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করা হয়।

আমরা উপরে দেখিলাম, **৯০ হইতে ১০৯** পর্যন্ত বুদ্ধ্যঙ্ক-বিশিষ্ট ব্যক্তিকে **স্বাভাবিক বুদ্ধি-সম্পন্ন** ব্যক্তি বলা যায় (যদিও আদর্শ স্বাভাবিকতার নির্দেশক বুদ্ধ্যঙ্ক হইল ১০০)।

৭০-বুদ্ধ্যঙ্কের নিম্ন অঙ্ক হইল **অস্বাভাবিকতার** স্পষ্ট নির্দেশক। ৭০—৮৯ পর্যন্ত বুদ্ধ্যঙ্ক-বিশিষ্ট ব্যক্তি সম্বন্ধে মন্তব্য করা নিতান্ত দুরূহ। এই গোষ্ঠীর কেহ কেহ স্বাভাবিক, আবার কেহ কেহ অস্বাভাবিক।

ঊনমানসতার বিভিন্ন স্তর :

৭০-এর নিম্ন বুদ্ধ্যঙ্কের অধিকারীকে **ঊনমানস** (feeble-minded) বলা হয়। ইহাদের আবার তিনভাগে ভাগ করা হয় :

(১) **জড়ধী** (idiot)—ইহাদের **বুদ্ধ্যঙ্ক ৩ হইতে ২৫**। ইহারা জীবনের সাধারণ বিপদ এড়াইতে পারে না; যেমন, কিছু না বুঝিয়াই ইহারা আগুনে হাত দিতে যায়, চলন্ত গাড়ীর সাম্‌নে দাঁড়ায়। ইহাদের উপর কঠোর দৃষ্টি না রাখিলে ইহাদের অপঘাতে মৃত্যু হইতে পারে। ইহাদের অনেকে নিজেরা জামা-কাপড় পরিতে জানে না, অনেকে দু'চারিটির বেশী কথা বলিতে পারে না, কেহ কেহ আবার ভাল করিয়া বসিতে পর্যন্ত শেখে না। পরিণতবয়সেও ইহারা দুই বৎসরের শিশুর তুল্য থাকে।

(২) **ক্ষীণধী** (imbecile)—ইহাদের **বুদ্ধ্যঙ্ক ২৬ হইতে ৫০**। ইহারা কিছু কথাবার্তা বলিতে পারে; অপরের পরিচালনায় ছোট ছোট কাজ (যেমন, বাগানে গর্ত করা, ঘরের মেঝে পরিষ্কার করা ইত্যাদি) ঠিকভাবে করিতে পারে। তবে অনেকে কিছুই পড়িতে শিখে না বা গণনা করিতে পারে না। যাহাদের বুদ্ধ্যঙ্ক একটু উচ্চ পর্যায়ের তাহারা

নিজেরা জামা-কাপড় পরিতে পারে, মুখ ধুইতে পারে। তবে তাহাদের আত্মনির্ভরশীল বলিয়া গণ্য করা যায় না। পরিণত বয়সেও ইহারা তিন বৎসরের শিশুর ন্যায় থাকে।

(৩) **অল্পধী** (moron)—**ইহাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৫১ হইতে ৭০**। ইহারা সামান্য কিছু লেখাপড়া শিখিতে পারে (তবে বিদ্যালয়ে ৪র্থ-৫ম মানের বেশী অগ্রসর হয় না)। ইহাদের অনেকে 'ধরাবাঁধা কাজ' (routine work)—যেমন, ছুতারের কাজ, যাঁতা চালানর কাজ বা গরু-ছাগল দেখার কাজ ইত্যাদি—করিতে পারে। ইহাদের উপর দৃষ্টি না রাখিলে ইহারা অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে পারে না; ইহাদের অনেকের নীতিবোধ জাগে না এবং অনেকে অপরাধপ্রবণ হইয়া পড়ে। পরিণতবয়সেও ইহারা ৭ হইতে ১৩ বৎসরের বালক-বালিকার তুল্য থাকে।

প্রতিভার বুদ্ধ্যঙ্ক ঃ

বুদ্ধ্যঙ্ক-নির্দেশক রেখার এক প্রান্তে যেমন ঊনমানসদের স্থান দেওয়া হয়, সেইরূপ অপর প্রান্তে স্থান দেওয়া হয় **প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের** (**gifted person** বা **genius**)।

ঠিক কোন্ অঙ্কে ইহাদের সীমানা আরম্ভ, তাহা নির্দেশ করা কঠিন।[৩৬] এ-বিষয়ে টার্‌মান্ ও তাঁহার সহকর্মিগণ ১৯২১ সালে ১৫০০ বালক-বালিকা লইয়া পরীক্ষা করেন; তাঁহারা ১৩০ হইতে ১৪০ বুদ্ধ্যঙ্ক-বিশিষ্ট বালক-বালিকাদের মধ্য হইতে ইহাদের নির্বাচন করেন এবং পরিণত-বয়সের প্রারম্ভ পর্যন্ত ইহাদের পর্যবেক্ষণ করেন।

৩৬ টার্‌মানের ভাষায়: "There is no point of which we can say, *except arbitrarily,* that above it the children are gifted and below it not gifted. ...On the whole, it seems best to draw our arbitrary line at 130 or 140 I. Q." (*Readings in Psychology,* Ed. by C. E. Skinner, p. 132).

বিভিন্ন মনীষীর জীবনী আলোচনা করিয়া সি. এম্. কক্স (C. M. Cox) তাঁহাদের বুদ্ধ্যঙ্কের আনুমানিক তালিকা রচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে দার্শনিক মিলের বুদ্ধ্যঙ্ক ১৯০, লাইব্‌নিৎসের ১৮০, হিউমের ১৫৫, কবি গোয়েটের ১৮৫, ওয়ার্ডসওয়ার্থের ১৫০, কোল্‌রিজের ১৭৫ ইত্যাদি। (*Genetic Studies of Genius* দ্রষ্টব্য।)

পিন্‌ট্‌নার ইত্যাদি বলেন যে, প্রতি ১০,০০০-এ গড়ে একজনের বুদ্ধ্যঙ্ক ১৬০, ৮ জনের ১৫২, ৭০ জনের ১৪০......(Pintner, Dragositz, Kushner, *Supplementary Guide for the revised Stanford-Binet* দ্রষ্টব্য)।

টার্‌মান্‌ প্রমুখ মনোবিদ্‌গণ পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখেন যে, প্রতিভাশালী বালক-বালিকাদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য (যথা, ওজন, উচ্চতা, সাধারণ স্বাস্থ্য), চাল-চলন, সামাজিক পরিবেশের সহিত প্রতিযোজনের ক্ষমতা ইত্যাদি সাধারণ (average) বালক-বালিকা অপেক্ষা বেশী ছিল। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, প্রতিভাশালী বালক-বালিকা অনেক সময় দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয় বা সমাজে বিশেষ মেলা-মেশা করিতে পারে না, এই প্রচলিত বিশ্বাস ঠিক নহে। বরং **বুদ্ধির প্রাখর্যের সহিত সুন্দর স্বাস্থ্য, সামাজিক প্রতিযোজনের ক্ষমতা** (social adaptability) এবং **জননায়কত্বের শক্তি** (leadership)-**এর সহ-অবস্থিতির সম্ভাবনা আছে।**

বুদ্ধ্যঙ্ক অনুসারে শ্রেণী-বিভাগের প্রয়োজনীয়তা এই যে, স্বাভাবিক বুদ্ধি-বিশিষ্টদের দলে থাকিয়া উনমানস কিছুই শিখিতে পারিবে না এবং ঐ স্তরের জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষায় তাহাদের কোন উপকার হইবে না। আবার প্রতিভাশালী শিশুরা যদি স্বাভাবিকদের দলে থাকে, তাহা হইলে অন্যে তাহাকে বুঝিতে পারিবে না—'অতিরিক্ত পাকা' ছেলে বলিয়া তাহাকে ব্যঙ্গ করিবে এবং সে নিজেও তাহার অপেক্ষা নিম্নস্তরভুক্তদের মধ্যে নিজেকে সকল সময় মানাইয়া লইতে পারিবে না। এই কারণে এই উভয় দলীয়দের জন্যই বিশেষ বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন।

(ঘ) বুদ্ধ্যঙ্কের অপরিবর্তনীয়তা (Constancy of I. Q.):

বিভিন্ন অর্থে বুদ্ধ্যঙ্ক 'অপরিবর্তনীয়' বলা চলে :

(১) প্রতি বয়ঃপর্যায়ে (age level-এ) স্বাভাবিক (normal) বা সমক (average) বুদ্ধ্যঙ্ক হইল ১০০—বয়ঃপর্যায়ের তারতম্য অনুসারে ইহা পরিবর্তিত হয় না।

(২) সকল বয়সের মধ্যে বুদ্ধির স্বাভাবিক বণ্টন (distribution) অপরিবর্তিত থাকিবে। ইহা না হইলে বুদ্ধ্যঙ্ক ৭৫, ১৩০ ইত্যাদির কোন স্থায়ী অর্থ হইত না।

(৩) আবার ব্যক্তি-বিশেষের (individual-এর) বুদ্ধ্যঙ্ক অল্প একটু বাড়িলে বা কমিলেও (যথা, ৫ হইতে ১০ অঙ্ক) মোটামুটি সমান[৩৭] থাকে, অর্থাৎ ইহা অপরিবর্তিত।

৩৭ "গাধা পিটে ঘোড়া করা যায় না"—এই বাংলা প্রবচনটি অনেকাংশে সত্য।

এক্ষেত্রে উড্ওয়ার্থ একটি বালিকার উদাহরণ দিয়াছেন। ছয় বৎসরের ভিতর তাহাকে বিভিন্ন সময় পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, তাহার বুদ্ধ্যঙ্ক '৮০'-কে কেন্দ্র করিয়া আছে। ঐ বিবিধ পরীক্ষার ফল এইরূপ :

	প্রকৃত বয়স		মানসিক বয়স		বুদ্ধ্যঙ্ক
প্রথম পরীক্ষা	—৬ বঃ ৮ মাঃ	...	৫ বঃ ৬ মাঃ	...	৮৩
দ্বিতীয় "	—৭ বঃ ১ মাঃ	...	৫ বঃ ৪ মাঃ	...	৭৫
তৃতীয় "	—৮ বঃ ২ মাঃ	...	৬ বঃ ১০ মাঃ	...	৮৪
চতুর্থ "	—৮ বঃ ৭ মাঃ	...	৭ বঃ ০ মাঃ	...	৮২
পঞ্চম "	—১২ বঃ ১০ মাঃ	...	৯ বঃ ১০ মাঃ	...	৭৭

অবশ্য ইহা অপেক্ষা বুদ্ধ্যঙ্কের বেশী ব্যতিক্রম দেখা দিয়াছে এমন উদাহরণও পাওয়া গিয়াছে। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, শৈশবে যে বুদ্ধির উজ্জ্বলতার পরিচয় দেয়, ভাবীকালে পরিণত বয়সেও সে বুদ্ধিমান্ থাকিবে আশা করা যায়।[৩৮]

(ঙ) প্রাপ্তবয়স্কদের বুদ্ধ্যঙ্ক-নির্ধারণ (Determination of the I. Q. of the Adults):

১৩ বৎসরের পর হইতে 'মানসিক বয়স' (mental age) এই প্রত্যয় (concept) বিশেষ অর্থবোধক থাকে না। তাহার পর বুদ্ধ্যঙ্ক-লাভের পার্থক্যও বেশী থাকে না; আমরা এমন কোন প্রশ্নাবলী রচনা করিতে পারি না যাহা সাধারণতঃ ২৮ বৎসর বয়স্কেরা পারিবে, কিন্তু ২৬ বৎসর বয়স্কেরা পারিবে না।

যদি ধরা যায় যে, মানসিক বয়স মোটামুটি ১৫ বৎসরের পর আর বাড়ে না, তাহা হইলে মানসিক বয়সকে প্রকৃত বয়স দ্বারা ভাগ করিয়া বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয় করা ঠিক হইবে না। কারণ, পূর্ববর্ণিত প্রথা অনুসারে ২০ বৎসর বয়সে একজনের বুদ্ধ্যঙ্ক হইবে $\frac{১৫}{২০}\times ১০০$ বা ৭৫, এবং ৪০ বৎসর বয়সে ঐ একই ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক ৩৭.৫ হইয়া যাইবে।

এইজন্য বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ধারণের সময় **প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে প্রকৃত বয়সের**

---

৩৮ Woodworth, *Psychology*, 12th Ed., pp. 116-117.

উড্ওয়ার্থ এক্ষেত্রে মন্তব্য করেন : "On the whole the ind vidual child's I. Q. remains fairly, though not absolutely, constant, and the bright child becomes the intelligent adult."

তুলনীয় : "Childhood shows the man, as morning shows the day."

(C. A.-এর) কোন **পরিবর্তন না করিয়া** উহা **সকল ক্ষেত্রেই ১৫ বৎসর** ধরা হয় ; **অর্থাৎ** প্রাপ্ত বয়স্কদের (১৬ বৎসর ও তাহার উর্ধ্বে) ক্ষেত্রে—

$$\textbf{বুদ্ধ্যঙ্ক} \text{ (I. Q.)} = \frac{\text{মানসিক বয়স (M. A.)}}{১৫} \times ১০০$$

আবার এই মানসিক বয়সের উর্ধ্বতম অঙ্ক কী হইতে পারে? এ-বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও বলা যায় যে, মানসিক বয়স সাধারণের ক্ষেত্রে (অর্থাৎ যাহাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৯০ হইতে ১১০) **১৫ বৎসর,** অতিস্বভাবীদের ক্ষেত্রে (বুদ্ধ্যঙ্ক ১১০-১২০) **১৮ বৎসর** এবং অধঃস্বভাবীদের ক্ষেত্রে (বুদ্ধ্যঙ্ক ৭০-৯০) **১৪ বৎসর।**

উপরে বর্ণিত আনুপাতিক ভগ্নাংশ দ্বারা বুদ্ধ্যঙ্ক প্রকাশের রীতি সকল ক্ষেত্রে গৃহীত হয় না। বিশেষতঃ প্রাপ্ত-বয়স্কদের ক্ষেত্রে এইভাবে বুদ্ধ্যঙ্ক-নির্ধারণ সকলে অনুমোদন করেন না।

এই সব ক্ষেত্রে **'শতকরা মান'-নির্ধারণ** (Percentile Rating) করা হয়। বিনে-পদ্ধতিতে হয়ত' একটি ছয়-বৎসরের শিশুকে পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় যে, সে ৭।৮ বৎসরের জন্য নির্দিষ্ট মানে পৌছিতে পারে কি না; এস্থলে কিন্তু ঐরূপ দেখা হয় না। একটি সঙ্ঘ বা দল (Group)-এর মধ্যে ব্যক্তি-বিশেষের কৃতি-অনুসারে তাহাকে সাফল্যাঙ্ক (score) দেওয়া হয় এবং ঐ অঙ্ক তাহার সমদলীয়দের সহিত তুলনা করিয়া দেখা হয়—ফলে সহজেই হিসাব করিয়া দেখা যায় যে, ব্যক্তি-বিশেষের কৃতি (performance) ঐ দলের শতকরা ৩০ জনের ন্যায়, অথবা ৭০ জনের ন্যায়, অথবা অন্য কিছু। ইহাতে বুঝা যায় যে, কৃতি নির্দেশক মান (Performance scale)-এ ব্যক্তি-বিশেষের স্থান (তাহার সমদলীয়দের তুলনায়) কোথায়।

অবশ্য এইরূপে মান নির্ধারণ করিয়া স্টানফোর্ড-বিনে-পদ্ধতি অনুসারে কত বুদ্ধ্যঙ্ক হইবে তাহা হিসাব করা যায়। ধরা যাউক্, একজনের মান দশম দশকেরও উর্ধ্বস্থানে, যেমন, ৯৮। ইহাতে বুঝা যায়, তাঁহার সমদলীয়দের শতকরা ২ জন তাহার উপরে আছে। আমরা পূর্বেই (পৃঃ ২১৬-এর চিত্র) বুদ্ধি-বণ্টনের হিসাবে দেখিয়াছি যে, মাত্র শতকরা ২ জনের বুদ্ধ্যঙ্ক ১৩০-এর উপরে থাকে। অতএব আলোচ্য ক্ষেত্রে যাহার স্থান ৯৮ (এবং যাহার উপরে ২% আছে), তাহার বুদ্ধ্যঙ্ক অন্ততঃ ১৩০।

ওয়েক্স্‌লের তাঁহার পদ্ধতি অনুসারে গৃহীত সাফল্যাঙ্কের মূল্য স্টান্‌ফোর্ড-বিনে-পদ্ধতির অঙ্কে প্রকাশ করিলে কত হয়, তাহার একটি তালিকা প্রণয়ন করিয়াছেন ; যেমন,

সাফল্যাঙ্ক ৯৮—বিভিন্ন বয়সে নিম্নলিখিত বুদ্ধ্যঙ্ক নির্দেশ করে :

বয়স	⟶	বুদ্ধ্যঙ্ক
২০ বৎসর	—	১০০
২৫ „	—	১০২
৩০ „	—	১০৪
৩৫ „	—	১০৬
....		
৫৫ „	—	১১৪

আবার সেনাবিভাগ প্রচলিত বুদ্ধি-পরীক্ষা পদ্ধতি অনুসারে প্রাপ্ত সাফল্যাঙ্ককে বিনে-পদ্ধতির অঙ্কে পরিণত করা যায়।[৩৯]

AGCT অনুসারে প্রাপ্ত সাফল্যাঙ্ককে পরিবর্তনের নিয়ম হইল ;
বুদ্ধ্যঙ্ক (I. Q.)=১০০+(০·৯[AGCT সাফল্যাঙ্ক—১০০])

আবার নৌ-বিভাগের GCT-অনুসারে প্রাপ্ত সাফল্যাঙ্ককে পরিবর্তনের নিয়ম হইল :

বুদ্ধ্যঙ্ক (I. Q.)=১০০+(১·৮[Navy GCT-সাফল্যাঙ্ক—৫০])

৫। বুদ্ধি ও আচরণ (Intelligence and Conduct) :

(ক) বুদ্ধি ও সাধারণ আচরণ (Intelligence and general behaviour) :

বুদ্ধির পরিচয় কার্যের মাধ্যমে। সুতরাং বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে আচরণের তারতম্য ঘটে। জগতে বিজ্ঞানের যে সমস্ত আবিষ্কার হইয়াছে, দার্শনিক মতাদি গঠিত হইয়াছে, সাহিত্যাদি রচিত হইয়াছে, তাহাদের মূলে যে উচ্চ পর্যায়ের বুদ্ধি ছিল, এ বিশ্বাস আমরা সকলেই করি।

আমরা ৪র্থ অনুচ্ছেদ (গ)-তে (পৃঃ ২১৭-১৮) দেখিয়াছি যে, বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে মানুষ কত বিভিন্ন আচরণ করে। আমরা পূর্ব আলোচনার পুনরুল্লেখ না করিয়া সংক্ষেপে এখানে বলিতে পারি যে, বুদ্ধির স্বল্পতা ঘটিলে ব্যক্তি-বিশেষের আচরণে দেখা দেয় জটিল কার্য করিবার অযোগ্যতা, নূতন শিখিবার অক্ষমতা, পুরাতন অভিজ্ঞতাকে

৩৯ F. L. Ruch, *Psychology and Life*, p. 205.

নূতন ক্ষেত্রে প্রয়োগের অপারগতা, সামাজিক পরিবেশের সহিত প্রতি-যোজনের শক্তির অভাব ইত্যাদি। সাধারণ বুদ্ধি থাকিলে বা উহার আধিক্য থাকিলে এইগুলি দূরীভূত হয়।[৪০] যাহারা প্রতিভাশালী বা অতি উচ্চ পর্যায়ের বুদ্ধির অধিকারী তাহাদের আচরণে নূতনত্বের উন্মেষ বা সৃজনীর প্রকাশ পাওয়া যায়।[৪১] 'সাধারণত্ব'-এর মানদণ্ডে আমরা ইহাদের বিচার করি বলিয়া শৈশবে ইহাদের আচরণ 'অদ্ভুত' বলিয়া মনে হয়।

(খ) বুদ্ধি ও অপরাধপ্রবণতা (Intelligence and Delinquency) :

আমরা উপরে বুদ্ধি ও সাধারণ আচরণের সম্পর্কের ইঙ্গিত করিলাম। এখন প্রশ্ন হইল : বুদ্ধির সহিত নৈতিক আচরণের সম্পর্ক কী? বিশেষতঃ **বুদ্ধির সহিত অপরাধপ্রবণতার কোন যোগ আছে কি?**

এই প্রশ্নের উত্তরে কোন সুনির্দিষ্ট মত দান করা দুরূহ।

বুদ্ধি-পরীক্ষা-পদ্ধতিগুলি প্রথম প্রচলিত হইবার কালে বিশ্বাস করা হইত যে, বুদ্ধির স্বল্পতার সহিত অপরাধপ্রবণতার ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে। ইহার কারণস্বরূপ আবার অনেকে বলিতেন যে, যাহাদের বুদ্ধি অল্প, তাহারা সহজেই অভিভাবনের (suggestion-এর) অধীন হইয়া পড়ে—তাহাদের ভাল-মন্দ বিচার-ক্ষমতা থাকে না এবং ফলে না বুঝিয়াই অপরের কুপরামর্শে তাহারা চালিত হয়।[৪২]

সকল ক্ষেত্রে কিন্তু এই কারণ প্রদর্শন করা যায় না; কারণ অপরাধী মাত্রই না বুঝিয়া বা অপরের পরামর্শে দুর্বোধের ন্যায় কার্য করে, এরূপ কথা সকল সময় বলা চলে না। তাহা ছাড়া অনেক অপরাধই পূর্ব-প্রকল্পিত এবং

---

৪০ Knight বলিয়াছেন : "Regarding...relations between intelligence and character, there is some evidence that the bright person is more willing to take the lead, more eager to break new ground, and more disposed to talk than the person of average intelligence. It also seems evident that intelligence is positively correlated with freedom from mental inertia. The highly intelligent person is active and he can pass from one task or train of thought to another with rapidity and ease." (*Op. cit.*, p. 83)

৪১ তুলনীয় : "প্রজ্ঞা নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা।"

যাহাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১৮০—এর উপর তাহাদের সম্বন্ধে শ্রীমতী হলিংওয়ার্থ মন্তব্য করিয়াছেন :

"They are the truly original thinkers and doers of their generation." (*Children Above 180 I. Q.* দ্রষ্টব্য)।

৪২ Knight বলেন : "The born simpleton falls into crime, for crime is, after all, just a stupid way of compassing one's ends." (*Op. cit.*, p. 83).

উদ্দেশ্য-প্রণোদিত এবং উহা সাধন করিবার জন্য যথেষ্ট বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। সুতরাং বুদ্ধির স্বল্পতা সকল ক্ষেত্রে অপরাধের কারণ, ইহা বলা চলে না।[৪৩]

বুদ্ধি-পরীক্ষা-পদ্ধতির উদ্ভাবনের প্রথম যুগে অপরাধ ও উনমানসতার মধ্যে প্রত্যক্ষ ও গভীর সংযোগের কথা বলা হইত; কিন্তু তখন বুদ্ধি-পরীক্ষা-পদ্ধতির যথেষ্ট উন্নতিসাধন করা হয় নাই এবং তাহার জন্য তখনকার দিনে প্রাপ্ত ফলাঙ্ক খুব নির্ভরযোগ্য নহে।

তাহা ছাড়া, অপরাধীদের মধ্যে যাহারা ধরা পড়ে তাহাদেরই বুদ্ধি-পরীক্ষার সুযোগ পাওয়া যায়। এইজন্য অনেকে বলেন যে, যাহারা বুদ্ধিমান্ তাহারা এরূপ সুকৌশলে কার্য সিদ্ধ করে যে তাহারা ধরা পড়ে না। সুতরাং অধিক বুদ্ধিশালী ঠিক কি পরিমাণ অপরাধ করে তাহা অনেক ক্ষেত্রে নাও জানা যাইতে পারে।[৪৪]

এ বিষয়ে বিভিন্ন লেখক যে সব উপাত্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাদের কয়েকটি নিম্নে[৪৫] প্রদত্ত হইল ঃ

পর্যবেক্ষক	অপরাধীর সংখ্যা	উনমানসের শতকরা হার
হিল্ (Hill) ও গড্ডার্ড (Goddard)	৫৬	৯৩
গিফোর্ড (Gifford) ও গড্ডার্ড	১০০	৬৬
ব্রিজ্মান (Bridgman)	১১৮	৮৯
ওটিস্ (Otis)	১৭২	৭৫
পাইল (Pyle)	২৪০	৬৬
	৫৮৬ (বালিকা)	৭২
ক্রেন (Crane)	৪০৯ (বালক)	৩৯
....	....	....
ব্রোনার (Bronner)	৫০৫	৯-১১
হিলি (Healy) ও ব্রোণার	৪,০০০	১৩
বার্ট (Burt)	১৯৭	৮
ফাবের (Faber) ও রিটার (Ritter)	১১০	১৪

৪৩ Goddard প্রথমে বলিতেন যে, অপরাধীদের মধ্যে শতকরা ৫০ জনই উনমানস (feeble-minded) ; পরে তিনি এই মত প্রত্যাহার করেন।

৪৪ Pintner (পিন্ট্নার) বলেন : "In general it has been found that the percentage of feeble-mindedness increases as we go from the unconvicted to the convicted delinquents. The feeble-minded individual is more likely to be caught and convicted than is the individual possessing a greater amount of intelligence." (*Intelligence Testing*, p. 378).

৪৫ Pintner, *loc. cit.*, pp. 375-376.

উপরের তালিকায় মধ্যবর্তী রেখার উর্ধ্বে যে সকল লেখকের উপাত্ত দেওয়া হইল, তাঁহাদের মতে অপরাধ ও উনমানসতার মধ্যে পারম্পর্য (correlation) অধিক; আবার মধ্যবর্তী রেখার নিম্নে যাঁহাদের উপাত্ত দেওয়া হইল তাঁহাদের মতে উহা নিতান্ত কম।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উনমানসতার সহিত অপরাধ-প্রবণতার সুনির্দিষ্ট কোন পারম্পর্য পাওয়া যায় না। উনমানসদের ভিতর যাহারা সর্বনিম্নস্তরের (যেমন, জড়ধী) তাহারা বোধ হয় অপরাধমূলক কার্য করিতে সক্ষম নয়। কিন্তু যাহারা একটু উচ্চ পর্যায়ের (অর্থাৎ **যাহাদের বুদ্ধ্যঙ্ক** ৫১—৭০ এবং যাহাদের moron বা 'অল্পধী' বলা হয়), **তাহাদের ভিতর অপরাধ-প্রবণতার সম্ভাবনা আছে।**[৪৬] ইহার অর্থ অবশ্য এই নহে যে, অল্পধী মাত্রই অপরাধী হইবে। তবে এই জাতীয় ব্যক্তিদের মধ্যে চৌর্যবৃত্তি, চুক্তিভঙ্গ, প্রতারণা, যৌন-অপরাধ ইত্যাদি দেখা যায়।[৪৭]

যদিও উনমানসতার সহিত অপরাধের পারম্পর্য নাই, তাহা হইলেও ইহা দেখা গিয়াছে যে, অপরাধীদের বুদ্ধি অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অঙ্কের নিম্নে। তাহাদের বুদ্ধ্যঙ্ক যদিও উনমানসতার স্তরে নামিয়া যায় নাই, তাহা হইলেও উহা স্বাভাবিক স্তরের নিম্নে—তাহাদের অনেকের বুদ্ধ্যঙ্ক ৭০-এর নীচে না নামিলেও উহা ৯০-এর নীচে।

কয়েকজন লেখক কর্তৃক প্রদত্ত অপরাধীদের গড়পড়তা বুদ্ধ্যঙ্ক (average I. Q.) নিম্নে প্রদত্ত হইল[৪৮]:

---

৪৬ বার্ট ইহার কারণ অনুমান করিয়াছেন: "The defective child is without the necessary insight to perceive for himself, or to hold effectively in his mind, that what tempts him is dishonest, and that dishonesty is wrong." (*The Young Delinquent*, p. 301). (Quoted by Knight).

৪৭ Ruch বলেন: "Adult morons have normal drives and emotions, but lack the capacity of the more intelligent person to foresee the consequence of their emotional behavior—for example, the frequency of illegitimate motherhood is highest among moron girls. Many morons become juvenile delinquents, prostitutes, professional toughs and petty thieves. It must be pointed out however that by no means all such people are morons." (*Psychology and Life*, pp. 207-08).

৪৮ Pintner, *op. cit.*, pp. 378-379.

পর্যবেক্ষক	অপরাধীদের পড়পড়তা বুদ্ধ্যঙ্ক
বার্ট	৮৯
হিলি ও ব্রোণার	৯০
ব্রিজেস্	৮৮
মেরিল্	৮২

গ্লুয়েক এবং গ্লুয়েক (Glueck and Glueck)[৪৯] নিম্নলিখিত তুলনামূলক সংখ্যা দিয়াছেন :

বুদ্ধ্যঙ্ক	অপরাধীর হার
স্বাভাবিক (৯০-১১০) বা উর্ধ্বে	৪১.৬%
৮১ — ৯০	২৮.২%
৭১ — ৮০	১৭.১%
৭০ বা উহার নিম্নে	১৩.১%

এই তালিকার ভিত্তিতে দেখা যায় যে, স্বাভাবিক বুদ্ধি-বিশিষ্টদের মধ্যেই অপরাধের হার সর্বাপেক্ষা অধিক।

একদল মনোবিৎ আবার এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, প্রতারণা ও গচ্ছিত ধন আত্মসাৎকরণ[৫০] (fraud and embezzlement)-এর অপরাধে অভিযুক্তদের বুদ্ধ্যঙ্ক স্বাভাবিকের কোটায় থাকে, কিন্তু যৌনঅপরাধ, অগ্নিসংযোগ, চুরি ইত্যাদি নিম্নবুদ্ধিশালীদের মধ্যে দেখা যায়।

অধিক বুদ্ধিশালীদের মধ্যে অপরাধের হার কম হওয়ার কারণ সম্বন্ধে অনেকে বিভিন্ন মত প্রদর্শন করিয়া থাকেন :

৪৯ *One thousand juvenile delinquents*, p. 102.

৫০ Root-এর মতে এই অপরাধে অভিযুক্তদের বুদ্ধ্যঙ্কের হার হইল : ১০৩.৭৫%

(ক) কেহ কেহ বলেন যে, বুদ্ধিশালীরা মন্দ কার্যের ফলাফল পূর্ব হইতে বুঝিতে পারে (বা foresee করে) বলিয়া অপরাধ হইতে বিরত হয় ;

(খ) আর একদলের মতে, উচ্চ বুদ্ধি উচ্চ স্তরের কৃষ্টির পরিচায়ক এবং কৃষ্টির উৎকর্ষের ফলে অপরাধের প্রতি বিমুখতা জাগে ;

(গ) আবার, অনেকে এইরূপ সন্দেহও করিয়া থাকেন যে, অতি-বুদ্ধিশালীরাও হয়ত অল্পবুদ্ধিশালীদের মতই অপরাধ করে[৫১], কিন্তু বুদ্ধির ফলে তাহারা এমন কৌশলে অপরাধ করে যে তাহাদের ধরা যায় না। (পৃঃ ২২৪ দ্রষ্টব্য)।

সমগ্র পরিস্থিতি বিচার করিলে দেখা যায় যে, **অপরাধের বহুবিধ কারণ আছে এবং স্বল্পবুদ্ধি উহার একটি অন্যতম কারণ।**[৫২] **বুদ্ধির অল্পতা থাকিলে অপরাধ-প্রবণতার সম্ভাবনা** থাকে ; কিন্তু বুদ্ধির অল্পতা ঘটিলেই যে প্রত্যেকে অপরাধী হইবেই এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। আবার স্বাভাবিক বুদ্ধির সহিত—এমন কি অতি-বুদ্ধির সহিতও—অপরাধের সংস্রব দেখা যায়।[৫৩]

(গ) বুদ্ধি ও জীবিকা-বৃত্তি (Intelligence and Occupation) :

মনোবিদ্যা-সম্মত বিবিধ পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, বুদ্ধির সহিত জীবিকা-বৃত্তির প্রত্যক্ষ-সংযোগ আছে। এই সব পরীক্ষার ফলে দেখা

---

৫১ মধ্যে মধ্যে ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া হিসাবে অতি-বুদ্ধিশালীরা অপরাধের পথে চালিত হয়। অধিক বুদ্ধিশালীরা সকল সময় নিজেদের প্রতিভার সুষ্ঠু পরিচয় দিবার সুযোগ না পাইয়া সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া করে এবং অপরাধের আশ্রয় লয়। বাল্যকালে বিদ্যালয়ের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া বা শিক্ষকের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া ইহারা নিজেদের প্রতিবাদ ঘোষণা করে।

প্রতিভাশালী শিশু সম্বন্ধে হলিংওয়ার্থের মত ব্যাখ্যা করিয়া মান্ (Munn) বলিয়াছেন : "Mrs. Hollingworth looks upon such children as possible benefactors of the human race who might, without such opportunities, become clever rogues and thieves—aggressively set against the society that, in the shape of their teachers, frustrated them unduly." (N. L. Munn, *Psychology*, p. 72).

৫২ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বার্ট অপরাধের বিবিধ কারণকে ক্রম অনুসারে সাজাইয়া বুদ্ধির স্বল্পতাকে ৬ষ্ঠ স্থান দান করিয়াছেন।

অপরাধের বিবিধ কারণের আলোচনার জন্য গ্রন্থকার-রচিত প্রবন্ধ *Why crimes ?* (*Patrika*, 11. 10. 59) দ্রষ্টব্য।

৫৩ এই প্রসঙ্গে আমরা এই বিষয়ে Pintner-এর সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিতে পারি : "All reports so far have agreed in finding a much smaller percentage of

গিয়াছে যে, যদি বৃত্তির পক্ষে ব্যক্তি-বিশেষের বুদ্ধি অত্যধিক বা অত্যল্প হয়, তাহা হইলে সে কর্মক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করিতে পারে না। যদি ব্যক্তি-বিশেষের বুদ্ধি তাহার বৃত্তির প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষা বিশেষ কম হয়, তাহা হইলে সে তাহার নির্দিষ্ট কার্য সুষ্ঠুভাবে করিতে পারে না; আবার যদি তাহার বুদ্ধি তাহার বৃত্তির প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষা অত্যধিক হয়, তাহা হইলে সে কার্য করিয়া তৃপ্তি ত' পাইবেই না, উপরন্তু তাহার বিরক্তি ও অবসাদ আসিবে।[৫৪]

প্রথম এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকার সেনাদলে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র হইতে লোক নিযুক্ত হ'ন। তাঁহাদের নির্বাচনের সময় তাঁহাদের বুদ্ধি-পরীক্ষা হয় এবং ফলে বহু উপাত্ত সংগৃহীত হয়। এইগুলি আলোচনা করিয়া দেখা যায় যে, অধিক বুদ্ধির প্রয়োজন এরূপ কার্যে যাঁহারা নিযুক্ত থাকেন (যেমন, চিকিৎসক, ইঞ্জিনীয়ার, অধ্যাপক, আইনজীবী ইত্যাদি), তাঁহাদের গড়পড়তা বুদ্ধ্যঙ্ক সর্বাপেক্ষা অধিক এবং অকুশলী শ্রমিকদের (unskilled labourer) বুদ্ধ্যঙ্ক সর্বাপেক্ষা কম। অবশ্য ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, **গড়পড়তা হিসাবে** যদিও চিকিৎসক বা অধ্যাপকের বুদ্ধ্যঙ্ক কেরাণী বা শ্রমিকের অপেক্ষা অধিক, কোন এক বিশেষ কেরাণী বা বিশেষ শ্রমিকের বুদ্ধ্যঙ্ক যথেষ্ট উচ্চহারের হইতে পারে। আবার, ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, কোন বিশেষ বৃত্তিতে সাফল্যের জন্য বুদ্ধিই যথেষ্ট নহে, অন্যান্য গুণেরও প্রয়োজন; যেমন, স্থৈর্য, ধৈর্য, আবেগের সুস্থিতি ও সাম্য, অন্যের সহিত

delinquents of superior intelligence as compared with the amount of superior intelligence supposed to exist in the population at large. Also there seems to be agreement in the finding of a large proportion of defective delinquents among female as opposed to male delinquents. The type of crime a delinquent commits has certainly some relation to his intelligence, but it is difficult to disentangle this one factor from all the others that are at work leading to the commitment of different sorts of crime." (*Op. cit.* p. 393).

৫৪ ভিটেলেস্ (Viteles) কয়েকটি রেস্তোর্ঁার ক্যাশিয়ারদের বুদ্ধ্যঙ্ক আলোচনা করিয়া দেখেন যে, যাহাদের, বুদ্ধ্যঙ্ক খুব কম ছিল তাহারা বেশীদিন ঐ কাজ করিতে পারিল না; আবার যাহাদের বুদ্ধ্যঙ্ক খুব বেশী ছিল তাহারা ঐ কাজে কোন শান্তি বা তৃপ্তি পাইল না বলিয়া অধিকদিন ঐ কাজ করিতে পারিল না। (M. S. Viteles, 'Selecting Cashiers and Predicting Length of Service', *Journal of Personnel Research*, 1924, Vol. 2.)

'মেলামেশার ক্ষমতা',[৫৫] বিশেষ কর্মের জন্য বিশেষ প্রকার দক্ষতা (special abilities) ইত্যাদি।

এ বিষয় বিভিন্ন লেখক বুদ্ধ্যঙ্কের বিভিন্ন পরিমাণ দিয়াছেন। যেমন: A. G. C. T.-পরীক্ষাপদ্ধতি দ্বারা প্রাপ্ত উপাত্ত হইতে হারেল্ এবং হারেল্ (Harrell and Harrell) সিদ্ধান্ত করেন যে, হিসাব-রক্ষক (accountant), ব্যবহারজীবী (lawyer), ইঞ্জিনিয়ার এবং শিক্ষকের গড়পড়তা বুদ্ধ্যঙ্ক (average I. Q.) হইল যথাক্রমে ১২৫, ১২৫, এবং ১২১, আর পেণ্টার, নাপিত এবং কৃষকের গড়পড়তা বুদ্ধ্যঙ্ক হইল যথাক্রমে ৯৮, ৯৫, ৯১। সেইরূপ, ফ্রায়ার (Fryer) বুদ্ধিমান্দের শ্রেণী-বিভাগ করিয়া সর্বোচ্চ শ্রেণী (Group A)-তে রাখিয়াছেন মাত্র ইঞ্জিনিয়ার, ধর্মযাজক এবং হিসাবরক্ষক; দ্বিতীয় শ্রেণী (Group B)-তে রাখিয়াছেন চিকিৎসক, শিক্ষক, Y. M. C. A.-র সেক্রেটারী ইত্যাদি; তৃতীয় শ্রেণী (Group C)-এর নিম্নস্তরে রাখিয়াছেন পাচক, নাবিক এবং কয়েকপ্রকার শিল্পের শ্রমিক।

আমরা প্রথমেই (পৃ: ২২৭-২৮) বলিয়াছি যে, বৃত্তির জন্য প্রয়োজনীয় বুদ্ধি অপেক্ষা অত্যন্ত কম বা অত্যন্ত বেশী বুদ্ধি থাকিলে ব্যক্তি-বিশেষ কার্যে যোগ্যতা অর্জন করিতে পারে না। এইজন্য কোন বিশেষ বৃত্তির জন্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে বুদ্ধি-পরীক্ষার একান্ত প্রয়োজন। ইহার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ: (ক) যে সব কার্যের জন্য (যেমন, কর্মাধ্যক্ষ বা manager ইত্যাদির পদের জন্য) উচ্চ পর্যায়ের বুদ্ধির প্রয়োজন, সেইরূপ বুদ্ধির অধিকারী যাহারা তাহারাই যেন নির্বাচিত হয়। (অবশ্য যে সব কার্যের জন্য বিশেষ দক্ষতা বা skill-এর প্রয়োজন, সেই সব ক্ষেত্রে একমাত্র বুদ্ধি-পরীক্ষাই পর্যাপ্ত নহে)। (খ) আবার যাহাদের বুদ্ধি নিতান্ত কম তাহারা যেন নির্বাচিত না হয়। যাহাদের বুদ্ধি নিতান্ত অল্প, যাহারা ঊনমানস তাহারা শিল্পক্ষেত্রে নির্বাচিত হইলে দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়িতে পারে, উৎপাদনের হার কমিতে পারে, উৎপন্ন দ্রব্যের গুণ না থাকিতে পারে ইত্যাদি; এইজন্য বুদ্ধি-পরীক্ষা দ্বারা এইরূপ অবাঞ্ছিত লোকের নির্বাচন রোধ করা প্রয়োজন।

৫৫ কোন কোন লেখক 'Social Intelligence' (সামাজিক বুদ্ধি) বলিয়া একটি নূতন প্রত্যয় গঠন করিয়াছেন; ইহার অর্থ হইল সমাজের অন্য লোকের সহিত সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে মেলামেশা বা মানাইয়া চলিবার ক্ষমতা (ability to get along with other people)।

৬। সমালোচনা :

বুদ্ধি-পরীক্ষা পদ্ধতি আধুনিক যুগের মনোবিদ্যার বিশেষ অবদানগুলির অন্যতম। বালক-বালিকার বুদ্ধির মান নির্ণয় করিয়া তাহাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা নির্ধারণ, ভবিষ্যৎ-জীবনের বৃত্তি সম্বন্ধে উপদেশ দান, বৃত্তি-প্রার্থীর যোগ্যতা নির্ধারণ, ইত্যাদি বিষয়ে বুদ্ধি-পরীক্ষা-পদ্ধতি দ্বারা প্রাপ্ত ফল আমাদের যথেষ্ট সাহায্য দান করে।

তবে এই প্রসঙ্গে আমাদের কতকগুলি বিষয় মনে রাখিতে হইবে :

(ক) যে অর্থে আমরা বিভিন্ন জিনিষের ওজন, উত্তাপ, দৈর্ঘ্য ইত্যাদি হিসাব করি, সে অর্থে বুদ্ধির পরিমাপ চলে না। একটি বস্তুর দৈর্ঘ্য যদি ১ মীটার হয় এবং অপর একটির দৈর্ঘ্য যদি ২ মীটার হয়, তাহা হইলে আমরা বলিব যে, দ্বিতীয় বস্তুটি প্রথম বস্তুটি অপেক্ষা দুই গুণ বড়; আবার যদি বলা যায় যে, একটি বস্তুর ওজন ১০ কিলোগ্রাম এবং অপর একটির ওজন ৫ কিলোগ্রাম, তাহা হইলে দ্বিতীয় বস্তুর ওজন প্রথমটির অর্ধেক। কিন্তু বুদ্ধি বা অন্য কোন মানসিক শক্তির ক্ষেত্রে তথাকথিত পরিমাণগুলি এই অর্থে বুঝিলে চলিবে না। যেমন, যদি বলা যায় যে, একজনের বুদ্ধ্যঙ্ক ৮০ এবং অপর আর একজনেব বুদ্ধ্যঙ্ক ১৬০, তাহা হইলে ইহা বুঝায় না যে, দ্বিতীয় ব্যক্তির বুদ্ধির পরিমাণ প্রথম ব্যক্তির বুদ্ধির ঠিক দ্বিগুণ।

আবার তিনটি বস্তু ক, খ এবং গ-এর ওজন যদি যথাক্রমে ৩ কিলোগ্রাম, ৭ কিলোগ্রাম এবং ১১ কিলোগ্রাম হয়, তাহা হইলে ক-এর ওজনের সহিত খ-এর ওজনের যে সম্বন্ধ, খ-এর ওজনের সহিত গ-এর ওজনেরও সেই সম্বন্ধ। কিন্তু যদি ক, খ, গ তিনটি বালকের বুদ্ধ্যঙ্ক যথাক্রমে ৮০, ১০০ এবং ১২০ হয়, তাহা হইলে উহার এই অর্থ নহে যে, খ ক অপেক্ষা যত ভাল, গ খ অপেক্ষা ঠিক তত ভাল। এইজন্য সকল ক্ষেত্রে বুদ্ধ্যঙ্কের ভিত্তিতে একজনের সহিত অপর জনের তুলনা সমান হারে করা চলে না।[৫৬]

(খ) তাহা ছাড়া, বুদ্ধি-পরীক্ষার জন্য যে সব পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, সেগুলির উপযুক্ততা সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

৫৬ তুলনীয় : "This non-equality of units at different parts of the scale, it must be confessed, is a serious handicap to exact comparison." (Dr. G. Pal, 'Measurements in Psychology', *Proceedings of the 29th. Indian Science Congress*, p. 335).

বুদ্ধি-পরীক্ষা-পদ্ধতির প্রয়োগকারীরা দাবী করেন যে, তাঁহাদের পদ্ধতির দ্বারা তাঁহারা স্বভাবজ বা জন্মলব্ধ 'বিশুদ্ধ' বুদ্ধি-শক্তি (unadulterated native ability)-র পরীক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ইহা কত দূর সম্ভবপর হয়, তাহা বলা যায় না; কারণ জন্মলব্ধ-শক্তির সহিত অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষা এমনভাবে মিশ্রিত হইয়া থাকে যে, তাহাদের পৃথক্ করা যায় না।

(গ) আবার যদিও বুদ্ধি-পরীক্ষা-পদ্ধতি যথার্থভাবে স্থিরীকৃত হয়, তাহা হইলেও সকলক্ষেত্রে পরীক্ষণ-পাত্রের বুদ্ধির সঠিক নির্দেশ পাওয়া যায় না। পরীক্ষণ-পাত্রের সাফল্য নির্ভর করে পদ্ধতির প্রতি তাহার অনুরাগ এবং আকর্ষণ, পদ্ধতি-প্রয়োগকারীর প্রতি সহযোগিতার ইচ্ছা এবং মনঃসংযোগের ক্ষমতা ইত্যাদির উপর। এই সব আবশ্যকীয় 'উপাদানের' বৈষম্যের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির ক্ষেত্রে, এমন কি একই পদ্ধতি বিভিন্ন সময় প্রয়োগের ফলে, একই ব্যক্তি বিভিন্ন সাফল্যাঙ্ক লাভ করে।

(ঘ) বুদ্ধি বা অন্য কোন মানসিক শক্তির পরীক্ষার পদ্ধতি স্থিরীকরণের সময় আশা করা যায় যে, ঐ শক্তি যেন কোন সঙ্ঘ বা দলমধ্যে সমভাবে বণ্টিত থাকে এবং ঐ বণ্টনকে যেন আদর্শ বণ্টন রেখা (যাহাকে 'ঘণ্টাকৃতি প্রতিসমরেখা' বলা হয়; পৃঃ ৭৬ দ্রষ্টব্য) দ্বারা নির্দেশ করা যায়। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু ইহা সম্ভব নহে; কারণ যে সব উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় সেগুলি সর্বত্রই এই আদর্শানুগ হয় না।

(ঙ) ইহা ছাড়া, যুক্তিশাস্ত্রের দিক্ হইতে একটি আপত্তি উত্থাপন করা যাইতে পারে। ঘণ্টাকৃতি রেখা কোন মানসিক শক্তির 'আদর্শ'-এর নির্দেশক ইহা কিভাবে জানা যায়? বিভিন্ন পরীক্ষা-পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া। আবার ঐ পদ্ধতিগুলি ঠিক হইয়াছে কি না কিভাবে জানা যায়? যদি ঐ পদ্ধতিগুলি 'আদর্শ বণ্টন' নির্দেশ করিতে পারে। সুতরাং এই যুক্তি চক্রক-দোষ (fallacy of circular argument)-এ দুষ্ট।

এই সব বিভিন্ন অসুবিধার প্রতিকারকল্পে প্রয়োজন হইল যে, অত্যন্ত যত্নসহকারে পরীক্ষা-পদ্ধতিগুলি গঠন করিতে হইবে, পরীক্ষণ-পাত্রদের শিক্ষা, অভিজ্ঞতা এবং পরিবেশের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঐগুলি রচনা করিতে হইবে, একাধিক পদ্ধতি প্রয়োগ করিতে হইবে, আবার বিভিন্ন সময় একই পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া সাফল্যাঙ্কের তুলনা করিতে হইবে।

অষ্টম অধ্যায়

ব্যক্তিত্বের স্বরূপ ও উপাদান

১। 'অস্মিতা' বা 'ব্যক্তিত্ব' কাহাকে বলে? (What is Personality?):

'ব্যক্তিত্ব' পদটি আজকাল বহুল ব্যবহৃত হইতেছে। যাহার চাল-চলন, কথাবার্তা আমাদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে বা মনের উপর রেখাপাত করে, তাহার সম্বন্ধে আমরা বলি যে, তাহার ব্যক্তিত্ব আছে। আবার অন্যের কাছে আকর্ষণীয় হইয়া উঠাকে বলা হয়, 'ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন হওয়া'; যেমন, অশন-বসন-ভূষণের বিজ্ঞাপনে বলা হয়, "অমুক জিনিষ ব্যবহার করিয়া নিজের ব্যক্তিত্ব বাড়াইয়া তুলুন।"

মনোবিদ্যায় 'অস্মিতা' বা 'ব্যক্তিত্ব' পদটিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়। 'ব্যক্তিত্ব' বলিতে সাধারণভাবে বুঝায় **ব্যক্তি-বিশেষের দৈহিক ও মানসিক সকল বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণের একটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয় এবং ইহার প্রকাশ ঘটে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে।**

আমরা ব্যক্তিত্বের মনোবিদ্যা-সম্মত বিভিন্ন সংজ্ঞাগুলি আলোচনা করিবার পূর্বে 'ব্যক্তিত্ব' **কী নহে,** তাহা আলোচনা করিব:

(ক) যাহার কথাবার্তা, চাল-চলন আমাদের কাছে আকর্ষণীয়, বা আমাদের উপর রেখাপাত করে বা প্রভাব বিস্তার করে, অথবা যে সকলের সঙ্গে মেলামেশা করিতে পারে, তাহারই ব্যক্তিত্ব আছে এবং যে উহার বিপরীত তাহার কোন ব্যক্তিত্ব নাই, এইরূপ বলা মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সম্পূর্ণ ভুল। যাহার কথাবার্তা, চাল-চলন 'প্রাণহীন', 'অনাকর্ষণীয়' বা যে সর্বদা আত্ম-চিন্তায় নিমগ্ন আছে, মনোবিদ্যার দৃষ্টিতে তাহারও ব্যক্তিত্ব আছে।

(খ) কেহ কেহ বলেন যে, ব্যক্তিত্ব বলিতে ব্যক্তি-বিশেষের চিন্তন, অনুভূতি ও প্রতিন্যাস (attitude) বুঝায়। কিন্তু এই প্রকার সংজ্ঞার অসুবিধা হইল যে, ইহা ব্যক্তি-বিশেষের বাহ্য কার্যাবলী বা প্রতিক্রিয়ার কোন উল্লেখ করে না।

(গ) আবার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ যদিও বিভিন্ন কার্য বা প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে, তাহা হইলেও ব্যক্তিত্ব বলিতে এই সব কার্যের সমন্বয়মাত্র বুঝায় না।

(ঘ) ব্যক্তিত্বের প্রকাশ চরিত্র (character)-এর মাধ্যমে ঘটে; কিন্তু চরিত্রই ব্যক্তিত্বের একমাত্র পরিচায়ক নহে। চরিত্রের সারধর্ম হইল নৈতিকতা; কিন্তু ব্যক্তিত্বের সারধর্ম নৈতিকতা নহে। 'ব্যক্তিত্ব' হইল 'চরিত্র' অপেক্ষা ব্যাপকতর। সকল চারিত্রিক প্রলক্ষণ (character traits) ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ (personality traits) হইতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণমাত্রই চারিত্রিক প্রলক্ষণ (অর্থাৎ নৈতিক চরিত্রের প্রকাশক) নহে।

(ঙ) বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিদ্যা অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে; সুতরাং মনোবিদ্যায় 'ব্যক্তিত্ব' বলিতে 'আত্মা' (soul) বা অনুরূপ কোন অতীন্দ্রিয় সত্তা বুঝায় না।

তাহা হইলে 'ব্যক্তিত্ব'[১] বলিতে কী বুঝায়?

'ব্যক্তিত্ব' পদের সংজ্ঞাদান করা নিতান্ত কঠিন। বিভিন্ন লেখক এক একটি বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ব্যক্তিত্ব-পদের সংজ্ঞাদানের চেষ্টা করিয়াছেন[২]; এইজন্য এই সকল সংজ্ঞা অসম্পূর্ণ বা একদেশদর্শী হইয়া পড়িয়াছে। আমরা প্রথমে এইরূপ কয়েকটি সংজ্ঞার উল্লেখ করিব:

(ক আমরা বিভিন্ন অবস্থার সহিত প্রতিযোজনের জন্য বিভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া করিয়া থাকি। একদল লেখক ব্যক্তিত্ব বলিতে এইসব **প্রতি-যোজক প্রতিক্রিয়া** (adaptive reactions)-**এর ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্য** বুঝিয়া থাকেন[৩]।

১ 'ব্যক্তিত্ব' বা 'অস্মিতা'-পদের ইংরাজী প্রতিশব্দ হইল *Personality*; এই পদটি লাতিন *Persona* পদ হইতে উদ্ভূত। 'Persona'-পদের আদি অর্থ হইল 'মুখোস' (mask)। প্রাচীন রোমে অভিনয়কালে অভিনেতারা যে 'মুখোস' পরিয়া রঙ্গমঞ্চে বিভিন্ন ভূমিকায় আবির্ভূত হইতেন, তাহাকে 'Persona' বলা হইত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, personality-পদটি এমন এক পদ হইতে ব্যুৎপন্ন হইয়াছে যাহা ব্যক্তির প্রকৃত ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক না হইয়া উহার মিথ্যা আবরণকে নির্দেশ করিত। ক্রমশঃ উহা অভিনেতা ও তাঁহার বিশেষ গুণাবলী বুঝাইতে লাগিল এবং তাহার পর ধীরে ধীরে ব্যাপক অর্থে 'ব্যক্তিত্ব' বুঝাইতে লাগিল।

২ দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, সমাজ-বিজ্ঞান ও ব্যবহারশাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে গডন আলপোর্ট ব্যক্তিত্বের প্রায় পঞ্চাশটি সংজ্ঞা সংগ্রহ করিয়াছেন। (G. W. Allport, *Personality : A psychological interpretation* দ্রষ্টব্য)।

৩ তুলনীয়: (১) Watson : "Personality includes not only these reactions, but also the more individual personal adjustments and capacities."

এই সংজ্ঞায় বাহ্য প্রতিক্রিয়ার উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। কিন্তু বাহ্য প্রতিক্রিয়াগুলির বৈশিষ্ট্য ও অভিনবত্ব ব্যক্তি-বিশেষের ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক হইলেও কেবলমাত্র উহাদের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞাদান যুক্তিযুক্ত হইবে না। ব্যক্তিত্বের প্রকাশের মধ্যে যে ঐক্য ও স্থায়িত্ব থাকে এবং উহার পশ্চাতে যে সমস্ত স্থায়ী চিন্তন ও ভাবধারা, অনুভূতি ও প্রবৃত্তি কার্য করে এই সংজ্ঞায় তাহার উল্লেখ নাই।

(খ) একদল লেখক আবার আন্তর উপাদানের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ব্যক্তিত্ব বলিতে বুঝায় **ব্যক্তি-বিশেষের সহজাত এবং জীবদ্দশায় গঠিত সকল স্বভাব, প্রেরণা, প্রবণতা, কামনা ও বৃত্তি**[৪]।

এইরূপ সংজ্ঞার গুণ এই যে, ইহা ব্যক্তিত্বের প্রকাশক বাহ্য ক্রিয়ার পশ্চাতে কার্যকরী 'উপাদান'-এর উল্লেখ করে। কিন্তু ইহার ত্রুটি হইল যে, এই সংজ্ঞা অতিরিক্ত ব্যাপক হওয়ার জন্য ইহাতে ব্যক্তিত্বের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় না—বরং ইহাতে যেন মনোবিদ্যার সমগ্র বিষয়-বস্তুরই উল্লেখ করা হইয়াছে।

(গ) কেহ কেহ ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞাদানকালে অপরের উপর প্রভাব-বিস্তারের ক্ষমতার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ব্যক্তিত্ব হইল, **'ব্যক্তি-বিশেষের 'সামাজিক উদ্দীপন-মূল্য'** (social stimulus value[৫])।

এই সংজ্ঞায় ব্যক্তিত্ব স্বরূপতঃ কী তাহা না বলিয়া একজনের ব্যক্তিত্ব অন্য জনের

(২) Floyd Allport: "Personality is the individual's characteristic reactions to social stimuli and the quality of this adaptation to the social features of his environment."

(৩) Kempf: "Personality is the habitual mode of adjustment which the organism effects between its own egocentric drives and the exigencies of the environment."

৪ তুলনীয়: "Personality is the sumtotal of all the biological innate dispositions, impulses, tendencies, appetites, and instincts of the individual, and the acquired dispositions and tendencies." (Morton Prince, *The Unconscious*).

৫ ইঁহাদের মতে "Personality=Impressiveness or Forcefulness." "Personality is your effect upon other people."

M. A. May বলিয়াছেন, "Personality is the social stimulus value of the individual." ('The adult in the Community' in C. Murchison's *Foundations of Experimental Psychology*).

উপর কী কার্য করে, অর্থাৎ কেবলমাত্র অন্তের উপর কী প্রভাব বিস্তার করে, তাহারই উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ সংজ্ঞা দ্বারা ব্যক্তিত্ব কী তাহা যথাযথ বুঝা যায় না। তাহা ছাড়া, ইহার আর একটি অসুবিধা হইল যে, এইরূপ সংজ্ঞা গ্রহণ করিলে মনে হইতে পারে যে, একমাত্র প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিরই ব্যক্তিত্ব আছে, অপরের নাই ; কিন্তু আমরা পূর্বেই (পৃঃ ২৩২) বলিয়াছি যে, অপরের উপর কেহ প্রভাব বিস্তার করিতে পারুক বা না পারুক সকলেরই কোন-না-কোন প্রকার ব্যক্তিত্ব আছে।

(ঘ) কেহ কেহ বলেন যে, ব্যক্তিত্ব হইল **ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন প্রলক্ষণের সমন্বয়।**[৬]

এই সংজ্ঞাও ত্রুটিহীন নহে ; ইহা যেন চক্রক-দোষে দুষ্ট। ব্যক্তিত্ব কী ?—যাহা প্রলক্ষণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় ; আবার প্রলক্ষণ কাহাকে বলে ?—যাহা ব্যক্তিত্বের প্রকাশক। সুতরাং এই সংজ্ঞা ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট কোন নির্দেশ দেয় না।

ব্যক্তি-বিশেষের ব্যক্তিত্ব বর্ণনা করিবার জন্য আমরা প্রলক্ষণের সাহায্য গ্রহণ করি ; কিন্তু কোন্ কোন্ প্রলক্ষণকে প্রধান বা আদর্শ বা উপযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে, সে বিষয়ের কোন নির্ধারিত তালিকা নাই। তাহা ছাড়া, ব্যক্তিত্বকে কতকগুলি প্রলক্ষণের সমন্বয় বা যোগফল বলাই যথেষ্ট হইবে না ; ঐ সব প্রলক্ষণের পশ্চাতে একটি ঐক্য ও সামঞ্জস্য থাকে, কিন্তু আলোচ্য সংজ্ঞায় ঐ ঐক্য কি-ভাবে সাধিত হয় বা উহা কিসের প্রকাশক, সে সম্বন্ধে কোন কিছু বলা হয় নাই।

আবার, এই প্রলক্ষণগুলির কতকগুলি সাধারণ (common) এবং কতকগুলি ব্যক্তিগত (individual) ; ইহাদের মধ্যে কোন্গুলিকে ব্যক্তিত্বের প্রকৃত পরিচায়ক বলিয়া ধরা হইবে, তাহা জানা নাই।

৬ ইঁহাদের মতে : "Personality is the sumtotal of different traits."

৭ সকল লেখক সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় না : যেমন, Allport, Eysenck ইত্যাদি প্রলক্ষণ (traits)-এর মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের কথা বলিবার কালে ব্যক্তিত্বের পশ্চাতে যে সংগঠন আছে তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন, Eysenck বলেন যে, "(Personality)...is the sumtotal of the actual or potential behavior-patterns of the organism...

(ঙ) অপর একদল লেখক ব্যক্তিত্বের ভিতর যে সংহতি, ঐক্য এবং সংগঠন (unity and organization) আছে, তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ব্যক্তিত্ব হইল তাহাই **যাহা ব্যক্তি-বিশেষের বিবিধ ব্যবহারের মধ্যে সংগঠন, ঐক্য ও সামঞ্জস্য আনিয়া দেয় এবং ইহারই ফলে ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটা সমগ্রত্ব থাকে।**

সুস্থ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-মধ্যে যে একটি স্থায়ী সংহতি ও সংগঠন থাকে, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য। তবে ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা-গঠনে কেবলমাত্র সংহতি বা সংগঠনের উল্লেখ করা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ এইরূপ সংজ্ঞাতে যে কার্য বা ব্যবহারের মধ্য দিয়া ব্যক্তিত্বের সংহতি প্রকাশ পায়, তাহার কোন উল্লেখ থাকে না। অর্থাৎ ব্যবহার, ক্রিয়া, আচরণ বা প্রলক্ষণকে বাদ দিয়া কেবল সংগঠন বা সংহতির উল্লেখ করা ঠিক হইবে না।

(চ) ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞাদানের এই সব অসুবিধা দূর করিবার জন্য কেহ কেহ আবার উহার একটি ব্যাপক সংজ্ঞা দিয়াছেন।

একদল বলেন যে, **ব্যক্তি যাহা করে তাহাই তাহার ব্যক্তিত্ব।**[৮]

এইরূপ সংজ্ঞার দোষ হইল যে, ইহাতে স্পষ্ট করিয়া কিছুই বলা হয় নাই। ব্যক্তিত্বের ভিতর কিরূপ সংহতি আছে, উহার ভিতর আন্তর ও বাহ্য কি কি দিক্ আছে, উহার কি কি প্রলক্ষণ আছে, সে সব সম্বন্ধে এই সংজ্ঞায় কিছু বলা হয় নাই।

(ছ) অপর এক দল লেখক আর একটি ব্যাপক সংজ্ঞা দিয়া বলিয়াছেন যে, **প্রকৃত ব্যক্তি নিজে যাহা তাহাই হইল ব্যক্তিত্ব,** বা **ব্যক্তিত্ব হইল মানুষের সারধর্ম**[৯]।

---

it originates and develops through the functional interaction of the four main sectors into which these behavior-patterns are *organized*: the cognitive sector (intelligence), the conative sector (character), the affective sector (temperament), and the somatic sector (constitution)." (*Dimensions of Personality*, p. 25). [অবশ্য Eysenck 'trait' অপেক্ষা 'dimension' পদটি-ই পছন্দ করেন।] সেইরূপ Allport এই প্রসঙ্গে 'dynamic organisation'-এর কথা বলিয়াছেন।

৮ ইঁহাদের মতে : Personality is what personality *does*."

৯ ইঁহাদের ভাষায় : (1) "Personality is what a man really is."

(2) "Personality is the *essence of* man."

এই সংজ্ঞাও অস্পষ্ট। মানুষের সারধর্ম কী সে বিষয়ে আজও মতভেদ আছে। তাহা ছাড়া, ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটা অভিনবত্ব আছে, অর্থাৎ প্রতি ব্যক্তিরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। সাধারণভাবে ব্যক্তির সারধর্মের উল্লেখ করিলে ব্যক্তি-বিশেষের স্বীয় বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু বলা হইল না। আবার, যদি বলা হয় যে, ব্যক্তি-বিশেষের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি লইয়াই ব্যক্তিত্ব, তাহা হইলেও অসুবিধা হইতেছে যে, 'নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি' কী তাহা বুঝা গেল না এবং মানুষের সাধারণ ধর্মের প্রতিও সুস্পষ্ট কোন ইঙ্গিত করা হইল না।

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ব্যক্তিত্বের কোন ত্রুটিহীন সংজ্ঞাদান করা সম্ভব নহে। আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে যেমন বুদ্ধির ক্ষেত্রে একটিমাত্র বিশেষ সংজ্ঞা-দানের প্রচেষ্টা পরিহার করিয়া উহার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়াছি, বর্তমান ক্ষেত্রেও সেইরূপ ব্যক্তিত্বের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি অনুধাবন করিয়া উহার স্বরূপ বুঝিবার চেষ্টা করিব।

ব্যক্তিত্বের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি এইরূপ :

(১) ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ব্যক্তি-বিশেষের **ক্রিয়ার মাধ্যমে** এবং এই ক্রিয়ার অভ্যুদয় হয় **বাহ্য জগতের সহিত প্রতিযোজনের** জন্য।

(২) এই সব বিভিন্ন প্রতিযোজনের পশ্চাতে আছে **বিভিন্ন ইচ্ছা, বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ**।

(৩) ব্যক্তিত্বের বাহ্য প্রকাশই হউক্ আর আন্তর 'অবস্থা'ই হউক্, সবেরই একটি **অভিনবত্ব বা বিশেষত্ব** (uniqueness) আছে। এই জন্য ব্যক্তি-বিশেষ তাহার **নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী** হইতে যে ভাবে বাহ্য পরিবেশকে বুঝে সেই ভাবেই **নিজস্ব** ভঙ্গিমায় প্রতিক্রিয়া করে।[১০]

(৪) মানসিক ক্রিয়ার সহিত দেহ-বৈশিষ্ট্য, দেহের রাসায়নিক ক্রিয়া ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট থাকে। এই জন্য 'ব্যক্তিত্ব'-পদ দ্বারা মানসিক বৈশিষ্ট্যের সহিত দৈহিক বৈশিষ্ট্যও সূচিত হয়। ব্যক্তিত্ব হইল **'দেহ-মন-বিশিষ্ট একক'** (psycho-physiological unit)।

(৫) ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটি **সমগ্রত্ব, ঐক্য, সামঞ্জস্য ও সংগঠন** আছে। ইহা নষ্ট হইলে ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিকতা (normalcy) নষ্ট হইয়া যায়।

১০ Stagner, *Psychology of Personality*, p. 5 দ্রষ্টব্য।

(৬) ব্যক্তিত্ব হইল **ক্রমবর্ধমান প্রচয়শীল সংগঠন** (developmental organization); অথচ এই বর্ধন ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়া স্থায়ী ভাবধারা গড়িয়া উঠে—এই জন্য আবার ব্যক্তিত্বকে **স্থায়ী সংগঠন** (stable organization) বলা হয়। তাহা ছাড়া, ব্যক্তি-বিশেষের শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্যের মধ্য দিয়া একই ব্যক্তিত্বের একটি নিরবচ্ছিন্নতা (continuity) বহিয়া চলে। (অবশ্য অস্বভাবী বা abnormal ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে)।

(৭) ব্যক্তিত্বের প্রকাশ একটি সামাজিক পরিবেশের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটিয়া থাকে; সুতরাং ঐ **সমাজ এবং জাতির কৃষ্টি ব্যক্তি-মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে**। এই দিক্ হইতে বলা যায় যে, ব্যক্তিত্ব হইল **'মানস-সামাজিক-একক'** (psycho-social unit)।

(৮) ব্যক্তিত্বকে বুঝিবার জন্য উহাকে শ্রেণীগতভাবে ভাগ করা যায়, আবার উহার প্রলক্ষণের মাধ্যমেও উহাকে বুঝিতে পারা যায়।

সংযোজন:

ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে বিবিধ মতবাদ (Different theories of Personality):

আমরা পূর্ব-প্রদত্ত বিবিধ সংজ্ঞা হইতে দেখিয়াছি যে, ব্যক্তিত্বের বহুমুখী বৈশিষ্ট্য থাকার জন্য উহার একটি সংক্ষিপ্ত সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা (definition) দেওয়া সম্ভব নহে। সেইরূপ ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে একটি কোন সুসমঞ্জস, সুনির্দিষ্ট মতবাদ (theory) আজও গড়িয়া উঠে নাই, অর্থাৎ এমন কোন মতবাদ আজ পর্যন্ত রচিত হয় নাই যাহা দ্বারা ব্যক্তিত্বের বহুমুখী বৈশিষ্ট্যসমূহের সুব্যাখ্যা সম্ভব হয়। এইজন্য ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে যে সব মতবাদ প্রদত্ত হইয়াছে সেগুলিকে এক একটি দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ব্যক্তিত্বের কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সম্ভাব্য এবং আংশিক ব্যাখ্যারূপে গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ। কোন একটি মতবাদের উপর গুরুত্ব আরোপ করিলে উহা একদেশদর্শী হইয়া যাইবার সম্ভাবনা অধিক।

(ক) মনঃসমীক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গী—মনঃসমীক্ষণ (psychoanalysis)-এর প্রধান প্রবর্তক হইলেন **ফ্রয়েড্ (Freud)**। ইহার মতের প্রধান

প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা পূর্বে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি। (পৃঃ ১০৯-১১৬ দ্রষ্টব্য)। ইহার মতের অভিনবত্ব হইল যে, ইনি কাম (sex বা libido)-এর উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। ইনি মনে করেন যে, শিশুর প্রথম পাঁচবৎসরের মধ্যে (যাহাকে ঈডিপাস্ এষণা বা গূঢ়ৈষার স্তর বলা হয়) ব্যক্তিত্বের ভিত্তি রচিত হয়। এই অবস্থায় শিশু তিনটি স্তর (stage)-এর মধ্য দিয়া যায়—মুখকামের স্তর (oral stage), পায়ুকামের স্তর (anal stage) এবং লিঙ্গকামের স্তর (phallic stage)। এইসব স্তরে শিশুর কামের যে ভাবে পরিতৃপ্তি ঘটে বা ঘটে না, তাহারই উপর ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। সুতরাং ফ্রয়েডের মতে ভাবীজীবনের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে অতীতের উপর।[১১] (৯ম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১ দ্রষ্টব্য)।

(খ) বৈশ্লেষিক দৃষ্টিভঙ্গী—ফ্রয়েডের দল পরিত্যাগ করিয়া য়ুঙ্ বৈশ্লেষিক মনোবিদ্যা (Analytical Psychology)-এর নূতন সম্প্রদায় স্থাপন করেন। (পৃঃ ১২৪-১৩০ দ্রষ্টব্য)। ফ্রয়েডের ন্যায় ব্যক্তি-বিশেষের অতীতের মধ্যে (অর্থাৎ শৈশবাবস্থায়) য়ুঙ্ ব্যক্তিত্বের কারণ অনুসন্ধান করেন না, বরং ব্যক্তি-বিশেষ বর্তমানের কোন্ অবস্থার সহিত প্রতিযোজনের চেষ্টা করিতেছে তাহাতেই য়ুঙ্ ব্যক্তিত্ব-প্রকাশক আচরণের কারণ আবিষ্কার করেন।

আবার তাঁহার মতে ব্যক্তি-মনের উপর কেবল ব্যক্তিগত নির্জ্ঞানই প্রভাব বিস্তার করে না, সমষ্টিগত নির্জ্ঞানও (Collective Unconscious) প্রভাব বিস্তার করে। তাহা ছাড়া, তিনি ব্যক্তিত্বের দুইটি জাতিরূপ (type)—যথা, বহির্বৃত্ত ও অন্তর্বৃত্ত—সম্বন্ধে মত প্রবর্তন করেন। (৯ম অধ্যায়, ১ম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

(গ) সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী—এই দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থকদের অন্যতম হইলেন

১১ তুলনীয়: Goldman-Eisler: "The description of adult character in terms of childhood experience is one of the basic principles of psychoanalytic characterology, and indeed the autogenetic approach to human personality is the essence of the theory and method of psychoanalysis." (Quoted by Klineberg, *Social Psychology*, p. 340).

আড্‌লার। ইনি ফ্রয়েডের দল ত্যাগ করিয়া প্রাতিস্বিক মনোবিদ্যা (Individual Psychology) প্রবর্তন করেন। (পৃঃ ১১৭-১২৩ দ্রষ্টব্য)। ইনি মনে করেন যে, প্রতি ব্যক্তিরই অন্তরে 'মহত্ত্বের বাসনা' (superiority complex) আছে, এবং আন্তর্ব্যক্তিক ও সামাজিক সম্বন্ধের মাধ্যমে এই বাসনা আত্মপ্রকাশের সন্ধান পায়। সামাজিকতাবোধ না জাগিলে মহত্ত্বের বাসনা স্বার্থান্ধতায় রূপান্তরিত হয়। মানুষের যাহা কিছু হীনতাবোধ বা দুর্বলতা আছে তাহার ক্ষতিপূরণ হয় সুষ্ঠু সামাজিকতাবোধের মধ্য দিয়া।[১২]

শ্রীমতী কারেন্ হোর্‌নে (Karen Horney) ফ্রয়েডীয় দৃষ্টিভঙ্গীর কিছু পরিবর্তন সাধন করিয়া নিজের মতবাদ রচনা করেন। তিনি বলেন যে, কেবলমাত্র কামের মাধ্যমে সব কিছুর ব্যাখ্যা চলে না। তাঁহার মতবাদের মূল প্রত্যয় (primary concept) হইল "মৌলিক উৎকণ্ঠা" (basic anxiety)। যাহা কিছু শিশুর নিরাপত্তাবোধ (sense of security) নষ্ট করে, তাহাই শিশুর মনে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করে।[১৩] অনিরাপত্তা বা বিপদ্‌বোধের জন্য শিশুর মনে যে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয় তাহা দূর করিবার জন্য শিশু বিবিধ প্রতিযোজনমূলক কার্য করে। হোর্‌নে প্রথমে দশ প্রকার "আকাঙ্ক্ষা" (needs)-এর কথা বলেন; পরে তিনি তিনপ্রকার প্রধান আকাঙ্ক্ষার কথা বলেন: (১) অপরের স্নেহ-ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা—ইহার ফলে লোকে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হয়; (২) আত্মনির্ভরতার আকাঙ্ক্ষা—ইহার ফলে লোকে নিজেকে অপরের নিকট হইতে দূরে রাখে; (৩) ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা—ইহার ফলে লোকে অপরের বিরুদ্ধাচরণ করে। এই সব আকাঙ্ক্ষা স্বভাবী ও অস্বভাবী (normal and abnormal) সকলেরই থাকে এবং এই সব আকাঙ্ক্ষাসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব স্বভাবী ও অস্বভাবী

---

১২ তুলনীয়: "Social interest is the true and inevitable compensation for all the natural weaknesses of individual human beings." (A. Adler, *Problems of Neurosis*, p. 31).

১৩ হোর্‌নে 'basic anxiety' বলিতে বুঝিয়াছেন, "the feeling a child has of being isolated and helpless in a potentially hostile world." (*Our inner Conflicts*, p. 41).

সকলেই বোধ করে। তবে যাহারা স্বভাবী তাহারা এই তিন প্রকার মূল আকাঙ্ক্ষার সামঞ্জস্য বিধান করে; কিন্তু যাহারা অস্বভাবী বা উদ্বায়ু-গ্রস্ত (abnormal বা neurotic) তাহাদের মৌলিক উৎকণ্ঠা অতিরিক্ত পরিমাণে থাকে বলিয়া তাহারা মূল আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব কৃত্রিম উপায়ে সমাধান করে। দ্বন্দ্ব মানুষের স্বভাবগত নহে, সামাজিক পরিবেশের মধ্যে উহার উদ্ভব হয়। সামাজিক কৃষ্টির দ্বারা সৃষ্ট (culturally determined) এই দ্বন্দ্ব যে ব্যক্তি তীব্রভাবে অনুভব করে এবং সমাধানের পন্থা নির্ণয় করিতে পারে না, তাহারই উদ্বায়ু-গ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা অধিক।[১৪]

এরিশ্ ফ্রোম্ (Erich Fromm)—ফ্রোম্ মনে করেন যে, শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন সে পিতামাতার নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে; ঐ শিশু যতই বড় হয়, ততই আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠে। তখন সে দেখে যে, স্বাধীন হইবার ফলে সে ক্রমশঃ অন্যের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বড়ই একাকী বা নিঃসঙ্গ বোধ করিতেছে। আবার তখনই সে চাহে স্বাধীনতা হইতে মুক্তি (escape from freedom)—তাই সে তাহার একাকিত্ববোধ দূর করিবার জন্য বিবিধ গঠনমূলক কার্যের মধ্য দিয়া অপরের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চাহে। এইজন্য সে সমাজের অনুশাসন মানিয়া চলিয়া সমাজেরই নিকট নিজেকে উৎসর্গ করিতে চাহে। সমাজের গঠনের তারতম্য অনুসারে ব্যক্তি-বিশেষের নিজস্ব প্রয়োজন মিটাইবার সুযোগেরও তারতম্য ঘটে এবং ব্যক্তিত্বেরও নানা বৈচিত্র্য ও তারতম্য দেখা দেয়। সর্বাপেক্ষা 'সুস্থ' সমাজ ('sane society')-তে মানুষে মানুষে সহযোগিতা স্থাপনের সর্বাধিক সুযোগ মিলে।[১৫]

১৪ Horney-এর ভাষায়: "The person who is likely to become neurotic is one who has experienced the culturally determined difficulties in an accentuated form, mostly through the medium of childhood experience." (*Neurotic Personality of Our Times*, p. 290). [হোর্নের দৃষ্টিভঙ্গীর বিশদ্ আলোচনার জন্য 'চিত্ত' পত্রিকায় (২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা) গ্রন্থকার-রচিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।]

১৫ শ্রেষ্ঠ সমাজের স্বরূপ নির্দেশ করিয়া ফ্রোম্ বলিয়াছেন যে, ইহাতে "......man relates to man lovingly,......he is rooted in bonds of brotherliness and solidarity..." (*The Sane Society*, p. 362). আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থার ফ্রোম্ নাম দিয়াছেন: *'Humanistic Communitarian Society.'*

স্থলিভান্ (Harry Stack Sullivan)-এর মতবাদ—ইঁহার মতে ব্যক্তি বা ব্যক্তিত্ব বলিয়া কোন কিছুর নিজস্ব পৃথক্ সত্তা নাই। আন্তর্ব্যক্তিক সম্বন্ধ (interpersonal relations)-এর মধ্যেই ব্যক্তিত্বের উদ্ভব ও প্রকাশ। আমাদের সমাজে একই প্রকারের আন্তর্ব্যক্তিক সম্বন্ধের পুনঃ পুনঃ আবির্ভাবের ফলে ইহা এক স্থায়ী রূপ লাভ করিয়াছে—যেমন, শৈশবে জন্মের পরমুহূর্তেই মাতার সহিত শিশুর সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং এই -সম্বন্ধের মধ্যে শিশু মাতার ব্যবহার অনুযায়ী উৎকণ্ঠা অথবা নিরাপত্তা বোধ করে; সেইরূপ কৈশোরে ও বয়ঃসন্ধিক্ষণে বহুবিধ ব্যক্তির সহিত বিবিধ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এই সব বিবিধ আন্তর্ব্যক্তিক অবস্থা (interpersonal situations)-এর মধ্যে যে ব্যবহার প্রকাশমান হয়, তাহাকে 'ব্যক্তিত্ব' আখ্যা দেওয়া হয়।[১৬] বংশগতি ও সহজাত বৃত্তি একেবারে অস্বীকার না করিলেও স্থলিভান মনে করেন যে, ব্যক্তিত্ব প্রধানতঃ সামাজিক মিথস্ক্রিয়া ও সম্বন্ধের মধ্যেই গড়িয়া উঠে (product of social relations and interactions)। স্থলিভান্ যদিও ব্যক্তিত্বকে একটি কাল্পনিক সত্তা (hypothetical status) দান করিয়াছেন, তাহা হইলেও তিনি মনে করেন যে, আন্তর্ব্যক্তিক অবস্থার মধ্যে ইহা হইল বিবিধ কার্যের শক্তির কেন্দ্র (dynamic centre)-স্বরূপ।

(ঘ) ম্যাক্‌ডুগাল্ (William McDougall)-এর মতবাদ—আমরা উপরে যে সব মতবাদ আলোচনা করিলাম, সেগুলিতে একটি মাত্র বিশেষ সহজবৃত্তি (instinct) বা প্রয়োজন (need)-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় ম্যাক্‌ডুগালের মতবাদে। তিনি চৌদ্দটি সহজ প্রবৃত্তি (instinct)-এর কথা বলেন (পৃঃ ৪২০-২১) এবং তিনি মনে করেন যে, ইহাদের সমাকলন (integration)-এর ফলে একটি প্রধান রস (master sentiment)-এর উদ্ভব হয়—এই প্রধান রসই আমাদের জীবনকে পারিচালিত করে। লাইব্‌নিৎসের দর্শনে যেমন বিবিধ মনাড (monad)-এর কল্পনা করা হইয়াছে এবং

১৬ ব্যক্তিত্বের 'সংজ্ঞা'-দান করিয়া Sullivan বলিয়াছেন যে, ইহা "relatively enduring pattern of recurrent interpersonal situations which characterize a human life." (*The Interpersonal Theory of Psychiatry*, p. 111).

তাহাদের পর্যায়ক্রমে সাজান হইয়াছে ও সর্বোপরি একটি প্রধান মনাডের ধারণা করা হইয়াছে, ম্যাক্‌ডুগালও সেইরূপ বিবিধ সহজ প্রবৃত্তির সমাকলন এবং সর্বোপরি একটি প্রধান রসের কল্পনা করিয়াছেন। এই প্রধান রসটি হইল 'আত্মশ্রদ্ধার রস' (sentiment of self-regard)। আত্মসাম্মুখ্য (self-assertion) ও আত্ম-নিবেদন (self-submission) এই দুই প্রবৃত্তির সমন্বয় বা সমাকলনে এই প্রধান রসটি 'গঠিত' হয়। (পৃঃ ৮১ ও ১৩৩)। যদি ইহার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা (disintegration) ঘটে, তাহা হইলে ব্যক্তিত্বের মধ্যেও বৈলক্ষণ্য দেখা দেয়। ম্যাক্‌ডুগাল্ তাঁহার মতবাদের নাম দিয়াছেন "মনাডীয় মতবাদ" (Monadistic Theory of Personality)[১৭]।

(ঙ) মারের মতবাদ—মারে (Murray) মনে করেন যে, প্রধানতঃ কুড়িটি মূল প্রয়োজন (basic psychological needs) আছে। বিবিধ প্রয়োজনের[১৮] 'তাগিদ' এবং যে ভাবে উহাদের মিটান হয় তাহার উপর ব্যক্তিত্বের গঠন নির্ভর করে। মারে কিন্তু ইহাও মনে করেন যে, ব্যক্তিত্বের 'অধিষ্ঠান' হইল মস্তিষ্ক (brain)—মস্তিষ্ক না থাকিলে ব্যক্তিত্ব থাকে না।

(চ) গর্ডন আল্‌পোর্টের মতবাদ—আল্‌পোর্ট মনে করেন যে, মানুষের প্রয়োজন ও প্রেষণা (needs and motives)-র সংখ্যা অগণিত। তিনি বলেন যে, এই সব বিবিধ প্রয়োজনের কার্মিক স্বতঃক্রিয়তা

১৭ ম্যাক্‌ডুগালের ভাষায়: "The only sentiment which can adequately fulfil the function of dominating and harmonising all other sentiments is the sentiment of self-regard taking the form of a self-conscious devotion to an ideal of character." "We regard...the normal personality as an integrated system of...monads; and the integrated system takes the form of a converging hierarchy. At the end of the hierarchy is the supreme monad which each of us calls 'myself'." (*Outline of Abnormal of Psychology*, pp. 526, 546).

১৮ বিবিধ প্রধান প্রয়োজনগুলি হইল এইরূপ: Abasement, Achievement, Affiliation, Aggression, Autonomy, Counteraction, Defendance, Deference, Dominance, Exhibition, Harmavoidance, Infavoidance, Nurturance, Order, Play, Rejection, Sentience, Sex, Succorance, Understanding. (H.A. Murray & Ors., *Explorations in Personality* দ্রষ্টব্য)।

(functional autonomy) আছে। ব্যক্তিত্বের বিবিধ প্রলক্ষণ লইয়া যে ব্যক্তিত্ব 'গঠিত' হয়, তাহা একটি অনুপম (unique) আকার ধারণ করে। তাহা ছাড়া, মানুষের ব্যক্তিত্বকে জানিবার জন্য তাহার অতীতকে জানিবার প্রয়োজন নাই—তাহার বর্তমানের মধ্যেই চেতন-স্তরে প্রেষণার উৎস পাওয়া যায়।[১৯]

(ছ) ক্রেট্‌সমার ও শেল্‌ডনের মতবাদ—ইঁহারা মনে করেন যে, দেহের গঠনের উপর ব্যক্তিত্ব নির্ভর করে। (৯ম অধ্যায়, ১ম অনুচ্ছেদ—পৃঃ ২৮৫-৯১ দ্রষ্টব্য)।

(জ) মার্‌ফি (Gardner Murphy)-র মতবাদ—মনোবিদ্‌গণের একদল দৈহিক বা জৈব উপাদান (biological factors)-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, আবার আর একদল বাহ্যপরিবেশের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। মার্‌ফি এই দুই ভিন্ন মতবাদের সমন্বয় করেন এবং তিনি বলেন যে, ব্যক্তিত্ব হইল দ্বিমুখী (bipolar)—যেন ইহার এক দিক্ আছে দেহের মধ্যে, অপর দিক্ আছে বাহ্যপরিবেশের মধ্যে। এইজন্য মার্‌ফি বলেন যে, ব্যক্তিত্ব হইল জৈব ও সামাজিক উপাদানের যুক্ত ফল (bio-social product)। এই দুই শ্রেণীর উপাদানের সমন্বয় ও সংগঠনে ব্যক্তিত্ব এক বিশেষ রূপ ধারণ করে।[২০]

(ঝ) গেস্টাণ্ট্ মতবাদ—এই মতবাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে কুর্ট লেভিন্ (Kurt Lewin) ব্যক্তিত্বকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে পারিপার্শ্বিক অবস্থা (behavioural environment বা field)-এর মধ্যে। যখন রাম, শ্যাম, যদু, মধু এই চারিজন মিলিয়া একটি কার্য করে বা আলাপ-আলোচনা করে, তখন এক প্রকারের 'ক্ষেত্র' রচিত হয়; আবার যখন রাম চলিয়া গেল বা নবীন আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন আবার সমগ্র ক্ষেত্রের রূপ

১৯ তাঁহার মতে "All motivation is contemporary."

২০ মার্‌ফির ভাষায়: "The person is a structured organism-environment field each aspect of which stands in dynamic relation to other aspects." (*Personality: A biosocial approach to origin and stucture*, p. 8).

মার্‌ফি ব্যক্তিত্বের মূল উপাদান (basic components) হিসাবে নিম্নলিখিত উপাদানের উল্লেখ করিয়াছেন: (১) physiological dispositions, (২) canalizations, (৩) conditioned responses, এবং (৪) cognitive and perceptual habits.

পরিবর্তিত হইয়া গেল এবং এক এক ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের প্রকাশেরও রূপ যেন পরিবর্তিত হইয়া যায়। যখনই কোন ব্যক্তি কার্য করে, তখনই একটি 'মানস শক্তি' (psychological force)-এর সৃষ্টি হয়।[২১]

আমরা উপরে ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি প্রধান মতবাদের আলোচনা করিলাম।[২২] ইহাদের সকলগুলির মধ্যেই আংশিক সত্য আছে, তবে কোনটিই ব্যক্তিত্বের সকল বৈশিষ্ট্যকে পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারে না।

২। ব্যক্তিত্বের উপাদান (Factors of Personality):

ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের আলোচনা হইতে আমরা দেখিলাম যে, ব্যক্তিত্ব হইল অল্পবিস্তর সামঞ্জস্যপূর্ণ জটিল সংগঠন। এখন প্রশ্ন হইতেছে: কোন্ কোন্ উপাদান (factor বা constituent) লইয়া ব্যক্তিত্ব গঠিত? অর্থাৎ কিসের দ্বারা ব্যক্তিত্ব নির্ধারিত হয়?

এ প্রশ্নের উত্তর দান করিবার পূর্বে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে 'উপাদান'-পদটি আপেক্ষিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আমরা যখন বলি যে, জলের উপাদান দুইটি—অম্লজান ও উদজান, তখন ইহার অর্থ হইল, এক বিশেষ পরিমাণে ইহাদের মিশাইলে জল পাওয়া যাইবে; ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে যখন আমরা উপাদানের উল্লেখ করি, তখন ইহার অর্থ নহে যে, অম্লজান ও উদজানের অনুরূপ কতকগুলি মৌলিক দ্রব্যের বিশেষ সংমিশ্রণ ঘটিলেই ব্যক্তিত্ব পাওয়া যাইবে।

আবার ব্যক্তিত্বের এক বিশেষ সমগ্রত্ব আছে যাহা উহার তথাকথিত উপাদান বর্ণনার মাধ্যমে পাওয়া যায় না। একটি কৃত্রিম জড়দ্রব্যের যদি বিশেষ বিশেষ উপাদানের বা আকারের বর্ণনা দান করা যায়, তাহা হইলে উহার সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা করা যায়; যেমন, যদি বলা যায় যে, একটি টেবিল আকারে এইরূপ এবং উচ্চতায়, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে এত এত মিটার, তাহা হইলে ঐ টেবিল সম্বন্ধে অনেকটা সঠিক ধারণা করা যায়। ব্যক্তিত্বের

২১ এই প্রসঙ্গে লেভিন্ দুইটি পদ ব্যবহার করিয়াছেন—'তান' (tension) এবং 'শক্তি' (valence)। একটি ক্ষেত্রের আকর্ষণ (attraction) বা বিকর্ষণের (repulsiveness) যে শক্তি থাকে, তাহাকে *valence* বলে।

২২ ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের বিস্তারিত বিবরণের জন্য Hall & Lindzey *Theories of Personality* দ্রষ্টব্য।

ক্ষেত্রে উপাদানগুলির এইরূপ কোন সম্যক্ পরিমাণগত বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নহে। যেমন, কোন সুন্দর দ্রব্যের সামগ্রিক সৌন্দর্য উহার গঠনকারী উপাদানের তালিকা হইতে উপলব্ধি করা যায় না, সেইরূপ ব্যক্তি-বিশেষের ব্যক্তিত্বের অভিনবত্ব উহার উপাদান-বিশ্লেষণের সাহায্যে পাওয়া যায় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উপযুক্ত পদের অভাবে আমরা 'উপাদান' পদটি ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া থাকি।

ব্যক্তিত্বের সকল রহস্য উদ্‌ঘাটন যদিও সম্ভব নহে, তাহা হইলেও আমরা সাধারণভাবে নিম্নলিখিত উপাদানের উল্লেখ করিতে পারি:

(১) প্রথমতঃ কতকগুলি হইল **প্রকৃতি-দত্ত উপাদান** (natural endowments)—ইহারা **জন্মগত**[২৩] (innate বা inborn)। (ক) ইহাদের কতকগুলি বংশজ (hereditary)—এইগুলি আমরা পূর্বপুরুষদিগের নিকট হইতে লাভ করি। (খ) আবার কতকগুলি নির্ভর করে দেহের নালিকাবিহীন (ductless) বা অন্তঃক্ষরা (endocrine) গ্রন্থি (glands)-এর কার্যের উপর; (গ) আর কতকগুলি উপাদান নির্ভর করে দেহের গঠন (physical structure)-এর উপর। (অবশ্য ইহা স্বীকার্য যে, দেহের গঠন-বৈশিষ্ট্য কিছু পরিমাণে বংশপ্রভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়। সুতরাং এই শ্রেণীবিভাগকে আপেক্ষিক অর্থে বুঝিতে হইবে।)

(২) দ্বিতীয় প্রকারের উপাদান হইল **পরিবেশগত** (environmental) এবং ইহাদের কতকগুলি আবার হইল **শিক্ষণ বা কৃষ্টিমূলক** (developed through culture or nurture)। সামাজিক পরিবেশ যে কেবল ব্যক্তিমনের সংজ্ঞান স্তরেই প্রভাব বিস্তার করে, তাহা নহে:

২৩ এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে, আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্তায় আমরা গঠনগত (constitutional), জন্মগত (congenital), সহজাত (innate) এবং বংশানুক্রমে প্রাপ্ত (hereditary) — এই পদগুলি সমার্থকভাবে ব্যবহার করি। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ইহা সমীচীন নহে।

(১) যাহা গঠনগত (constitutional), তাহা কতকাংশে জন্মগত আবার কতকাংশে জীবদ্দশায় প্রাপ্ত।

(২) যাহা জন্মগত (congenital), তাহা কতকাংশে গর্ভধারণের প্রথম মুহূর্ত হইতেই প্রাপ্ত, আবার কতকাংশ মাতৃজঠরে অবস্থানকালে প্রাপ্ত।

(৩) যাহা সহজাত (innate) তাহা কতকাংশে বংশানুক্রমিকভাবে পিতামাতা ও অন্যান্য পূর্বপুরুষগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত, আবার কতকাংশে জননকোষে কোন আকস্মিক পরিবর্তন-জনিত।

(Cattell. *Personality*, pp. 119-21 দ্রষ্টব্য)।

উহা সকলের অলক্ষ্যে মনের নির্জ্ঞান স্তরের উপরও প্রভাব বিস্তার করে এবং কতকাংশে উহার সংগঠনে সহায়তা করে এইরূপও বলা যায়।

৩। বংশপ্রভাব (Hereditary Factors):

বংশপ্রভাব আমাদের ব্যক্তিত্বের উপর কি ভাবে কার্য করে বা আমরা পূর্বপুরুষদিগের নিকট হইতে কি ভাবে ও কিসের মাধ্যমে তাহাদের বৈশিষ্ট্য পাইয়া থাকি, তাহা বুঝিতে হইলে প্রথমে প্রাণিবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে তথাকথিত জন্মরহস্য আলোচনা করিতে হইবে।

বংশগতির বাহক (Carriers of heredity):

স্ত্রী-পুরুষের মিলনের ফলে সন্তানের জন্ম। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার বহুপূর্ব হইতেই—জন্মের প্রায় ২৮০ দিন পূর্ব হইতে—মাতৃ-জঠরে শিশুর জীবন সুরু হয়। এই জীবন সর্বপ্রথম অবস্থায় হইল একটি ডিম্বকোষ (fertilised egg)-মাত্র। কোষের ধর্ম হইল নিজেকে বহুসংখ্যক করা (self-multiplication), এবং ইহারই ফলে একটি কোষ হইতে দুই, দুই হইতে চার, চার হইতে আট, এইভাবে বহু-কোষ বিশিষ্ট একটি জীবের জন্ম হয় এবং জন্মের পরও ঐ কোষগুলি নিজেদের বহুগুণিত করিতে থাকে।

যাহা হউক প্রথম ডিম্বকোষটি (zygote বা fertilised egg) কি ভাবে হইল? ইহা দুইটি জনন-কোষ (germ cell)-এর মিলনে গঠিত। একটি জনন-কোষ আসে পিতৃদেহ হইতে—ইহাকে বলে শুক্রকীট (spermatozoa): আর একটি জনন-কোষ আসে মাতৃগর্ভে অবস্থিত দুইটি ডিম্বাধার (ovary)-এর যে কোন একটি হইতে—ইহাকে বলে ডিম্বাণু (ovum)।

পুং-জননকোষ বা শুক্রকীটের মস্তকে থাকে উহার কেন্দ্রাংশ (nucleus) এবং সেইরূপ ডিম্বাণুর মধ্যেও থাকে একটি কেন্দ্রাংশ। প্রতি জনন-কোষের কেন্দ্রাংশে থাকে বংশজ প্রলক্ষণের কতকগুলি বাহক; ইহাদের বলা হয় 'ক্রোমোসোম' (chromosome)[২৪] এবং প্রতি জনন-কোষে ইহাদের সংখ্যা ২৪টি। পুং-দেহ হইতে আগত জনন-কোষের কেন্দ্রাংশ স্ত্রী-দেহে অবস্থিত জনন-কোষের কেন্দ্রাংশের মধ্যে প্রবেশের পরমুহূর্ত হইতেই নূতন ডিম্ব-কোষের সৃষ্টি হয় এবং এই ডিম্ব-কোষের ক্রোমোসোমের মোট সংখ্যা

---

২৪ 'Chromosome'-পদের বুৎপত্তিগত অর্থ হইল 'রঙীন দেহ' (coloured bodies)। আসলে কিন্তু ইহারা রঙীন নহে—ইহাদের অণুবীক্ষণযন্ত্রের মাধ্যমে দেখিবার সুবিধার জন্ত বিশেষ প্রকারের রঙ্ (special dyes) ব্যবহার করিতে হয়; সেইজন্ত এইরূপ নামকরণ করা হইয়াছে।

হইল ২৪+২৪, অর্থাৎ ৪৮। যেহেতু এই ডিম্ব-কোষটি নিজেকে সমভাবে দ্বিত্ব করিতে থাকে, সেই হেতু উহা হইতে উদ্ভূত প্রতিটি কোষের মধ্যেও ৪৮টি ক্রোমোসোম থাকিবে।

এই কোষগুলি আবার দুই প্রকারের—দেহ-কোষ (body cell) এবং জনন-কোষ (germ cell)। যদিও দেহ-কোষগুলি ক্রমান্বয়ে নিজেদের অনুরূপ দেহ-কোষের সৃষ্টি করিয়া সংখ্যাবৃদ্ধি করিতে থাকে, তাহা হইলেও জনন-কোষগুলির ঐরূপ পরিবর্তন সাধিত হয় না—পরবর্তী বংশধর সৃষ্টির কার্যে পরে ব্যবহৃত হইবার জন্য ইহারা পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করে। স্ত্রী-দেহের জনন-কোষ বা ডিম্বাণুগুলি থাকে স্ত্রীলোকের গর্ভাশয়দ্বয়ে এবং পুং-দেহের জনন-কোষগুলি থাকে পুরুষের অণ্ডাধারে। স্ত্রী-দেহের ডিম্বাণু কিভাবে রচিত হয় তাহা জানা নাই—তবে জন্মাবধি তাহারা গর্ভাধারে সঞ্চিত থাকে এবং যৌবনের প্রারম্ভে পুষ্ট হয়; এবং দেহ-কোষগুলিতে যে ৪৮টি ক্রোমোসোম থাকে, ডিম্বাণুতে তাহার মাত্র অর্ধেক, অর্থাৎ ২৪টি থাকে।

বয়ঃসন্ধিকাল (period of puberty)-এ পুং-অণ্ডাধারে যে জনন-কোষগুলি থাকে তাহারা নিজেদের সমানভাবে দ্বিখণ্ডীকরণ (self-division) করে—ইহার ফলে যে জীব-কোষ বা শুক্রকীট গঠিত হয় তাহাদের মস্তিষ্কভাগে বা কেন্দ্রাংশে ৪৮টি ক্রোমোসোম না থাকিয়া মাত্র ২৪টি থাকে। এইরূপ সম-দ্বিখণ্ডীকরণ যদি না হইত, তাহা হইলে প্রথম বংশে নূতন ডিম্বকোষে ৪৮+৪৮=৯৬, তাহার পরবর্তী বংশে ৯৬+৯৬= ১৯২ এবং এইভাবে যুগযুগ ধরিয়া ক্রোমোসোমের সংখ্যা এক ধারণাতীত বিরাট্ অঙ্কে পরিণত হইত![২৫]

যাহা হউক্, এই ক্রোমোসোম বা বংশগতি-বাহকগুলি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দণ্ড (rod)-এর ন্যায় এবং ইহার অভ্যন্তরে থাকে অসংখ্য গুটিকা বা দানা (bead)-এর ন্যায় পদার্থ; এইগুলিকে বলা হয় **উৎপাদন-অণু বা 'জিন'** (gene). **এই উৎপাদন-অণু (gene)-গুলিই হইল বংশগতির প্রকৃত বাহক।**

আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতায় দেখিতে পাই যে, একই পিতামাতার বিভিন্ন সন্তানের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসত্ত্বেও বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব থাকে—কতকাংশে তাহাদের দৈহিক আকৃতি ভিন্ন এবং মানসিক বৃত্তিও ভিন্ন। ইহার কারণ

২৫ সাম্প্রতিক কালের একদল বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে, মানুষের দেহ-কোষে ক্রোমোসোমের সংখ্যা ২৪ জোড়া নহে, উহা ২৩ জোড়া বা ৪৬টি; সুতরাং জনন-কোষে ক্রোমোসোমের সংখ্যা হইবে উহার অর্ধেক, অর্থাৎ ২৩। অতএব পুং-জনন কোষ এবং ডিম্বাণুর মিলনে উৎপন্ন কোষটিতে ক্রোমোসোমের সংখ্যা হইবে ২৩+২৩ বা ৪৬। (Krech & Crutchfield, *Elements of Psychology*, p 563 এবং *Nature*, vol. 178, pp. 1020-23 দ্রষ্টব্য)।

কি? ইহার উত্তর হইল যে, একই পিতামাতার বিভিন্ন সন্তান ভিন্ন ভিন্ন জনন-কোষের মিলনে জন্মলাভ করিয়াছে এবং এই জনন-কোষগুলির বংশগতি-বাহক বা ক্রোমোসোমগুলি বিভিন্ন। এই ক্রোমোসোমগুলি যে সব বিভিন্ন প্রলক্ষণের সম্ভাব্যতা বহন করে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি প্রকাশমান (dominant) হয় এবং কতকগুলি সুপ্তভাবে (dormant) থাকে। একটি উদাহরণ লওয়া যাউক্। এমন হইতে পারে যে, বাহ্যতঃ কোন ব্যক্তি দীর্ঘাঙ্গ হইলেও তাহার কোষগুলির মধ্যে খর্বতার সম্ভাব্যতা সুপ্তভাবে আছে; জনন-কোষ গঠন কালে সম-দ্বিখণ্ডীকরণের ফলে যখন একটি করিয়া ক্রোমোসোম বর্জিত হয়, তখন কোন জনন-কোষে দীর্ঘতার সম্ভাব্যতা বহনকারী ক্রোমোসোম থাকিতে পারে, আর কোন জনন-কোষে খর্বতার সম্ভাব্যতা বহনকারী ক্রোমোসোম থাকিতে পারে। ইহার ফলে একই পিতামাতার ভিন্ন ভিন্ন সন্তানের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের উচ্চতা (height) দেখা যাইতে পারে।

ধরা যাউক্, পিতা ও মাতা উভয়েই দীর্ঘাঙ্গ (tall); অথচ তাহাদের কোন সন্তান দীর্ঘাকৃতি, আর কোন সন্তান খর্বাকৃতি। এমন হইতে পারে যে, পিতা ও মাতার মধ্যে খর্বতার প্রলক্ষণ সুপ্তভাবে আছে; ইহার জন্য এক একটি সন্তান এক এক প্রকারের উচ্চতা-বিশিষ্ট হইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সম্ভাবনা দেখা দেয়:

(১) প্রথম সন্তানের ক্ষেত্রে এইরূপ হইতে পারে যে, পিতা ও মাতার উভয়েরই জননকোষ হইতে খর্বতার বাহক ক্রোমোসোমটি বর্জিত হইয়াছে; সুতরাং এই দুই জনন-কোষের মিলনে উৎপন্ন ডিম্বকোষটির মধ্যে ১ জোড়া ক্রোমোসোম থাকিবে যাহারা উভয়ই দীর্ঘতার বাহক। অর্থাৎ এইক্ষেত্রে হইবে:

[দীঃ (খঃ)] × [দীঃ (খঃ)] = দীঃ দীঃ; এই সন্তানটি হইবে 'প্রকৃত দীর্ঘ' (Pure Tall)।

(২) দ্বিতীয় সন্তানের ক্ষেত্রে এমন হইতে পারে:

[(দীঃ) খঃ] × [(দীঃ) খঃ] = খঃ খঃ; এই সন্তানটি হইবে 'প্রকৃত খর্ব (Pure Shorc)।

(৩) তৃতীয় সন্তানের ক্ষেত্রে এইরূপ হইতে পারে:

[দীঃ (খঃ)] × [(দীঃ) খঃ] = দীঃ খঃ; অর্থাৎ এই সন্তান হইবে 'মিশ্র দীর্ঘ' (Hybrid Tall)।

(৪) চতুর্থ সন্তানের ক্ষেত্রে এইরূপ হইতে পারে :

[(দীঃ) খঃ] × [দীঃ (খঃ)] = দীঃ খঃ ; অর্থাৎ এই সন্তানটিও হইবে 'মিশ্র দীর্ঘ' (Hybrid Tall)।

দ্রষ্টব্য—এই স্থানে 'দীঃ' অর্থে দীর্ঘতা এবং 'খঃ' অর্থে খর্বতা বুঝিতে হইবে। পিতা বা মাতার দেহের কোষের ১ জোড়া ক্রোমোসোমকে [ ]-এই বন্ধনীর মধ্যে রাখা হইয়াছে। জনন-কোষ গঠনের সময় যে ক্রোমোসোমটি পরিত্যক্ত হইতেছে, তাহাকে ( )-এই বন্ধনীর মধ্যে রাখা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতে হইবে। ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতা স্ত্রী-পুরুষ ভেদে ঘটিয়া থাকে। সুতরাং প্রশ্ন উঠিতে পারে : সন্তানের লিঙ্গভেদ (অর্থাৎ গর্ভস্থ শিশু পুত্র হইবে অথবা কন্যা হইবে) কি-ভাবে ঘটে ?

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, মনুষ্য-দেহের প্রতিটি কোষে ২৪ × ২ অথবা ৪৮টি ক্রেমোসোম থাকে—ইহাদের ভিতর একজোড়া বা দুইটি ক্রোমোসোম থাকে যৌন-নির্ধারক (sex-determining chromosomes)। স্ত্রীলোকের কোষে (cells) যে দুইটি যৌন-নির্ধারক ক্রোমোসোম থাকে তাহারা একই আকারের—তাহাদের বলা হয় XX-ক্রোমোসোম। কিন্তু পুরুষের কোষে যে দুইটি যৌন-নির্ধারক ক্রোমোসোম থাকে তাহাদের একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র—ইহাদের বলা হয় XY-ক্রোমোসোম। পুং-দেহের যে সমস্ত কোষ জনন-কোষরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহাদের মধ্যে যখন সম-দ্বিখণ্ডীকরণ বা সম-বিভাগ (self-division বা reduction division) ঘটে, তখন কোন কোষে x-ক্রোমোসোম আর কোন কোষে y-ক্রোমোসোম থাকে। স্ত্রী-দেহের ডিম্বাণু মাত্রেই x-ক্রোমোসোম থাকিবে। ফলে যদি x-ক্রোমোসোম-বাহক পুং-জননকোষ ডিম্বাণুতে প্রবেশ করিয়া নূতন ডিম্বকোষ গঠন করে, তাহা হইলে উহাতে xx-ক্রোমোসোম থাকিবে এবং ভাবী সন্তান কন্যা হইবে ; অপর পক্ষে যদি y-ক্রোমোসোম-বাহক পুং জনন-কোষ ডিম্বাণুতে প্রবেশ করে, তাহা হইলে নূতন ডিম্বকোষে xy-ক্রোমোসোম থাকিবে এবং ভাবী সন্তান পুত্র হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সন্তানের যৌন-পার্থক্য পিতৃ-জনন-কোষ দ্বারা নির্ধারিত হয়।[২৬]

২৬ এইজন্য বলা হয় "Sex of the child is the gift of the father."

এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, পিতৃদেহের x-ক্রোমোসোমের সহিত যদি কোন রোগ 'সংশ্লিষ্ট' থাকে, তাহা হইলে সাধারণতঃ কন্যারা উহা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়া নিজেদের সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত করে। যেমন, অনেকে মাতার মাধ্যমে মাতামহ হইতে বর্ণান্ধতা (colour-blindness) রোগ উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে (অথচ, মাতা নিজে ঐ রোগের 'বাহিকা' হইলেও উহা দ্বারা আক্রান্ত হয় না)।

(যৌন-নির্ধারক ক্রোমোসোম ব্যতীত অন্যান্য ক্রোমোসোমকে 'autosome' বলা হয়)।

যমজ-সন্তানের ব্যক্তিত্ব (Personality of twins) ঃ

বংশগতি যে ব্যক্তিত্বকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় যমজ-সন্তানের ক্ষেত্রে।

যমজ-সন্তান দুই প্রকারের ঃ **সম-ডিম্বজ** বা **এক-ডিম্বজ** (uniovular) এবং **দ্বি-ডিম্বজ** (di-ovular)। সম-ডিম্বজ যমজেরা সম-প্রকৃতিবিশিষ্ট (identical) এবং দ্বি-ডিম্বজ যমজেরা একই পিতামাতার বিভিন্ন সময়ে জাত সন্তানের ন্যায় (ইহাদের বলা হয় fraternal twins ; ইহারা sibling-এর ন্যায়)।

সম-ডিম্বজ যমজের ব্যক্তিত্ব একই প্রকারের। পিতৃদেহ হইতে আগত একটি জনন-কোষ মাতৃদেহের একটি জনন-কোষের সহিত মিলিত হইয়া যে ডিম্ব গঠন করে, তাহা যদি গর্ভাবস্থার আদি স্তরে কোন কারণে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায় তাহা হইলে যে দুই যমজ সন্তানের জন্ম হয়, তাহাদের 'সম-ডিম্বজ যমজ' বলে। এই দুই সন্তান দুইজনেই হয় পুত্র, না হয় কন্যা হইবে এবং ইহাদের ব্যক্তিত্ব অভিন্ন হইবে, কারণ ইহারা দুইজনেই একই প্রকারের ক্রোমোসোমের অধিকারী।

দ্বি-ডিম্বজ যমজের ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন প্রকারের। পিতৃ-দেহ হইতে আগত দুইটি বিভিন্ন জনন-কোষ যদি মাতৃদেহের দুইটি ভিন্ন ডিম্বাণুতে অল্পবিস্তর একই সময় প্রবেশ করে, তাহা হইলে যে দুই যমজ সন্তানের জন্ম হয় তাহাদের কোষে ক্রোমোসোমগুলি বিভিন্ন ; সুতরাং তাহাদের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলিও পৃথক্।

এক-ডিম্বজ যমজের ব্যক্তিত্ব একই প্রকারের কি না তাহা লইয়া কিছু কিছু অনুসন্ধান কার্য চালান হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশের মধ্যে দুইটি এক-ডিম্বজ যমজকে রাখিয়া দেখা হইয়াছে যে, তাহাদের ব্যক্তিত্ব একই দিকে বা একই ভাবে প্রকাশমান হয় কি না। অবশ্য এইরূপ অনুসন্ধানের প্রধান অসুবিধা হইল যে, বৈজ্ঞানিকের প্রয়োজনমত যমজ সন্তানদের পৃথক্ পৃথক্ অবস্থার মধ্যে লালন-পালনের সুযোগ পাওয়া দুর্লভ।

গেসেল্ (Gesell) এবং টম্‌সন্ (Thompson) দুইটি এক-ডিম্বজ যমজ ভগিনীকে শৈশব হইতে ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করেন। যদিও সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে তাহাদের শিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় এবং তাহাদের

ব্যক্তিত্বকে ভিন্নমুখী করিয়া তোলার প্রবল চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলেও তাহাদের ব্যক্তিত্ব-প্রলক্ষণ (personality traits)-এর মধ্যে প্রায় সকল বিষয়েই সাদৃশ্য দেখা যায়।

নিউম্যান্ (Newman) দুইটি এক-ডিম্বজ বা সম-ডিম্বজ যমজ ভ্রাতার কথা বলিয়াছেন। তাহারা ভিন্ন ভিন্ন সহরে ভিন্ন পরিবারে লালিত পালিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহারা উভয়ই বিদ্যুৎ-কারখানায় কারিগরী কার্যে দক্ষতা দেখায় এবং যৌবনেও তাহাদের দেহের গঠন ও আকৃতির মধ্যে সাদৃশ্য দেখা দেয়।

স্টিফেন্স্ (Stephens) এবং টম্সন্ (Thompson) আর দুই যমজ ভ্রাতার কথা বলিয়াছেন—তাহারা ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে ভিন্ন ভিন্ন সহরে লালিত-পালিত হইয়াছিল এবং ১৯ বৎসর বয়স পর্যন্ত কেহ কাহাকেও দেখে নাই। অথচ তাহাদের দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের (যথা, বুদ্ধি, আবেগ-প্রবণতা ইত্যাদি) ক্ষেত্রে অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যায়।[২৭]

লাঙ্গে (Lange) কয়েকজন সম-ডিম্বজ এবং দ্বি-ডিম্বজ ভ্রাতার মধ্যে অপরাধপ্রবণতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে, ঐ সব ভ্রাতাদের যাহারা সম-ডিম্বজ তাহাদের দ্বারা সাধিত অপরাধের মধ্যেও সাদৃশ্য ছিল।[২৮]

অবশ্য সকল মনোবিৎ ও প্রাণিবিৎ উপরের এই অভিমত গ্রহণ করেন না। ইঁহারা অনেকে বলেন যে, ব্যক্তি-মনের উপর বংশগতি অপেক্ষা পরিবেশের প্রভাবই অধিকতর।

বাস্তবিক, এ বিষয়ে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসিবার উপযুক্ত সংখ্যক উপাত্ত এখনও সংগৃহীত হয় নাই।[২৯]

বংশগতির মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রলক্ষণ (Hereditary Traits):

বংশগতি সম্বন্ধে আমরা যাহা আলোচনা করিলাম তাহার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে: আমাদের ব্যক্তিত্বের সকল বৈশিষ্ট্যই কি আমরা পূর্বপুরুষদের

২৭ *Journal of Heredity*, 1943 দ্রষ্টব্য।

২৮ J. Lange, *Crime and Destiny* দ্রষ্টব্য।

২৯ তুলনীয়: "The sample of identical twins reared is still too small to justify confident conclusions." (Woodworth, *Psychology*, 12th. Ed., p. 230).

নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে পাই ? যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য বা প্রলক্ষণ পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে পাই ?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিব যে, আমাদের ব্যক্তিত্বের **সকল** বৈশিষ্ট্য ও প্রলক্ষণ আমরা পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে পাই না ; কতকগুলি বৈশিষ্ট্য যে বংশগতির মাধ্যমে প্রাপ্ত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কতকগুলি সম্বন্ধে মাত্র সম্ভাব্যতা (probability)-র অধিক কিছু বলা যায় না এবং আরও কতকগুলি সম্বন্ধে কিছুই জোর করিয়া বলা যায় না।[৩০] উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ সকল সময় সরাসরি মানসিক প্রলক্ষণগুলিকে নির্ধারিত করে না—এবং উহারা স্নায়ুতন্ত্রের গঠন, গ্রন্থির গঠন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন ইত্যাদির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া উহাদের মাধ্যমে ব্যক্তিবিশেষের প্রতিযোজক প্রতিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করিতে পারে।[৩১]

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, কোন্ কোন্ প্রলক্ষণ উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যায়, তাহার কোন সুনির্দিষ্ট তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব নহে।

সাধারণভাবে বলা যায় যে, **বুদ্ধিবৃত্তি কতকাংশে** উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। অর্থাৎ পিতামাতা বা পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে আমরা বুদ্ধির একটা **প্রবণতা** (tendency) লাভ করি (যদিও অবশ্য শিক্ষণের মাধ্যমে বুদ্ধি মার্জিত ও বিকশিত হয়)। বুদ্ধিবৃত্তি যে বংশগতিদ্বারা প্রভাবিত হয়, তাহার সপক্ষে আমরা নিম্নলিখিত উপাত্ত পাই :

(১) এক একটি "প্রতিভাশালী" বংশ দেখিতে পাওয়া যায় যাহাদের প্রায় সকলেই তীক্ষ্নবুদ্ধিসম্পন্ন।

(২) আবার ইহার বিপরীতও দেখা যায় ; অর্থাৎ একটি পরিবারের

৩০ Dr. N. N. Sen Gupta বলেন : "A critical survey of authentic data leads to the conclusion that our belief in the hereditary transmission of a considerable number of mental traits has no sure foundation in facts. The evidence is strong in some cases ; it raises a bare presumption in others ; and it yields no definite conclusion in still others. There is no simple and unqualified answer to the question 'Are mental traits heritable ?' " (*Heredity in Mental Traits*, Preface, p. ix).

৩১ Shaffer, *The Psychology of Adjustment*, p. 344 দ্রষ্টব্য।

সকলেরই মধ্যে অল্পবিস্তর উনমানসতা (feeble-mindedness বা amentia) দেখা যায়।[৩২]

(৩) একই সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থার মধ্যে লালিত-পালিত এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত বিভিন্ন পরিবারভুক্ত শিশুদের মধ্যে বুদ্ধির পার্থক্য যথেষ্ট থাকে; কিন্তু একই অবস্থার মধ্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত একই পিতামাতার সন্তানদের মধ্যে বুদ্ধির পার্থক্য তদপেক্ষা কম দেখা যায়। অথচ বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত একই পিতামাতার এক-ডিম্বজ সন্তানদের বুদ্ধ্যঙ্ক (I.Q.) মোটামুটি একই প্রকারের হয়।[৩৩]

এই সব শিশুদের বুদ্ধ্যঙ্কের মধ্যে **গড়পড়তা পার্থক্য** সাধারণতঃ নিম্নরূপ হারে থাকে—

এক-ডিম্বজ যমজদের বুদ্ধ্যঙ্ক-পার্থক্য	দ্বি-ডিম্বজ যমজদের বুদ্ধ্যঙ্ক-পার্থক্য	একই পিতামাতার ভিন্ন সময়ে জাত সন্তানদের বুদ্ধ্যঙ্ক-পার্থক্য	ভিন্ন পরিবারভুক্ত সন্তানদের বুদ্ধ্যঙ্ক-পার্থক্য
৫	৯	১১	১৫

কর্মদক্ষতা বা **কার্যপটুতা** (skill and talent) কিয়দংশে পূর্বপুরুষগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত। তবে দক্ষতা, কুশলতা বা পটুতা বলিয়া কোন একটি সরল বৈশিষ্ট্য (simple characterstic) নাই—ইহা একটি জটিল গুণ। একই বংশের বিভিন্ন ব্যক্তির কার্যকুশলতা যে ঠিক একইভাবে প্রকাশিত হইবে তাহা নহে; এক একজন এক একটি বিষয়ে দক্ষতা দেখাইতে পারে।

৩২ গডার্ড প্রায় তিনশতের অধিক পরিবার পর্যবেক্ষণ করিয়া বলেন যে, উনমানসতা একটি বংশজ প্রলক্ষণ। (Goddard, ***Feeble-mindedness**: **Its causes and consequences*** দ্রষ্টব্য)।

৩৩ শাইন্‌ফেল্ড (Scheinfeld) বলেন: "IQs of identical twins do often differ, although on an average ***they are much more alike than those of fraternal twins*** and decidedly more alike than those of ordinary brothers and sisters in the same family." (*The New You and Heredity*, p. 339).

সেইরূপ সংবেদন-বিনিশ্চয়তা (sensory discrimination), প্রতি-ক্রিয়ার দ্রুতি (speed of reaction) এইগুলিও বংশগতির দ্বারা প্রভাবিত হয়।

ইহা ছাড়া, দৈহিক বৈশিষ্ট্য, যথা, দীর্ঘতা বা খর্বতা, স্থূলত্ব বা ক্ষীণত্ব, গাত্রবর্ণ, চক্ষুর বর্ণ, কেশের বর্ণ, ইত্যাদি বংশগতি দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়।[৩৪]

বংশগতির মাধ্যমে অল্পপরিমাণে যে সব প্রলক্ষণ পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে আয়ান-প্রলক্ষণ (temperament traits), যথা, আবেগপ্রবণতা, মেজাজের দ্রুত পরিবর্তনশীলতা, পরিশ্রমশীলতা অথবা উহার বিপরীত অবস্থা।

বংশগতি দ্বারা সর্বাপেক্ষা কম প্রভাবিত হয়, অথবা একেবারেই প্রভাবিত হয় না এইরূপ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখ করা যাইতে পারে প্রতিন্যাস (attitudes), বিশ্বাস, আদর্শ এবং মূল্যবোধ (value sense)।[৩৫]

বংশগতির প্রভাবে ব্যক্তি-বিশেষ অসদ্‌গুণ বা অনিষ্টকারী প্রলক্ষণেরও অধিকারী হইতে পারে। কতকগুলি দৈহিক রোগের প্রবণতা, মানসিক রোগের প্রবণতা (যথা, schizophrenia বা চিত্তভ্রংশী বাতুলতা), অপরাধ-প্রবণতা 'বংশজপ্রলক্ষণ' হিসাবে ব্যক্তি-বিশেষের মধ্যে প্রকাশিত হইতে পারে।

---

৩৪ এইস্থানে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বংশগতির ফলে পূর্বপুরুষ ও উত্তরপুরুষদের মধ্যে সকল সময় যে সাদৃশ্যই থাকিবে তাহা নহে, বৈসাদৃশ্যও থাকিতে পারে। আমরা পূর্বেই (পৃঃ ২৪৯) বলিয়াছি যে, প্রলক্ষণগুলির মধ্যে কোনটি পিতামাতার মধ্যে প্রকট বা প্রকাশমান (dominant বা manifest) থাকিতে পারে, আবার কোনটি সুপ্ত (recessive বা dormant) থাকিতে পারে এবং ঐ সুপ্ত প্রলক্ষণগুলি সন্তানসন্ততির মধ্যে প্রকাশমান হইতে পারে। যেমন, জেনিংস উদাহরণ-স্বরূপ বলিয়াছেন যে, পিতামাতার কটাচক্ষু থাকা সত্ত্বেও যদি সন্তানের নীলচক্ষু হয় তাহা হইলে উহার মধ্যে যে বংশগতি প্রভাব একেবারেই নাই, তাহা নাও হইতে পারে। (Jennings, *The Biological Basis of Human Nature* দ্রষ্টব্য)।

৩৫ বংশগতির প্রভাবের ক্রম অনুসারে শাইন্‌ফেল্ড্‌ প্রলক্ষণগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে সাজাইয়াছেন।

"*Most likely to be influenced by heredity* :—Basic abilities, such as intelligence, speed of reaction, motor skills, sensory discrimination etc.

Less likely to be influenced by heredity :—Temperamental traits, such as emotionality, alteration or evenness of mood, activity or lethargy.

Least likely to be influenced by heredity (if at all) :—Attitudes, stylistic traits, beliefs, values......" (*The New You and Heredity*, p. 425).

এই প্রসঙ্গে আরও দ্রষ্টব্য Young & Mack, *Sociology & Social Life*, p. 109.

অভিজ্ঞতা-লব্ধ গুণের উত্তরাধিকার (**Transmission of Acquired Characteristics**) :

পরিশেষে প্রশ্ন উঠিতে পারে : ব্যক্তি-বিশেষ তাহার জীবদ্দশায় যাহা শিক্ষালাভ করে বা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যাহা অর্জন করে তাহা তাহার বংশধরেরা কি পাইবে ?

এই প্রশ্নেরও সুস্পষ্ট উত্তর দান করা কঠিন। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, বিদ্বানের পুত্র যে বিদ্বান্ হইবে, সঙ্গীতজ্ঞের পুত্র যে সঙ্গীতজ্ঞ হইবে এমন কিছু নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। যেখানে, সন্তান বিদ্বান্ বা সঙ্গীতজ্ঞ হয়, সেখানেও কতটা বংশগতির প্রভাবে আর কতটা পরিবেশের প্রভাবে তাহা নির্ধারণ করিবার উপায় নাই।

প্রাণিবিদ্যাবিদ্‌গণ (biologists)-এর মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ আছে।[৩৬]

ল্যামার্ক (Lamarck)-এর বিবর্তনবাদ যাঁহারা সমর্থন করেন, তাঁহারা বলেন যে, পরিবেশ (environment)-এর প্রভাবে জীবদেহে যে পরিবর্তন আসে তাহা পরবর্তী বংশধরেরা পায়। ম্যাকডুগাল (McDougall) পরীক্ষণ করিয়া দেখেন যে, কয়েকপুরুষ ধরিয়া যে সমস্ত ইঁদুরেরা এক বিশেষ ধাঁধাঁ-পথে যাইতে অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহাদের পরবর্তী বংশধরেরা সহজেই ঐ পথে নির্ভুলভাবে যাইতে পারে। পাভ্‌লভ্ (Pavlov)-ও বিশ্বাস করিতেন যে, যে সমস্ত ইঁদুর সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়াতে অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহাদের পরবর্তী বংশধরেরা শিক্ষা ব্যতীতই বিকল্প উদ্দীপক প্রত্যক্ষ করিলে প্রতিক্রিয়া করিবে।

অপরপক্ষে ভাইস্‌মান্ (Weismann) ইত্যাদি প্রাণিবিদ্যাবিশারদগণ মনে করেন যে, কেবলমাত্র জনন-কোষগুলির পরিবর্তন (germinal variations) পরবর্তী বংশধরেরা পায়; পরবর্তী বংশ-প্রজননের জন্য জনন-কোষগুলি দেহ-কোষ হইতে পৃথক্ থাকে।[৩৭]

৩৬ এই বিষয়ে বিবিধ মতবাদ ও পরীক্ষণের আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : O. Klineberg, *Social Psychology*, pp. 233-241, P. B. Chatterji, *Outines of General Philosophy*, 12th Ed., pp. 156-159.

৩৭ এই মতের প্রতিধ্বনি করিয়া ডনকাষ্টার (Doncaster) বলেন : "Germ-substance is derived from germ-substance, the body being a kind of offshoot from it. The child is like its parent, not because it is produced from the parent, but because both child and parent are produced from the same stock of germ-plasm." (*Heredity*, p. 144).

এই দুই মতবাদের সপক্ষে যে সব পরীক্ষা ও ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাদেরও আবার বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হইয়াছে। এইজন্য ব্যক্তি-বিশেষের অর্জিত গুণাবলী তাহার বংশধরেরা কতদূর পায় তাহা বলা কঠিন। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে, যেহেতু জনন-কোষগুলি দেহ-কোষ হইতে পৃথক্, সেই হেতু এইরূপ গুণাবলী বংশধর কর্তৃক পাওয়ার সম্ভাবনা কম।[৩৮]

জনক-কোষে কিভাবে কখন পরিবর্তন আসে তাহা আমাদের নিকট অজ্ঞাত। প্রকৃতির "প্রয়োজনে" নূতন জীবের বিবর্তনের জন্য উহা সাধিত হয় বলা যাইতে পারে। কৃত্রিম উপায়ে (যথা, রঞ্জন-রশ্মি, এ্যাট্‌ম-রশ্মি ইত্যাদির প্রভাবে) জনন-কোষের আকস্মিক এবং সম্ভবতঃ অনিষ্টকর পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে।[৩৯]

মেন্‌ডেলের নীতি (Mendel's Laws):

বংশনীতি লইয়া আলোচনা সুরু করেন ধর্মযাজক গ্রেগর মেন্‌ডেল্ (Bishop Gregor Mendel)। তিনি মটর-শুঁটি (peas) লইয়া গবেষণা করেন। তিনি দেখেন যে, গোলাকার ও কুঞ্চিত (round and wrinkled) মটর শুঁটির সংমিশ্রণে যে মটর-শুঁটি জন্মিল, তাহাদের সবগুলিই গোলাকার হইল; কিন্তু এইরূপ মিশ্রণের ফলে উৎপন্ন গোলাকার মটর-শুঁটির সহিত প্রকৃত গোলাকার শুঁটির সংমিশ্রণে যে সব মটর-শুঁটি হইল, তাহাদের প্রতি চারিটির মধ্যে তিনটি হইল গোলাকার এবং একটি হইল কুঞ্চিত। তাহার পরবর্তী বংশেও সকলগুলি গোলাকার হইল না।

---

৩৮ তুলনীয়: "Even if we take the most favourable view of the theory of the transmissibility of acquired characters, facts show that hereditary transmission is the exception, and not the rule." (Henri Bergson, ***Creative Evolution***, p. 89).

৩৯ অধ্যাপক হলডেন্ (Haldane)-এর ভাষায়: "The killing of 10 per cent of humanity by an attack with atomic bombs might not destroy civilisation. But the production of abnormalities in 10 per cent of the people by gene mutations induced by radio-activity may very easily destroy it." (Quoted by Scheinfeld, *op. cit.*, p. 485).

ইহা হইতে মেন্‌ডেল্‌ নিম্নলিখিত নীতি প্রবর্তন করেন :

(ক) বংশপ্রভাব যে সকল 'উপাদান'[৪০] (factors)-এর মাধ্যমে পরিবাহিত হয়, সেগুলি বংশপরম্পরায় অপরিবর্তিত থাকে।

(খ) এই উপাদানগুলির মধ্যে যেগুলি সমজাতীয় সেইগুলি এক এক জোড়া একত্রে থাকে, কিন্তু প্রতিক্ষেত্রেই দুইটির মধ্যে একটি প্রকাশমান বা প্রকট (dominant) থাকে এবং অপরটি সুপ্ত (dormant বা recessive) থাকে। (যেমন, দীর্ঘতা ও খর্বতার মধ্যে দীর্ঘতা প্রকট হইতে পারে; গোলাকারত্ব ও কুঞ্চিতদেহত্বের মধ্যে গোলাকারত্ব প্রকট হইতে পারে ইত্যাদি)।

(গ) যখন দুইটি বীজের মিলন ঘটে, তখন প্রতি বীজের প্রতি উপাদান-দ্বয়ের একটি করিয়া পরিত্যক্ত হয়।

৪। নালিকাবিহীন গ্রন্থি বা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি (Ductless or Endocrine Glands) :

আমাদের দেহের অভ্যন্তরে অনেকগুলি গ্রন্থি (gland) আছে; ইহাদের কতকগুলি হইল এইরূপ যে, ইহাদের সহিত কোন নালিকা (duct) সংযুক্ত নাই এবং ইহাদের নিঃসৃত রস রক্ত মধ্যে পড়িয়া সমগ্র দেহমধ্যে দ্রুত সঞ্চালিত হয়।[৪১] এই সব গ্রন্থিগুলিকে নালিকাবিহীন গ্রন্থি বা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি বলা হয়। ইহাদের রসকে সাধারণতঃ বলা হয় **হরমোন** (hormone)[৪২]।

নালিকাবিহীন গ্রন্থিগুলির রস দেহ-মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটাইয়া ব্যক্তিত্বের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এইজন্য ইহারা ব্যক্তিত্বের অন্যতম 'উপাদান'-রূপে পরিগণিত হয়।

৪০ মেন্‌ডেলের সময় chromosome ও gene-পদের প্রচলন হয় নাই, তাই তিনি factor-পদটি ব্যবহার করিয়াছিলেন।

৪১ ব্যক্তিত্বের উপর নালিকাবিহীন গ্রন্থির প্রভাব সম্বন্ধে গ্রন্থকার-রচিত প্রবন্ধ 'The Role of Endocrine Glands in Human Personality', (*Calcutta Review*, August, 1958) দ্রষ্টব্য। বিস্তারিত বিবরণের জন্য R. G. Hoskins-এর *Endocrinology* দ্রষ্টব্য।

৪২ হরমোন পদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল যাহা উত্তেজিত করে, কিন্তু সকল গ্রন্থির রসের প্রভাবে উত্তেজনা হয় না। কোন কোন গ্রন্থির রসের প্রভাবে আবার 'বাধ' (inhibition)-এর সৃষ্টি হয়। এইজন্য কেহ কেহ হরমোন্‌-পদের পরিবর্তে *Autocoid* পদটি ব্যবহার করেন।

প্রধান প্রধান নালিকাবিহীন গ্রন্থিগুলির নাম হইল—থাইরয়েড (Thyroid), প্যারাথাইরয়েড (Parathyroid), থাইমাস্ (Thymus) এ্যাড্রিনাল্ (Adrenal), পিটুইটারি (Pituitary), পিনিয়াল (Pineal) এবং যৌনগ্রন্থি (Gonads বা sex-glands)। এইগুলি ব্যতীত দুইটি সনালী গ্রন্থি (duct gland)-ও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হিসাবে কার্য করে; ইহারা হইল যকৃৎ (Liver) এবং প্যান্‌ক্রিয়াস (Pancreas)-এর কয়েকটি কোষ (যাহাদের বলা হয় 'islet cells of Langerhans')। (নিম্নাঙ্কিত চিত্র দ্রষ্টব্য)।
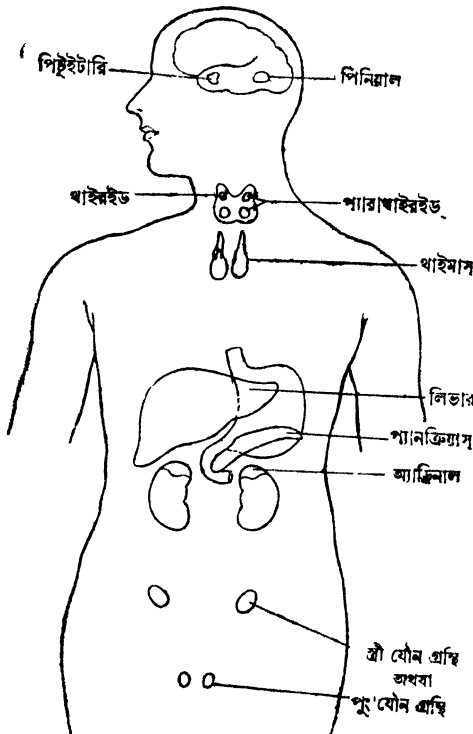
১ নং চিত্র।
উপরের চিত্রে বিবিধ অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির অবস্থান দেখান হইয়াছে।

এই সকল গ্রন্থির প্রয়োজনাতিরিক্ত কার্য (over-activity বা hyperfunction) বা অপর্যাপ্ত কার্যের (under-activity বা hypo-

function-এর) ফল, সুস্থ ব্যক্তির দেহে এই সব গ্রন্থির হরমোন্ ইন্‌জেকৃসনের ফল, এবং ব্যক্তি-বিশেষের দেহে অন্য কোন সুস্থ জীবের দেহ হইতে কোন গ্রন্থি লইয়া উহা গ্রথিত (grafting) করার ফল এবং সুস্থ ব্যক্তির দেহ হইতে কোন গ্রন্থি অপসারণের ফল লক্ষ্য করিয়া ঐ সকল গ্রন্থির কার্য সম্বন্ধে আমরা ধারণা করিবার চেষ্টা করি।

আমরা বর্তমানে এক একটি গ্রন্থির প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

থাইরইড্ গ্রন্থি (Thyroid Gland) :

ইহা গলদেশে শ্বাসনালী (windpipe)-এর সম্মুখে অবস্থিত। ইহা দুইভাগে বিভক্ত—স্বরযন্ত্র (larynx)-এর প্রতি পার্শ্বে এক একটি ভাগ থাকে।

পরিণতবয়স্ক (adult)-দের মধ্যে যদি থাইরইড্ গ্রন্থি অপর্যাপ্তভাবে কার্য করে (অর্থাৎ যদি উহার underactivity বা hypofunction ঘটে), তাহা হইলে যে রোগ দেখা দেয় তাহার নাম **মিক্সিডিমা** (myxœdema); এই রোগের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রকাশ পায় :

(১) শরীরের 'বিপাক' বা অন্তঃস্থ রাসায়নিক কার্য (metabolism বা chemical activity) ব্যাহত হয়। ইহার ফলে রক্তের চাপ ও শরীরের উত্তাপ হ্রাস পায়।

(২) সমগ্র দেহে, বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে, অত্যধিক চর্বি জন্মায়।

(৩) শিশুসুলভ ব্যবহার প্রকাশ পায়—আত্মসংযম কমিয়া যায় এবং উচ্চ পর্যায়ের মানসিক ক্রিয়ার ক্ষমতা ব্যাহত হয়।

(৪) চর্ম শুষ্ক হয় এবং কেশবিরলতা ঘটে।

(৫) হস্ত ও পদ কিছু কিছু স্ফীত হইয়া উঠে।

(৬) কর্মবিমুখতা, অলসতা এবং তন্দ্রাচ্ছন্নতার ভাব দেখা দেয়।

শিশুদের ক্ষেত্রে থাইরইড্ গ্রন্থির অপর্যাপ্ত ক্রিয়া ঘটিলে যে রোগ দেখা দেয় তাহাকে **ক্রেটিনিজ্‌ম্** (cretinism) বলে। এই রোগে নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রকাশ পায় :

(১) শিশুর দেহের প্রচয় বা বর্ধন ব্যাহত হয় এবং শিশু খর্বাকৃতি থাকে।

(২) গাত্র-চর্ম শুষ্ক ও কর্কশ থাকে।

(৩) মুখমণ্ডল বিবর্ণ থাকে এবং দেহের অন্য অংশ ক্ষীণ থাকিলেও উদর স্ফীত হয়।

(৪) গুরুমস্তিষ্কের কোষগুলি বিশেষ পুষ্ট হয় না এবং বুদ্ধির বিকাশ ব্যাহত হয়।

অপরপক্ষে থাইরইড্ গ্রন্থি যদি **প্রয়োজনাতিরিক্ত ক্রিয়া** (hyper-function বা over-activity) করে, তাহা হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রকাশ পায় :

(১) ব্যক্তি-বিশেষের দেহের 'বিপাক' বা রাসায়নিক ক্রিয়া অস্বাভাবিক রূপে বৃদ্ধি পায় ;

(২) ব্যক্তি-বিশেষ উত্তেজনাপ্রবণ ও চঞ্চল হইয়া পড়ে ;

(৩) বয়সের অনুপাতে দেহের বৃদ্ধি ঘটে, বিশেষতঃ ব্যক্তি-বিশেষ দীর্ঘাঙ্গ হইয়া উঠে (যদিও ঐ অনুপাতে যে বুদ্ধির অতিরিক্ত বিকাশ ঘটে তাহা নহে) ;

(৪) ব্যক্তি-বিশেষের ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়।

যদি থাইরইডের রস (যাহাকে **thyroxin** বলা হয়) ইনজেকসন্ দেওয়া হয় অথবা ঐ গ্রন্থির যদি বৃদ্ধি ঘটে, তাহা হইলেও উপরের এই লক্ষণগুলি দেখা যায়।[৪৩]

থাইরইড্ গ্রন্থি যদি **স্বাভাবিকভাবে** কার্য (normal function) করিতে থাকে, তাহা হইলে **ব্যক্তি-বিশেষ বুদ্ধিমান্, কর্মঠ এবং আবেগপ্রবণ হয়, কার্যে প্রেরণা লাভ করে, এবং আশাবাদী হয়।** তাহার মানসিক শক্তিগুলি (mental abilities) বিশেষত: বুদ্ধিশক্তি সুষ্ঠুভাবে বিকশিত হয়। সুতরাং বলিতে পারা যায় যে, অতিরিক্ত কর্মক্ষমতা বা অল্প কর্মক্ষমতারূপ যে ব্যক্তিত্ব-প্রলক্ষণ দেখা দেয়, তাহার পশ্চাতে থাইরইডগ্রন্থির প্রভাব থাকে (অবশ্য থাইরইড্ই যে ইহার একমাত্র কারণ তাহা বলা যায় না)।

---

৪৩ থাইরইডের অস্বাভাবিক বৃদ্ধিকে বলা হয় exopthalmic goitre ; এই রোগের নাম Grave's Disease.

প্যারাথাইরইড্ (Parathyroids) ঃ

ইহারা সংখ্যায় চারিটি ক্ষুদ্রাকৃতি গ্রন্থি এবং থাইরইডের মধ্যে ইহারা গ্রথিত থাকে। ইহাদের কার্য থাইরইডের কার্যের ঠিক বিপরীত। থাইরইড্ হইতে নিঃসৃত রস যেমন উত্তেজনা, কর্মদক্ষতা ইত্যাদি বৃদ্ধি করে, সেইরূপ **প্যারাথাইরইডের রস** (যাহাকে বলে Parathormone) **কার্যক্ষমতা বা ক্রিয়াশক্তিকে ব্যাহত করে।** সুতরাং প্যারাথাইরইড্-নিঃসৃত রস উত্তেজক (excitatory) নহে, ইহা **বাধক** (inhibitory)। থাইরইডের অতি-ক্রিয়াকে সংযত করাই যেন প্যারাথাইরইডের কার্য।

থাইমাস্ (Thymus) ঃ

থাইমাস্ বক্ষোদেশে অবস্থিত। ইহা শৈশবকালে ক্রিয়াশীল থাকে। শিশুর জন্মের পরেই ইহা বৃদ্ধি পাইতে থাকে ; কিন্তু দ্বিতীয় বৎসর হইতে ইহা হ্রাস পায় এবং পরিণতবয়সে উহার মাত্র শেষ চিহ্ন থাকে।

ইহার ক্রিয়া সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট জ্ঞান নাই। থাইমাস্-নিঃসৃত রস ইন্‌জেক্‌সন্ দিলে দেহে বিশেষ কোন পরিবর্তন সূচিত হয় না। কেহ কেহ বলেন যে, মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, শৈশবে থাইমাস্ অপসারণ করিলে উহার অস্থিসমূহের স্বাভাবিক পুষ্টি ব্যাহত হয় এবং উহা ক্ষীণাস্থি (ricket)-রোগে আক্রান্ত হয়। অনেক শরীরতত্ত্ববিৎ আবার এই মত গ্রহণ করেন না।[৪৪]

মোটামুটিভাবে বলা যাইতে পারে যে, **বয়ঃসন্ধি (puberty)-র পূর্বে এই গ্রন্থি দেহের বর্ধন বা প্রচয়ে সহায়তা করে এবং বয়ঃসন্ধির পরেও যদি ইহা ক্রিয়াশীল থাকে, তাহা হইলে দৈহিক বর্ধন ব্যাহত হয়।**

এ্যাড্রিনাল্ গ্রন্থি (Adrenal Glands) ঃ

এ্যাড্রিনাল্ গ্রন্থিদ্বয় মূত্রাশয় (kidney)-এর উপরে অবস্থিত। এ্যাড্রিনাল্ গ্রন্থির দুইটি ভাগ আছে—একটি বাহিরের অংশ এবং আর একটি ভিতরের অংশ। বাহিরের অংশকে বলা হয় **এ্যাড্রিনাল্ কর্টেক্স** (adrenal cortex) ; ভিতরের অংশ বা অন্তর্বিভাগকে বলা হয় **এ্যাড্রিনাল্ মেডুলা**

৪৪ Howell, *A Text-book of Physiology*, pp. 924-25 দ্রষ্টব্য।

(adrenal medulla)—**এই দুই অংশ হইতে দুইটি পৃথক্ হর্‌মোন** নিঃসৃত হয় এবং ইহাদের কার্য বিভিন্ন। এ্যাড্রিনাল্ কর্টেক্স হইতে নির্গত হর্‌মোনকে বলে **কর্টিন** (cortin) এবং এ্যাড্রিনাল্ মেডুলা হইতে নির্গত হর্‌মোন্‌কে বলে **এ্যাড্রিনিন্** বা **এ্যাড্রিনালিন্** (adrenin বা adrenalin)।

(ক) **কর্টিনের ক্রিয়া :**

এ্যাড্রিনাল্ কর্টেক্স হইতে নিঃসৃত হর্‌মোন্ বা কর্টিনের ক্রিয়া আমরা সম্পূর্ণরূপে অবগত নহি। তবে ইহা দেখা গিয়াছে যে, **কর্টিনের সহিত পুরুষোচিত অপ্রধান বৈশিষ্ট্যের** (secondary male sexual characteristics) **সংযোগ আছে**। এ্যাড্রিনাল্ কর্টেক্সের ক্রিয়ার ফলে বক্ষোদেশে, অধরে এবং গণ্ডদেশে কেশোদ্গম হয় এবং সাধারণ পুরুষালী ভাব দেখা যায়। পুরুষের ক্ষেত্রে গ্রন্থির ঐ অংশের যদি ক্রিয়াদৌর্বল্য (under-activity) ঘটে, তাহা হইলে পুরুষের বাহ্য আকৃতি ও আচরণ কিছু পরিমাণ নারীসুলভ হইয়া পড়ে—পুরুষের মুখমণ্ডলে শ্মশ্রু ও গুম্ফের অভাব ঘটে, গলার স্বর ক্ষীণ হয়। অপরপক্ষে স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে ঐ গ্রন্থির এই অংশের যদি ক্রিয়াধিক্য (over-activity) হয়, তাহা হইলে স্ত্রীলোকের বাহ্য আকৃতি ও আচরণে পুরুষোচিত ভাব প্রকাশ পায়—ঐরূপ স্ত্রীলোকের মুখমণ্ডলে কমনীয়তার অভাব ঘটে, শ্মশ্রু ও গুম্ফরেখা প্রকাশ পায়, গলার স্বর গম্ভীর হয় ইত্যাদি।

তাহা ছাড়া, কর্টিন দেহকে কঠোর পরিবেশের সহিত প্রতিযোজনের কার্যে সহায়তা করে। আবার অবসন্ন স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রে পুনরায় সতেজভাব আনয়নের ক্ষমতাও (capacity to restore fatigued autonomic fibres) কর্টিনের আছে।

(খ) **এ্যাড্রিনিনের ক্রিয়া :**

এ্যাড্রিনিন্‌ও উত্তেজক। এ্যাড্রিনিনের আধিক্য ঘটিলে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়, শ্বাসক্রিয়া দ্রুতগতিতে চলে, পেশীর ক্লান্তি কমিয়া যায়, চক্ষু উদ্ভাসিত (dilated) হয়, যকৃৎ (liver) হইতে শর্করা নির্গত হয়। এ্যাড্রিনিন্ স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের সমবেদী শাখাকে (sympathetic division of the autonomic system) উদ্দীপিত করিয়া তুলে এবং তীব্র আবেগের

সময় যে সব লক্ষণ দেখা যায়, সেই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। শর্করা হইল দেহ-যন্ত্রের 'জ্বালানী' (fuel)-স্বরূপ—সেই শর্করাকে যকৃৎ হইতে নির্গত হইতে সহায়তা করিয়া এবং পেশীর দুর্বলতা রোধ করিয়া ইহা দেহকে প্রক্ষোভজনিত কষ্ট সহ্য করিবার শক্তি দান করে।[৪৫]

এ্যাড্রিনাল গ্রন্থির অবনতি ঘটিলে শারীরিক দুর্বলতা ঘটে (বিশেষ বিশেষ পেশীসমূহের কার্যক্ষমতা নষ্ট হয়), হৃদ্‌যন্ত্র ও পরিপাকযন্ত্রের ক্রিয়া ব্যাহত হয় এবং চর্ম ব্রোঞ্জের বর্ণ ধারণ করে।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, **এ্যাড্রিনাল গ্রন্থি দেহকে কর্মক্ষম ও সক্রিয় রাখে**। ব্যক্তি-বিশেষের আবেগ-প্রবণতা এবং অপ্রধান পুরুষ-সুলভ বৈশিষ্ট্যসমূহকে প্রভাবিত করে।

যৌনগ্রন্থি (Gonads বা sex-glands) :

পুরুষের অণ্ডকোষ এবং স্ত্রীলোকের গর্ভাশয় হইতে প্রজনন-কোষ এবং হরমোন্ নির্গত হয়—ইহাদের হর্‌মোন্ দ্বারা দেহের সাধারণ গঠন, প্রচয় এবং বাহ্য আচরণ নির্ধারিত হয়। যৌন-গ্রন্থিতে দুই প্রকারের কোষ থাকে—অন্তঃক্ষরা কোষ (interstitial cells) এবং বাহ্যক্ষরা কোষ (seminiferous cells)।

পুং অন্তঃক্ষরা কোষ হইতে যে দুইটি হরমোন নিঃসৃত হয় তাহাদের নাম এ্যান্‌ড্রোটিন্ বা এ্যান্‌ড্রোজেন (androtin বা androgen) এবং টেস্‌টোস্‌টেরোন্ (testosterone)[৪৬]। স্ত্রীলোকের হরমোনের নাম হইল ইস্‌ট্রিন্ (estrin) এবং প্রোজেস্টিন্ (progestin)।

পুরুষের ক্ষেত্রে পুরুষত্ব (masculinity) **এবং স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে স্ত্রীত্ব** (femininity) **প্রকাশে সহায়তা করে তদুপযুক্ত যৌন-**

---

৪৫ এইজন্য অধ্যাপক ক্যানন্ (Cannon) এ্যাড্রিনাল্ গ্রন্থিকে 'the gland of the fighting man and of the arrant coward' বলিয়াছেন, কারণ ক্রোধোন্মত্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে বা ভীত হইয়া পলায়ন করিতে যে শক্তির প্রয়োজন, তাহা সৃষ্টি করিতে এ্যাড্রিনাল্ গ্রন্থি সহায়তা করে।

৪৬ টেস্‌টোস্‌টেরোন্ সম্বন্ধে বলা হয় যে, ইহা দেহ-সংগঠক (body-builder)। দেখা গিয়াছে যে, এই হর্‌মোনের প্রয়োগে কয়েক প্রকার পীড়ায় (বিশেষতঃ ধমনীসংক্রান্ত পীড়ায়) নিরাময় হয়। (Paul De Kruif, *The Male Hormone*, pp. 158, 159 দ্রষ্টব্য)।

হরমোন্। যৌন-হরমোনের পরিমাণ কমিয়া যাইলে বা যৌনগ্রন্থি অপসারিত হইলে দেহের সাধারণ গঠন ব্যাহত হয়—বয়ঃসন্ধিতে পুরুষের পুরুষালী দেহ-বৈশিষ্ট্য এবং স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে স্ত্রীজনোচিত দেহ-বৈশিষ্ট্য সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হয় না। ইহা ছাড়া, অন্যান্য কয়েকটি নালিকাবিহীন গ্রন্থি—যথা, থাইরইড্, পিটুইটারি এবং থাইমাসের কার্যও কিয়ৎপরিমাণে ব্যাহত হয়। অপর পক্ষে, যৌন-হরমোনের আধিক্য ঘটিলে যৌনবৈশিষ্ট্যগুলি অতিরিক্ত প্রকট হয়।

যৌন-হরমোন্ যে কেবল যৌবনের আবির্ভাবের উপযুক্ত যৌন-বৈশিষ্ট্য প্রকাশে সহায়তা করে তাহা নহে, দেহ-গঠনেও সহায়তা করে। স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে মাতৃত্বের বাসনা হরমোন্ দ্বারা উদ্দীপিত হয় বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

মোট কথা, ব্যক্তিত্ব প্রলক্ষণগুলির মধ্যে পুরুষত্বের প্রকাশক বা স্ত্রীত্বের প্রকাশক প্রলক্ষণগুলি যৌন-হরমোন্ দ্বারা প্রভাবিত হয়।[৪৭]

পিটুইটারি গ্রন্থি (Pituitary gland):

এই গ্রন্থিকে 'মুখ্য গ্রন্থি' (master gland) বলা হয়, কারণ ইহা অন্যান্য গ্রন্থিকে নিয়ন্ত্রণ করে। ইহা মস্তিষ্ক মধ্যে চক্ষুঃস্নায়ুর ব্যত্যাস বা পারস্পরিক কর্তন স্থল (optic chiasma)-এর পশ্চাতে অবস্থিত।

ইহার দুইটি বিভাগ (lobe) আছে—সম্মুখবর্তী (anterior) এবং পশ্চাদ্বর্তী (posterior)।

সম্মুখবর্তী অংশ (anterior lobe)—ইহা অস্থিসমূহের বর্ধনে সহায়তা করে এবং দেহের বিপাকের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই অংশ হইতে

৪৭ তুলনীয়: "A balance of male hormones steers development in the direction of masculinity, a balance of female hormones steers it towards femininity...

"As to personality traits, some individuals appear to be oversexed and others undersexed. Such differences *may* be due to the hormones...The individual's sex behavior is determined by three factors: his spontaneous sex interest dependent on the hormones, the opportunities and restriction of the environment, and his other interests which compete or combine with the sex interest." (Woodworth, *Psychology*, pp. 173, 174).

নিঃসৃত হরমোন জীবদেহে ইন্‌জেক্‌সন্ দিয়া দেখা গিয়াছে যে, ঐ **জীবের** দেহ খুব তাড়াতাড়ি বাড়িতে থাকে। এইজন্য অনুমান করা হয় যে, **ইহার ক্রিয়াধিক্য হইলে 'অসুরতুল্যতা'** (gigantism) ঘটে।[৪৮] অর্থাৎ **পিটুইটারির সম্মুখবর্তী অংশ হইতে নিঃসৃত হরমোনের আধিক্য হইলে দীর্ঘ হস্ত, দীর্ঘ পদ, দীর্ঘ নাসিকা, উচ্চ বক্ষ বা চোয়াল হয়।** ইহাকে বলা হয় **দীর্ঘাঙ্গতা** (acromegaly)। অবশ্য হস্তপদাদি দীর্ঘ হইলেও এই প্রকার ব্যক্তি অনেক সময়ই দুর্বল হয়।

আবার যদি **সম্মুখবর্তী পিটুইটারির হরমোনের অল্পতা ঘটে, তাহা হইলে ব্যক্তি-বিশেষের দেহের গঠন বাড়ে না**—তাহার দেহ খর্ব ও গোলাকার হয়। (ইংরাজিতে ইহাকে midget বলে)। অবশ্য দেহের গঠন না বাড়িলেও তাহার বুদ্ধির বিকাশ ব্যাহত হয় না।[৪৯]

তাহা ছাড়া, **পিটুইটারির সম্মুখবর্তী অংশের হর্‌মোন্ থাইরইড্, এ্যাড্রিনালের বহিরংশ** (adrenal cortex) এবং **যৌনগ্রন্থিকে উদ্দীপিত করে**। (এইজন্য ইহাকে কেহ কেহ 'endocrinological switchboard' আখ্যা দিয়াছেন)।

পিটুইটারির পশ্চাদ্‌বর্তী অংশ (posterior lobe)-**এর হরমোন উত্তেজক** (stimulating or excitatory)। ইহার প্রভাব নিম্নরূপ :

(ক) ইহা অন্যান্য গ্রন্থিকে উদ্দীপিত করে ;

(খ) ইহা অনৈচ্ছিক পেশী (non-voluntary muscles)-এর কার্যশক্তি বৃদ্ধি করে ;

(গ) ইহা যৌনক্রিয়াশক্তিকে প্রভাবিত করে ;

---

৪৮ আধুনিক কালের একজন তথাকথিত 'দৈত্য' বা 'অসুর' ছিলেন প্যাট্রিক কটার ও'ব্রিয়েন (Patrick Cotter O' Brien)—ইনি আয়ারল্যাণ্ডের অধিবাসী ছিলেন এবং ১৮০৬ সালে ইহার মৃত্যু হয়। ইনি দৈর্ঘ্যে ৮ ফিট্ ১ ইঞ্চ্ ছিলেন। ইহার দেহ রক্ষার জন্য যে 'কফিন্' ব্যবহার করা হয়, তাহার দৈর্ঘ্য ছিল ৯ ফিট্ ২ ইঞ্চ্।

৪৯ থাইরইডের অপর্যাপ্ততা ঘটিলে শিশুর দেহের গঠন ব্যাহত হয় এবং এইরূপ শিশুকে cretin বলা হয়। ইহার বুদ্ধিরও বিশেষ প্রকাশ ঘটে না এবং বুদ্ধ্যঙ্ক কম হয়। পিটুইটারির সম্মুখবর্তী অংশের হরমোনের অল্পতা ঘটিলে দৈহিক গঠন ব্যাহত হয়—কিন্তু ইহাতে বুদ্ধির স্বাভাবিক বিকাশ নষ্ট হয় না।

(ঘ) ইহা কিয়ৎপরিমাণে দেহের গতিভঙ্গিমা এবং চলন (gaits and movements) নিয়ন্ত্রণ করে।

আমরা উপরে বিভিন্ন নালিকা-বিহীন গ্রন্থির ক্রিয়ার কথা উল্লেখ করিলাম। ইহা ব্যতীত আরও কয়েকটি স-নালিকা গ্রন্থি (duct gland) আছে যাহাদের অন্তঃক্ষরণ ঘটে—প্যান্‌ক্রিয়াস্ (Pancreas) এবং যকৃৎ (liver) এই দলভুক্ত।

প্যান্‌ক্রিয়াসের অন্তঃস্থ 'আইলেট্‌স্ অব্ লাঙ্গারহান্‌স্' (islets of Langerhans) হইতে যে হরমোন্ নিঃসৃত হয় তাহাকে ইন্‌সুলিন্ (insulin) বলে। ইহার সহায়তায় রক্তের শর্করা দেহস্থ কোষ ব্যবহার করিতে পারে—ইন্‌সুলিনের অভাব ঘটিলে রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়িতে থাকে এবং মূত্রেও শর্করা নির্গত হইতে থাকে; ফলে দেহের কার্যশক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যায় এবং মানসিক অবসাদ ও বিরক্তি (depression ও irritation) আসে ও সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করিবার ক্ষমতা কমিয়া যায়।

সাধারণ মন্তব্য :

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, বিভিন্ন নালিকাবিহীন গ্রন্থির হরমোন্ দেহের সাধারণ রাসায়নিক ক্রিয়া এবং গঠনের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং উহার মাধ্যমে প্রতিক্রিয়ার তারতম্য নির্ধারণ করে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, এইরূপ গ্রন্থিগুলির—বিশেষতঃ থাইরইড্, পিটুইটারি এবং যৌনগ্রন্থির—কার্যক্ষমতা ব্যাহত হইলে বাহ্য পরিবেশের সহিত প্রতিযোজনের ক্ষমতা স্বতঃই কমিয়া যায়। আবার যে ব্যক্তি স্থূলকায় বলিয়া, অথবা প্রতিক্রিয়া-মন্থর বলিয়া বা কোন কার্য করিলে সহজেই দুর্বলতা বোধ করে বলিয়া বা সহজেই উত্তেজিত হইয়া পড়ে বলিয়া বা অন্য কোন কারণে সুষ্ঠু প্রতিযোজন করিতে অপারগ বলিয়া জীবনযুদ্ধে কেবলই পরাজিত হয়, সে 'ক্ষতিপূরণমূলক' (compensatory) বিবিধ অস্বভাবী (abnormal) কার্য করিয়া থাকে। এইস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, দেহের সাধারণ দৈনন্দিন কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তিরক্ষায় সহায়তা করে থাইরইড্ গ্রন্থি এবং বিপদাবস্থা (emergency situation)-এর সম্মুখীন হইবার বিশেষ শক্তি যোগাইয়া থাকে এ্যাড্রিনাল গ্রন্থি।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর নালিকাবিহীন গ্রন্থি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে: **পেশীসমূহের সঞ্চালনশক্তি, দেহের সাধারণ শক্তিসাম্যতা, সাধারণ প্রেষণা** (general motivation), **যৌনবাসনা, আবেগপ্রবণতা, বুদ্ধিশক্তি, আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তি, কার্যে উৎসাহ, প্রধান ও স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের সুষ্ঠু কার্যক্ষমতা, বিপজ্জনক অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার মনোবল ও শক্তি এবং দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিবার শক্তি।**[৫০]

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্যক্তিত্বের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য ও অস্বাভাবিকতাকে কেবলমাত্র নালিকাবিহীন গ্রন্থির কার্যের ফল মনে করিলে সেই মতবাদ অতিশয়োক্তি দোষে দুষ্ট হইবে। যেমন, একথা সত্য যে থাইরয়ড্ গ্রন্থির অতি-ক্রিয়ার ফলে ব্যক্তি-বিশেষ অত্যন্ত চঞ্চল ও উত্তেজনাপ্রবণ হইয়া পড়ে, কিন্তু তাই বলিয়া যে কেহ চঞ্চল ও উত্তেজনা-প্রবণ হইলেই তাহার থাইরইডের অতিক্ষরণ ঘটিতেছে এরূপ নাও হইতে পারে।[৫১]

মোটকথা, নালিকাবিহীন বা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির হর্‌মোন্‌কে ব্যক্তিত্বের অন্যতম দৈহিক উপাদান বলা যায়।

৪। অন্যান্য দৈহিক উপাদান:

(ক) গুরুমস্তিষ্ক:

বুদ্ধি ব্যক্তিত্বের একটি প্রধান পরিচায়ক এবং সাধারণ বিশ্বাস যে বুদ্ধির সহিত গুরুমস্তিষ্কের একটি সংযোগ আছে। আমরা মোটামুটিভাবে বলিতে পারি

৫০ **তুলনীয়:** "The relationship (between hormones and human personality) involves the following forms of behavior, each of which is important in a study of psychology: level of muscular activity, energy level, insomnia, general motivation, sexual drive, emotion, intellectual ability, aggressiveness, enthusiasm, normality of growth and sexual functions, normality of CNS and ANS functions, and ability to respond to emergency situations and to withstand prolonged stress. Moreover, we should consider the anomalies in physical development or functions which are attributable to endocrine dysfunctions, for they also contribute to individual deficiencies in behavior and personality." (Wenger, Jones & Jones, *Physiological Psychology*, p. 239).

৫১ **অর্থাৎ যুক্তি-শাস্ত্রের ভাষায়:** 'An *A* proposition cannot generally be converted simply'.

যে, মস্তিষ্কের আকার বা ওজনের সহিত ইহার বিশেষ সংযোগ নাই। অপর পক্ষে মনে হয় যে, মস্তিষ্কের কোষের সংখ্যাধিক্য, কোষগুলির বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে ক্রিয়াসাম্য, তাহাদের কার্যের দ্রুততা ইত্যাদির সহিত বুদ্ধির সংযোগ আছে।

গুরুমস্তিষ্কের বিবিধ অঞ্চলগুলির মধ্যে ললাট-অঞ্চল (frontal lobe)-এর উপর আধুনিককালে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়া থাকে। বিবিধ উপাত্তের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, এই অঞ্চল আত্ম-সচেতনতা (self-consciousness), আত্মসমালোচনা (self-criticism), ভবিষ্যতের চিন্তার ক্ষমতা এবং আশা ('the projection of the individual as a whole into the future' and anticipation) ও সামাজিকতা-বোধ (social sense) এইগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট [৫২]। (পৃঃ ১৭১-১৭২ দ্রষ্টব্য)।

(খ) স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র :

স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের সহিত ব্যক্তিত্বের গভীর সংযোগ আছে বলিয়া অনেকে (যথা, Kempf, Smith, Darrow ইত্যাদি) মতপ্রকাশ করেন। স্বতঃক্রিয়ঃ-স্নায়ুতন্ত্রের পরিবর্তনশীলতার ফলে আবেগের ক্ষেত্রে সুস্থিতি বা স্থৈর্য কমিয়া যাইতে দেখা যায়। ফ্রীম্যান্ মনে করেন যে, ব্যর্থতার ক্ষেত্রে আত্মস্থ থাকা এবং উহা হইতে আত্মরক্ষা করার ক্ষমতা স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের সুষ্ঠু ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। স্বতঃক্রিয়-স্নায়ুতন্ত্রের প্রতিক্রিয়াশীলতা যাহাদের ক্ষেতে অতি দ্রুত তাহারা অনেক সময় অব্যবস্থিতচিত্ত, উৎকণ্ঠাগ্রস্ত, শঙ্কিতচিত্ত হয় বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

[দেহের আকৃতি ও গঠনের সহিত ব্যক্তিত্বের সংযোগ আছে বলিয়া একদল মনোবিৎ মনে করেন। ইহাদের মতবাদ আমরা পরবর্তী অধ্যায়ের ১ম অনুচ্ছেদে আলোচনা করিব।]

---

৫২ 'Lobotomy' নামক অস্ত্রোপচার দ্বারা গুরুমস্তিষ্কের ললাট-অঞ্চলের সহিত থ্যালাম্যাসের সংযোগ ছিন্ন করা হয়। ইহার ফলে দেখা গিয়াছে যে, অস্বাভাবিক আতঙ্ক, অবসাদ, সন্দেহের বাতিক, অনুকর্ষী বায়ু (compulsion neurosis) ইত্যাদি ভাব তিরোহিত হয়। একদিকে যেমন অতিরিক্ত আত্ম-সচেতনতা চলিয়া যায়, অপরদিকে সকল ব্যাপারে ঔদাসীন্য, চিন্তন-শক্তির দৈন্য ইত্যাদি আসিয়া পড়ে। (Freeman & Watts, *Psychosurgery* এবং Cattell, *Personality*, pp. 276, 277 দ্রষ্টব্য)।

শিখিতে পারে, স্বীয় পরিবারের মধ্যেই শিশু নিরাপত্তা বোধ করে এবং ইহারই মাধ্যমে সে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে।

পরিবার ব্যতীত আর একটি যে সংস্থা ব্যক্তি-মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তাহা হইলে **শিক্ষায়তন বা বিদ্যালয়।** বিদ্যালয়ের সহপাঠীদের সাহচর্যে শিশুমনে **সহযোগিতার** মনোভাব গঠিত হইবার সুযোগ দেখা দেয়। পারিবারিক জীবনে পিতামাতার যে স্থান, বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা সেই স্থান গ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ে **শিক্ষক বা শিক্ষিকা যদি অতিরিক্ত কঠোর হ'ন** তাহা হইলে শিশুর মনে এক বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া জন্মায় এবং **শিশু-মনে আক্রমণাত্মকভাব, ঔদাসীন্য** ইত্যাদি প্রলক্ষণ দেখা দিতে পারে। আবার বিদ্যালয়ে **শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে যদি সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সম্পর্ক থাকে,** যদি বিদ্যালয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়, তাহা হইলে **শিশু-মনে স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা, সহযোগি-মনোভাব, কর্মে উৎসাহ** ইত্যাদি গুণ দেখা যাইবার সমধিক সম্ভাবনা।

অন্যান্য যে সব সামাজিক সংস্থা ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করে তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল **ধর্মীয়সম্প্রদায় ও ধর্মীয় সংস্থা, কর্মক্ষেত্র, রাষ্ট্রীয় সংস্থা এবং বিবিধ দলীয় সংগঠন।**

যাহা হউক, এই সব বিবিধ সামাজিক সংস্থার মাধ্যমে ব্যক্তি-বিশেষ বিভিন্ন কৃষ্টি, আদর্শ ও ভাবধারা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। ইহাদেরই মাধ্যমে ব্যক্তি-বিশেষের সামাজিকীকরণ (socialization) সম্ভব হয়। সামাজিকতা বোধ (social feeling) সুষ্ঠুরূপে প্রকাশিত না হইলে সুষ্ঠু ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠিতে পারে না বলিয়া অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন।[৫৫] (পৃঃ ১১৯ দ্রষ্টব্য)।

এখন প্রশ্ন হইল: বংশগতি ও পরিবেশ এই দুইটির মধ্যে ব্যক্তিত্বের উপর কাহার প্রভাব অধিকতর? এক্ষেত্রে দুইদল মনোবিৎ দুইটি চরম মতবাদ পোষণ করেন। একদল বলেন যে, বংশগতিই ব্যক্তিত্বের একমাত্র

---

৫৫ তুলনীয়: "Social feeling is the crucial and deciding factor in normal development. Every disturbance which resists in a lessening of the social or communal feeling has a tremendously harmful effect on the mental growth of the child. ***Social feeling is the barometer of the child's normality.***" (Alfred Adler, ***Education of Children***, p. 11).

নির্ধারক, অপরদল বলেন যে, কেবলমাত্র পরিবেশই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গড়িয়া তুলে।[৫৬] কিন্তু এই দুই চরম মতবাদ পরিহার করাই শ্রেয়ঃ। **বংশগতি ও অন্যান্য দৈহিক উপাদানের মাধ্যমে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যের সহিত পরিবেশের মিথস্ক্রিয়ার ফলেই ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়।**

বংশগতি ও পরিবেশের আপেক্ষিক প্রভাব নির্ধারণ করিবার জন্য কেলোগ্ (Kellog)-দম্পতি এক অভিনব পরীক্ষা করেন। তাঁহারা তাঁহাদের দশমাস বয়স্ক পুত্র ডোনাল্ড (Donald)-এর সহিত সাড়ে সাত মাস বয়স্ক একটি শিম্পাঞ্জীকে সমানভাবে লালন-পালন করিতে আরম্ভ করেন। ঐ শিম্পাঞ্জী-শিশুর তাঁহারা নাম দেন গুয়া (Gua)। একই আব্‌হাওয়ার মধ্যে একই ভাবে তাহারা লালিত-পালিত হইতে লাগিল। খেলার ক্ষেত্রে, ইন্দ্রিয়-সংবেদন-জনিত প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে তাহারা মোটামুটি একই প্রকার দক্ষতা দেখাইতে লাগিল। কিন্তু উগ্র আবেগ-প্রবণতা এবং দৈহিক শক্তির প্রয়োজন এমন কার্যে (যেমন, চেয়ার বা অন্য কোন উচ্চ স্থানে লাফাইয়া উঠা) গুয়া ডোনাল্ড অপেক্ষা শীঘ্র অধিকতর পটুত্ব দেখাইতে লাগিল। অপরপক্ষে, ডোনাল্ড একটু বড় হইবার পর অপরের সঙ্গে মিশিতে লাগিল, ভাষা ব্যবহার করিতে শিখিল, স্মৃতিশক্তির ক্ষমতা দেখাইতে লাগিল; কিন্তু গুয়া এসব ক্ষমতা দেখাইতে পারিল না।[৫৭]

এই উদাহরণ হইতে দেখা যায় যে, বংশগতি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের হইলে একই পরিবেশের প্রভাবে একই প্রকার ব্যক্তিত্ব গঠিত হয় না।

অপরপক্ষে দেখা গিয়াছে যে, মনুষ্যসমাজ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে লালিত-পালিত হইয়াছে এরূপ শিশুর মধ্যে মনুষ্যোচিত গুণের বিশেষ প্রকাশ ঘটে নাই; কিন্তু পরে যখন তাহারা লোকালয়ে আনীত হইয়া সাধারণভাবে লালিত-পালিত হইতে লাগিল, তখন তাহাদের মধ্যে মনুষ্যোচিত প্রলক্ষণ ধীরে ধীরে দেখা দিল।[৫৮]

---

৫৬ ব্যবহারবাদী ওয়াট্‌সন্ কেবলমাত্র পরিবেশবাদ (environmentalism) সমর্থন করেন। (পৃঃ ৯৮-৯৯ দ্রষ্টব্য।)

৫৭ Kellog & Kellog, *The Ape and the Child* দ্রষ্টব্য।

৫৮ Kingsley Davis, 'Extreme Isolation of a Child', ***American Journal of Sociology***, 1940, pp. 554-565 & K. Davis, ***Human Society***, p. 206 দ্রষ্টব্য।

অতি শৈশবে বানর বা অন্য কোন ইতর জীব কর্তৃক অপহৃত হইয়া পশু-সমাজে লালিত-পালিত

এই দুই প্রকারের উদাহরণ হইতে আমরা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, কেবলমাত্র বংশগতি বা কেবলমাত্র পরিবেশ দ্বারা ব্যক্তিত্ব গঠিত হয় না। **বংশগতির মাধ্যমে একটি ভিত্তিভূমি রচিত হয়—উহার মধ্যে বিবিধ প্রলক্ষণের সম্ভাবনা সুপ্তভাবে থাকে। প্রাকৃতিক এবং বিশেষতঃ সামাজিক পরিবেশের সহিত প্রতিক্রিয়ার ফলে ঐ সব প্রলক্ষণ বিকশিত, পরিবর্ধিত এবং পরিমার্জিত হইয়া থাকে এবং নূতন কিছু কিছু প্রলক্ষণও উহাদের সহিত সাধারণতঃ সংযুক্ত হয়।** সমাজের মধ্যে বর্ধিত না হইলে মানব-শিশুর মধ্যে অহং-জ্ঞান, নৈতিকতা, দক্ষতা, বুদ্ধি, বিবিধ আবেগ প্রকাশের ক্ষমতা ইত্যাদি কোন কিছুই বিকশিত হয় না। মোট কথা, বংশগতি যেন উপাদানসমূহ জোগাইয়া থাকে এবং সুষ্ঠু পরিবেশ উহাদের বিকশিত করিয়া তোলে।[৫৯]

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, **ব্যক্তিত্বের মূলে বংশগতি ও পরিবেশ উভয়েই কার্য করে।**[৬০]

হইয়াছে এরূপ মনুষ্য-শিশুর মধ্যে মনুষ্যোচিত গুণের বিকাশ ঘটে নাই ; কিন্তু পরে মনুষ্য সমাজে আনীত হইবার পর তাহার মধ্যে ঐরূপ গুণের বিকাশ দেখা গিয়াছে। (এই প্রসঙ্গে A Gesell, ***Human Child and Wolf Child*** দ্রষ্টব্য)

৫৯ ইহার অর্থ এই নহে যে 'বংশগতি + পরিবেশ = ব্যক্তিত্ব'। অঙ্কশাস্ত্রের চিহ্ন ব্যবহার করিতে হইলে বলা উচিত 'বংশগতি × পরিবেশ = ব্যক্তিত্ব', কারণ ইহাদের মিথস্ক্রিয়ার ফলে ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠে।

৬০ তুলনীয় : (১) "The fact as it appears...is that no distinction can be expediently made at any given moment in the behavior of the individual after the fertilized egg has once begun to develop, between that which is native and that which is acquired. The so-called hereditary factors can only be acquired in response to an environment, and likewise the so-called acquired factors can only be secured by a modification of already existing structure, which in the last analysis is hereditary structure." (L. Carmichael, "Heredity and Environment : Are they Antithetical ?" ***Journal of Abnormal and Social Psychology***, 1925.)

(২) "Which is more important for the characteristics of organism, heredity or environment ?...No single general answer can be given...For good results, both fit material and appropriate treatment of these materials are required : good genes and fit conditions for their development...Either poor materials or poor handling can ruin a machine or an organism.

৬। ব্যক্তিত্বের সমাকলন ও বিষজাবস্থা—অস্বভাবী ব্যক্তিত্ব (Integration and Dissociation of Personality—Abnormal Personalities):

সুস্থমনা ব্যক্তি যদি আত্ম-চিন্তন বা আত্ম-বিশ্লেষণ করে, তাহা হইলে সে লক্ষ্য করিবে যে, তাহার বিভিন্ন অবস্থা ও ক্রিয়া তাহার 'অহং' (ego)-কে কেন্দ্র করিয়া আছে। এইজন্য তাহার চেতনার মধ্যে একটি ব্যক্তিগত ঐক্যের বা সমানত্বের জ্ঞান (consciousness of personal identity) থাকে—এইজন্যই ব্যক্তি-বিশেষ বলিতে পারে, "যে আমি অমুক সালে অমুক কাজ করিয়াছিলাম, সেই আমিই এই কাজ করিতেছি; শত পরিবর্তনের মধ্যেও আমি আমিই আছি।" আবার সুস্থ ব্যক্তির বাহ্য কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করিলে আমরা উহাদের মধ্যে অনেক পরিমাণে সামঞ্জস্য লক্ষ্য করি; এইজন্যই আমরা বিশ্বাস করি যে, একই প্রকার ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি একই প্রকারে ব্যবহার করিবে। সুতরাং মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, স্বভাবী (normal) ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটি ঐক্য (unity), সংহতি (organization), এবং সমাকলন (integration) থাকে। অবশ্য পূর্ণ সংহতি বা সমাকলন একটি আদর্শমাত্র, কারণ সম্পূর্ণরূপে সমাকলিত ব্যক্তিত্ব আমাদের থাকে না বলিলেই হয়—এইজন্য আমাদের সকল আচরণের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য বা ঐক্য দেখা যায় না। কখনও আমরা অতিরিক্ত কর্মব্যস্ত হই, আবার কখনও নিস্তেজ হইয়া পড়ি; কখনও আমরা বাহ্য পরিবেশের প্রতি অত্যন্ত উৎসুক হইয়া উঠি, আবার কখনও বা পরিবেশকে একেবারে পছন্দ করি না। তবে ব্যক্তিত্বের এই বহুমুখিতা ও পরিবর্তনশীলতার মধ্যেও অনেক পরিমাণে ব্যবহারের স্থিতি (stability) ও সমাকলন (integration) রক্ষিত হয়, অর্থাৎ বহুত্বের মধ্যে একত্ব থাকে।

উপরে বর্ণিত এই বৈশিষ্ট্যের কিন্তু কিছু কিছু ব্যতিক্রমও দেখা যায়—অর্থাৎ কোন কোন লোকের ব্যক্তিত্বের ঐক্য ও সমাকলন নষ্ট হইয়া যায়; ফলে

If the materials are worthless, if the individual starts with thoroughly poor genes, the method of treatment, the environment, can do little. And if the material is spoiled in the process of development, it makes little difference what it was at the beginning." (Jennings, *Biological Basis of Human Nature*, p. 130.)

তাহাদের ব্যক্তিত্বের এক **অবস্থা** অপর অবস্থা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং ব্যক্তিত্বের বিযঙ্গ (dissociation) ঘটে।[৬১] কোন বিশেষ কারণে —যেমন, তীব্র মানসিক বা দৈহিক অভিঘাত (shock)-এ—ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ঘটে এবং ঐক্য নষ্ট হইয়া যায়। এক বিচ্ছিন্ন অংশ অপর বিচ্ছিন্ন অংশের ঘটনাবলীকে সাধারণতঃ স্মরণ করিতে পারে না। এইরূপে একই ব্যক্তির মধ্যে **বহুব্যক্তিত্ব** (**Multiple Personality**)-এর উদ্ভব হইতে পারে।

আমরা এখানে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিব।

(ক) ফেলিডার কাহিনী (Felida Case): চৌদ্দ বৎসর বয়সে ফেলিডার জীবনে হঠাৎ এক বিশেষ পরিবর্তন আসে এবং সে এক 'নূতন মানুষ' হইয়া যায়। দ্বিতীয় অবস্থায় কিছুদিন থাকার পর আবার সে প্রধান ও প্রথম অবস্থায় ফিরিয়া যায়। দ্বিতীয় অবস্থায় থাকাকালীন তাহার প্রথম অবস্থার ঘটনা কিছু কিছু মনে পড়িত, কিন্তু প্রথম অবস্থায় দ্বিতীয় অবস্থার ঘটনা সে কিছুই মনে করিতে পারিত না। একবার দ্বিতীয় অবস্থায় থাকাকালীন সে এক বন্ধুর মৃত্যুতে যখন শবানুগমন করিতেছিল, তখন হঠাৎ সে প্রথম অবস্থায় ফিরিয়া যায় এবং তখন কোথায় যাইতেছে, কেন যাইতেছে ইত্যাদি সকল কথা সে ভুলিয়া গেল। এইভাবে ৪৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাহার জীবনে প্রায়ই প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থা পরস্পরের মধ্যে একে অন্যের স্থান গ্রহণ করিতে থাকে।

(খ) লিওনীর কাহিনী (Leonie Case): লিওনী ছিল ভীরুস্বভাবা, স্বল্পবুদ্ধি, মলিনবদনা বালিকা। ৩ বৎসর বয়সের পর হইতে প্রায়ই তাহার আবেশ বা সমাধি (trance) হইত। ১৫ বৎসর বয়সের পর হইতে অনেকেই অল্প চেষ্টায় তাহার সংবেশন (hypnosis) আনয়ন করিতে পারিত। সংবেশনকালে তাহার মধ্যে এক দ্বিতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটিত। সে তাহার নিজের নাম লিওন্‌টাইন্ (Leontine) বলিত। সে বলিত যে, সে লিওনীকে চেনে, কিন্তু সে ও লিওনী যে একই ব্যক্তি তাহা সে অস্বীকার করিত। সে খুব আমুদে ছিল এবং 'হৈ-চৈ' করা পছন্দ করিত।

---

৬১ ইহারই ফলে বাস্তবজীবনেও ষ্টিভেন্‌সন্-কল্পিত Dr. Jekyll and Mr. Hyde দেখা যায়।

সে যেন লিওনীকে ঘৃণা করিত। লিওনী কিন্তু লিওন্‌টাইন্ সম্বন্ধে কিছুই জানিত না। মনোবিৎ ডঃ জানে (Janet) তাহাকে আরও গভীরভাবে সংবিষ্ট করেন; এই অবস্থায় তাহার ভিতর এক তৃতীয় ব্যক্তি দেখা দেয়। সে তাহার নাম বলে লিওনোর (Leonore)—সে ছিল গম্ভীর প্রকৃতির এবং লিওনী ও লিওন্‌টাইন্ দুইজনকেই সে 'নিম্ন পর্যায়ের জীব' মনে করিত। লিওন্‌টাইন্ কিন্তু লিওনোর সম্বন্ধে কিছুই জানিত না।

(গ) মারিয়ার কাহিনী (Maria Case)—২০ বৎসর বয়সে তাহার পিতার মৃত্যুতে মারিয়া (Maria) বিশেষ শোক পায় এবং তাহার মানসিক বৈলক্ষণ্য দেখা দেয়। তাহার ভিতর দুইটি ব্যক্তিত্ব (যাহাদের আমরা 'A' ও 'B' বলিব) সহ-অবস্থান (co-exist) করিত। *A* ও *B* পর্যায়ক্রমে মারিয়াকে যেন নিয়ন্ত্রণ করিত। *A* ছিল তাহার স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব এবং *B* অবস্থায় সে বলিত যে, সে পূর্বজন্মে এক স্পেনীয় জিপ্‌সী বালিকা ছিল এবং নাচিয়া গাহিয়া তাহার দিন কাটিত; *B* অবস্থায় সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্প্যানিশ ভাষা বলিত এবং বিদেশীর ন্যায় তাহার মাতৃভাষা বলিত। *A* ও *B* পরস্পরকে চিনিত, তবে যখন *B* কর্তৃত্ব করিত, *A* তখন নিরুপায় দ্রষ্টা থাকিত এবং *A* যখন কর্তৃত্ব করিত, *B* তখন দ্রষ্টা থাকিত। আবার *A* ও *B* মধ্যে মধ্যে পরস্পরের সহিত কথোপকথনও করিত।

(ঘ) ব্যুকাম্প কাহিনী (Beuchamp Case)—ব্যুকাম্প ছিল ধর্মপরায়ণা, বিবেকসম্পন্না, নিঃস্বার্থ তরুণী। কিন্তু প্রায়ই তাহার ভিতর এক দুষ্টস্বভাবা রমণী আবির্ভূত হইত; সাধারণ অবস্থায় সে ইহার কারণ বুঝিতে পারিত না। মনোরোগ-চিকিৎসকের অধীনে চিকিৎসাকালে তাহার ভিতর আর একটি উদ্ধতপ্রকৃতি ও স্বার্থপর তৃতীয় ব্যক্তি দেখা দিত। বহু চেষ্টায় পুনরায় তাহার ব্যক্তিত্বের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

আমরা উপরে যে কয়েকটি উদাহরণ দিলাম তাহাদের সকলগুলিরই বৈশিষ্ট্য হইল যে, একই ব্যক্তির মধ্যে একাধিক ব্যক্তিত্ব পর্যায়ক্রমে আবির্ভূত ও তিরোহিত হইতেছে, অথবা সহ-অবস্থান করিতেছে। ইহা ছাড়া, এমনও দেখা গিয়াছে যে, হঠাৎ কোন তীব্র অভিঘাতে ব্যক্তি-বিশেষ তাহার জীবনের সব কিছু ভুলিয়া গিয়া 'নূতন' হইয়া গিয়াছে—তখন সে নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া, নূতন অভ্যাস আয়ত্ত করিয়া, নূতনভাবে জীবন যাপন

সুরু করিয়াছে। আবার বহু বৎসর এইভাবে জীবন যাপন করিবার পর হঠাৎ কোন কারণে তাহার প্রথম জীবনের ঘটনাবলী মনে পড়িয়া গিয়াছে, এইরূপ হয়।

আবার মধ্যে মধ্যে এমন ঘটে যে, ব্যক্তি-বিশেষের ব্যক্তিত্বের এক অংশ চেতনার প্রধান স্রোত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিস্মৃতির গর্ভে লীন হইয়া যায় এবং পরে আবার হঠাৎ ঐ পূর্ব স্মৃতি জাগিয়া উঠে। ম্যাক্‌ডুগাল্ এক সৈনিকের জীবনীর যে উদাহরণ দিয়াছেন, তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য।[৬২] রণক্ষেত্রে কামানের গোলা ফাটার ফলে সৈনিকটি দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়ে। যখন তাহার জ্ঞান হয়, তখন দেখা যায় যে, অপর অনেক বিষয়ে সে স্বাভাবিক লোকের ন্যায় থাকিলেও তাহার আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছে; যেমন, তাহার নিজের নাম, পারিবারিক জীবন, কোন্ সেনাবিভাগে কাজ করে ইত্যাদি সব সে ভুলিয়া গিয়াছে। কিছুদিন হাসপাতালে সে ম্যাক্‌ডুগালের চিকিৎসাধীন ছিল; হঠাৎ একদিন গ্রীষ্মপ্রধান দেশ হইতে আগত কতকগুলি সৈনিকের শিরস্ত্রাণ (sun-helmet) দেখিয়া সে উত্তেজিত হইয়া পড়ে। ম্যাক্‌ডুগাল্ অনুমান করেন যে, হয়ত' সে ভারতবর্ষে কাজ করিয়াছে; তিনি তখন তাহার নিকট তদানীন্তন ব্রিটিশ ভারতের বিবিধ ক্যান্টনমেন্টের নাম বলিয়া যাইতে লাগিলেন। সে আগ্রহভরে ঐ সব নাম শুনিতেছিল এবং হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল যে, সেও একদিন ভারতবর্ষের সেনাদলে ছিল এবং সেখান হইতে ফ্রান্সে বদলি হইয়া গিয়াছিল। এইভাবে তাহার স্মৃতির দুয়ার খুলিয়া গেল।

সংবেশ (hypnotism)-এর অবস্থাতেও সাময়িকভাবে ব্যক্তিত্বের বিচ্ছিন্নতা ঘটে। ব্যক্তি-বিশেষ সংবিষ্ট অবস্থায় যাহা করে তাহা তাহার দৈনন্দিন সাধারণ ব্যক্তিত্ব হইতে যেন বিচ্ছিন্ন থাকিয়া যায় এবং সংবেশনের অবসানের পর সে ঐ সব ঘটনা স্মরণ করিতে পারে না।

সেইরূপ যাহারা স্বপ্নচারিতা (somnambulism) রোগে ভুগিতেছে, তাহারা নিদ্রাকালীন অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইবার সময় কী করে তাহা জাগ্রত অবস্থায় স্মরণ করিতে পারে না।

আবার আর একপ্রকার অদ্ভুত মানসিক কার্য আছে যাহাকে স্বতঃক্রিয় লিখন (automatic writing) বলা হয়। ব্যক্তি-বিশেষ এই প্রকার

৬২ McDougall, *An Outline of Abnormal Psychology*, p. 244.

লিখনের সময় স্বতঃক্রিয়ভাবে (automatically) লিখিয়া যায়; সে যেন 'আবেশের' অবস্থায় থাকে—কী লিখিতেছে, কেন লিখিতেছে কিছুই জানে না। অনেক সময় এইরূপ ব্যক্তি অতি সুন্দর কবিতা অথবা অন্য কোন রচনা লিখিয়া থাকে—যদিও স্বাভাবিক অবস্থায় সে কোন সাহিত্যিক বা কবি-প্রতিভার সামান্য পরিচয়ও দেয় নাই।[৬৩]

উপরের আলোচনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, মানসিক আঘাতের তীব্রতা সহ্য করিতে না পারিলে অনেকের ব্যক্তিত্বে বিচ্ছিন্নতা ঘটে। তবে ব্যক্তিত্বের সমাকলন ও ঐক্য প্রচয়ঘটিত ব্যাপার (developmental phenomenon)। অস্বাস্থ্যকর পারিবারিক পরিবেশ (যথা, নিত্য কলহ, দুর্নীতিপরায়ণতা ইত্যাদি), অত্যন্ত কঠোর শাসন, কোন প্রকার সংযম ও শাসনের অভাব, অপূরিত বাসনার দ্বন্দ্ব ইত্যাদি অনেক সময় ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু গঠন ও প্রচয়ের পথে বিঘ্নস্বরূপ হয় এবং ভাবীজীবনে ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বা বিষঙ্গতা সৃষ্টি করিতে পারে।

৬৩ *Ibid.*, Ch XIII.

নবম অধ্যায়

ব্যক্তিত্বের শ্রেণী-বিভাগ ও প্রলক্ষণ

১। ব্যক্তিত্বের শ্রেণীভেদ বা জাতিরূপ (Types of Personality) :

ব্যক্তিত্বকে বুঝিবার সুবিধার জন্য অনেক লেখক ব্যক্তিত্বকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া থাকেন। এইভাবে ব্যক্তিত্বের ভিন্ন ভিন্ন জাতিরূপ (type)-এর উদ্ভব হইয়াছে। জাতিরূপের প্রকৃত স্বরূপ লইয়া মতভেদ আছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, জাতিরূপগুলি সম্পূর্ণ পৃথক্ বা বিপরীত এবং এক জাতিরূপের বৈশিষ্ট্য অপর জাতিরূপে থাকিতে পারে না; কেহ কেহ বলেন যে, জাতিরূপগত বৈশিষ্ট্য প্রলক্ষণের ন্যায় এক এক গোষ্ঠীর মধ্যে স্বাভাবিকভাবে বণ্টিত (distributed) আছে; আবার কেহ কেহ বলেন যে, ইহা প্রলক্ষণের ন্যায় স্বাভাবিকভাবে বণ্টিত নহে—কোন জাতির মধ্যে যে প্রলক্ষণ পুঞ্জীভূত (accumulated) হইয়া একটি গোষ্ঠী গঠন করে, তাহাকে জাতিরূপ বলে।

(ক) মানসিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ-নির্ধারণ :

(১) যুঙ্ (Jung)-কৃত শ্রেণী-বিভাগ :—জাতিরূপের শ্রেণীকরণ নানা সূত্রের উপর ভিত্তি করিয়া করা যাইতে পারে। **মানসিক ক্রিয়া** (mental functions)-এর ভিত্তিতে যে সব লেখক ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ বিভাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের অন্যতম হইলেন যুঙ্—তিনি ব্যক্তিত্বের দুইটি জাতিরূপ নির্ধারণ করিয়াছেন : **বহির্বৃত্ত** (extrovert) এবং **অন্তর্বৃত্ত** (introvert)।

বহির্বৃত্তের ব্যক্তিত্ব বাহ্যকেন্দ্রিক বা বহির্মুখী; সে নিজের চিন্তা বিশেষ না করিয়া অপরের সহিত মেলা-মেশায়, আলাপ-আলোচনায় তৃপ্তি বোধ করে, অন্যের সহিত সহজেই নিজেকে মানাইয়া লইতে পারে, অবস্থার তারতম্য অনুসারে বা প্রয়োজনমত নিজের কার্যনীতি বা আদর্শের পরিবর্তন করে। অপরপক্ষে অন্তর্বৃত্ত আত্মচিন্তায় নিমগ্ন থাকিতে

ভালবাসে; অন্যের সহিত নিজেকে মানাইয়া লইতে পারে না, সহজে নিজের আদর্শ (ঠিকই হউক্ বা ভুলই হউক্) হইতে বিচ্যুত হয় না।[১] অবশ্য বহির্বৃতত্ব বা অন্তর্বৃতত্ব বাহ্যজগতের সহিত প্রতিযোজনের সময় প্রতিক্রিয়ার সহিত প্রকাশ পায়।[২] যখন কোন বিশেষ প্রকারের প্রতিক্রিয়া বার বার প্রকাশ করার ফলে উহা অভ্যাসে পরিণত হয় তখনই উহা স্থায়ী বহির্বৃতত্ব বা অন্তর্বৃতত্বের পরিচায়ক বলা যাইতে পারে।[৩]

আমরা পূর্বেই (পৃঃ ১২৯) আলোচনা করিয়াছি যে, প্রশ্নোত্তর-প্রণালীর মাধ্যমে জানা যাইতে পারে বহির্বৃত ও অন্তর্বৃতের মধ্যে কে কী প্রকার ব্যবহার করিতে পছন্দ করে। আমরা এখানে উহাদের প্রতিন্যাস (attitude) এবং ব্যবহারের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য নির্দেশ করিব:

অন্তর্বৃত	বহির্বৃত
(১) ব্যক্তিগত ভাবধারা দ্বারা দৃষ্টিভঙ্গী নিরূপিত হয়; এবং বাহ্যজগতের বস্তুর প্রতি উদাসীন থাকে।	(১) বাহ্যবস্তুর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়; বাহ্যজগতের বস্তুর প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হয়।
(২) কতকগুলি বিশেষ বিশেষ নীতি অনুসরণ করিয়া চলে এবং সহজে তাহা হইতে বিচ্যুতি ঘটে না।	(২) প্রয়োজনমত নীতি বা আদর্শ পরিবর্তন করিতে পারে।
(৩) নিজের প্রতি (বিশেষতঃ নিজের শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য, সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদির প্রতি) বিশেষ মনোযোগী।	(৩) নিজের সম্বন্ধে মোটামুটি উদাসীন বা অমনোযোগী।

১ Introvert ও Extrovert-দের প্রতিটিকে আবার চারিটি উপ-জাতি (sub-type)-এ ভাগ করা যায়, যথা: thinking type, feeling type, sensation type এবং intuition type।

২ Chein মনে করেন যে, অন্তর্বৃতত্ব ও বহির্বৃতত্ব প্রতিক্রিয়ার দুইটি বিভিন্ন রূপ (reaction type); এইজন্য নিরাপদ পরিবেশের মধ্যে লোকে বহির্বৃতের ন্যায় ব্যবহার করে, অথচ বিপদের মধ্যে তাহারা অন্তর্বৃতের ন্যায় ব্যবহার করে। (*Journal of Social Psychology*, Vol. 18, pp 89-109 দ্রষ্টব্য।)

৩ য়ুঙের ভাষায়: "When the orientation to the object and to objective facts is predominant...one speaks of an extroverted *attitude*. When this is *habitual*, one speaks of an extroverted *type*".

	বহির্বৃত্ত
(৪) নূতন পরিবেশের সহিত সহজে প্রতিযোজন করিতে পারে না।	(৪) অনায়াসেই নূতন পরিবেশের সহিত প্রতিযোজন করিতে পারে।
(৫) ইহাদের মধ্যে যাহারা 'চিন্তাপ্রবণ' (অর্থাৎ thinking type-এর লোক) তাহাদের চিন্তার মধ্যে বিমূর্ত ধারণা (abstract ideas) প্রাধান্য লাভ করে।	(৫) ইহাদের চিন্তা বাস্তব ঘটনা (concrete facts)-কে কেন্দ্র করিয়া থাকে।
(৬) ইহাদের মধ্যে যাহারা 'অনুভূতিপ্রবণ' (অর্থাৎ feeling type-এর) তাহারা গভীর ও তীব্রভাবে (deeply and strongly) অনুভূতি বোধ করে, কিন্তু সহজে তাহা প্রকাশ করিতে পারে না।	(৬) ইহারা সহজেই নিজেদের আবেগ প্রকাশ করে এবং কোন অনুভূতিই গভীর রেখাপাত করে না। ইহাদের সামাজিকতা-বোধ (social feeling) অধিক থাকায় ইহারা সহজেই লোকজনের সহিত মিশিতে পারে।
(৭) ইহাদের মধ্যে যাহারা 'সংবেদনপ্রবণ' (sensory type) তাহারা মাত্র বিশেষ বিশেষ সংবেদন পছন্দ করে এবং উহাদের 'ধ্যান' (contemplation)-এ তৃপ্তি বোধ করে।	(৭) ইহারা যেন বাহ্যজগতের বস্তু ও ঘটনা দ্বারা উদ্দীপিত হইতে চাহে এবং উদ্দীপনের অভাবে 'অস্বস্তি' বোধ করে।
(৮) ইহাদের মধ্যে যাহারা 'অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন' (intuitive type), তাহারা হঠাৎ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেও তাহা সহজে বাহ্য-আচরণে প্রকাশিত করে না—উহা তাহাদের চিন্তার মধ্যেই সীমিত থাকে।	(৮) ইহাদের মধ্যে যাহারা তথাকথিত 'অন্তর্দৃষ্টি'র ফলে অনায়াসেই কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তাহারা তদনুযায়ী সাধারণতঃ তৎক্ষণাৎ কার্য করে।
(৯) বাস্তবের সহিত প্রতি-	(৯) ইহাদের ব্যবহারে ক্ষতি-

অন্তর্বৃত	বহির্বৃত
যোজনে অক্ষম হইলে ইহাদের ব্যবহারে 'বাস্তব পরিস্থিতি হইতে পলায়ন' (withdrawal) বা বাস্তবকে পরিহারের চেষ্টা এবং 'অলীক কল্পনা' (phantasy) প্রকাশ পায়।	পূরণ (compensation)-এর প্রচেষ্টা প্রকাশ পায়।
(১০) ইহারা যদি বায়ুরোগ (psychoneurosis)-এ ভোগে, তাহা হইলে 'আবেশিক বায়ু' বা বা 'অনুকর্ষী বায়ু' (obsession compulsion neurosis) দেখা দিবার সম্ভাবনা অধিক।	(১০) ইহাদের ক্ষেত্রে হিষ্টিরিয়া (hysteria) দেখা দিবার সম্ভাবনা অধিক।

য়ুঙ্-প্রদত্ত বহির্বৃত-অন্তর্বৃতের এই বিভাগ দৈনন্দিন জীবনে জনগণকে বুঝার ব্যাপারে এবং মনোরোগ-চিকিৎসাকালে চিকিৎসা কার্যে যথেষ্ট আলোকপাত করিয়াছে। তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, মানুষের ব্যক্তিত্বে এত বৈচিত্র্য আছে, এত অনুপম বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটিয়াছে যে, সকল মানুষকে অন্তর্বৃত ও বহির্বৃত এই দুই সম্পূর্ণ পৃথক্ শ্রেণীতে বিভাগ করা যায় না। আধুনিক অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছে যে, অধিকাংশ ব্যক্তিই বহির্বৃত ও অন্তর্বৃতের মধ্যবর্তী শ্রেণী (intermediate class)-এর অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ অধিকাংশ ব্যক্তির মধ্যে বহির্বৃত ও অন্তর্বৃতের সমন্বয় দেখা যায়। এইজন্য ইহাদের বলা যায় **উভয়মুখী** (ambivert)। অল্পসংখ্যক লোকই সম্পূর্ণরূপে অন্তর্বৃত বা সম্পূর্ণরূপে বহির্বৃত। সুতরাং সাধারণভাবে বলা যায় যে, পূর্ণ অন্তর্বৃতত্ব এবং পূর্ণ বহির্বৃতত্ব এই দুই বৈপরীত্যের মধ্যে ব্যক্তিত্বের ভেদ্যতা বা তারতম্য (variation) ঘটে।

(২) কুয়েল্‌পে-প্রদত্ত শ্রেণীবিভাগ :

প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে পরীক্ষণকালে কুয়েল্‌পে (Külpe) লক্ষ্য করেন যে, এক দল লোক উদ্দীপকের বর্ণ বা রঙ্ দ্বারা প্রভাবিত হয়, আবার আর একদল উদ্দীপকের আকৃতি (shape বা form) দ্বারা প্রভাবিত হয়। ইহার ভিত্তিতে

তিনি ব্যক্তিত্বের দুইটি জাতিরূপের কথা বলেন : একটি 'বস্তুমুখী' (material) এবং অপরটি হইল 'আকৃতিমুখী' (formal)।

(৩) য়েন্‌শ্‌-প্রদত্ত শ্রেণীকরণ :

কয়েকজন মনোবিৎ পরীক্ষণকালে লক্ষ্য করেন যে, কতকগুলি ব্যক্তির ক্ষেত্রে—বিশেষতঃ চৌদ্দ বৎসরের নিম্নের বালক-বালিকার ক্ষেত্রে—দেখা যায় যে, তাহারা প্রত্যক্ষের ন্যায় সুপরিস্ফুট প্রতিরূপ 'অবলোকন' করিয়া থাকে। এই প্রকার প্রতিরূপকে বলা হয় **আইডেটিক প্রতিরূপ** (eidetic image)। (পৃঃ ৬১২ দ্রষ্টব্য)। ইহাদের আবার পরিমাণগত ও গুণগত পার্থক্য থাকে। ইহাদের গুণগত পার্থক্যের ভিত্তিতে য়েন্‌শ্‌ (Jaensch) ব্যক্তিত্বের দুইপ্রকার জাতিরূপ (type)-এর কথা বলিয়াছেন। একটি হইল 'B'-type—এই জাতিরূপের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের সাধারণতঃ কলাকুশলী মনোভাব (artistic mentality) থাকে এবং তাহাদের সমবেদী স্নায়ুতন্ত্র (sympathetic nervous system) তীব্রভাবে প্রতিক্রিয়া করে এবং থাইরইড্‌ গ্রন্থি কতকপরিমাণে বর্ধিত হয়। দ্বিতীয় জাতিরূপ হইল 'T'-type[৪]—এই জাতিরূপের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের য়ুঙ্‌-বর্ণিত বহির্বৃত্তদের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে; ইহারা বাহ্য উদ্দীপন দ্বারা সহজেই উদ্দীপিত হয়।

(খ) দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ-নির্ধারণ :

অতি প্রাচীনকাল হইতেই মানুষের দৈহিক আকৃতির পার্থক্যের ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বের পার্থক্য ঘটে বলিয়া বিশ্বাস চলিয়া আসিতেছে। গ্রীক দার্শনিক আরিষ্টটল্‌ মুখাবয়বের বৈচিত্র্যের সহিত ব্যক্তিত্বের সম্পর্ক আছে মনে করিতেন। গ্রীক চিকিৎসক হিপোক্রেটেস্‌ (Hippocrates) বলিতেন যে, দেহের তারতম্যের সহিত আয়ান (temperament)-এর সংযোগ আছে।[৫]

৪ এখানে 'B'-type-এর অর্থ Basedowid Type এবং 'T'-type-এর অর্থ Tetanoid type।

৫ মহাকবি শেক্সপীয়র দৈহিক গঠনের সহিত মানসিক বৈশিষ্ট্যের সম্পর্কের ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছেন :

"Yond Cassius has a lean and hungry look
He thinks too much : such men are dangerous."
(*Julius Caesar.*)

ক্রেট্‌শ্‌মের-কৃত বিভাগ :

বর্তমান কালে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ভিত্তিতে ক্রেট্‌শ্‌মের (Kretschmer) দৈহিক গঠনের সহিত ব্যক্তিত্বের সম্পর্ক লইয়া আলোচনা আরম্ভ করেন। তিনি প্রথমে মানসিক অস্বাভাবিকতার কারণ লইয়া অনুসন্ধান করেন এবং লক্ষ্য করেন যে, অস্বভাবী মনের সহিত দৈহিক গঠনের সংযোগ আছে। পরে তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতার আলোকে স্বাভাবিক মন লইয়া আলোচনা করেন।

ক্রেট্‌শ্‌মের দুইটি প্রধান মানসিক বিকার বা রোগ লইয়া গবেষণা আরম্ভ করেন : একটি হইল চিত্তভ্রংশী বাতুলতা (schizophrenia) এবং অপরটি হইল খেদোন্মত্ত বাতুলতা (manic-depressive insanity)। চিত্তভ্রংশী বাতুলতা ঘটিলে রোগী বাহ্যজগৎ হইতে নিজেকে যেন বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজের সৃষ্ট এক মনোজগতে বাস করে। রোগী বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে এবং তাহার নানাপ্রকার অমূলপ্রত্যক্ষ (hallucination) এবং ভ্রান্তি (delusion) দেখা দেয় (যেমন, রোগীর ভ্রান্তি ঘটিতে পারে যে, 'সকলেই তাহাকে নিপীড়ন করিতেছে' বা 'সে ভগবানের শ্রেষ্ঠ সন্তান' ইত্যাদি)। খেদোন্মত্ত বাতুলতা ঘটিলে রোগী একবার উন্মত্ত (maniac) হইয়া পড়ে (যে অবস্থায় সে সব কিছু দলিত-মথিত করিয়া ফেলিতে চাহে), আবার একবার অত্যন্ত নিস্তেজ বা বিষাদগ্রস্ত (depressed) হইয়া পড়ে ; অর্থাৎ ক্ষিপ্ত অবস্থা এবং খেদ বা বিষাদের অবস্থা যেন চক্রাকারে ঘুরিতে থাকে।[৬]

ক্রেট্‌শ্‌মের ২৬০টি মানসিক রোগী পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখেন যে, দেহাবয়ব অনুসারে তাহাদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় : **এস্‌থেনিক্‌** (asthenic), **পিক্‌নিক্‌** (pyknic) এবং উহাদের মধ্যবর্তী **এ্যাথ্‌লেটিক্‌** (athletic)। ইহাদের দেহ-বৈশিষ্ট্য এইরূপ :

(১) এস্‌থেনিক্ (asthenic)—ইহারা ক্ষীণদেহ এবং ইহাদের দেহ-রেখা সরল। দেহের ওজনের তুলনায় ইহারা দীর্ঘ, ইহাদের হস্ত-পদ দীর্ঘ, পেশী ও অস্থি অপরিপুষ্ট, বক্ষোদেশ অনুন্নত ও ক্ষীণ, পঞ্জরাস্থিগুলি যেন গোণা যায়, উদরদেশ ক্ষীণ। মোট কথা, স্থূলতা ও পুষ্টির অভাবের সহিত

৬ এই দুই রোগের বিস্তারিত বিবরণের জন্য McDougall, *An Outline of Abnormal Psychology*, Chs. XXII & XXIII দ্রষ্টব্য।

দীর্ঘতার সমন্বয়ই (a deficiency in thickness combined with an average unlessened length) হইল এস্থিনিকের প্রধান লক্ষণ।

(২) পিক্নিক্ (pyknic)—ইহারা এস্থেনিকের বিপরীত। ইহারা স্থূলদেহ এবং গোলাকার—ইহাদের সর্বদেহে চর্বির আধিক্য থাকে। উচ্চতা মধ্যম প্রকারের; মস্তিষ্ক, বক্ষোদেশ এবং উদরদেশ বর্ধিত বা স্ফীত আকারের। স্থূলত্ব (plumpness) ইহাদের প্রধান লক্ষণ।

(৩) এ্যাথ্লেটিক্ (athletic)—ইহারা উপরে বর্ণিত দুই শ্রেণীর মধ্যবর্তী। ইহারা অতিরিক্ত স্থূলও নহে, অতিরিক্ত ক্ষীণও নহে। ইহাদের অস্থি ও পেশীসমূহ পুষ্ট। চর্বির আধিক্য বশে দেহ স্ফীত বা বর্তুলাকার নহে, অথচ বেশ সুগোল, সুডৌল গঠন। উচ্চতা মধ্যম হইতে দীর্ঘ আকারের হইতে পারে। পরিপুষ্ট পেশী ও অস্থি ইহাদের প্রধান লক্ষণ।

এই তিন প্রকার ব্যতীত আর এক প্রকারের দৈহিক গঠন কখনও কখনও দেখা যায়। ইহাদের বলা যায় **ডিস্প্লাষ্টিক্** (dysplastic)—ইহারা সংখ্যায় বিরল, কদাকার এবং সাধারণ মান হইতে ইহাদের আশ্চর্যজনক ব্যতিক্রম দেখা যায় (ইহারা "rare, surprising and ugly")[৭]।

ক্রেট্শ্মার তাঁহার রোগী পর্যবেক্ষণকালে লক্ষ্য করেন যে, **খেদোন্মত্ত বাতুলদের অধিকাংশই হইল পিক্নিক্-আকৃতির এবং অধিকাংশ চিত্তভ্রংশী বাতুলেরা হইল দেহগঠনে এস্থেনিক-আকৃতির। এ্যাথ্-লেটিক্ এবং ডিস্প্লাস্টিকরাও হইল এই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত।**

ইহার ভিত্তিতে ক্রেট্শ্মের স্বাভাবিক ব্যক্তিত্বকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—**চিত্তভ্রংশীরূপ** (schizothyme) এবং **খেদোন্মত্তরূপ** (cyclothyme)। **চিত্তভ্রংশীরূপ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকেদের সামাজিকতা-বোধ কম**—তাহারা সাধারণতঃ গম্ভীর, স্বল্পভাষী, এবং লোকজনের সহিত মেলামেশা করিতে পারে না। **ইহাদের য়ুঙ্-বর্ণিত অন্তর্বৃত্তের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।** ইহাদের যখন মানসিক রোগ দেখা দেয় তখন ইহারা চিত্তভ্রংশী বাতুল হয়। অপরপক্ষে খেদোন্মত্তরূপী ব্যক্তিরা সামাজিক-

---

৭ বিস্তারিত বিবরণের জন্য Kretschmer, *Physique and Character*, pp. 21-29 দ্রষ্টব্য।

বোধ-সম্পন্ন, রসিক, তীব্র প্রেরণা দ্বারা কার্যে নিযুক্ত হয়, অথচ ইহাদের আবেগ পরিবর্তনশীল। ইহাদের **য়ুঙ্-বর্ণিত বহির্বৃতদের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে** (তবে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, সাধারণ বহির্বৃতেরা পরিবর্তনশীল আবেগের অধীন নহে)। ইহাদের যখন মানসিক রোগ হয়, তখন ইহাদের খেদোন্মত্ত বাতুলতা দেখা দেয়।

আবার ক্রেট্শ্মের ইহাও বিশ্বাস করিতেন যে, কতকগুলি লোক আছে যাহারা পুরাপুরি অস্বভাবী না হইলেও ঐ পথে চলিয়াছে, অর্থাৎ ইহারা যেন স্বাভাবিকতার শেষ প্রান্তে আছে এবং যে কোন সময় ইহাদের মধ্যে পূর্ণ অস্বাভাবিকতা দেখা দিতে পারে। ইহাদের যথাক্রমে চিত্তভ্রংশতা-অভিমুখী (schizoid) এবং খেদোন্মত্ততা-অভিমুখী (cycloid) বলা হয়।

ক্রেট্শ্মারের মতবাদকে সংক্ষেপে নিম্নলিখিত আকারে বর্ণনা করা যাইতে পারে :

দেহের গঠন-বৈশিষ্ট্য	স্বাভাবিক ব্যক্তিত্বের রূপ	মনোবিকারের অভিমুখ্য	পূর্ণ মানসিক বিকার
(ক) পিক্নিক্ (pyknic)	খেদোন্মত্তরূপ (cyclothyme)	খেদোন্মত্ততা-অভিমুখী (cycloid)	খেদোন্মত্ত বাতুলতা (manic-depressive or circular insanity)
(খ) এস্থেনিক্ (Asthenic) (গ) এ্যাথলেটিক্ (Athletic) (ঘ) ডিস্প্ল্যাস্টিক (Dysplastic)	চিত্তভ্রংশীরূপ (schizothyme)	চিত্তভ্রংশতা-অভিমুখী (schizoid)	চিত্তভ্রংশী-বাতুলতা (schizophrenia)

(২) **শেল্ডন-কৃত বিভাগ :**

শেল্ডন্ (William Sheldon) ক্রেট্শ্মেরের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেন; কিন্তু তিনি সম্পূর্ণভাবে ক্রেট্শ্মেরকে সমর্থন করিতে পারেন নাই।

ক্রেট্শ্মের সাধারণ পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ন এবং তিনি মাত্র ২৬০ জন রোগী পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। শেলডন্ বাহ্য পর্যবেক্ষণ অপেক্ষা দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিমাপ গ্রহণ করাকে শ্রেয়ঃ মনে করেন এবং তিনি চার হাজার নগ্নগাত্র ছাত্রের ফটো গ্রহণ করেন।[৮] ক্রেট্শ্মেরের সহিত শেল্ডনের প্রধান পার্থক্য হইল যে, শেল্ডনের মতে দৈহিক ভিত্তিতে জাতিরূপ নির্ধারণের জন্য ব্যক্তি-বিশেষের দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির মধ্যে সম্বন্ধ নিরূপণ করা প্রয়োজন, অর্থাৎ দেহের এক অংশের তুলনায় অপর অংশ অতিরিক্ত বর্ধিত, না স্বল্প-বর্ধিত ইহা দেখিতে হইবে।[৯]

শেলডন্ তিন প্রকারের দেহ-বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন।

(১) **এন্ডোমর্ফিক্** (endomorphic)—ইহাদের আন্তরযন্ত্র (বিশেষতঃ উদরাংশ) দেহের অন্যান্য অংশের তুলনায় অধিকতর স্ফীত, অথচ অস্থি, পেশী ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত অপরিপুষ্ট (ইহারা **পিক্নিক্দের সহিত তুলনীয়**)।

(২) **মেসোমর্ফিক্** (mesomorphic)—ইহাদের দেহের সাধারণ গঠন দৃঢ় ও কঠিন এবং পেশীসমূহ সুসংবদ্ধ (ইহারা **এ্যাথলেটিক্দের সহিত তুলনীয়**)।

(৩) **এক্টোমর্ফিক্** (ectomorphic)—ইহাদের দেহ দীর্ঘ ও ক্ষীণ, পেশীসমূহ সুগঠিত নহে এবং আন্তরযন্ত্র বিশেষ বর্ধিত নহে (ইহারা **এস্থেনিক্দের সহিত তুলনীয়**)।

এই তিন প্রকারের দেহরূপের সহিত তিন প্রকারের ব্যক্তিত্ব সংশ্লিষ্ট থাকে।

---

৮ ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত তাঁহার *Atlas of Men* নামক পুস্তকে তিনি সহস্রাধিক পুরুষের ছবি দ্বারা দেহ-বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে জাতিরূপ-নির্ধারণ সম্বন্ধে তাঁহার মতবাদ বুঝাইয়াছেন। তিনি ভবিষ্যতে *Atlas of Women* প্রকাশ করিবার আশা রাখেন।

৯ কোন ব্যক্তির মান-নির্ধারণ (rating)-এর জন্ত শেল্ডন্ ৭টি স্থানের পরিমাপ গ্রহণ করিতেন এবং এইভাবে প্রতিক্ষেত্রেই উর্ধ্বতম মান-অঙ্ক ৭ এবং নিম্নতম মান-অঙ্ক ১ হইতে পারে। সুতরাং চরম (extreme) এন্ডোমর্ফের মান-অঙ্ক হইবে ৭-১-১, চরম মেসোমর্ফের মান-অঙ্ক হইবে ১-৭-১ এবং চরম এক্টোমর্ফের মান-অঙ্ক হইবে ১-১-৭ ; তবে অধিকাংশ ব্যক্তিই কোন চরম শ্রেণীভুক্ত নহে এবং তাহাদের গড়পড়তা মান-অঙ্ক হইবে ৪-৪-৪।

(১) যাহারা **এনডোমর্‌ফিক্‌** তাহারা **ভিসেরোটোনিক্‌** (**viscerotonic**) :

ইহাদের দেহের ভঙ্গিমা শ্লথ (relax); ইহারা দৈহিক আরামপ্রিয়; ইহাদের প্রতিক্রিয়া মন্থর; ইহারা ভোজনপ্রিয় এবং অন্যের সহিত একত্রে আহার করিতে ভালবাসে; ইহারা আমোদ-প্রমোদ, উৎসব ইত্যাদি পছন্দ করে; ইহারা অন্যের সহিত মিশিতে চাহে; অন্যের স্নেহ-ভালবাসা আকাঙ্ক্ষা করে; বিপদে অন্য লোকের সাহায্য চাহে; ইহাদের আবেগের প্রবাহ সমভাবে চলে (even flow of emotion); নিজের মনের আবেগ ও অনুভূতি ইহারা খোলাখুলি বা সরলভাবে অন্যের নিকট প্রকাশ করে; ইহাদের সহ্যশক্তি আছে; ইহারা নিদ্রাকালে গভীরভাবে নিদ্রামগ্ন হয়; শৈশবের চিন্তা পছন্দ করে এবং নিজের আত্মীয়-স্বজনের কথা ভালবাসে; মদ্যপান করিলে অত্যন্ত অসংযত হইয়া পড়ে ইত্যাদি।

(২) যাহারা **মেসোমর্‌ফিক্‌** তাহারা **সোমাটোটোনিক্‌** (**somatotonic**):

ইহাদের দেহের ভঙ্গিমা ও গতি দৃঢ়তাসূচক (assertive); ইহারা দুঃসাহসিক কার্য পছন্দ করে; ইহাদের প্রতিক্রিয়া তেজোদৃপ্ত; ইহারা ব্যায়াম চাহে, অন্যের উপর কর্তৃত্ব করিবার বাসনা থাকে; প্রতিযোগিতা ভালবাসে; বদ্ধ জায়গায় থাকিতে চাহে না; বীরদর্পে শারীরিক কষ্ট অগ্রাহ্য করে; ইহাদের গলার স্বর অসংযত এবং ইহারা গোলমাল পছন্দ করে; বিপদে পড়িলে কাজ করিতে চাহে; যৌবনের কার্যকলাপ ও লক্ষ্য লইয়া আলোচনা ভালবাসে; মদ্যপান করিলে আত্মদম্ভ প্রকাশ পায় ইত্যাদি।

(৩) যাহারা **এক্‌টোমরফিক্‌** তাহারা **সেরিব্রোটোনিক** (**cerebrotonic**):

ইহাদের গতি ও দেহভঙ্গিমা বেশ সংযত (restraint); প্রতিক্রিয়া অতিরিক্ত দ্রুত, গোপনতা পছন্দ করে; আবেগকে নিয়ন্ত্রিত রাখে এবং মনের অনুভূতি গোপন করে; সামাজিকতা একেবারে অপছন্দ করে; খোলা জায়গায় থাকিতে ভয় করে; মনের গতি পূর্ব হইতে নির্ধারণ করা কঠিন; দীর্ঘ নিদ্রার অভ্যাস নাই এবং প্রায় সর্বদাই ক্লান্তি বোধ করে;

বিপদের সময় নির্জনে থাকিতে চায়; ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে; মাদকদ্রব্যাদির প্রতি নিস্পৃহ ইত্যাদি।[১০]

আমরা সংক্ষেপে ক্রেট্‌শ্‌মার্‌ ও শেল্‌ডনের মতবাদ বর্ণনা করিলাম। এইবার এই মতদ্বয়ের **সমালোচনা** করা যাউক্।

(১) ক্রেট্‌শ্‌মার এবং শেল্‌ডনের মতবাদ বা তদনুরূপ মতবাদ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য হইল যে, **দৈহিক গঠন-বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিত্বের প্রধান এবং গৌণ নির্ধারক নহে।** এই সব গঠন-বৈশিষ্ট্যের আবার নিজস্ব কারণ থাকিতে পারে; যেমন, দেহের স্থূলত্ব বা ক্ষীণত্ব, দীর্ঘতা বা খর্বতা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইতে পারে বা নালিকাবিহীন (অথবা অন্তঃক্ষরা) গ্রন্থির রসক্ষরণের দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাহা ছাড়া, দেহের বৈশিষ্ট্য হইতে সরাসরি ব্যক্তিত্বের কোন বিশেষ প্রলক্ষণের উদ্ভব না হইতে পারে। বিশেষ বিশেষ দেহ-বৈশিষ্ট্যের জন্য বাহ্য পরিবেশের সহিত বিশেষ প্রকারের প্রতিযোজনের প্রয়োজন হয় (যেমন, অত্যন্ত স্থূলদেহবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে যেরূপ প্রতিযোজনের প্রয়োজন হয়, ক্ষীণদেহীর পক্ষে সেইরূপ প্রযোজন না হইতে পারে)[১১] এবং এই সব বিশেষ বিশেষ প্রতিযোজনের প্রচেষ্টা হইতে বিশেষ বিশেষ প্রলক্ষণ দেখা দেয়।

(২) ক্রেট্‌শমারের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, তিনি দৈহিক গঠনের যে শ্রেণীকরণ করিয়াছিলেন, তাহা মাত্র **কিছু সংখ্যক অস্বভাবিমনোবিশিষ্ট ব্যক্তিকে পর্যবেক্ষণ করিয়া রচিত হইয়াছিল**[১২]; **সুতরাং উহার সার্বিকতা লইয়া প্রশ্ন উঠে।** তাহা ছাড়া, পরবর্তী কালে

১০ এই তিনটি হইল মুখ্য দেহ-রূপ। ইহা ব্যতীত শেল্‌ডন্‌ আরও কয়েকটি গৌণ বা অপ্রধান দেহ-রূপের কথা বলিয়াছেন: যথা, (১) Dysplasia—ইহা হইল প্রধান প্রধান দেহ-রূপের অসামঞ্জস্যপূর্ণ বা অদ্ভুত সমাবেশ। (২) Gynandromorphy—ইহা হইল পুরুষের মধ্যে স্ত্রীজনোচিত এবং স্ত্রীলোকের মধ্যে পুরুষোচিত বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ। (৩) Textural aspect—ইহা হইল দৈহিক উপাদানের স্থূলত্ব বা সূক্ষ্মত্ব।

১১ 'স্থূলদেহীরা রসিক' (Fat men are humorous)—এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত আছে। ইহার কারণ সম্বন্ধে পরিহাস ছলে বলা হয় "মোটা লোকেরা রসিক না হ'য়ে কি করবে? অপরের সঙ্গে ঝগড়া করলে তারা না পারবে মারামারি করতে, আর না পারবে পালাতে।"

১২ এই বিষয়ে ম্যাক্‌ডুগালের মন্তব্য লক্ষণীয়: "But Kretschmer's conclusions are based almost wholly on the Schwabian population; and he has not taken into account racial peculiarities, whether mental or physical." (*An Outline of Abnormal Psychology*, pp. 440-41 *fn.*)

গবেষকগণ দেখিয়াছেন যে, ক্রেট্শ্মার-প্রদত্ত শ্রেণীকরণ অনেক ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নহে।

(৩) **শেল্ডনের** মতবাদ বহু স্বাভাবিক ব্যক্তির দেহের পরিমাপ ও ছবি গ্রহণ করিয়া গঠিত হইয়াছে এবং তিনি এ কথাও স্বীকার করিয়াছেন যে, দেহ-বৈশিষ্ট্য ব্যতীত অন্য উপাদানও ব্যক্তিত্বের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে (যদিও আমূল পরিবর্তন সাধন করিতে পারে না)। তাহা হইলেও, **ব্যক্তিত্বের উপর দৈহিক গঠনের প্রাধান্য তিনি কতদূর 'প্রমাণ' করিয়াছেন এবং উহা কতদূর পুনঃ পর্যবেক্ষণ দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে।**

(গ) শৈশবের অভিজ্ঞতার দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ-নির্ধারণ :

আমরা পূর্বে (পৃঃ ২১১-১৪) আলোচনা করিয়াছি যে, সমাজ (বিশেষতঃ পরিবার) ব্যক্তি-জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এবং এই জন্য সামাজিক তথা পারিবারিক প্রভাবকে ব্যক্তিত্বের অন্যতম উপাদান বলিয়া সাধারণতঃ গণ্য করা হয়।

শিশু-জীবনের উপর বাহ্য পরিবেশ (বিশেষতঃ পিতা-মাতার ব্যবহার) কিরূপ প্রতিক্রিয়া করে এবং উহার ব্যক্তিত্ব-গঠনে 'উপাদান' জোগাইয়া থাকে, তাহার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন মনঃসমীক্ষণবাদী ফ্রয়েড্। পিতা-মাতার (ও অন্যান্য পরিণতবয়স্কদের) ব্যবহারের প্রতিক্রিয়ার ফলে শিশুর কাম (libido)-এর গতি এক বিশেষ পর্যায়ের উপর সংবদ্ধ (fixated) হইয়া যাইতে পারে এবং ইহার ফলে তাহার ব্যক্তিত্বের একটি বিশেষ রূপ নির্ধারিত হয়। তাঁহার এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ফ্রয়েড্ ব্যক্তিত্বের তিনটি জাতি-রূপের উল্লেখ করিয়াছে[১৩] :

(১) **পায়ুকামী** (Anal-erotic Type)—শিশুর পিতা-মাতা যদি শৈশবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা (toilet training)-এর উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে, বা কোন কারণে শিশু যদি পিতা-মাতার উপর বিরাগজনিত আক্রমণাত্মকভাব পোষণ করে, তাহা হইলে শিশু পায়ুকামী হইতে পারে।

১৩ Freud, *Collected Papers*, Vol. II দ্রষ্টব্য। **সংক্ষিপ্ত বিবরণীর জন্য** G. S. Blum, ***Psychoanalytic Theories of Personality***, pp 139-164 **দ্রষ্টব্য**।

পায়ুকামী ব্যক্তিত্বের লক্ষণ প্রকাশ পায় প্রায় তিন প্রকারের আবেশিক (obsessional) **ব্যবহারের মাধ্যমে—কৃপণতা** (parsimony বা frugality), **একগুঁয়েমি** (petulence বা obstinacy) এবং **কোন কিছুর খুঁটিনাটি লইয়া খুঁতখুঁত করা** (pedantry বা overfussiness about details)।

(২) **মুখ-কামী** (Oral-erotic Type): ইহারা দুই প্রকারের—মর্ষকামী (sadistic) এবং ভৌগিক (passive)। **যাহারা মর্ষকামী** (oral-sadistic বা 'biting' type) **তাহারা শৈশবে মাতার আদর-যত্ন হইতে বঞ্চিত** এবং ফলে শৈশব হইতেই তাহাদের একটা ব্যর্থতার ভাব (sense of frustration) দেখা দেয়। ইহারা **ভাবী জীবনে হয় নৈরাশ্যতার ভাব** (pessimism) **দেখায়, না হয় বিদ্বেষভাবাপন্ন** (malicious) **হইয়া পড়ে** এবং আচারে-ব্যবহারে **বিদ্রূপাত্মক** (sarcastic) হইয়া পড়ে। আবার যাহারা **ভৌগিক মুখকামী** (oral-passive বা 'sucking' type) তাহারা **আশাবাদী** (optimistic) এবং আচরণে **অপরিপক্ক** বা **শিশুসুলভ** (immature) হইয়া পড়ে।

(৩) **উপস্থ-কামী** (Genital Type)—ইহাদের ভিতর যাহারা লিঙ্গকামী (phallic type) তাহারা আত্মকামী (narcisstic) ও দুরাকাঙ্ক্ষী (overambitious) হইয়া পড়ে—যে **সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাহে,** এবং **সামান্য ব্যর্থতাতেই হতাশ হইয়া পড়ে।** যাহারা এই স্তর অতিক্রম করিয়া সাধারণ যৌন সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে, তাহাদের স্বাভাবিক গোষ্ঠীভুক্ত বলা যাইতে পারে।

ফ্রয়েডীয় মনোবিদ্যার মূল তত্ত্ব (কামবাদ বা doctrine of libido) লইয়া অনেক সমালোচনা হইয়াছে; এই স্থলে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা মাত্র কয়েকটি মন্তব্য করিব:

(১) **ব্যক্তিত্বের মূলে কেবলমাত্র যে কামই কার্য করিতেছে তাহা বলা যায় না।** কামকে ব্যক্তিত্বের 'একমাত্র উপাদান' না বলিয়া 'অন্যতম উপাদান' গণ্য করাই বাঞ্ছনীয়।

(২) **ব্যক্তিত্বের ভিত্তিভূমি যে শৈশবেই সম্পূর্ণরূপে রচিত**

হয় এমন কথা সকলে গ্রহণ করেন না। বর্তমানের প্রভাবকে অস্বীকার করিয়া ফ্রয়েড্ একদেশদর্শী হইয়া পড়িয়াছেন মনে হয়।

(৩) ব্যক্তিত্বের যে কয়েকটি জাতিরূপের উল্লেখ ফ্রয়েড্ করিয়াছেন, কার্যক্ষেত্রে ব্যক্তি-বিশেষের মধ্যে তাহাদের **শুদ্ধরূপ** (pure forms)-এ **দেখা যায় না।**

(৪) ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ-নির্ধারণে ফ্রয়েড্ তথাকথিত **অস্বাভাবিক ব্যবহারের উপরই অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।**

(৫) শৈশবে মলরোধের অভ্যাস করিয়া যে পায়ুকামী হইয়া পড়ে, সে ভাবীজীবনে অর্থ 'ধারণ' করিয়া রাখিবে, অর্থাৎ অর্থ ব্যয়ে কাতর এবং কৃপণ হইবে—এই মত সাধারণ বিবেচনায় **নিতান্ত কষ্টকল্পিত** বলিয়া মনে হয়।

সাধারণ মন্তব্য ঃ

আমরা উপরের ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ সম্বন্ধে কয়েকটি মতবাদ আলোচনা করিলাম।

জাতিরূপ অনুসারে ব্যক্তিত্বের শ্রেণীকরণের সুবিধা ও অসুবিধা দুই-ই আছে।

এইরূপ বিভাগের **সুবিধা** হইল যে, এক একটি 'শুদ্ধ' জাতিরূপ জানা থাকিলে উহার আলোকে ব্যক্তি-বিশেষের স্বরূপ সহজে নির্ণয় করা যায়। কতকগুলি গুণের সমাবেশে একটি শ্রেণী কল্পনা করা হয়; সুতরাং কোন্ ব্যক্তি কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত তাহা জানিলে তাহার কি কি প্রলক্ষণ থাকিবে তাহা অনুমান করা যায়। সুতরাং জাতিরূপ-কল্পনা 'আলোচনার নির্দেশক' (reference point) হিসাবে আলোচনার সুবিধা করে। তাহা ছাড়া, এইরূপে বিভাগ করিলে 'সমগ্র' (gestalt বা pattern)-এর সাহায্যে 'অংশ'-গুলিকে (যথা, বিশেষ বিশেষ আবেগ, প্রতিন্যাস ইত্যাদি) বুঝা যায়।

(১) জাতিরূপ কল্পনার বিরুদ্ধে **প্রধান অভিযোগ** হইল যে, ইহা জাতিরূপগুলিকে পরস্পর হইতে পৃথক্ কল্পনা করে; কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এইরূপ **'শুদ্ধ' জাতিরূপের সাক্ষাৎ পাওয়া কঠিন।** অধিকাংশ সময়ই দেখা যায় যে, ব্যক্তি-বিশেষ দুইটি বিপরীত জাতিরূপের মধ্যবর্তী স্থান অধিকার করিয়া আছে।

(২) দ্বিতীয়তঃ, এইরূপ শ্রেণীকরণের সময় মনে করা হয় যে, ব্যক্তিত্বের 'সমগ্রত্ব' ব্যক্তিত্বের 'অংশ'-গুলিকে একই আদর্শে নিয়ন্ত্রিত করে। বাস্তবক্ষেত্রে ইহার সত্যতা সকল সময় প্রমাণিত হয় না, কারণ ইহা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে ব্যক্তি-বিশেষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটি পূর্ণসামঞ্জস্য-বিশিষ্ট ঐক্য দেখা যাইত; কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ঐরূপ আদর্শ ঐক্য দেখা যায় না। তাহা ছাড়া, 'সমগ্র' যেমন 'অংশ'-কে প্রভাবিত করে, 'অংশ'-সমূহও সেইরূপ 'সমগ্র'-কে প্রভাবিত করে—জাতিরূপসম্বন্ধীয় মতবাদ কিন্তু ইহার উপর গুরুত্ব আরোপ করে নাই।

(৩) তৃতীয়তঃ, এক একটি জাতিরূপের বর্ণনায় এমন বিবিধ প্রলক্ষণের সমাবেশ করা হইয়া থাকে যাহা বাস্তবক্ষেত্রে সকল সময় ঘটে না। যেমন, অন্তর্বৃত্তের বর্ণনায় বলা হয় যে, সে অসামাজিক এবং কাহারও সহিত মেলামেশা করিতে পারে না, আবার সে গভীর অনুভূতিপ্রবণ (deeply sensitive)। কিন্তু আমরা এমন লোক মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাই, যাহারা অপরের সহিত মিশিতে ভালবাসে (gregarious), অথচ গভীর অনুভূতি-প্রবণ।

(৪) চতুর্থতঃ, জাতিরূপ অনুসারে ব্যক্তিত্ব-বিভাগ কালে মনে হয় যেন জাতিরূপই ব্যক্তি-বিশেষের ব্যবহারের কারণ। যেমন, অনেক সময় বলা হয় যে, "অমুক-লোক খুব হৈ চৈ করে, কারণ সে বহির্বৃত্ত", "অমুক লোক কৃপণ, কারণ সে পায়ুকামী।" কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এইরূপ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ নহে, কারণ বহির্বৃত্তত্ব বা অন্য কোন জাতিরূপত্ব নিজেই আবার বিবিধ সামাজিক ও অন্যান্য কারণের কার্যবিশেষ।

(৫) ইহাও বলা যাইতে পারে যে, জাতিরূপ সম্বন্ধে মতবাদ এত প্রকারের আছে যে, উহাদের কোন একটির উপর নির্ভর করা সমীচীন হইবে না।

এই সকল কারণে অনেক মনোবিৎ ব্যক্তিত্বের আলোচনা-প্রসঙ্গে জাতিরূপের উল্লেখ না করিয়া প্রলক্ষণ (trait)-এর বর্ণনা করাই শ্রেয়ঃ মনে করেন।

২। ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ (Personality Traits):

(ক) প্রলক্ষণ কাহাকে বলে ?

ব্যক্তি-বিশেষের ব্যবহারের মধ্যে তাহার ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়। এই ব্যবহার অসংখ্য এবং বহুমুখী। **বিবিধ ব্যবহারের সুষ্ঠু, সংক্ষিপ্ত, বোধগম্য উপায়ে বর্ণনা দান করিবার জন্য প্রলক্ষণের প্রয়োজন হয়।**

ধরা যাউক্, রাম সম্বন্ধে আমরা জানি যে, সে গুরুজনদের সম্মান করে, স্ত্রীলোককে মর্যাদা দান করে, লোকের সহিত কলহ করে না, বিপদে লোককে সাহায্য করে, ন্যায়নীতির পথ অবলম্বন করিয়া চলে ইত্যাদি। এখন রামের ব্যক্তিত্বের বর্ণনা দান করিতে হইলে উহার সকল ব্যবহারের উল্লেখ করা সম্ভব নহে। আমরা যদি বলি 'রাম প্রকৃত ভদ্র লোক', তাহা হইলে তাহার আচরণের যে সব বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হইল তাহার আভাস বা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাহা হইলে 'ভদ্রতা' রামের ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক একটি 'প্রলক্ষণ'।

যদিও প্রলক্ষণ ব্যবহারের পরিচায়ক, যাহা কিছু ব্যবহার বর্ণনা করে বা নির্দেশ করে, তাহাকেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে প্রলক্ষণ বলা যায় না। কোন গুণ 'প্রলক্ষণ' পদবাচ্য হইতে হইলে উহার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন :

(১) উহা স্বাভাবিকভাবে জনগণের মধ্যে বিভিন্ন নির্দিষ্ট হারে বণ্টিত (distributed) থাকা বাঞ্ছনীয়।

(২) অনেকক্ষেত্রে একটি গুণ ও তাহার বিপরীতকে লইয়া যুগ্ম প্রক্ষলণ (pair of traits) গঠন করা হয়। যেমন, প্রফুল্ল—বিষণ্ণ (cheerful—gloomy), উদ্ধত—বিনীত (ascendent—submissive)। ইহার অর্থ এই নহে যে, জনগণ 'প্রফুল্ল' ও 'বিষণ্ণ' এই দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্ গোষ্ঠীতে বিভক্ত। ইহার অর্থ হইল যে, 'প্রফুল্লতা' হইতে 'বিষাদ' পর্যন্ত এই আয়তনের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন হারে জনগণের মধ্যে কিছু-না-কিছু সংখ্যক লোক আছে; অবশ্য এই আয়তনের মধ্যস্থলে বা কেন্দ্রে সর্বাধিক সংখ্যক লোক আছে।

[ব্যক্তিত্বের মান-নির্ধারণ (personality rating)-এর জন্য যদি দুইটি বিপরীত গুণবাচক পদ ব্যবহার করা হয় এবং উহাদের দুইটি বিপরীত দিকে রাখিয়া যদি একটি সরলরেখা দ্বারা যোগ করা যায়, তাহা হইলে ঐ রেখার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নির্ধারিত হইবে, এবং ঐ রেখাকে 'ব্যক্তিত্বের আয়তন' (dimensions of personality)-এর পরিচায়ক বলা হয়।[১৪]]

১৪ Woodworth, *Psychology*, p. 137 দ্রষ্টব্য।

(৩) 'প্রলক্ষণ'-আখ্যার উপযুক্ত গুণগুলি এমন হওয়া প্রয়োজন যে, উহাদের যেন সহজে বুঝিতে বা চিনিতে পারা যায় (বা উহারা easily recognisable হয়) এবং উহারা যেন বিশেষ প্রকারের ব্যবহারকে সুষ্ঠু ও সহজ উপায়ে বর্ণনা করে।

(৪) প্রলক্ষণ যে গুণের নির্দেশ করে তাহা ব্যক্তি-বিশেষের সকল আচরণের মধ্যে সঙ্গতিপূর্ণ বা সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে (consistently) যেন প্রকাশমান হয়। বাহ্য অবস্থার পরিবর্তনের সহিত সহজেই উহার আমূল পরিবর্তন ঘটে না। সুতরাং প্রলক্ষণ এমন গুণের নির্দেশ দিবে যাহা ব্যক্তি-বিশেষের চরিত্রের বা আচরণের যেন অপেক্ষাকৃত স্থায়ী গুণ হয়।

['সঙ্গতিপূর্ণ আচরণ' বলিতে কী বুঝায়? যদি বলা যায় যে, একজনের প্রলক্ষণ হইল 'প্রফুল্লতা' (cheerfulness), তাহা হইলে আশা করা যায় যে, মোটামুটি সকল অবস্থায় সে প্রফুল্ল থাকিবে; তবে অবস্থার পূর্ণ বিপর্যয় ঘটিলে ইহা আশা করা যায় না। অপরপক্ষে একই অবস্থার মধ্যে অথবা অবস্থার সামান্যমাত্র তারতম্যে যে ব্যক্তি বিভিন্ন আচরণ করে, যে "ক্বচিৎ রুষ্টঃ, ক্বচিৎ তুষ্টঃ, রুষ্টস্তুষ্টঃ ক্ষণে ক্ষণে", তাহার আচরণ অসঙ্গতিপূর্ণ।[১৫]]

(৫) ব্যক্তি-বিশেষের ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ স্থিরীকৃত হইলে তাহার ভবিষ্যৎ আচরণের গতিপথ জানা যাইবে, ইহা আশা করা যায়। (অবশ্য ইহা সম্ভব হইতে পারে, যদি প্রলক্ষণটি সুনিশ্চিতভাবে স্থিরীকৃত হইয়া থাকে এবং ব্যক্তি বিশেষের অতীত পরিবেশের স্বরূপ সঠিকভাবে জানা থাকে।[১৬])

---

১৫ এই স্থলে সঙ্গতিপূর্ণ ব্যবহার বলিতে আত্ম-সঙ্গতি (self-consistency) বুঝাইতেছে, অর্থাৎ তুল্য অবস্থায় সমান আচরণ। আবার—'সঙ্গতি' (consistency) বলিতে ব্যাপক অর্থে সর্বকালীন প্রলক্ষণ (trait generality)-ও বুঝাইতে পারে। Woodworth-এর ভাষায়: "Trait generality implies that a certain trait manifests itself in varied situations. If even temper were a perfectly general trait, the individual possessing this trait would show it under all conditions." (*Psychology*, 12th. Ed., p. 156). [গীতায় বর্ণিত "স্থিতধী"-র কথা এই প্রসঙ্গে তুলনীয়।]

১৬ H. W. Karn & J. Weitz. *Psychology*, pp. 191-193 দ্রষ্টব্য।

তুলনীয়: N. N. Sen Gupta, *Heredity in Mental Traits*, pp. 3-4:

(i) A trait is observable as a specific psychosis in introspection, e g., image-type, sensory acuity.

যদিও ব্যক্তি-বিশেষের ব্যক্তিত্বকে বুঝিবার জন্য উহার ভিন্ন ভিন্ন প্রলক্ষণগুলিকে মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আলোচনা করা হয়, তাহা হইলেও ইহার অর্থ এই নহে যে, উহাদের যোগফল গ্রহণ করিলেই ব্যক্তিত্বকে বুঝা যাইবে। ব্যক্তিত্বের একটি অনুপম (unique) সামগ্রিক রূপ (totality) আছে যাহা পৃথক্ পৃথক্ প্রলক্ষণ পরিমাপ করিয়া বুঝা যায় না। ব্যক্তিত্বকে বুঝিতে হইলে 'সমগ্র' ব্যক্তি কি-ভাবে কার্য করিতেছে তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে।[১৭]

তাহা ছাড়া, ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রলক্ষণগুলিকে ব্যক্তি-বিশেষের বিবিধ আচরণের কারণ বলিয়া গণ্য করা উচিত হইবে না। যেমন, যদি বলা যায় যে, কোন ব্যক্তির মধ্যে 'সদ্ভাবাপন্নতা' (friendliness) প্রলক্ষণ আছে, তাহা হইলে ইহা বুঝায় না যে, এই প্রলক্ষণটি আছে বলিয়া সে অপরের সহিত বন্ধুত্ব করে, অপরকে সাহায্য করে ইত্যাদি—বরং সে এইরূপ আচরণ করে বলিয়া তাহার 'সদ্ভাবাপন্নতা'-প্রলক্ষণ আছে বলা হয়।

(খ) প্রলক্ষণের তালিকা ঃ

প্রলক্ষণের তালিকা লইয়া মনোবিদ্গণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। তবে **বুদ্ধিশীলতা, উদারচরিত্রতা, পরিশ্রমশীলতা, শান্তভাবাপন্নতা, সদ্ভাবাপন্নতা, সহযোগিতা** ইত্যাদি হইল ব্যক্তিত্বের উল্লেখযোগ্য প্রলক্ষণ।

আমরা এখানে কয়েকজন বিশিষ্ট মনোবিৎ কর্তৃক প্রদত্ত প্রলক্ষণের তালিকা উল্লেখ করিতে পারি ঃ

এফ্. এইচ. আলপোর্টের মত :

ফ্লয়েড্ আল্পোর্ট প্রলক্ষণ বলিতে বুঝেন জন্মগত ও অভ্যাসলব্ধ প্রতি-

---

(ii) A trait exhibits itself in a specified *form* of behaviour which maintains itself under varying circumstances, e g., a fear or an anger response ; the 'form' in games.

(iii) A trait is that which in introspection or behaviour is durable in character. It describes similar time-curves and exhibits similar quality-phases on different occasions.

(iv) A trait again cannot easily be modified through a change of external conditions, e.g., synæsthesia.

১৭ G. W. Allport, *Personality*, pp. 343-365 দ্রষ্টব্য।

ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়। তিনি পাঁচটি প্রধান প্রলক্ষণ ও উহার অন্তর্ভুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির নিম্নলিখিত বর্ণনা দিয়াছেন :[১৮]

১। **বুদ্ধি (Intelligence) :**

সমস্যা-সমাধানের সামর্থ্য (problem-solving ability),
স্মৃতিশক্তি এবং শিক্ষণের ক্ষমতা (Memory and Learning Ability),
প্রত্যক্ষ-শক্তি (Perceptional Ability),
গঠনমূলক কল্পনা (Constructive Imagination),
বিশেষ বিশেষ দক্ষতা (Special Abilities),
সুষ্ঠু, নির্দোষ বিচারশক্তি (Soundness of Judgement),
সাধারণ প্রতিযোজনের ক্ষমতা (General Adaptabiliiy)।

২। **গতীয়তা (Motility) :**

চেষ্টাবেদনানুভূতি-প্রাথর্য এবং ঐরূপ অনুভূতির স্বল্পতা বা দুর্বলতা (Hyperkinesis—Hypokinesis),
তাড়না—বাধ (Impulsion—Inhibition),
সংসক্তি (Tenacity),
পটুতা (Skill),
গতিপদ্ধতি (Style)।

৩। **আয়ান (Temperament) :**

প্রক্ষোভ বা আবেগের পৌনঃপুনিকতা ও পরিবর্তন (Emotional Frequency and Change),
প্রক্ষোভ বা আবেগের ব্যাপকতা (Emotional Breadth),
প্রক্ষোভ বা আবেগের তীব্রতা (Emotional Strength),
স্বাভাবিক মেজাজ (Characteristic Mood),
প্রক্ষোভজ প্রতিন্যাস (Emotional Attitude)।

৪। **আত্ম-প্রকাশ (Self-Expression) :**

নোদনা (Drive),

১৮ F. H. Allport, *Social Psychology* (1924), pp. 102-103.

ক্ষতিপূরণমূলক ব্যবহার (Compensation),
বহির্বৃত্তত্ব—অন্তর্বৃত্তত্ব (Extroversion—Introversion),
পরিজ্ঞান (Insight),
ঔদ্ধত্য (প্রভুত্ব)—বিনয় (Ascendance—Submission),
আত্মপ্রচার—নির্জনতাপ্রিয়তা (Expansion—Reclusion) ।

৫ । **সামাজিকতাবোধ** (Sociality) :

সামাজিক পরিবেশ দ্বারা উদ্দীপনা-প্রবণতা (Susceptibility to Social stimulation),
সমাজবোধ—স্বার্থানুসন্ধান (Socialization—Self seeking),
সামাজিক কার্যে অংশ গ্রহণ (Social Participation),
চরিত্র (Character).

অনেক লেখক (যথা, Shaffer) মনে করেন যে, এই তালিকাই পর্যাপ্ত । তবে ইহার সহিত কয়েকটি দৈহিক বৈশিষ্ট্য যোগ দেওয়া যাইতে পারে ; যেমন, দেহের আকৃতি, দৈহিক শক্তি, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য ।

উড্‌ওয়ার্থের মত :

উড্‌ওয়ার্থ (Woodworth) নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রলক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন :[১৯]

(১) নির্বন্ধতা—অধীরতা
(Persistence—Quick giving up),

(২) বিপদাশঙ্কা—প্রফুল্লতা
(Trouble-finding—Cheerfulness),

(৩) ঔদ্ধত্য—বিনয়
(Ascendance—Submissiveness),

(৪) অন্তর্বৃত্তত্ব—বহির্বৃত্তত্ব
(Introversion—Extroversion) ।

---

১৯ Woodworth, *Psychology* (12th. Ed.), pp. 152-53.

আর্. বি. ক্যাটেলের মত :

সাম্প্রতিককালে আর্. বি. ক্যাটেল বহুবিধ (প্রায় ৪,০০০) সম্ভাব্য প্রলক্ষণ লইয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করেন এবং শেষ পর্যন্ত নিম্নলিখিত বারটি বিভাগে মুখ্য প্রলক্ষণগুলি ভাগ করেন[২০] :

(১) **খেদোন্মত্ত-রূপ** বনাম **চিত্ত-ভ্রংশীরূপ**

বহির্মুখী	—	অন্তর্মুখী
ভদ্রভাবাপন্ন	—	রুক্ষস্বভাব
প্রতিযোজনক্ষম	—	অপরি-বর্তনীয়

(২) **বুদ্ধি-শীলতা** বনাম **উনমানসতা**

বুদ্ধিমান্	—	নির্বোধ
বিবেকী	—	বিবেকহীন
চিন্তাশীল	—	অবিবেচক বা অপরি-ণামদর্শী

(৩) **উচ্চ-পর্যায়ের আবেগ** বনাম **নিম্নপর্যায়ের আবেগ**

বাস্তব	—	আত্মকেন্দ্রিক
অপরিবর্তনীয়	—	অসংযত
ধীর, শান্ত	—	উত্তেজিত

(৪) **ঔদ্ধত্য** বনাম **বিনয়**

দাম্ভিক	—	নম্র
স্বার্থপর	—	আত্মভোলা
কঠোর	—	সুবেদী

(৫) **উচ্ছ্বাস** বনাম **বিষাদ**

প্রফুল্ল	—	বিমর্ষ
আশাবাদী	—	নৈরাশ্যবাদী
সঙ্গলিপ্সু	—	নিঃসঙ্গতাপ্রিয়

(৬) **সুবেদী, কল্পনাপ্রবণ** বনাম **কঠোর, সংযত**

আদর্শবাদী	—	রূঢ়, বিদ্রূপকারী
অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন	—	যুক্তিবাদী
বন্ধুত্বভাবাপন্ন	—	কঠোরচিত্ত

(৭) **শিক্ষিত, সামাজি-কতাপূর্ণ** বনাম **অশিক্ষিত**

চিন্তাশীল	—	ক্ষুদ্রমনা
অসরল	—	সরল
রুচিজ্ঞান-সম্পন্ন	—	অশিষ্ট

(৮) **সমাকলিত** বনাম **অপরিপক্ক, নির্ভরশীল**

স্বাধীন	—	পরাধীন
অধ্যবসায়ী	—	ভ্রান্তিপূর্ণ
ব্যবহারিক	—	অবাস্তব
দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন	—	কল্পনাবিলাসী

২০ R, B Cattell, *Description and Measurement of Personality*. pp. 313-336 দ্রষ্টব্য।

(৯) দয়ার্দ্রচিত্ত, দুঃসাহসী বনাম **রোধকারী, অন্তর্মুখী**

দয়ালু — রূঢ়
সহযোগী — বিঘ্নকারী
অকপট — গোপনতাপ্রিয়

(১০) স্নায়বিক অবসাদ বনাম **বীর্যবত্তা**

অবসন্ন — সতর্ক
পলায়নপর — পরিশ্রমী
শিথিলচিত্ত — দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

(১১) অনুভূতি-প্রবণ, শিশুসুলভ বনাম **ব্যর্থতা সহন-শীলতা**

শিশুভাবাপন্ন —প্রতিযোজনশীল
অস্থির — শান্ত
অধীর — জড়

(১২) **উদ্দাম** বনাম **ভ্রান্তিবিলাসী**

উৎসাহী — ব্যর্থ
বন্ধুভাবাপন্ন — বিদ্বেষভাবাপন্ন
বিশ্বাসপ্রবণ — সন্দিগ্ধচিত্ত

গর্ডন **আলপোর্ট** (Gordon Allport)-এর **মতবাদ :**

আমরা এ পর্যন্ত প্রলক্ষণসম্বন্ধে যে সকল লেখকের মতবাদ আলোচনা করিলাম, তাঁহারা সকলেই সাধারণ বা সর্বজনপ্রযোজ্য (common বা universal) প্রলক্ষণের তালিকা রচনার চেষ্টা করিয়াছেন। গর্ডন আল্‌পোর্টের মতের একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। তিনি মনে করেন যে, প্রতি ব্যক্তিরই ব্যক্তিত্ব অনুপম (unique)—এইজন্য একই অবস্থার মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া করে।[২১] আল্‌পোর্ট সাধারণ প্রলক্ষণের অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করেন নাই ; তবে তিনি মনে করেন যে, তথাকথিত সাধারণ প্রলক্ষণ হইল জটিল 'ব্যক্তিগত প্রলক্ষণসমূহের পরিমাপযোগ্য অবস্থা' (a measurable aspect of complex individual traits), 'বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতিযোজনের ভঙ্গিমার মোটামুটি সাদৃশ্য।' আল্‌পোর্টের মতে প্রকৃত প্রলক্ষণ হইল ব্যক্তিগত অনুপম প্রলক্ষণ, কারণ (ক) একমাত্র ব্যক্তির মধ্যেই প্রলক্ষণ থাকে, সমাজ বা গোষ্ঠীর মধ্যে থাকে না এবং (খ) প্রতি ব্যক্তির নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকেই এই প্রলক্ষণগুলি গড়িয়া উঠে।

২১ আলপোর্ট এই প্রসঙ্গে উপমা দিয়াছেন যে, "যে আগুনে মাখন গলে, সেই আগুনের উত্তাপেই ডিম জমিয়া শক্ত হয়।"

প্রলক্ষণের অনুপমত্ব সম্বন্ধে Allport, *Personality*, pp. 298-99 দ্রষ্টব্য। এই মতের সমালোচনার জন্ত দ্রষ্টব্য : P. A. Bertocci, 'A critique of G. W. Allport's theory of movitation' (*Psychological Review*, 1940. Vol. 47).

৩। ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা ও পরিমাপ (Personality Tests & Measurements) :

পরিমাপের পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয়তা :

ব্যক্তি বিশেষকে বুঝিবার চেষ্টা মানুষ সুদূর অতীত হইতেই করিয়া আসিতেছে ; এইজন্য সে ব্যক্তি-বিশেষের বাহ্য আচরণ লক্ষ্য করে, তাহার সম্বন্ধে অপরের মতামত জিজ্ঞাসা করে এবং তাহাকে তাহার বিশ্বাস, আদর্শ, প্রতিন্যাস ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। মনোবিদ্যার প্রগতির ফলে আজ যখন মানুষ মানুষকে সুষ্ঠু বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জানিবার ও বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে, তখনও সে উপরি-উক্ত সনাতন পদ্ধতিগুলি ত্যাগ করে নাই ; তবে সেগুলিকে সুসংবদ্ধ বা নীতিসম্মত পদ্ধতিতে পরিচালিত করিবার উপায় সে উদ্ভাবন করিয়াছে। **বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা কয়েকটি সুনিয়ন্ত্রিত** (controlled) **পন্থায় ব্যক্তিত্বের মান নির্ধারণের চেষ্টা করে এবং ইহার অনুসন্ধানের ফলাফল পরিমাণের অঙ্কে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করে।**

বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ব্যক্তিত্ব পরিমাপের প্রধান উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তি-বিশেষের ব্যবহার, সমষ্টিগত ব্যবহার এবং ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক ব্যবহারের তাৎপর্য বুঝা এবং পারিমাণিক মূল্য-নির্ধারণ করা। এই প্রকার জ্ঞানের সাহায্যে আমরা ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত ব্যবহার ভবিষ্যতে কী হইতে পারে তাহা অনুমান করি এবং প্রয়োজন হইলে পরিবর্তন ঘটাইয়া উহাদের নিয়ন্ত্রণের উপায় চিন্তা করিতে পারি।

যদি কোন ব্যক্তি অপপ্রতিযোজনের ফলে অসুবিধা ভোগ করে এবং মনোবিদের সাহায্য চায় তখন তাহার ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা ও পরিমাপ করা হইলে মনোবিৎ সহজেই বুঝিতে পারেন কোথায় তাহার মানসিক দুর্বলতা এবং কোথায় তাহার শক্তি। সেইরূপ ছাত্রনির্বাচন, কর্মিনিয়োগ, সৈন্য-নির্বাচন ইত্যাদি ব্যাপারে উপযুক্ততা নির্ধারণের জন্য ব্যক্তিত্ব-পরীক্ষা প্রয়োজন।

পরিমাপের বিবিধ পদ্ধতি :

ব্যক্তিত্ব-পরীক্ষা প্রচেষ্টার প্রারম্ভ হইতে বহু মনোবিৎ বিবিধ পরীক্ষা-

পদ্ধতি উদ্ভাবনের চেষ্টা করিয়াছেন।[২২] আমরা এখানে কয়েকটি প্রধান পদ্ধতির উল্লেখ করিব।

(ক) **সাধারণ সাক্ষাৎকার** (Interview):

সাক্ষাৎকারের সময় মনোবিৎ ব্যক্তি-বিশেষের সহিত আলাপ-আলোচনার দ্বারা তাহাকে জানিতে চেষ্টা করেন। সাধারণতঃ মনঃসমীক্ষণকালে মনোবিৎ এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। রোগী তাহার জীবন-কাহিনী বলিয়া যায় (ইহাকে বলা হয় বিরেচন বা catharsis) এবং মনঃসমীক্ষণবিৎ নীরবে তাহা শ্রবণ করেন। রোগীর কাহিনীর মাধ্যমে মনোবিৎ তাহার জীবনের সমস্যা, তাহার অভিযোগ, তাহার অতীত অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা ইত্যাদি জানিয়া রোগের প্রকৃত কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করেন।

স্বাভাবিক লোকের ক্ষেত্রেও সাক্ষাৎকার-পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। স্কুল-কলেজে ছাত্র-নির্বাচন, চাকুরীক্ষেত্রে কর্মিনিয়োগ ইত্যাদি কার্যে সাধারণ সাক্ষাৎকার পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

সাক্ষাৎকার **দুই প্রকারের** হইতে পারে: **পূর্বপ্রকল্পিত, প্রণালীসঙ্গত** (pre-planned, formal) এবং **খোলাখুলি কথোপকথন** (informal, conversational)। প্রথমটিতে সাক্ষাৎগ্রহণকারী (interviewer) সাক্ষাৎপ্রদানকারী (interviewee)-কে পূর্ব হইতে রচিত কতকগুলি বিশেষ বিশেষ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। ইহা এক প্রকারের মৌখিক পরীক্ষা বিশেষ। ইহার সুবিধা হইল যে, ইহাতে 'বৃথা' সময় নষ্ট হয় না এবং সাক্ষাৎগ্রহণকারীর নিজস্ব মত, বিশ্বাস ইত্যাদি দ্বারা তাঁহার বিচার দুষ্ট হইবার সম্ভাবনা কম; কিন্তু ইহার অসুবিধা হইল যে, ইহা কৃত্রিম, ইহা ব্যক্তি-বিশেষের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য উদ্ঘাটিত করিতে পারে না (কারণ কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রশ্নগুলি রচিত হয়)। অপর পক্ষে দ্বিতীয় পদ্ধতি (informal method) এর সাফল্য নির্ভর করে সাক্ষাৎগ্রহণকারীর অভিজ্ঞতা, সাবধানতা

২২ Ferguson তাঁহার *Personality Measurement* নামক গ্রন্থে ব্যক্তিত্ব-পরীক্ষার ক্ষেত্রে চৌদ্দ প্রকার দৃষ্টিভঙ্গীর উল্লেখ করিয়াছেন; যথা, Empirical, Rational, A´priori, A´posteriori, Unidimensional, Multidimensional, Diagnostic, Prognostic, Non-analytical, Analytical, Perceptual, Imaginal, Observational এবং Experimental.

ও কৌশলের উপর। এই জন্য এই প্রকার সাক্ষাৎকার পদ্ধতির যাথার্থ্য লইয়া মতভেদ রহিয়াছে।[২৩]

(খ) প্রশ্নাবলী বা প্রশ্নতালিকা (Questionnaires & Inventories):

প্রশ্নাবলী পদ্ধতিতে রীতিসম্মত উপায়ে কতকগুলি প্রশ্ন নির্বাচন করিয়া ব্যক্তি-বিশেষকে উহাদের উত্তর দিতে বলা হয়—উত্তরগুলি হয় 'হাঁ' নয় 'না' এইরূপ সংক্ষিপ্ত আকারে দিবার নির্দেশ থাকে। এই সব প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে ব্যক্তি-বিশেষের কোন প্রলক্ষণ বা কোন বিশ্বাস, প্রতিন্যাস বা আদর্শ জানার চেষ্টা করা হয়।

প্রশ্নাবলী-পদ্ধতির সুবিধা হইল যে, সাক্ষাৎগ্রহণকারী এবং সাক্ষাৎপ্রদানকারী লইয়া কোন চক্র গঠন করিবার প্রয়োজন হয় না। পরীক্ষণ-পাত্র নিজেই আত্ম-চিন্তা দ্বারা সংক্ষেপে সঠিক উত্তরদানের চেষ্টা করে। এই প্রকার প্রশ্নাবলী উড্‌ওয়ার্থ প্রথম মহাযুদ্ধের সময় প্রণয়ন করেন। পরীক্ষণ-পাত্রদের আবেগসমূহ সুসম এবং অপরিবর্তনীয় (well-balanced and stable) অথবা তাহাদের আবেগসমূহ দ্রুত পরিবর্তনশীল (unstable), ইহাই ছিল তাঁহার অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু। শেযোক্তদলের লোকেরা রণক্ষেত্রের কঠোর জীবনের জন্য উপযুক্ত নহে। উড্‌ওয়ার্থ শেষ পর্যন্ত সর্বসমেত ১১৬টি প্রশ্ন রচনা করিয়াছিলেন; ইহাদের কয়েকটি এইরূপ—

১। আপনি কি নিজেকে বেশ সুস্থ ও সবল বলিয়া মনে করেন?

২। আপনি কি ঘুমাইবার সময় হঠাৎ ভয় পাইয়া জাগিয়া উঠেন?

৩। আপনার কি কখনও বাড়ী হইতে পলাইয়া যাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল?

৪। আপনার কি ভয় হয় যে, আপনি পাগল হইয়া যাইবেন?

৫। আপনি কি রক্ত দেখিলে ভয় পান?

৬। আপনি কি বাড়ীর বাহিরে কাজ (out-door work) পছন্দ করেন?

---

২৩ ভার্ণন (Vernon) বলেন: 'If two school masters independently interviewed 100 candidates for a grammar school, and each picked the twenty best in his opinion, they would agree on nine of their choices only and disagree on eleven. (*Personality Tests and Assessments*, p. 24.)

যাহাদের প্রক্ষোভ বা আবেগসমূহের সুস্থিতি (stability) আছে, তাহারা ১ ও ৬ প্রশ্নের উত্তরে 'হাঁ' এবং ২, ৩, ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তরে 'না' বলিবেন, ইহা আশা করা যায়:

বহির্বৃত্তত্ব ও অন্তর্বৃত্তত্ব নির্ধারণের জন্য কিরূপ প্রশ্ন করা যাইতে পারে তাহার উদাহরণ আমরা ১২৯ পৃষ্ঠায় দিয়াছি।

এস্. এল্. প্রেসি (S. L. Pressey) সাধারণ অনুরাগ-বিরাগ এবং ব্যক্তিগত বিশেষত্ব (idiosyncrasy) নির্ধারিত করিবার জন্য কতকগুলি বিষয়ের তালিকা প্রস্তুত করেন। ইহাকে 'X-O'- পরীক্ষা বলে, কারণ পরীক্ষণ-পাত্রকে তাহার উত্তরসমূহ X বা O দ্বারা চিহ্নিত করিতে বলা হয়। প্রেসি বিষয়গুলি তিনভাগে ভাগ করেন। প্রতি বিভাগে ২৫টি করিয়া লাইন এবং প্রতি লাইনে ৫টি করিয়া বিষয়ের উল্লেখ থাকে (অর্থাৎ সর্বসমেত ৫ × ২৫ × ৩ = ৩৭৫টি বিষয় থাকে)। আমরা এখানে একটি করিয়া সারি বা লাইনের উদাহরণ দিলাম:

"১নং পরীক্ষা (বা Test):

নিম্নলিখিত কাজগুলির মধ্যে যেগুলি আপনি অন্যায় মনে করেন, সেইগুলি 'X'-চিহ্ন দ্বারা কাটিয়া দিন:

১ম সারি: ভিক্ষা করা, ধূমপান করা, ছিনালী করা, থুতু ফেলা, খিল্ খিল্ করিয়া হাসা।

... ...

২নং পরীক্ষা:

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে যাহা লইয়া আপনি অতিরিক্ত চিন্তিত বা ভীত বা উদ্বিগ্ন হইয়াছেন, সেইগুলি 'X'-চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করুন:

১ম সারি: নির্জনতা, কাজ ভুলিয়া যাওয়া, বিদ্যালয়, বিষণ্ণতা।

... ...

৩নং পরীক্ষা: নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে যেগুলি আপনি পছন্দ করেন, সেইগুলি 'X'-চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করুন:

১ম সারি: ভবিষ্যৎ-গণনা, নৌকা বিহার, সমুদ্রের তীর, পর্বত, নৃত্যগীত।

এইবার প্রতি পরীক্ষার প্রতি সারিতে যাহা আপনি সর্বাপেক্ষা অন্যায় মনে করেন, যাহা লইয়া আপনি সর্বাপেক্ষা চিন্তিত বা উদ্বিগ্ন হইয়াছেন এবং যাহা আপনি সর্বাপেক্ষা পছন্দ করেন, সেইগুলি 'O'-এইরূপ চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করুন।"

ব্যক্তি-বিশেষের মূল্যবোধ (sense of value) নির্ধারণের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন **আলপোর্ট ও ভার্ণন।** তাঁহারা বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সৌন্দর্যতত্ত্ব, রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ দিকে অনুরাগ (interest) আছে তাহা নির্ধারণের জন্য প্রশ্নতালিকা রচনা করেন। তাঁহাদের প্রশ্নাবলী দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের প্রশ্নগুলি 'হাঁ' বা 'না' বলিয়া উত্তর দিতে হইবে এবং দ্বিতীয় ভাগের প্রশ্নগুলির চারিটি সম্ভাব্য উত্তরকে অগ্রাধিকার (order of preference) অনুসারে বাছিয়া লইতে হইবে। যথা :

"বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মূল উদ্দেশ্য হইল শুদ্ধ সত্য (pure truth)-এর অনুসন্ধান করা, উহার প্রয়োগ নহে—ইহা কি আপনি স্বীকার করেন?" [ইহার উত্তরে 'হাঁ' বা 'না' বলুন।]

(এক্ষেত্রে যিনি হাঁ বলিবেন তাঁহার তাত্ত্বিক চিন্তার প্রতি অনুরাগ (theoretical interest) বুঝিতে হইবে এবং 'না' বলিলে বুঝিতে হইবে তিনি 'কাজের লোক' এবং তাঁহার অর্থনৈতিক ব্যাপারে বা অনুরূপ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অনুরাগ অধিক।)

আবার দ্বিতীয় প্রকারের প্রশ্ন :

"আপনি কি মনে করেন যে, উত্তম রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় শাসকমণ্ডলীর লক্ষ্য হইল

(ক) দরিদ্র, আর্ত এবং বৃদ্ধের জন্য অধিকতর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা? —

(খ) শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করা? —

(গ) রাষ্ট্রপরিচালনায় ন্যায়-নীতির ব্যবস্থা করা? —

(ঘ) বিভিন্ন জাতির মধ্যে সম্মান ও মর্যাদার আসন গ্রহণ করা? —

[আপনি সম্ভাব্য উত্তরগুলিকে উহাদের 'মান' (order) অনুসারে সাজান]"

আবার বিশেষ বিশেষ প্রলক্ষণ-নির্ণয়ের জন্য বিশেষ বিশেষ প্রশ্নের তালিকা রচনা করা হইয়াছে। যেমন, 'ঔদ্ধত্য—বিনয়' প্রলক্ষণ (Ascendance—Submission Trait) সম্বন্ধে **আল্‌পোর্ট** একটি প্রশ্নতালিকা দিয়াছেন। ইহাদের একটি প্রশ্ন হইল :

"ভিড়ের মধ্যে বা অন্য কোন জায়গায় যদি আপনি এমন একজন ভদ্রলোককে দেখেন যাঁহাকে আপনি বোধহয় পূর্বে দেখিয়াছেন, অথচ এখন চিনিতে পারিতেছেন না, তাঁহাকে কি আপনি পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবেন ?"

উত্তর : মাঝে মাঝে ঐরূপ করিতে পারি—
কদাচিৎ " " "
কখনও " করিব না—

[আপনার মনোমত উত্তরটিতে দাগ দিন।]

(উদ্ধত প্রকৃতির লোক তৃতীয় উত্তরটিতে দাগ দিবেন আশা করা যায়।)

ব্যক্তি-বিশেষের রসিকতা জ্ঞান (sense of humour) নিরূপণের জন্য **ক্যাটেল ও লুবোর্‌স্কি** (Cattell & Luborsky) একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এই পরীক্ষায় কতকগুলি 'হাসির কথা' বা 'মজার কথা' (অর্থাৎ jokes) দুইটি দুইটি একত্র করিয়া সাজান থাকে। পরীক্ষণ-পাত্রকে বলা হয় যে, প্রতিক্ষেত্রে দুইটির মধ্যে যেটিকে তিনি অধিকতর হাস্যোদ্দীপক বা মজার বলিয়া মনে করেন সেটিকে যেন চিহ্নিত করেন।

এই ক্ষেত্রে আশা করা যায় যে, যাঁহার ভিতর আক্রমণাত্মক মনোভাব (spirit of aggression) আছে, তিনি অপরের মন্দ ভাগ্য লইয়া যে তামাসা সেইগুলি উপভোগ করিবেন ; যাঁহার ভিতর কাম অবদমিত আছে, তিনি যৌনমূলক তামাসা উপভোগ করিবেন ; ইত্যাদি।

কাহার কোন্ বৃত্তি (vocation বা profession)-এর প্রতি অনুরাগ আছে তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য **ই. কে. ষ্ট্রং** (E. K. Strong) কতকগুলি প্রশ্ন রচনা করেন। একটি পদ্ধতি হইল, পরীক্ষণ-পাত্রকে কতকগুলি বৃত্তির তালিকা দিয়া তাহাকে বলা যে, সে যেন উহাদের কোন্‌টি পছন্দ বা অপছন্দ করে বা কোন্‌টির প্রতি উদাসীন তাহা যেন চিহ্নিত করে।

প্রশ্নাবলী-পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রধান অভিযোগ হইল যে, ইহা অনেকক্ষেত্রে

কৃত্রিম হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। ইহাতে পরীক্ষক ব্যক্তি বিশেষকে জানিবার পূর্বেই কতকগুলি সাধারণ প্রশ্ন রচনা করেন এবং ফলে ব্যক্তি-বিশেষের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আবিষ্কৃত হয় না। আবার পরীক্ষক পূর্ব হইতে একটি মতবাদ রচনা করিয়া তাহারই আলোকে বিশেষ প্রকারের প্রশ্নাবলী রচনা করেন।

এই সব কারণে অন্যান্য পদ্ধতি প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(গ) **অভিক্ষেপ পদ্ধতি** (Projective Technique):

এই পর্যন্ত আমরা যে সব পদ্ধতি আলোচনা করিলাম, তাহাতে পরীক্ষণ-পাত্র দ্বারা প্রদত্ত উত্তরের কী ব্যাখ্যা হইবে তাহা পরীক্ষক পূর্ব হইতেই স্থির করেন। এই কারণ ইহাতে ব্যক্তিত্বের সুচারু ব্যাখ্যা না হইতেও পারে। সেইজন্য আর এক প্রকারের পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। ইহার নাম **অভিক্ষেপ বা প্রক্ষেপ পদ্ধতি**। ইহাতে পরীক্ষক পরীক্ষণ-পাত্রের সম্মুখে কতকগুলি উদ্দীপক স্থাপিত করেন এবং পরীক্ষণ-পাত্র তাঁহার নিজের ব্যক্তিত্বের গঠন-অনুযায়ী ঐ সব উদ্দীপকের ব্যাখ্যা দান করেন।[২৪]

আমরা বর্তমান ক্ষেত্রে তিন প্রকারের অভিক্ষেপ পরীক্ষার আলোচনা করিব: অবাধ ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতি (Free Association Tests), কালির ছাপের ব্যাখ্যা (Inkblot interpretation) এবং ছবির ব্যাখ্যা।

(১) **অবাধ ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতি**:

এই পদ্ধতি অনুসারে পরীক্ষণ-পাত্রকে কতকগুলি 'শব্দ' (word) উদ্দীপক হিসাবে প্রদান করা হয় এবং তাহাকে বলা হয় যে, প্রতিক্রিয়া (reaction) হিসাবে যে শব্দটি সর্বপ্রথম কোনরূপ চিন্তা ব্যতীত মনে আসিবে তাহাই যেন সে বলে। (ক) কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বিশেষ বিশেষ শব্দের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া-কাল দীর্ঘতর হয়; যেমন, একবার এক

২৪ তুলনীয়: "(A) projection method for (the) study of personality involves the presentation of a stimulus-situation designed or chosen because it will mean to the subject, not what the experimenter has arbitrarily decided it should mean.......but rather whatever it must mean to the personality who gives it, or imposes upon it, his private, idiosyncratic meaning and organization." (L. K. Frank, 'Projective Method for the Study of Personality,' *Journal of Psychology*—1939, Vol. 8).

ব্যক্তি 'জল' এই পদটি শুনিয়া বলিল 'গভীর', জাহাজ শুনিয়া বলিল 'ডুবিয়া যাওয়া', 'হ্রদ' শুনিয়া বলিল 'জল'—এই সকল শব্দের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া-কাল বেশ দীর্ঘ হইল (৪ হইতে ৫ সেকেণ্ড); অথচ অন্যান্য শব্দের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া-কাল খুবই কম (১ হইতে ১'৫ সেকেণ্ড) ছিল। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, ঐ লোকটি মনের খেদে জলে ডুবিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করিতেছিল।[২৫] (খ) যেখানে উদ্দীপক-বাক্যের সহিত কোন বিশেষ আবেগ জড়িত আছে, সেইরূপ ক্ষেত্রে বিশেষ প্রকারের আচরণ প্রকাশ পাইতে পারে, যথা—লজ্জায় মুখমণ্ডল রক্তিম হওয়া, চক্ষু আনত করা, কথা বলিতে 'ঢোঁক্ খাওয়া' ইত্যাদি। (গ) আবার এমন হইতে পারে যে, পরীক্ষণ-পাত্র বিভিন্ন উদ্দীপকের ক্ষেত্রে একই শব্দ বলিতে লাগিল, বা কোন কিছুই বলিতে পারিল না, বা অসতর্ক মুহূর্তে এমন কিছু বলিয়া ফেলিল যাহাতে কোন 'গোপন কথা' প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

(২) কালির ছাপের ব্যাখ্যা:

এই পদ্ধতি হের্‌মান্ রোর্‌শাক্ (Hermann Rorschach) কর্তৃক প্রবর্তিত হয়। তাঁহার পদ্ধতি হইল এইরূপ: পরীক্ষক কর্তৃক পরীক্ষণ-পাত্রকে

১নং চিত্র। কালির ছাপের দুইটি নমুনা।
রোর্‌শাক্ পরীক্ষণ-পদ্ধতিতে ইহাদের অনুরূপ ছাপ ব্যবহৃত হয়।

কতকগুলি কালির ছাপ দেখান হয়। বাস্তবিক পক্ষে, এইগুলি অর্থহীন

২৫ Hart, *Psychology of Insanity*, p. 70.

অথচ "এইগুলি কী?" বা "ইহাদের কী অর্থ হইতে পারে?" এই প্রশ্নের উত্তরে পরীক্ষণ-পাত্র ইহাদের উপর অর্থ 'প্রক্ষেপ' করে; অর্থাৎ ঐগুলি মানুষ বা পশুর বা অন্য কোন কিছুর আকৃতি বলিয়া পরীক্ষণ-পাত্র বর্ণনা করে। উত্তরের বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্য অনুসারে পরীক্ষক তাহার ব্যক্তিত্ব নিরূপণের চেষ্টা করেন। (১ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

রোর্‌শাক্‌ তাঁহার পদ্ধতিতে দশটি বিভিন্ন কালির ছাপবিশিষ্ট কার্ড দেখান[২৬], ইহাদের পাঁচটি কালো এবং ধূসর, দুইটি কালো এবং লাল এবং বাকী তিনটি বিভিন্ন রঙের। পরীক্ষণ-পাত্র যে সমস্ত উত্তর প্রদান করে সেইগুলিকে তিনটি দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করা হয়ঃ (১) পরীক্ষণ-পাত্র সমগ্র ছাপটিকে বা উহার কোন অংশকে বর্ণনা করিতেছে কি না, (২) তাহার 'প্রতিক্রিয়া' বা বর্ণনা ছাপের রঙ্‌ বা আকৃতি বা অন্য কিছু দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে কি না; (৩) পরীক্ষণ-পাত্র ছাপকে কি ভাবে দেখিতেছে—মানুষ না জন্তু না অন্য কোন কিছু হিসাবে।

পরীক্ষণ পাত্রের 'প্রতিক্রিয়া' হইতে তাহার প্রলক্ষণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অনুমান করা হয়ঃ

(১) যে ব্যক্তি সমগ্রত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করে, সে বিমূর্তচিন্তা (abstract thought) এবং শুদ্ধজ্ঞান (theoretical knowledge) পছন্দ করে, এবং যে অংশগুলিকে প্রাধান্য দেয়, সে খুঁটিনাটি বা সামান্য বিষয় লইয়া ব্যস্ত থাকিতে ভালবাসে ও তাহার অনুকর্ষী বায়ু (compulsion neurosis)-এর প্রতি প্রবণতা থাকে।

(২) ছাপের ভিতর যদি সে 'গতি' (বিশেষতঃ গতিশীল মানুষের আকৃতি) 'প্রত্যক্ষ' করে, তাহা হইলে সে অন্তর্বৃত, এবং যদি পশুর আকৃতি দেখে, তাহা হইলে তাহার চিন্তার পরিসর নিতান্ত ক্ষুদ্র।

(৩) যদি পরীক্ষণ-পাত্র রঙের উপর প্রতিক্রিয়া করে, তাহা হইলে তাহার অসংযত আবেগ ও প্রেরণা (impulsiveness)-এর আধিক্য আছে বুঝিতে হইবে, কিন্তু যদি রঙ্‌ ও আকৃতি উভয়েরই (both colour and

২৬ ব্লটিং পেপারে কালি ঢালিয়া উহাকে মুড়িয়া নানা প্রকারের অদ্ভুত ছাপ 'তৈয়ারী' করা যায়।

form) উপর গুরুত্ব আরোপ করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাহার আবেগের প্রকাশ অব্যাহত ও সাবলীল (free and easy)।

এই সকল অনুমানের সত্যতা কতদূর তাহা লইয়া মতভেদ আছে; তবে কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে কিছু সিদ্ধান্ত করিতে হইলে রোর্‌শাক্ পদ্ধতি দ্বারা প্রাপ্ত সাফল্যাঙ্কের সহিত অন্য পদ্ধতি দ্বারা প্রাপ্ত সাফল্যাঙ্কের তুলনা করিয়া দেখা বাঞ্ছনীয়।

(৩) ছবির ব্যাখ্যা :

এই পদ্ধতিতে পরীক্ষণ-পাত্রকে কতকগুলি ছবি দেখান হয় এবং তাহার মতে ঐ ছবির কী ব্যাখ্যা হইতে পারে তাহা জিজ্ঞাসা করা হয়। ইহাকে 'কাহিনী-সংপ্রত্যক্ষ পরীক্ষণ-পদ্ধতি' (Thematic-Apperception Test বা সংক্ষেপে, *TAT*) বলা হয়। মর্গান ও মারে (C. D. Morgan & H. A. Murray) এই পদ্ধতির সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট।[২৭] এই পদ্ধতি-প্রয়োগের সপক্ষে যুক্তি এই যে, এই পদ্ধতিতে প্রদর্শিত ছবিগুলি এমনভাবে নির্বাচিত হয় যে, উহাদের নানাবিধ ব্যাখ্যা হইতে পারে এবং প্রতি ব্যক্তিই তাহার অতীত আচরণ এবং বর্তমান অভাব (past behaviour and present wants) অনুসারে ঐগুলি ব্যাখ্যা করিবে আশা করা যায়।

পরীক্ষণ-পাত্রকে দুইটি ভাগে ছবি দেখান হয় এবং প্রতি বিভাগে (series) ১০টি করিয়া ছবি দেখান হয়। প্রথম বিভাগের ছবিগুলি দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া; কিন্তু দ্বিতীয় দলের ছবিগুলি এইরূপ নহে—সেইজন্য পরীক্ষণ-পাত্রকে কল্পনার সর্বাধিক আশ্রয় লইতে বলা হয়। ইহাদের ভিতর একটি কার্ড থাকে একেবারে সাদা; পরীক্ষক সেটি পরীক্ষণ-পাত্রকে দেখাইয়া বলেন, "উহার ভিতর যে কোন ছবি কল্পনা করুন এবং সবিস্তারে উহা বর্ণনা করুন। ঐ সম্বন্ধে একটি গল্পও বলুন।"

২৭ Morgan & Murray, "A method of Investigating Fantasies : the Thematic Apperception Test"—*Archives of Neurology & Psychiatry* (1935) দ্রষ্টব্য।

একই ছবির কত বিভিন্ন ব্যাখ্যা হইতে পারে দেখা যাউক্। মারে-প্রদর্শিত একটি ছবিতে আছে যে, একটি বালকের সম্মুখে টেবিলের উপর একটি বেহালা (ভাওলিন) শায়িত আছে এবং বালকটি কি যেন ভাবিতেছে। ইহা দেখিয়া কেহ বলিবে যে, বালকটি কি সুর বাজাইবে তাহা চিন্তা করিতেছে; কেহ কেহ বলিবে বালকটি এইমাত্র যাহা বাজাইয়াছে তাহারই রেশ যেন তাহার মনে জাগিতেছে; কেহ বলিবে যে, বালকটি হয়ত' কোন কারণে উহা বাজাইতে না পারিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে; কেহ বলিবে যে, বালকটি বাজনা সম্বন্ধে কিছুই ভাবিতেছে না, বরং কখন খেলিতে যাইবে তাহাই ভাবিতেছে; ইত্যাদি।

সেইরূপ আর একটি ছবিতে দেখান হয় একটি বৃদ্ধা ও একটি তরুণী। বৃদ্ধার মাথা শালে ঢাকা এবং চিবুকে হাত রাখিয়া সে কি যেন ভাবিতেছে এবং তরুণীটি সামনের দিকে চাহিয়া আছে। এই ছবিটি দেখিয়া কেহ কেহ বলিবে যে, তরুণীটি বৃদ্ধার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া অভিমানভরে অন্যদিকে চাহিয়া আছে এবং বৃদ্ধা চিন্তা করিতেছে কিভাবে উহাকে 'ঠাণ্ডা' করিবে; কেহ কেহ বলিবে যে, বৃদ্ধাটি একটি 'ডাইনি বুড়ী', সে তরুণীটিকে বশ করিয়া ফেলিয়াছে; ইত্যাদি।

এই প্রকার পদ্ধতিতে কোন সাফল্যাঙ্ক (scoring) দ্বারা ব্যক্তিত্বের মান নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয় না। পরীক্ষণ-পাত্র ছবি দেখিয়া যে 'কাহিনী' (theme) বর্ণনা করে সেটিকে বিশ্লেষণ করিয়া পরীক্ষণ-পাত্রের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আবেগ, প্রেরণা, অভাব, ব্যর্থতা ইত্যাদি জানিবার চেষ্টা করা হয়। এই পদ্ধতির প্রবর্তকেরা বিশ্বাস করেন যে, পরীক্ষণ-পাত্র তাঁহার বর্ণিত কাহিনীর একটি চরিত্রের সহিত নিজেকে 'একাত্মীকরণ' (identify) করে এবং এই কারণ ঐ কাহিনীর মধ্যেই তাহার জীবনীর তথা ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

(ঘ) কৃতি-পরীক্ষা (Performance Tests):

মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ কার্যের মধ্যে। কেবলমাত্র প্রশ্নোত্তর-পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যক্তিত্বকে সুষ্ঠুভাবে জানা যায় না; কারণ "মানুষ কী?"

এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইবে "মানুষ যাহা করে।" এইজন্য একদল মনোবিৎ বিভিন্ন প্রকারের কৃত্যভীক্ষা বা কৃতি-পরীক্ষা[২৮] উদ্ভাবন করিয়াছেন।

কোন বিশেষ কাজের জন্য ব্যক্তি-বিশেষের যোগ্যতা আছে কি না তাহা জানিবার জন্য তাহাকে ঐ কাজের নমুনা (work-sample) দেখাইতে হয়। যেমন, মোটর-চালকের কার্যের জন্য ব্যক্তি-বিশেষ উপযুক্ত কি না, তাহা জানিবার জন্য তাহাকে কিছুদূর গাড়ী চালাইয়া দেখাইতে বলা হয়। আবার কোন জটিল কার্যের যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য ঐ কার্যের জন্য যে সব সামর্থ্যের (abilities) প্রয়োজন হয়, সেগুলি সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ পরীক্ষা করা হয়। যেমন, মোটর গাড়ী-চালনা, রেলগাড়ী-চালনা ইত্যাদি কাজের জন্য প্রতিক্রিয়া-কাল, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণ-শক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে পৃথক্‌ভাবে পরীক্ষা করা যায়। আবার ভবিষ্যতে বাস্তবক্ষেত্রে ব্যক্তি-বিশেষকে যে সব কার্যের সম্মুখীন হইতে হইবে তাহারই একটি "কৃত্রিম ক্ষুদ্র সংস্করণ" রচনা করিয়া তাহার মধ্যে তাহাকে কাজ করিতে বলা হয় এবং তাহার গোচরে তাহার কার্যের নিপুণতা ইত্যাদি লক্ষ্য করা হয়।

মে (May) এবং হার্টশোর্ণ (Hartshorne) বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের **চরিত্রের বিবিধ প্রলক্ষণ** সম্বন্ধে পরীক্ষণ-পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন (যেমন, বঞ্চনা করা, মিথ্যা কথা বলা, চুরি করা, অপরের সহিত সহযোগিতা করা, নির্বন্ধতা [persistence] দেখান ইত্যাদি প্রলক্ষণ)। একটি বালককে কতকগুলি বিবিধ ওজনের ছোট ছোট বাক্স দিয়া ওজনের তারতম্য অনুসারে তাহাকে সাজাইতে বলা হয়। উহাদের ওজনের পার্থক্য এত অল্প যে, হাতে ধরিয়া সহজে ঐ পার্থক্য বুঝা যায় না। বাক্সের তলায় উহাদের প্রকৃত ওজন লেখা আছে এবং উহা না দেখিবার জন্য তাহাকে বলিয়া দেওয়া হয়। পরীক্ষক ঐগুলি দিয়া সরিয়া যাইবেন। যদি দেখা যায়, বালকটি একেবারে নির্ভুলভাবে বাক্সগুলি সাজাইয়া ফেলিয়াছে, তাহা হইলে অনুমান করা যায় যে, সে গোপনে প্রকৃত ওজন দেখিয়া লইয়াছে।

২৮ বুদ্ধি-পরীক্ষা-পদ্ধতির আলোচনা-কালে আমরা কয়েক প্রকার কৃতি-পরীক্ষার উল্লেখ করিয়াছি (পৃঃ ২০৭)।

সেইরূপ ধৈর্য (patience) **পরীক্ষা** করিবার জন্য পরীক্ষণ-পাত্রকে ছুঁচে সুতা পরাইতে দেওয়া যাইতে পারে; যতবার সে সুতা পরাইতে যাইবে, ততবার কোন বাধা দিয়া বা অন্য কোন ভাবে তাহাকে অন্যমনস্ক করিয়া দেখা যাইতে পারে যে, সে ঐ কাজ ধীরভাবে করিবার চেষ্টা করিতেছে অথবা বিরক্ত হইয়া উহা ছাড়িয়া দিয়াছে।

৪। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পদ্ধতি :

আমরা যখন বলি যে, কোন জিনিষ উত্তপ্ত, তখন উহার একটা গুণ, ধর্ম বা বিশেষ অবস্থা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করি; কিন্তু তখন প্রশ্ন উঠে: উহার উত্তাপের পরিমাণ কত? এই পরিমাণকে প্রকাশ করিবার জন্য আমরা সাধারণতঃ গাণিতিক সংখ্যা ব্যবহার করি। মনোবিদ্যার ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে না; ইহা আমরা সপ্তম অধ্যায়ে বুদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনাকালে লক্ষ্য করিয়াছি। ব্যক্তিত্বকে পরীক্ষা করিয়া পরীক্ষার ফল আমরা গাণিতিক সংখ্যায় ও চিত্রলেখ বা গ্রাফে প্রকাশ করি। আমরা এখানে ব্যক্তিত্ব পরীক্ষার ফল প্রকাশ করিবার কয়েকটি পদ্ধতির উল্লেখ করিব।

(ক) গুণাণুক্রমে সাজান (Order-of-merit Method) :

ইহা হইল সনাতন প্রথা। যেমন, বিদ্যালয়ে পরীক্ষায় যে যত সংখ্যা বা মার্ক্‌স্ পাইয়াছে তাহার ভিত্তিতে তাহাদের ১ম, ২য়, ৩য় এইভাবে সাজান যায়।

এই পদ্ধতিতে ব্যক্তি-বিশেষের নিজস্ব মান অপেক্ষা অন্যের তুলনায় তাহার আপেক্ষিক মান নির্ধারণ করা হয়।

(খ) তুলনামূলক পদ্ধতি (The Method of Paired Comparisons) :

এই পদ্ধতিতে পরীক্ষণ-পাত্রদের একজনকে অপরজনের সহিত তুলনা করিয়া কে শ্রেয়ঃ তাহা ইঙ্গিত করা হয় এবং কে সর্বাপেক্ষা অধিক ভাল তাহা গণনা করিয়া তাহার তুলনামূলক মান নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়।

মনে করা যাউক, ক, খ, গ, ঘ, ঙ এই পাঁচ ব্যক্তিকে তুলনা করিয়া একটি ছকে তাহা প্রকাশ করিতে হইবে। একটি 'ছক' কাটিয়া বাম দিকের স্তম্ভে

ক, খ, গ ইত্যাদির নাম লিখিতে হইবে এবং আবার উহাদের নাম একটি সমান্তরাল রেখার উপরেও লিখিতে হইবে। বাম দিকে স্তম্ভভাবে বা লম্ব-ভাবে যাহাদের নাম লেখা আছে তাহার প্রত্যেকে হইল যে যে তুলিত (compared) হইতেছে এবং সমান্তরাল রেখার উপরে যাহাদের নাম আছে তাহারা প্রত্যেকে হইল যাহার সহিত তুলিত হইতেছে। ধরা যাউক্ 'উদারতা' এই প্রলক্ষণ লইয়া অনুসন্ধান করা হইতেছে। যদি পরীক্ষক মনে করেন যে, 'ক' 'খ' অপেক্ষা অধিকতর উদার, তাহা হইলে 'ক'-এর সারিতে এবং সমান্তরাল রেখায় 'খ'-এর যে স্থান তাহার নিম্নে যোগচিহ্ন (+) দিতে হইবে এবং 'খ'-এর সারিতে 'ক'-এর নিম্নে বিয়োগচিহ্ন (–) দিতে হইবে। সেইরূপ 'ক'-এর সহিত আবার যথাক্রমে গ, ঘ, ঙ-এর তুলনা করিতে হইবে। শেষ পর্যন্ত যোগচিহ্নগুলি যোগ দিলে প্রতি ক্ষেত্রে যে 'অঙ্ক' হইবে, তাহা বিভিন্ন ব্যক্তির সাফল্যাঙ্ক (score) নির্দেশ করিবে। (নিম্নলিখিত রেখাঙ্কনটি দ্রষ্টব্য)।

	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	মোট
ক		+	+	+	+	=৪
খ	–		+	+	–	=২
গ	–	–		+	–	=১
ঘ	–	–	–		–	=০
ঙ	–	+	+	+		=৩

∴ 'ক'-এর সাফল্যাঙ্ক সর্বাপেক্ষা অধিক।

এই পদ্ধতির অসুবিধা হইল যে, পরীক্ষণ-পাত্রের সংখ্যা অনেক বেশী হইলে পারস্পরিক তুলনা করায় প্রচুর অসুবিধা হয়। এই পদ্ধতিতেও পূর্বের পদ্ধতির ন্যায় নিরপেক্ষভাবে ব্যক্তি-বিশেষের নিজস্ব মান নির্ধারণ করা যায় না।

(গ) **নিরপেক্ষ মান নির্ধারণ (Absolute rating scales) :**

আমাদের ব্যক্তিত্বের এমন অনেক প্রলক্ষণ আছে (যেমন, উদারতা, সামাজিকতা, বন্ধুভাবাপন্নতা ইত্যাদি) যে সম্বন্ধে আমাদের পরিচিত ব্যক্তিরাই সুষ্ঠুবিচার করিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের পরিচিতদের নিকট ঐ সব প্রলক্ষণ সম্বন্ধে মতামত চাওয়া হয়। মত-প্রকাশকারীকে বলা হয় যে, তিনি যেন তাঁহার অভিমতকে একটি মানক (scale)-এর উপর চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করেন। যেমন, কোন শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে তাহার অমুক ছাত্র পড়াশুনায় কিরূপ আগ্রহ প্রকাশ করে। এখানে উত্তরটি দুইটি সম্ভাব্য বৈপরীত্যের যে-কোন এক স্থান অধিকার করিতে পারে, অর্থাৎ 'একেবারেই পড়াশুনা করে না' এবং 'পড়াশুনায় অত্যন্ত আগ্রহী' এই দুইটি বৈপরীত্যের যে কোন স্থানে থাকিতে পারে। নিম্নে সম্ভাব্য মানকটি প্রদর্শন করা হইল :

(একজন শিক্ষককে বলা যাইতে পারে) আপনার ছাত্র শ্রীমান্——এর পড়াশুনার প্রতি যেরূপ মনোভাব লক্ষ্য করেন, তাহা নিম্নলিখিত মানক-এ √-চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করুন :

আবার মানক (scale)-টিকে অন্যভাবে আঁকা যায়। গড়পড়তা পরিমাণকে মধ্যবিন্দুকে রাখিয়া উহার দুই পার্শ্বে একটি প্রলক্ষণের দুইটি বিপরীত মুখকে রাখা যায়। উপরের উদাহরণের মানকটিকে এইভাবে প্রস্তুত করা যাইতে পারে :

অবশ্য পরীক্ষণ-পাত্রকেও তাহার নিজের কোন গুণ সম্বন্ধে তাহারই ধারণা মানক-এ স্থান চিহ্নিত করিয়া প্রকাশ করিতে বলিতে পারা যায়। যেমন, তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, সে ঝোঁকের মাথায় কাজ করে, না সে বেশ সাবধানী। এরূপ ক্ষেত্রে "আমি সর্বদাই ঝোঁকের মাথায় কাজ করি" এবং "আমি অত্যন্ত

ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করি" এই দুই বৈপরীত্যের মধ্যে সে স্বীয় প্রলক্ষণের স্থান নির্দেশ করিতে পারে।

নির্ধারক মানকে (Rating scale) ব্যবহারের বিরুদ্ধে যুক্তি হইল এই যে, পরীক্ষকের নিজের কাহারও সপক্ষে বা বিপক্ষে ভুল ধারণা (bias) থাকিতে পারে এবং তাঁহার প্রদর্শিত স্থান সেই কারণে নির্ভরযোগ্য না হইতে পারে।[২৯] এইজন্য একই ব্যক্তির একই প্রলক্ষণ সম্বন্ধে বিভিন্ন পরীক্ষকের অভিমত গ্রহণ করা উচিত। তাঁহারা পরস্পরের সহিত আলোচনা করিয়া মান নির্ধারণ করিতে পারেন, অথবা তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে যে মান দান করিলেন, অপর একজন ব্যক্তি তাহার গড়পড়তা মান (average rating) বাহির করিতে পারেন। তবে দেখা গিয়াছে যে, পরীক্ষকরা যদি তাঁহাদের কার্যে বিশেষ শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন, যদি মানকটি সুচিন্তিতভাবে প্রস্তুত করা হইয়া থাকে এবং পরীক্ষকদের সহিত আলোচ্য ব্যক্তির বিশেষ পরিচয় থাকে, তাহা হইলে ভুলের সম্ভাবনা কমিয়া যায়।

যেখানে কোন ব্যক্তি নিজেই নিজের প্রলক্ষণের স্থান মানক-এ নির্দেশ করে, তখন বাঞ্ছনীয় প্রলক্ষণ বা সৎ প্রলক্ষণের দিক্ চিহ্নিত করিবার সম্ভাবনা অধিক থাকে। তবে অনেকে আবার স্বীয় বৈশিষ্ট্যকে মধ্যবিন্দুতে (যাহা গড়পড়তা নির্দেশ করে) চিহ্নিত করে।

(ঘ) ব্যক্তিত্বের রূপ-রেখা-অঙ্কন (Personality Profile):

ব্যক্তি-বিশেষের বিবিধ প্রলক্ষণ লক্ষ্য করিয়া যে সব বিবিধ সাফল্যাঙ্ক দেওয়া হয়, সেগুলিকে একটি রেখাঙ্কনে প্রকাশ করা যাইতে পারে। ইহাকে বলা হয় **ব্যক্তিত্বের রূপ-রেখা** (Personality Profile বা Psychograph)। ইহাতে একটি মধ্যবর্তী সমান্তরাল রেখা দ্বারা 'গড়পড়তা সাফল্যাঙ্ক' (average score) নির্দেশ করা হয়।[৩০] রেখাঙ্কন দ্বারা দেখান হয় কোন্ কোন্ প্রলক্ষণের ব্যাপারে ব্যক্তি-বিশেষ

২৯ তুলনীয় 'The observer's own personality is a factor in his impressions of another person." (Woodworth. *op. cit.*, p. 145).

৩০ ইহার অর্থ এই নহে যে, সাধারণ লোক (average man)-এর সকল প্রলক্ষণের মান একই প্রকারের। পরপৃষ্ঠার চিত্রে মধ্যম রেখাটি যে গড়পড়তা নির্দেশ করিতেছে তাহা প্রতি প্রলক্ষণের গড়পড়তা-হার।

গড়পড়তার ঊর্ধ্বে আর কোন্ কোন্ প্রলক্ষণের ব্যাপারে ঐ ব্যক্তি গড়পড়তার নিম্নে।

নিম্নে একটি কাল্পনিক রূপ-রেখা প্রদত্ত হইল (২নং চিত্র দ্রষ্টব্য) :
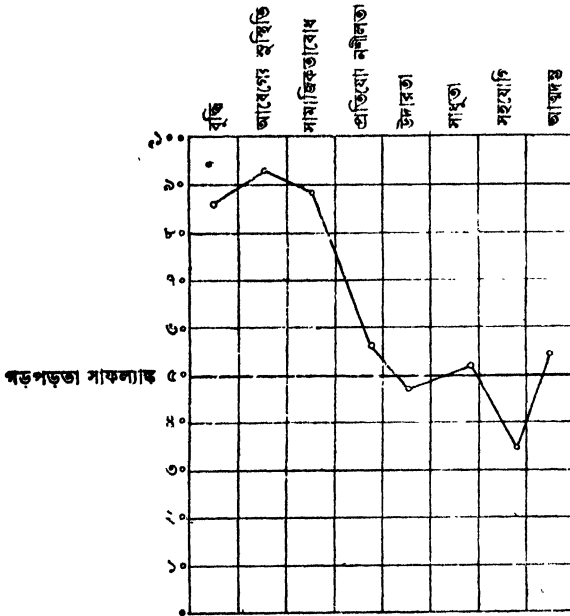
২নং চিত্র। কাল্পনিক রূপ-রেখা।

উপরের রেখাঙ্কনটি অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, আটটি প্রলক্ষণের মধ্যে অধিকাংশগুলিতেই ব্যক্তি-বিশেষ গড়পড়তার ঊর্ধ্বে এবং কয়েক ক্ষেত্রে নিম্নে। (যদি প্রত্যেকটি প্রলক্ষণ সমান পরিমাণে গড়পড়তার ঊর্ধ্বে বা নিম্নে হইত, তাহা হইলে ব্যক্তিত্ব-নির্দেশক রেখাঙ্কনটি মধ্যরেখার সহিত ঊর্ধ্বে বা নিম্নে সমান্তরাল হইত)।

সমালোচনা :

আমরা পূর্বে (পৃঃ ২৩০-৩১) বুদ্ধি-পরীক্ষা পদ্ধতি সমালোচনাকালে লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, যে অর্থে জড়পদার্থের পরিমাপ করা যায়, ঠিক সেই অর্থে মানসিক কোন ক্রিয়া বা অবস্থার পরিমাপ সম্ভব নহে। সাধারণভাবে ব্যক্তিত্ব-পরীক্ষাক্ষেত্রে সেই একই কথা প্রযোজ্য। আমরা

বর্তমান অনুচ্ছেদে ব্যক্তিত্ব পরীক্ষাপদ্ধতির বিশেষ কয়েকটি অসুবিধা এবং তৎসংক্রান্ত ভ্রান্ত ধারণার উল্লেখ করিব।

(১) প্রথমতঃ, মান-নির্ধারণ সম্বন্ধে বিবিধ অসুবিধা দেখা দেয়। (ক) সাফল্যাঙ্ক নির্ণয় করিবার জন্য একটি **সুনির্দিষ্ট** এবং **সার্বিক মানক ব্যবহার করা হয় না।** কোন মানকের বিস্তার হইল ০ হইতে ৫০, আবার কোনটির বা বিস্তার হইল ০ হইতে ২০০ পর্যন্ত। সুতরাং যদি বলা যায় যে, একজন ভাষা-সম্বন্ধীয় পরীক্ষায় (language test-এ) সাফল্যাঙ্ক পাইয়াছে ১৩ এবং বুদ্ধি-পরীক্ষায় সাফল্যাঙ্ক পাইয়াছে ১৩০, তখন ইহার অর্থ নহে যে, তাহার বুদ্ধি তাহার ভাষাশিক্ষার ক্ষমতার দশগুণ; কারণ এখানে কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ মানক ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা না জানিলে কোন তুলনা করা সম্ভব নহে। (খ) তাহা ছাড়া, মানক (scale) তৈয়ারী করিবার সময় কিসের ভিত্তিতে উহাকে বিভিন্নভাগে ভাগ করা হইয়াছে এবং উহার উৎপত্তিবিন্দু বা উৎপত্তি-স্থল (point of origin or zero point)-এর কী অর্থ তাহা না জানিলে উহার সাহায্যে ব্যক্তি-বিশেষের ব্যক্তিত্ব বুঝা যায় না। কোন একটি পরীক্ষায় যদি দেখা গেল যে, এক ব্যক্তির উদারতা '০' (শূন্য), তাহার অর্থ কি যে, সে কোন দিন কোন অবস্থাতে বিন্দুমাত্রও উদারতা দেখাইতে পারে নাই বা পারিবে না? (গ) আবার, যদি বলা যায় যে, একজন সামাজিকতা-প্রলক্ষণের ক্ষেত্রে সাফল্যাঙ্ক লাভ করিয়াছে ৮০ এবং আর একজন ৪০, তাহা হইলে কি বলিতে হইবে যে, প্রথম ব্যক্তির ঐ প্রলক্ষণ দ্বিতীয় ব্যক্তির ঐ প্রলক্ষণের ঠিক দ্বিগুণ (যেমন, ১০ কিলোগ্রাম ওজন ৫ কিলোগ্রামের ঠিক দ্বিগুণ)? আবার, কোন ব্যক্তির কোন সাফল্যাঙ্ক অধিক হইয়াছে, কি কম হইয়াছে তাহা বুঝা যায় না যতক্ষণ না একটি সাধারণ কেন্দ্রবিন্দু নির্দেশ করিয়া বলা যায় যে, ইহা অপেক্ষা ঐ অঙ্ক বেশী না কম। এইজন্য একটি গড়পড়তা অঙ্ক স্থির করিতে হয়; কিন্তু এই গড়পড়তার কী অর্থ? ইহা মধ্যক সাফল্যাঙ্ক (medium score) অথবা অঙ্কশাস্ত্রের গড়পড়তা (arithmetic mean) তাহা জানা প্রয়োজন।

(২) দ্বিতীয়তঃ, **পরীক্ষার জন্য যে সমস্ত প্রশ্ন রচিত হয় বা অন্য কোন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়, সেগুলি যথোপযোগী হওয়া প্রয়োজন।**

যেমন, পরিণতবয়স্কদের কোন বিষয় সামর্থ্য পরীক্ষার জন্য যে পদ্ধতি রচিত হইয়াছে শিশুদের ক্ষেত্রে তাহা প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত নহে। সেইজন্য যাহাদের জন্য পরীক্ষা পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছে উহা তাহাদের উপযুক্ত কি না তাহা দেখিতে হইবে। মোট কথা, পরীক্ষাপদ্ধতিগুলির যাথার্থ্য (validity), নির্ভরযোগ্যতা (reliability) এবং উপযুক্ততা (suitability) সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হইতে হইবে। (পৃঃ ২১২-২১৪ দ্রষ্টব্য)।

(৩) তৃতীয়তঃ, **পরীক্ষকের বিচারের যাথার্থ্য লইয়াও সন্দেহের অবকাশ থাকে।** পরীক্ষকের বিচার পক্ষপাতদোষে দুষ্ট হইতে পারে—পরীক্ষক যদি পরীক্ষণ-পাত্রের উপর সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট থাকেন, তাহা হইলে ঐ মনোভাব তাঁহার বিচারকে প্রভাবিত করিতে পারে। অর্থাৎ পরীক্ষকের বিচার কোন ব্যাপারে পূর্বধারণা (preconceived notion বা stereotype) দ্বারা দুষ্ট হইতে পারে; যেমন, পরীক্ষক পূর্ব হইতেই ধারণা করিয়া লইতে পারেন যে, অমুক জাতের (racial group) লোক বা অমুক আকৃতিবিশিষ্ট লোকের বিশেষ বুদ্ধি থাকিতে পারে না। আবার, যদি এক ব্যক্তির এক বা একাধিক প্রলক্ষণ সম্বন্ধে পরীক্ষকের খুব উচ্চ ধারণা অথবা খুব মন্দ ধারণা থাকে, তাহা হইলে তাহার অন্যান্য প্রলক্ষণসম্বন্ধে পরীক্ষকের অনুরূপ ধারণা হইয়া যায়। (ইহাকে 'halo effect' বা 'আবেষ্টনীর ফল' বলা হয়)। যেমন, যদি পরীক্ষক দেখেন যে, বুদ্ধি পরীক্ষায় এক ব্যক্তির সাফল্যাঙ্ক অত্যধিক, তাহা হইলে পরীক্ষক হঠাৎ ধারণা করিয়া ফেলিতে পারেন যে, ঐ ব্যক্তির অন্যান্য প্রলক্ষণও (যথা, উদারতা, সাধুতা ইত্যাদি) উচ্চ পর্যায়ের হইবে।[৩১]

অবশ্য যথাবিধি শিক্ষিত পরীক্ষক বিভিন্ন পদ্ধতি দ্বারা পরীক্ষা করিলে এই সব ভুলের সম্ভাবনা কমিয়া যায়। (পৃঃ ৩১৬ দ্রষ্টব্য)।

---

৩১ রাগ্ (H. O. Rugg) এ বিষয়ে নিম্নলিখিত উদাহরণ দিয়াছেন: প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এক ক্যাপ্টেনের সহকর্মীরা (fellow officers) তাঁহার বুদ্ধি-পরীক্ষা করিয়া তাঁহার সাফল্যাঙ্ক অত্যন্ত কম বলেন। কিন্তু ভদ্রলোক অক্সফোর্ডের কৃতী ছাত্র এবং তাঁহার নিয়োগের সময় তিন প্রকার বুদ্ধি-পরীক্ষায় তিনি প্রথম হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ব্যবহারের জন্য তাঁহাকে তাঁহার সহকর্মীরা পছন্দ করিতেন না; এই মন্দ ধারণা দ্বারা তাঁহার সহকর্মীদের বিচার ভ্রান্ত হইয়াছিল বলা যায়। (*Journal of Educational Psychology*, Vols. 12 & 13 দ্রষ্টব্য)।

(৪) চতুর্থতঃ, এমন হইতে পারে যে, **পরীক্ষণ-পাত্র ইচ্ছা করিয়া তাহার ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ সম্বন্ধে প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেয় না।** যেমন, বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে, চাকুরির ক্ষেত্রে ইত্যাদিতে নিজেকে বাঞ্ছনীয় প্রলক্ষণ-বিশিষ্ট বলিয়া প্রকাশ করিবার লোভে ব্যক্তি-বিশেষ কোন কোন প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে না পারে।

এই অসুবিধার প্রতিকার-কল্পে ব্যক্তি-বিশেষকে বিবিধ পদ্ধতিতে পরীক্ষা করা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া, পরীক্ষণ-পদ্ধতিরও এমন ভাবে সংস্কার সাধন করা যাইতে পারে যে, পরীক্ষণ-পাত্র মিথ্যা উত্তরদান করিতে পারে না বা মিথ্যা উত্তর দিলেও মিথ্যাত্ব প্রকাশ হইয়া যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা মিনেসোটায় প্রবর্তিত 'ব্যক্তিত্বের বহুমুখিতা' পরীক্ষার পদ্ধতির কথা বলিতে পারি। ইহা Minnesota Multiphasic Persorality Inventory (M M P I) নামে পরিচিত। ইহাতে বহু প্রশ্ন দেওয়া হয় এবং সেইগুলি স্বভাবী (normal) এবং অস্বভাবী (abnormal) উভয়বিধ ব্যক্তিগোষ্ঠীকে দেওয়া হয়। যেমন, "আমি সহজেই ক্লান্তি বোধ করি" এবং "কাহারও কোন বন্ধুকে অতিরিক্ত বিশ্বাস করা উচিত নহে" ইত্যাদি বিষয় (items) স্বভাবী (normal) ব্যক্তি এবং বিষণ্ণতা-রোগগ্রস্ত রোগী (depressive patient) উভয়কেই দেখাইয়া ঐ বিষয়ে কিরূপ বিভিন্ন মনোভাব হইতে পারে তাহার একটা দ্বিমুখী মান নির্ণয়ের চেষ্টা করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে বিষণ্ণতা সম্বন্ধে মানক (scale) নির্মাণের জন্য বিষাদগ্রস্ত রোগীদের উত্তরকে আদর্শ (criterion) হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে।[৩২]

(৫) পঞ্চমতঃ, ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা পদ্ধতির মধ্যে একটা **কৃত্রিম ভাব** (artificiality) থাকিয়া যায়। **এক একটি প্রলক্ষণকে অন্যান্য প্রলক্ষণ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা হয়,** কিন্তু কার্যক্ষেত্রে উহারা ঐরূপ পৃথকৃভাবে অবস্থান করে না। যেমন, ব্যক্তিত্বের রূপ-রেখা (Personality Profile)-তে যদিও ব্যক্তি-বিশেষের মধ্যে কোন্ প্রলক্ষণ কি ভাবে আছে তাহা নির্দেশ

৩২ পৃঃ ৩০৪-তে বর্ণিত উডওয়ার্থ-রচিত প্রশ্নমালার মিথ্যা উত্তরদানের যে সম্ভাবনা আছে মিনেসোটা পদ্ধতিতে তাহা কমিয়া যায়। মিনেসোটা পদ্ধতিতে depression ব্যতীত Hypochondria, Hysteria, Psychopathic deviation, Paranoia, Paychaesthenia, Schizophrenia, Hypomania এবং Masculinity-femininity সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হয়।

করা হয়, তাহা হইলেও ঐ সব বিবিধ প্রলক্ষণ কি ভাবে একত্রে কার্য করিয়া ব্যক্তি-বিশেষের ব্যক্তিত্বকে একটি সামগ্রিক আকার দেয় তাহা কেবল রূপ-রেখা অনুধাবন করিয়া বুঝা কঠিন। যেমন, একটি সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণে বিভিন্ন উপাদান (ইট, চূণ, সুরকি ইত্যাদি) কী কী পরিমাণে প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা জানিয়া সমগ্র প্রাসাদের স্থাপত্যকলার সৌন্দর্য বুঝা যায় না, অথবা একটি যন্ত্রের মধ্যে কি কি কলকব্জা আছে তাহা জানিয়া সমগ্র যন্ত্রটি কি ভাবে কার্য করে বুঝা যায় না, সেইরূপ ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণের 'পরিমাণ'-এর তালিকা হইতে সমগ্র ব্যক্তিত্বকে বুঝা যায় না। (পৃঃ ২৪৫ দ্রষ্টব্য)।

অবশ্য ইহার অর্থ এই নহে যে, ব্যক্তিত্ব পরিমাপের প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করিতে হইবে। পরিমাপেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। পরস্পরের তুলনা করা, বিশেষ বিশেষ কার্যের জন্য ব্যক্তি-বিশেষের যোগ্যতা নির্ধারণ এবং তাহার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার গতি নিরূপণ ইত্যাদি ব্যাপারে পরিমাণ-পদ্ধতি যথেষ্ট আলোকপাত করে। তবে মনের সুষ্ঠু ব্যাখ্যার জন্য কেবলমাত্র পরিমাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর গুরুত্ব আরোপ করা সমীচীন হইবে না— পরিমাণমূলক এবং গুণমূলক (quantitative and qualitative) দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয় সাধন করাই বাঞ্ছনীয়।

দশম অধ্যায়

চেতন ও অবচেতন স্তর

আমাদের মনের সকল অবস্থা বা ক্রিয়া সম্বন্ধে আমরা জ্ঞাত না থাকিলেও এমন কতকগুলি ভাব, ধারণা, অনুভূতি, ইচ্ছা আছে যেগুলি সম্বন্ধে আমরা অবগত থাকি। অর্থাৎ আমাদের মনের ভিতর যেন স্তরভেদ আছে—একটি হইল চেতন-স্তর বা সংজ্ঞান-স্তর (conscious level) এবং আর একটি হইল অবচেতন-স্তর বা নির্জ্ঞান-স্তর (subconscious বা unconscious level)। ফ্রয়েডীয় মনোবিদ্যা আলোচনাকালে (পৃঃ ১০৯-১১৬) আমরা আমাদের চেতন-স্তরের উপর নির্জ্ঞান-স্তরের সম্ভাব্য প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছি ; কিন্তু নির্জ্ঞান-স্তরের প্রভাব যাহাই হউক না কেন, মনের সম্যক্ আলোচনার জন্য চেতন-স্তরের বৈশিষ্ট্যসমূহও আমাদের লক্ষ্য করিতে হইবে। বাস্তবিক, তথাকথিত সংজ্ঞান ও নির্জ্ঞান, চেতন ও অবচেতন-স্তরের সমন্বয়ের ফলেই মন উহার সমগ্র রূপটি ধারণ করে।

১। 'চেতনা' কাহাকে বলে ? (What is consciousness ?)

(ক) চেতনার স্বরূপ (Nature of consciousness) :

চেতনার ক্ষেত্র নির্ধারণ করিতে হইলে আমাদের প্রথমেই আলোচনা করিতে হইবে চেতনা কী বা উহার সংজ্ঞা কী হইবে। কিন্তু চেতনা একটি মৌলিক অবস্থা বলিয়া উহার কোন তর্কবিদ্যাসম্মত সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নহে ; তবে উহাকে নানা ভাবে বর্ণনা করা হইয়া থাকে। আমরা চেতনাকে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করিতে পারি :

(১) প্রতিশব্দ ব্যবহার করিলে বলিতে হইবে যে, চেতনা হইল মনের সংজ্ঞান অবস্থা, অর্থাৎ যে অবস্থায় মনের বাহ্য ও আন্তর ঘটনা সম্বন্ধে **অবগতি** (awareness) জন্মে।

(২) আবার চেতনাকে উহার বিপরীত অবস্থার সহিত পার্থক্য করিয়া

বুঝান যাইতে পারে; যেমন, বলা যাইতে পারে যে, **জড়পদার্থ অচেতন, কিন্তু মন সচেতন।**

(৩) চেতনাকে আবার কেহ কেহ মনের সারধর্ম বলিয়া বর্ণনা করেন।[১] বিস্তার (extension) যেমন জড়পদার্থের সারধর্ম (essence), **চেতনা** সেইরূপ **মনের সারধর্ম।**

(৪) আবার উপমার সাহায্যে ইহাকে বুঝান হয়। যেমন, বলা হয় যে, চেতনা হইল **মনের আলোক**— সন্ধানী আলোক (search light)-এর সাহায্যে যেমন আমরা অন্ধকারের মধ্যে বিভিন্ন বস্তুর অবস্থিতি জানিতে পারি, সেইরূপ চেতনারূপ আলোকের সাহায্যে আমরা বিবিধ বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি।

(৫) আবার চেতনার হ্রাসবৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কেহ কেহ চেতনাকে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন: 'চেতনা হইল তাহা যাহা আমরা যতই সুষুপ্তির অবস্থায় মগ্ন হই, ততই কমিয়া যায়। ইহা হইল তাহা যাহা সুষুপ্তির অবস্থা হইতে জাগ্রত হইলে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়।'[২]

(খ) চেতনার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of consciousness):

চেতনার স্বরূপকে সুষ্ঠুভাবে বুঝিতে হইলে ইহার কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতে হইবে:

(১) চেতনার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহার মধ্যে একটি নিরবচ্ছিন্নতা (continuity) আছে। আমাদের চেতনার মধ্যে ক্রমাগতই বিবিধ চিন্তন, অনুভূতি ও ইচ্ছা একের পর এক আসিতেছে। স্বপ্নবিহীন নিদ্রায় এই চেতনার স্রোত ব্যাহত হয়, কিন্তু নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই নিদ্রাপূর্ব অবস্থার সহিত যোগসূত্র পুনরায় স্থাপিত হয়। এইজন্য মনোবিৎ উইলিয়াম্ জেম্‌স্

১ দার্শনিক দ্যকার্ত (Descartes) এই মতের অন্যতম প্রবর্তক।

২ তুলনীয়: "It is what we are when we are awake as contrasted with what we are when we sink into a profound and perfectly dreamless sleep. It is what we are less and less as we sink gradually down into dreamless sleep; it is what we are more and more as we are slowly aroused from sleep." (Ladd, *Psychology: Descriptive and Explanatory*, p. 30.)

(William James) চেতনা-প্রবাহকে স্রোতস্বতী নদীর সহিত তুলনা করিয়াছেন।[৩]

আবার চেতনার এই সাধারণ প্রবাহের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশেষ প্রবাহ (special continuity) থাকিতে পারে। যখন আমরা কোন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে অতিরিক্ত আগ্রহান্বিত হই, তখন আমাদের ভাবধারা, কার্যধারা, অনুভূতিরাশি ইত্যাদি সব কিছুই সাধারণতঃ ঐ উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া চলিতে থাকে। যেমন, পরীক্ষার প্রাক্কালে পরীক্ষার্থীর প্রায় সকল কার্য, চিন্তা, অনুভূতি ইত্যাদি পরীক্ষায় সাফল্যলাভকে মুখ্য উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করিয়া সেই দিকে প্রধাবিত হয়।

(২) চেতনার মধ্যে এই নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহধারা চলা সম্ভব হইতে পারে যদি উহার মধ্যে সর্বদা কোন-না-কোন পরিবর্তন সূচিত হয়। এইজন্য বলা হয় যে, চেতনা পরিবর্তনকে আশ্রয় করিয়া থাকে (*consciousness thrives on change*)। যদি চেতনার মধ্যে কোন পরিবর্তন না ঘটে—

৩ জেম্‌স্ ইহাকে ***stream of thought*** আখ্যা দিয়াছেন। (অবশ্য জেম্‌স্ এখানে 'thought' পদটি consiousness অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার ভাষায় "I use the word thinking... ...for every form of consciousness indiscriminately.") তিনি চেতনা-প্রবাহের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিয়াছেন :

(ক) প্রত্যেক চিন্তাধারাই ব্যক্তি-বিশেষের অহং-জ্ঞানের অংশরূপে থাকে। ("Every thought tends to be part of a personal consciousness." "It seems as if the elementary psychic fact were not ***thought*** or ***this thought*** or ***that thought***, but ***my thought***, every thought being ***owned***."

(খ) প্রতি ব্যক্তির আত্মচেতনার মধ্যে চিন্তাধারা সর্বদা পরিবর্তনশীল। ("Within each personal consciousness thought is always changing.")

(গ) প্রতি ব্যক্তিরই আত্মচেতনার মধ্যে চিন্তাধারার একটি নিরবচ্ছিন্নতা থাকে। "Within each personal consciousness thought is sensibly continuous." "Consciousness does not appear to itself chopped up in bits." "It is nothing joined, it flows."

(ঘ) যে সকল বস্তু সম্বন্ধে আমরা সচেতন, আমাদের ব্যক্তিগত চেতনার বাহিরে তাহাদের সত্তা আছে। ("It always appears to deal with objects independent of itself.")

(ঙ) বাহ্য বস্তুসমূহের বিশেষ অংশকে চেতনা নির্বাচন করিয়া লয়। "It is interested in some parts of these objects to the exclusion of others, and welcomes or rejects—***chooses*** from among them, in a word—all the while.")

(James, ***Principles of Psychology***, Vol. I, Ch. XI দ্রষ্টব্য।)

যদি ক্রমান্বয়ে আমরা একই বস্তু প্রত্যক্ষ করি, বা একই বিষয় চিন্তা করি বা ইচ্ছা করি—তাহা হইলে আমাদের যেন ঐ বিষয় বা বস্তু সম্বন্ধে চেতনার ধীরে ধীরে বিলুপ্তি ঘটে।[৪] এইজন্য আমাদের চেতনার বিষয়-বস্তু পরিবর্তনশীল হওয়া প্রয়োজন।

(৩) চেতনার মধ্যে একটা দ্বিধা-বিভাগ (dichotomy) আছে—যখনই আমরা কোন বিষয় সম্বন্ধে সচেতন থাকি, তখনই তাহার মধ্যে 'জ্ঞাতা' এবং 'জ্ঞেয়' এই দুই সম্বন্ধে চেতনা থাকে। আমাদের প্রত্যেকের এই জ্ঞান থাকে যে, 'আমি জানি' এবং 'আমি অমুক বিষয় জানি'—অর্থাৎ 'অহং-জ্ঞান' (self-consciousness) এবং 'বস্তু-জ্ঞান' (object-consciousness) এই দুই ভাগে আমাদের চেতনা বিভক্ত।

(৪) আমাদের সংবেদন, প্রত্যক্ষ, স্মৃতি, যুক্তি ইত্যাদি সকল কার্যেরই প্রকাশ ঘটে চেতনার মাধ্যমে।

(গ) **চেতনার আপেক্ষিকতা (Relativity of Consciousness) :** আমরা উপরেই বলিয়াছি যে, চেতনার জন্য প্রয়োজন পরিবর্তন (change), পার্থক্য (difference) বা বৈসাদৃশ্য (contrast)। সুতরাং পরিবর্তন বা বৈচিত্র্যের অভাবে 'একঘেয়েমি' (monotony) দেখা দেয় এবং চেতনা যেন ক্রমশঃ কমিয়া যায়। এইজন্য চেতনা সম্বন্ধে একটি নীতি রচিত হইয়াছে যাহাকে বলা হয় **চেতনার আপেক্ষিকতা সম্বন্ধীয় নীতি** (Law of Relativity of Consciousness)। এই নীতি বলে : **চেতনার সম্ভাব্যতার জন্য পরিবর্তন, বৈচিত্র্য, বৈসাদৃশ্য বা পার্থক্য একান্ত প্রয়োজন।**

এই নীতির তিনটি রূপ আছে ; যথা :

(১) অহং সম্বন্ধে চেতনা (self-consciousness) সম্ভব হয় অহং ব্যতীত অন্য বস্তুর চেতনার (consciousness of the not-self) সহিত তুলনা বা পার্থক্যের মাধ্যমে ; অর্থাৎ জ্ঞাতা (knower) ও জ্ঞেয় (known) প্রত্যেকটি সম্বন্ধে জ্ঞান পরস্পরের জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। জ্ঞাতা

[৪] তুলনীয় : "To feel always the same thing is equivalent to feeling nothing." (এইজন্য একটানা সুরে যখন কোন শিশুর নিকট ঘুমপাড়ানি গান গাওয়া হয়, তখন ক্রমশঃ উহার ঘুম আসে।)

জ্ঞেয়-এর সহিত তুলনায় নিজেকে জ্ঞাতারূপে জানে এবং নিজের সহিত তুলনায় জ্ঞেয়কে জ্ঞেয়রূপে জানে।

(২) আবার বাহ্য জগতের কোন কিছু সম্বন্ধে যখন আমাদের অবগতি জন্মে, তখন আমাদের চেতনার প্রকার বা পরিমাণ নির্ভর করে যে ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়সমূহের মাধ্যমে ঐ সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে তাহার উপর। যেমন, একই পরিমাণের শব্দ কম বা বেশী বলিয়া মনে হয় শ্রবণযন্ত্রের দোষগুণ অনুসারে, একই বস্তু স্পষ্ট বা অস্পষ্ট বলিয়া মনে হয় চক্ষুর দোষগুণানুসারে ইত্যাদি।

(৩) যদি দুইটি বিপরীত গুণ সহ-অবস্থান করে, অথবা একটির অব্যবহিত পরেই অপরটি দেখা দেয়, তাহা হইলে ঐ গুণদ্বয়ের পরিমাণ সম্বন্ধে সংবেদন বা অনুভূতি পরস্পরের সহিত তুলনায় অধিকতর বলিয়া প্রতীত হয়। যেমন, দীর্ঘাঙ্গী ব্যক্তির পার্শ্বে খর্বাকৃতি ব্যক্তি অধিকতর খর্ব এবং খর্বাকৃতির তুলনায় দীর্ঘদেহী অধিকতর দীর্ঘ বলিয়া মনে হয়, সুন্দরের পার্শ্বে কুৎসিত অধিকতর কুৎসিত এবং কুৎসিতের পার্শ্বে সুন্দর অধিকতর সুন্দর বলিয়া প্রতীত হয়, অন্ধকার স্থান হইতে হঠাৎ আলোকিত স্থানে আসিলে উহা অধিকতর আলোকিত এবং আলোকিত স্থান হইতে হঠাৎ অন্ধকারে আসিলে অন্ধকার অধিকতর বলিয়া বোধ হয়।[৫]

২। চেতনার ক্ষেত্র (Field of consciousness) :

চেতনার সমগ্র ক্ষেত্রে চেতনা সমপরিমাণে ব্যাপ্ত থাকে না; একটি অংশে চেতনা কেন্দ্রীভূত হয় এবং ঐ কেন্দ্রের বাহিরে চেতনার পরিমাণ

৫ মহাকবি কালিদাস তাঁহার 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে এই বিষয়ে একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়াছেন। রাজা দুষ্মন্ত বল্কলধারিণী শকুন্তলাকে অবলোকন কালে বোধ করিলেন যে, মলিন বল্কলে শকুন্তলার সৌন্দর্য না কমিয়া যেন বৃদ্ধি পাইয়াছে (যেমন, শৈবালের পার্শ্বে পদ্মের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়, চন্দ্রের কলঙ্ক উহার সৌন্দর্য বাড়াইয়া তুলে)। কবির ভাষায় :

"সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যম্
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্।"

ক্রমশঃ কমিয়া যায়। চেতনার পরিমাণের এই তারতম্য অনুসারে চেতনার ক্ষেত্র (field of consciousness)-কে কেন্দ্র (focus) এবং প্রান্ত (margin) এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

আমাদের চারিধারে যে সব বস্তু সম্বন্ধে আমরা সচেতন থাকি তাহাদের সকলগুলির উপর আমরা সমানভাবে মনঃসংযোগ করিতে পারি না। সুতরাং উহাদের কোন একটি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকে, আর বাকীগুলি সম্বন্ধে আমাদের অস্পষ্ট ধারণা থাকে। যেটির উপর আমরা সর্বাধিক মনঃসংযোগ করি, সেটি আমাদের চেতনার কেন্দ্র (focus)-এ অবস্থান করে, এবং অন্যান্য যে সমস্ত বস্তু সম্বন্ধে তখন অস্পষ্ট ধারণা (vague বা dim consciousness) থাকে সেগুলি আমাদের চেতনার প্রান্তদেশ (margin of consciousness)-এ অবস্থান করে। **চেতনার কেন্দ্র ও প্রান্তদেশের সংযোগে চেতনার ক্ষেত্র** রচিত হয়। (Focus + Margin of consciousness = Field of consciousness)।

একটি উদাহরণ লওয়া যাউক্। পরীক্ষা গ্রহণকালে পরীক্ষাকেন্দ্রে একজন পরীক্ষার্থী প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া যাইতেছে—তাহার মাথার উপর আলো জ্বলিতেছে, পাখা ঘুরিতেছে, চারিদিকে সহ-পরীক্ষার্থীরা লিখিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে পরিচালক বা গার্ডেরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। এখানে ঐ পরীক্ষার্থী যে প্রশ্নের উত্তর লিখিতেছে বা চিন্তা করিতেছে, তাহা তাহার চেতনার কেন্দ্র (focus)-এ অবস্থান করিতেছে বলা যায়। আর আলো, পাখা, 'গার্ড', সহ-পরীক্ষার্থী ইত্যাদি তাহার চেতনার প্রান্তদেশে আছে, কারণ ঐগুলির উপর সে বিশেষ মনঃসংযোগ করিতেছে না এবং উহাদের সম্বন্ধে তাহার অস্পষ্ট ধারণা (vague consciousness) আছে। কিন্তু চেতনার কেন্দ্র ও প্রান্তদেশের বস্তুরা সহজেই পরস্পরের সহিত স্থান বিনিময় করিতে পারে। যেমন, বর্তমান উদাহরণে যদি হঠাৎ কোন সহ-পরীক্ষার্থী অজ্ঞান হইয়া পড়ায় অথবা কোন সহ-পরীক্ষার্থীকে পরিচালক বা গার্ড তিরস্কার করায়, অথবা কোন কারণে আলো-পাখা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় আমাদের আলোচ্য পরীক্ষার্থীর মনোযোগ ঐ দিকে চলিয়া যায়, তখন ঐরূপ কোন ঘটনা তাহার চেতনার কেন্দ্রে চলিয়া আসিবে এবং পূর্বে যাহা কেন্দ্রে ছিল (অর্থাৎ, প্রশ্ন-বিশেষের উত্তর সম্বন্ধে চিন্তা) তাহা সাময়িক-

ভাবে তাহার চেতনার প্রান্তে চলিয়া যাইবে। যাহা হউক, চেতনার কেন্দ্রস্থ ও প্রান্তস্থ বস্তুসমূহ মিলিয়াই চেতনার ক্ষেত্র অধিকার করে।[৬]

এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠিতে পারে 'মন' এবং 'চেতনার ক্ষেত্র' সমব্যাপক (co-extensive) কি না। ইহার উত্তরে বলিতে হইবে যে, মন চেতনা অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক। কারণ চেতন-স্তর বা সংজ্ঞান-স্তরের বাহিরে আছে বিরাট্ নির্জ্ঞান স্তর; এবং মন হইতেছে এই দুই স্তরের 'সংযোগ' বা সমন্বয় (অর্থাৎ সংজ্ঞান + নির্জ্ঞান = মন ; Conscious + Unconscious = Mind)[৭]। সমুদ্রে ভাসমান বিরাট্ তুষারস্তূপ (avalanche)-এর যেমন প্রায় $\frac{১}{১০}$ অংশ উপরে থাকে এবং বাকী $\frac{৯}{১০}$ অংশ সমুদ্রের জলে নিমজ্জমান থাকে, সেইরূপ মনের অল্প 'অংশ'ই চেতন বা সংজ্ঞানস্তরে প্রকাশমান থাকে এবং বাকী 'অংশ' নির্জ্ঞান-স্তরে থাকে। [নিম্নাঙ্কিত চিত্র দ্রষ্টব্য।]
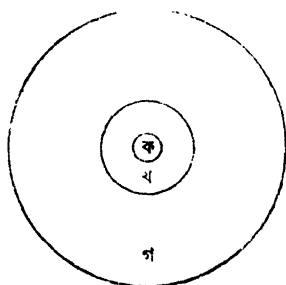
মনের স্তর-বিভাগ

উপরের চিত্রে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে মনের স্তর নির্দেশ করা হইয়াছে। ক = চেতনার কেন্দ্র ; খ = চেতনার প্রান্ত ; গ = অবচেতন বা নির্জ্ঞান। অতএব, ক + খ = চেতনার ক্ষেত্র এবং ক + খ + গ = মন।

৩। অবচেতন বা নির্জ্ঞান (The Unconscious):

আমরা দেখিলাম যে, চেতনার ক্ষেত্র মনের ক্ষেত্র অপেক্ষা অনেক সঙ্কীর্ণ। কিন্তু প্রশ্ন, হইতেছে যে, এই মতের সপক্ষে যুক্তি কী কী? যাহা

৬ Stout প্রমুখ লেখকেরা অস্পষ্ট বা অনির্দিষ্ট জ্ঞাততাকে 'প্রান্তবর্তী চেতনা' (marginal consciousness) আখ্যা না দিয়া 'অবচেতন' (*Sub-consciousness*) পদটি ব্যবহার করিয়াছেন। Stout-এর ভাষায়: "Such *implicit awareness* is called 'sub-consciousness' as distinguished from clear or distinguishing consciousness." (*A Manual of Psychology*, p. 162.)

৭ অবশ্য এরূপ ক্ষেত্রে 'সংযোগ'-পদটি আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় নহে।

চেতনার বাহিরে, যাহা অবচেতন বা নির্জ্ঞান,[৮] সে সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান কি ভাবে সম্ভব হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতে হইবে যে, অবচেতন বা নির্জ্ঞানের অস্তিত্ব কল্পনা না করিলে আমরা চেতন বা সংজ্ঞান স্তরের অনেক ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে পারি না। সুতরাং আমরা নির্জ্ঞানকে 'যথার্থ প্রকল্প' (valid hypothesis) বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।[৯] নির্জ্ঞান-স্তর বলিতে আমরা এমনই এক স্তর বুঝি যাহা চেতনার ক্ষেত্রের বহির্ভূত, অথচ মনোরাজ্যের অন্তর্গত।

যে সমস্ত কারণে বিভিন্ন মনোবিৎ অবচেতন বা নির্জ্ঞান-স্তরে বিশ্বাস করেন, আমরা এখানে তাহাদের উল্লেখ করিব:

(১) আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতায় আমরা দেখিতে পাই যে, সকল উদ্দীপনই সংবেদন সৃষ্টি করে না, উদ্দীপনের তীব্রতা এক বিশেষ পরিমাণে

---

৮ পূর্বের লেখকেরা চেতনার বহির্ভূত স্তর বুঝাইবার জন্য অবচেতন বা ইংরাজি Sub-conscious পদটি ব্যবহার করিতেন। পদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দিক্ দিয়া ইহাতে কোন ত্রুটি নাই: কারণ 'অব' (বা ইংরাজি 'sub') এই উপসর্গটি কোন কিছুর নিম্নস্থ বা অধীন যাহা তাহা বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই দিক্ হইতে যাহা চেতনার নিম্নে বা বাহিরে তাহাকে অবচেতন (বা sub-conscious) বলা যাইতে পারে। তবে বর্তমানে অনেকে 'subconscious' পদটি 'অস্পষ্ট চেতনা' এই অর্থে ব্যবহার করিতেছেন (পূর্ব পৃষ্ঠার ষষ্ঠ পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। আধুনিক লেখকেরা এইজন্য 'নির্জ্ঞান' (বা unconscious) পদটি ব্যবহার করেন। অবশ্য 'unconscious' পদটি একেবারে ত্রুটিহীন নহে। যাহার চেতনা নাই (অর্থাৎ জড়) তাহাকে unconscious বলা হয়; যখন কোন কার্যের উদ্দেশ্য কর্তার নিকট জ্ঞাত নয়, বা কর্তা যাহা অন্যমনস্কভাবে করিয়াছে, তখনও unconscious পদটি ব্যবহৃত হয়, যেমন, "I did it rather unconsciously"; আবার ফ্রয়েড্ প্রমুখ্ লেখকগণ কর্তৃক মনের স্তরবিশেষ বুঝাইবার জন্য ইহা বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন 'The Unconscious.' (A. C. MacIntyre, *The Unconscious*, Ch. III দ্রষ্টব্য।)

[বর্তমান অধ্যায়ে 'অবচেতন'-পদটি চেতনার ক্ষেত্রে বহির্ভূত মানসিক 'স্তর-বিশেষ' এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।]

৯ অধ্যাপক সুহৃৎচন্দ্র মিত্র নির্জ্ঞান-স্তরে বিশ্বাসের স্বপক্ষে বলিয়াছেন: "অনেক সময়ে ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করিয়া এবং বিধিসঙ্গত যুক্তি, অনুমান প্রভৃতির সাহায্যে কারণ কল্পনা করিয়া লইতে হয়। যদি কল্পিত কারণ যথেষ্ট এবং ন্যায়সঙ্গত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে তাহাই প্রকৃত কারণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, যতদিন না অন্য কোনও প্রতিকূল ঘটনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।...মনের নির্জ্ঞান-স্তরে বাসনা, চিন্তা প্রভৃতির অস্তিত্ব ধরিয়া লইবার এই ধরণের যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে।" (মনঃসমীক্ষণ, পৃঃ ১৫, ১৬)।

পৌছিলে তবে সংবেদনের সৃষ্টি হয়। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, উদ্দীপন ঐ ঊর্ধ্ব সীমারেখায় পৌছিবার পূর্বে নিশ্চয়ই মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছিল, অথচ সীমারেখার নিম্নস্থ উদ্দীপন সম্বন্ধে আমাদের কোন চেতনা ছিল না; সুতরাং মনের অবচেতন স্তরে উহাদের প্রভাবের সমাবেশ ঘটিতেছিল।[১০]

(২) স্মৃতির সম্ভাব্যতা অবচেতন স্তরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিবার একটি অন্যতম প্রধান হেতু। আমরা দৈনন্দিন জীবনে অনেক কিছু প্রত্যক্ষ করিতেছি বা অনেক ব্যক্তি, বস্তু ও ঘটনা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছি। ইহাদের সবগুলি আমাদের মনে থাকে না—যেগুলি আমাদের মনে থাকে সেগুলি সম্বন্ধেও আমরা সর্বদা সচেতন থাকি না; সেগুলি যেন আমাদের স্মৃতিপটে থাকে এবং প্রয়োজনমত আমরা সেগুলিকে 'পুনরুজ্জীবিত' করিতে পারি বা করিবার চেষ্টা করি। এক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, ঐ সব ঘটনা ইত্যাদির কথা আমরা সর্বদা চিন্তা করি না; অতএব ঐগুলি আমাদের সংজ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বদা বিরাজমান নাই। অথচ ঐগুলি একেবারে মন হইতে অবলুপ্ত হইয়া যায় নাই—যদি যাইত, তাহা হইলে তাহাদের আমরা কখনই প্রতিরূপ (images)-এর আকারে জাগরিত করিতে পারিতাম না; আবার ঐগুলি সর্বদা চেতনা বা সংজ্ঞানের ক্ষেত্রে নাই—যদি থাকিত, তাহা হইলে আমাদের সর্বদাই ঐ সম্বন্ধে অবগতি থাকিত। অতএব অনুমান করিতে হইবে যে, মনের এমন এক স্তর আছে যাহা চেতনার ক্ষেত্রের বাহিরে, অথচ মনের ভিতর এবং সেখানে উহারা প্রতিরূপের আকারে ছিল। এই স্তরকে আমরা অবচেতন বা নির্জ্ঞান-স্তর বলিতে পারি।

(৩) মধ্যে মধ্যে ইহা দেখা যায় যে, যখন আমরা কোন কিছু স্মরণ করিবার চেষ্টা করি, তখন তাহা মনে করিতে পারি না; কিন্তু তাহার পরে হঠাৎ উহা মনে পড়িয়া যায়—আবার হয়ত' কিছুক্ষণ পরে তাহা ভুলিয়া

১০ হ্যামিলটন্ (Hamilton)-এর একটি উদাহরণ এখানে উল্লেখযোগ্য। দূর হইতে আমরা যখন সমুদ্রের গর্জন শুনিতে পাই, তখন অনুমান করা যাইতে পারে যে, যদিও পৃথক্ পৃথক্ ঢেউ আমরা শুনিতে পাই না, তাহা হইলেও তাহারা নিশ্চয়ই মনের উপর (অথচ চেতনার বাহিরে কোন স্তরে) প্রভাব বিস্তার করে—নচেৎ আমরা সমুদ্রের গর্জন (যাহা বিবিধ পৃথক্ পৃথক্ ঢেউ-এর সমন্বয়) শুনিতে পাইতাম না। (*Petites perceptions* সম্বন্ধে দার্শনিক লাইব্‌নিৎসের মতবাদ ইহার সহিত তুলনীয়।)

যাই। এইভাবে মনোরাজ্যে যেন স্মৃতি-বিস্মৃতির 'লুকোচুরি' চলে। যেমন, পরীক্ষার সময় একটি প্রশ্নের উত্তর লিখিবার কালে অনেক চেষ্টা করিয়াও একজন পরীক্ষার্থী হয়ত' একটি বিষয় কিছুতেই স্মরণ করিতে পারিল না, কিন্তু অপর এক প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় হয়ত' তাহা মনে পড়িল, অথবা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার পরই তাহা মনে পড়িল। এইভাবে স্মৃতি-বিস্মৃতির পর্যায়ক্রমে দ্রুত পরিবর্তন সম্ভব হইতে পারে, যদি চেতনার বহির্ভূত (অথচ মনের অন্তর্ভুক্ত) কোন স্তর থাকে যেখানে বিস্মৃত বিষয়বস্তু আশ্রয় লয় এবং যেখান হইতে উহা স্মৃতিপথে উদিত হয়।

(৪) যুক্তির ক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে এরূপ দেখা যায় যে, আমরা কোন সচেতন প্রচেষ্টা ব্যতীতই সিদ্ধান্তে উপনীত হই এবং উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া করিবার চেষ্টা করি। যেমন, ধূম দেখিবামাত্র উহার পশ্চাতে কারণভাবে অগ্নি বিদ্যমান, ইহা আমরা অনুমান করিয়া লই। এরূপ ক্ষেত্রে বলিতে পারি যে, আমাদের অবচেতন স্তর যুক্তির বিভিন্ন পর্যায় দ্রুত অতিক্রম করে এবং সংজ্ঞান-স্তরে অনুমানের সকল পর্যায় বা 'অবয়ব' সম্বন্ধে বিশেষ অবগতি থাকে না।

(৫) অভ্যাসের বেলায় দেখা যায় যে, অভ্যস্ত কার্য (habitual act) করিবার কালে আমরা ঐ সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত বা সচেতন থাকি না; আমরা অন্যমনস্কভাবে ঐরূপ কার্য করি। এমন কি দেখা যায় যে, অভ্যস্ত কার্য করিবার কালে উহার উপর বেশী মনঃসংযোগ করিলে উহা সুষ্ঠুভাবে করা যায় না। তাহা ছাড়া, দেখা যায় যে, অভ্যস্ত কার্য করিবার কালে ব্যক্তি-বিশেষ হয়ত' অন্য কোন বিষয় গল্প করিতেছে বা আলোচনা করিতেছে। যেমন, মোটর গাড়ী বা সেলাইয়ের কল চালাইবার কালে ঐরূপে কার্যে যে অভ্যস্ত, সে অনায়াসেই অন্য বিষয় গল্প বা আলোচনা করিতে পারে। ইহা হইতে অনুমান করা হয় যে, মনের অবচেতন-স্তর অভ্যাসলব্ধ কার্য করিয়া যায় এবং চেতন-স্তর অন্য বিষয়ে ব্যাপৃত থাকে।

(৬) কখনও কখনও এরূপ হয় যে, আমরা অন্যমনস্কভাবে কোন কিছু প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কিন্তু তখন উহা আমাদের চেতন-স্তরে কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই; অথচ উহা আমাদের অবচেতন-স্তরে রেখাপাত করিয়াছে। যেমন, একজনের হয়ত' কোন জিনিষ হারাইয়া

গিয়াছে; সে জাগ্রত অবস্থায় উহা মনে করিতে পারিল না, কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় যেন দেখিল যে, উহা 'অমুক' স্থানে আছে এবং বাস্তবিকই উহা সেখানে পাওয়া গেল। এক্ষেত্রে অনুমান করা হয় যে, ঐ ব্যক্তির চেতন-স্তর ঐ বস্তুকে না দেখিলেও তাহার অবচেতন-স্তর উহা "লক্ষ্য" করিয়াছিল।[১১]

(৭) কাহারও কাহারও স্বপ্নচারিতা (somnambulism) রোগ থাকে। ইহারা স্বপ্নাবস্থায় ঘুরিয়া বেড়ায় বা অন্য কার্য করে। কেহ কেহ আবার সুন্দর কাব্য রচনা বা অন্য কোন সাহিত্য রচনা করে।[১২] অথচ নিদ্রাবস্থা হইতে উত্থিত হইলে তাহা স্মরণ করিতে পারে না। আবার কেহ কেহ তথাকথিত জাগ্রত অবস্থাতেও স্বতঃক্রিয়ভাবে কার্য করে—ইহাকে স্বতঃ-ক্রিয়তা (automatism) বলে; অথচ ঐরূপ কার্য কেন করিল বা কে করিল স্বাভাবিক অবস্থায় তাহা বলিতে পারে না (পৃঃ ২৭৮-৭৯)। ইহার কারণস্বরূপ বলিতে পারা যায় যে, ঐরূপ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটা বিষঙ্গাবস্থা (dissociation) ঘটে এবং ব্যক্তিত্বের প্রধান অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থা মনের অবচেতন বা নির্জ্ঞান-স্তর হইতে কার্য করে।

(৮) সংবেশন (hypnotism)-এর ফলে দেখা যায় যে, যে সব ঘটনা ব্যক্তি-বিশেষ কোন ক্রমেই চেতনাবস্থায় মনে করিতে পারে না সেইরূপ ঘটনা সংবিষ্ট অবস্থায় (hypnotized state-এ) স্মরণ করিতে পারে। এমন দেখা গিয়াছে যে, সংবিষ্ট ব্যক্তি অতি শৈশব অবস্থার (যেমন, ২।১ বৎসর বয়সের) কোন ঘটনা হয়ত' স্মরণ করিতেছে। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, এইসব ঘটনার স্মৃতি নির্জ্ঞানের কোন গভীর স্তরে যেন নিমজ্জিত ছিল। আবার সংবিষ্ট অবস্থায় ব্যক্তি-বিশেষ যাহা করে, তাহা

---

১১ তুলনীয়: "A man who has lost a valuable article may dream that he sees it in a certain place where later it actually proves to be. The presumption is that the dream is based on a disposition left by an actual perception. But had he consciously observed the object in this place, he would have been sufficiently interested to have removed it to safety. If he had seen it there at all, he must have done so 'unconsciously." (Stout, *A Manual of Psychology*, p. 29.)

১২ শুনা যায় যে, Paganini তাঁহার *Sonata du Diable* এবং Coleridge তাঁহার *Kubla Khan* নিদ্রাকালে রচনা করিয়াছিলেন।

জাগ্রত অবস্থায় সে স্মরণ করিতে পারে না; অথচ পুনরায় সংবিষ্ট হইলে সে উহা স্মরণ করিতে পারে।

আবার নির্জ্ঞান-স্তরের কল্পনা ব্যতীত সংবেশনোত্তর অভিভাবন (post-hypnotic suggestion)-এর ফলে কৃত কার্যের ব্যাখ্যা করা কঠিন। সংবেশনকালে সংবেশক সংবিষ্ট ব্যক্তিকে এরূপ 'আদেশ' দিতে পারেন যে, সংবেশনোত্তর কোন এক সময় তিনি যেন একটি বিশেষ কার্য করেন। দেখা গিয়াছে, সংবিষ্ট ব্যক্তি জাগ্রত হইবার পর প্রায় নির্দিষ্ট সময়ে 'আদিষ্ট' কার্যটি করিয়াছেন বা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। যেমন, সংবেশক হয়ত' আদেশ দিলেন যে, তখন হইতে ৮ ঘণ্টা বাদে সংবিষ্ট ব্যক্তি যেন কোন একটি বিশেষ বাগানে ঘুরিয়া বেড়ান; তাহার পর সংবিষ্ট ব্যক্তিকে জাগরিত করিয়া দেওয়া হইল। নির্দিষ্ট সময় আগতপ্রায় হইলে দেখা যাইবে যে, 'আদিষ্ট' কার্য করিবার জন্য ঐ ব্যক্তির মনে বিশেষ ব্যাকুলতা জন্মাইতেছে এবং যদি সুবিধা পান, তাহা হইলে ঠিক ঐ বাগানে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইবেন (এমন কি গভীর রাত্রি হইলেও তাহা করিবেন)। কিন্তু যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে তিনি কেন বেড়াইতেছেন, তাহা হইলে তিনি প্রকৃত কারণ (অর্থাৎ সংবেশকের আদেশ) স্মরণ করিতে পারিবেন না, এবং অন্য কাল্পনিক 'কারণ' বলিবেন। এক্ষেত্রে স্বতঃই অনুমান করা যাইতে পারে যে, 'জাগ্রতাবস্থায়' নিশ্চয়ই ঐ ব্যক্তির মনের কোন বিশেষ্ স্তর (যাহা অবশ্যই সংজ্ঞান-স্তর হইতে পারে না) অজ্ঞাতসারে সংবেশকের আদেশের কথা স্মরণ করিয়া সময়ের হিসাব রাখিয়া কার্য করিবার চেষ্টা করিয়া চলিতেছিল[১৩] এবং ঐ বিশেষ স্তরকে নির্জ্ঞান-স্তর বলা যায়।

(৯) ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণবাদ প্রচারিত হইবার পর হইতেই মনোবিদ্যার

১৩ যদি সংবেশন গভীর হয় এবং সংবেশক ও সংবিষ্টের মধ্যে সম্বন্ধ (rapport) নিবিড় হয়, তাহা হইলেই সংবেশনোত্তর অভিভাবনের প্রভাবে সংবিষ্ট ব্যক্তি 'আদিষ্ট' কার্য করিতে পারে।

ম্যাক্‌ডুগাল (McDougall) এই প্রকার কার্যের ব্যাখ্যা দান কালে বলিয়াছেন: "......in all (such) cases whatever the method of calculation or counting or recording, the intellectual operation was carried on *subconsciously* so far as these experienced and cautious experimenters could ascertain." (*Outline of Abnormal Psychology*, p. 98.) এই প্রসঙ্গে ঐ পুস্তকের পৃঃ ৯৪-৯৭ দ্রষ্টব্য।

রাজ্যে নির্জ্ঞান-স্তরের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হইতে থাকে।[১৪] মনোজগতের অনেক ঘটনাকে পূর্বে মনোবিদ্‌গণ যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন না, তাই উহাদের অনেক সময় আকস্মিক বলিয়া অভিহিত করা হইত। ফ্রয়েড্‌ কিন্তু দেখান যে, জড়-জগতে যেমন কোন ঘটনা কারণবিহীনভাবে ঘটে না, সেইরূপ মনোজগতেও কোন কিছু আকস্মিকভাবে ঘটে না। তিনি বলেন যে, সংজ্ঞানকে মনের সহিত সমব্যাপক বলিয়া মনে করার জন্যই এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সংজ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া মনের ব্যাপকতা। যে সব মানসিক ঘটনাকে আপাতদৃষ্টিতে কারণবিহীন বলিয়া মনে হয়, মনের নির্জ্ঞান-স্তরে তাহাদের কারণ লুক্কায়িত থাকে। আমাদের যে সকল বাসনা বাহ্য জগতে পরিপূরিত হয় না, মনের নির্জ্ঞান-স্তরে থাকিয়া তাহারা আমাদের জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং অজ্ঞাত বা গোপন প্রেষণা (unconscious motivation) হিসাবে কার্য করে।[১৫]

(ক) আমরা অনেক সময় অনেক ভুল করি—কোন ব্যক্তি বা বস্তু বা স্থানের নাম ভুলিয়া যাই, কোন বিশেষ কার্য করিতে ভুলিয়া যাই, যে কথা যেখানে বলিতে হইবে, তাহা না বলিয়া অন্য কথা বলিয়া ফেলি ইত্যাদি। এগুলি ফ্রয়েডের মতে মোটেই আকস্মিক নহে। ইহাদের কারণ নির্জ্ঞান-

১৪ প্রাক্‌-ফ্রয়েডীয় যুগে নির্জ্ঞান সম্বন্ধে যাঁহাদের আলোচনার সহিত ফ্রয়েডের মতের সাদৃশ্য আছে তাঁহাদের অন্যতম হইলেন হার্‌বার্ট (Herbart)। তবে এই দুইজনের মতের পার্থক্যও আছে। হার্‌বার্ট ফ্রয়েডের ন্যায় রোগি-পরীক্ষা-পদ্ধতির ভিত্তিতে তাঁহার মনোবিদ্যা গড়িয়া তুলেন নাই, হারবার্টের মতবাদে বৌদ্ধিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাধান্য; কিন্তু ফ্রয়েডের রচনায় ইচ্ছার উপর প্রাধান্য। দৈনন্দিন জীবনের বিবিধ সাধারণ চেতন অবস্থার ব্যাখ্যার জন্য হারবার্ট নির্জ্ঞান সম্বন্ধে অনুমান করেন, কিন্তু ফ্রয়েড্‌ মানসিক রোগের লক্ষণ, সাধারণ ভুল, স্বপ্ন ইত্যাদির সুষ্ঠু ব্যাখ্যার জন্য নির্জ্ঞান কল্পনা করেন।

১৫ ফ্রয়েড সংজ্ঞান ও নির্জ্ঞান ব্যতীত আর একটি মধ্যবর্তী স্তরের কল্পনা করিয়াছেন—ফ্রয়েড্‌ ইহার নাম দিয়াছেন 'আসংজ্ঞান'-স্তর (pre-conscious)। [পৃঃ ১১২ দ্রষ্টব্য।] "যে সমস্ত ঘটনার কথা ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের মনে নাই, অথচ একটু চেষ্টা করিলেই পুনরায় সংজ্ঞানে আনিতে পারা যায়, সেগুলি মনের দ্বিতীয় স্তরে আছে বলিয়া কল্পনা করা যায়। এই দ্বিতীয় স্তরের নাম আসংজ্ঞান।" (ডাঃ মিত্র, "মনঃসমীক্ষণ", পৃঃ ১২)।

স্তরে সুপ্ত থাকে। যে বিষয় আমরা ভুল করি, তাহা ভুল করিতে ইচ্ছা করি বলিয়াই আমরা ভুল করি। যেমন, ফ্রয়েড্ হঠাৎ এক অতি পরিচিত রোগীর নাম ভুলিয়া গেলেন; অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল যে, তিনি রোগীকে এমন এক ইন্‌জেক্‌সন্ দিয়াছিলেন যাহা তাঁহার দেওয়া উচিত হয় নাই। তিনি এই লজ্জাকর ঘটনাটি ভুলিয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন বলিয়াই ঐ রোগীর নাম ভুলিয়া যান।

(খ) বিবিধ মানসিক রোগের লক্ষণগুলির মধ্য দিয়া রোগী তাহার অপূরিত এবং অবদমিত বাসনাগুলিকে 'সাঙ্কেতিক উপায়ে' (symbolic manner-এ) তৃপ্ত করিবার পথ খুঁজে।

(গ) স্বপ্নে আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করি, তাহাও একেবারে অসার বা অলীক নহে। ফ্রয়েড্ স্বপ্নের 'ব্যক্ত অংশ' (manifest content)-এর পশ্চাতে যে সব 'অব্যক্ত অংশ' (latent content) আছে তাহা অনুধাবন করিবার চেষ্টা করেন। ইহার ফলে দেখা যায় যে, স্বপ্নদৃষ্ট প্রতিরূপগুলি হইল অপূরিত (এবং মানবসমাজে সম্ভবতঃ অপূরণীয়) বাসনার প্রকাশক।

এই সব অপূরিত বাসনাগুলির একটি আধারের বা আবাসের (habitat) প্রয়োজন; নির্জ্ঞানই হইল এই সব অবদমিত এবং অপূরিত বাসনাসমূহের আধার (পৃঃ ১১২-তে প্রদত্ত রেখাঙ্কন দ্রষ্টব্য)।[১৬] এই নির্জ্ঞান হইল আমাদের জীবনের সকল কার্যের মূল এবং আদি উৎস। যেহেতু ইহা শৈশবাবস্থার অপূর্ণ এবং অবদমিত সকল বাসনার আধার, সেই হেতু ইহারই মাধ্যমে শৈশব এবং পরিণত বয়সের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয় এবং শৈশবাবস্থা পরিণত বয়সেও মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে (পৃঃ ২৯১-২৯৩ দ্রষ্টব্য)।

---

১৬ ফ্রয়েডীয় দৃষ্টিভঙ্গীকে ব্যাখ্যা করিয়া ম্যাক্‌ইনটায়ার (MacIntyre) বলেন: "......in dreams and psychoneurotic behaviour we find modes of expression and types of action which can only be explained on the supposition that, as well as our conscious mental activity and what is not but can be readily made available in the form of conscious mental activity, there is a realm of unconscious mental activity where ideas charged with psychical energy combine and substitute for one another in a variety of ways." (*The Unoonscious*, p. 37.)

অনেক মনোবিৎ নির্জ্ঞান সম্বন্ধে ফ্রয়েডীয় মতবাদের কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন। যেমন, য়ুঙ্, ব্যক্তিগত নির্জ্ঞান ব্যতীত জাতিগত নির্জ্ঞান কল্পনা করেন, ইহা আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি (পৃঃ ১২৬)।

যাহা হউক, নির্জ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও বর্তমান কালে কেহই আমাদের মনের উপর নির্জ্ঞানের প্রভাবকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিতে পারেন না।[১৭]

১৭ আমরা উপরে নির্জ্ঞান সম্বন্ধে ফ্রয়েডীয় এবং ফ্রয়েড-উত্তরকালের মতবাদের উল্লেখ করিয়াছি। তবে প্রাক্-ফ্রয়েডীয় যুগের লেখকদের রচনাতেও নির্জ্ঞান ও অবচেতন স্তর সম্বন্ধে আলোচনার পরিচয় পাওয়া যায়।

(১) দার্শনিক লাইব্‌নিৎস্ মনে করিতেন যে, অনেক সময় মৃদু উদ্দীপক (petit perception) আমাদের চেতন স্তরে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না; অথচ তাহাদের যখন সমাবেশ ঘটে, তখন তাহাদের সম্বন্ধে আমরা অবহিত হই। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে মৃদু উদ্দীপকগুলির পৃথক্ পৃথক্ প্রভাব নিশ্চয় অবচেতন বা নির্জ্ঞানস্তরে থাকে। (পৃঃ ৩৩১ পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

(২) হারবার্টের রচনায় নির্জ্ঞান-সম্বন্ধীয় মতবাদ আর একটু পরিপুষ্ট হয়। তিনি বলিতেন যে, মনের ভিতর এমন কতকগুলি ভাব (ideas) থাকিতে পারে যাহাদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধিতা ঘটিতে পারে; কিন্তু এই বিরোধের ফলে যে সকল ভাব বা ধারণা পরাজিত হয়, তাহারা মনোরাজ্য হইতে একেবারে বিদায় লয় না, বরং সর্বদাই প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের স্তরে উঠিবার চেষ্টা করে।

(৩) হ্যামিলটনও 'নির্জ্ঞান' সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি এই প্রসঙ্গে নির্জ্ঞানের সুপ্ত বা অব্যক্ত অবস্থার (latency) তিনটি প্রকারভেদ করেন। তিনি বলেন যে, মনের এমন অবস্থা থাকিতে পারে যে সম্বন্ধে আমরা মোটেই অবহিত নহি, অথচ উহা সর্বদা মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

(৪) ফন্ হার্ট্‌মান্ (Von Hartmann)-এর রচনাতেও 'নির্জ্ঞান' পদের প্রচুর উল্লেখ আছে। তিনি অনুভূতি, চিন্তা, কার্য সকল ক্ষেত্রেই নির্জ্ঞানের প্রভাবকে স্বীকার করিতেন।

(৫) তাহা ছাড়া, আধুনিক যুগের প্রারম্ভে শারকো (Charcot), জানে (Janet), প্রিন্স্ (Prince) ইত্যাদিও নির্জ্ঞানের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।

[C. S. Spearman, *Psychology Down the Ages*, Vol. I, pp. 371-77 দ্রষ্টব্য।]

একাদশ অধ্যায়

প্রতিক্রিয়া

আমরা মনোবিদ্যাকে ব্যবহার সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান বলিয়া সংজ্ঞাদান করিয়াছি। অতঃপর আমরা বিবিধ ক্রিয়া বা ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিব। আমরা যে সকল কার্য করি তাহাদের মধ্যে কতকগুলি উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়ারূপে সাধিত হয়। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা প্রতিক্রিয়া (reaction)-এর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

১। প্রতিক্রিয়া-কাল (Reaction Time) :

(১) 'প্রতিক্রিয়া' কাহাকে বলে ? (What is Reaction ?)—

রাস্তায় পথ চলিতে চলিতে মোটর গাড়ীর হর্ণ শুনিয়া আমরা চলন্ত গাড়ীর সম্মুখ হইতে সরিয়া যাই ; মোটর চালক ট্রাফিক্ সিগ্‌ন্যালে লাল আলোক দেখিলে গাড়ী থামাইয়া ফেলে ; ক্লাসে অধ্যাপক 'রেজিষ্টার' হইতে 'রোল নম্বর' ডাকিয়া যাইতে থাকিলে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীরা প্রত্যুত্তর দেয় ; রেডিওতে সময় সঙ্কেত শুনিলে আমরা ঘড়ি মিলাইয়া লই ; কোন গরম জিনিষের সংস্পর্শে হাত লাগিলে তৎক্ষণাৎ উহা সরাইয়া লই ইত্যাদি। এই সব বিবিধ কার্যকে প্রতিক্রিয়া (reaction) বলা হয়। **কোন এক (বা একাধিক) উদ্দীপকের সংস্পর্শে আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ আসিলে উহাকে গ্রহণ করিবার জন্য বা পরিহার করিবার জন্য বা উহার দ্বারা নির্দিষ্ট কোন 'আদেশ' পালন করিবার জন্য বিবিধ প্রতিক্রিয়া সাধিত হয়।**

প্রতিক্রিয়া আবার **শিক্ষা-নিরপেক্ষ** (unlearned) এবং **শিক্ষালব্ধ** (learned) এই দুই প্রকারের হইতে পারে। মোটর গাড়ীর চালক কোন আলোর সঙ্কেত দেখিয়া গাড়ী থামান-রূপ যে প্রতিক্রিয়া করেন, বা ক্লাসে ছাত্রেরা 'রোল নম্বর' শুনিয়া যে প্রত্যুত্তর দেয়, কোন পরিচিত ব্যক্তি করমর্দনের জন্য হাত বাড়াইলে আমরা যে হাত বাড়াইয়া দিই, তাহা হইল শিক্ষালব্ধ (learned)। শিক্ষালব্ধ প্রতিক্রিয়া যে উদ্দীপকের প্রয়োগমাত্রই সর্বদা হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই (যেমন, 'রোল নম্বর' শুনিবামাত্র সকল ছাত্রছাত্রী তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর দেয় না, বা লাল আলো

দেখিবামাত্র সকল চালক গাড়ী নাও থামাইতে পারে)। তবে একইরূপ উদ্দীপক প্রয়োগে একই রূপ প্রতিক্রিয়া বার বার করিলে উহা কতকটা অভ্যাসে পরিণত হয় এবং স্বতঃক্রিয়ভাবে (automatically) উহা সাধিত হয়।

অপরপক্ষে, গরম জিনিষে হাত লাগিলে যখন আমরা হাত তৎক্ষণাৎ সরাইয়া লই বা চক্ষুর উপর তীব্র আলোক পড়িলে চক্ষু বুজিয়া ফেলি, তখন উহা হইল শিক্ষা-নিরপেক্ষ বা সহজাত প্রতিক্রিয়া।[১]

(২) 'প্রতিক্রিয়া-কাল' কাহাকে বলে? (What is Reaction-time?):

উদ্দীপকের প্রয়োগ ঘটিলেই আমরা সেই একই মুহূর্তে প্রতিক্রিয়া করি না। **উদ্দীপকের প্রয়োগ এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কিছু সময়ের ব্যবধান থাকে। প্রতিক্রিয়া-কাল বলিতে সময়ের এই ব্যবধানকে বুঝায়।**[২]

প্রতিক্রিয়া-কালের পার্থক্য বা তারতম্য নানা কারণে ঘটিতে পারে; যথা—

(ক) **ব্যক্তিগত পার্থক্য** অনুসারে—সকল ব্যক্তির প্রতিক্রিয়ার শক্তি সমান নহে। সুতরাং একই উদ্দীপকজনিত প্রতিক্রিয়া-কাল বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ হয়।

(খ) **উদ্দীপকের গুণগত পার্থক্য** অনুসারে—একই ব্যক্তির ক্ষেত্রে উদ্দীপকের পার্থক্য অনুসারে প্রতিক্রিয়া-কালের তারতম্য ঘটে। (যেমন, আলোক সংবেদনের ফলে প্রতিক্রিয়ার যে সময় লাগিবে, উত্তাপ-সংবেদনের ফলে প্রতিক্রিয়ার জন্য সেইরূপ সময় নাও লাগিতে পারে)।

(গ) একই **উদ্দীপকের তীব্রতা** (intensity) বা **ব্যাপকতা** (duration)-এর পার্থক্য অনুসারে—ক্ষীণ আলোক-রূপ উদ্দীপকজনিত

---

১ 'প্রতিক্রিয়া' পদটি ব্যাপক অর্থে ধরিলে 'কোন কিছুর প্রত্যুত্তরে যে কোন ক্রিয়া' ইহা বুঝাইবে। সুতরাং একমাস পূর্বে আমার বন্ধু যে চিঠি দিয়াছিল, আজ যদি তাহার উত্তর দিতে যাই, তাহাকেও ব্যাপক অর্থে 'প্রতিক্রিয়া' বলা চলে। আমরা বর্তমান ক্ষেত্রে 'প্রতিক্রিয়া' পদটি এইরূপ ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিব না। 'উদ্দীপক' প্রয়োগের পর অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে যে সকল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, আমরা বর্তমানে তাহাদের সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

২ প্রতিক্রিয়া-কাল লইয়া গবেষণা আরম্ভ হইবার ইতিহাস এইরূপ। ১৭৯৬ সালে গ্রীণউইচের পর্যবেক্ষণশালায় (observatory-তে) এক সহকারীর উপর ভার ছিল কখন নক্ষত্র মধ্যরেখা

প্রতিক্রিয়া করিতে যে সময় লাগিবে তীব্র আলোকরূপ উদ্দীপকে প্রতিক্রিয়া করিতে ঠিক সেইরূপ সময় লাগিবে না।

(ঘ) **উদ্দীপিত ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপন-স্থানের পার্থক্য** অনুসারে—যেমন, চাক্ষুষ সংবেদনের ক্ষেত্রে অক্ষিপট (retina)-এর কেন্দ্র (fovea centralis) উদ্দীপিত হইলে প্রতিক্রিয়ার যে সময় লাগিবে, কেন্দ্র হইতে দূরবর্তী বিন্দু উদ্দীপিত হইলে সেই সময় লাগিবে না।

(ঙ) **প্রতিক্রিয়াকারীর শারীরিক এবং মানসিক অবস্থার তারতম্য অনুসারে**—ক্লান্তি, মাদকদ্রব্য সেবনের ফলজনিত অবসাদ বা উত্তেজনা, শাস্তির ভয়, প্ররোচকের আশা ইত্যাদি কারণে প্রতিক্রিয়ার পার্থক্য ঘটে।

(৩) প্রতিক্রিয়া-কাল পরিমাপের পদ্ধতি (Method of measuring Reaction-Time):

পরীক্ষাগারে সাধারণতঃ একটি সরল পদ্ধতিতে শিক্ষালব্ধ প্রতিক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া-কাল পরিমাপ করা হয়।

পরীক্ষণ-পাত্র (subject of experiment) একটি 'বৈদ্যুতিক যোজক' (electric key)-কে চাপিয়া সাধারণতঃ তাঁহার তর্জনী অঙ্গুলিটি রাখেন। তাঁহাকে বলা থাকে যে, একটি বিশেষ সঙ্কেত (signal) বা উদ্দীপক (stimulus), যথা, আলোক, প্রত্যক্ষমাত্র তিনি 'যোজক' হইতে অঙ্গুলিটি তুলিয়া লইবেন। যদি আলোক-কে উদ্দীপকরূপে ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে পরীক্ষক একটি যোজক (key বা switch) টিপিবামাত্র আলো

(meridian) অতিক্রম করিয়া যায় তাহা দেখিবার; কিন্তু তিনি যে সময়ের নির্দেশ লিখিতেন, তাহাতে প্রায়ই ভুল হইত (ইহাকে 'personal equation'-জনিত ভুল বলা হইত)। এইজন্য তাঁহাকে কর্মচ্যুত করা হয়।

পরে ১৮২২ সালে জার্মান জ্যোতির্বিদ্ বেস্‌সেল্ (Bessel) একটি তুলনামূলক তালিকা প্রণয়ন করিয়া দেখান যে, নক্ষত্রের 'অতিক্রমণ—পথ' লক্ষ্য করার ব্যাপারে ব্যক্তিগত পার্থক্য থাকার জন্য কেহই একই সময়ের উল্লেখ করিতে পারিতেছেন না।

১৮৫০ সালে হেলম্‌হোলৎস্ (Helmholtz) এই বিষয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। তিনি ক্রিয়াবাহী স্নায়ুপথ (motor-nerve)-এ শক্তি পরিবহনে কত সময় লাগে তাহা লইয়া গবেষণা করেন এবং পরে অন্তর্মুখী স্নায়ু লইয়াও আলোচনা করেন।

ভুণ্ড্‌টের গবেষণাগারেও এবিষয় পরীক্ষণ চালান হয়। এই বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করেন ক্যাটেল্ (Cattell) ও ডোলি (Dolley)।

জলিয়া উঠিবে এবং পরীক্ষণ-পাত্র উহা দর্শনমাত্র প্রতিক্রিয়া করিবেন (অর্থাৎ অঙ্গুলি তুলিয়া লইবেন)। এরূপ ব্যবস্থা থাকে যে, আলোকের 'যোজক' (key) টিপিবামাত্র সময়-পরিমাপক একটি কালদৃক্ যন্ত্র (chronoscope) চলিতে থাকিবে এবং পরীক্ষণ-পাত্র তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট যোজক হইতে অঙ্গুলি তুলিয়া লইবামাত্র সময়-পরিমাপক যন্ত্রটি থামিয়া যাইবে। সুতরাং কালদৃকের সাহায্যে পরীক্ষক প্রতিক্রিয়া-কাল পরিমাপ করিতে পারেন। (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।
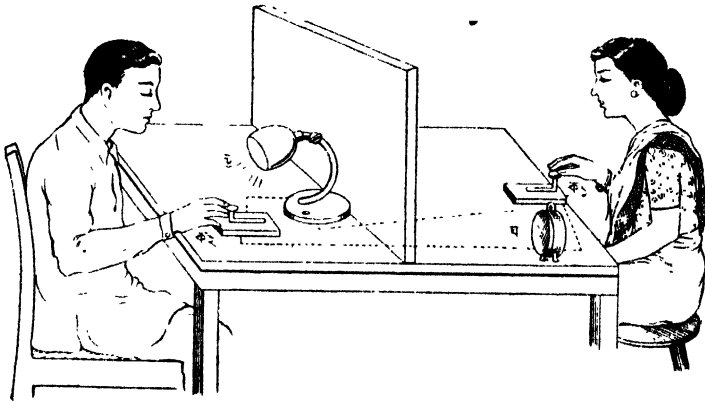
১নং চিত্র

প্রতিক্রিয়া-কাল সম্বন্ধে পরীক্ষণ।

$ক_1$ = উদ্দীপক প্রদানকারীর যোজক (key);
$ক_2$ = প্রতিক্রিয়াকারীর যোজক;
উ = উদ্দীপক;
ঘ = কালদৃক্ যন্ত্র বা বিরাম ঘড়ি।

সময় পরিমাপের জন্য সাধারণ বিরাম-ঘড়ি (stop-watch) অথবা বৈদ্যুতিক কালদৃক্ ব্যবহার করা যাইতে পারে।[৩] বিরাম-ঘড়িতে সময় মাপিবার একক হইল $\frac{১}{৫}$ সেকেণ্ড এবং কালদৃক্ যন্ত্রের একক হইল '০০১ সেকেণ্ড বা $\frac{১}{১০০০}$ সেকেণ্ড। পাশ্চাত্ত্য লেখকেরা কালদৃক্-যন্ত্র-নির্দিষ্ট 'একক'-কে অর্থাৎ '০০১ সেকেণ্ড-কে '1σ'-দ্বারা প্রকাশ করেন। তবে এই চিহ্ন পরিসংখ্যান বিজ্ঞানেও ব্যবহৃত হয় বলিয়া অনেক আধুনিক লেখক কাল-

৩ সাধারণতঃ Hipp Chronoscope, Bergstorm Chronoscope এবং Dunlop Chronoscope ব্যবহার করা হয়।

দৃকের একক-কে **মিলিসেকেণ্ড** (millisecond, সংক্ষেপে ms.) বলেন—
১ মিলিসেকেণ্ড='০০১ সেকেণ্ড এবং ১০০ মিলিসেকেণ্ড='১০০ সেকেণ্ড।

(৪) প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষা (Different kinds of reaction test) :

আমরা উপরে প্রতিক্রিয়া-কাল সম্বন্ধীয় যে পরীক্ষার কথা বলিলাম, উহা হইল **'সরল প্রতিক্রিয়া'** (**simple reaction**) সম্বন্ধীয় পরীক্ষা।

ইহা ব্যতীত আরও কয়েক প্রকারের পরীক্ষা হইতে পারে। ইহাদের **জটিল বা যৌগিক প্রতিক্রিয়া** (Compound Reaction)-সম্বন্ধীয় পরীক্ষণ বলা হয়।

(ক) **'বিনিশ্চয়তা প্রতিক্রিয়া'** (**Discrimination Reaction**) **:** পরীক্ষণ-পাত্রকে দুইটি উদ্দীপক (যথা, দুইটি বিভিন্ন রঙের আলোক) পর পর দেখান হয় এবং তাঁহাকে বলা হয় যে, তিনি যেন একটি উদ্দীপকের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া করেন এবং অপরটির ক্ষেত্রে কিছু না করেন।

(খ) **'নির্বাচন প্রতিক্রিয়া'** (Choice Reaction) **:** পরীক্ষণ-পাত্রের সম্মুখে দুইটি 'যোজক' (key) থাকে এবং প্রতি হস্তের একটি আঙ্গুলি দ্বারা এক একটি যোজককে চাপিয়া রাখিতে বলা হয়। তাহার পর তাঁহাকে দুইটি পৃথক্ উদ্দীপক (যেমন, লাল ও সবুজ রঙের আলোক) প্রদান করা হয় এবং নির্দেশ দেওয়া হয় যে, একটি উদ্দীপকের ক্ষেত্রে (যেমন, লাল আলো দেখিলে) দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া এবং অপর উদ্দীপক (যেমন, সবুজ আলো দেখিলে) বাম হস্ত তুলিয়া তিনি যেন প্রতিক্রিয়া করেন।

(গ) **অনুষঙ্গ প্রতিক্রিয়া** (Associative Reaction) **:** পরীক্ষণ-পাত্রকে কোন একটি বিশেষ পদ (word) দেখাইয়া উহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে যে কোন পদ বা সমার্থক পদ বা বিপরীত পদ অথবা **অন্য** কোন বিশেষ পদ বলিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। (পৃঃ ৩০৮ ও ৩৪৬ দ্রষ্টব্য)।

২। ক্যাটেল্-পরিচালিত পরীক্ষণ (Cattell's Experiments) :

(ক) সরল প্রতিক্রিয়া-কালের তারতম্য :

প্রতিক্রিয়া-কাল সম্বন্ধে ক্যাটেল্ এবং তাঁহার সহকর্মিগণ বিবিধ পরীক্ষণ চালাইয়াছিলেন। তাঁহারা সরল প্রতিক্রিয়া-কালের পার্থক্য কিভাবে এবং কেন ঘটে তাহা লইয়া অনুসন্ধান করেন। আমরা পূর্বেই (পৃঃ ৩৩৯-৪০) লক্ষ্য করিয়াছি যে, নানা কারণে প্রতিক্রিয়া-কালের তারতম্য ঘটিতে

পারে। আমরা বর্তমান অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে ক্যাটেল্-পরিচালিত পরীক্ষণের ফলাফল উল্লেখ করিব :

(১) **উদ্দীপিত ইন্দ্রিয় (sense-organ)-এর পার্থক্য অনুসারে প্রতিক্রিয়া-কালের তারতম্য ঘটে।** ক্যাটেল্ ও তাঁহার সম্প্রদায় এই বিষয়ে পরীক্ষণের ফলে নিম্নলিখিত পার্থক্য লক্ষ্য করেন :

উদ্দীপিত ইন্দ্রিয়		প্রতিক্রিয়া-কাল (মিলিসেকেণ্ডে প্রদত্ত)
	চক্ষু	১৫০—২০০
	কর্ণ	১২০—১৬০
	জিহ্বা	৩০০—১,০০০
	নাসিকা	২০০—৮০০
চর্ম	ব্যথন-বিন্দু	৪০০—১,০০০
চর্ম	স্পর্শ-বিন্দু	১১০—১৬০
চর্ম	শৈত্য	১৫০
চর্ম	উত্তাপ	১৮০

(২) **উদ্দীপকের তীক্ষ্ণতা (intensity), উদ্দীপনের স্থায়িত্ব ও ব্যাপকতা অনুসারে প্রতিক্রিয়া-কালের পার্থক্য ঘটে।** ক্যাটেলের নির্দেশে ফ্রোয়েবের্গ (Froeberg) বিভিন্ন পরিমাণের তীব্রতা বা তীক্ষ্ণতা বিশিষ্ট আলোক লইয়া পরীক্ষণ করিয়া দেখেন যে, উদ্দীপকের তীক্ষ্ণতা কমিতে থাকিলে প্রতিক্রিয়া-কাল বাড়িতে থাকে, কিন্তু অতি ধীরে ধীরে। তাঁহাদের পরীক্ষার ফলাফল এইরূপ :

মাঝারি উজ্জ্বলতাবিশিষ্ট আলোকের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া-কাল ১৯১ মিলি সেঃ
উহার $\frac{1}{2}$ „ „ „ „ ১৯১+৩ „ „
উহার $\frac{1}{10}$ „ „ „ „ ১৯১+১৭ „ „

শব্দের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, শব্দের তীক্ষ্ণতা কমিবার সহিত সমান হারে প্রতিক্রিয়া-কাল ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে।

(৩) **প্ররোচক, শান্তি, মাদকদ্রব্য সেবন, বয়সের প্রভাব ইত্যাদি কারণে প্রতিক্রিয়া-কালের পার্থক্য ঘটে।**

সুখ্যাতি, উৎসাহ ইত্যাদির ফলে প্রতিক্রিয়া-কাল প্রায় ৮ মিলি সেকেণ্ড বাড়িয়া যায়। শাস্তির ভয় দেখাইলে (যেমন, ঠিক সময়ের ভিতর প্রতিক্রিয়া করিতে না পারিলে 'ইলেক্ট্রিক শক্' দেওয়া হইবে) প্রতিক্রিয়া-কাল প্রায় ২০ মিঃ সেঃ দ্রুততর হইবে। চা, কফি, এবং অল্প পরিমাণ মদ্য প্রতিক্রিয়া-কাল কমাইয়া দেয়। শৈশব ও বার্ধক্যের তারতম্যে প্রতিক্রিয়ার তারতম্য ঘটে।

(৪) **সাধন** (practice), **মনোযোগ** (attention), **বিক্ষেপ** (distraction) **এবং ক্লান্তির** (fatigue) **ফলে প্রতিক্রিয়া-কালের তারতম্য ঘটে।**

কোন বিশেষ প্রকারের প্রতিক্রিয়া শিক্ষা করিবার প্রাক্কালে যে প্রতি-ক্রিয়া-কাল থাকে, সাধনের ফলে তাহা কমিয়া যায়; তবে একবার অভ্যস্ত হইয়া যাইলে সাধনের ফলে আর কোন তারতম্য ঘটে না।

অভ্যস্ত প্রতিক্রিয়ার উপর ক্লান্তির বিশেষ প্রভাব নাই। ক্যাটেল্ এক পরীক্ষণ-পাত্রকে দিয়া সমস্ত দিন প্রতিক্রিয়া করাইয়াও প্রতিক্রিয়া-কালের বিশেষ পরিবর্তন ঘটাইতে পারেন নাই।

বিবিধ প্রকার মানসিক বিক্ষেপের ফলে প্রতিক্রিয়া-কাল বাড়িয়া যাইতে পারে। দেখা গিয়াছে যে, প্রতিক্রিয়া কালে মেট্রোনোম্ বাজাইয়া শব্দ করিলে প্রতিক্রিয়া-কাল ২ হইতে ১০ মিলি সেঃ বাড়িয়া যায়। প্রতিক্রিয়া-কালে পরীক্ষণ-পাত্রকে মনে মনে দুই বা ততোধিক সংখ্যা যোগ দিতে বলিলে প্রতিক্রিয়া-কাল প্রায় ২০ হইতে ৩০ মিলি সেঃ বাড়িয়া যায়। সেইরূপ মনোযোগের পার্থক্য অনুসারে প্রতিক্রিয়ার তারতম্য ঘটে।

(৫) **প্রতিক্রিয়া-পূর্ব কালের তারতম্য অনুসারে প্রতিক্রিয়া কালের তারতম্য ঘটে।** প্রতিক্রিয়া-পূর্ব কাল (foreperiod) বলিতে বুঝায় পরীক্ষক পরীক্ষণ-পাত্রকে 'প্রস্তুত' থাকিতে যখন নির্দেশ দেন (যেমন, 'Ready' বা অনুরূপ কিছু বলেন) তখন হইতে প্রতিক্রিয়া আরম্ভের মুহূর্ত পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান। যখন প্রতিক্রিয়া-পূর্ব কাল নিতান্ত কম থাকে (যেমন, ১ সেকেণ্ড), তখন উপযুক্ত প্রস্তুতির অভাবে প্রতিক্রিয়া-কাল বিলম্বিত হইতে পারে; আবার যখন উহা 'অত্যন্ত দীর্ঘ' (প্রায় ১০ সেকেণ্ড) হয়, তখন প্রস্তুতির প্রভাব কাটিয়া যায় এবং ফলে প্রতিক্রিয়া-কাল বিলম্বিত হইতে পারে।

(খ) প্রতিক্রিয়া-কালের উপর প্রতিন্যাস (attitude)-এর ফল :

পরীক্ষণ-পাত্রের মনোযোগের বিষয়-বস্তুর তারতম্য অনুসারে প্রতিক্রিয়াকালের তারতম্য ঘটিতে পারে কি না সে সম্বন্ধেও ক্যাটেল্ পরীক্ষণ চালাইয়া ছিলেন। এ ক্ষেত্রে মনোযোগের বিষয়-বস্তুটি হইতে পারে উদ্দীপক অথবা প্রতিক্রিয়া।

ক্যাটেলের পরীক্ষণের পূর্বে কেহ কেহ মনে করিতেন যে, যদি পরীক্ষণ-পাত্র উদ্দীপকের উপর মনঃসংযোগ করেন, তাহা হইলে প্রতিক্রিয়া-কাল বিলম্বিত হইবে; কিন্তু তিনি যদি যে বিশেষ অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া প্রতিক্রিয়া করিতে হইবে তাহার উপর মনঃসংযোগ করেন তাহা হইলে প্রতিক্রিয়া-কাল অপেক্ষাকৃত দ্রুত হইবে। মনোবিৎ লাঙ্গে (Lange) এই মত পোষণ করিতেন—তিনি প্রথমটিকে 'সংবেদন-জাত প্রতিক্রিয়া' (sensorial reaction) এবং দ্বিতীয়টিকে 'পেশী-সম্বন্ধীয় প্রতিক্রিয়া' (muscular reaction) বলিতেন।

লাঙ্গের এই মতবাদকে বল্ড্উইন্ (Baldwin) ইত্যাদি পরিহার করেন। বল্ডউইন্ ইত্যাদি বলিতেন যে, ব্যক্তিত্বের প্রকারভেদ আছে—একদল সংবেদন-জাতিরূপের (sensorial type) অন্তর্ভুক্ত এবং অপরদল ক্রিয়াশীল-জাতিরূপের (motor type) অন্তর্ভুক্ত। যে সকল পরীক্ষণ-পাত্র প্রথম দলভুক্ত তাঁহারা উদ্দীপকের উপর মনঃসংযোগ করিলে প্রতিক্রিয়া অপেক্ষাকৃত দ্রুত হইবে; যাঁহারা দ্বিতীয় দলভুক্ত, তাঁহারা যদি প্রতিক্রিয়ারূপ কার্যটির উপর মনোযোগ দেন, তাহা হইলে প্রতিক্রিয়া দ্রুততর হইবে।

ক্যাটেল্ এই দুই প্রকার মতবাদই পরিত্যাগ করেন। তিনি পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখেন যে, অভ্যস্ত পরীক্ষণ-পাত্রদের ক্ষেত্রে সংবেদনজ এবং পেশীজ প্রতিক্রিয়ার মধ্যে প্রতিক্রিয়া-কালের কোন প্রভেদ ঘটে না। যাঁহারা নূতন প্রতিক্রিয়ার অভ্যাস করেন, তাঁহারা সংবেদন অথবা পেশীর ক্রিয়া কোন্‌টির উপর মনঃসংযোগ করিবেন, তাহা নির্ভর করে পরীক্ষকের নির্দেশের উপর এবং পরীক্ষণ-পাত্রের পূর্বতন শিক্ষার উপর।

(গ) প্রতিক্রিয়া-পদ্ধতির ব্যাখ্যা :

প্রতিক্রিয়া কিভাবে সাধিত হয়, তাহাকে ব্যাখ্যা করিয়া ক্যাটেল্ যে মত দিয়াছিলেন তাহার সহিত ভুণ্ড্টের মতের পার্থক্য আছে।

ভুণ্ড্ট্ বলেন যে, সমগ্র প্রতিক্রিয়াটিকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, উহা তিনটি অবস্থান্তরের মধ্য দিয়া যায় :

(১) উদ্দীপকের প্রত্যক্ষ, (২) সংপ্রত্যক্ষ (apperception), অর্থাৎ উদ্দীপকের প্রত্যভিজ্ঞা (recognition), এবং (৩) ইচ্ছা (will)।

ক্যাটেল্ বলেন যে, এই বিশ্লেষণ মনোবিদ্যার দৃষ্টি হইতে যথাযথ নহে। তাঁহার মতে সংপ্রত্যক্ষ বা প্রত্যভিজ্ঞা আসে প্রতিক্রিয়ার পরে এবং ইচ্ছা থাকে প্রতিক্রিয়ার পূর্বে (যখন প্রতিক্রিয়ার জন্য প্রস্তুতি—'set' বা preparation—চলে)। সুতরাং ভুণ্ড্ট্ এই দুইটিকে প্রতিক্রিয়া-প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করিয়া ভুল করিয়াছেন, ইহাই ক্যাটেলের অভিমত।[৪]

(ঘ) অনুষঙ্গ প্রতিক্রিয়া (Associative Reaction):

অনুষঙ্গ প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া ক্যাটেল্ বহু মূল্যবান্ তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন।

(১) তিনি একটি পদ্ধতিতে কোন বস্তুর 'সমগ্রত্ব'-জ্ঞাপক শব্দ দিয়া উহার কোন 'অংশ'-জ্ঞাপক শব্দ 'প্রতিক্রিয়া' হিসাবে পরীক্ষণ-পাত্রকে বলিতে নির্দেশ দিতেন এবং উহার বিপরীত পদ্ধতিও (অর্থাৎ, অংশ→সমগ্র) অবলম্বন করিতেন, এবং পরে এই উভয় প্রকার পদ্ধতির ফলাফলের তুলনা করিতেন। যথা :—

'সমগ্র' হইতে 'অংশ' :

'ঘর' → 'দরজা', 'পেন্সিল' → 'সিস্' বা সিসা (lead) ইত্যাদি,

'অংশ' হইতে 'সমগ্র' :

'ছাত' → 'বাড়ী' ; 'চাকা' → 'গাড়ী'।

ক্যাটেল্ লক্ষ্য করেন যে, 'সমগ্র' হইতে 'অংশ'-এ যাইবার জন্য যে সময়ের প্রয়োজন হয়, তাহা 'অংশ' হইতে 'সমগ্র'-এ যাইবার জন্য যে সময়ের প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা কম।

অন্য কতকগুলি পরীক্ষণ করিয়া ক্যাটেল্ দেখেন যে, পৃথক্‌ভাবে একটি মাত্র শব্দ উদ্দীপকভাবে প্রদত্ত হইলে প্রতিক্রিয়া-কাল হইবে ৩৬০ মিঃ সেঃ, কিন্তু

৪ ভুণ্ড্টের শিষ্য টিচেনার (Titchener) সমগ্র প্রতিক্রিয়া-কালকে তিনটি অংশে বিভক্ত করিয়াছেন : (ক) প্রতিক্রিয়া-পূর্ব কাল (fore-period), (খ) প্রতিক্রিয়াকালীন সময় বা, মধ্যবর্তী কাল (mid-period) এবং (গ) প্রতিক্রিয়া-উত্তর কাল (after-period)। (*Text book of Psychology*, পৃ: ৪৩৪ দ্রষ্টব্য)।

সারিবদ্ধভাবে কতকগুলি অর্থপূর্ণ শব্দ একসঙ্গে দিলে প্রতিটি শব্দের প্রতিক্রিয়া-কাল কমিয়া গড়ে মাত্র ২০০ মিলি সেকেণ্ড দাঁড়ায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শেষোক্ত ক্ষেত্রে ব্যক্তি-বিশেষের সমগ্র প্রতিক্রিয়া-কাল বিভিন্ন শব্দের প্রতিক্রিয়া-কালের সমষ্টিমাত্র নহে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে ব্যক্তি-বিশেষ ভিন্ন ভিন্ন শব্দগুলিকে একত্রে একটি 'বৃহত্তর সমন্বয়' বলিয়া মনে করে। ইহা হইতে ক্যাটেল্ অনুমান করেন যে, আমরা যখন কোন কিছু পড়িতে থাকি তখন সমগ্র বাক্যটি আমাদের মনের উপর রেখাপাত করে এবং আমরা কোন বাক্যকে পৃথক্ পৃথক্ পদে ভাগ করিয়া পৃথক্ ভাবে উহাদের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করি না।

৩। প্রতিক্রিয়া-কাল সম্বন্ধীয় পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলের প্রয়োগ (Applications of the results of Reaction-Time Experiments) :

বাস্তবক্ষেত্রে (practical field-এ) আমাদের সম্ভাব্য ব্যবহারের রূপ কী হইতে পারে, তাহা নির্ধারণের জন্য আমরা নানাভাবে প্রতিক্রিয়া-কাল সম্বন্ধীয় পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলের ব্যবহার করিতে পারি।

(১) প্রতিক্রিয়া-কাল-সম্বন্ধীয় পরীক্ষণের সাহায্যে আমরা

(ক) **কার্য-বিশেষের কাঠিন্য** (difficulty)

অথবা (খ) বিবিধ অবস্থার মধ্যে **ব্যক্তি-বিশেষের দক্ষতা** (efficiency) নির্ধারণের চেষ্টা করি।

(২) ঐ পরীক্ষণের সাহায্যে আমরা **ব্যক্তি-বিশেষের ব্যবহারের তারতম্য** বা **ব্যক্তিগত পার্থক্য** (individual difference) নিরূপণ করিবার চেষ্টা করি।

(ক) আমরা বিভিন্ন ব্যক্তিকে একই অবস্থার মধ্যে পর্যবেক্ষণ করিতে পারি, অথবা (খ) আমরা একই ব্যক্তিকে বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে পর্যবেক্ষণ করিতে পারি।

(৩) ইহার সাহায্যে আবার আমরা **সাধারণ কার্য সম্পন্ন** করার গতির সহিত **যে সব কার্যে বুদ্ধির প্রয়োজন** সেইগুলি সম্পন্ন করার গতির **তুলনা** করি।

(৪) **অভ্যাস (habit), সাধন (practice) ও পরিচিতি (familiarity) কিভাবে ব্যক্তিবিশেষের কার্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তাহা নিরূপণের আমরা চেষ্টা করি।**

এই সকল পরীক্ষণের ফলাফল বৃত্তি-নির্বাচন (vocational selection) এবং প্রবণতা বা অনুরাগ (aptitude)-এর নিদান (diagnosis) স্থির করায় আমাদের সাহায্য করে। এমন অনেক কার্য আছে যাহাতে ত্বরিত গতিতে কার্য করার বিশেষ প্রয়োজন হয়। যেমন, মোটর গাড়ী চালকের প্রতিক্রিয়া-কাল দীর্ঘ হইলে অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে। গাড়ী চালাইতে চালাইতে হঠাৎ লাল আলোর সঙ্কেত পাইলে তৎক্ষণাৎ গাড়ী থামান প্রয়োজন; আবার চলন্ত গাড়ীর সম্মুখে কোন লোক বা অন্য কোন গাড়ী পড়িলে গাড়ীর গতি পরিবর্তন করা বা গাড়ী থামান আবশ্যক হইতে পারে। এই সব ক্ষেত্রে দ্রুত প্রতিক্রিয়া করা প্রয়োজন; অতএব এই সকল কার্যের জন্য লোক নির্বাচনের সময় তাহাদের প্রতিক্রিয়া-কাল পরীক্ষা করিলে তাহাদের যোগ্যতা বুঝা যায়। দেখা গিয়াছে যে, যে-সব লোকের প্রতিক্রিয়া-কাল অতি অল্প বা অত্যন্ত বেশী (অর্থাৎ, যাহারা খুব তাড়াতাড়ি প্রতিক্রিয়া করে বা প্রতিক্রিয়া করিতে খুব দেরী করে) তাহারাই সাধারণতঃ দুর্ঘটনার মধ্যে জড়াইয়া পড়ে।

যুদ্ধের সময় লোক নির্বাচনের ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধীয় পরীক্ষার ফল (বিশেষতঃ বিনিশ্চয়তা বা discrimination-প্রতিক্রিয়ার পরীক্ষার ফল) বিশেষ সহায়তা করে।

অনুষঙ্গ (association) সম্বন্ধে পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফল শিক্ষার ক্ষেত্রে আলোকপাত করে। এই বিষয়ে পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, আমরা 'সমগ্র' হইতে 'অংশে'র কথা অতি দ্রুত চিন্তা করি, কিন্তু 'অংশ' হইতে 'সমগ্র' সম্বন্ধে সেইরূপ দ্রুততার সহিত যাইতে পারি না। তাহা ছাড়া, আমরা 'সমগ্র পদ' বা 'সমগ্র বাক্যে'র উপর প্রতিক্রিয়া করি—উহাদের বিশ্লেষণ করিয়া অগ্রসর হই না (পৃঃ ৩৪৬ দ্রষ্টব্য)। ইহার আলোকে আমরা বুঝিতে পারি যে, শিশুদের যখন মাতৃভাষা ব্যতীত কোন নূতন ভাষা শিখান হয়, তখন প্রথমে অক্ষর, পরে পদ, এবং তাহার পর বাক্য

শিখানর যে পদ্ধতি সাধারণতঃ অনুধাবন করা হয়, তাহাতে ভাষা আয়ত্ত করিবার জন্য সময় বেশী লাগে[৫]; কিন্তু ইহার পরিবর্তে আমরা যদি 'স্বাভাবিক পদ্ধতি' (natural method) অনুধাবন করি, অর্থাৎ যদি কথাবার্তার মাধ্যমে তাহাদের সমগ্র বাক্য আয়ত্ত করাইতে সাহায্য করি, তাহা হইলে সহজেই তাহারা ভাষা শিখিতে পারিবে। শিশু তাহার মাতৃভাষা এই ভাবেই প্রথমাবস্থায় আয়ত্ত করে।

৪। সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া—প্যাভ্‌লভ্‌-অনুসৃত পদ্ধতি (Conditioned Reflex—Pavlov's Method):

আমরা এ পর্যন্ত সাধারণ প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম। এইবার আমরা প্রতিবর্ত প্রতিক্রিয়া এবং উহার সাপেক্ষীকরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

(ক) প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Simple Reflex):

বাহ্য উদ্দীপকের প্রয়োগমাত্র যখন আমাদের দেহ স্বতঃক্রিয়ভাবে প্রতিক্রিয়া করে, অর্থাৎ ঐ প্রতিক্রিয়া যখন আমাদের ইচ্ছাধীন থাকে না, তখন ঐরূপ প্রতিক্রিয়াকে **প্রতিবর্ত ক্রিয়া** (Reflex action) বলা হয়। এইরূপ কার্যের সময় ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে উদ্দীপন অন্তর্মুখী স্নায়ুপথে সুষুম্নাকাণ্ডের ধূসর পদার্থের পশ্চাদ্‌বর্তী অংশ দিয়া প্রবেশ করিয়া সম্মুখবর্তী অংশে পৌছে এবং তথা হইতে বহির্মুখী স্নায়ুপথে পেশীতে ক্রিয়াশক্তি পৌছে। এইভাবে যে পথ রচিত হয়, তাহাকে 'প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ' (reflex arc) বলে। (বিস্তারিত বিবরণের জন্য পৃঃ ১৫৯ ও ৮ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

প্রতিবর্ত ক্রিয়া বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, উহাতে একটি উদ্দীপকের সহিত কোন ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ ঘটে এবং তাহার ফলে তদুপযুক্ত প্রতিক্রিয়া ঘটে। এরূপ কোন ক্ষেত্রে এক একটি উদ্দীপক এক এক প্রকারের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে; যেমন, আলোক উদ্দীপন কেবলমাত্র চক্ষুর উপরই কার্য করে

---

৫ যেমন, আমাদের দেশে বালক-বালিকাদের ইংরেজী শিখানর সময় আমরা তাহাদের প্রথমে a, b, c, তাহার পর bla-ব্লে, cla-ক্লে, তাহার পর f a t-ফ্যাট, m a n-ম্যান, r a n-র‍্যান, তাহার পর A fat man ran (একটি মোটা লোক দৌড়াইয়াছিল)......এইভাবে শিখাই এবং অযথা তাহাদের সময় ও শক্তি নষ্ট করি।

এবং একমাত্র চক্ষুর উপরেই হঠাৎ তীব্র আলোক পড়িলে চক্ষু মুদিত হয়—অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের উপর উহা ঐভাবে কার্য করে না।

(খ) সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Conditioned Reflex) :

কোন বিশেষ প্রতিক্রিয়ার জন্য যে বিশেষ উদ্দীপকের প্রয়োজন হয় তাহার পরিবর্তে তাহার সহিত অনুষঙ্গবদ্ধ কোন বিকল্প উদ্দীপক দ্বারা একই প্রকার প্রতিক্রিয়া হয় কি না, তাহা অনুসন্ধান করাই ছিল পাভ্‌লভের আলোচনার বিষয়বস্তু। তিনি এইজন্য প্রধানতঃ কুকুরের উপর এক বিশেষ প্রকারের পরীক্ষণ চালাইতে থাকেন (পৃঃ ১০০ দ্রষ্টব্য)। তিনি কুকুরকে তাহার আহার্য দিবার ঠিক পূর্বে ঘণ্টা বাজাইতে থাকেন। কয়েকদিন এই-রূপ হইবার পর দেখা গেল যে, ঘণ্টার শব্দ শুনিবামাত্র কুকুরের লালা নিঃসরণ হইতেছে, অর্থাৎ আহার্য দর্শনে ও ঘ্রাণে যেরূপ প্রতিক্রিয়া হয়, শব্দ শুনিবামাত্রও সেইরূপ প্রতিক্রিয়া হইতে লাগিল। সুতরাং ঘণ্টার শব্দ 'বিকল্প উদ্দীপক' (substitute stimulus) ভাবে কার্য করিতে লাগিল।

সমগ্র পরিস্থিতিটি সংক্ষেপে এইভাবে ব্যক্ত করা যায় :

উদ্দীপক	... ...	প্রতিক্রিয়া
(১) দুইটি নিরপেক্ষ বা স্বাধীন উদ্দীপক—		
(ক) খাদ্য বা আহার্য দর্শন বা ঘ্রাণ	...	লালানিঃসরণ
(খ) শব্দ শুনা	...	কান খাড়া করা, সচকিত হইয়া উঠা, ইত্যাদি
(২) অনুষঙ্গ-বদ্ধ অবস্থায় দুইটি উদ্দীপকের প্রয়োগ—		
{ (ক) শব্দ[৬] (খ) খাদ্য	...	লালানিঃসরণ

৬ তুলনীয় : "......stable conditioned reflexes can be elaborated only when the conditioned stimulus precedes the 'unconditioned stimulus'." (*Text-book of Physiology*, Ed. by K. M. Bykov, p. 607).

(৩) সাপেক্ষ উদ্দীপক বা

বিকল্প উদ্দীপক—

শব্দ ... ... লালানিঃসরণ

লালানিঃসরণ সম্বন্ধে কুকুরের উপর প্রযুক্ত একটি পরীক্ষণের ফল এইরূপ। যেমন, ৯ বার ঘণ্টাধ্বনি করা এবং তাহার পর খাবার দেওয়ার ফলে দেখা গেল যে, কেবলমাত্র ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়াই ৩০ সেকেণ্ডে ১৮ ফোঁটা (drops) লালা নিঃসরণ হইতেছে। সমগ্র পরীক্ষণটির ফল নিম্নে প্রদত্ত হইল :

ঘণ্টাধ্বনি করা এবং তাহার পরেই খাবার দেওয়া কয়বার হইয়াছে ?	ঐ দুই উদ্দীপক একত্র প্রয়োগের পর কেবলমাত্র সাপেক্ষ উদ্দীপক বা ঘণ্টা-ধ্বনি শুনিয়াই ৩০ সেকেণ্ডে কয় ফোঁটা লালা নিঃসরণ হইয়াছে ?
১	০
৯	১৮
১৫	৩০
৩১	৬৫
৪১	৬৪
৫১	৬৯

(গ) **সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া-সম্বন্ধীয় পরীক্ষণ কিভাবে সাধিত হয় ?**

সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষণ কার্য চালাইবার জন্য শব্দ-প্রতিরোধক কক্ষ (sound-proof chamber)[৭]-এ পরীক্ষণ চালান বাঞ্ছনীয়। তাহা ছাড়া, পরীক্ষকও পরীক্ষণ-পাত্রের (যথা, কুকুরটির) অলক্ষ্যে থাকিয়া উদ্দীপক প্রয়োগ করিতে পারিলে ভাল হয়। সুতরাং যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিবিধ বিকল্প উদ্দীপক (যথা,

৭ রাশিয়ার লেনিনগ্রাডে Institute of Experimental Medicine-এর যে শব্দ-প্রতিরোধক গৃহে পাভলভ (Pavlov) ও গ্রাম্প্কে (Grampke) পরীক্ষা কার্য চালাইতেন, তাহা *Tower of Silence* নামে অভিহিত।

আলোক-প্রদান, ঘণ্টা বাজান ইত্যাদি) প্রয়োগ করা যাইতে পারে। গণ্ডদেশে একটি ছিদ্র করিয়া উহার মধ্য দিয়া একটি নলের এক মুখ পারোটিড্ (parotid) গ্রন্থির সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয় এবং অপর মুখটি একটি বাল্‌ব বা কাঁচের শিশির সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। ঐ শিশিটি তাহার গণ্ডদেশ হইতে ঝুলিতে থাকে; শিশুটি আবার অপর একটি নল দ্বারা একটি মাপযন্ত্র (manometer)-এর সহিত যুক্ত থাকে। মাপযন্ত্র ব্যবহার না করিয়া গতিলিখ্‌ যন্ত্র (kymograph)-ও ব্যবহৃত হইতে পারে। (২নং চিত্র দ্রষ্টব্য)
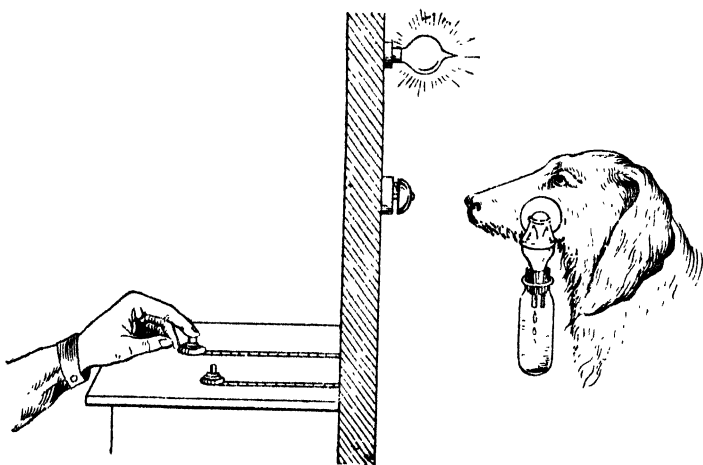
২নং চিত্র। সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া সম্বন্ধীয় পরীক্ষণাধীন একটি কুকুর।

উপরের চিত্রে দেখা যাইতেছে সাপেক্ষীকরণের পরবর্তী অবস্থায় কেবলমাত্র আলোকরূপ বিকল্প উদ্দীপক প্রত্যক্ষ করিয়া কুকুরের লালানিঃসরণ হইতেছে।

স্বাভাবিক উদ্দীপক (natural stimulus) হিসাবে নানারকম খাদ্য, যথা—রুটির গুঁড়া, মাংসের টুকরা ইত্যাদি সাধারণতঃ ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

৮ পাভ্‌লভ্‌ ও তাঁহার সহকর্মিবৃন্দ বহুবিধ উদ্দীপকই বিকল্প উদ্দীপক হিসাবে ব্যবহার করিতেন। যেমন, ঘ্রাণজ উদ্দীপকের জন্য কর্পূরের গুঁড়া ছাড়িয়া দেওয়া, চাক্ষুষ উদ্দীপকের জন্য বিবিধ অক্ষর ও জ্যামিতিক ক্ষেত্রের ছবি প্রদর্শন, স্পার্শন উদ্দীপনের জন্য দেহের বিশেষ বিশেষ স্থান স্পর্শ করা ইত্যাদি তাঁহারা করিতেন।

পাছে পরীক্ষককে দেখিলে পরীক্ষক স্বয়ং 'বিকল্প উদ্দীপক' গণ্য হইতে পারেন, এইজন্য এক যান্ত্রিক কৌশলের সাহায্যে খাবার দেওয়া হয়।

পাভ্লভ্ কুকুরের লালানিঃসরণ লইয়া বহু গবেষণা চালাইয়াছিলেন; কিন্তু ইহার অর্থ নহে যে, কেবলমাত্র কুকুরের উপরই এই প্রকার পরীক্ষা করা চলে। বিড়াল, ইঁদুর, বানর ইত্যাদি বহুবিধ প্রাণীর উপরই ঐরূপ পরীক্ষা করা চলে। বাস্তবিক সকল জীবের উপরই সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া সম্বন্ধে বিবিধ উপায়ে পরীক্ষা চালান যায়। যেমন, একটি শামুক (snail)-কে খাবার দিবার সময় তাহার পিছন দিক্ চাপিয়া ধরা যাইতে পারে; কিছুদিন এইরূপ করার ফলে তাহার পিছন দিক্ চাপিয়া ধরামাত্র সে মুখ হাঁ করিবে।

(ঘ) সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া স্থাপনার জন্য আবশ্যকীয় 'উপাদান' (Factors affecting establishment of Conditioned Response):

(১) প্রথমেই প্রয়োজন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় (acquisition)। ইহার জন্য সাপেক্ষ উদ্দীপক (conditioned stimulus) এবং নিরপেক্ষ উদ্দীপক (unconditioned stimulus) সম্বন্ধে একত্রে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হইবে। এইজন্য সাপেক্ষ ও নিরপেক্ষ এই দুই প্রকার উদ্দীপক বার বার প্রদত্ত হওয়া প্রয়োজন। অতএব **পৌনঃপুন্যতা** (repetition) একটি আবশ্যকীয় 'উপাদান'।

(২) তাহা ছাড়া, নিরপেক্ষ উদ্দীপক এবং সাপেক্ষ উদ্দীপক এই দুইটির মধ্যে **সন্নিধি** বা **নৈকট্য** (contiguity) প্রয়োজন। দুই প্রকার উদ্দীপকের মধ্যে সময়ের ব্যবধান যত কম হয়, তত শীঘ্র সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়ার অভ্যাস গঠিত হয়। যদি সাপেক্ষ ও নিরপেক্ষ দুই প্রকার উদ্দীপক একই সময় (simultaneously) কয়েকবার প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে সহজেই সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়ার অভ্যাস গঠিত হয়। সাপেক্ষ উদ্দীপক (conditioned stimulus) নিরপেক্ষ উদ্দীপকের অল্প পূর্বে প্রদত্ত হইলেও ঐরূপ ফল পাওয়া যায়। এই সময়ের ব্যবধান ১ সেকেণ্ড হইতে ৫ মিনিট পর্যন্ত হইতে পারে —সময়ের ব্যবধান যত কম হয়, ততই ভাল। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই সাপেক্ষ

উদ্দীপক নিরপেক্ষ উদ্দীপকের পরে প্রদত্ত হইলে কোন ফল পাওয়া যায় না ; যেমন, খাদ্য দেওয়ার পর (এমন কি, ঠিক অব্যবহিত পরেই) ঘণ্টা বাজাইলে শব্দ শুনার ফলে কুকুরের আর লালা নিঃসরণ হইবে না।[৯]

সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া-সম্বন্ধীয় বিবিধ পরীক্ষণের ভিত্তিতে পাভ্‌লভ্‌ যে নীতি প্রবর্তন করেন, তাহাকে বলা হয় **উদ্দীপকের শক্তি-বৃদ্ধি-সম্বন্ধীয় নীতি** (Law of Reinforcement)। ইহাকে মোটামুটি এইভাবে ব্যক্ত করা যায়: "যদি সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার 'সাময়িক নৈকট্যে' (temporal contiguity-তে), অর্থাৎ অল্প সাময়িক ব্যবধানে নিরপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া ঘটে, তাহা হইলে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার শক্তি বৃদ্ধি হয়।"[১০]

(৩) সাপেক্ষ উদ্দীপক এবং নিরপেক্ষ উদ্দীপক কয়েকবার প্রদত্ত হওয়ার ফলে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া **'প্রতিষ্ঠিত'** (established) হয় ; কিন্তু ঐরূপ প্রতিষ্ঠার পরও **যদি নিরপেক্ষ উদ্দীপক ব্যতীত কেবলমাত্র সাপেক্ষ উদ্দীপক প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে পূর্বপ্রতিষ্ঠিত সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার 'বিলোপ'** (extinction) **ঘটে**। যেমন, ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া লালানিঃসরণ রূপ সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার প্রতিষ্ঠার পর যদি শুধুই ঘণ্টা বাজান হয়, কিন্তু কোন খাবার দেওয়া না হয়, তাহা হইলে ক্রমশঃ এরূপ হয় যে, ঘণ্টার শব্দ শুনিলে আর লালা ক্ষরণ হয় না।

ইহার ভিত্তিতে পাভ্‌লভ্‌ তাহার দ্বিতীয় নীতি রচনা করেন। এই নীতিকে বলা হয় **বিলোপ-সম্বন্ধীয় নীতি** (Law of Extinction)। ইহাকে এই ভাবে ব্যক্ত করা চলে: "যদি কোন সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়াকে নিরপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া দ্বারা 'শক্তিশালী' করিয়া না

৯ পাভ্‌লভের সহকর্মী ক্রেস্তোভ্‌নিকভ (Krestovnikov) ১,০০০টি পরীক্ষায় নিরপেক্ষ উদ্দীপকের প্রয়োগের ১ হইতে ৩ সেকেণ্ড পরে সাপেক্ষ উদ্দীপক প্রয়োগ করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার অভ্যাস 'গঠিত' হয় নাই।

১০ পাভ্‌লভের *Law of Reinforcement*-কে ব্যাখ্যা করিয়া Skinner বলিয়াছেন: "The occurrence of an unconditional reflex in temporal contiguity with a conditional reflex increases the strength of the latter."

রাখা হয়, তাহা হইলে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া ক্রমশঃ শক্তিহীন হইয়া পড়ে এবং উহার বিলোপ ঘটে"।[১১]

বিলোপ-সম্বন্ধীয় নীতির আলোকে আমরা বুঝিতে পারি যে, নিরপেক্ষ ও সাপেক্ষ উদ্দীপক উভয়েরই সহ-অবস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয়।

(ঙ) সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার দুইটি বিভিন্ন অবস্থা (Two stages of C. R.): সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার দুইটি বিভিন্ন অবস্থা থাকে—প্রাথমিক এবং পরবর্তী (early and later stages)।

প্রাথমিক অবস্থায় উদ্দীপকের সার্বীকরণ (stimulus generalisation) ঘটে। এই অবস্থায় একই শ্রেণীর বিবিধ উদ্দীপকের মধ্যে সামান্য পার্থক্য থাকিলে ঐ পার্থক্য বুঝিবার ক্ষমতা প্রাণি-বিশেষের থাকে না।

যেমন, ধরা যাউক্ যে, একটি কুকুর প্রতি সেকেণ্ডে ১,০০০ আবর্তের স্বনকম্পাঙ্ক বিশিষ্ট শব্দ (pitch corresponding to 1,000 cycles per second) শুনিয়া লালা নিঃসরণ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে; সুতরাং সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এইরূপ শব্দ শুনিলে তাহার সর্বোচ্চ পরিমাণ লালা নিঃসরণ হয়। কিন্তু এই অবস্থায় যদি সে প্রতি সেকেণ্ডে ৮০০ (এমন কি ৬০০) স্বনকম্পাঙ্কবিশিষ্ট শব্দও শুনে, তাহা হইলেও তাহার লালা নিঃসরণ হইবে।

পরবর্তী অবস্থায় ঐ কুকুর **পার্থক্য বা বিনিশ্চয়তা** (discrimination)-এর **ক্ষমতা আয়ত্ত করে।** পুনঃপুনঃ একটি বিশেষ সাপেক্ষ উদ্দীপকে (যেমন, প্রতি সেকেণ্ডে ১০০০ স্বনকম্পাঙ্ক বিশিষ্ট শব্দে) প্রতিক্রিয়া করার ফলে কুকুরটি ১,০০০ হইতে উহার নিকটবর্তী স্বনকম্পাঙ্ক (যথা, প্রতি সেকেণ্ডে ৯০০, ৯৫০ বা ১০৫০) পৃথক্ করিতে থাকে, অর্থাৎ কেবলমাত্র প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে (বা ১০০০ স্বনকম্পাঙ্কের ক্ষেত্রেই) কুকুরটির লালা নিঃসরণ হইতে থাকে, কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত ক্ষেত্রসমূহে ঐরূপ কিছু হয় না।

আবার স্পার্শন সংবেদনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিনিশ্চিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়। একটি কুকুরের পিছনের পা'র চারিটি জায়গার প্রতি জায়গা স্পর্শ

১১ *Law of Extinction*-এর সূত্র হইল: "If a conditional reflex is elicited without reinforcement by an unconditional reflex, the conditional reflex is weakened or inactivated."

করিবার পরই খাবার দেওয়া হইত; কয়েকবার এইরূপ করার পর সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ ঐ চারিটি জায়গার যে কোন এক জায়গা স্পর্শ করিলেই লালা নিঃসরণ হইত। ঐ চারিটি জায়গার নিকটবর্তী কোন জায়গা স্পর্শ করিলেও প্রথমাবস্থায় লালানিঃসরণ হইত (অথচ কোন খাবার মিলিত না); পরে কিন্তু ঐরূপ নিকটবর্তী স্থান স্পর্শ করিলে আর লালানিঃসরণ হইত না। অর্থাৎ প্রথমে উদ্দীপক-সার্বিকীকরণের ফলে ভুল হইলেও পরে কুকুরটির বিনিশ্চয়তা-বোধ জন্মিল এবং তখন আর ভুল স্থান স্পর্শ করিলে সাঁপেক্ষ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল না।

(চ) পরীক্ষণ-সৃষ্ট উদ্বায়ু (Experimental Neurosis):

আমরা পূর্ব অনুচ্ছেদে দেখিলাম যে, সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর প্রাণি-বিশেষ বিনিশ্চয়তার ক্ষমতা আয়ত্ত করে। যেমন, ৯০০ আবর্তের স্বনকম্পনবিশিষ্ট শব্দ যদি সাপেক্ষ উদ্দীপক হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা হইতে ৯৩০, ৯২০ বা ৯১৫ স্বনকম্পবিশিষ্ট শব্দের পার্থক্য সে করিতে পারে। কিন্তু ঐ ব্যবধান বা পার্থক্য যদি অতি সূক্ষ্ম বা অল্প হয়, তাহা হইলে প্রাণি-বিশেষের ঐরূপ পার্থক্যের ক্ষমতা আর থাকে না। তাহার উপর ঐরূপ অবস্থায় উদ্বায়ুরোগ (neurosis)-এর ন্যায় একটা 'উন্মত্ত'-অবস্থার সৃষ্টি হয়। যেমন, ৯০০ স্বনকম্পনে লালানিঃসরণরূপ প্রতিক্রিয়া স্থাপিত হইলে ৮৯৮ বা ৯০২ স্বনকম্পের উদ্দীপক প্রয়োগ করিলে প্রাণি-বিশেষ কিছুই ঠিক করিতে পারে না। তখন আবার এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, যে কোন উদ্দীপকের প্রয়োগেই লালা নিঃসরণ হইতে থাকে।

পাভ্‌লভ এবং তাঁহার ছাত্র ক্রেস্টোভ্‌নিকোভ আর একটি অনুরূপ পরীক্ষণ করেন। একটি কালো পর্দার উপর পূর্ণবৃত্তাকারের একটি আলোক দেখাইবার পর একটি কুকুরকে আহার্য দেওয়া হইত। কয়েকবার এইরূপ করিবার পর ঐরূপ আলোক সাপেক্ষ উদ্দীপক হিসাবে কার্য করিতে লাগিল। ঐরূপ উদ্দীপকের সহিত একটি উপবৃত্তও (ellipse) 'নঙর্থক উদ্দীপক' (negative stimulus) হিসাবে দেখান হইত, অর্থাৎ উহার সহিত কোন আহার্য প্রদান করা হইত না। কুকুরটিও বৃত্ত এবং উপবৃত্তের মধ্যে পার্থক্য করিতে পারিত। ক্রমশঃ ক্রমশঃ ঐ উপবৃত্তের

পরিধি এরূপ পরিবর্তিত করা হইতে লাগিল যে, উহা প্রায় সম্পূর্ণ বৃত্তের ন্যায় আকার প্রাপ্ত হইল। তখন ঐ কুকুরটির সম্পূর্ণ বৃত্ত এবং প্রায় পূর্ণাকার বৃত্তের মধ্যে আর বিনিশ্চয়তা-বোধ (sense of discrimination) রহিল না। ফলে কুকুরটি ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল—সে চীৎকার করিতে লাগিল, পরীক্ষণাগারে তাহার বন্ধনরজ্জু ছিঁড়িয়া ফেলিল, টেবিল হইতে লাফাইয়া পড়িল; মোট কথা, কুকুরটি যেন 'উদ্বায়ু রোগাক্রান্ত' হইয়া উঠিল এবং পরীক্ষণের অনুপযুক্ত হইয়া গেল।

এই অবস্থাকে পাভ্‌লভ্‌ উদ্বায়ুর অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কারণ উদ্বায়ুগ্রস্ত রোগী (neurotic patient) যেমন ভালমন্দ, নিরাপদ-বিপদ্‌জনক, কর্তব্য-অকর্তব্য ইত্যাদির মধ্যে কিছুই পার্থক্য টানিতে পারে না, এবং নিরাপদ এমন কি মঙ্গলজনক অবস্থার সম্মুখীন হইলেও উৎকণ্ঠা বোধ করে[১২], সেইরূপ উপরে বর্ণিত অবস্থার সম্মুখীন হইলে কুকুরটি কী করিতে হইবে এবং কী করিতে হইবে না তাহা 'বিবেচনা' করিতে পারে না। এইজন্য পাভ্‌লভ্‌ ইহাকে উদ্বায়ুর অবস্থা বলিয়াছেন।

(ছ) সাপেক্ষ উদ্দীপকের প্রয়োগ এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সময়ের ব্যবধান :

সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় বাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়ার 'প্রতিষ্ঠার' জন্য নিরপেক্ষ উদ্দীপকের পূর্বে অথবা উহার সহিত যুগপৎ সাপেক্ষ উদ্দীপকের প্রয়োগ

---

১২ যেমন, উদ্বায়ুগ্রস্ত রোগীর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সে হয়ত' বিনা কারণে অন্ধকারকে ভয় করে, অথবা ক্রমাগত হাত ধুইয়াও মনে করে যে, উহা অশুচি রহিয়া গেল, অথবা রাস্তার প্রতি ল্যাম্প-পোষ্ট হইতে দূরে থাকে পাছে সেগুলি মাথায় পড়িয়া যায়, অথবা সকলকেই (এমন কি তাহার নিকটতম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীকেও) অত্যন্ত সন্দেহ করে।

গ্যারেট্ (Garrett) বলেন যে, শিশুরা যখন দেখে যে তাহারা সামান্য মিথ্যা কথা বলিলেই শাস্তি পায়, অথচ তাহাদের পিতামাতারা স্বচ্ছন্দে মিথ্যা কথা বলে, তখন (পাভ্‌লভের পরীক্ষণাধীন কুকুরের ন্যায়) তাহারা দ্বন্দ্বের (conflict-এর) সম্মুখীন হয় এবং তাহাদের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। গ্যারেটের ভাষায় : "A child is punished for 'lying' but hears his mother tell 'social lies' over the phone—say that she is ill......Many children cannot see the difference between behaviour (ostensibly the same) which is sometimes right and sometimes wrong. Unable to fathom such inconsistencies, they are faced by a dilemma......" (*Great Experiments in Psychology*, p. 12).

প্রয়োজন। কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, যেখানে সাপেক্ষ উদ্দীপকের পরে নিরপেক্ষ উদ্দীপকের প্রয়োগ হয়, সেখানে ঐরূপ প্রয়োগ ঠিক অব্যবহিত পরেই করিতে হইবে—এরূপক্ষেত্রে সময়ের কিছু ব্যবধানও থাকিতে পারে। ধরা যাউক্ যে, একটি পরীক্ষণের ক্ষেত্রে ঘণ্টাধ্বনি করিবার ৫ মিনিট বাদে কুকুরকে তাহার খাদ্য দেওয়া হইতে লাগিল। এরূপ স্থলে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া 'প্রতিষ্ঠিত' হইবার পর ঘণ্টাধ্বনি শুনিলেই কুকুরের লালা-নিঃসরণ হইবে না—খাদ্য পাইবার সময় নিকটবর্তী হইলে লালানিঃসরণ শুরু হইবে; যেমন, বর্তমান উদাহরণে প্রায় ৪ মিনিট কাল সময় অতীত হইলে লালানিঃসরণ আরম্ভ হইবে। এইরূপ প্রতিক্রিয়াকে **বিলম্বিত প্রতিক্রিয়া** (**delayed reaction** বা **trace reflex**) বলা হয়।

আবার যদি এক একটি সময়ের ব্যবধানে একটি কুকুরকে খাওয়ানর অভ্যাস করান যায়, তাহা হইলে ঐরূপ সময়ের ব্যবধানে কুকুরটির লালা-নিঃসরণ হইবে; যেমন, যদি প্রতি ১২ মিনিট অন্তর অন্তর অল্প অল্প খাদ্য দেওয়া যায়, তাহা হইলে প্রতি ১১।১২ মিনিট পর পর লালানিঃসরণ হইবে।

বিলম্বিত প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আর একটি অভিনব ঘটনা পাভ্‌লভ ও তাঁহার সহকর্মিগণ লক্ষ্য করেন। সাপেক্ষ উদ্দীপকের প্রয়োগের পর কুকুরটি নিদ্রামগ্ন হইয়া পড়ে এবং উদ্দীপকের প্রয়োগ (যেমন, ঘণ্টাধ্বনি) চলিতে থাকিলেও যতক্ষণ না নিরপেক্ষ উদ্দীপকের (যেমন, খাদ্যের প্রয়োগের) সময় নিকটবর্তী না হয়, ততক্ষণ সে নিদ্রামগ্ন থাকে। পাভ্‌লভ্ মনে করেন যে, এই নিদ্রার কারণ এই যে, অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থায় গুরুমস্তিষ্কের বিস্তৃত ক্ষেত্র ব্যাপিয়া একটি 'বাধ' (inhibition)-এর সৃষ্টি হয়।

৪। সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার প্রকারভেদ (Different kinds of Conditioned Reflex):

সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া নানাপ্রকারের হইতে পারে; যথা—

(১) সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া **সদর্থক** (positive) এবং **নঙর্থক** (negative) হইতে পারে। যেখানে প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাণি-বিশেষ কোন কিছু পাইবার জন্য প্রস্তুত হয় সেখানে প্রতিক্রিয়াকে সদর্থক বলে। যেমন, সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত

হইবার পর যখন কুকুর ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া লালা নিঃসরণ করে, তখন উহাকে 'সদর্থক' বলা যায়; কারণ, ঐরূপ প্রতিক্রিয়া আহার্য পাইবার প্রস্তুতি ইঙ্গিত করে।

আবার যদি অনুরূপ প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাণি-বিশেষ কোন কিছু পরিহার করিতে বা কোন কিছু হইতে আত্মরক্ষা[১৩] করিতে চাহে, তবে উহাকে নঙর্থক প্রতিক্রিয়া (negative conditioning) বলা যায়। যেমন, একটি তৈলপায়িকা বা আরসুলা যতবার অন্ধকার পথে যাইতে চেষ্টা করে, ততবার যদি উহাকে বিদ্যুতের অভিঘাত বা ধাক্কা (shock) দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহা অন্ধকার পথ দেখিলেই তাহা পরিহার করিয়া চলিবার চেষ্টা করিবে।

(২) আবার সাপেক্ষীকরণ (conditioning) একটি মাত্র বিকল্প উদ্দীপকের সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে পারে অথবা একাধিক বিকল্প উদ্দীপকের সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে পারে। প্রথমটিকে বলা যায়, **নিম্নপর্যায়ের** সাপেক্ষীকরণ (Lower-order conditioning) এবং দ্বিতীয়টিকে বলা যায় **উচ্চপর্যায়ের** সাপেক্ষীকরণ (Higher-order conditioning)। উপরের উদাহরণে ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া যখন লালা নিঃসরণ হয়, তখন একটিমাত্র উদ্দীপক (যথা, ঘণ্টাধ্বনি) বিকল্প উদ্দীপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং উহা তথাকথিত নিম্নপর্যায়ভুক্ত। আবার ঐরূপ সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া 'সুপ্রতিষ্ঠিত' হইবার পর উচ্চপর্যায়ের সাপেক্ষীকরণের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। যেমন, কয়েকবার ধরিয়া প্রথমে একটি আলোক দেখাইয়া তাহার পর ঘণ্টাধ্বনি করিলে এইরূপ হইতে পারে যে, কেবল আলোকটি দেখিবার পর কুকুরটির লালানিঃসরণ হইতেছে (অবশ্য এইরূপ স্থলে ঘণ্টাধ্বনির পর আবার আহার্য দিতে হইবে, নচেৎ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার 'অবলুপ্তি' বা extinction ঘটিবে)। অর্থাৎ উচ্চপর্যায়ের সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার ক্ষেত্রে একটি পূর্বপ্রতিষ্ঠিত সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সাহায্যে একটি নূতন উদ্দীপকের সাপেক্ষীকরণ ঘটে।

---

১৩ পাভ্‌লভের ন্যায় আর একজন রুশ বৈজ্ঞানিক ভ্‌লাডিমির বেক্‌টেরেভ্‌ (Vladimir Bechterev) এই বিষয় পরীক্ষা চালান। তিনি সাধারণতঃ দেহের কোন অঙ্গে বিদ্যুতের ধাক্কা দিয়া উহা সরাইয়া লইবার ব্যাপারে প্রাণি-বিশেষকে অভ্যস্ত করাইতেন। এইরূপ প্রতিক্রিয়াকে *protective reflex* বলা হয়।

(৩) সেইরূপ প্রতিক্রিয়ার পার্থক্য অনুসারে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া দুই প্রকারের হইতে পারে। যেমন, **স্বভাবজ** (natural) এবং **চালক-সৃষ্ট** (operant)। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া প্রতিষ্ঠার পর নিরপেক্ষ উদ্দীপকের ফলে যেরূপ স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হয়, সাপেক্ষ উদ্দীপকের সহিত সংযোগ স্থাপিত হইলেও সেইরূপ হয় (যেমন, ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া লালা-নিঃসরণ)—এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াকারী প্রাণী নিজে উদ্যোগী হইয়া কোন কিছু করে না। ইহা হইল পাভ্‌লভ্‌-পরিকল্পিত আদি-পদ্ধতি বা সনাতন প্রথা। সাম্প্রতিক কালে প্রচলিত এক প্রকার পরীক্ষণ-পদ্ধতিতে পরীক্ষণ-পাত্ররূপে ব্যবহৃত জীবকে নিজে উদ্যোগী হইয়া কোন কিছু করিতে প্ররোচিত করা হয়। যেমন, একটি ইঁদুর বা বিড়াল যদি দেখে যে, একটি যন্ত্রের কোন 'বোতাম' বা 'লেভার' (lever) টিপিলে খাবার মিলিবে, তাহা হইলে সে নিজেই পরে প্রয়োজনমত ঐরূপ করিবে—এরূপ ক্ষেত্রে প্রাণি-বিশেষ নিজেই 'চালক' (operator) ভাবে কার্য করিতেছে। ইহাকে 'চালক-সৃষ্ট সাপেক্ষীকরণ' (operant[১৪] or instrumental conditioning) বলে।

৫। মানবের জীবনে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া (C. R. in human life):

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার প্রকাশ আমরা অনেক সময় পাই। যেমন, দুগ্ধপোষ্য শিশু যখন ক্ষুধার্ত হয় এবং সেইজন্য কাঁদিতে থাকে বা অন্য কোন প্রকারে দৈহিক অস্থিরতা প্রকাশ করে, তখন সে যদি তাহার মা'কে দেখে বা তাহার দুধের বাটী নাড়াচাড়ার শব্দ পায়, তাহা লইলে কতকটা শান্ত হয় এবং দুধের 'প্রতীক্ষা' করে। সেইরূপ শিশু শাস্তি দিবার সময় আমরা অনেক সময় জোরে ধম্‌কাইয়া থাকি এবং সেইজন্য কেবলমাত্র ধম্‌কানি শুনিয়াই সে ভীত বা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে।

এই বিষয় ক্রাস্‌নোগোরস্কি (Krasnogorski) নামক পাভ্‌লভের একজন ছাত্র পরীক্ষণমূলকভাবে গবেষণা করেন। তিনি নানাবিধ বিকল্প

১৪ Operant Conditioning-কে বর্ণনা করিয়া B. F. Skinner বলিয়াছেন: "the behavior *operates* upon the environment to generate consequences." (*Science and Human Behaviour*, p. 65).

উদ্দীপক (যেমন, ঘণ্টাধ্বনি, বাঁশীর শব্দ, চর্মকণ্ডূয়ন ইত্যাদি)-কে আহার্য-দ্রব্যরূপ নিরপেক্ষ উদ্দীপকের সহিত সংশ্লিষ্ট করেন এবং দেখেন যে, সাপেক্ষ উদ্দীপকের প্রয়োগের ফলেই শিশুদের লালা সঞ্চার হয়।

আমেরিকার মাটীয়ের (Mateer) এই বিষয়ে শিশুদের উপর পরীক্ষা করেন। তিনি দেখেন যে, স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের ক্ষেত্রে সাপেক্ষীকরণ যত তাড়াতাড়ি প্রতিষ্ঠিত এবং অবলুপ্ত করা যায়, তাহার দ্বিগুণ সময় প্রয়োজন হয় উনমানস (feeble-minded) শিশুদের ক্ষেত্রে।

কেহ কেহ পরিণত বয়স্কদের উপর এই বিষয় পরীক্ষা করেন। যেমন, ওয়াট্‌সন্ (Watson) প্রথমে ঘণ্টাধ্বনি করিয়া বা অনুরূপ সাপেক্ষ উদ্দীপক প্রয়োগ করিয়া পরে ব্যক্তি-বিশেষের হস্ত বা পদে বিদ্যুতের অভিঘাত (shock) দিতেন ; এইরূপ কয়েকবার করার পর দেখা গেল যে, সাপেক্ষ উদ্দীপকের প্রয়োগমাত্র ব্যক্তি-বিশেষ তাহার হস্ত বা পদ সরাইয়া লইতেছে।

দৈনন্দিন জীবনের বিবিধ ক্ষেত্রে সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতির ব্যবহারিক প্রয়োগ (practical application) করা যাইতে পারে। অনেক সময় মন্দ অভ্যাস বা ব্যক্তিত্বের কোন মন্দ প্রলক্ষণ দূর করিবার জন্য বা বিবিধ অপপ্রতিযোজন সংশোধন করিবার জন্য সাপেক্ষীকরণ 'প্রতিষ্ঠিত' করা যাইতে পারে—ইহা সাধারণতঃ শিশুদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে শিশু যতবার কোন অবাঞ্ছিত কায করিতে যাইবে, ততবার তাহাকে কোন প্রকার মৃদু 'শাস্তি' দান করিয়া অথবা যতবার ইহার বিপরীত করিবে, ততবার 'পুরস্কার' দিয়া কোন অবাঞ্ছিত অভ্যাস দূরীকরণ অথবা বাঞ্ছিত অভ্যাস স্থাপন করা যাইতে পারে।

৬। সমালোচনা :

পাভ্‌লভের মতবাদের যে বহু বিষয় অভিনবত্ব আছে তাহা অনস্বীকার্য। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সম্পূর্ণরূপে বস্তুতান্ত্রিক (materialistic) এবং তিনি দেহাতিরিক্ত কোন পৃথক্ মানসিক সত্তা, অবস্থা বা ক্রিয়াতে আস্থাবান্ ছিলেন না। এই কারণে তিনি অন্তর্দর্শন (introspection)-কে কোন যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মতে মনকে পৃথক ভাবে স্বীকার করিলে অযথা মিথ্যা দ্বৈতবাদ (dualism)-এর সৃষ্টি হয়।

বস্তুবাদের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ তিনি যান্ত্রিকতাবাদকেই (mechanism) ব্যাখ্যার মূলসূত্ররূপে গ্রহণ করেন।

তিনি প্রতিবর্ত ক্রিয়া (reflex action)-কেই জীব-জগতের সকল ক্রিয়ার আদর্শরূপে গ্রহণ করিযাছিলেন। তিনি মনে করিতেন যে, মানুষ যে সব জটিল কার্য করে, সেইগুলি বিভিন্ন সরল প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সমন্বয় এবং উচ্চ পর্যায়ের সাপেক্ষীকরণের ফলে গঠিত (পৃঃ ৩৫৯)। সকল প্রতিবর্ত ক্রিয়ার উদ্ভব বাহ্যপরিবেশ ও দেহের মিথস্ক্রিয়া হইতে ঘটে এবং এই সকল ক্রিয়াগুলি পরস্পরের সহিত শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া জটিল আকার ধারণ করে।[১৫] পাভ্‌লভ্‌ কোন সহজাত সংস্কারে বিশ্বাসী ছিলেন না।

পাভ্‌লভ্‌ এই প্রসঙ্গে তথাকথিত দৈহিক (physiological) ও মানসিক (psychical) প্রতিবর্ত ক্রিযার পার্থক্য উল্লেখ করিযা বলেন যে, দৈহিক প্রতিবর্ত ক্রিয়া অপরিবর্তনীয় ('constant and unchanging') এবং নিরপেক্ষ ('unconditioned'), কিন্তু মানসিক প্রতিবর্ত ক্রিয়াগুলি পরিবর্তনশীল ('subject to fluctuation') এবং সাপেক্ষ ('dependent on many conditions' বা 'conditioned')।

পাভ্‌লভ্‌ মনে করিতেন যে, **গুরুমস্তিষ্ক** (cerebral cortex) হইল সকল **সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার অধিষ্ঠান** ('seat of all conditioned refex activity')। তিনি কয়েকটি প্রাণীর গুরুমস্তিষ্ক অপসারণ করিবার পর লক্ষ্য করেন যে, উহারা কোন নূতন সাপেক্ষীকরণ প্রক্রিয়া আয়ত্ত করিতে পারিতেছে না এবং তাহা ছাড়া পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া আর সম্ভবপর হইতেছে না। মস্তিষ্কের নিম্নাঞ্চল এবং মেরুদণ্ড নিরপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট। পাভ্‌লভ বিশ্বাস করিতেন যে,

১৫ তুলনীয় : "We prefer the word *reflex*......(because of) the chain-like character of the process, the compounding of a complex effect from simple components, whereby the end of one action is the stimulus for the beginning of another." (Pavlov).

গুরুমস্তিষ্ক সমগ্রভাবে কার্য করে এবং এইজন্য তিনি গুরুমস্তিষ্কের আঞ্চলিক ক্রিয়াবাদ পরিহার করেন।[১৬]

তাহা ছাড়া, পাভ্‌লভ্ তাহার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে উদ্বায়ুরোগেরও (neurosis) এক ব্যাখ্যা দেন। তিনি মনে করেন যে, তথাকথিত মানসিক রোগের মূল কারণ মস্তিষ্কের মধ্যেই অন্তর্নিহিত থাকে। এক্ষেত্রে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী ফ্রয়েডীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পূর্ণ বিপরীত। ফ্রয়েড্ যদিও মানসিক কার্যের জন্য মস্তিষ্কের প্রয়োজন অস্বীকার করেন না, তাহা হইলেও তিনি মনে করেন যে, মনোরোগের কারণ হইল মানসিক বিকার বা মনের কার্মিক বিকলতা (malfunction of the *mind*)। অপরপক্ষে, পাভ্‌লভ্ মনে করেন যে, গুরুমস্তিষ্কের কার্মিক বিকলতাই (functional disorder of the *cerebrum*) উদ্বায়ুরোগের প্রধান কারণ।[১৭]

পাভ্‌লভের মতবাদ সম্বন্ধে প্রধান আপত্তি হইল যে, ইহা দৈহিক ক্রিয়ার উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে; কিন্তু মনকে বাদ দিয়া কোন প্রকার মনোবিদ্যা রচনা করা যায় না—ইহা আমরা চেষ্টিতবাদের সমালোচনাকালে লক্ষ্য করিয়াছি। (পৃঃ ১০১-১০৪ দ্রষ্টব্য)।

সাপেক্ষীকরণ একেবারে যান্ত্রিক প্রক্রিয়া হইতে পারে না। মানুষ এবং অন্ততঃ উচ্চ পর্যায়ের জীবের ক্ষেত্রে যান্ত্রিকতাবাদের আলোকে

১৬ তিনি মনে করিতেন যে, যদিও গুরুমস্তিষ্ক সমগ্রভাবে কার্য করে, তাহা হইলেও একটি অংশে এমন 'বাধ' (inhibition)-এর সৃষ্টি হইতে পারে যে, ঐ অংশ কোন কার্য করিতে পারে না। তিনি এক রোগীকে পর্যবেক্ষণ করেন; সে কুড়ি বৎসর নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া হাসপাতালে ছিল। প্রায় ষাট বৎসর বয়সের সময় তাহার দেহে গতির লক্ষণ দেখা দেয় এবং সে বলে যে তথাকথিত নিদ্রাকালীন অবস্থায় সে তাহার চারিপাশে কি হইত তাহা বুঝিতে পারিত। পাভ্‌লভের মতে ঐ রোগীর মস্তিষ্কের চেষ্টাধিষ্ঠানে একটি দীর্ঘস্থায়ী 'বাধ'-এর সৃষ্টি হইয়াছিল।

১৭ ফ্রয়েড্ ও পাভ্‌লভের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য বর্ণনা করিয়া ওয়েলস্ (H. K. Wells) বলিয়াছেন: "Pavlov's position with regard to psychology and psychiatry is that they cannot become exact sciences without basing themselves closely on the physiology and patho-physiology of the higher nervous activity. Freud's position is that though mental activity is a function of the brain, it is nevertheless an independent phenomenon, and that a scientific psychology and a scientific psychiatry can be constructd without benefit of cerebral physiology". (*Ivan P. Pavlov*, p. 214).

ইহার পূর্ণ ব্যাখ্যা হইতে পারে না। যেমন, যদি কেহ দেখে যে, যতবারই একটি যন্ত্রের বোতাম টিপা যায়, ততবারই খাবার মিলিতেছে, তাহা হইলে ক্ষুধার ভাব জাগিলে আবার সে বোতাম টিপিবে। এখানে উহার মনে পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 'আশা' জাগিতেছে—এইরূপ মানসিক প্রত্যয় (mental concept) ব্যবহার করিয়া সমগ্র প্রক্রিয়াটির ব্যাখ্যা করাই সমীচীন।

উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষণের মূলে থাকে সমগ্র পরিস্থিতির অবধারণ (comprehension of the *total* situation)। এইজন্য সকল শিক্ষণই সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া, এবং জটিল শিক্ষণ (complex learning)-মাত্রই 'একাধিক সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার দীর্ঘ শৃঙ্খল বিশেষ' (long chain of conditioned reflexes)—এইরূপ বলা যুক্তিযুক্ত নহে।

আমাদের এই সমালোচনার অর্থ নহে যে, সাপেক্ষীকরণ প্রক্রিয়াটিই অসম্ভব বা অবাস্তব। সাপেক্ষীকরণ যে মানুষ এবং অন্যান্য সকল প্রাণীর ক্ষেত্রেই ঘটিয়া থাকে তাহা আমরা স্বীকার করি; কিন্তু আমাদের বক্তব্য হইল যে, মনের পটভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কেবলমাত্র যান্ত্রিকতাবাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ইহার সম্যক্ ব্যাখ্যা চলে না।

দ্বাদশ অধ্যায়

প্রেষণা

মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ বিভিন্ন কার্যের মাধ্যমে; কিন্তু মানুষ কেন কার্য করে—কিসের তাড়নায়, কোন্ বাসনার প্রভাবে, কি উদ্দেশ্য সাধনের আশায় সে কর্মে প্রবৃত্ত হয়? মানুষের ন্যায় মনুষ্যেতর পশুও নানাপ্রকার কার্য করে; কিন্তু পশুজীবনের বিবিধ প্রধান প্রধান কার্যের যেন একটা নির্দিষ্ট তালিকা আছে, এবং সেগুলি এক একটি বিশেষ সময় নির্দিষ্ট পন্থায় সাধিত হয়। মানুষের কার্য কিন্তু বহু প্রকারের এবং সেগুলি বহু বৈচিত্র্যময়; এমনকি মনুষ্যের সহিত পশুর যে সমস্ত কার্যের সাদৃশ্য আছে (যথা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌনকামনা ইত্যাদি চরিতার্থ করার জন্য কার্য), সেগুলিও নানাকারণে নানাভাবে পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত হয়। সেইজন্য "মানুষ কেন কার্য করে?" এই প্রশ্নের উত্তর দান করা কঠিন। তবে সাধারণতঃ বলা যায় যে, কোন অভাব দূর করিবার জন্য মানুষ কর্মে নিযুক্ত হয়—এই অভাব দৈহিক বা জৈবিক (physiological বা biological) হইতে পারে; আবার মানসিক (psychological) হইতে পারে। তাহা ছাড়া, অনেক ক্ষেত্রে কোন অভাব দূর করাই যথেষ্ট প্ররোচক নহে—উহার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে কোন কিছু পাইবার বা লাভ করিবার আশা। সুতরাং কোন উদ্দেশ্য সাধনের এষণা বা ইচ্ছা মানুষকে কর্মে চালিত করে। মানুষ যে সকল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে অবগত থাকে, তাহা নহে; কখনও কখনও ইহাদের সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা থাকে, আবার কখনও কখনও চেতনার অগোচরে ইহারা কার্য করে।

১। (ক) প্রেষণা—নোদনা, প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য (Motivation—Drives, Needs and Motives):

যখন কোন কার্য সাধন করা হয়, তখন উহার মাধ্যমে কোন লক্ষ্যে পৌছিবার চেষ্টা করা হয়। এই **লক্ষ্যকে অনেক সময় উদ্দেশ্য বলা হয়।** কিন্তু উদ্দেশ্য বলিতে কেবলমাত্র লক্ষ্য সম্বন্ধে ধারণা (idea about the end or goal) বুঝায় না—উহার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে কতকগুলি

অনুভূতি (feelings) এবং উহাকে পাইবার একান্ত আগ্রহ ও চেষ্টা (striving); এইগুলির সমাবেশে যে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহাকে উদ্দেশ্য (motive) বলা হয়। আর **উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হইলে যে গতীয় অবস্থা** (dynamic state)-এর **উদ্ভব হয়, তাহাকে বলা যায় প্রেষণা** (motivation)—ইহা হইল উদ্দেশ্যকে পাইবার 'প্র' বা প্রকৃষ্ট এষণা, বাসনা, ইচ্ছা বা তীব্র অনুরাগ ও আকাঙ্ক্ষার অবস্থা; যতক্ষণ পর্যন্ত না লক্ষ্য বস্তু পাওয়া যায়, ততক্ষণ ইহা চলিতে থাকে।

আমরা এখানে বলিলাম যে, উদ্দেশ্যের মধ্যে লক্ষ্য সম্বন্ধে ধারণা থাকে —অবশ্য ইহা সম্ভব হয় যদি কার্যটি পূর্ব হইতে পরিকল্পিত হয়; নহিলে এইরূপ কোন সুস্পষ্ট ধারণা থাকে না। এইজন্য অনেক লেখক উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ করিবার সময় ধারণা (idea)-র উল্লেখ করেন না।[১]

উদ্দেশ্যকে পাইবার ইচ্ছা জাগে কেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যে কোন প্রয়োজন (need) মিটাইবার তাগিদে আমরা কার্য করি। এই প্রয়োজন অবশ্য নিছক জৈব প্রয়োজন হইতে পারে, অথবা মানসিক প্রয়োজনও হইতে পারে। প্রয়োজনবোধের ভিতর থাকে একটি চালনা বা তাড়নার ভাব—ইহাই আমাদের কার্য করিতে বাধ্য করে। ইহাকে বলা যায় 'নোদনা' (drive)। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, **আমরা যখন কার্য করি তখন কোন প্রয়োজন বোধের তাড়নায় বা প্রভাবে এক বিশেষ লক্ষ্যের প্রতি চালিত বা নোদিত হই।**

আমাদের প্রচলিত কথাবার্তায় ও সাধারণ আলোচনায় আমরা উদ্দেশ্য, তাড়না, নোদনা, প্রয়োজন ইত্যাদি পদগুলির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য রাখি না এবং অনেক সময় উহাদের পরস্পরের বিকল্প বা প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করি। তবে **উদ্দেশ্য পদটিতে লক্ষ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়** এবং এই লক্ষ্যটিকে মন (উহার চেতন বা অবচেতন স্তর) বিবিধ সম্ভাব্য লক্ষ্য হইতে

১ তুলনীয়: (১) A motive...is a state or set of the individual which disposes him for certain behaviour and for seeking certain goals." (Woodworth, *Psychology*, 12th. Ed., p. 363).

(২) "Motivation then refers to conditions or states within an organism that cause *persisting* behaviour." (Wenger &c. *Physiological Psychology*, p. 313).

নির্বাচন করিয়া লয়। 'প্রয়োজন' পদটিতে অভাবের প্রতি ইঙ্গিত থাকে; এই অভাবটি কোন অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে স্বস্তির অভাব নির্দেশ করিতে পারে অথবা এমন কোন কিছুর অভাব নির্দেশ করিতে পারে যাহা পাইলে তৃপ্তি, শান্তি, সুখ ইত্যাদি লাভ হইবে[২]। **'নোদনা'-পদটিতে গতীয়তা (dynamism)-এর প্রাধান্য আছে**—ইহার প্রভাবে ব্যক্তি-বিশেষ এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে চালিত হয়। 'উদ্দেশ্য' এবং 'নোদনা' দুইটি পদেই লক্ষ্য (goal)-এর প্রতি ইঙ্গিত আছে—কিন্তু সাধারণতঃ উদ্দেশ্য পদটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং 'উদ্দেশ্য' (motive)-পদ দ্বারা সূচিত লক্ষ্য বলিতে জৈব প্রয়োজন অপেক্ষা বিবিধ পরিবেশের প্রভাবে মানব মনে যে সব বহু বিচিত্র প্রয়োজন ও বাসনা জাগে সেইগুলিকেই অধিকতর বুঝায়; আর 'নোদনা' (drive)-পদ দ্বারা সাধারণতঃ সূচিত হয় কতকগুলি সহজাত বৃত্তি, প্রেরণা ও বাসনা (যথা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম ইত্যাদি)। উদ্দেশ্যের মধ্যে নূতনত্ব, বৈচিত্র্য ও ব্যক্তিগত পার্থক্য অধিক থাকিলেও নোদনার মধ্যে বৈচিত্র্যের অভাব এবং একরূপতা দেখা দেয়; তাহা ছাড়া ইহা সাধারণতঃ বংশগত[৩]। একই উদ্দেশ্য (যেমন, প্রতিষ্ঠালাভ বা যশোলাভ) বিবিধ উপায়ে সাধিত হইতে পারে, কিন্তু নোদনার তৃপ্তি মোটামুটি একই উপায়ে সাধিত হইতে পারে (যেমন, ক্ষুধার তৃপ্তি একমাত্র খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমেই সম্ভব, যদিও অবশ্য ঐ খাদ্য বিবিধ প্রকারের হইতে পারে)। এইজন্য অনেক লেখক মনুষ্যেতর প্রাণীর ব্যবহারের ক্ষেত্রে 'নোদনা'-পদটি ব্যবহার করেন এবং অধিকাংশ মনুষ্য-সম্পাদিত কার্য উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বলিয়া অভিহিত করেন[৪]।

---

২ কেহ কেহ (যথা, Krech ও Crutchfield) প্রথমোক্ত শ্রেণীর প্রয়োজনকে *deficiency motive* এবং দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর প্রয়োজনকে *abundancy motive* নাম দিয়াছেন।

৩ Stagner, *Psychology of Personality*, p. 259 দ্রষ্টব্য। তিনি 'drive'গুলিকে "determined completely by heredity" এবং 'motive'-কে "variable" এবং "relatively more dependent upon experience" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

৪ Woodworth-এর মতে "The word *drive* is preferred by animal psychologists, because it carries no implication of conscious experience or desire." (*Op. cit.*, pp. 363-64).

কোন কোন লেখক আবার উদ্দেশ্য (motive) ও নোদনা (drive) এই দুই পদের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্দেশ না করিয়া উহাদের সমানার্থক ভাবে ব্যবহার করেন[৫]।

(খ) উদ্দেশ্য কী নহে (What motive is not):

আমরা এই পর্যন্ত উদ্দেশ্য পদের কি অর্থ হইতে পারে, তাহা আলোচনা করিলাম। কিন্তু 'উদ্দেশ্য'-পদের অর্থ সুষ্ঠুভাবে বুঝিবার জন্য উহা কী নহে, তাহাও লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

(১) উদ্দেশ্য (motive) ও উদ্দীপক (stimulus) এক নহে। **উদ্দীপক সাময়িকভাবে এক বা একাধিক ইন্দ্রিয়ের উপর কার্য করিয়া সংবেদনের সৃষ্টি করে। উদ্দীপক মাত্রই উদ্দেশ্যের লক্ষ্য হইতে পারে না—বরং কখনও কখনও কোন কোন উদ্দীপক উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হইতে পারে।** যেমন, একজন ছাত্র একটি বই পড়িতেছে—তাহার চক্ষুর উপর যদি হঠাৎ তীব্র আলোক পড়ে বা বাহিরে যদি খুব গোলযোগ হয়, তাহা হইলে ঐরূপ উদ্দীপক তাহার উদ্দেশ্যের বিঘ্ন-স্বরূপ হইবে। আবার উদ্দীপক উদ্দেশ্যের লক্ষ্যের অনুকূল হইতে পারে বা লক্ষ্যের বিষয়-বস্তুও হইতে পারে; যেমন, একজন ব্যক্তি বিনা শ্রমে অর্থ পাইতে চাহে এবং লটারীর টিকিটের বিজ্ঞাপন এই উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক উদ্দীপক হিসাবে তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিল। অথবা, একজন পথিমধ্যে ক্ষুধার্ত হইয়া খাদ্যের সন্ধান করিতেছে এবং সে মিষ্টান্ন বা অন্য কোন খাবারের দোকান দেখিতে পাইল। এরূপ ক্ষেত্রে যদিও লক্ষ্যকে পাইবার বাসনা উদ্দীপক তীব্র করিয়া তুলে, তাহা হইলেও উহারা এক নহে; কারণ উদ্দীপককে প্রত্যক্ষ করিবার পূর্ব হইতেই উদ্দেশ্য বিদ্যমান ছিল। তাহা ছাড়া উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া যাইবার পর উহার লক্ষ্যের

---

৫ ক্লাইনবের্গ (Klineberg) তাঁহার *Social Psychology* গ্রন্থে (পৃ: ৭৭) 'motive' ও 'drive' পদদ্বয়ের কোন পার্থক্য না করিয়া বলিয়াছেন: "...no attempt will be made here to draw a line of demarcation between motive and drive. These terms will be used interchangeably to refer to the motors of action, the dynamic conditions either within the organism or in the environment, or both, which lead us to seek to reach certain goals."

সহিত সংশ্লিষ্ট উদ্দীপক প্রত্যক্ষ করিলেও উহার প্রতি আর আগ্রহ থাকে না। যেমন, নিমন্ত্রণ বাড়ীতে ভোজনের শেষ পর্বে (যখন বিশেষ ক্ষুধা থাকে না) নানাবিধ মিষ্টান্ন দেখাইয়া আহার করিবার জন্য যখন বার বার অনুরোধ জানান হয়, তখন উহারা উদ্দীপক হিসাবে সংবেদনের সৃষ্টি করিলেও উহাদের পাইবার আর বাসনা থাকে না। অর্থাৎ ঐসব উদ্দীপকেরা তখন আর ক্ষুধার লক্ষ্য-বস্তু থাকে না।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, উদ্দেশ্য ও উদ্দীপক এক নহে।

(২) **আবার উদ্দেশ্য ও প্ররোচক বা প্রয়োজক (incentive) একার্থবোধক নহে।** প্ররোচক লক্ষ্য হিসাবে কার্য করে না, তবে উহা লক্ষ্যকে পাইবার আগ্রহ তীব্রতর করে এবং ফলে লক্ষ্য সাধনের উপায় স্বরূপ কার্য (means বা instrumental behaviour) ত্বরান্বিত হইতে পারে বা সুষ্ঠুভাবে সাধিত হইতে পারে; যেমন, অর্থোপার্জনের জন্য একজন শ্রমিক কাজ করিতেছে—তাহাকে বেতনেব সহিত 'বোনাস্'-এর প্ররোচনা দেখাইলে সে হয়ত' আরও সুষ্ঠুভাবে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করিবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কাযের উপর প্ররোচনা বা প্রয়োজকের একটা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে; কিন্তু উদ্দেশ্য ও প্ররোচক উহারা এক নহে।

(৩) **উদ্দেশ্য কোন দৈহিক শক্তি সৃষ্টি করে না।** যেমন, ক্ষুধা দৈহিক শক্তির সৃষ্টি ত' করেই না, বরং দৈহিক শক্তির প্রয়োজন নির্দেশ করে। তবে, উদ্দেশ্য সাধনকালে পূব হইতে দেহে যে শক্তি সঞ্চিত আছে তাহার কতকাংশ প্রয়োজনীয় কার্যের জন্য ব্যয়িত হয়।

(৪) **উদ্দেশ্যকে "কারণ" বলা যুক্তিযুক্ত নয়।** প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে 'কারণ'-পদটি সাধারণতঃ যান্ত্রিকতাবাদের দৃষ্টিভঙ্গী (mechanistic point of view) হইতে ব্যবহৃত হয়; এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বলা হয়, 'পূর্বে কারণ ঘটে, পরে কার্য উৎপন্ন হয়'। সুতরাং কারণ হইল অতীতের ঘটনা। কিন্তু উদ্দেশ্য নির্দেশ করে ভবিষ্যতে পাওয়া যাইতে পারে এমন কোন বস্তু বা বিষয়। তাহা ছাড়া, উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তিগত, কিন্তু প্রাকৃতিক কারণ হইল সর্বজনীন।[৬]

৬ **তুলনীয়:** "Motive...should not be confused with 'cause'. 'Motive' has a forward reference in time. It is concerned with purpose and with the

(৫) আবার **সাফল্য (achievement) ও উদ্দেশ্য এক হইতে পারে না।** কারণ আমাদের সকল উদ্দেশ্য সকল সময় সার্থক হইতে পারে না। সাফল্যের জন্য প্রয়োজন উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্য সাধনের সামর্থ্য (ability) এবং অনুকূল পরিবেশ (favourable environment)।

(গ) উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কার্যের লক্ষণ (Marks of motivated behaviour):

উদ্দেশ্য প্রণোদিত কার্য বলিতে আমরা বুঝি কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছিবার জন্য কার্য। যান্ত্রিক কার্যের সহিত তুলনা করিলে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কার্যের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য দেখা যায়[৭] :

(১) যান্ত্রিক কার্য সুরু হওয়ার জন্য প্রয়োজন হয় বাহির হইতে কোন শক্তির প্রয়োগ ; যেমন, বাষ্পযানকে চালিত করিতে প্রয়োজন হয় বাষ্পীয় শক্তির প্রয়োগ, বৈদ্যুতিক পাখাকে চালিত করিতে প্রয়োজন হয় বাহির হইতে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োগ। ইচ্ছা-প্রণোদিত কার্যের জন্য বাহির হইতে কোন শক্তির প্রয়োগ বা সঞ্চালনের আবশ্যকতা নাই। এমন কি যেখানে মানুষ কোন উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া হিসাবে কার্য করে, সেখানেও সে এই উদ্দীপককে নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ করে না, বরং সক্রিয়ভাবে উদ্দীপকের উপর প্রতিক্রিয়া করে ; তাহা ছাড়া, উদ্দীপক হইতে কোন শক্তিই কর্তার পেশীতে সঞ্চালিত হয় না। এইজন্য বলা হয় যে, ইচ্ছাপ্রণোদিত কার্য বাহ্য শক্তি হইতে নিরপেক্ষভাবে, অর্থাৎ স্বতঃই ও স্বাধীনভাবে (*spontaneously and freely*) উৎপন্ন হয়।

(২) যান্ত্রিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, উদ্দীপকের প্রয়োগ বন্ধ হইলে ক্রিয়াও বন্ধ হয় ; কিন্তু যে ইচ্ছাপ্রণোদিত কার্য কোন উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া

anticipated consequences of acts. Causation has a backward reference ; it refers to antecedent conditions, i. e., those which immediately precede or accompany an event and which influence it decisively or determine it. Motives are in a sense personal and private, whereas causes are general and public." (Lindesmith & Strauss, ***Social Psychology***, p. 300).

অবশ্য 'উদ্দেশ্য সাধন' দৃষ্টিভঙ্গী (teleological standpoint) **হইতে কারণকে ব্যাখ্যা করিলে এই পার্থক্য বিশেষ থাকে না।**

৭ McDougall, ***Outline of Psychology***, pp. 44-16 দ্রষ্টব্য।

ভাবে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা প্রয়োজন হইলে উদ্দীপকের অভাবেও চলিতে পারে (*persistence of activity even after the withdrawal of the stimulus*)।

(৩) যন্ত্রের কোন স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি নাই বলিয়া উহা যন্ত্রের মধ্যে কোন পরিবর্তন আনিতে পারে না—এই কারণে যন্ত্র অটুট্ থাকিলে এবং বাহিরের কোন বাধা না থাকিলে যান্ত্রিক ক্রিয়া অপরিবর্তনীয়ভাবে চলিতে পারে ; কিন্তু ইচ্ছা-প্রণোদিত কার্য পরিবর্তনশীল (*variable*)। একটি বৈদ্যুতিক পাখা আমরা যত জোরে চালাইবার ব্যবস্থা করি, ঠিক তত জোরে উহা চলিতে থাকে ; কিন্তু মানুষ যখন কোন প্রতিক্রিয়া করে, তখন প্রয়োজন অনুসারে সে তাহার ব্যবহারে নানা পরিবর্তন আনে।

(৪) উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কার্য সমাপ্ত হইয়া যায়। যান্ত্রিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ইহা সম্ভব নহে ; কারণ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে কি না তাহা বুঝিবার ক্ষমতা যন্ত্রের নাই।

(৫) উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কার্য আরম্ভ হইবার প্রাক্কালে প্রস্তুতির ভাব (preparation বা set) থাকে ; কিন্তু যান্ত্রিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন উঠে না।

(৬) উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কার্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একই প্রকার কার্য পুনঃ পুনঃ করার ফলে নূতন অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হয় এবং কার্যের ক্রিয়া-কুশলতা বাড়ে ; যান্ত্রিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইহা সম্ভব নহে, কারণ যন্ত্রের যতদিন না কোন অবনতি ঘটে, ততদিন উহা একইভাবে কার্য করিয়া যাইবে।

৩। প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যের শ্রেণীবিভাগ (Different classes of Needs and Motives):

(ক) বিবিধ শ্রেণীকরণ (Different classifications):

প্রয়োজনের দাবী মিটাইবার জন্য আমরা বিভিন্ন প্রকার কার্য করিয়া থাকি এবং এই প্রয়োজনের বিভিন্নতা অনুসারে উদ্দেশ্যেরও বিভিন্নতা ঘটে। মানুষের প্রয়োজন (ও তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যের) সংখ্যা এত অধিক এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে এত সূক্ষ্ম তারতম্য থাকে যে তাহাদের সকলগুলি সুষ্ঠুভাবে বলিতে গেলে প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যের তালিকা এক বিরাট্ আকার ধারণ করিবে এবং উহার শ্রেণীবিভাগ অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

তবে আমরা যদি মানুষের প্রধান প্রধান প্রয়োজনগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখি, তাহা হইলে তাহার প্রয়োজন ও বাসনার একটা স্থূল শ্রেণীকরণ সম্ভব হয়। "মানুষ কী চায়? কী তাহার প্রয়োজন?"—এ প্রশ্নের উত্তরে তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে, সে বাঁচিতে চাহে, সে নিরাপত্তা চাহে, সে তৃপ্তি চাহে, সে নূতন উদ্দীপন বা অভিজ্ঞতা চাহে[৮]। ইহার জন্য আবার প্রয়োজন কিছু পরিহার (avoid) করা এবং কিছু লাভ (attain) করা। আবার এইগুলির প্রত্যেকটি দেহগত, প্রাকৃতিক পরিবেশগত, সামাজিক পরিবেশগত এবং আত্মসম্বন্ধীয়[৯] হইতে পারে। যেমন,

(১) দেহকে রক্ষা এবং দৈহিক নিরাপত্তার জন্য আমরা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীতাতপের আধিক্য, দৈহিক ক্লান্তি, অসুস্থতা ইত্যাদি পরিহার বা নিবারণ করিতে চাই।

আবার, দৈহিক তৃপ্তির জন্য আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, যৌনসুখ, দেহের সুস্থতা ইত্যাদি লাভ করিতে চাহি।

(২) প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে যেগুলি বিপজ্জনক, কুৎসিত, ভয়ঙ্কর, বিরক্তিকর সেগুলি পরিহার করিতে চাই।

আবার প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে নূতন নূতন বিষয় অনুসন্ধান করিতে, আবিষ্কার করিতে এবং নূতনত্বের সৃষ্টি করিতে চাই।

(৩) সামাজিক পরিবেশের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, বৈরীভাব ইত্যাদি পরিহার করিতে চাই।

আবার, গোষ্ঠীভুক্ত থাকিতে, গোষ্ঠীর সম্মান রক্ষা করিতে, অন্যলোকের সাহচর্য, প্রীতি, শ্রদ্ধা ইত্যাদি লাভ করিতে চাহি।

(৪) নিজের হীনতা, পরাজয়, লজ্জা, উৎকণ্ঠা, দুঃখ ইত্যাদি পরিহার করিতে চাই।

আবার, আত্মসম্মান রক্ষা করিতে, আত্ম-বিশ্বাস অটুট রাখিতে বা ফিরিয়া পাইতে, নৈতিক মূল্য বা কোন আদর্শ-নির্দেশক কার্য করিতে,

---

৮ ইংরাজীতে বলিতে গেলে: Man has needs for ***survival, security, satisfaction*** and ***stimulation.***

৯ অবশ্য এই শ্রেণীবিভাগ আপেক্ষিক অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ দেহ হইতে মনকে, বা অহং হইতে পরিবেশকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করা যায় না।

নিজেকে জানিতে এবং সমাজে ও তথা সমগ্র বিশ্বে নিজের কী স্থান তাহা বুঝিতে আমরা চাই।

উপরের এই তালিকা কিয়দংশে ব্যাপক। অনেক লেখক মানুষের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যকে দুইটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন—(১) **জৈবিক** বা **দৈহিক** এবং (২) **মানসিক**। ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূরীকরণ, যৌনবাসনা বা কামের পরিতৃপ্তি সাধন ইত্যাদি কার্য জৈব প্রয়োজনে সাধিত হয়। আবার মানসিক প্রয়োজন অসংখ্য—অর্থলাভ, যশোলাভ, বিদ্যালাভ, কর্মক্ষেত্রে এবং সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ ইত্যাদি নানা প্রকারের প্রয়োজনের তাড়না আমরা মনোরাজ্যে বোধ করি।

এক দল লেখক আবার প্রয়োজনকে (১) **সহজাত** (innate) বা **শিক্ষা-নিরপেক্ষ** (unlearned)[১০] এবং (২) **শিক্ষালব্ধ** (learned) এই দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। নিছক দৈহিক প্রয়োজনগুলি সাধারণতঃ সহজাত। শারীরিক ও মানসিক প্রচয় (development)-এর ফলে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সহিত ব্যক্তি-বিশেষ আরও অনেক অভাব বোধ করে; এবং এই-ভাবে বহুবিধ অভিজ্ঞতালব্ধ প্রয়োজনের সৃষ্টি হয়।

আর এক দল লেখক মানবীয় প্রয়োজনসমূহকে (১) **ব্যক্তিগত** (individual) এবং (২) **সামাজিক** (social) এই দুই প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। ব্যক্তিগত প্রয়োজনগুলি আবার দৈহিক ও মানসিক হইতে পারে।

যে ভাবেই আমরা প্রয়োজনগুলির শ্রেণীবিভাগ করি না কেন, এই সব বিভিন্ন শ্রেণী পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না। যেমন, দৈহিক ও মানসিক প্রয়োজনসমূহ পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট, কারণ দেহ ও মন পরস্পরকে প্রভাবিত করে। আবার সহজাত ও শিক্ষালব্ধ (বা অভিজ্ঞতা-লব্ধ) প্রয়োজনগুলি একেবারে বিচ্ছিন্ন থাকে না—যেগুলি সহজাত সেগুলি অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার ফলে পরিবর্তিত বা পরিমার্জিত হয় এবং যেগুলি শিক্ষালব্ধ, সেইগুলির মূলে সহজাত প্রয়োজনও কার্য করিতে পারে। আবার ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রয়োজনগুলি পরস্পরের সহিত সংযুক্ত,

১০ সহজাত প্রয়োজনকে পূর্ববর্তী লেখকেরা 'সহজাত বৃত্তি' (instinct) আখ্যা দিতেন। Woodworth-এর ভাষায়: "Unlearned trends were formerly called instincts, but the use of this particular term led to confusion, because an instinct was (and is) defined as an unlearned activity." (*Op. cit.*, p. 370).

কারণ ব্যক্তি ও সমাজ মিথস্ক্রিয়া করার ফলে ব্যক্তিগত প্রয়োজনগুলির উপর সামাজিক ঐতিহ্য, আদর্শ, আশা-আকাঙ্ক্ষার ছায়া পড়ে এবং সামাজিক প্রয়োজনগুলিও ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্রভাবিত হয়।

(খ) কয়েকটি প্রধান প্রধান মানবীয় প্রয়োজন (Few examples of principal human needs):

(১) ক্ষুধা (Hunger):

বাঁচিয়া থাকিতে হইলে ক্ষুধার প্রয়োজন মিটান একান্ত আবশ্যক। ক্ষুধাকে প্রধান দৈহিক প্রয়োজনসমূহের অন্যতম বলা হয়। উদরযন্ত্রের সঙ্কোচন (stomach contraction)-এর ফলে যে দৈহিক সংবেদনের সৃষ্টি হয়, তাহাকেই আমরা 'ক্ষুধার যন্ত্রণা' (hunger pangs) আখ্যা দিয়া থাকি[১১]।

এই ক্ষুধার মূলে যদিও সহজাত দৈহিক প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলেও ক্ষুধার প্রয়োজনের সহিত ব্যক্তিগত বিশেষ অভ্যাস এবং কতকগুলি সামাজিক নীতি বা প্রথা জড়িত থাকে। এইজন্য বিভিন্ন ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে ভোজ্য-দ্রব্য, ভোজন-সময় ও ভোজনপদ্ধতির তারতম্য দেখা দেয়। এক একজন ব্যক্তি এক এক প্রকারের খাদ্য খাইতে ভালবাসে—কেহ বা মাছের ভক্ত, কেহ বা মাংসের ভক্ত, আবার কেহ বা নিরামিষ আহার পছন্দ করে। আবার এক এক সমাজ, গোষ্ঠী ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এক এক প্রকার খাদ্যগ্রহণের রীতি প্রচলিত আছে। পাশ্চাত্ত্য দেশে বা প্রতীচ্যে যে সব খাদ্য গ্রহণের প্রচলন আছে, তাহার সবগুলি প্রাচ্যে প্রচলিত নহে।[১২] আবার, হিন্দু-সমাজে গো-মাংস নিষিদ্ধ, কিন্তু অন্য ধর্মীয়-সম্প্রদায়ে উহা নিষিদ্ধ নহে। অবশ্য নূতন অভ্যাসের ফলে এক সমাজভুক্ত লোক অন্য সমাজের প্রচলিত খাদ্য

১১ ক্ষুধাকে কোন কোন লেখক আন্তরযন্ত্রীয় প্রয়োজন (visceral needs)-এর অন্তর্ভুক্ত করেন। ইহার অধীনে আছে ক্ষুধা-তৃষ্ণা মিটাইবার প্রয়োজন, বিশ্রাম ও নিদ্রার প্রয়োজন এবং মলমূত্রাদির মাধ্যমে শরীরের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় পদার্থের নিষ্কাশনের প্রয়োজন (O. Klineberg, *Social Psychology*, পৃ: ১৭৩ দ্রষ্টব্য)।

১২ তুলনীয়: "English and American people generally eat different items for breakfast. The Chinese avoid milk and milk products and Americans abhor snake meat, although milk is available in China and snakes in America and both foods are nourishing." (Lindesmith & Strauss, *Social Psychology*, p. 271).

গ্রহণ করিতে শিখে এবং উহার প্রতি আসক্তিও জন্মাইতে পারে; যেমন, প্রাচ্যের কিছু সংখ্যক লোক ইচ্ছাপূর্বক পাশ্চাত্ত্যদেশের ভোজনরীতি গ্রহণ করিয়াছে। তাহা ছাড়া, এক এক সমাজে বা দেশে এক এক বিশেষ পদ্ধতিতে ভোজন কার্য সমাধা করা হয়—পাশ্চাত্ত্যদেশীয় প্রথায় আহার·কালে টেবিলের উপর আহার্য ও পানীয় দ্রব্য রাখিয়া ছুরি, কাঁটা, চামচ সহযোগে আহার করা হয়; চীনা প্রথায় কাঠি ব্যবহার করা হয়; ভারতীয় প্রথায় সাধারণত হাত ব্যবহার করা হয়। আবার, অভ্যাস ও দলীয় প্রথা অনুসারে আহারের এক একটি নির্দিষ্ট সময় থাকে, এবং ঐরূপ সময় আগত-প্রায় হইলে ক্ষুধার উদ্রেক বোধ হয়। ইহা ছাড়া, আহারের পাত্র, রন্ধনের পদ্ধতি ইত্যাদিও আমাদের আহারের ইচ্ছার উপর প্রভাব বিস্তার করে। আবার, অনেক সময় মানুষ বিশেষ বিশেষ সঙ্গীর সহিত পান-আহার করিতে ভালবাসে। এইজন্য সে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গলাভের জন্যও মধ্যে মধ্যে পান-আহারে প্রবৃত্ত হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আহারের মূল প্রবৃত্তি জৈব প্রয়োজন মিটাইবার জন্য দেখা দেয়[১৩]; অতএব ক্ষুধার তাড়না বা প্রয়োজন সহজাত।

১৩ যাহা দেহের পুষ্টি ও বর্ধনের জন্য প্রয়োজন তাহারই প্রতি ক্ষুধার স্বাভাবিক স্পৃহা থাকে কি না সে বিষয় নানাবিধ পরীক্ষা করা হইয়াছে। পরীক্ষণাগারে কতকগুলি ইঁদুরকে ভিটামিন্ 'বি' হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়া তাহার পর খাইবার স্বাধীনতা দিয়া দেখা গিয়াছে যে, যে সমস্ত আধারে ভিটামিন 'বি'-সংযুক্ত আহার বা পানীয় আছে, সেইগুলির প্রতিই ঐ সব ইঁদুরের সর্বাধিক আকর্ষণ।

কোন জীবের অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি অপসারিত করার পর উহা অত্যধিক লবণ না গ্রহণ করিলে ১০।১৫ দিনের মধ্যে উহার মৃত্যু ঘটে। কতকগুলি ইঁদুরের অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি অপসারিত করার পর দেখা গিয়াছে যে, তাহাদের কতকগুলি খাবারে যদি অতিরিক্ত লবণ দেওয়া হয়, তাহা হইলে যে সব খাবারে লবণের আধিক্য সেইগুলি খাইবার জন্য তাহাদের অত্যধিক আগ্রহ জন্মে।

ডেভিস্ (Davis) শিশুদের উপর অনুরূপ একটি পরীক্ষা করেন। তিনি কতকগুলি শিশুর সম্মুখে বিভিন্ন প্রকারের প্রায় ত্রিশটি খাবার রাখিতেন এবং তাহাদের ঐ সব খাবার হইতে যাহা খুসী তাহা খাইবার স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। ছয় মাস ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, শিশুরা সাধারণতঃ শরীরের পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্যই আহার করিয়াছে।

অবশ্য এই সব পরীক্ষা হইতে এই সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, সকল সময়ই যাহা শরীরের পক্ষে পুষ্টিকর তাহার প্রতি পরিণতবয়স্কদের স্পৃহা থাকে। যেমন, যকৃতের পক্ষে ক্ষতিকর তৈলাক্ত খাবারের দিকে অনেকের স্পৃহা থাকে, কলে ছাঁটাই চাউল (যাহাতে ভিটামিন্ 'বি'-র অভাব) অনেকে আহার করিতে পছন্দ করে।

কিন্তু কী উপায়ে ক্ষুধার নিবৃত্তি করা যাইবে (অর্থাৎ, কোথায়, কখন, কাহার সহিত এবং কী খাইয়া ক্ষুধার উপশম করিতে হইবে) তাহা শিক্ষালব্ধ (learned)। তাহা ছাড়া, আহারের ইচ্ছার সহিত সকল সময়ই যে দেহের প্রয়োজন (যাহা উদরের সঙ্কোচন জন্য সংবেদনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়) অনুভূত হয় তাহা নহে; যেমন, উদর অপূর্ণ না থাকিলেও বিশেষ প্রকার খাদ্যের গন্ধে, বা আহারের সময় আসিলে, বা কোন প্রিয় ভোজনালয় দেখিলে বা প্রিয় সঙ্গীর সাহচর্যলাভের বাসনায় আমাদের আহারের 'প্রয়োজন' দেখা দিতে পারে।

(২) যৌন প্রয়োজন বা কাম (sex):

জৈব প্রয়োজনগুলির মধ্যে একটি হইল যৌন প্রয়োজন বা কাম। ইহার পূরণের মাধ্যমে ব্যক্তি-বিশেষ তৃপ্তি বোধ করে। ক্ষুধা দূরীকরণ যেমন বাঁচিয়া থাকার জন্য প্রয়োজন, কামের পরিপূরণ অবশ্য সেই অর্থে অপরিহার্য নহে। ক্ষুধার প্রয়োজন যেমন জন্মের পরমুহূর্ত হইতে দেখা যায়, কামতৃপ্তির বাসনা কিন্তু শৈশব হইতে দেখা যায় না; উহা যৌবনের সন্ধিক্ষণে দেখা যায়। (অবশ্য ফ্রয়েডীয় সম্প্রদায়ের মনোবিদ্‌গণ এই মতবাদ গ্রহণ করেন না। পৃঃ ১১৩ দ্রষ্টব্য)।

মানুষের মনে যৌন কামনা উদ্ভবের মূলে যে সমস্ত দৈহিক উপাদান ও পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়, তাহার সহিত মনুষ্যেতর বহু প্রাণীর অনুরূপ কামনার মূলে যে দৈহিক উপাদান থাকে, তাহার সহিত সাদৃশ্য আছে। এই দিক্ হইতে মানুষের কামকে দৈহিক ও সহজাত বলা যায়। তবে মানুষের সামাজিক আচার-ব্যবহার, কৃষ্টি, রীতিনীতি, শিক্ষা ইত্যাদি তাহার কামকে এক জটিলরূপ দান করিয়াছে, এবং বিভিন্ন সমাজের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ইত্যাদির পার্থক্য থাকার জন্য এক এক সমাজে কামের প্রকাশ এক এক আকার ধারণ করিয়াছে।[১৪] আবার ইহাকে কেন্দ্র করিয়া কত প্রক্ষোভ বা

[১৪] তুলনীয়: "In man, the organic factors are much the same as in animals, so that there is undoubtedly an ***unlearned*** trend in sex behaviour. Human courtship must be largely ***learned*** behaviour, it differs so widely from one social group to another." (Woodworth, *op. cit.*, p. 372).

যৌন কামনার প্রকাশ সামাজিক আদর্শের প্রভাবে এক এক সমাজে এক এক কালে কিরূপ বিভিন্নরূপ ধারণা করিয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণীর জন্য Klineberg, ***Social Psychology***, পৃঃ ১২৮-১৫৩ দ্রষ্টব্য।

আবেগ প্রকাশ পায়; ইহাকে ভিত্তি করিয়া মানুষ তাহার পারিবারিক জীবন গড়িয়া তুলে, আবার ইহারই প্রভাবে অনেক মানুষ নানা উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দেয়।

(৩) **মাতৃ-বৃত্তি বা মাতৃত্বের নোদনা (Maternal motive or drive):**

মাতৃত্ববোধের সহিত কতকগুলি দৈহিক পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট থাকে (যথা, কয়েকটি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির হরমোনের প্রভাব, স্তনদুগ্ধের আবির্ভাব ইত্যাদি)। ইহার ফলে সন্তানের জন্মের জন্য মাতৃমনে প্রস্তুতি জাগে এবং সন্তান জন্মের পর তাহার প্রতি নানাভাবে স্নেহের প্রকাশ পায়। অবশ্য মাতৃত্ববোধ ও সন্তান-কামনা এক নহে—কারণ শিশুর জন্মের সময় হইতে মাতৃত্ববোধ দেখা দেয়, কিন্তু সন্তান ধারণের বহু পূর্ব হইতেই সন্তানকামনা থাকিতে পারে।[১৫]

মাতৃত্ববোধের তীব্রতা সকল কৃষ্টির মধ্যে বা সকল নারীর মধ্যে সমভাবে প্রকাশ পায় না। যদিও সাধারণতঃ মাতৃত্ববোধ গর্ভজাত সন্তানকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে (এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অন্যের সন্তানের প্রতিও প্রকাশিত হয়), তাহা হইলেও এমন অনেক আদিম জাতি আছে যাহাদের মধ্যে অপরের পুত্রকন্যাকে দত্তক হিসাবে গ্রহণই স্বাভাবিক বা সাধারণ প্রথা[১৬], এবং সেই কারণে এই সব জাতির স্ত্রীলোকের পক্ষে সন্তান প্রসবের সহিত মাতৃত্ববোধ জড়িত, এ কথা সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য নহে। আবার কোন কোন আদিম জাতির মধ্যে ইহাও দেখা যায় যে, দুই তিনটির বেশী সন্তান স্বল্পব্যবধানে জন্মগ্রহণ করিলে জননী হইয়াও নারী নির্বিকার চিত্তে নবজাত শিশুকে হত্যা করিয়াছে।[১৭] এই সকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মাতৃত্ববোধের একটি সার্বিকরূপ দেওয়া দুরূহ।

১৫ তুলনীয়: "...It is important to keep in mind that there is a distinction, psychologically, between the desire to have children and the urge to care for them. ...Although clearly related biologically, they are distinct as motives." (Klineberg, *Social Psychology*, p. 29).

১৬ যথা, মারে (Murray) দ্বীপ, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, বোর্ণিও ইত্যাদি স্থানের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে।

১৭ যথা, New Hebrides ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে।

এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, সভ্যসমাজে এবং অনেক আদিম জাতির মধ্যেও সন্তানের জনকের মনে পিতৃত্ববোধ এবং তজ্জনিত নোদনা দেখা দেয় (যদিও এইরূপ নোদনার মূলে দেহাভ্যন্তরে কোন জৈবিক বা রাসায়নিক পরিবর্তন দেখা দেয় না)।

(৪) সংগ্রাম ও আত্মরক্ষার প্রয়োজন (Defence & Aggression) :

আমরা যে পরিবেশের মধ্যে বাস করি, তাহা সকল সময় আমাদের অনুকূল বা সহায়ক নহে। এইজন্য আমরা প্রতিকূল অবস্থা হইতে নিজেদের দূরে রাখি অথবা উহার সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হই।

আমাদের দেহ-যন্ত্রের মধ্যেই এমন ব্যবস্থা আছে যে, দেহের পক্ষে ক্ষতিকর অবস্থার উদ্ভব হইলে আমরা উহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া করি : যেমন, দেহের কোন অঙ্গ অতিরিক্ত উত্তপ্ত বস্তুর সংস্পর্শে আসিলে আমরা তৎক্ষণাৎ উহা সরাইয়া লই, নাসিকার মধ্যে অস্বস্তিকর কিছু প্রবেশ করিলে হাঁচিয়া উহাকে বাহির করিয়া দিই ইত্যাদি। আবার, অধিকতর বিপজ্জনক অবস্থার সম্মুখীন হইলে যদি দেখি আমাদের উহাকে প্রতি-রোধের ক্ষমতা নাই, তখন আমাদের অন্তরে ভয়রূপ প্রক্ষোভ দেখা দেয় এবং ঐ স্থান হইতে আমরা পলায়নের চেষ্টা করি।

অপরপক্ষে যদি আমরা দেখি যে, আমরা প্রতিকূল অবস্থার সমকক্ষ হইতে পারি, উহাকে অপসারণ করিবার শক্তি আমাদের আছে, তাহা হইলে আমরা উহাকে আক্রমণ করি বা উহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা কেবল আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই যুদ্ধ করি না, আক্রমণাত্মক (aggressive) স্বভাবের জন্যও যুদ্ধে লিপ্ত হই ; যেমন, কলহপরায়ণ বা 'ঝগড়াটে' স্বভাবের লোকেরা সামান্য অছিলাতেই ঝগড়া করে বা মারামারি করে।[১৮]

---

১৮ Woodworth-এর ভাষায় : "Pugnacious individuals, dogs or men, seem to derive more solid satisfaction from a good fight than from any other amusement. A good fighting dog will sally forth in search of an opponent. A pugnacious person will 'pick a quarrel' by provoking some one who is minding his own business. We must recognise aggressive fighting then, as well as defensive, and both sorts are important in social situations." (*Psychology*, 12th. Ed., p. 375).

(৫) **অনুসন্ধিৎসার বা কৌতূহলের নোদনা (Exploration or Curiosity Drive) :**

জীবমাত্রেরই উহার পরিবেশের উপযুক্ত প্রতিযোজনমূলক (adaptive) কার্য করিবার ক্ষমতা আছে—উহা পরিবেশকে উহার নিজস্ব জ্ঞানের সীমারেখার মধ্যে আনিতে চাহে। সুতরাং অনুসন্ধিৎসা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় ও পেশীর ব্যবহারে প্রকাশিত হয় না—পরিবেশের সহিত পরিচিত হইবার প্রচেষ্টার মাধ্যমেও উহা প্রকাশিত হয়। মানবের ক্ষেত্রে এই নোদনা আরও পরিস্ফুটভাবে দেখা যায়। শৈশব হইতেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। শিশু যখন নূতন কিছু দেখে তখন কৌতূহলভরা চোখে উহা কী তাহা বুঝিবার চেষ্টা করে—কোন শব্দ শুনিলে উহা কিসের শব্দ, কোথা হইতে আসিতেছে তাহা জানিতে চাহে ; কোন কিছু তাহার সম্মুখে ধরিলে সে হাত দিয়া উহা আঁকড়াইতে চাহে। এই সকল ব্যবহারই কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসার প্রকাশক এবং এই সকল ব্যবহার দ্বারা বাহ্যজগৎ কী তাহা জানিতে ও তাহার সহিত প্রতিযোজন করিতে শিশু চেষ্টা করে।

আহার ইত্যাদি প্রাথমিক ও জৈব ব্যবহারের ন্যায় অনুসন্ধিৎসারও মূলে জৈব প্রয়োজন, অর্থাৎ বাঁচিবার উদ্দেশ্য (বা motive of survival) আছে এবং উহাদেরই ন্যায় ইহাও শিক্ষা ও সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়।[১৯]

---

১৯ জীবজগতে অনুসন্ধিৎসামূলক কার্যের কী উদ্দেশ্য এবং উহার জন্য প্রাণী কতটা শক্তি ব্যয় করিতে চাহে ? এই প্রশ্নের উত্তরে একদল লেখক বলেন যে, জীবেরা বাঁচিয়া থাকা, যৌনতৃপ্তির জন্য সঙ্গী পাওয়া এবং নিরাপত্তার মধ্যে থাকা (to survive, to find a mate and to be safe) এই তিন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহারা বাহ্য পরিবেশকে বুঝিতে চাহে। এই কার্যের জন্য তাহারা ন্যূনতম প্রচেষ্টা করে, অর্থাৎ এই তিন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্বাপেক্ষা কম শক্তি ব্যয় করে। ইহাকে বলা হয় '*Law of Least Effort.*'

প্রাণি-মন সম্বন্ধে গবেষণাগারে পরীক্ষা করিয়া কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, উপরে বর্ণিত তিনটি উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজন না থাকিলেও মনুষ্যেতর প্রাণীরা ঘুরিয়া ফিরিয়া পরিবেশকে বুঝিবার বা জানিবার চেষ্টা করে এবং ন্যূনতম শক্তির অধিক শক্তিই তাহারা ব্যয় করে। মানুষের ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য—মানুষ উপর্যুক্ত তিনটি উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্যান্য বহু উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করে। তাহা ছাড়া, মানুষ এক কার্যে স্বল্পশক্তি ব্যয় করিলে অন্য কার্যে অধিক শক্তি ব্যয় করে।

(গ) শিক্ষালব্ধ প্রয়োজন, নোদনা ও উদ্দেশ্য (Learned needs, drives & motives) :

আমরা এ পর্যন্ত যে সকল প্রয়োজনের উদাহরণ দিলাম, তাহাদের সকলগুলিই প্রাথমিক বা জৈবিক, অর্থাৎ কোন-না-কোন জৈব প্রয়োজন মিটাইবার জন্য তাহাদের উদ্ভব হইয়াছিল; কিন্তু ঐ সকল প্রয়োজন মিটাইবার নানা উপায় মানুষ নানাভাবে আবিষ্কার করিয়াছে এবং এই কারণে মানবীয় কার্যসমূহ জটিল আকার ধারণ করিয়াছে।

মানুষ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সম্মুখীন হওয়ার ফলে আবার নূতন প্রয়োজনের সৃষ্টি হয় এবং ঐ সব প্রয়োজন মিটাইবার জন্য নূতন উদ্দেশ্য দেখা দেয়। পরিণতবয়সের সকল প্রয়োজন যে প্রাথমিক জৈব প্রয়োজনকে ভিত্তি করিয়া গঠিত হয় তাহা নহে; নূতন অবস্থার মধ্যে সম্পূর্ণ নূতন প্রয়োজনের উদ্ভব হইতে পারে।[২০] তাহা ছাড়া, কোন প্রাথমিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যাহার প্রয়োজন অনুভূত হয়, তাহা আবার অনেক সময় ক্রমশঃ "স্বাধীনতা" (autonomy) লাভ করে এবং তাহা নিজেই একটি পৃথক্ উদ্দেশ্যে পরিণত হয়। যেমন, একজন হয়ত' জীবিকা অর্জনের জন্য সমুদ্রে মাছ ধরিতে যায়, এখানে সমুদ্রে যাওয়া জীবিকা অর্জনের উপায় হিসাবে উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। কালক্রমে সমুদ্রে যাওয়া নিজেই একটি "স্বাধীন" প্রয়োজনে পরিণত হইতে পারে, অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি পরে সমুদ্রে যাইতে ভাল লাগে বলিয়াই সমুদ্রে যাইতে চাহে—তখন আর উহা জীবিকার্জনের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে না।[২১] এইভাবে বহু নূতন প্রয়োজনের তাড়না ব্যক্তি-বিশেষ অনুভব করে এবং উহার ফলে সে বিবিধ কার্য করে।

মানুষের প্রয়োজনগুলি পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, উহাদের মধ্যে জৈব প্রয়োজন ও সামাজিক প্রয়োজন এবং মুখ্য ও গৌণ প্রয়োজনের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে। কোন প্রয়োজন, নোদনা বা উদ্দেশ্য কেবল দৈহিক (বা জৈবিক) বা কেবল মানসিক বা কেবল সামাজিক নহে। তবে (ক)

---

২০ তুলনীয় : "Radically new motives may emerge from the environment, or better from the individual's dealings with the environment." (Woodworth, *op. cit.*, p. 383).

২১ আলপোর্টের মতবাদ (পৃঃ ২৪৩ দ্রষ্টব্য)।

কতকগুলি প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য আছে যাহারা দেহের রক্ষণ, বর্ধন ও প্রচয়ের জন্য আবশ্যক। তাহাদের যে 'ভিত্তি' সম্পূর্ণরূপে দৈহিক, তাহা অস্বীকার করা যায় না; তবে মানুষের ক্ষেত্রে তাহাদের প্রকাশ ও চরিতার্থতার উপায় সামাজিক প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়। (খ) কতকগুলি প্রয়োজন আছে যাহাদের দৈহিক ভিত্তি আছে এবং সকল সমাজেই যাহাদের প্রকাশ আছে, কিন্তু কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে তাহাদের ব্যতিক্রম ঘটে (অন্ততঃ বাহ্য আচরণে উহাদের প্রকাশ দেখা যায় না), যেমন, যৌনকামনা, মাতৃত্ববোধ। (গ) কতকগুলি প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য আছে যাহারা গৌণতঃ বা পরোক্ষভাবে দেহের সহিত সংশ্লিষ্ট, কিন্তু কোন কোন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে তাহাদের ব্যতিক্রম দেখা যায়; যেমন, আক্রমণাত্মকভাব (aggressiveness), বিপদের মুখে পলায়ন এবং আত্মসাম্মুখ্য (self-assertiveness)। (ঘ) কতকগুলি প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য আছে যাহাদের কোন দৈহিক ভিত্তি জানা নাই, কিন্তু সামাজিক প্রভাবের ফলে অধিকাংশ মানব গোষ্ঠীর ভিতরই তাহাদের দেখা যায়, যেমন, যূথচারিতা (gregariousness), সংগ্রহশীলতা (acquisitiveness), পিতৃত্বের নোদনা (paternal drive)।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মানুষের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য বিভিন্ন কারণে জটিল আকার ধারণ করে। আবার একাধিক প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যের সমাবেশের ফলে একটি কার্য সম্পন্ন হয়। একজন ছাত্র বিদ্যার্জনের কাযে লিপ্ত আছে—উহার মূলে অধিকাংশ স্থলেই বিভিন্ন উদ্দেশ্য কার্য করে; যথা, জ্ঞানলাভ, অর্থলাভ, প্রতিষ্ঠালাভ ইত্যাদি। একজন সম্পত্তির অধিকারী হইতে চাহে, কারণ সে হয়ত' উহার মাধ্যমে সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভ, আর্থিক কৃচ্ছ্রতা নিবারণ, এবং পুত্রাদির ভবিষ্যৎ সংস্থান করিতে চাহে।

মানুষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ঘাত-প্রতিঘাতে নানা উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনের সৃষ্টি হয় এবং ইহারা নানাভাবে মানুষকে পরিচালিত করে।

(ঘ) ব্যর্থতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া (Frustration Reaction Motives)

আমাদের অভিজ্ঞতায় অনেক সময়ই দেখা যায় যে, যে উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আমরা কার্য করি তাহা সকল সময় সার্থক হয় না; অর্থাৎ অনেক সময়

আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। আমরা অনেক সময় এই ব্যর্থতা মানিয়া লই না—ইহার ফলে নানারকম প্রতিক্রিয়া করি। আমাদের এই প্রতিক্রিয়াগুলি দুই প্রকারের—সুপ্রতিযোজনমূলক (adaptive) এবং অপপ্রতিযোজনমূলক (mal-adaptive)।

সুপ্রতিযোজনমূলক প্রতিক্রিয়ায় ব্যর্থতাকে স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, কিন্তু তাহাতে হতাশার ভাব আসে না। বরং প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিকল্প ক্রিয়ার কথা চিন্তা করা হয়; যেমন, আমরা পথ চলিতে চলিতে যদি নির্বাচিত পথ বন্ধ দেখি, তখন অন্য পথ ধরিয়া লক্ষ্যস্থলে যাইতে চেষ্টা করি। সেইরূপ সকল ক্রিয়ার ক্ষেত্রেই যদি নির্বাচিত উদ্দেশ্য পূরণের সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে বিকল্প উপায় বা উদ্দেশ্য (detour behaviour) চিন্তা করিতে পারি (যদিও সকল ব্যক্তি সকল সময় তাহা করে না)। আবার কেহ কেহ 'উদ্গতি' (sublimation)-এর চেষ্টা করে। আমাদের এমন অনেক উদ্দেশ্য আছে যাহা সামাজিক আদর্শের বিরোধী—এরূপ ক্ষেত্রে আমরা উদ্দেশ্য ও উহার সহিত প্রক্ষোভ বা আবেগের বিষয়বস্তু এমনভাবে পরিবর্তিত করিতে পারি যাহাতে উহা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে গ্রহণযোগ্য হয়। যেমন, সকল যৌন বাসনা সকল সময় সমাজ পূর্ণ করিতে দেয় না; এরূপ ক্ষেত্রে ব্যক্তি-বিশেষ কলা-শিল্প, রোমান্টিক কাব্য ইত্যাদি চর্চার মাধ্যমে তাহার আদি বা মূল বাসনার উদ্গতি (sublimation)-এর চেষ্টা করে। কেহ কেহ ক্ষতিপূরণ (compensation)-এর মাধ্যমে ব্যর্থ উদ্দেশ্য গৌণভাবে সার্থক করিতে চাহে। একজন হয়ত' অপরের সঙ্গলিপ্সু, কিন্তু অত্যন্ত কুৎসিত বলিয়া অপরকে আকর্ষণ করিতে পারে না; সে এমন মধুর আচরণ করিতে পারে যে, তাহার বাহ্য কুৎসিৎ রূপ সত্ত্বেও অপরে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। এক্ষেত্রে তাহার মধুর ব্যবহার কুরূপের ক্ষতিপূরণ করিল।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ ব্যর্থতাকে মানিয়া লইতে পারে না এবং উহার বিরুদ্ধে অপপ্রতিযোজনমূলক কার্য করিয়া থাকে[২২]।

---

২২ "পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্রের আত্মহত্যা", "বরখাস্ত কর্মচারী কর্তৃক প্রাক্তন মনিব ছুরিকাহত", "ক্রুদ্ধ জনতা কর্তৃক চালের গুদাম লুঠ"—ইত্যাদি যে সমস্ত সংবাদ আমরা সংবাদপত্রে প্রায়ই পড়িয়া থাকি, সেইগুলি হইল ব্যর্থতার বিরুদ্ধে অপপ্রতিযোজনমূলক কার্য।

বিবিধ অপপ্রতিযোজনমূলক কার্যের মধ্যে অন্যতম হইল আক্রমণাত্মক ব্যবহার (aggression)। ইহা যে কেবল দৈহিক আঘাতের রূপ ধারণ করে তাহা নহে, অনেক স্থলে ইহা তীব্র 'মৌখিক প্রতিবাদের' (যেমন, ঝগড়া, চেঁচামেচি, গালাগালি) আকার ধারণ করে। আবার যেখান হইতে মানুষ বাধা পায়, অনেক সময় তাহাকে আক্রমণ না করিয়া যাহার সহিত বাধার সংস্রব নাই তাহাকে আক্রমণ করে; যেমন, অফিসে তিরস্কৃত হইয়া কেহ হয়ত' বাড়ীতে ফিরিয়া অপরের সহিত ঝগড়া করে।

এই আক্রমণ আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অপরের উপর না হইয়া নিজের উপরও হইতে পারে; তখন ইহা আত্মনিগ্রহ (যথা, নিজেকে নিজে আঘাত করা, উপবাস করিয়া থাকা), এমন কি আত্মহত্যা বা আত্মধ্বংসের রূপ ধারণ করিতে পারে।

কোন কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যর্থতার ফলে প্রত্যাবর্তন (regression) ঘটে। এরূপ লোক শিশুসুলভ আচরণ করে; কারণ শৈশবে পিতামাতার স্নেহযত্নের মধ্যে সবাধিক নিরাপত্তা ছিল এবং অনুরূপ অবস্থায় ফিরিয়া যাইলে নিরাপত্তা মিলিবে, এই ধারণা নির্জ্ঞানস্তরে থাকে।

কেহ কেহ আবার ব্যর্থতার ক্ষেত্র হইতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত (withdraw) করিয়া অন্য ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করে; যেমন, যাহার পারিবারিক জীবন ব্যর্থ হইয়াছে, সে হয়ত' 'দেশের সেবায়' কিংবা 'সমাজ সংস্কারের' কার্যে নিজেকে সর্বদা ব্যস্ত রাখে। এইরূপ ক্ষেত্রে কেহ কেহ ব্যক্তিগত জীবনের তীব্র শোক বা তিক্ত অভিজ্ঞতা মদ্যপান ইত্যাদির দ্বারা ভুলিতে চাহে।

স্বীয় জীবনের ব্যর্থতাকে জয় করিতে পারিয়াছে, এইরূপ কল্পনা কেহ কেহ মনঃসৃষ্টি (phantasy), বা দিবাস্বপ্ন (day-dreaming)-এর মাধ্যমে করিয়া থাকে। (পৃঃ ৬৫৫-৫৭)। যাহাকে স্কুলের বন্ধুরা 'অক্ষম' মনে করিয়া খেলিতে নেয় না, সে হয়ত' দিবাস্বপ্ন দেখে যে, ভবিষ্যতে সে আই. এফ্. এ. শীল্ড ম্যাচে খেলিয়া প্রচুর সাফল্য অর্জন করিয়াছে এবং তাহারই স্কুলের বন্ধুরা অবাক্ বিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া আছে!

কেহ কেহ নিজের ব্যর্থতার জন্য নিজের দায়িত্ব বা অক্ষমতা স্বীকার না

করিয়া উহার সপক্ষে মিথ্যা যুক্তি দেখায়। ইহাকে বলা হয় 'যুক্ত্যাভাস' (অর্থাৎ যুক্তির আভাস, বা 'rationalisation')। যেমন, যে ছাত্র পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর 'অনার্স' পাইবে বলিয়া খুব দম্ভভরে প্রচার করিয়া বেড়াইত, সে যখন তাহা পাইল না, তখন হয়ত' সে বলিয়া বেড়াইবে (এবং মনে মনে বিশ্বাসও করিবে) যে, তাহার উত্তরের ভঙ্গিমা এত উচ্চস্তরের এবং মৌলিক (original) হইয়াছিল যে, 'সেকেলে' পরীক্ষকেরা তাহার উত্তরের উপযুক্ত মর্যাদা দিতে পারে নাই। এই ক্ষেত্রে আবার অন্যের উপর দোষার্পণ করিয়া নিজের দোষ স্খালন করা হইল—ইহাকে বলা হয় 'অভিক্ষেপ' (projection।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, **যেমন কোন লক্ষ্যে পৌঁছিবার ইচ্ছা ব্যক্তি-বিশেষকে কার্যে প্রবৃত্ত করে, সেইরূপ বাঞ্ছিত লক্ষ্যে না পৌঁছিতে পারিলেও ব্যর্থতা তাহাকে নানা কার্যে বা অপকার্যে নিয়োজিত করে।**

৪। নির্জ্ঞান প্রেষণা—ফ্রয়েডীয় মতবাদ (Unconscious Motivation—Freudian theory):

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে সমস্ত কার্য করি তাহার পশ্চাতে কী উদ্দেশ্য আছে তাহা আমরা সকল সময় জানি না। অনেক সময় আমরা এই সব কার্যকে 'আকস্মিক', 'অভ্যাসগত', 'রোগের লক্ষণ' ইত্যাদি নানাভাবে অভিহিত করি; কিন্তু ইহা দ্বারা ঐ সব কার্যের প্রকৃত কারণ বা উদ্দেশ্য অব্যাখ্যাত রহিয়া যায়। এই সব কার্যের কারণ আমাদের চেতনার অগোচরে নির্জ্ঞানস্তরে থাকে বলিয়া ইহাদের ব্যাখ্যা এত দুরূহ হয়। এই মতের প্রধান সমর্থক হইলেন ফ্রয়েড্ ও তাঁহার অনুগামিগণ।

ফ্রয়েডীয় মতবাদের মূলসূত্রগুলি আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি (পৃঃ ১০৯-১৬, ২৯১-৯৩)। বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা কয়েকটি ফ্রয়েডীয় বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিব:

(১) আমাদের সকল কার্যের মাধ্যমে কাম (libido) তৃপ্তির সন্ধান খুঁজিতেছে। এইজন্য বলিতে পারা যায় যে, আমাদের সকল মানসিক ক্রিয়া **'সুখ-সূত্র'** (pleasure principle) অনুসরণ করিয়া চলে। বাস্তবক্ষেত্রে কিন্তু সকল সময় ইচ্ছামাত্র যে কোন সুখ পাইবার চেষ্টা করা বিপজ্জনক;

সেইজন্য ভবিষ্যতে অধিকতর সুখের আশায় বর্তমানের সুখের সম্ভাবনা ত্যাগ করিতে হয়। ইহাকে বলা হয় **'বাস্তবতা-সূত্র'** (Reality-principle)।[২৩]

(২) আমাদের বাসনা সকল সময় সামাজিক আদর্শানুগ নহে; এইজন্য সমাজে আমাদের সকল বাসনা পূর্ণ হয় না। যে সমস্ত বাসনা পূর্ণ হওয়া সম্ভব নহে, সেইগুলিকে অবদমন (repress) করা হয়।

(৩) আমাদের মনের তিনটি বিভিন্ন স্তর (levels) আছে—সংজ্ঞান, আসংজ্ঞান ও নির্জ্ঞান। যে সমস্ত বাসনাকে আমরা অবদমন করি, সেইগুলি মন হইতে সম্পূর্ণরূপে বহিষ্কৃত হয় না—তাহারা মনের নির্জ্ঞানস্তর আশ্রয় করিয়া থাকে। নির্জ্ঞান হইল অবদমিত বাসনার আধার (১১২ পৃষ্ঠার চিত্র দ্রষ্টব্য)। ঐ স্তরে বাসনাগুলি ক্রিয়াশীল (dynamic) থাকে এবং উহারা সংজ্ঞান স্তরের কার্যের মাধ্যমে নিজেদের প্রকাশ করিয়া চরিতার্থতা বা তৃপ্তির সন্ধান করে।

(৪) বাসনাগুলি যখন আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে, তখন সাধারণতঃ উহারা নিজেদের সামাজিক আদর্শ-বিরোধী রূপটিকে এমন কৌশলে প্রতীক (symbol)-এর অন্তরালে লুক্কায়িত রাখে যে তাহাদের চেনা যায় না।

(৫) শৈশব হইতেই কামের প্রকাশ ঘটে এবং ব্যক্তি-বিশেষের ভাবী কালের ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণসমূহ শৈশবের কামজ বাসনা (libidinous

২৩ **তুলনীয় :** "In the psychoanalytic theory of the mind we take it for granted that the course of mental processes is automatically led by the 'pleasure-principle'; that is to say, we believe that any given process originates in an unpleasant state of tension and therefore determines for itself such a path that its ultimate issue coincides with a relaxation of this tension, *i.e.*, with avoidance of 'pain' or with production of pleasure." "Under the influence of the instinct of the ego for self-preservation, it is replaced by 'the reality-principle' which without giving up the intention of ultimately attaining pleasure yet demands and enforces the postponement of satisfaction...". (S. Freud, ***Beyond the Pleasure Principle***, p. 185). [ইহার সহিত গ্রীক দার্শনিক এপিকিউরাসের 'মার্জিত সুখবাদ' (Refined Egoistic Hedonism) তুলনীয়]।

সুখান্বেষী বাসনার শক্তি বা 'চাপ'-কে গতিশীল তরলপদার্থের চাপের (pressure in a hydraulic system-এর) সহিত Hendrick তুলনা করিয়াছেন। (তাঁহার রচিত ***Facts and Theories of Psychoanalysis*** দ্রষ্টব্য)।

wishes)-এর সহিত সংশ্লিষ্ট। শৈশবে যে সকল বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া কাম আত্মপ্রকাশ করে এবং এই সকল স্তরে শিশু যে সকল দ্বন্দ্ব, ব্যর্থতা ও উৎকণ্ঠার সম্মুখীন হয়, সেইগুলি ব্যক্তিত্বের স্বরূপ নির্ধারণ করে।

এই কয়েকটি সূত্র হইতে প্রেষণা সম্বন্ধে ফ্রয়েডের মতবাদ বুঝা যাইতে পারে:

(১) প্রেষণার বিষয়-বস্তু ও প্রকাশের রূপ নির্জ্ঞানস্তরে অবস্থিত অবদমিত বাসনার দ্বারা নির্ধারিত। (২) এইগুলি অনেকক্ষেত্রে অতীতের অর্থাৎ শৈশবের অভিজ্ঞতার সহিত সংশ্লিষ্ট। (৩) আমাদের বাসনাগুলি দুঃখ বা কষ্ট পরিহার করিবার চেষ্টা করে এবং সুখের অন্বেষণ করে।

এখন কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাউক্।

(১) আমরা কথা বলা বা লেখায় যে ভুল করি বা করণীয় কার্য করিতে যে ভুল করি, তাহা কোন-না-কোন ইচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত (যদিও সে ইচ্ছা নির্জ্ঞানস্তরে থাকে বলিয়া ঐ সম্বন্ধে আমরা অবগত নহি)। (পৃঃ ৩৩৫ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং আমরা ভুল করিতে চাই বলিয়া ভুল করি।[২৪]

রামবাবু তাঁহার 'বিশেষ বাল্যবন্ধু' উমাপতিবাবুর নাম হয়ত' কোন প্রয়োজনের সময় কিছুতেই মনে করিতে পারিলেন না; তিনি যদুপতি, ধনপতি, গজপতি ইত্যাদি অনেক নামই মনে করিলেন, কিন্তু আসল নামটি মনে আসিল না। এক্ষেত্রে হয়ত' দেখা যাইবে যে, বাল্যকালে উমাপতিবাবু রামবাবুর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন এবং তখন হইতেই রামবাবু উমাপতিবাবুকে পছন্দ করেন না; কিন্তু সে ভাব তিনি কখনও প্রকাশ করেন নাই (সম্ভবতঃ লোকলজ্জার ভয়ে প্রকাশ করিতে সাহসও পান নাই)।

আমরা অনেক সময় যাহা মনে মনে ইচ্ছা করি বা যে ভাব গোপনে পোষণ করি (কিন্তু প্রকাশ করিতে চাহি না), 'ভুলক্রমে' তাহাই বলিয়া ফেলি বা লিখিয়া ফেলি। যেমন, কোন সভার সভাপতি সভারম্ভের প্রথমেই

---

২৪ 'ভুল' সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্য ফ্রয়েডের *Introductory Lectures on Psychoanalysis*, Lect. II-IV দ্রষ্টব্য।

যদি বলিয়া ফেলেন যে 'এইবার সভার কার্য শেষ হইল', তখন বুঝিতে হইবে যে, তিনি তাঁহার মনের নির্জ্জানস্তরে অতি শীঘ্রই সভার সমাপ্তি ইচ্ছা করেন।

লিখিবার সময় আমরা নির্জ্জান বাসনার প্রভাবে ভুল করি। নূতন বৎসরের প্রারম্ভে অনেক সময় আমরা তারিখ লিখিবার সময় বিগত বৎসর লিখিয়া ফেলি। এস্থলে সাধারণতঃ বলা হয় যে, এক বৎসরের পুরাতন অভ্যাস চলিয়া যাইতে চাহে না বলিয়া এইরূপ ভুল হয়। ফ্রয়েডের মতে কিন্তু ইহার কারণ এই যে, মনের নির্জ্জানস্তরে আমরা মোটেই পছন্দ করি না যে, আমাদের বয়স বাড়িয়া যাউক এবং আমরা বার্ধক্যের পথে অগ্রসর হই। সেইরূপ টাইপিষ্টের টাইপ্ করায় ভুল বা কম্পোজিটরের কম্পোজ করায় ভুল আলোচনা করিলেও আমরা তাঁহাদের নির্জ্জানস্তরের সুপ্ত বাসনার খবর জানিতে পারি।[২৫]

আমরা কোন একটি জিনিষ কোথায় রাখিয়াছি তাহা মধ্যে মধ্যে ভুলিয়া যাই; যেমন, ক্যাশবাক্সের চাবি কোথায় রাখিয়াছি তাহা মনে করিতে পারি না। ইহার কারণ এমন হইতে পারে যে, আমরা টাকা খরচ করিতে চাহি না বলিয়া চাবির কথা মনে করিতে পারি না। ডাকবাক্সের চিঠি দিবার জন্য চিঠি মাঝে মাঝে পকেটেই পড়িয়া থাকে, তাহা আর ডাকবাক্সে ফেলা হয় না। ইহার কারণ এই হইতে পারে যে, যাহার উদ্দেশ্যে চিঠি লেখা হইয়াছে মনের সঙ্গোপনে তাহাকে মোটেই পছন্দ করি না এবং নিতান্ত 'দায়ে পড়িয়া' হয়ত' তাহাকে চিঠি লিখিয়াছি; অথবা অপরের লেখা চিঠি যদি তাহার অনুরোধে ফেলিবার জন্য লইয়াছি হয়, তাহা হইলে এমন হইতে পারে যে,

২৫ এখানে একটি গল্পের উল্লেখ করা যাইতে পারে:

এক সংবাদপত্রের ছাপাখানার কম্পোজিটরকে নিম্নলিখিত সংবাদটি কম্পোজ করিতে হয়: 'The Crown Prince presided over the function'। তিনি কম্পোজ করিবার সময় Crown কথাটির 'r'-এর স্থলে 'l' বসাইয়া ফেলিলেন। প্রুফ-রীডারও উহা লক্ষ্য করিলেন না। সংবাদপত্রে ছাপা হইল "The Clown Prince..."; কর্তৃপক্ষ ঐ কম্পোজিটরকে একটি 'সংশোধনী' পরের সংখ্যায় বাহির করিতে নির্দেশ দেন। সেবারে তিনি Crown কথাটির 'n' ফেলিয়া দিলেন; সুতরাং পরের সংখ্যার 'সংশোধনী'-তে ছাপা হইল "The Crow Prince..."। এ ক্ষেত্রে হয়ত' দেখা যাইবে যে, কম্পোজিটরের এবং হয়ত' প্রুফ-রীডারেরও নির্জ্জানে রাজতন্ত্রের প্রতি বিদ্বেষ আছে এবং তাই তাঁহারা 'Crown Prince' পদটি লইয়া এত গোলযোগ করিতেছেন।

অনুরোধকারী বা অনুরোধকারিণীকে মনের অগোচরে আর পছন্দ করি না এবং তাহার প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইবার জন্য তাহার অনুরোধ (অর্থাৎ, চিঠি ফেলা) পালন করিতেছি না।

(২) আমাদের কতকগুলি কাজ আছে যাহার সপক্ষে আমরা যে 'যুক্তি' দেখাই তাহা মোটেই গ্রহণযোগ্য নহে; তাহাদের আসল কারণ নির্জ্ঞানস্তরে নিহিত থাকে। এমন কোন কোন শিক্ষক আছেন যাঁহারা অতি সামান্য ক্রটির জন্য নির্দয়ভাবে ছাত্রদের প্রহার করেন; তাঁহারা বলেন যে, ছাত্রদের 'মঙ্গলের' জন্যই তাঁহারা প্রহার করেন। কিন্তু তথাকথিত 'লাঠ্যৌষধ' নির্বিচারে প্রয়োগ করিলেই যে ছাত্রেরা 'মানুষ' হয় না একথা সকলেই জানেন; তাহা ছাড়া যেরূপ সামান্য অজুহাতে এবং যেরূপ নির্দয়ভাবে তাঁহারা প্রহার করেন, তাহাতে তাঁহাদের যুক্তি গ্রহণ করা চলে না। এরূপক্ষেত্রে হয়ত' দেখা যাইবে যে, ঐ সব ব্যক্তিরা তাঁহাদের নির্জ্ঞানে মর্ষকামী (sadist) এবং তাঁহারা প্রহার করিয়া সুখ পান বলিয়া প্রহার করেন। সুতরাং কেবল প্রহাররূপ কার্য নহে, তাঁহাদের বাহ্য **'যুক্ত্যাভাস'** (rationalisation)-ও **নির্জ্ঞানস্তর দ্বারা প্রেষিত**।

(৩) কোন কোন ব্যক্তির দেখা যায় যে, তাঁহারা **অস্বাভাবিক নিষ্ঠার** সঙ্গে কোন একটি আচার পালন করেন: যেমন, কেহ কেহ দিনের মধ্যে বহুবার অনেকক্ষণ ধরিয়া 'হাত-পা' পরিষ্কার করিবার জন্য ধুইতে থাকেন এবং কিছুতেই যেন সন্তুষ্ট হ'ন না। এরূপ ক্ষেত্রে হয়ত' দেখা যাইবে যে, ঐরূপ ব্যক্তিদের নির্জ্ঞানস্তরে 'অপরাধের ধারণা' আছে এবং তাঁহারা যেন ঐরূপ আচারের মাধ্যমে নিজেদের পাপকে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছেন।[২৬]

(৪) **হিষ্টিরিয়া ও বিবিধ মানসিক রোগের লক্ষণগুলি** অপূরিত বাসনাদ্বারা প্রেষিত (পৃঃ ১১১)। সেইরূপ **স্বপ্নের** ভিতর যে সমস্ত প্রতিরূপ আমরা দেখি সেগুলিরও মূলে আছে অবদমিত বাসনা। এক ব্যক্তি

২৬ ফ্রয়েডের চিকিৎসাধীন এক রোগিনী ঘুমাইবার পূর্বে অতি যত্নে সকল ঘড়ি বন্ধ করিয়া দিতেন অথবা শুইবার ঘরের বাহিরে রাখিয়া দিতেন—এমন কি ক্ষুদ্র রিষ্ট্-ওয়াচ্ও বাদ যাইত না। কাঁচের ফুলদানী, গ্লাস ইত্যাদি সব নামাইয়া জড় করিয়া রাখিতেন পাছে তাহারা পড়িয়া গেলে শব্দ হয়। ফ্রয়েড্ মনঃসমীক্ষণের ফলে আবিষ্কার করেন যে, তাহার এই আচরণের কারণ তাহার নির্জ্ঞানে সুপ্ত কামজ বাসনার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। (Freud, *Introductory Lectures*, pp. 224-25).

লিখিতে বা বলিতে বা পড়িতে একটি বিশেষ ভুল কেন করিল তাহার কারণ যেমন নির্জ্ঞানস্তরে নিহিত থাকে, সেই অর্থে একজন ব্যক্তি স্বপ্নে যে এক বা একাধিক বিশেষ প্রতিরূপ কেন দেখিল তাহার কারণও নির্জ্ঞানস্তরে পাওয়া যায়।

(৫) আবার ব্যক্তি-বিশেষ নিজের ভাবপ্রকাশের জন্য মুখের ও দেহের অন্যান্য অংশের যে সব ভঙ্গিমা (phenomena related to facial and other expressive movements) দেখায়, সেগুলিও নির্জ্ঞানস্তরের বাসনা দ্বারা প্রেষিত।[২৭]

আমরা উপরের যে কয়েকটি উদাহরণ দিলাম, তাহাতেই বুঝা যায় যে, ফ্রয়েডীয় মনোবিদ্‌গণের মতে কিরূপ ব্যাপকভাবে নির্জ্ঞান বাসনা আমাদের কার্যকে নিয়ন্ত্রিত করে। এগুলি নানাভাবে নিজেদের 'আবৃত' বা 'গুপ্ত' রাখে এবং তাহার ফলে তাহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংজ্ঞানস্তরে বিন্দুমাত্র অবগতি থাকে না।[২৮]

সমালোচনা ঃ

(১) ফ্রয়েডীয় মতবাদ সকল মনোবিদের নিকট গ্রহণযোগ্য নহে; বিশেষতঃ ফ্রয়েডীয় মনোবিদ্যায় কামের উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে তাহা সকলে গ্রহণ করেন না। আমাদের প্রেষণার মূলে 'কাম' ব্যতীত অন্য জৈব প্রয়োজন বা সহজাত বৃত্তিও থাকিতে পারে (যেমন, ক্ষুধার তাড়নাতেও আমরা অনেক কার্য করিতে পারি)।[২৯]

(২) দ্বিতীয়তঃ, আমাদের কার্যগুলি অনেক সময় বাহ্য পরিবেশের প্রতিক্রিয়ারূপে সাধিত হয়। যেমন, আড্‌লার্‌ বলেন যে, বাহ্য পরিবেশের সহিত মিথস্ক্রিয়ার প্রভাবে অনেক শিশুই নিজেকে 'হীন' (inferior) বোধ করে এবং এই হীনতা-বোধের বিরুদ্ধে অবলম্বিত প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে তাহার ব্যক্তিত্ব

২৭ Freud, *Collected Works*, Vol. XIII, p. 166 দ্রষ্টব্য।

২৮ তুলনীয়: "Psychoanalysts believe that not only is there much duplicity and concealment about motives, but most persons actually *know very little about their own motivations*." (Lindesmith & Strauss, *op. cit.*, p. 287).

২৯ মার্ক্সবাদের মতে সমাজের বিবর্তন এবং ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া অর্থনৈতিক কারণ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং মার্ক্সবাদ ফ্রয়েডীয় মতবাদের বিপরীত।

গঠিত হয়। (পৃঃ ১২১-২৩ দ্রষ্টব্য)। আড্‌লারের মত সকল ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য না হইতে পারে; কিন্তু আমাদের প্রেষণা তথা ব্যক্তিত্বের মূলে যে সামাজিক পরিবেশের বিপুল প্রভাব আছে সেইদিকে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন; এবং উহা অস্বীকার করা যায় না। সামাজিক পরিবেশের গুরুত্ব অবহেলা করা ফ্রয়েডীয় মতবাদের অন্যতম ত্রুটি বলিয়া অনেকে মনে করেন।

(৩) তৃতীয়তঃ, ফ্রয়েড্‌ প্রেষণার ব্যাখ্যার জন্য ব্যক্তি-বিশেষের অতীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করেন; অর্থাৎ ফ্রয়েড্‌ মনে করেন যে, প্রেষণার মূলে যে অবদমিত বাসনা কার্য করে তাহা শৈশবের এমন কোন কামজ বাসনা (infantile libidinous desire) যাহা পূরণ করা সম্ভব হয় নাই বলিয়া অবদমিত হইয়াছিল। সেইজন্য তিনি কৃপণতা, খুঁটিনাটির উপর জোর দেওয়া ইত্যাদি লক্ষণ প্রেষণায় প্রকাশ পাইলে উহাদের সহিত পায়ুকামের সংযোগ আছে বলেন, বা আক্রমণাত্মক প্রেরণার সহিত মুখকামের সংযোগ আছে বলেন (পৃঃ ২৯২ দ্রষ্টব্য)। এই মতের বিরোধিতা করিয়া গর্ডন আল্‌পোর্ট বলেন যে, প্রেষণা অতীতের নহে—সকল প্রেষণাই বর্তমানের (all motivation is contemporary)। পরিণতবয়সের সকল প্রেষণ কোন একটি জৈব প্রয়োজনে বা সহজাত বৃত্তির দ্বারা চালিত হয় না—তাহারা কার্মিক স্বাধীনতা (functional autonomy) লাভ করে (পৃঃ ২৪৩-৪৪ দ্রষ্টব্য)। শৈশবের প্রেরণাসমূহের সহিত পরিণতবয়সের প্রেষণার যে সংস্রব তাহা ঐতিহাসিক সংযোগ (historical contact) মাত্র, কার্মিক সম্বন্ধ (functional relation) নহে।

তাহা ছাড়া, সকল প্রেষণাকে অতীত বা শৈশবের বাসনার সহিত সংযুক্ত করা চলে না। ফ্রয়েড্‌ নিজেই উদাহরণ দিয়াছেন যে, যদি কোন সভার সভাপতি সভার প্রারম্ভে ভুলক্রমে বলিয়া ফেলেন যে, সভার কার্য শেষ হইয়াছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সভা দীর্ঘস্থায়ী হউক্ ইহা তিনি মোটেই পছন্দ করেন না। এই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হইতে পারে; কিন্তু এ ক্ষেত্রে শৈশবের কামের সহিত সভা পরিচালনায় অনিচ্ছার কী প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকিতে পারে?

(৪) ফ্রয়েড্‌ উদ্দেশ্য (motive) এবং প্রেষণা (motivation) এই দুইটিকে 'পূর্ববর্তী কারণ' (cause) এবং 'ভবিষ্যতের সম্ভাব্য লক্ষ্য' (purpose) এই দুই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। আধুনিক অনেক

লেখকই উদ্দেশ্যকে 'কারণ' হিসাবে বর্ণনা করেন না (পৃঃ ৩৬৯ দ্রষ্টব্য); কিন্তু ফ্রয়েড্ এই পার্থক্য অগ্রাহ্য করিয়া উদ্দেশ্য ও প্রেষণা পদদ্বয়কে দ্ব্যর্থবোধক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।[৩০]

(৫) পরিশেষে এই কথা বলা যায় যে, আমাদের উদ্দেশ্য এবং প্রেষণার প্রকার ভেদ আছে। আমাদের সকল উদ্দেশ্যই নির্জ্ঞানের ইঙ্গিতে পরিচালিত হয়, সকল প্রেষণার মূলেই অবদমিত বাসনা কার্য করে, ইহা বলিলে বোধ হয় অতিশয়োক্তি হইবে। **যেখানে সংজ্ঞান বাসনা** (conscious wish)-এর **আলোকে কোন প্রেষণার সুষ্ঠু, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা সম্ভব, সেখানে তাহাই গ্রহণ করা উচিত; আর যেখানে তাহা পাওয়া যায় না, সেখানে নির্জ্ঞানস্তরের বাসনা বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করিয়া উহার মাধ্যমে প্রেষণার ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করা উচিত।**[৩১]

৫। বিবিধ উদ্দেশ্যের আপেক্ষিক শক্তি (Relative strength of motives):

মানুষ নানা উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া কার্য করে এবং এই সকল উদ্দেশ্যের শক্তি বা তীব্রতা সমান নহে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে কেহ কেহ বলেন যে, ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করিলে দেখা যাইবে যে, ক্ষুধার নোদনা বা তাড়না সর্বাপেক্ষা তীব্র; মনঃসমীক্ষণবাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে অপর এক দল বলেন যে, মানুষ যে সমস্ত সমস্যার সমাধান করিতে না পারার জন্য তাহার বৈলক্ষণ্য দেখা দেয়, সেইগুলি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাহাদের

৩০ তুলনীয়: "Freud's ordinary concept of unconscious motive is both of cause behind and purpose in the neurotic condition..." (MacIntyre, *The Unconscious*, pp. 61-62).

৩১ R. S. Peters-এর মত লক্ষণীয়: "......there is a kind of gradation in the relevance of explanations in terms of unconscious wishes. Some actions have such obvious and acceptable reasons that reference to unconscious wishes seems grotesquely out of place...Then there are actions where the stated reason is *unconvincing*. In such cases the first move is usually to look round for a *concealed* conscious motive...But often there is no such concealed reason; and in such cases we have recourse to *unconscious wishes* which are *sufficient* to explain what he does." (*The Concept of Motivation*, p. 61).

সকলেরই মূলে কাম (libido) আছে। এই মতবিরোধের সমাধান করা দুরূহ, কারণ মানুষের উদ্দেশ্য বহু ঘটনার সমাবেশে নির্ধারিত হয় এবং এইজন্য কোন সাধারণ বা সর্বজনীন সূত্র দেওয়া উচিত নহে। অনেক সময় একই অবস্থার মধ্যে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন উদ্দেশ্য দ্বারা চালিত হয়; যেমন, যখন হঠাৎ কোথায় আগুন লাগে, তখন কেহ বা নিজেকে বাঁচাইবার চেষ্টা করে, কেহ বা নিজের কথা না ভাবিয়া কোন প্রিয়জনের বা এমন কি নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তির প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করে; আবার কেহ বা ক্যাসাবিয়াঙ্কার মত নির্ভীকভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। আবার, একই মানুষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে কার্য করে—এক সময়ে যে ব্যক্তি আত্মসংযমী ছিল, সেই হয়ত' অন্য সময় রিপুপরবশ হইয়া কার্য করিয়া বসিল। তাহা ছাড়া, আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, মানুষ কেবল জৈব প্রয়োজন দ্বারা চালিত হয় না—বিভিন্ন পরিবেশ, বিভিন্ন কৃষ্টি, বিভিন্ন সামাজিক ও নৈতিক আদর্শ তাহার জীবনকে রূপায়িত করে। আবার জৈব প্রয়োজনগুলি শিক্ষা-নিরপেক্ষ হইলেও তাহাদের চরিতার্থতার উপায় শিক্ষার দ্বারা প্রভাবিত। সুতরাং মানুষের উদ্দেশ্যগুলির তীব্রতা প্রাখর্য অনুসারে সাজাইয়া একটি সর্বজনপ্রযোজ্য তালিকা রচনা করা সম্ভব নহে।

এইজন্য অনেক মনোবিদ্ মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে পরীক্ষণের মাধ্যমে নোদনা ও প্রয়োজন (drives & needs)-এর তীব্রতা নির্ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন। কারণ ইহাদেরই ক্ষেত্রে নোদনা ও প্রয়োজনসমূহকে অপেক্ষাকৃত "শুদ্ধ" অবস্থায় পাওয়া যায়।

কতকগুলি ইঁদুরকে ২৪ ঘণ্টার জন্য ক্ষুধা ও যৌনবৃত্তি তৃপ্তির সুযোগ হইতে বঞ্চিত রাখা হয়। তাহার পর তাহাদের ঐ দুইটি বৃত্তিকেই পরিতৃপ্তির সুযোগ দান করা হয়। ইহার ফলে দেখা যায় যে, শতকরা ৭৭টি ইঁদুর প্রথমেই ক্ষুধা পরিতৃপ্তির চেষ্টা করে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, ক্ষুধার তাড়না কামের তাড়না অপেক্ষা তীব্রতর। এখানে অবশ্য কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, ২৪ ঘণ্টা ইঁদুরগুলিকে উপবাসী রাখিয়া তাহাদের দেহ তথা যৌনকামনাকে দুর্বল করিয়া ফেলা হইয়াছিল।

এই বিষয়ে একটি সন্তোষজনক পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন ওয়ার্ডেন (C. J. Warden)। এই পদ্ধতিটিতে একটি কৃত্রিম বাধাদানের ব্যবস্থা আছে এবং ইহাতে

লক্ষ্য করা হয় যে, বিশেষ বিশেষ নোদনার প্রভাবে কতবার ইঁদুরগুলি বাধা অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতেছে। এস্থলে অনুমান করা হয় যে, নোদনার তীব্রতা বাড়িলেই ইঁদুরগুলি বাধাকে অগ্রাহ্য করিবে।

এখানে পরীক্ষণের জন্য প্রস্তুত বাক্সটি এইরূপ। উহার একটি প্রান্তের কক্ষে ইঁদুরকে রাখা হয়, অপর প্রান্তের কক্ষে উদ্দীপক বা প্ররোচক (যথা, খাদ্য, জল, সঙ্গী ইত্যাদি) রাখা হয় এবং মধ্যস্থলে থাকে বাধা-কক্ষ (obstruction compartment)—ইহাতে বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা ধাক্কা' বা 'শক্' দিবার ব্যবস্থা থাকে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম, মাতৃত্ব এবং অনুসন্ধিৎসা—এই কয়েকটি নোদনা সম্বন্ধে গবেষণা করা হয়। ইহাদের একটিমাত্র নোদনা বা প্রয়োজনকে অতৃপ্ত রাখিয়া ইঁদুরটিকে স্বীয় কক্ষে রাখা হয় এবং অপর প্রান্তের কক্ষে (অর্থাৎ Reward Chamber বা পুরস্কার কক্ষে) ঐ বিশেষ প্রয়োজনকে তৃপ্ত করিবার উপায়ের ব্যবস্থা করা থাকে (যেমন, ক্ষুধার ক্ষেত্রে খাদ্য রাখিবার ব্যবস্থা থাকে)। এক একটি নোদনাকে অতৃপ্ত রাখিয়া দেখা হয় যে, ইঁদুরটি বাধা-কক্ষ অতিক্রম করিবার কতবার চেষ্টা করিতেছে। (নিম্নস্থ চিত্র দ্রষ্টব্য)।
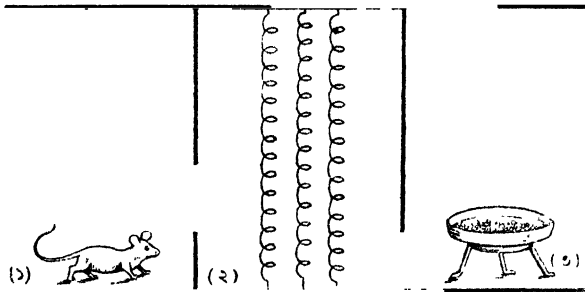
বিভিন্ন নোদনার আপেক্ষিক তীব্রতা নির্ধারণ সম্বন্ধীয় পরীক্ষণ

উপরের চিত্রে দেখা যাইতেছে যে, ১নং কক্ষে একটি ক্ষুধাত ইঁদুর আছে এবং ৩নং কক্ষে তাহার আহার্য দ্রব্য আছে। ২নং কক্ষ হইল 'বাধা-কক্ষ'—ইহার মধ্য দিয়া যাইবার কালে ইঁদুরটি তাড়িত শক্তির অভিঘাত (electric shock) পাইবে। ক্ষুধার তীব্রতা বৃদ্ধি পাইলে ইঁদুরটি এই বাধা অগ্রাহ্য করিবার চেষ্টা করিবে।

ওয়ার্ডেন্ কর্তৃক পরিচালিত ২৩ মিনিট কাল ব্যাপী পরীক্ষার ফলাফল নিম্নরূপ :

নোদনা (Drive)	বাধা-কক্ষ অতিক্রমের চেষ্টার গড়পড়তা হার (Average number of Crossings)	কত ঘণ্টা বঞ্চিত ছিল (Hours of Deprivation)
মাতৃত্ব ...	২২·৪ ...	•
তৃষ্ণা ...	২০·৪ ...	২৪
ক্ষুধা ...	১৮·২ ...	৯৬
কাম ...	১৩·৮ ...	২৪
অনুসন্ধিৎসা ...	৬·০ ...	•
কোন প্ররোচক নাই ...	৩·৫ ...	০

এই পরীক্ষার ফল বিবিধ প্রেষণার তীব্রতার উপর আলোকপাত করে। সাধারণ অভিজ্ঞতাতেও দেখা যায় যে, অতি অল্পদিনই মানুষ জল ব্যতীত বাঁচিতে পারে, খাদ্য ব্যতীত আরও কয়েকদিন বাঁচিতে পারে এবং যৌন কামনাকে অতৃপ্ত রাখিয়া অনির্দিষ্ট কাল থাকিতে পারে

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ঐচ্ছিক ক্রিয়া

১। ক্রিয়ার প্রকার ভেদ (Different kinds of Action):

মানুষ কর্মশীল জীব—সে সর্বদাই কোন-না-কোন কর্মে নিযুক্ত থাকে। মানুষের কর্মকে সাধারণতঃ দুইভাগে ভাগ করা যায়—**ঐচ্ছিক** (voluntary) এবং **অনৈচ্ছিক** (non-voluntary)। **ঐচ্ছিক ক্রিয়া-সমূহ আমাদের ইচ্ছাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন এবং আমরা ঐ সকল ক্রিয়া করিতেও পারি বা নাও করিতে পারি।** অপরপক্ষে, **অনৈচ্ছিক ক্রিয়াসমূহের ক্ষেত্রে আমাদের ইচ্ছার কোন স্বাধীনতা নাই, এবং সেই কারণ উহারা আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন নহে—আমাদের দেহ-মনের সংগঠন এইরূপ যে, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় আমরা ঐরূপ কার্য করিতে বাধ্য হই।** যেমন, আমি এখন পড়িতে বসিয়াছি—ইহা আমরা ঐচ্ছিক ক্রিয়া ; এই কার্য না করিয়া আমি অন্য কোন কার্য (যেমন, গল্প করা, তাস খেলা ইত্যাদি) করিতে পারিতাম। কিন্তু আমার চোখের উপর যদি হঠাৎ এক ঝলক আলো আসিয়া পড়ে, আমি তৎক্ষণাৎ চোখ বুজিয়া ফেলি—ইহা হইল অনৈচ্ছিক ক্রিয়া (কারণ এই ক্রিয়াটি আমার কোন স্বাধীন ইচ্ছার বশবর্তী নহে)।

আমরা বর্তমান অধ্যায়ে ঐচ্ছিক ক্রিয়ার স্বরূপ আলোচনা করিব।

২। ঐচ্ছিক ক্রিয়ার স্বরূপ ও বিশ্লেষণ (Voluntary Activity —its nature and analysis):

যে কার্যের উদ্দেশ্য এবং উপায় আমরা স্বেচ্ছায় নির্বাচন[১] করিয়া লই তাহাকে ঐচ্ছিক ক্রিয়া বলে। ঐচ্ছিক ক্রিয়া মাত্রেরই একটি 'সামগ্রিক রূপ' আছে, তবে উহাকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, উহা তিনটি স্তরের

১ সকল লেখক মানুষের ঐচ্ছিক স্বাধীনতা (Freedom of Will)-তে বিশ্বাসী নহেন ; সুতরাং তাঁহারা তথাকথিত ঐচ্ছিক ক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণভাবে মানুষের ইচ্ছাধীন এই কথা স্বীকার করেন না।

মধ্য দিয়া যায়: **মানসিক স্তর** (mental stage), **দৈহিক স্তর** (bodily or physical stage) এবং **দেহাতিরিক্ত বা বাহ্য স্তর** (extra-bodily or external stage)।

মানসিক স্তর—

বাহ্য জগতে কোন ক্রিয়া প্রকাশমান হইবার পূর্বে মনোজগতে একটি 'প্রস্তুতি' চলে; ক্ষেত্রবিশেষে এই প্রস্তুতি অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে, আবার দীর্ঘস্থায়ীও হইতে পারে।

(ক) অভাবের তাড়না—

কোন কার্য করিবার পূর্বে একটি **প্রয়োজন** বা **অভাব** অনুভূত হয় এবং ঐ প্রয়োজনের তাগিদেই আমরা কার্য করিয়া থাকি। কারণ ঐ প্রয়োজন বা অভাব হইল এক অপ্রীতিকর বা অস্বাচ্ছন্দ্যকর অনুভূতি এবং এই অভাব দূর করিবার প্রচেষ্টা হইতে আমরা কর্মে প্রবৃত্ত হই।

এই অভাব বর্তমানেরও হইতে পারে, অথবা ভবিষ্যতেরও হইতে পারে: যেমন, এখন আমি আলোর অভাবে পড়িতে পারিতেছি না, সুতরাং আমি আলো জ্বালিয়া দিলাম—ইহা হইল বর্তমানের অভাব। আবার ভবিষ্যতে অর্থের অভাব যেন না ঘটে সেইজন্য যখন আমি অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা করি, তখন ভ বষ্যতের অভাবের কল্পনা করিয়া বর্তমানে কার্য করি।

এই অভাব কর্তার (agent-এর) নিজের অভাব হইতে পারে, অথবা অন্য কাহারও যাহার সহিত সে একাত্মভাব বোধ করে তাহার অভাব হইতে পারে। যেমন, পিতামাতা স্বীয় পুত্রকন্যাদের অভাব নিজেদের অভাবের তুল্য জ্ঞান করিয়া তাহা দূর করিবার চেষ্টা করেন। সেইরূপ একজন বন্ধু অপর বন্ধুর সহিত একাত্মভাব বোধ করিয়া তাহার অভাব দূর করিবার চেষ্টা করিতে পারে।

(খ) বিষয় বা বস্তু সম্বন্ধে ধারণা—

কেবলমাত্র অভাব বোধ করাই কার্যসাধনের জন্য পর্যাপ্ত নহে; কোন্ বস্তু পাইলে অভাব দূরীভূত হইবে, তাহাও স্থির করিতে হইবে, অর্থাৎ **বস্তু-সম্বন্ধে ধারণা** প্রয়োজন। যেমন, ক্ষুধার তাড়না থাকাই যথেষ্ট নহে,

কিভাবে বা কোন্ খাদ্যদ্বারা উহা দূর করা যাইবে, তাহাও চিন্তা করিতে হইবে[২]।

(গ) কামনা—

আবার অভাব দূর করিবার উপযুক্ত বস্তু চিন্তা করাই যথেষ্ট নহে—ঐরূপ বস্তু পাইবার জন্য একটা **কামনা** বা **বাসনা** (desire) থাকা প্রয়োজন। যেমন, 'ক্ষুধা পাইয়াছে, অতএব খাদ্যের প্রয়োজন', 'অন্ধকার হইয়াছে, অতএব আলোর প্রয়োজন'—এইরূপ চিন্তা করাই যথেষ্ট নহে; প্রয়োজনের উপযুক্ত বস্তু পাইবার জন্য কামনা থাকা আবশ্যক। **কামনার ভিতর যে তীব্র তাড়না থাকে তাহাই ব্যক্তি-বিশেষকে কার্যে প্রবৃত্ত করে।**

(ঘ) কামনা-বিরোধ—

অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ ঘটে যে, একাধিক কামনা একই সময়ে আমাদের মনে দেখা দেয় এবং **ঐ সকল কামনা এইরূপ বিপরীতধর্মী হয় যে, তাহাদের একই সময় পুরণ করা সম্ভব নহে।** এই ক্ষেত্রে কামনাগুলির মধ্যে অন্তর্বিরোধ দেখা দেয়। কোন কোন কামনাকে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিতে হয়, আবার কোন কোন সময় কামনা-বিশেষকে একেবারে পরিহার করিতে হয়। যেমন, এমন হইতে পারে যে, একজন ছাত্রের বাৎসরিক পরীক্ষা সমাগতপ্রায় এবং সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য পড়িতেছে। এমন সময় সে খবর পাইল যে, তাহার এক নিকট আত্মীয় অত্যন্ত পীড়িত এবং তাঁহার পরিচর্যার জন্য উহার সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। আবার যখন সে ভাবিতেছে যে, পরীক্ষার জন্য পড়িতে থাকিবে, অথবা ঐ পীড়িত আত্মীয়ের নিকট যাইবে, তখন হয়ত' আর এক বন্ধু আসিয়া তাহাকে কয়েকদিনের জন্য প্রমোদভ্রমণে যাইবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিতে লাগিল। এরূপ অবস্থায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কামনা, অসুস্থ আত্মীয়ের সেবা-শুশ্রূষা করার কামনা এবং প্রমোদভ্রমণজনিত আনন্দলাভের কামনার

২ আমরা উপরে বলিলাম যে, প্রথমে অভাববোধ জাগে এবং পরে উপযুক্ত বস্তু সম্বন্ধে ধারণা হয়; কিন্তু অনেকক্ষেত্রে এমনও হয় যে, কোন বস্তুকে দেখিয়া উহা পাইবার ইচ্ছা জাগে এবং উহা না পাওয়া পর্যন্ত অভাববোধ থাকে। যেমন, হঠাৎ কোন বস্তু সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন দেখিয়া অথবা ঐ বস্তুটিকে দেখিয়া তাহা পাইবার তীব্র কামনা দেখা দিতে পারে।

মধ্যে বিরোধ দেখা দিল, কারণ একটি কামনা পূর্ণ করিতে হইলে আর একটি কামনা সেই একই সময় পূর্ণ করা চলে না। সুতরাং এখানে **কামনা-বিরোধ** (conflict of desires) অবশ্যম্ভাবী। সেইরূপ অফিসের এক দরিদ্র কর্মচারীর পুত্র অত্যন্ত পীড়িত এবং অর্থের অভাবে তাহার উপযুক্ত চিকিৎসা হইতেছে না, অথচ পুত্রের আরোগ্য তিনি একান্তভাবে কামনা করেন। ঐ ব্যক্তি তখন তাঁহার নিকট অফিসের গচ্ছিত অর্থ অপহরণ করার চিন্তা করিতে, লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার আবার নৈতিক জীবন যাপনের জন্যও একান্ত আগ্রহ আছে। এরূপ ক্ষেত্রে স্বীয় পুত্রের আরোগ্য-কামনার সহিত সুনাম এবং নৈতিক জীবনযাপনের কামনার বিরোধ দেখা দিল।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তথাকথিত কামনা-বিরোধের অর্থ নহে যে, মনোমধ্যে একটি 'যুদ্ধক্ষেত্র' আছে, বিবিধ কামনাগুলি তথায় যুধ্যমান এবং 'অহং' নামক একটি পৃথক্ দ্রষ্টা আছে। ইহার অর্থ হইল অহং-এর নিজের মধ্যেই অন্তর্দ্বন্দ্ব বা আত্মদ্বন্দ্ব[৩]। এরূপ অবস্থায় 'অহং' বিরোধী কামনাগুলির একটি লইয়া বিচার করে—ঐ কামনা পূর্ণ হইলে কী পরিণতি হইবে তাহা চিন্তা করে; আবার অন্য কামনাগুলি লইয়াও অনুরূপ চিন্তা করে। এইভাবে সম্ভাব্য পরিণতিগুলি (possible consequences) লইয়া অহং বিচার করে এবং তাহাদের আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারণের চেষ্টা করে[৪]।

৩ মহাকবি শেক্সপীয়র মনের এইরূপ অবস্থাকে রাষ্ট্রের অন্তর্বিপ্লবের সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছেন :

"........and the State of man
Like to a little kingdom, suffers then
The nature of an insurrection." (*Julius Cæsar*, II, i)

৪ অধ্যাপক ডিউই (Dewey) তথাকথিত 'conflict of desires'-এর স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন : "It is a strife or conflict which goes in the man himself —*it is the conflict of himself with himself*; it is not a conflict of himself with something external to him, nor of one impulse with another, he meanwhile remaining a passive spectator awaiting the conclusion of the struggle. What gives the conflict of desires its whole meaning is that it represents the man at strife with himself. He is the opposing contestants as well as the battlefield." (*Psychology*, pp. 364, 365).

অধ্যাপক স্টাউট (Stout) এইরূপ অবস্থাকে 'self deliberation' বলিয়াছেন এবং

অবশ্য কামনা-বিরোধের সময় আমরা যে সকল সময়ই 'শুদ্ধ যুক্তি' দ্বারা পরিচালিত হই, তাহা নহে আমরা সাময়িক উত্তেজনা দ্বারাও পরিচালিত হইয়া থাকি।

(ঙ) নির্বাচন—

মন অনেকক্ষণ ধরিয়া বিরোধী কামনাগুলির আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারণ কার্যে নিযুক্ত থাকিতে পারে না। বিরোধমাত্রই বেদনাদায়ক এবং মন এই বিরোধের অবসান চাহে। বিরোধী কামনাগুলির মধ্যে যেটি ব্যক্তি-বিশেষের মনের স্বাভাবিক ধর্মের অনুকূল বা তদবস্থায় মনের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কোন কিছুর দাবী মিটাইতে পারে, মন সেইটিকেই সাধারণতঃ **নির্বাচন** করিয়া লয়। কেবলমাত্র উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য (goal বা end) নির্বাচনই যথেষ্ট নহে ; মন উহার সহিত উপায়ও (means) নির্বাচন করে। সুতরাং ঐ উপায় দ্বারা উদ্দেশ্য সাধন করার ফলে যে পরিস্থিতিটির উদ্ভব হইবে বলিয়া কর্তা বা সাধনকারী (agent) মনে করে, সেই সমগ্র পরিস্থিতিটিই তাহার সঙ্কল্প বা অভিপ্রায় (intention)-এর অন্তর্ভুক্ত।

(২) দৈহিক পর্যায়—

বাসনাটি নির্বাচিত হইবার ফলে উহাকে কার্যে পরিণত করার জন্য **দেহকে নানাভাবে চালনা করা** প্রয়োজন ; অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির এই চালনা সম্ভব হয় যখন মস্তিষ্কের চেষ্টাধিষ্ঠান (motor centre) হইতে আবশ্যকীয় শক্তি বহির্মুখী স্নায়ুপথে পেশী ইত্যাদিতে চালিত হয়।

(৩) দেহাতিরিক্ত বা বাহ্য অবস্থা—

কর্তা যদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি উদ্দেশ্যসাধনের প্রয়োজন অনুসারে চালিত করিতে পারে, তাহা হইলেই **বাহ্য জগতে আবশ্যকীয় পরিবর্তন**

ঐরূপ অবস্থাকে বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন : "I contemplate myself as I shall be if I put it in execution, so as to make it part of my actual life history, and on the other hand I contemplate myself as I shall be if I leave it undone. I follow out this representation of a hypothetical self in more or less detail, until that turning-point in the process which is called 'voluntary decision' emerges." (*A Manual of Psychology*, pp. 631-32).

ঘটাইয়া সে কার্যটি সম্পন্ন করিতে পারে। সুতরাং ইহাই হইল কোন ঐচ্ছিক ক্রিয়ার শেষ পর্যায়।

৩। উদ্দেশ্য, কামনা, ইচ্ছা, অভিপ্রায়, সঙ্কল্প (Motive, Desire, Wish, Intention and Will):

ঐচ্ছিক ক্রিয়ার বিশ্লেষণকালে আমরা প্রায়ই বিভিন্ন পদ ব্যবহার করিয়া থাকি,—যেমন, উদ্দেশ্য, কামনা, ইচ্ছা, অভিপ্রায়, সঙ্কল্প। এই সব পদের অর্থ খুব বেশী সুনির্দিষ্ট নহে এবং অনেক সময় একটি পদ অন্য পদের সমার্থক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

আমরা পূর্বে (পৃঃ ৩৬৬) **উদ্দেশ্য** (motive) পদটি ব্যাখ্যা করিয়াছি। কোন ঐচ্ছিক ক্রিয়া সাধনের পশ্চাতে থাকে কোন উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই আমাদের অভাব দূরীভূত হইবে এই বিশ্বাস থাকে বলিয়া উহা লাভের চেষ্টা করি। উদ্দেশ্যের নিজস্ব একটি আকর্ষণী শক্তি থাকে বলিয়া আমরা উহার প্রভাবে কার্য করি; উহার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে উদ্দেশ্যের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ধারণা (যাহা সুস্পষ্ট না হইলেও অন্ততঃ অস্পষ্ট-ভাবে থাকে) এবং অনুভূতি।

আমরা উপরে সম্ভাব্য কামনা-বিরোধের কথা উল্লেখ করিয়াছি। এই কামনা-বিরোধের পূর্বেও বিবিধ লক্ষ্য থাকে। 'উদ্দেশ্য'-পদটি ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিলে এই প্রকার সকল লক্ষ্যকেই বুঝায়। তবে 'উদ্দেশ্য'-পদটি অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করাই সমীচীন। যেখানে কামনা-বিরোধ ঘটে, সেখানে 'উদ্দেশ্য' বলিতে কামনা-বিরোধের অবসানের পর নির্বাচিত লক্ষ্যকে বুঝায়। কারণ এইরূপ একটি সুনির্বাচিত উদ্দেশ্যই আমাদের কার্যের পথে চালিত করে।[৫]

কামনা (desire) বলিতে বুঝায় কোন কিছুর জন্য স্পৃহা। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা 'ক্রিয়াত্মক ঘটনা' (active phenomenon)। যখন আমরা কোন কিছু কামনা করি, তখন মনোরাজ্যে একটি তান (tension)-এর সৃষ্টি হয় এবং ঐ লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য মন একটি সক্রিয়-

৫ ইংরাজী 'motive' পদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল 'that which moves us' বা 'moving force'; এই জন্য Dewey বলিয়াছেন : "a desire when *chosen* becomes a *motive*". (*Psychology*, p. 366).

ভাব গ্রহণ করে।[৬] অবশ্য কামনা প্রধানতঃ ক্রিয়াত্মক হইলেও উহার সহিত অনুভূতি এবং জ্ঞানও সংশ্লিষ্ট থাকে। অনুভূতিটি প্রধানতঃ বেদনাদায়ক —কামনার বিষয়বস্তু অপ্রাপ্ত থাকার জন্য বেদনাবোধ দেখা দেয়; আবার ইহার পশ্চাতে সুখের কল্পনাও থাকিতে পারে, অর্থাৎ কামনার বিষয়বস্তু পাওয়া যাইলে কিরূপ সুখ দেখা দিতে পারে মন তাহা কল্পনা করিতে পারে। তাহা ছাড়া, কামনার সহিত কামনার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে একটি ধারণা থাকে।

ইচ্ছা (wish)-পদটি অনেক সময়ই কামনা (desire)-পদের সহিত সমার্থক ভাবে ব্যবহৃত হয়। তবে কেহ কেহ এই দুই পদের মধ্যে পার্থক্য টানিয়া থাকেন। কামনা-পদটি ইচ্ছা-পদ অপেক্ষা ব্যাপকতর, অর্থাৎ কামনার ক্ষেত্র বিস্তৃততর। আমরা বিবিধ বস্তু কামনা করি, কিন্তু যে কামনাটি কার্যকরী বা সিদ্ধ করিতে মনস্থ করি, সেটিকে ইচ্ছা (wish)[৭] বলা যায়। যেমন, কোন ছাত্র যখন চিন্তা করে যে, সে কোন পুস্তক পড়িবে, অথবা বেড়াইতে যাইবে, অথবা সিনেমা যাইবে, অথবা বন্ধুর গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবে, তখন এইগুলি সবই কামনার পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু যখন শেষ পর্যন্ত সে বন্ধুর গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাওয়াই স্থির করিল, এবং তদনুসারে কার্য করিতে লাগিল, তখন ঐটিকেই বর্তমান অর্থে তাহার ইচ্ছা বলা যায়। এক্ষেত্রে তাহার যে পড়িবার বা বেড়াইবার বা ছায়াচিত্র দেখিবার কামনা (desire) নাই তাহা নহে, তবে কোনটিই বন্ধুর বাড়ী যাইবার কামনার ন্যায় বলবতী (strong) হইল না।

অভিপ্রায় (intention)-পদটিও এক বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। অভিপ্রায় বলিতে উদ্দেশ্য (motive), উপায় (means) এবং পূর্ব-অনুমিত ফল

[৬] অধ্যাপক সালি (Sully) কামনার স্বরূপ বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন: "......it (desire) is sufficiently marked off as an *active* phenomenon...In desiring a thing, say, an approaching holiday, we are in a state of active tension, as if striving to aid the realisation of that which is only represented at the moment, and recognised as such.". (*Outlines of Psychology*, p. 389).

[৭] তুলনীয়: "...it may be convenient to limit the term 'wish' to those desires that predominate or continue to be effective. A hungry man may be said to have a desire for food... The desire may be kept in abeyance by a sense of religious obligation, by devotion to work, or by some overmastering passion. In such uses we may say that the man no longer *wishes* for food, though a desire for food continues to exist..." (Mackenzie, *A Manual of Ethics*, p. 38).

বা পরিণাম (foreseen consequences), এই তিনটির সমন্বয়কে বুঝায়। যেমন, একজন চিকিৎসক দেখিলেন যে, রোগীর রোগ-নিরাময়ের জন্য অস্ত্রোপচার করা প্রয়োজন; এক্ষেত্রে রোগীর রোগ নিরাময় হইল চিকিৎসকের উদ্দেশ্য (motive)। এইজন্য তিনি অস্ত্রোপচারকে উপায় (means)-রূপে গ্রহণ করিলেন এবং তৎসহ তিনি ইহাও চিন্তা করিলেন যে, অস্ত্রোপচারের সময় রোগীর কিছু কষ্ট হইবে, কয়েকদিন তাহাকে শয্যাশায়ী থাকিতে হইবে এবং অস্ত্রোপচার সফল হইলে রোগীর আরাম হইবে। সুতরাং চিকিৎসকের উদ্দেশ্য, উপায় এবং তাঁহার দ্বারা পূর্ব-চিন্তিত পরিণাম বা ফল, সবগুলিই চিকিৎসকের অভিপ্রায় (intention)-এর অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, 'অভিপ্রায়'-পদটি 'উদ্দেশ্য'-পদ অপেক্ষা ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'উদ্দেশ্য' বলিতে কেবলমাত্র বাঞ্ছিত বা নির্বাচিত লক্ষ্য বুঝায়; কিন্তু অভিপ্রায় বলিতে বুঝায়—নির্বাচিত লক্ষ্য সম্বন্ধে ধারণা, উহাকে পাইবার উপায় চিন্তন এবং সম্ভাব্য পরিণাম চিন্তন। এক্ষেত্রে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সম্ভাব্য পরিণামগুলির মধ্যে কোনটি প্ররোচক (persuasive) হইতে পারে, আবার কোনটি কর্তাকে সাময়িকভাবে নিবৃত্ত (deter) করিতেও পারে (যদিও আকাঙ্ক্ষার তীব্রতার জন্য কর্তা উহাদের অগ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত); অর্থাৎ পরিণামগুলির মধ্যে কয়েকটি এমন যে তাহাদের জন্যই কর্তা কার্যটি করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছে, আবার কতকগুলি এরূপ যে তাহা সত্ত্বেও কর্তা কার্যটি করিতে চাহে।

সঙ্কল্প (will)[৮]-পদটির দ্বারা কোন কার্য করিবার মানসিক দৃঢ়তা বা স্থিরনিশ্চয়তা বুঝায়। যেমন, যেখানে ব্যক্তি-বিশেষ কার্যসাধনের পথে যত বাধাবিঘ্নই থাকুক তাহাদের অতিক্রম করিবার চেষ্টা করে,[৯] অথবা পরাজিত হইয়াও পুনরায় অনুরূপ প্রচেষ্টা করে, সেইরূপ স্থলে সঙ্কল্পের বিশেষ প্রকাশ ঘটে। ব্যক্তি-বিশেষের সমগ্র শক্তিই যেন বিশেষ লক্ষ্যের উপর কেন্দ্রীভূত

৮ ইংরাজি 'will'-পদেরও একটি সুনির্ধারিত অর্থ নাই। Will-পদটি ব্যাপক অর্থে সাধারণ ক্রিয়াশীলতা (active side of consciousness) বুঝায়। আবার যে-কোন কামনা বা ইচ্ছা, অথবা কামনা-বিরোধের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ কামনাকে নির্বাচন করাও বুঝায়। সেইরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প বুঝাইবার জন্যও will-পদটি ব্যবহার করা হয়, যেমন, "I *will* do this".

৯ "মাতিয়া যখন উঠেছে পরাণ
কিসের আঁধার, কিসের পাষাণ"-কবির এই উক্তি দৃঢ়সঙ্কল্পের প্রকাশক।

(focalised) হয় এবং তাহার প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাহার আত্মবিশ্বাস ফুটিয়া উঠে।

জেম্‌স্‌-এর মতবাদ :

উইলিয়ম্‌ জেম্‌স্‌ (William James) পাঁচ প্রকার সঙ্কল্পের বা বিচারের (decision) কথা বলিয়াছেন :

(১) প্রথমটি হইল সুযুক্তিপূর্ণ বিচার (reasonable type of decision)। ইহার বৈশিষ্ট্য হইল যে, এক্ষেত্রে কোন একটি বিষয়ের পক্ষে বা বিপক্ষে যে সমস্ত যুক্তি আছে, সেইগুলি ধীরে ধীরে দেখা দেয় এবং বিকল্প লক্ষ্যগুলির একটির সপক্ষে যে সকল যুক্তি আছে, সেইগুলি মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং মন সেই লক্ষ্যটিকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে।

(২) দ্বিতীয় প্রকারের বিচারে আমাদের অনুভূতি যেদিকে ইচ্ছা আমাদের লইয়া চলে এবং হঠাৎ কোন বাহ্য পরিস্থিতির সম্মুখীন হইলে তৎক্ষণাৎ আমাদের এই ধারণা জন্মে যে, একটি বিশেষ লক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য।

(৩) তৃতীয় প্রকার বিচার বা সঙ্কল্পের ক্ষেত্রে অন্তর হইতে এক প্রেরণা আসিয়া আমাদের বিশেষ পথে পরিচালিত করে। লুথার, নেপোলিয়ঁ, হিট্‌লার, সুভাষচন্দ্র ইত্যাদি অনেকে এইভাবেই তীব্র আবেগের প্রভাবে নিজেদের কর্মপন্থা নির্বাচন করিয়া লইতেন। হঠাৎ ইঁহাদের কর্মশক্তির রুদ্ধদ্বার খুলিয়া যায় এবং তখন আর উহার গতিরোধ করা সম্ভব হয় না।

(৪) চতুর্থ প্রকারের সঙ্কল্প বা বিচারের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ব্যক্তি-বিশেষের মনে হঠাৎ এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দেখা দেয় এবং তাহাতে তাহার জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে। এইরূপ অবস্থাকে অনেক সময় 'বিবেকের জাগরণ', 'হৃদয়ের পরিবর্তন' ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হয়।

(৫) পঞ্চমতঃ, আর এক প্রকারের সঙ্কল্প আছে যাহাতে বিশেষ চেষ্টা করিয়া একটি লক্ষ্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা হয়। হয়ত' ঐ প্রকার কার্য করিবার জন্য মনে মনে বিশেষ অস্বস্তি ভোগ করিতে হয়, হয়ত' বিকল্প লক্ষ্য বার বার প্রলুব্ধ করে; কিন্তু তথাপি নির্বাচিত লক্ষ্য হইতে যাহাতে বিচ্যুত না হয়, সেইজন্য ব্যক্তি-বিশেষ ঐকান্তিক চেষ্টা করে।

৪। পেশী ও ক্রিয়া (Muscles and actions) :

আমাদের দেহের মাধ্যমে যে সব কার্য সাধিত হয়, সেইগুলির জন্য

পেশীর প্রয়োজন। **পেশীর সঙ্কোচনের ফলে বিবিধ কার্য সাধিত হয়; পেশীর মধ্যে কতকগুলি কোষ থাকে যাহারা উদ্দীপিত হইলে পেশী-সঙ্কোচন ঘটে।** উদ্দীপনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের চেষ্টাধিষ্ঠান (motor centre) হইতে পরিবাহিত হয়।

পেশী তিন প্রকারের:

(ক) **রেখাঙ্কিত পেশী** (striped or striated muscles)—অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে দেখা যায় যে, কতকগুলি পেশীতে একান্তর-ভাবে (alternately) কালো এবং হাল্কা ধরণের দাগ আছে। এইজন্য ইহাদের 'রেখাঙ্কিত' (বা ডোরাকাটা) বলা হয়। ইহারা বিবিধ অস্থির সহিত সংযুক্ত থাকে এবং ইহাদের সমষ্টিগত ওজন দেহের ওজনের অর্ধেক। **ইহাদের সঙ্কোচনের ফলেই বিবিধ ঐচ্ছিক ক্রিয়া করা সম্ভব হয়।** এইজন্য ইহাদের অপর নাম **'ঐচ্ছিক পেশী'** (voluntary muscles)।

(খ) **মসৃণ বা সরল পেশী** (smooth or plain muscles)—ইহারা প্রাথমিক এবং বিবিধ জৈব কার্য সাধন করে। ইহারা বিবিধ আন্তরযন্ত্রে (viscera-তে) অবস্থিত এবং ইহাদের সাহায্যে পরিপাকযন্ত্র, মূত্রাশয়, পায়ুযন্ত্র ইত্যাদির কার্য সাধিত হয়। **ইহাদের সাহায্যে অনৈচ্ছিক ক্রিয়া সাধিত হয়** বলিয়া ইহাদের **অনৈচ্ছিক পেশী** (non-voluntary muscles) বলা হয়।

(গ) **হৃৎপিণ্ডের পেশী** (cardiac muscles)—ইহারা আকারে রেখাঙ্কিত পেশীর ন্যায়, কিন্তু কার্যের দিক্ হইতে ইহারা মসৃণ পেশীর ন্যায়, কারণ হৃৎপিণ্ডের কার্য আমাদের ইচ্ছার অধীন নহে। অর্থাৎ **হৃৎপিণ্ডের সাধারণ কার্য** (যাহা অনৈচ্ছিক ক্রিয়া-বিশেষ) **ইহাদের দ্বারা সাধিত হয়** বলিয়া ইহারা অনৈচ্ছিক পেশীর শ্রেণীভুক্ত। (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

১নং চিত্র। বিভিন্ন রকমের পেশী।

ক = রেখাঙ্কিত বা ঐচ্ছিক পেশী। খ = মসৃণ বা অনৈচ্ছিক পেশী। গ = হৃৎপিণ্ডের পেশী।

বিভিন্ন প্রকারের পেশীর কার্যবৈশিষ্ট্য এইরূপ :

(১) রেখাঙ্কিত পেশীর মধ্যে এক বা একাধিক স্নায়ুতন্তু থাকে; তাহাদের মাইও-তন্তু (বা myofibril) বলে। ইহারা সঙ্কোচনশীল। ইহাদের ভিতর এক বিশেষ প্রকারের রাসায়নিক পদার্থ থাকে; ইহাকে বলে এ্যাক্টোমাইওসিন (actomyosin)—ইহাই রাসায়নিক শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ইহাদের দ্বারা ঐচ্ছিক ক্রিয়া সাধিত হয়; সুতরাং জীবনধারণের জন্য ইহারা অত্যাবশ্যকীয় (essential for living) নহে, তবে ইহারা জীবনধারণের সহায়ক (aid to living)। পেশীর দৈর্ঘ্যের সঙ্কোচন ঘটাইয়া ইহারা বিবিধ কার্য সম্পন্ন করে। অবশ্য এই সঙ্কোচনের আবার প্রকারভেদ আছে—যেমন, নীচু হইয়া মাটি হইতে কোন কিছু তুলিয়া লইতে এক প্রকারের সঙ্কোচনের প্রয়োজন হয় (তাহাকে বলে isotonic contraction), আবার কোন কিছু তুলিয়া ধরিয়া রাখিতে আর এক প্রকারের সঙ্কোচনের প্রয়োজন হয় (তাহাকে বলে isometric contraction)।

(২) মসৃণ পেশীর বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই প্রকারের পেশী-কোষগুলির একটি কেন্দ্র (nucleus) আছে এবং এক বা একাধিক রেখাবিহীন (unstriped) মাইও-তন্তু (myofibril) থাকে। ইহারা সাধারণতঃ রক্তবাহী নালিকা (blood vessels) এবং আন্তরযন্ত্রকে বেষ্টন করিয়া থাকে। ইহাদেরও কার্যের প্রকারভেদ আছে। পরিপাকযন্ত্রে যে সকল মসৃণ পেশী থাকে, তাহাদের সঙ্কোচন যেন ছান্দস গতিতে হয় (ইহাকে peristalsis বা peristaltic movement বলে)। আবার কেশোদ্গমন-কোষ (hair cells)-এর সহিত সংশ্লিষ্ট মসৃণ পেশী সাধারণতঃ নিষ্ক্রিয় থাকে, তবে উপযুক্ত উদ্দীপক দ্বারা সক্রিয় হইলে রোমাঞ্চন হয় (ইহাকে pilomotor reaction বলে)।

(৩) হৃৎপিণ্ডের পেশীসমূহে বিভিন্ন মাইও-তন্তু পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে এবং ইহাদের একটিতে সঙ্কোচন ঘটিলে উহা একটি হইতে অপরটিতে জলের তরঙ্গের ন্যায় প্রবাহিত হয়। হৃৎপিণ্ডের পেশী প্রতিনিয়ত এইভাবে ছান্দস গতিতে কার্য করিতেছে।

বিরুদ্ধধর্মী পেশী (antagonistic muscles) :

সাধারণতঃ দেহের এক একটি অঙ্গের সহিত সংশ্লিষ্ট এক এক

জোড়া পেশী বিপরীতভাবে সাজান থাকে। ইহাদের **বিরুদ্ধধর্মী পেশী** (antagonistic muscles) বলে। (ক) ইহাদের একটি হইল **আকুঞ্চন-সহায়ক পেশী** (flexor বা biceps) এবং (খ) অপরটি হইল **প্রসারণ-সহায়ক পেশী** (extensor বা triceps)। প্রথমটি ক্রিয়াশীল হইলে সংশ্লিষ্ট অঙ্গ বাঁকান যায় এবং দ্বিতীয়টি ক্রিয়াশীল হইলে সংশ্লিষ্ট অঙ্গ সম্প্রসারিত করা যায়। ইহারা পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া চলে। **একটি যখন উদ্দীপিত** (stimulated) **হয়, অপরটিতে তখন বাধ** (inhibition)-**এর সৃষ্টি হয়।** এই কারণে একই সময়ে দুইটি বিপরীত কার্য (যথা, হাতকে
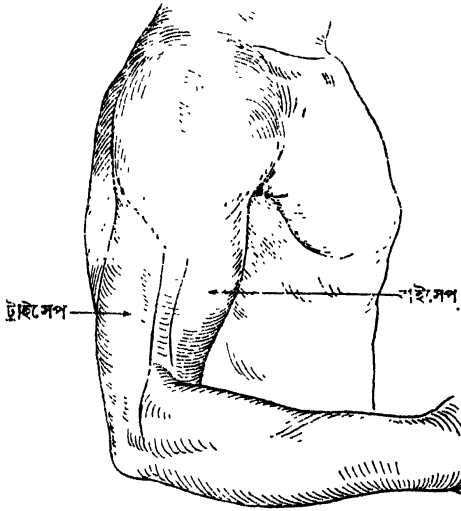
২নং চিত্র। বাইসেপ্ ও ট্রাইসেপ্।

নিজের দিকে আনা এবং সম্প্রসারিত করা) করা যায় না। বিপরীতধর্মী পেশীর এই কার্য-নীতিকে **অন্যোন্য উদ্দীপন নীতি** (Law of reciprocal innervation) বলে। (২ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

যদি একটি অঙ্গকে দুইটি উদ্দীপক দ্বারা উদ্দীপিত করা যায় (যেমন, পায়ের তলায় বা চেটোতে যদি একই সময় ব্যথন-উদ্দীপক বা pain stimulus এবং প্রেষ-উদ্দীপক বা pressure stimulus প্রয়োগ করা যায়), তাহা হইলে মাত্র একটি উদ্দীপকের উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে ; যেমন, এই ক্ষেত্রে যদিও ব্যথন-উদ্দীপকের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হইল পেশী-আকুঞ্চন এবং

প্রেষ-উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া হইল পায়ের ঝাঁকুনি বা পেশী সম্প্রসারণ, তাহা হইলেও একই সময় দুইটি উদ্দীপক প্রযুক্ত হওয়ার ফলে কেবলমাত্র একটি প্রতিক্রিয়া করিবে, অর্থাৎ পেশী আকুঞ্চন হইবে এবং ব্যক্তি-বিশেষ পা'টি হঠাৎ তুলিয়া লইবে।

যদি দুইটি বিভিন্ন উদ্দীপক একই সময় এক জোড়া বিপরীত পেশীদ্বয়কে উদ্দীপিত করে, তাহা হইলে উদ্দীপকদ্বয়ের একটি কার্যকরী (effective) হইবে। এই বিষয় একটি নীতি অনুসৃত হয়; যেমন,

(১) উদ্দীপকদ্বয়ের যেটি ব্যথা-সংবেদনের সৃষ্টি করে, সেইটি কার্যকরী হয়, অপরটি হয় না (উপরে প্রদত্ত উদাহরণ দ্রষ্টব্য)।

(২) উদ্দীপকদ্বয়ের যেটি তীব্রতর সেইটি কার্যকরী হয়।

(৩) যদি একই মৃদু উদ্দীপক বার বার প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে উহা কার্যকরী হইবে।

(৪) কিন্তু বার বার উদ্দীপিত হওয়ার ফলে যদি কোন পেশীর ক্লান্তি হয়, তাহা হইলে উপযুক্ত উদ্দীপক কিছুক্ষণ কার্যকরী হয় না।

৫। সাধন-যন্ত্র হিসাবে গ্রন্থি-সমুদয় (Glands as Effectors):

আমাদের দেহস্থ বিভিন্ন গ্রন্থিও কয়েক প্রকার অনৈচ্ছিক কার্য সাধন করিয়া থাকে। এই গ্রন্থি দুই প্রকারের—সনালী (Duct gland) এবং নালিকাবিহীন গ্রন্থি (Ductless glands)। সনালী গ্রন্থিসমূহ হইতে নিঃসৃত রস বিশেষ বিশেষ অঙ্গকে বিশেষভাবে উদ্দীপিত করে[১০]। যেমন, কোন কোন ব্যক্তি হয়ত' অল্প পরিশ্রমেই অতিরিক্ত ঘর্মাক্ত হইয়া পড়ে—ইহাদের ঘর্ম-গ্রন্থি (sweat glands) সম্ভবতঃ অতিরিক্ত ক্রিয়াশীল (hyper-active); কেহ কেহ কাঁদিবার সময় প্রচুর অশ্রুবিসর্জন করে—ইহাদের অশ্রুগ্রন্থি (tear glands) হয়ত' অতিক্রিয়াশীল (hyperactive); আবার কাহারও কাহারও কথা বলিবার সময় অল্পেই তালুদেশ শুষ্ক হইয়া পড়ে এবং জিহ্বা যেন আটকাইয়া যায়—সম্ভবতঃ ইহাদের লালানিঃসরণকারী গ্রন্থি (salivary glands) অপর্যাপ্তভাবে কার্য (hypoactivity) করে।

১০ সনালী গ্রন্থিসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল: (১) salivary glands, (২) lachrymal glands, (৩) gastric glands, (৪) pancreas, (৫) liver, (৬) sweat glands, (৭) sebacceous glands, (৮) tear glands.

নালিকাবিহীন গ্রন্থির রস সরাসরি রক্তপ্রবাহের মধ্যে পড়ে এবং অতি-শীঘ্র সমগ্র দেহমধ্যে সঞ্চালিত হয়[১১]। ইহাদের রস (যাহাকে সাধারণতঃ 'হরমোন' বলা হয়) দেহমধ্যে সঞ্চালিত হইয়া নানাভাবে দেহের উপর প্রভাব বিস্তার করে। বিবিধ আবেগ ও উত্তেজনার বশবর্তী হইয়া আমরা যে সব বিবিধ কার্য করি, প্রধানতঃ তাহাদের মূলে হরমোনের প্রভাব বিদ্যমান থাকে।

[আমরা অষ্টম অধ্যায়ে (পৃঃ ২৫৮–২৬৮) সবিস্তারে নালিকাবিহীন গ্রন্থির ক্রিয়া বর্ণনা করিয়াছি। সুতরাং উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।]

১১ অনেকে অনুমান করেন যে, নালিকাবিহীন গ্রন্থি-নিঃসৃত রস দেহাভ্যন্তরে বিবিধ স্থানে পৌঁছাইতে মাত্র ১৫ সেকেণ্ড সময় লাগে। (W. W Cruze, *General Psychology for College Students*, p. 178 দ্রষ্টব্য)।

চতুর্দশ অধ্যায়

অনৈচ্ছিক ক্রিয়া

পূর্ব অধ্যায়ে আমরা ঐচ্ছিক ক্রিয়া বিশ্লেষণ করিয়াছি। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা বিবিধ অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার স্বরূপ বর্ণনা করিব।

অনৈচ্ছিক ক্রিয়া নানাপ্রকারের হয়ঃ স্বতঃসঞ্জাত বা স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়া (spontaneous action), প্রতিবর্ত ক্রিয়া (reflex action), সাহজিক ক্রিয়া (instinctive action), ভাবনাজ ক্রিয়া (ideo-motor action), অভ্যাস (habit)।

১। স্বতঃবৃত্ত বা স্বতঃসঞ্জাত ক্রিয়া (Spontaneous Action) :

স্বতঃবৃত্ত বা স্বতঃসঞ্জাত ক্রিয়ার জন্য কোন বাহ্য উদ্দীপকের প্রয়োজন হয় না। স্বতঃবৃত্ত বা স্বতঃসঞ্জাত পদের ব্যুৎপত্তি হইতেই বুঝা যায় যে, **এরূপ ক্রিয়া স্বতঃই উৎপন্ন হয়।** শিশুদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তাহারা আপনা আপনিই অর্থাৎ বাহ্য উদ্দীপক ব্যতীতও দৌড়াইতেছে, খেলিতেছে, হাত-পা ছুঁড়িতেছে। এরূপ ক্রিয়ার পশ্চাতে শিশুর **কোন পুর্ব-কল্পিত উদ্দেশ্য থাকে না** ; অথচ এরূপ ক্রিয়া দ্বারা শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত হয় এবং স্নায়ু ও পেশীসমূহ পরিপুষ্টি লাভ করে। এই প্রকার ক্রিয়া অনৈচ্ছিক, কারণ এরূপ ক্ষেত্রে তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পুষ্টিলাভ করিবে এইরূপ কোন ইচ্ছা দ্বারা শিশু প্রণোদিত হয় না, অর্থাৎ ফলের বিষয় কর্তার নিকট অজ্ঞাত থাকে। দেহের অভ্যন্তরে সঞ্চিত অতিরিক্ত শক্তি এইভাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং উহাতে দেহের মঙ্গল সাধিত হয়। যদি এই শক্তি সুষ্ঠুভাবে ব্যয়িত না হয় অথবা ইহার প্রকাশের পথে যদি কোন বাধার সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে দেহে অস্বাচ্ছন্দ্য বা অস্বস্তির ভাব দেখা দেয়। এই দিক্ হইতে বিচার করিলে ইহার উৎপত্তির কারণ নিছক দেহগত (physiological) নয়, মনোগতও (psychical) বটে।

২। প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Reflex Action) :

(ক) সরল প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Simple Reflex) :

বাহ্য উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়ারূপে স্বতঃক্রিয়ভাবে যে কার্য

সাধিত হয়, তাহাকে প্রতিবর্ত ক্রিয়া বলে। ইহা সরল—অর্থাৎ একটি উদ্দীপকের প্রয়োগে একটি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বাহ্য উদ্দীপকের প্রয়োগমাত্র ইহা সাধিত হয়—ইহা অনৈচ্ছিক, সুতরাং ইহাতে চিন্তা বা কল্পনার কোন অবকাশ ঘটে না। ইহাতে দুই প্রকারের স্নায়ুতরঙ্গের সৃষ্টি হয়—একটি হইল অন্তর্মুখী বা সংবেদজ (sensory) এবং অপরটি হইল বহির্মুখী বা চেষ্টীয় (motor)। উদ্দীপিত বাহ্য ইন্দ্রিয় হইতে মেরুদণ্ডের ধূসরাংশের সম্মুখবর্তী অংশ পর্যন্ত চলে অন্তর্মুখী প্রবাহ এবং ঐ অংশের সংযোজক কোষ হইতে উৎপন্ন হয় দ্বিতীয় প্রকারের স্নায়ুতরঙ্গ ও উহা পেশী পর্যন্ত পৌছিয়া পেশীকে জাগরিত করে। উদ্দীপিত ইন্দ্রিয় হইতে পেশী পর্যন্ত এই পথকে **প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ** (reflex arc) বলে। (পৃঃ ১৫৯-তে ৮নং চিত্র এবং পৃঃ ৩৪৯ দ্রষ্টব্য)।

যেমন, হঠাৎ মেঘ গর্জন হইল এবং উহা শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম; শীতকালে হঠাৎ কেহ আমার দেহে ঠাণ্ডা জল নিক্ষেপ করিল এবং অমনি আমি শিহরিয়া উঠিলাম; আমার চক্ষুর উপর হঠাৎ এক ঝলক তীব্র আলোক আসিয়া পড়িল, অমনি আমি চক্ষু মুদিত করিলাম; আমি অত্যন্ত গরম চা পান করিতে গেলাম, চায়ের সহিত ঠোঁটের সংস্পর্শ ঘটিবামাত্র আমি উহা সরাইয়া লইলাম; আমার নাসিকার মধ্যে কোন কিছু তীব্র ঝাঁজ প্রবেশ করিল, অমনি আমি হাঁচিতে লাগিলাম—এইগুলি সবই হইল প্রতিবর্ত ক্রিয়ার উদাহরণ।

প্রতিবর্ত প্রতিক্রিয়ার উপর আমাদের কোন ঐচ্ছিক নিয়ন্ত্রণ নাই; অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয় বিশেষভাবে উদ্দীপিত হইলে আমরা বিশেষ প্রকারের প্রতিক্রিয়া করিতে বাধ্য। এই প্রকার বৈশিষ্ট্য আমাদের দেহমানস গঠনের উপর নির্ভরশীল এবং ইচ্ছা করিয়া আমরা ইহার কোন পরিবর্তন সাধন করিতে পারি না। যদিও এইপ্রকার প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের কোন পূর্বপ্রকল্পিত, সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধিত হয় না, তাহা হইলেও ইহা দ্বারা দেহের কোন সাধারণ উপকার বা মঙ্গল হয়। যেমন, হঠাৎ কোন উত্তপ্ত দ্রব্যের সংস্পর্শে দেহের কোন অঙ্গ আসিলে তৎক্ষণাৎ উহা সরাইয়া ফেলিবার ব্যবস্থা না থাকিলে ঐ অংশ পুড়িয়া যাইয়া কোন ক্ষতি হইতে পারিত। আবার ইহাতে চিন্তার বা পরিকল্পনার কোন স্থান নাই, অর্থাৎ যে অঙ্গ পুড়িয়া যাইতে পারে বা

যাইতেছে, তাহা সরাইয়া লওয়া উচিত কি অনুচিত, এইপ্রকার চিন্তার কোন স্থান নাই—এইরূপ কোন দ্বিধা-সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকিলে দেহের ক্ষতি হইত[১]।

আমরা এই পর্যন্ত যে সকল প্রতিবর্ত ক্রিয়ার বর্ণনা করিলাম, সেইগুলি সসংজ্ঞ (conscious), অর্থাৎ এইরূপ ক্ষেত্রে যদিও চেতনার কোন নিয়ন্ত্রণ নাই, তাহা হইলেও উদ্দীপক এবং তাহার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে। যেমন, চক্ষুর উপর তীব্র আলোক পড়িতেই আমি চক্ষু বুজিয়া ফেলি, কিন্তু ঐ প্রতিক্রিয়ার সহিত যুগপৎ অথবা অব্যবহিত পরেই এই জ্ঞান থাকে যে, চক্ষুর উপর আলোক পড়িয়াছে এবং তাহারই ফলে চক্ষু স্বতঃই মুদিত হইয়াছে।

আর একপ্রকারের প্রতিবর্ত ক্রিয়া আছে যাহাদের বলা হয় অসংজ্ঞ (unconscious) বা দৈহিক (physiological) প্রতিবর্ত ক্রিয়া ; যেমন, পরিপাকযন্ত্রের ক্রিয়া, শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া, রক্তপ্রবাহ ইত্যাদি কার্য আমাদের অজ্ঞাতসারেই সাধিত হইতেছে, অর্থাৎ ইহারা যখন স্বাভাবিক ভাবে কার্য করে, তখন চেতনার উপর প্রত্যক্ষভাবে ইহারা কোন রেখাপাত করে না।

(খ) ক্রমিক প্রতিবর্ত ক্রিয়া বা প্রতিবর্ত ক্রিয়া-পরম্পরা (Chain Reflex):

প্রতিবর্ত ক্রিয়ার দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা সরল এবং একরূপী (uniform); এই কারণ যান্ত্রিকতাবাদের সমর্থক একদল মনোবিৎ (যথা, থর্ণডাইক্) সকল জটিল ক্রিয়াকেই প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সমষ্টি বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে একাধিক প্রতিবর্ত ক্রিয়া পর্যায়ক্রমে যুক্ত হইলে তথাকথিত জটিল ক্রিয়ার উদ্ভব হয়। ইঁহাদের মতে একটি প্রতিবর্ত প্রতিক্রিয়া উদ্দীপক হিসাবে কার্য করিয়া আর একটি প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সৃষ্টি করে।[২] অর্থাৎ একটি জটিল কার্যের উদ্ভব নিম্নলিখিতভাবে নির্দেশ করা যাইতে পারে :

$$উ_১ \rightarrow প্র_১ = উ_২ \rightarrow প্র_২ = উ_৩ \rightarrow প্র_৩ = উ_৪ \rightarrow প্র_৪ \cdots\cdots$$

১ প্রতিবর্ত প্রতিক্রিয়া ত্বরিৎগতিতে হওয়া আবশ্যক। এইজন্ম প্রতিবর্ত ক্রিয়ার চেষ্টাধিষ্ঠান (motor centre) হইল সুষুম্নাকাণ্ড (spinal cord), গুরু মস্তিষ্ক (cerebrum) নহে। উদ্দীপন পৌঁছিবামাত্র সুষুম্নাকাণ্ড হইতে প্রতিক্রিয়ার জন্ম প্রয়োজনীয় শক্তি পরিবাহিত হয়। এইস্থলে যদি বিবিধ কার্যে নিরত গুরুমস্তিষ্ক হইতে শক্তি সঞ্চালনের ব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলে অযথা বিলম্ব হইত। অতি দ্রুত প্রতিক্রিয়া যাহাতে সম্ভবপর হয়, তাই প্রকৃতি যেন গুরুমস্তিষ্কের নির্দেশ ব্যতীতই সুষুম্নাকে কার্য করিবার অধিকার দিয়াছে।

২ উচ্চ পর্যায়ের সাপেক্ষীকরণের ক্ষেত্রে একাধিক বিকল্প উদ্দীপককে একটির সহিত অপরটিকে সংযুক্ত করিয়া একটি দীর্ঘ ক্রমের সৃষ্টি করা যাইতে পারে। (পৃঃ ৩৫৯)। পাভ্‌লভ,

(এখানে 'উ' অর্থে 'উদ্দীপক' এবং 'প্র' অর্থে 'প্রতিক্রিয়া' বুঝিতে হইবে)। নিম্নস্থ চিত্র দ্রষ্টব্য :
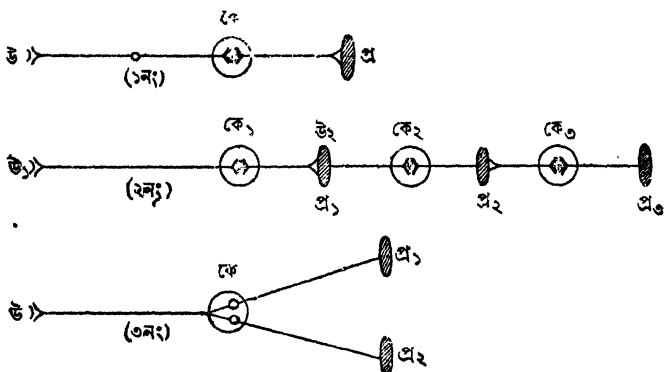
সরল ও জটিল প্রতিবর্ত ক্রিয়া

উপরের চিত্রে প্রথম রেখাঙ্কনটি সরল প্রতিবর্ত ক্রিয়া এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি জটিল প্রতিবর্ত ক্রিয়া নির্দেশ করিতেছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, পূর্ববর্তী প্রতিক্রিয়া পরবর্তী ক্রিয়ার উদ্ভব ঘটাইতেছে এবং তৃতীয় ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, পূর্ববর্তী একটি কার্যের দুইটি প্রতিক্রিয়া হইতে দুইটি বিভিন্ন নূতন ক্রিয়ার উদ্ভব ঘটিতেছে।

[উ=উদ্দীপক ; কে=কেন্দ্র ; প্র=প্রতিক্রিয়া।]

যান্ত্রিকতাবাদী মনোবিদ্‌দের এই মত গ্রহণযোগ্য নহে ; কারণ মানুষের অধিকাংশ ব্যবহারই এত বিবিধ, বৈচিত্র্যপূর্ণ ও জটিল যে তাহাদের সকল-গুলিকে সরল, একরূপী, অনৈচ্ছিক প্রতিবর্ত ক্রিয়ার রূপান্তর বা সমষ্টি বলা যায় না।

ব্যবহারবাদী ওয়াট্‌সন্‌ ও তাঁহাদের সমর্থকেরা মনে করেন যে, মানুষের সকল ক্রিয়াকেই সাপেক্ষ-প্রতিবর্ত প্রতিক্রিয়া (C.R.) ভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে। (পৃঃ ১০০)। স্পেন্‌সার মনে করেন যে, ক্রমিক প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সংযোগে সহজাত বৃত্তির উদ্ভব হয়। (পৃঃ ৪১৭ এবং Koffka, *Growth of Mind*, pp. 90-100 দ্রষ্টব্য)।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, প্রাণিমনোবিদ্যার ক্ষেত্রে একদল যান্ত্রিকতাবাদী লেখক নিম্নপর্যায়ের জীবের অপেক্ষাকৃত সরল ব্যবহারকে আভিমুখ্যবাদ (tropism)-এর আলোকে ব্যাখ্যা করেন (পৃঃ ৫৩)। এই মতানুসারে উদ্দীপক হইতে প্রসূত 'শক্তি' বা 'প্রভাব' জীবের দেহের কোন অংশের উপর ক্রিয়া করিয়া (বা local action দ্বারা) উহাকে ক্রিয়াশীল করিয়া তোলে এবং প্রাণিবিশেষ তখন দেহকে বিশেষ দিকে আবর্তিত (oriented) করে। 'আলোর পোকা' (moth) যে আলোর দিকে উড়িয়া যায়, যান্ত্রিকবাদীরা বলিবেন উহা এক প্রকারের সদর্থক আভিমুখ্য-ক্রিয়া (positive tropic action)। অপরপক্ষে, যদি কোন প্রাণী উদ্দীপকের প্রভাবে উহাকে পরিহার করিতে যায়, তাহা হইবে নঙর্থক আভিমুখ্য-ক্রিয়া (negative tropic action)।

৩। ভাবনাজ ক্রিয়া (Ideo-Motor Action) :

যখন কোন ভাব বা ধারণা (idea) এত তীব্র হইয়া পড়ে যে, তাহার গতিরোধ করা যায় না এবং সে বিষয় কোন চিন্তাও করা যায় না এবং তাহা স্বতঃই (automatically) কার্যে পরিণত হয়. তখন তাহাকে ভাবনাজ ক্রিয়া (ideo-motor action) বলে। ঐচ্ছিক ক্রিয়ার পশ্চাতেও একাধিক ভাব বা ধারণা কার্য করে এবং ভাবনাজ ক্রিয়ার পশ্চাতেও ভাব বা ধারণা থাকে ; কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, ঐচ্ছিক ক্রিয়ার পশ্চাতে যে সকল ভাব বা ধারণা থাকে তাহাদের আবির্ভাব-মাত্র তাহারা কার্যে পরিণত হয় না এবং তাহাদের নিয়ন্ত্রণ এবং অবদমনের ক্ষমতা আমাদের থাকে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস ; কিন্তু ভাবনাজ ক্রিয়াতে আমাদের নিয়ন্ত্রণ বা অবদমনের ক্ষমতা থাকে না—ইহাতে কোন বিশেষরূপ ভাব (idea) আমাদের এতদূর অভিভূত করিয়া ফেলে যে, আমাদের কোন ঐচ্ছিক স্বাধীনতা থাকে না।

ইহা বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে :

(ক) প্রথমতঃ, কখনও কখনও কোন বদ্ধমূল ধারণা (fixed idea) এমনভাবে মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারে যে, 'শয়নে স্বপনে জাগরণে' ঐ বিষয় কেবলই মনে পড়ে এবং ঐ ধারণা হঠাৎ কোন কার্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। যেমন, কোন অপ্রকৃতিস্থ বা অস্বভাবী ব্যক্তির মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মাইতে পারে যে, সে ঘোরতর অপরাধী এবং তাহার জীবনের অবসান ঘটান প্রয়োজন ; প্রতিনিয়ত এই চিন্তা করিতে করিতে ঐ ব্যক্তি কোন উচ্চ স্থান হইতে হঠাৎ একদিন লাফাইয়া পড়িয়া জীবনের অবসান ঘটাইতে পারে। এইরূপ ক্রিয়াকে একপ্রকার ভাবনাজ ক্রিয়া বলা যাইতে পারে।

(খ) দ্বিতীয়তঃ, কতকগুলি ভাবনাজ ক্রিয়া অন্যের ক্রিয়া দেখিয়া অনুকরণের চেষ্টা হইতে উদ্ভূত হয় ; যেমন, সার্কাসে খেলোয়াড়রা যখন দড়ির উপর নৃত্য (rope dancing) করে, তাহা দেখিয়া কোন কোন দর্শক নিজের দেহকেও দোলাইতে থাকে। ইহাও একপ্রকার ভাবনাজ ক্রিয়া।

(গ) তৃতীয়তঃ, উত্তেজনার সময় কোন কিছু করিবার প্রবল ইচ্ছা হইলেও ভাবনাজ ক্রিয়া দেখা যায়। যেমন, ফুটবল খেলা দেখিবার সময় এমন এক উত্তেজনার মুহূর্তের সৃষ্টি হইতে পারে যে, কোন দর্শকের প্রিয় কোন দলের

খেলোয়াড় অল্পের জন্য গোল করিতে পারিতেছেন না এবং তখন ঐ দর্শক মনে করিতে পারেন যে, তিনি মাঠে থাকিলে তৎক্ষণাৎ গোল করিতে পারিতেন ; এই ধারণার উদয় হওয়া মাত্র তিনি হয়ত' দর্শকের আসনে বসিয়াই সামনের দিকে তাঁহার পা' ছুঁড়িয়া দিলেন। ইহাও হইবে ভাবনাজ ক্রিয়ার প্রকাশ।

৪। সহজাত বৃত্তি বা সহজ প্রবৃত্তি এবং সাহজিক ক্রিয়া (Instincts and Instinctive Acts):

(ক) সাহজিক ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Instinctive Acts):

সহজ বা সহজাত প্রবৃত্তির নাম হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, এই **প্রবৃত্তি জন্মের সময় হইতেই বিদ্যমান** এবং **ইহাকে আয়ত্ত করিবার জন্য নূতন কোন শিক্ষার প্রয়োজন হয় না।** অবশ্য যদিও ইহা আজন্ম বিদ্যমান বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তাহা হইলেও ইহার অর্থ এই নহে যে, সকল সহজাত প্রবৃত্তিই জন্মের সময় হইতেই সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত বা প্রকাশিত হয়। এমন অনেক বৃত্তি আছে যাহা শৈশবে সুপ্ত (dormant) থাকে এবং পরে প্রকাশিত হয় ; যেমন, যৌন-বৃত্তি, (sex-instinct), পাখীর পক্ষে বাসা তৈয়ারীর প্রবৃত্তি (nest-building instinct of birds)। আবার যদিও ইহা শিক্ষালব্ধ নহে, তাহা হইলেও সহজ বৃত্তি অনুসারে কার্য করিবার পদ্ধতি অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রভাবিত, পরিবর্তিত বা পরিমার্জিত হইতে পারে (যেমন, মানুষের পক্ষে 'ক্ষুধা' সাহজিক বৃত্তি, কিন্তু ক্ষুন্নিবৃত্তির পদ্ধতি অভিজ্ঞতা ও শিক্ষণের ফলে নানারূপ হইতে পারে)। (পৃঃ ৩৭৪-৭৫ দ্রষ্টব্য।)

সাহজিক বৃত্তি বলিতে যে কেবলমাত্র কোনপ্রকার শক্তি বুঝায় তাহা নহে, ইহা ঐ বৃত্তির প্রেরণা অনুযায়ী কোন কার্য করিবার প্রবণতা (tendency)-ও বুঝায়। সাহজিক ক্রিয়ার মধ্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য দেখা যায়ঃ

(১) সাহজিক ক্রিয়ার মূলে থাকে কোন **জৈব প্রয়োজন-জনিত অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ**। এই প্রয়োজন জীব-বিশেষের নিজের দেহধারণ (self-preservation)-এর প্রয়োজন হইতে পারে, অথবা ইহা সন্তানসন্ততিকে রক্ষার বা সমগ্র জাতির অস্তিত্ব রক্ষা (race-preservation)-এর প্রয়োজনও হইতে পারে। যেমন, ক্ষুধার প্রয়োজন মিটাইবার জন্য যখন কোন জীব কার্য করে, তখন প্রত্যক্ষভাবে উহা ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য কার্য করে, আবার অপত্যস্নেহের

বশে উহা যখন সন্তানসন্ততির মঙ্গলবিধানের চেষ্টা করে অথবা কামের প্রভাবে যখন যৌন কামনা চরিতার্থ করার চেষ্টা করে, তখন উহাদের মাধ্যমে জাতির অস্তিত্বের ধারা অক্ষুণ্ণ থাকে।

(২) **ঐ প্রয়োজন সম্বন্ধে জীব-বিশেষের কোন সুস্পষ্ট ধারণা থাকে না,** অর্থাৎ 'অমুক কার্য করিলে আমার দেহের মঙ্গল হইবে' বা 'অমুক কার্য করিলে আমার বংশধারা অব্যাহত থাকিবে'—এইরূপ কোন উদ্দেশ্য লইয়া জীব-বিশেষ কার্যে লিপ্ত হয় না। তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে, সাহজিক বৃত্তির সাহায্যে কোন-না-কোন উদ্দেশ্য সাধিত হয়, অথচ কর্তার অর্থাৎ যে কার্য করে তাহার ঐ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা বা অবগতি থাকে না।

(৩) সাহজিক ক্রিয়ার মাধ্যমে **কোন-না-কোন উদ্দেশ্য সাধিত হয়** এবং ঐ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য প্রয়োজনীয় উপায়গুলিও সুন্দররূপে নির্বাচিত হয়। উপায়গুলি উদ্দেশ্যের উপযুক্ত করিয়া তোলার মধ্যে যথেষ্ট কৌশল (skill)-এর পরিচয় পাওয়া যায়। অথচ উদ্দেশ্য এবং উপায়-নির্বাচনের জন্য কোনরূপ শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। এইজন্য সহজ প্রবৃত্তিকে **'অশিক্ষিত পটুত্ব'** বলা যাইতে পারে।

(৪) সাহজিক ক্রিয়া প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার ন্যায় কোন সরল প্রতিক্রিয়া (simple reaction) নহে—ইহা **জটিল** (complex) এবং কোন বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধনের উপযোগী বিবিধ ক্রিয়ার মাধ্যমে সহজ প্রবৃত্তি প্রকাশ পায়।

(৫) সহজ প্রবৃত্তিসমূহ প্রতি জীবই **উত্তরাধিকারসূত্রে পূর্বপুরুষগণের নিকট হইতে পাইয়া থাকে।** এইজন্য ইহাদের একরূপতা (uniformity) আছে। সহজপ্রবৃত্তিসমূহের 'তাগিদ' বা প্রেরণা (instinctive urge বা impulse) বংশপরম্পরায় সমভাবেই প্রকাশিত হয়।

মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে আরও দেখা যায় যে, পুরুষানুক্রমে তাহাদের সহজবৃত্তি-চালিত কার্য করিবার পদ্ধতিও অপরিবর্তিত আছে। যেমন, আজও ব্যাঘ্র যেভাবে তাহার শিকার ধরে, মৌমাছি তাহার চাক তৈয়ারী করে, মাকড়সা তাহার জাল বুনে, পাখী তাহার নিজের ও সন্তানসন্ততির আহার সংগ্রহ করে, সহস্র বর্ষ পূর্বেও তাহারা সেইরূপই করিত।

(খ) সাহজিক ক্রিয়া ও প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া (Instinctive & Reflex Acts) :

আমরা দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিয়াছি। ইহার সহিত সাহজিক ক্রিয়াকে তুলনা করিলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি প্রকাশ পায় :

(১) প্রত্যাবর্তক প্রতিক্রিয়া বাহ্য উদ্দীপক দ্বারা জাগরিত হয়; কিন্তু সাহজিক ক্রিয়া বাহ্য উদ্দীপক দ্বারা জাগরিত হয় না—ইহার উদ্দীপন কোন জৈব বা দৈহিক প্রয়োজন এবং উহা ভিতর হইতেই আসে। বাহ্য জগতের কোন বস্তু যদি ঐরূপ প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে উপযুক্ত হয়, তাহা হইলে অবশ্য ঐ বস্তুর প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে।

(২) প্রত্যাবর্তক প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কোন তাড়না পূর্ব হইতে আমাদের কোন কিছুর প্রতি চালিত করে না—উদ্দীপক প্রযুক্ত হইলে তবে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সহজাত প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে কোন আন্তর তাড়না উহার পরিতৃপ্তির জন্য বিশেষ বিশেষ বস্তুর প্রতি আমাদের চালিত করে।

(৩) প্রত্যাবর্তক প্রতিক্রিয়া একটি সরল প্রতিক্রিয়া, কিন্তু সাহজিক ক্রিয়া একটি জটিল ক্রিয়া।

(৪) প্রত্যাবর্তক প্রতিক্রিয়ার সহিত আবেগ বা প্রক্ষোভ (emotion)-এর কোন প্রত্যক্ষ সংযোগ নাই; কিন্তু সাহজিক ক্রিয়ার মূলে অনেক সময়ই আবেগ কার্য করে। (কেহ কেহ, যথা, ম্যাক্‌ডুগাল্, মনে করেন যে, প্রতি সহজ প্রবৃত্তির মূলে কোন-না-কোন আবেগ আছে)।

(৫) প্রত্যাবর্তক প্রতিক্রিয়া একটি যান্ত্রিক ক্রিয়া; কিন্তু সাহজিক ক্রিয়া যান্ত্রিক হইলেও উহার বৌদ্ধিক ক্রিয়ার একটি আবরণ (appearence of an intelligent act) আছে, কারণ উহাতে উদ্দেশ্যের সহিত উপায়ের প্রতি-যোজনের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এইজন্য অনেক লেখক সাহজিক ক্রিয়াকে পুরাপুরি যান্ত্রিক ক্রিয়া বলিতে প্রস্তুত নহেন।

(গ) সহজ প্রবৃত্তি সম্বন্ধে বিবিধ মতবাদ :

ইহার **উৎপত্তি** (origin) সম্বন্ধে পূর্বে দুইটি মতবাদ প্রচলিত ছিল :

ভুণ্ড্‌ট্ ইত্যাদির মত ঃ

ভুণ্ড্‌ট্ (Wundt), কোপ্ (Cope) ইত্যাদির মতে সহজাত প্রবৃত্তি হইল লুপ্ত বুদ্ধি (lapsed intelligence)। ইঁহাদের মতে বর্তমানে যে সকল কার্য সাহজিক ক্রিয়া বলিয়া পরিচিত, সুদূর অতীতে সেইগুলি বৌদ্ধিক কার্য ছিল, অর্থাৎ অতীতে আমাদের পূর্বপুরুষগণ ঐ সব কার্য করিবার জন্য বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইত। কিন্তু পুনঃপুনঃ একই রূপ কার্য করার ফলে ঐগুলি যান্ত্রিক অভ্যাসে পরিণত হয় এবং পরবর্তী বংশধরগণের মধ্যে ঐ সকল অভ্যাসের প্রবৃত্তি বংশপ্রভাব হিসাবে দেখা দিতে লাগিল এবং তখন ঐগুলি সহজাত প্রবৃত্তি বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল।

এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য নহে। ইহার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত যুক্তি উত্থাপন করা যাইতে পারে ঃ

(১) ইহাতে অযৌক্তিকভাবে কল্পনা করা হইয়াছে যে, আমাদের পূর্বপুরুষগণ অতিরিক্ত বুদ্ধিশালী ছিলেন।

(২) ইহাতে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, আমাদের সকল পূর্বপুরুষগণ একই প্রকারের বৌদ্ধিক কার্য পুনঃপুনঃ করিতেন—নহিলে সহজ প্রবৃত্তির সার্বিকতা ব্যাখ্যা করা যায় না।

(৩) তাহা ছাড়া, এই মতবাদ অনুসারে অভিজ্ঞতালব্ধ কোন গুণ (acquired characteristic) পরবর্তী বংশধরের মধ্যে সংক্রামিত (transmitted) হয়; কিন্তু এই বিশ্বাসের সপক্ষে আজ পর্যন্ত পর্যাপ্ত উপাত্ত সংগৃহীত হয় নাই (পৃঃ ২৫৬-৫৭ দ্রষ্টব্য)।

স্পেন্সার ইত্যাদির মত ঃ

আর একদল লেখকের মতে প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সংযোগের ফলেই বিবিধ সাহজিক ক্রিয়া উৎপন্ন হইয়াছে। স্পেন্সার্ (Spencer) ও ভাইস্‌মান্ (Weismann) এই মতের সমর্থক। আকস্মিকভাবে একটি প্রতিবর্ত ক্রিয়ার পর আর একটি প্রতিবর্ত ক্রিয়া সাধিত হইল, তাহার পর আর একটি প্রতিবর্ত ক্রিয়া সাধিত হইল—এইভাবে একটি 'প্রতিবর্ত ক্রিয়া পরম্পরা' বা সারি (series of reflex acts)-এর সৃষ্টি হইল এবং উহার ফল শেষ পর্যন্ত হয়ত' হিতকর (beneficial) হইল (পৃঃ ৪১২)। উহা হিতকর হওয়ার জন্য ঐ

একইরূপ প্রতিবর্ত কার্য-পরম্পরা বার বার সাধিত হইতে লাগিল এবং উহা অভ্যাসে পরিণত হইল; ফলে উহা পরবর্তী বংশধরগণের মধ্যে সংক্রামিত হইল ও বংশগত বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত হইল।

(১) এই মতবাদে আকস্মিকতার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। কারণ স্পেন্সার ইত্যাদির মতে আকস্মিকভাবে বা হঠাৎ একটি প্রতিবর্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হইল, আকস্মিকভাবে উহার পর আর একটি প্রতিবর্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হইল, আকস্মিকভাবে উহারা সংযুক্ত হইল, আকস্মিকভাবে উহার ফল হিতকর হইল। যে মতবাদ আকস্মিকতার উপর এত বেশী গুরুত্ব আরোপ করে, তাহা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে নির্ভরযোগ্য নহে।

(২) তাহা ছাড়া, প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যেখানে কার্য-পরম্পরার শেষ ফল হিতকর হইবে, সেক্ষেত্রে পূর্ব হইতে কি করিয়া বুঝা যাইবে কোন্ কোন্ প্রতিবর্ত ক্রিয়া একসূত্রে আবদ্ধ হইলে শেষ ফল হিতকর হইবে?

সাহজিক বৃত্তির স্বরূপ (nature of instinct) লইয়া ম্যাক্‌ডুগালের মতবাদ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিযাছে।

ম্যাক্‌ডুগালের মতবাদ:

ম্যাক্‌ডুগালের অভিপ্রায়বাদ বা হরমিক্ মনোবিদ্যায় সহজ প্রবৃত্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। (পৃ: ১৩১-১৩৩ দ্রষ্টব্য)। ম্যাক্‌ডুগাল্ মনে করেন যে, **আমাদের সকল চিন্তন ও কার্যের মূলে, আমাদের চরিত্রের মূলে, আমাদের সকল ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ব্যবহারের মূলে আছে সহজাত প্রবৃত্তি।**[৩]

ম্যাক্‌ডুগালের মতে আমাদের দুই প্রকারের সহজাত প্রবণতা দেখা যায় —কতকগুলি হইল সুনির্দিষ্ট বা বিশিষ্ট (specific), আর কতকগুলি সাধারণ

৩ Instinct-কে বর্ণনা করিয়া ম্যাক্‌ডুগাল্ বলিয়াছেন: "...(they are) innate or inherited tendencies which are the essential springs or motive powers of all thought and action, whether individual or collective, and are the bases from which the character and will of individuals and nations are gradually developed under the guidance of the intellectual faculties." (*An Introduction to Social Psychology*, p. 20).

বা অনির্দিষ্ট (general or non-specific)। সুনির্দিষ্ট প্রবণতাগুলিকে সহজাতবৃত্তি (instinct) বলা যায় ; যথা, ভয়, ঔৎসুক্য, বিবাদপ্রিয়তা। আর সাধারণ বা অনির্দিষ্ট প্রবণতা হইল সহানুভূতি, অভিভাবন-প্রবণতা (suggestibility) এবং অনুকরণবৃত্তি।

যে সকল প্রবণতা সুনির্দিষ্ট এবং সহজপ্রবৃত্তি আখ্যা পাইবার যোগ্য তাহাদের প্রত্যেকটিরই তিনটি 'অংশ' বা দিক্ (aspect) আছে—(ক) উহাদের প্রত্যেকটিরই কেন্দ্রে বা মূলে আছে কোন-না-কোন আবেগ (emotion), (খ) উহাদের জাগরিত করে বিশেষ বিশেষ উদ্দীপকের প্রত্যক্ষ এবং (গ) উহারা প্রত্যেকেই বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধনের পথে চালিত হয় (পৃঃ ১৩২ দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ সহজপ্রবৃত্তিসমূহের লক্ষ্য হইল কোন বিশেষ উদ্দেশ্যসাধন ; সুতরাং ঐ উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে যেগুলি সহায়ক সেইগুলিকে প্রাণি-বিশেষ বা ব্যক্তি-বিশেষ প্রত্যক্ষ করে। আবার উদ্দেশ্যসাধনের বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া কতকগুলি আবেগ বা প্রক্ষোভ থাকে এবং ঐ সব আবেগই কার্যপ্রবণতা (tendency to act) সৃষ্টি করে ; ফলে কার্যটি নিষ্পন্ন হয়। বাস্তবিক ম্যাকডুগাল্ মনে করেন যে, প্রাণি-মনে যেখানেই আবেগের উদ্ভব হয়, সেইখানেই সহজাত প্রবৃত্তি আছে এবং যেখানেই সহজাত প্রবৃত্তির বশে কার্যপ্রবণতা দেখা যায় তাহারই পশ্চাতে কোন-না-কোন আবেগের উত্তেজনা আছে।[৪] যেমন, ধরা যাউক্ পলায়ন-প্রবৃত্তি (instinct of escape)—উহার কেন্দ্র বা মূলে আছে ভয়রূপ আবেগ এবং যাহাতে ক্ষতি বা অপকার হইতে পারে এইরূপ বস্তু প্রত্যক্ষ করিলে

৪ ম্যাক্‌ডুগালের ভাষায় : "Wherever we observe in an animal signs of emotion...we may accept that as an indication of the working of a corresponding intinct. And, whenever we see an animal aroused to some train of intinctive activity, we may assume that it experiences some emotional excitement." (*An Outline of Psychology*, p. 120). ম্যাক্‌ডুগালের এই মতবাদ জেম্‌স্ (William James)-এর মতবাদের সহিত তুলনীয় ; জেম্‌স্ বলেন : "Instinctive reactions and emotional expressions...shade imperceptively into each other. Every object that excites an instinct excites an emotion as well." (*Principles of Psychology*. Vol II, p. 442).

ঐ আবেগ জাগরিত হয় এবং উহা প্রাণি-বিশেষকে বিপদাবস্থা হইতে দূরে চালিত করে।

যেহেতু সহজাত প্রবৃত্তির একটা প্রত্যক্ষের দিক্ আছে, সেইহেতু শিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা দ্বারা কতকাংশে উহার পরিবর্তন সম্ভব। ভীষণ শব্দ শুনিলে শিশুর স্বভাবতঃই ভয় দেখা দেয়; এইজন্য যেহেতু আকাশে বিদ্যুৎ চমকাইবার পর প্রায়ই মেঘগর্জন শুনা যায়, সেই হেতু আকাশে বিদ্যুৎ চমকাইতে দেখিলেই অনেক শিশু ভয় পায়।[৫] সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অভিজ্ঞতার ফলে সহজ প্রবৃত্তির সহিত সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত উদ্দীপকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে পারে। আবার প্রতিক্রিয়ারও পরিবর্তন ঘটিতে পারে; যেমন, ভীতিজনক কোন কিছু প্রত্যক্ষ করিলে কোন একজন শিশু হয়ত' পূর্বে পলাইয়া যাইত (যেমন, বিদ্যুৎ দেখিলে লুকাইয়া পড়িত), পরে সে হয়ত' এইপ্রকার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ না করিতে শিখিতে পারে এবং কেবলমাত্র ভাষার মাধ্যমে তাহার ভীতি প্রকাশ করিতে পারে।

ম্যাক্‌ডুগাল্ সহজ প্রবৃত্তির একটি তালিকাও দিয়াছেন। প্রথমে তিনি এগারটি সুনির্দিষ্ট (specific) সহজাত প্রবৃত্তির কথা বলেন; পরে তিনি ঐ তালিকার সামান্য পরিবর্তন করিয়া **চৌদ্দটি প্রধান সহজ প্রবৃত্তির**[৬] কথা বলেন। ঐগুলি হইল নিম্নলিখিতরূপ ঃ

সহজাত প্রবৃত্তি	উহার সহিত সংশ্লিষ্ট মূল আবেগ বা অনুভূতি
(১) বাৎসল্যবৃত্তি বা অপত্যরক্ষা প্রবৃত্তি ... ... (Parental instinct)	কোমল অনুভূতি (Tender feeling)
(২) সংগ্রাম প্রবৃত্তি ... ... (Instinct of combat)	ক্রোধ (Anger)

৫ অভিজ্ঞতার আলোকে সাহজিক প্রবৃত্তির পরিবর্তনের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে ম্যাক্‌ডুগালের এই মতবাদের সহিত সাপেক্ষীকরণ সম্বন্ধে পাভ্‌লভের মতবাদ তুলনীয় (একাদশ অধ্যায়, পৃঃ ৩৫০ দ্রষ্টব্য)।

৬ McDougall, *An Outline of Psychology*, pp. 135-165 দ্রষ্টব্য।

উপরে বর্ণিত সহজ প্রবৃত্তিগুলি মনুষ্য ব্যতীত অন্যান্য স্তন্যপায়ী জীবের মধ্যেও দেখা যায় বলিয়া ম্যাক্‌ডুগাল্ ইহাদের 'Instincts of Mammals and of Man' আখ্যা দিয়াছেন।

	সহজাত প্রবৃত্তি	উহার সহিত সংশিষ্ট মূল আবেগ বা অনুভূতি
(৩)	কৌতূহল প্রবৃত্তি ... ... (Instinct of curiosity)	বিস্ময় (Wonder)
(৪)	খাদ্যান্বেষণ প্রবৃত্তি ... ... (Instinct of food-seeking)	ক্ষুধার অনুভূতি (Feeling of hunger)
(৫)	পরিবর্জন প্রবৃত্তি ... ... (Instinct of repulsion)	বিরক্তি (Disgust)
(৬)	পলায়ন প্রবৃত্তি .. ... (Instinct of escape)	ভয় (Fear)
(৭)	যূথ প্রবৃত্তি ... ... (Gregarious instinct)	নিঃসঙ্গতা বা একাকিত্ববোধ (Feeling of loneliness)
(৮)	আত্মপ্রতিষ্ঠা বা আত্মসাম্মুখ্য প্রবৃত্তি ... (Instinct of self-assertion)	গৌরব বা মহত্ত্ববোধ (Feeling of superiority)
(৯)	আত্মদমন বা আত্মনিবেদন-প্রবৃত্তি ... ... (Instinct of submission)	বিনয় (Humility)
(১০)	যৌনপ্রবৃত্তি ... ... (Sex instinct)	কামভাব (Lust বা love)
(১১)	সঞ্চয় প্রবৃত্তি ... ... (Instinct of hoarding)	অধিকারের গৌরববোধ (Feeling of ownership)
(১২)	সংগঠন প্রবৃত্তি ... ... (Constructive instinct)	সৃষ্টির আনন্দ (Feeling of creativeness)
(১৩)	অনুনয় প্রবৃত্তি ... .. (Instinct of appeal)	দৈন্যবোধ (Feeling of distress)
(১৪)	হাস্য-প্রবৃত্তি ... ... (Instinct of laughter)	কৌতুক বা আনন্দবোধ (Feeling of amusement)

ম্যাক্‌ডুগাল্‌-প্রদত্ত এই তালিকা অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, ইহাদের কতকগুলি জৈব প্রয়োজনে আবির্ভূত হয়, কতকগুলি অন্য জীবের প্রতি প্রতিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়, আর কতকগুলি স্বতঃস্ফূর্ত লীলাপূর্ণ ব্যবহাররূপে প্রকাশিত হয়। ম্যাক্‌ডুগালের মতে এই সকল সহজ প্রবৃত্তি ব্যতীত আরও কয়েকটি অপ্রধান সহজপ্রবৃত্তি আছে, যথা, হাঁচা, কাশা, চুলকান (কণ্ডূয়ন), মলমূত্রাদি ত্যাগ ('tendencies to sneeze, to cough, to scratch any itching spot, to defecate and to urinate')।[৭]

সহজাত প্রবৃত্তিসমূহের সমন্বয়ে আবার বিবিধ রস (sentiment)-এর উদ্ভব হইতে পারে। যেমন, কাম বা প্রেম হইল যৌনপ্রবৃত্তির সহিত সংশ্লিষ্ট অনুভূতি বা আবেগ; কিন্তু ইহা আবার অন্যান্য আবেগের সহিত যুক্ত হইতে পারে—যেমন, প্রেমাস্পদের আনন্দে আনন্দ, দুঃখে দুঃখ, তাহার প্রত্যাখ্যানে মনোবেদনা ইত্যাদির আবির্ভাব ঘটিতে পারে। আবার আত্মনিবেদন এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তির সমন্বয়ে আত্মশ্রদ্ধা-রস (self-regarding sentiment) দেখা দেয় (পৃঃ ১৩৩ দ্রষ্টব্য)।

ম্যাক্‌ডুগাল তাঁহার মনোবিদ্যায় সহজাত প্রবৃত্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহার মতে সকল ব্যবহারের মূলে কোন না কোন সহজ প্রবৃত্তি কার্য করে। তিনি আরও বিশ্বাস করেন যে, মনুষ্যেতর প্রাণী এবং মনুষ্য উভয়েরই ক্ষেত্রে এই সহজাত প্রবৃত্তিগুলি কার্য করে। সুতরাং এই দিক্‌ হইতে বিচার করিলে মনুষ্যের ব্যবহার এবং ইতর জীবের ব্যবহার উভয়েরই মূলে একই প্রকার প্রবৃত্তি আছে, অর্থাৎ ম্যাক্‌ডুগালের মতে মানুষের ক্ষেত্রে নূতন কোন নীতি প্রকৃতিতে প্রবর্তিত হয় হয় নাই[৮] (যদিও অবশ্য

৭ McDougall, *Outline of Psychology*, p. 164.

৮ McDougall-এর ভাষায়: "Man, though he is Nature's most favoured child, was not constructed by her upon any new principle. He is only one among her many marvels, though the greatest of them; and in the structure of his mind, as in his body, there are no elements and no principles that she has not used again and again in those less exhalted achievements which we call animals. In making Man she did but compound the same elements more subtly and with greater skill and success..." (*Outline of Psychology*, p. 134).

মানুষের সাহজিক প্রবৃত্তিগুলি অভিজ্ঞতা ও শিক্ষণের ফলে নানাভাবে পরিবর্তিত হইয়া থাকে)।

আমরা ম্যাক্‌ডুগালের মতবাদের সমালোচনা পূর্বেই (পৃঃ ১৩৩-৩৫) করিয়াছি। ম্যাক্‌ডুগালের মতবাদ প্রচলিত হইবার ফলে যান্ত্রিকতাবাদের প্রসার বাধা লাভ করে এবং কার্যের ভিতর যে উদ্দেশ্যমুখিতা (purposiveness) থাকে সেই দিকে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাহা ছাড়া, মনুষ্যেতর প্রাণীর কার্য এবং মনুষ্যের কার্যের মধ্যে যে সুনির্দিষ্ট সীমারেখা পূর্বে টানা হইত, তাহাও অনেক পরিমাণে অপসারিত হয়। উহার ফলে প্রাণি-মনোবিদ্যার পর্যালোচনা এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে।

তবে ম্যাক্‌ডুগালের মতবাদও ক্রমে একদেশদর্শী হইয়া পড়ে। তিনি তাঁহার মনোবিদ্যায় একই ছাঁচে বা একই পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রকারের কার্যকে ব্যাখ্যা করিবার যে প্রচেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সমর্থনীয় নহে। তিনি হাঁচা, কাশা, চুলকান ইত্যাদি প্রত্যাবর্তক ক্রিয়াকেও সহজাত প্রবৃত্তি বলিয়া যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাতে তিনি 'সহজাত প্রবৃত্তি' পদটিকে অতিব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু ইহা সর্বজনগ্রাহ্য নহে।

আধুনিক মতবাদ ঃ

বিবর্তনবাদ (Theory of Evolution)-এর প্রসারের ফলে মানুষ প্রকৃতিরাজ্যে যে পৃথক্‌স্থানের দাবী করিত, তাহার যৌক্তিকতা কতক পরিমাণে হ্রাস পায়। মানুষের সৃষ্টি একদিনে হঠাৎ হয় নাই; বরং বিবর্তনের ফলে ধীরে ধীরে নিম্নস্তরের জীব হইতে সে বিবর্তিত হইয়াছে—এই বিশ্বাস প্রচলিত হয়। তাহার ফলে মানুষের ব্যবহার এবং ইতর জীবের ব্যবহার উভয়েরই সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার জন্য একটি সাধারণ প্রত্যয়ের প্রয়োজন অনুভূত হয় এবং এইজন্য 'সহজাত প্রবৃত্তি' (instinct) পদটি ব্যবহৃত হইতে থাকে। ফলে সকল প্রকার ব্যবহারকেই সহজাত প্রবৃত্তির নামে ব্যাখ্যা করা হইতে থাকে। মাকড়সা কেন জাল বুনে? সহজাত প্রবৃত্তির বশে। আবার লোকে কেন মেলামেশা করিতে ভালবাসে? সহজাত প্রবৃত্তির বশে। শিশুরা কেন দুষ্টামি করে? সহজাত প্রবৃত্তির বশে। অর্থাৎ সহজাত প্রবৃত্তিগুলিই সকল ব্যবহারের ব্যাখ্যার মূলসূত্র হইয়া পড়িল।

অনেক তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে যে, যাহা একদিন পর্যাপ্ত বা সম্যক্ বলিয়া মনে হইত, তাহাই পরে অপর্যাপ্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। সহজ প্রবৃত্তির আলোকে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও এই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। মনোবিদ্‌গণ ক্রমশঃই অভিযোগ করিতে থাকেন যে, সহজাত প্রবৃত্তির প্রত্যয়টি বর্ণনামূলক (descriptive), উহা কোন কার্যের বৈজ্ঞানিক কারণ নির্দেশ করে না। বাস্তবিকই, যদি বলা যায় যে, 'মানুষ ভীতিপ্রদ বস্তু দেখিলে পলাইয়া যায়, কারণ মানুষের পলায়ন-প্রবৃত্তি আছে', তাহা হইলে উহা একই কথার পুনরাবৃত্তি মাত্র। তাহা ছাড়া, সহজাত প্রবৃত্তিকে যখন পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত একটি অদৃশ্য শক্তি বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তখন অকারণ এক রহস্যের সৃষ্টি করা হয় বলিয়াও কেহ কেহ অভিযোগ করেন।[১]

অবশ্য পুনরায় আবার একদল লেখক সহজপ্রবৃত্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন।

(ঘ) মানুষের জীবনে সহজাত প্রবৃত্তির প্রভাব (Place of instincts in human life) :

মনুষ্যেতর প্রাণীর জীবনে সহজাত বৃত্তির প্রভাব অপরিসীম। ইহাদের জীবনে যৌন-কামনা, ক্ষুধা, বাসস্থান-নির্মাণের প্রবৃত্তি, আত্মরক্ষা ও আক্রমণের প্রবৃত্তি বিশেষভাবে প্রকাশমান। কিন্তু মানুষের জীবনে সহজাত প্রবৃত্তি কতদূর কার্য করে তাহা লইয়া মতভেদ আছে। এ বিষয়ে ডারউইন্-পূর্ব (Pre-Darwinian) এবং ডারউইন্-উত্তর (Post-Darwinian) যুগের লেখকগণের দৃষ্টিভঙ্গীর ভিতর পার্থক্য দেখা যায়। ডারউইন-পূর্ব যুগের অনেক লেখক মনে করিতেন যে, যদিও মনুষ্যেতর জীবের জীবন সহজ প্রবৃত্তি দ্বারা পূর্ণভাবে চালিত, মনুষ্যের জীবন কেবল বুদ্ধি বা যুক্তি দ্বারা চালিত।

---

১ তুলনীয় : "It became increasingly clear that in accounting for behavior in terms of instincts, nothing has been accomplished after all. To attribute the wasp's nest-building ability to an instinct for nest-building is little more than a circular explanation.........Moreover, to 'explain' instincts as 'hereditary propensities' is substituting one mystery for another." (J. P. Chaplin & T. S. Krawiec, ***Systems and Theories of Psychology***, p. 314).

মানুষ হইতেছে প্রকৃতির এক পৃথক্ সৃষ্টি; সুতরাং মানুষের ব্যবহার মনুষ্যেতর জীবের ব্যবহারের সহিত তুলনীয় বা সমপর্যায়ভুক্ত নহে। কিন্তু ডারউইনের বিবর্তনসম্বন্ধীয় মতবাদের প্রচলনের ফলে এই বিশ্বাস জন্মিল যে, মানুষ প্রকৃতির কোন পৃথক্ বা বিশেষ সৃষ্টি নহে। সুতরাং ডারউইন্-উত্তর যুগের অনেক লেখক এই মতবাদ পোষণ করিতে লাগিলেন যে, মানুষের ব্যবহার মনুষ্যেতর জীবের ব্যবহারের ন্যায় একই প্রকার সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত।[১০] অবশ্য মানুষের প্রবৃত্তিগুলি অভিজ্ঞতা ও শিক্ষণের দ্বারা পরিবর্তিত হয়। আবার এই মতবাদের বিরুদ্ধেও প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। সাম্প্রতিক কালের অনেক মনোবিদ্ 'সহজাত প্রবৃত্তি' পদটি বিশেষ পছন্দ করেন না এবং তাঁহারা প্রেষণা পদটিই অধিক পছন্দ করেন (পৃঃ ৩৬৫-৬৭ দ্রষ্টব্য)।

আমরা এ বিষয়ে কোন বিশেষ দলের মতবাদ সমর্থন না করিয়া সাধারণ-ভাবে বলিতে পারি যে, মনুষ্যেতর জীবের ন্যায় মানুষও কতকগুলি প্রবৃত্তি লইয়া জন্মায়। তবে মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে এই সকল প্রবৃত্তি অনেক পরিমাণে অপরিবর্তিত থাকে, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে ইহারা অভিজ্ঞতা ও শিক্ষণের দ্বারা প্রভাবিত হয়। অর্থাৎ মানুষের অনেক প্রবৃত্তির মূল তাড়নার সহিত মনুষ্যেতর প্রাণীর তাড়নার মিল আছে, কিন্তু এই সকল তাড়নাকে তৃপ্ত করিবার বিবিধ উপায় ও উদ্দেশ্য মানুষ আবিষ্কার করিয়া ঐ গুলিকে নানা প্রকার নূতন রূপ দান করিয়াছে।[১১]

৫। অভ্যাস (Habit):

কোন ঐচ্ছিক ক্রিয়াকে পুনঃপুনঃ করার ফলে অভ্যাস জন্মে। অভ্যাস বদ্ধমূল হইলে উহা ইচ্ছা-নিরপেক্ষ হইয়া পড়ে, কিন্তু উহা আয়ত্ত করিবার মূলে ইচ্ছা বর্তমান থাকে।[১২] যেমন, আমরা বেড়ান, স্নান করা,

১০ ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যান্ত্রিকতাবাদের সমর্থক চেষ্টিতবাদী ওয়াট্‌সন্ সহজাত প্রবৃত্তির অস্তিত্বে বিশ্বাসী নহেন।

১১ দ্বাদশ অধ্যায়ে মানুষের কতকগুলি প্রেষণার বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

১২ তুলনীয়: "Habit is lapsed volition." [সাধারণতঃ 'অভ্যাস'-পদটি ক্রিয়া সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়; তবে ব্যাপক অর্থে habit of thinking, habit of feeling ইত্যাদিও আমরা বলিয়া থাকি]।

অধ্যাপক সালি (Sully)-র ভাষায়: "What differentiates such habitual

পোশাক পরা ইত্যাদি নানা বিষয় অভ্যাস করিয়াছি; কিন্তু এইগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে এক বিশেষ ভঙ্গিমায় বেড়ান, বা স্নান করা, বা পোশাক পরার কার্য বার বার করিতে হইয়াছে। অভ্যাস প্রতিষ্ঠিত হইলে উহার উপর আর বিশেষ নিয়ন্ত্রণ থাকে না। এইজন্য অভ্যাস-সঞ্জাত কার্য অনৈচ্ছিক ক্রিয়াতে রূপান্তরিত হয়।[১৩]

অভ্যাসের সুবিধা ও সুফল:

কোন অভ্যাস আয়ত্ত হইলে ব্যক্তি-বিশেষের ঐ কার্য করিবার একটা প্রবণতা ও তৎসহ যোগ্যতা ও দক্ষতা জন্মে। যেমন সন্তরণ প্রথম শিখিবার সময় ইচ্ছাপূর্বক নানাপ্রকার দেহ-সঞ্চালনের কৌশল আয়ত্ত করিতে হয়; পরে ঐ বিষয়ে ব্যক্তি-বিশেষের একটি প্রবণতা বা ঝোঁক (tendency) আসিয়া পড়ে। আবার বার বার ঐ রূপ কার্য করিবার ফলে ক্রমে যোগ্যতা (fitness), দক্ষতা (skill) এবং দ্রুততা (speed) জন্মে। এইজন্য অভ্যাস সুদৃঢ় হইলে অভ্যাসলব্ধ কার্য করিবার কালে উহাতে বিশেষ মনোযোগ দিবার প্রয়োজন হয় না; যেমন, যাহার টাইপ্‌রাইটার যন্ত্রে ছাপা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, তাহার আর ছাপিবার বা টাইপ্ করিবার সময় অঙ্গুলি সঞ্চালনের দিকে মনোযোগ দিবার প্রয়োজন নাই—বরং মনোযোগ দিলে কার্যের দ্রুতি (speed) ব্যাহত হয়।[১৪] তাহা ছাড়া, অভ্যাস সুপ্রতিষ্ঠিত

chains from automatic succession is the initial volitional impulse. I must consciously and voluntarily *start* the walking, dressing and so forth. But the start is all, so far as volition is concerned. The succession then takes care of itself, and what is more, is carried out better for the non-intervention of attention." (*Outlines of Psychology*, p. 450).

১৩ এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত প্রবচনদ্বয় উল্লেখ করা যাইতে পারে:

(ক) অভ্যাসে করায় কর্ম; (খ) Habit is second nature.

১৪ জেম্‌স (James) তাঁহার সুবিখ্যাত *Principles of Psychology*-তে অভ্যাস সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি অভ্যাস আয়ত্ত করার সুবিধা সম্বন্ধে আলোচনা-কালে উদাহরণ দিয়াছেন: "Whilst we are learning to walk, to ride, to swim, skate, fence, write, play or sing, we interrupt ourselves at

হইলে কার্য যথাযথভাবে করা যায় এবং জটিল কার্যের মধ্যেও একটা সরল সহজ ভাব দেখা দেয়। এই কারণে জটিল কার্য করার জন্য শ্রান্তি বা অবসাদ (fatigue বা depression) কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

অভ্যাস বদ্ধমূল হইলে জটিল কার্য করিবার জন্য সাধারণতঃ যে সময়ের প্রয়োজন হয়, তাহা অনেক পরিমাণে কমিয়া যায় এবং ত্বরিৎগতিতে উহা সম্পন্ন হয়।[১৫] এইজন্য শিক্ষার ক্ষেত্রে যতগুলি সম্ভব সু-অভ্যাস যাহাতে আয়ত্ত হয় এবং কু-অভ্যাস পরিত্যক্ত হয়, সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এইভাবে যদি অনেকগুলি সু-অভ্যাস আয়ত্ত করা যায় এবং যদি সেগুলি স্বতঃক্রিয়ভাবে সাধিত হয়, তাহা হইলে অযথা দৈহিক ও মানসিক শক্তির অপচয় রক্ষা করা যায় এবং ঐ শক্তি উচ্চতর মানসিক কার্যের জন্য ব্যয়িত হইতে পারে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে সু-অভ্যাস গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর অনেকেই গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন যে, শিক্ষার জন্য প্রয়োজন ব্যক্তি-বিশেষকে সদাচরণে অভ্যস্ত করিয়া তোলা। যদি কঠোর আত্ম-সংযম ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অভ্যাস দ্বারা ব্যক্তি-বিশেষ নিজেকে এমন ভাবে গড়িয়া তোলে যে, সে সহজে সৎপথ হইতে বিচলিত হয় না এবং সৎকার্য করিবার দিকে তাহার একটা প্রবণতা দেখা দেয়, তবেই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত

every step by unnecessary movements and false notes. When we are proficients, on the contrary, the results follow not only with the very minimum of muscular action requisite to bring them forth, but they follow from a single instantaneous 'cue'. The marksman sees the bird, and, before he knows it, he has aimed and shot.......A glance at the musical hieroglyphics, and the pianist's fingers have rippled through a shower of notes." (Vol. I, p. 114).

১৫ অভ্যাসজনিত কার্য এত দ্রুত গতিতে অনেক সময় সম্পন্ন হয় যে, উদ্দীপকের প্রয়োগ-মাত্র প্রতিক্রিয়া সাধিত হয়। এই প্রসঙ্গে জেমস্ একটি গল্পের উল্লেখ করিয়াছেন: একবার সৈন্যবিভাগের একটি লোক হোটেলে খাদ্য-পরিবেশকের (waiter) কার্যভার গ্রহণ করে। একদিন সৈন্যবিভাগের এক পদস্থ কর্মচারী ঐ হোটেলে আহারকালে ঐ ব্যক্তিকে চিনিতে পারিয়া 'Attention' বলেন এবং উহা শুনিবামাত্র সে পুরাতন অভ্যাসবশে হঠাৎ হাত নামাইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে; ফলে তাহার হাত হইতে খাবারের প্লেট্ পড়িয়া গেল।

হয়। জেম্স্ (James),[১৬] নান্ (Nunn), রস্ (Ross) ইত্যাদি এই মতের সমর্থক।

বাস্তবিক অভ্যাসের সহিত কেবল যে অতীত অভিজ্ঞতারই সংযোগ রহিয়াছে তাহা নহে, ইহার সহিত ভবিষ্যতেরও সংশ্রব রহিয়াছে; কারণ যে ভাবে যে অভ্যাস গঠিত হইবে, সেইভাবেই উহা ভবিষ্যৎ জীবনকে পরিচালনা করিবে।[১৭]

অভ্যাসের কু-ফল :

অভ্যাসের একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, অভ্যাসগুলি স্বতঃই পরিচালিত হয় এবং এইজন্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে উহাকে পরিবর্তন করা কষ্টসাধ্য হয়।

এই কারণে কু-অভ্যাসের ফল মানবের জীবনে অত্যন্ত ক্ষতিকর। যেমন, কু-বাক্য বলা, অসৎ সংসর্গে মেলা-মেশা করা ইত্যাদির অভ্যাস একবার সুদৃঢ় হইলে উহাদের সহজে পরিত্যাগ করা যায় না। উহাদের পরিহার করিতে হইলে কঠোর মনোবলের আবশ্যক এবং সাধারণ লোকের ঐরূপ ক্ষমতা প্রায়ই থাকে না বলিয়া সাধারণের ক্ষেত্রে কু-অভ্যাস বিশেষ ক্ষতিকর। এইজন্য কু-কার্যের পৌনঃপুনিকতা যাহাতে না ঘটে, কু-অভ্যাসের প্রারম্ভেই যাহাতে তাহাকে উচ্ছেদ করা হয়, সে বিষয় বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

১৬ জেম্স্ অভ্যাসের নৈতিক ও শিক্ষামূলক মূল্যের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন :

"The great thing, then, in all education, is to ***make our nervous system our ally instead of our enemy.*** It is to fund and capitalize our acquisitions, and live at ease upon the interest of the fund. ***For this we must make automatic and habitual, as early as possible, as many useful actions as we can.*** " (*Ibid.*, Vol. 1, p. 122).

তবে আর একদল লেখক (যথা, ফ্রোয়েবেল্, মণ্টেসরি, রাসেল ইত্যাদি) শিক্ষার ক্ষেত্রে অভ্যাস-বদ্ধ 'বাঁধাধরা' (বা routine-মাফিক) জীবনযাত্রা পছন্দ করেন না। শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং নূতন নূতন অভিজ্ঞতার বা নূতন নূতন কর্মপন্থার মাধ্যমেই ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে।

১৭ তুলনীয় : "The basic characteristic of habit is that every experience enacted and undergone, modifies the one who acts and undergoes, while this modification affects, whether we wish it or not, the quantity of subsequent experiences...It (habit) covers the formation of attitudes, attitudes that are emotional and intellectual." (John Dewey, ***Experience and Education,*** pp. 25, 26)

অভ্যাস-গঠনের নিয়ম :

অভ্যাস গঠিত হইবার পূর্বে উহা ঐচ্ছিক ক্রিয়া-বিশেষ থাকে ; সুতরাং অভ্যাস-গঠনের জন্য ইচ্ছাপূর্বক কতকগুলি বিধান মানিয়া চলিতে হইবে :

(১) অভ্যাস-গঠনের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন যাহা অভ্যাস করিতে হইবে, তাহা পুনঃপুনঃ করা। যাহাতে পৌনঃপুনিকতা ব্যাহত না হয়, সেইজন্য এই বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকিতে পারিলে ভাল হয়।

(২) অভ্যাস গঠনের জন্য যে সকল কার্য করিতে হইবে, তাহার ধারা যতদূর সম্ভব অব্যাহত রাখিতে হইবে ; অর্থাৎ অভ্যাস-গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যের গতি নিরবচ্ছিন্ন (continuous) থাকা বাঞ্ছনীয়। এই কারণে অভ্যাস-গঠনের সময়েরও ব্যতিক্রম না হইতে দেওয়া উচিত। এইজন্য প্রতিদিন একই সময় ব্যায়াম করা, পড়িতে বসা, স্নান করা ইত্যাদি কার্য করিলে ঐ সব সম্বন্ধে অভ্যাস জন্মে। কিন্তু একদিন ব্যায়াম করিয়া যদি আবার ১৫।২০ দিন পরে উহা করা যায়, তাহা হইলে ঐ বিষয়ে আর অভ্যাস জন্মে না।

(৩) সুযোগ পাইলেই আবশ্যকীয় কার্যটির অনুশীলন করিতে হইবে।

(৪) অপরের ক্ষেত্রে কোন অভ্যাস গঠন করিতে হইলে তাহার সম্মুখে বাঞ্ছিত অভ্যাসটি নিজে অনুশীলন করিয়া অভ্যাস গঠনের পরামর্শ দান করা উচিত। যেমন, যে ব্যক্তি কোন শিশুকে সত্য কথা বলানোর অভ্যাস গঠন করাইতেছে, যে যদি তাহার সম্মুখে প্রায়ই মিথ্যা কথা বলে, তাহা হইলে ঐরূপ কার্য শিশুর পক্ষে সু-অভ্যাস গঠনের পরিপন্থী হইবে।

আবার যে আচরণটি অন্যের পক্ষে পালন করা বাঞ্ছনীয় সেটি করিতে তাহাকে উৎসাহ দেওয়া কর্তব্য। অপর পক্ষে অযথা ভয় দেখাইয়া বা মিথ্যা প্রলোভন দ্বারা অভ্যাস গঠনের চেষ্টা করা উচিত নহে।[১৮]

---

১৮ অনেক সময় পড়াশুনার অভ্যাস জন্মাইবার জন্য পড়াশুনা না করিলে পিতামাতা বা শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিশুদের শাস্তি দেন। আবার, অনেক সময় দুষ্টামি বন্ধ করিবার জন্য শিশুকে ভয় দেখান হয় যে, দুষ্টামি বন্ধ না করিলে তাহাকে পড়িতে বসাইয়া দেওয়া হইবে (যেন পড়িতে বসা একপ্রকার শাস্তি)। ইহার পরিণাম অত্যন্ত মন্দ হয়, কারণ শাস্তির মাধ্যমে কোন সুষ্ঠু অভ্যাস গঠন করা যায় না।

অভ্যাস ও প্রতিবর্ত ক্রিয়া ঃ

অভ্যাস গঠিত হইবার পর উহা অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার রূপ ধারণ করে এবং এই হিসাবে উহা প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সহিত তুলনীয়।

তবে অভ্যাসের সহিত প্রতিবর্ত ক্রিয়ার পার্থক্য থাকে ঃ

(১) অভ্যাসিক ক্রিয়া সাধারণতঃ জটিল, কিন্তু প্রতিবর্ত প্রতিক্রিয়া একটি সরল প্রতিক্রিয়া। বিশেষ বিশেষ ভঙ্গিমায় স্নান করা, ব্যায়াম করা, আহার করা ইত্যাদি সকল অভ্যাসই একাধিক ক্রিয়ার সংযোগ বা সমন্বয়; কিন্তু চক্ষে হঠাৎ তীব্র আলো পড়িলেই যখন আমরা চক্ষু বুজিয়া ফেলি, তখন একটি উদ্দীপকের ফলে একটি সরল প্রতিক্রিয়া সাধিত হয়।

(২) অভ্যাস হইল আয়াসলব্ধ—চেষ্টা করিয়া উহাকে আয়ত্ত করিতে হয়। কিন্তু প্রতিবর্ত ক্রিয়ার ক্ষমতা এইভাবে আয়ত্ত করিতে হয় না, ইহা সহজাত।

(৩) অভ্যাস গঠিত হইবার পর বিশেষ চেষ্টা করিয়া উহাকে পরিহার করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রতিবর্ত ক্রিয়া করিবার ক্ষমতা পরিহারের কোন প্রশ্ন উঠে না।

(৩) অভ্যাসিক ক্রিয়া গঠনের প্রথম পর্যায়ে উহা ঐচ্ছিক ক্রিয়া থাকে, কিন্তু প্রতিবর্ত ক্রিয়া সকল অবস্থাতেই অনৈচ্ছিক।

অভ্যাস ও সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া ঃ

সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়াও এক প্রকারের অভ্যাস। পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিয়া যেমন অভ্যাস গঠিত হয়, সেইরূপ নিরপেক্ষ উদ্দীপক এবং সাপেক্ষ উদ্দীপকের কয়েকবার অনুষঙ্গ ঘটার ফলে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া স্থাপিত হয়; মাত্র ২।১ বার অনুষঙ্গ ঘটিলে উহা স্থাপিত হয় না। তবে অভ্যাসের সহিত ইহার পার্থক্যও আছে ঃ

(১) সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া স্থাপিত করিবার জন্য যে নিরপেক্ষ বা মূল উদ্দীপকের সহিত সাপেক্ষ উদ্দীপককে সংযুক্ত বা অনুষঙ্গবদ্ধ করা হয়, সেই মূল উদ্দীপক প্রদত্ত হইলে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তাহা সহজাত। কিন্তু যে সকল কার্যের পৌনঃপুনিকতার ফলে অভ্যাস গঠিত হয়, সেই সকল কার্য ঐচ্ছিক কার্য। অর্থাৎ অভ্যাসের মূলে থাকে ঐচ্ছিক ক্রিয়া; কিন্তু সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মূলে থাকে অনৈচ্ছিক ক্রিয়া।

(২) অভ্যাস একবার গঠিত হইলে উহাকে সহজে পরিহার করা যায় না, কিন্তু সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া একবার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর সহজেই উহাকে আবার বিলুপ্ত বা 'নির্বাপিত' (extinguished) করা যায়। (পৃঃ ৩৫৪)।

(৩) অভ্যাস একটি জটিল প্রক্রিয়া, কিন্তু সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া অপেক্ষাকৃত সরল।

অভ্যস্ত ক্রিয়া ও সাহজিক ক্রিয়া (Habit vs. Instinct) :

অভ্যাস ও সাহজিক ক্রিয়া উভয়ই হইল জটিল ক্রিয়া। সাহজিক ক্রিয়ার মধ্যে যেমন সরল কার্যের পরম্পরা (series) বর্তমান, সেইরূপ অভ্যস্ত ক্রিয়ার মধ্যেও একটি কার্য-পরম্পরা দেখা যায়।

আবার উভয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্য আছে :

(১) অভ্যস্ত ক্রিয়ার মূলে আছে ঐচ্ছিক ক্রিয়া, কিন্তু সাহজিক ক্রিয়ার মূলে কোন ঐচ্ছিক ক্রিয়া নাই। চেষ্টার সাহায্যে অভ্যাস আয়ত্ত করিতে হয় ; কিন্তু সহজপ্রবৃত্তি জন্মলব্ধ, এবং ঐ প্রবৃত্তিই আমাদের সাহজিক ক্রিয়াতে নিয়োজিত করে।

(২) অভ্যস্ত ক্রিয়া অভিজ্ঞতালব্ধ, কিন্তু সাহজিক ক্রিয়া বংশানুক্রমিকভাবে প্রাপ্ত।

(৩) অভ্যস্ত ক্রিয়া ব্যক্তিগত ; ইহা ব্যক্তি-বিশেষের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সহজ প্রবৃত্তি জাতিগত ; ইহা বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর সকল জীবের মধ্যেই বর্তমান।

(৪) অভ্যাস গঠিত হইলে তাহাকে পরিহার করা যাইতে পারে (যদিও অবশ্য তাহা কষ্টসাধ্য) ; কিন্তু সাহজিক প্রবৃত্তি একেবারে পরিহার করা যায় না—চেষ্টা করিয়া উহাকে নিয়ন্ত্রণ করা যাইতে পারে মাত্র।

অভ্যাস ও সহজাতবৃত্তির পারস্পরিক সম্বন্ধের বিষয় জেম্‌স্ ও ম্যাক্‌ডুগালের অভিমত :

অভ্যাস ও সহজাতবৃত্তির পারস্পরিক সম্বন্ধ বিষয়ে জেম্‌স্ (James) এবং ম্যাক্‌ডুগাল্ (McDougall) দুইটি বিভিন্ন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

জেম্‌স্ মনে করেন যে, সহজাত বৃত্তি অভ্যাস দ্বারা প্রভাবিত হইতে পারে। তিনি বলেন যে, অভ্যাস দ্বারা সহজাতবৃত্তির প্রকাশের পথে বাধা (inhibition)-এর সৃষ্টি হইতে পারে এবং সহজাত বৃত্তিগুলি সকল সময়

স্থায়ী বৃত্তি নহে (যেহেতু, কয়েকটি তথাকথিত সহজাত বৃত্তি শৈশবে প্রকাশ পায় না এবং কয়েকটি পরে লুপ্ত হইয়া যায়)।[১৯]

অনেক সময় দেখা যায় যে, একই গাছের উপর একই পাখী কয়েক বৎসর ধরিয়া বাসা বাঁধিতেছে বা একই সঙ্গী লইয়া জীবন যাপন করিতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে বলা যায় যে, অভ্যাসের দ্বারা সহজাতবৃত্তির প্রকাশ সীমিত হইতেছে।

আবার যে সকল সহজাতবৃত্তি ক্ষণস্থায়ী, সেগুলিকে যদি গঠনের বা আত্মপ্রকাশের বিশেষ সুযোগ না দেওয়া হয়, তাহা হইলে সেগুলির প্রকাশ ব্যাহত হইবে; অপর পক্ষে যদি সেগুলিকে সযত্নে বাড়িতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে সেগুলি বহুদিন ধরিয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে শিশুর পক্ষে চুষিবার প্রবৃত্তি (sucking instict)-এর উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ম্যাক্‌ডুগাল্‌ মনে করেন যে, এ বিষয়ে জেম্‌সের মতবাদ পূর্ণভাবে গ্রহণ-যোগ্য নহে। ম্যাক্‌ডুগাল্‌ বলেন যে, যদিও অভ্যাসের ফলে সহজাত প্রবৃত্তি দৃঢ়তর হয়, তাহা হইলেও বিপরীত অভ্যাসের দ্বারা উহাকে প্রতিহত করা যায় না। যেমন, যদি কতকগুলি বন্য হাঁসের ডানা কাটিয়া দেওয়া যায় এবং অনেকদিন ধরিয়া উড়িতে নাও দেওয়া হয়, তাহা হইলেও সুবিধা পাইলেই এবং ডানা গজাইলেই উহারা উড়িয়া যাইবে; অথবা যদি হাঁসের ছানাদের মুরগীর ছানাদের সহিত রাখা যায় এবং বহুদিন জলে নামিতে না দেওয়া হয়, তাহা হইলেও জলের ধারে আসিলে ও বাধা না পাইলে তাহারা জলে ঝাঁপাইয়া পড়িবে।

১৯ জেম্‌স্‌ এক্ষেত্রে দুইটি নীতির উল্লেখ করিয়াছেন: (১) Principle of the inhibition of instincts by habits এবং (২) Principle of the transitoriness of instincts.

প্রথমটির প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন: "A habit, once grafted on an instinctive tendency, restricts the range of the tendency itself, and keeps us from reacting on any but the habitual object", **এবং দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে বলিয়াছেন:** "if during the time of such an instinct's vivacity, objects adequate to arouse it are met with, a habit of acting on them is formed..., but if no such objects are met with, then no habit will be formed..." (*Principles of Psychology*, Vol. II, pp. 394, 395, 398).

তাহা ছাড়া, যদিও তুই একটি সহজপ্রবৃত্তি স্বল্পস্থায়ী, তাহা হইলেও প্রধান প্রধান সহজ প্রবৃত্তিগুলি স্বল্পস্থায়ী নহে—জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত তাহারা কোন না কোন ভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

ম্যাক্‌ডুগালের মতে সহজাত প্রবৃত্তিসমূহই জীবনকে পরিচালিত করে; সুতরাং দেহের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং সকল ক্রিয়া সহজাত প্রবৃত্তিরই অধীন—সহজ প্রবৃত্তি হইল 'প্রভু' এবং অভ্যাস হইল 'দাস'।[২০]

অভ্যাসের শারীরিক ভিত্তি (Physiological basis of habits) :

অভ্যাসের শারীরিক ভিত্তির স্বরূপ লইয়া মতভেদ আছে।

অনুষঙ্গবাদীরা মনে করেন যে, অভ্যাসের ক্ষেত্রে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে স্বল্পবিস্তর স্থায়ী অনুষঙ্গ স্থাপিত হয়; সুতরাং দেহের দিক্ হইতে বলা যায় যে, বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয় ও বিশেষ বিশেষ পেশীর মধ্যেও এক নূতন অনুষঙ্গের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এই কারণে অনেকে মনে করেন যে, অভ্যাস স্থাপনের ফলে প্রধান স্নায়ুতন্ত্রে—বিশেষতঃ গুরুমস্তিষ্কে—কতকগুলি নূতন স্নায়বিক পথ গঠিত হয় এবং প্রান্তসন্নিকর্ষের স্থলে বাধা কমিয়া যায়।

এই মত সকলে গ্রহণ করেন না। ওয়াট্‌সন্ ইত্যাদি মনে করেন যে, অভ্যাসের ফলে কোন নূতন স্নায়বিক পথ গঠিত হয় না। শিশুর জন্মের কিছুদিনের মধ্যেই সকল সম্ভাব্য পথ রচিত হইয়া যায় এবং ইহার পর আর কোন নূতন পথ গঠিত হয় না।[২১]

তাহা ছাড়া, অভ্যাস গঠনের ফলে প্রান্তসন্নিকর্ষীয় প্রতিরোধ কমিয়া যাওয়া বিষয় যে প্রকল্প অনেকে করিয়াছেন, সে সম্বন্ধেও কতকগুলি প্রশ্ন উঠে: অভ্যাসের ফলে প্রান্তসন্নিকর্ষের কেন পরিবর্তন ঘটিবে? যে

২০ ম্যাক্‌ডুগালের ভাষায়: "We have to recognize that the instincts of an animal are, as it were, its very essence and central core, all its bodily organs and functions being merely the servants of the instincts. A species is most completely characterised by its instincts, all its peculiarities of form, color, structure, function, and habit being subservient to and determined by them." (*An Outline of Psychology*, p. 112).

২১ তুলনীয়: "Certainly at birth or shortly thereafter the elements or 'unit acts' out of which every habit is formed can be noted... The conclusion is forced upon us that in habit no *new* elementary movements are needed. There are enough present at birth." (Watson, *Psychology from the standpoint of a Behaviorist*, p. 303).

নিউরোন্ পূর্বে উদ্দীপিত হইত, এখন কেন তাহা উদ্দীপিত হয় না, বা যে নিউরোন্ পূর্বে উদ্দীপিত হইত না, তাহা এখন কেন উদ্দীপিত হয়? বাস্তবিক, প্রান্তসন্নিকর্ষীয় প্রতিরোধ শক্তি কিভাবে পরিবর্তিত হইতে পারে, সে সম্বন্ধে কোন সুপরীক্ষিত মতবাদ গড়িয়া উঠে নাই।[২২]

অভ্যাস সুগঠিত হইলে গুরুমস্তিষ্ক ঠিক কী ভূমিকা অবলম্বন করে, সে সম্বন্ধেও যথেষ্ট মতভেদ আছে। অভ্যাসের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অভ্যাস গঠিত হইবার পর অভ্যস্ত কার্য করিবার কালে ঐ সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন থাকিবার প্রয়োজন নাই। এইজন্য মনোবিদ্‌গণের মধ্যে এই মতবাদ গড়িয়া উঠে যে, অভ্যাস গঠনের কালে যখন ইচ্ছাপূর্বক আবশ্যকীয় কার্য পুনঃপুনঃ করিতে হয়, তখন গুরুমস্তিষ্ক উহাতে বিশেষ অংশ গ্রহণ করে; কিন্তু উহা গঠিত হইবার পর গুরুমস্তিষ্ক উহার পরিচালনভার লঘুমস্তিষ্কের উপর অর্পণ করে। ফ্রান্‌ৎস্ (Franz) এমন কথাও বলিয়াছেন যে, অভ্যাস সুগঠিত হইবার পর গুরুমস্তিষ্কের বহুলাংশ নষ্ট করিয়া দিলেও অভ্যস্ত কার্যসাধনে বিশেষ অসুবিধা হয় না।

কিন্তু আধুনিক পরীক্ষণের ফলে লঘুমস্তিষ্কের কার্যকলাপ সম্বন্ধে মতের যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং উহাকে কোন প্রকার কার্যের 'কেন্দ্র' বলা হয় না (পৃঃ ১৬৬-৬৮ দ্রষ্টব্য)। পরবর্তী কালে ফ্রান্‌ৎস্ নিজেই বিড়ালের উপর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, গুরুমস্তিষ্কের ললাট অঞ্চলের (Frontal lobe) কিয়দংশ অপসারিত হইলে বিড়ালটি আর অভ্যস্ত কার্য করিতে পারিতেছে না।

তবে ল্যাশ্‌লে এক পরীক্ষণের ফলে লক্ষ্য করেন যে, ইঁদুরের গুরুমস্তিষ্কের ⅔ অংশ পর্যন্ত অপসারিত হইলে, ইঁদুরের অভ্যাসের মধ্যে কোন বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না। কিন্তু যেখানে গুরুমস্তিষ্কের ⅓ অংশ রক্ষিত হইল (এবং ল্যাশ্‌লের নিজেরই মত অনুসারে গুরুমস্তিষ্কের এক অংশের ক্ষতি হইলে অপর অংশ উহার কার্যভার গ্রহণ করে), সেখানে সমগ্র গুরুমস্তিষ্ক অভ্যস্ত কার্যের সহিত কিভাবে সংশ্লিষ্ট তাহা বলা কঠিন। সুতরাং এক্ষেত্রেও কোন সুনির্দিষ্ট মত দান করা এখনও পর্যন্ত সম্ভবপর হয় নাই।

২২ Wenger, Jones & Jones-এর ভাষায়: "Actually, there is no accepted theory of how synaptic resistance is altered in learning." (*Physiological Psychology*, p. 311).

পঞ্চদশ অধ্যায়

শিক্ষণ

আমরা দৈনন্দিন জীবনে অভিজ্ঞতার ফলে নানা প্রকার শিক্ষালাভ করিয়া থাকি। কি ভাবে বসিতে হয়, কি ভাবে খাইতে হয়, কি ভাবে জামা-কাপড় পরিতে হয়, কি ভাবে লিখিতে পড়িতে হয়, ইত্যাদি নানা বিষয় আমরা শৈশব হইতে শিখিতে থাকি; এমন কি শিক্ষণ সহজাত বৃত্তিসমূহের উপরও প্রভাব বিস্তার করে (পৃঃ ৩৮১ দ্রষ্টব্য)। শিক্ষণের ফলে আমাদের প্রতিক্রিয়ার পদ্ধতিও নানাভাবে পরিবর্তিত হয় এবং জ্ঞানও বৃদ্ধি পায়।

বর্তমান অধ্যায়ে আমরা শিক্ষণের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

১। **শিক্ষণ কাহাকে বলে?** (What is Learning?)

শিক্ষণের একটি যুক্তিশাস্ত্র-সম্মত সংজ্ঞাদান সম্ভব নহে।[১] তবে ইহার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়া ইহাকে বর্ণনা করিতে পারা যায়:

(ক) বর্তমানের যে কার্যের মধ্যে অতীতের এক বা একাধিক কার্যের প্রভাব প্রকাশ পায়, তাহাকে শিক্ষণ-লব্ধ ক্রিয়া (learned activity) বলা যায়। **শিক্ষণ-লব্ধ কার্যের মধ্যে দেখা যায় যে, অতীত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানর চেষ্টা করা হইয়াছে।**[২] যেমন, একটি শিশু চাবি দ্বারা তালা খুলিতে দেখিল বা নিজেই ক্রমশঃ খুলিল, পরে অনুরূপ ক্ষেত্রে বন্ধ তালা দেখিলে সে উহা খুলিবার জন্য চাবির অনুসন্ধান করিবে।

১ **ব্যাপক অর্থে ধরিলে সকল জ্ঞান, সকল কার্য-কৌশল, সকল অভ্যাস, সকল প্রতিভাস সব কিছুই শিক্ষণের ফল। তুলনীয়:** "All knowledge, however acquired, all skill resulting from motor activity, all habits, all acquaintance with people and things, have been *learned* in the broad sense of the term." (Woodworth, *Psychology*, 12th. Ed., p. 288).

২ **এইজন্য বলা হয়:** (১) "Learning is profiting by past experience." (২) "Learning is a change in performance as a result of practice."

(খ) **শিক্ষণের মূলে আয়াস বা প্রচেষ্টা থাকে।** উদ্দিষ্ট কার্য আয়ত্ত করিবার প্রারম্ভে নানাপ্রকার ভুল হয় এবং ক্রমশঃ ভুলের সংখ্যা কমিয়া যায় এবং শেষ পর্যন্ত বাঞ্ছিত কার্যটি আয়ত্ত হয়। যেমন, হাতের লেখা শিখিতে, অঙ্ক শিখিতে, এমন কি বসিতে, উঠিতে, দাঁড়াইতেও আমাদের প্রত্যেকেরই শৈশবে কত না ভুল হইয়াছিল এবং ধীরে ধীরে সংশোধিত হইয়াছিল।

তবে ইহার এই অর্থ নহে যে, সকল সময়ই সকল কার্য অনেক ভুল-ভ্রান্তির মধ্যমে আয়ত্ত হয়; অনেকে অনেক বিষয় অতি সহজেই শিখিয়া ফেলে। শিক্ষণ দ্রুত হইবে, অথবা ভ্রান্তি পরিহারের মাধ্যমে মন্থর গতিতে হইবে, তাহা ব্যক্তি-বিশেষের পারিপার্শ্বিক ও মানসিক অবস্থার তারতম্যের উপর নির্ভর করে।

(গ) শিক্ষণের ফলে **নূতন অবস্থার সহিত প্রতিযোজনের ক্ষমতা আয়ত্ত হয়, কার্য-সাধনের দ্রুততা বাড়ে, কার্য-কুশলতা উন্নততর হয়।**

(ঘ) শিক্ষণের ফলে **ইন্দ্রিয় ও পেশী বা গ্রাহক ও সাধকের মধ্যে নূতন সম্বন্ধ স্থাপিত হয় অথবা পুরাতন সম্বন্ধ দৃঢ়তর হয়।** আবার বিবিধ স্নায়ু-কোষের গঠনেও (cell structure) পরিবর্তন সাধিত হয় বলিয়া মনে হয়।[৩]

২। শিক্ষণ সম্বন্ধে বিবিধ মতবাদ (Different Theories of Learning):

শিক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা আধুনিক মনোবিদ্যার অন্যতম অবদান। কিন্তু এই বিষয়ে এত বেশী তথ্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে এবং এত অধিক আলোচনা সংঘটিত হইয়াছে যে, কোন একটি সুস্পষ্ট ধারণা করা কঠিন। সকল আলোচনারই সূত্রপাত হইয়াছিল মনুষ্যেতর প্রাণীর অল্পবিস্তর সরল

---

৩ **তুলনীয়:** (১) Just as the inherited equipment of reaction tendencies consists of receptor-effector connections, so the process of learning consists in the strengthening of certain of these connections as contrasted with others, or in the setting up of quite new connections." (Hull).

(২) "Learning is the formation of relatively permanent neural circuits...; such activity is of the nature of change in cell structures..." (Bugelski, *The Psychology of Learning*, p. 120).

ব্যবহার লইয়া এবং শেষ পর্যন্ত প্রতিটিই সকল প্রকার শিক্ষণের সাধারণ মতবাদ হিসাবে পর্যবসিত হয়। অর্থাৎ যাহা বর্ণনামূলক আলোচনা হিসাবে প্রচলিত হইয়াছিল তাহাই ক্রমশঃ সার্বিক ব্যাখ্যায় রূপান্তরিত হইয়া গেল।

যাহা হউক, **শিক্ষণ সম্বন্ধে তিনটি প্রধান মতবাদ** প্রচলিত হয়:

(ক) সংযোগবাদ (connectionism) বা পরীক্ষা ও ভ্রান্তি-সংশোধন-বাদ (Trial and Error Theory);

(খ) সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়াবাদ (Conditioned Reflex Theory);

(গ) গেস্টাল্ট্ মতবাদ (Gestalt Theory)।

আমরা বর্তমান অনুচ্ছেদে এই তিন মতবাদের আলোচনা করিব।

(ক) পরীক্ষা ও ভ্রান্তি-সংশোধন মতবাদ (Trial and Error Theory of Learning):

এই মতবাদের প্রধান প্রবর্তক হইলেন ই, এল্. থর্ণডাইক্ (E. L. Thorndike); এবং সি, এল, হল্ (C. L. Hull) হইলেন তাঁহার অন্যতম সমর্থক।

থর্ণডাইকের পরীক্ষণ-পদ্ধতি :

থর্ণডাইক্ প্রথমে তিন মাস হইতে উনিশ মাস পর্যন্ত বয়সের বারটি বিভিন্ন বিড়াল লইয়া পরীক্ষা করেন। তিনি নানা প্রকারের ধাঁধাঁর বাক্স (puzzle box) বা পিঞ্জর এই বিষয়ে পরীক্ষণের জন্য ব্যবহার করেন। একটি ক্ষুধার্ত বিড়ালকে তিনি পিঞ্জরাবদ্ধ রাখিলেন এবং ব্যবস্থা করিলেন যে, খাঁচার দরজা খুলিতে পারিলেই বিড়ালটি 'পুরস্কৃত' হইবে (যেমন, একটি মাছ পাইবে)। যে সকল পিঞ্জর বা খাঁচার গঠনপ্রণালী অপেক্ষাকৃত সরল, সেগুলিতে এমন ব্যবস্থা থাকিত যে, ভিতর হইতে একটি দড়ি ধরিয়া টানিলেই দরজাটি খুলিয়া যাইবে; আর যেগুলির গঠন জটিল সেগুলির ব্যবস্থা থাকিত যে, বাহিরে আসিবার জন্য ভিতর হইতে দুইটি ছিট্‌কানি খুলিতে হইবে এবং দরজাটিকে লম্বভাবে হেলাইয়া দিতে হইবে—অর্থাৎ তিনটি বিভিন্ন কার্য করিলে তবে দরজাটি খোলা যাইবে।

থর্ণডাইক্ লক্ষ্য করেন যে, প্রতিটি বিড়ালই প্রথমে নানাভাবে খাঁচার গায়ে আঁচড় কামড় দিতে থাকে এবং ইহার ফলে হঠাৎ হয়ত' ছিট্‌কানি খুলিয়া যায়—অর্থাৎ অনেক প্রকার ভুল-ভ্রান্তির মধ্য দিয়া সে হঠাৎ সাফল্য

লাভ করে। আবার ঐ বিড়ালকে পরে ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঐ একই খাঁচায় রাখা হইল; কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিড়ালটি তৎক্ষণাৎ পূর্ব অভিজ্ঞতার ফলে দরজা খুলিতে পারিল না। সে পূর্বের ন্যায় আঁচড়াইতে কামড়াইতে লাগিল এবং হঠাৎ এক সময় দরজা খুলিয়া গেল। কিন্তু বার বার ঐ একই অবস্থার মধ্যে বিড়ালটিকে রাখার ফলে দেখা গেল যে, ভুল অঙ্গ-সঞ্চালন ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে এবং অল্প হইতে অল্পতর সময়ের মধ্যে বিড়ালটি দরজা খুলিয়া ফেলিতে পারিতেছে।[৪]

থর্ণডাইকের মতানুসারে শিক্ষণের স্বরূপ:

এই প্রকার পরীক্ষণ হইতে থর্ণডাইক্ সিদ্ধান্ত করিলেন যে, শিক্ষণের অর্থ সম্পূর্ণ নূতন প্রকারের কোন প্রতিক্রিয়া আয়ত্ত করা নহে—ইহার অর্থ হইল বিশেষ উদ্দীপকের সহিত ঠিক তাহার উপযুক্ত প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধ স্থাপন করা[৫]। শিক্ষণের মধ্যে যুক্তির স্থান নাই। শিক্ষণ সম্পূর্ণ যান্ত্রিক ক্রিয়া—ইহার মাধ্যমে প্রাণি-বিশেষ যাহা শিক্ষালাভ করে, তাহা হইল কতকগুলি দৈহিক ক্রিয়ার পারম্পর্য মাত্র (sequence of physiological movements)।

শিক্ষণ আকস্মিকভাবে লাভ করা যায় না—ইহা ধীরে ধীরে ভ্রান্ত অঙ্গচালনা পরিহার এবং নির্ভুল অঙ্গচালনা আয়ত্তাধীনকরণের মাধ্যমে লাভ করা যায়।

শিক্ষণ কেবলমাত্র অনুকরণ বা কেবলমাত্র পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে লাভ করা যায় না—কার্যের মাধ্যমেই কোন কিছু শিখিতে পারা যায়।

শিক্ষণ সম্বন্ধে থর্ণডাইক্ প্রবর্তিত নীতি (Thorndike's Laws of Learning):

থর্ণডাইক্ তাঁহার পরীক্ষণের ফলগুলি অনুধাবন করিয়া শিক্ষণ সম্বন্ধে

৪ থর্ণডাইক্ যে কেবল বিড়াল লইয়া পরীক্ষা করেন তাহা নহে; তিনি কুকুর ও বানর লইয়াও পরীক্ষণ করেন।

৫ থর্ণডাইক্-এর ভাষায়: "Learning is the establishment of bonds between stimulus and response and it follows a mechanical process of blind trial and error".

তিনটি প্রধান সূত্র প্রবর্তন করেন। পরে তিনি আরও পাঁচটি অপ্রধান সূত্র আবিষ্কার করেন।

থর্ণডাইক্ প্রবর্তিত **তিনটি প্রধান সূত্র** হইল: **কার্যফল সম্বন্ধীয় নীতি** (Law of Effect), **অভ্যাস বা অনুশীলন সম্বন্ধীয় নীতি** (Law of Exercise) এবং **প্রস্তুতি সম্বন্ধীয় নীতি** (Law of Readiness)।

(১) কার্যফল সম্বন্ধীয় নীতি—উপরের উদাহরণে আমরা দেখিলাম যে, ক্ষুধার্ত বিড়াল পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে নানাভাবে বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিতে থাকে এবং সে হঠাৎ সাফল্য লাভ করে—তখন সে বাহিরে আসিয়া তাহার খাবার পাইল। অতএব যে বিশেষ কার্যটি তাহার ফললাভে সাহায্য করিল তাহার সহিত ঐ বিশেষ ফলের সম্বন্ধ স্থাপিত হইল (establishment of a bond between the stimulus and the right response)। অপরপক্ষে, যে সকল ক্রিয়ার দ্বারা কোন সাফল্য অর্জন করা যাইল না, সেইগুলি ক্রমশঃ অপসারিত হইয়া গেল।

যে ক্রিয়া দ্বারা সাফল্য অর্জন করা যায়, তাহা প্রীতিপ্রদ বা তৃপ্তিদায়ক এবং যাহাতে বিফলতা আসে তাহা অপ্রীতিকর। প্রীতিপ্রদ কার্যগুলিই বারে বারে করা হয় এবং অপ্রীতিকর কার্যগুলি পরিহারের চেষ্টা করা হয়; অর্থাৎ প্রীতিপ্রদ কার্যগুলি রেখাপাত করে (বা stamped in হয়) এবং অপ্রীতিকর কার্যগুলির প্রভাব অবলুপ্ত (stamped out) হইয়া যায়।[৬]

৬ Thorndike তাঁহার Law of Effect-কে ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন: "Of several responses made to the same situation, those which are accompanied or closely followed by satisfaction to the animal will, other things being equal, be more firmly connected with the situation, so that, when it recurs, they will be more likely to recur; those which are accompanied or closely followed by discomfort to the animal will, other things being equal, have their connections with that situation weakened, so that, when it recurs, they will be less likely to occur. The greater the satisfaction or discomfort, the greater the strengthening or weakening of the bond".

এই প্রসঙ্গে 'satisfaction' ও 'discomfort' এই দুই পদের ব্যাখ্যা করিয়া Thorndike বলিয়াছেন: "By a satisfying state of affairs is meant one which the animal does nothing to avoid, often doing such things as attain and preserve it. By a discomforting or annoying state of affairs is meant

এখন প্রশ্ন হইল: কোন্ কোন্ প্রতিক্রিয়াকে প্রীতিকর বা অপ্রীতিকর বলা যায়? প্রাণীর পক্ষে কতকগুলি বস্তু স্বভাবতঃই প্রীতিপদ বা তৃপ্তিকর (original satisfiers) এবং কতকগুলি বস্তু স্বভাবতঃই অপ্রীতিকর (original annoyers)। যাহা জৈব প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে সহায়তা করে, তাহা স্বভাবতঃই তৃপ্তিকর (যেমন, উপরের উদাহরণে ক্ষুধার্ত বিড়ালের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য খাদ্যই প্রয়োজন; সুতরাং যে কার্য তাহাকে খাদ্য সংগ্রহে সহায়তা করে, তাহাই প্রীতিপদ), এবং যাহা জৈবপ্রয়োজনের পরিপন্থী তাহাই অপ্রীতিকর (যেমন, ক্ষুধার সময় খাদ্যবিহীন পিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়া থাকা)[৭]।

(২) অনুশীলন সম্বন্ধীয় নীতি—এই নীতি অনুসারে যে কার্য পুনঃ পুনঃ করা যায়, তাহা সহজেই শিখিতে পারা যায় এবং যে কার্যের পুনরাবৃত্তি ঘটে না, সেই কার্য শিক্ষা করা দুরূহ হইয়া পড়ে—ইহা আমরা সাধারণ অভিজ্ঞতায় দেখিতে পাই। থর্ণডাইক্ ইহারই প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছেন যে, কোন অবস্থায় যে প্রতিক্রিয়া যত বেশী বার, যত বেশীক্ষণ এবং যত তীব্রভাবে ঘটে, সেই প্রতিক্রিয়া ঐ অবস্থার সহিত তত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হয়।[৮] যেমন, উপরের উদাহরণে বিড়ালটিকে যদি মাত্র একবার বা দুইবার পিঞ্জরে বদ্ধ রাখা হইত, তাহা হইলে সে দরজা খুলিবার কৌশল আয়ত্ত করিতে পারিত না; কিন্তু যেহেতু বহুবার ধরিয়া ঐ একই প্রক্রিয়ায় দরজা খুলিয়াছে, সেই হেতু সে উহা আয়ত্ত করিল।

অনুশীলন সম্বন্ধীয় নীতির অন্তর্গত কয়েকটি উপনীতি আছে; যেমন,

one which the animal commonly avoids and abandons". (*Animal Intelligence*, pp. 244-45).

Law of Effect-কে C. L. Hull 'Principle of Reinforcement' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

৭ এইজন্য শিশুকে কোন কিছু সহজে শিখাইতে হইলে প্রশংসা, পুরস্কার ইত্যাদির সাহায্য গ্রহণ করা উচিত। তিরস্কার, তাড়না ইত্যাদির সাহায্যে স্থায়ী সুফল পাওয়া যায় না।

৮ থর্ণডাইকের ভাষায়: "Any response to a situation will, other things being equal, be more strongly connected with the situation in proportion to the number of times it has been connected with that situation and to the average vigour and durations of the connections." (*Ibid.*, p. 245).

পৌনঃপুনিকতা সম্বন্ধীয় নীতি (Law of frequency), সাম্প্রতিকতা সম্বন্ধীয় নীতি (Law of recency) এবং তীব্রতা সম্বন্ধীয় নীতি (Law of vividness or intensity)। যাহা সম্প্রতি শেখা হইয়াছে, তাহা সহজেই করা যায়। যাহা বার বার করিয়া শেখা হইয়াছে, তাহাও আয়ত্তাধীন থাকে। যে যে উদ্দীপকের তীব্রতা আছে, তাহারা শিক্ষাকালীন অবস্থায় গভীর রেখাপাত করিয়া থাকে এবং তাহাদের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়।

(৩) **প্রস্তুতি সম্বন্ধীয় নীতি** (Law of Readiness)—

যখন উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সংযোগে কোন কিছু করিবার জন্য প্রাণি-বিশেষ প্রস্তুত থাকে, তখন সেই কার্য করিলে তৃপ্তি আসে এবং না করিলে বিরক্তি আসে; আবার যখন ঐ প্রস্তুতি থাকে না, তখন উহা করিতে হইলে বিরক্তি আসে।[৯] সুতরাং যেখানে প্রতিক্রিয়ার জন্য প্রস্তুতি নাই, সেখানে শিক্ষণ সহজসাধ্য নহে। প্রতিক্রিয়ার জন্য প্রস্তুতি না থাকিলে ঐ কার্য করিলে তৃপ্তি আসে না, বরং বিরক্তি আসে এবং তাহা শিক্ষণের পথে বিঘ্নের সৃষ্টি করে।[১০]

উপরে বর্ণিত এই তিনটি সূত্র ব্যতীত থর্ণডাইক্ আরও পাঁচটি অপ্রধান সূত্রের কথা বলিয়াছেন; যথা—

(ক) একই অবস্থা বা উদ্দীপকের প্রতি বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া ঘটিতে পারে (ইহা হইল Law of multiple response to the same external situation); যেমন, বুদ্ধির বিকাশের সহিত এবং অভিজ্ঞতার ফলে আমরা একই বস্তুকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখি; এবং এইজন্য একই উদ্দীপকের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া ঘটে।

৯ থর্ণডাইকের ভাষায়: "When a bond is ready to act, to act gives satisfaction and not to act gives annoyance; when a bond which is not ready to act, is made to act, annoyance is caused." (*Ibid.*, p 245).

সেইরূপ তাঁহার *Educational Psychology*, Vol. I পৃঃ ১২৭-তে থর্ণডাইক্ বলিয়াছেন: "For a conduction unit ready to conduct to do so is satisfying and not to do so is annoying."

১০ আমরা শিশুদের পড়াইবার সময় এই কথা সকল সময় মনে রাখি না; এইজন্য যখন তাহারা খেলিতে চাহে, দৌড়াদৌড়ি করিতে চাহে, সেই সময় তাহাদের ঘরের মধ্যে রাখিয়া জোর করিয়া পড়াইতে চেষ্টা করি। ইহার ফল যে অনেক সময়ই খারাপ হয়, তাহা বলা বাহুল্য।

(খ) প্রতিন্যাস (attitude), প্রস্তুতি (set) বা মেজাজ (disposition) অনুসারে বিভিন্ন প্রকার প্রতিক্রিয়া ঘটে (ইহা হইল Law of attitude, set or disposition); যেমন ক্ষুধার্ত অবস্থায় পিঞ্জরাবদ্ধ বিড়াল উহার দরজা খুলিবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করিবে, কিন্তু ক্ষুন্নিবৃত্তি ঘটিলে উহা হয়ত' শান্তভাবে ঘুমাইবে।

(গ) শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অংশকে বিচ্ছিন্ন বা অর্থহীনভাবে না দেখিয়া উহাদের সমগ্রের সহিত সম্বন্ধযুক্তভাবে দেখা হয় (ইহা হইল Law of partial activity)।

(ঘ) শিক্ষার ফলে সমজাতীয়দের একই শ্রেণীভুক্ত করা হয় বা তাহাদের পরস্পরের তুলনা করা হয় (ইহা হইল Law of Assimilation)।

(ঙ) একটি ঘটনায় যে প্রতিক্রিয়া জাগে ঐ ঘটনার সহিত যদি আর একটি ঘটনা সংযুক্ত থাকে, তাহা হইলে দ্বিতীয় ঘটনাতেও ঐ একই প্রতিক্রিয়া সংক্রমিত হইতে পারে। (ইহাকে বলে Law of Associative Shifting)। যেমন, একটি বিড়াল যদি একটি পাত্র হইতে দুধ পাইতে অভ্যস্ত হয়, তাহা হইলে পরে পাত্রটি দেখিয়াই বিড়ালটি প্রতিক্রিয়া করিবে।

সমালোচনা ঃ

যদিও থর্ণডাইক্‌-প্রবর্তিত পরীক্ষণ-পদ্ধতি শিক্ষণের ক্ষেত্রে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সূচনা করে, তাহা হইলেও শিক্ষণ-সম্বন্ধে তাঁহার প্রদত্ত ব্যাখ্যার যাথার্থ্য লইয়া মতভেদ আছে।

থর্ণডাইক্‌ শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[১১] তিনি শিক্ষণের বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের জন্য বিবিধ পরীক্ষণ মনুষ্যেতর জীবের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছেন, কারণ তিনি মনে করেন যে, এইরূপ প্রক্রিয়ারই মাধ্যমে শিক্ষণের সরলতম সূত্রগুলি আবিষ্কার করা যাইবে।

থর্ণডাইক্‌ মনে করেন যে, পরীক্ষণাধীন বিড়াল কতকগুলি দৈহিক ভঙ্গিমার পারম্পর্য শিক্ষা করিয়াছে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ঠিক নহে; কারণ দেখা গিয়াছে যে, কোন বিড়াল খাঁচা হইতে বাহিরে আসিবার কৌশল আয়ত্ত করিবার পর যদি খাঁচার দরজা ও ছিটকানি সরাইয়া দেওয়া হয়,

১১ অনেকে মনে করেন যে, থর্ণডাইক্‌ কোন প্রকার যান্ত্রিকতাবাদ ইচ্ছাপূর্বক প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন নাই।

তাহা হইলে বিড়ালটি পূর্বের স্থানেই প্রথম যায় এবং পরে ছিট্‌কানিটি নূতন স্থানে দেখিবার পর আর পূর্বের স্থানে যায় না। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, এ ক্ষেত্রে বিড়ালটি বস্তু-বিশেষ (যথা, দরজা ও ছিট্‌কানি) এবং উহার অবস্থান সম্বন্ধে ধারণা (idea) গঠন করিয়াছে।[১২]

তিনি সাধারণতঃ 'সংযোগ-সূত্র' (bond of connections)-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন; কিন্তু এই সংযোগ-সূত্র বলিতে যদি কেবলমাত্র নিউরোনসমূহের পারস্পরিক সংযোগ বুঝায় তাহা হইলে বিশেষ অর্থ হয় না। প্রস্তুতি-সম্বন্ধীয় নীতি (Law of Readiness)-এর ক্ষেত্রেও কেবলমাত্র নিউরোনের পারস্পরিক সংযোগের কোন অর্থ হয় না; যদি প্রস্তুতির কোন তাৎপর্য থাকে, তাহা হইল কোন কিছু শিখিবার জন্য 'মানসিক' প্রস্তুতি (*mental* readiness)।

শিক্ষণ-সম্বন্ধীয় নীতিত্রয়ের মধ্যে প্রধানতম হইল কার্যফলসম্বন্ধীয় নীতি (Law of Effect)। থর্ণডাইক্ মনে করেন যে, যে কার্যের ফল সুখপ্রদ সেই কার্যই গভীর রেখাপাত করে; সুতরাং তুল্য অবস্থায় ঐ সকল কার্যের পুনরাবৃত্তি ঘটিবে। সার্থক কার্য এবং তাহার সুখপ্রদ ফলের মধ্যে একটি অনুষঙ্গ বা সংযোগ স্থাপিত হয় ও এই কারণে উহার পৌনঃপুনিকতা ঘটে। এখানে প্রশ্ন হইল: সার্থক বা সফলকাম কার্য-সাধনের জন্য যে ক্রিয়াপথ রচিত হয় এবং গভীর রেখাপাত করে, তাহা কি কেবল স্নায়ুযন্ত্রের উপরই রেখাপাত? সংযোগ ও অনুষঙ্গ বলিতে কি এখানে কেবল নিউরোন ও স্নায়ুর সংযোগই বুঝিতে হইবে? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে কি বলিতে হইবে নিউরোন ও স্নায়ুসমূহের 'সুখের ইচ্ছা' আছে? বাস্তবিক, 'মন'-কে বাদ দিয়া কেবল দৈহিক সম্বন্ধের ভিত্তিতে 'তৃপ্তিকর' বা 'প্রীতিপ্রদ' ইত্যাদি পদের বিশেষ অর্থ থাকে না।[১৩]

১২ **এইজন্য উড্‌ওয়ার্থ বলেন:** "If we ask what the cat learns in the puzzle-box, the best answer is that she gets acquainted with the box, the location of the door and other important objects, and the use of these things as means of escape." (*Psychology*, p. 292).

১৩ **তুলনীয়:** "...there is no physiological basis for the neurological hedonism implied by the law." (Chaplin & Krawiec, *Systems & Theories of Psychology*, p. 187).

তাহা ছাড়া, যে কার্য দ্বারা প্রাণি-বিশেষ 'পুরস্কৃত' (rewarded) হয়, তাহাই সে পুনঃপুনঃ করিবার অভ্যাস আয়ত্ত করে, এই মতবাদও সকলে গ্রহণ করেন না। টোল্‌ম্যান্ পরীক্ষণের সাহায্যে দেখিয়াছেন যে, কতকগুলি ইঁদুরকে যদি ধাঁধাঁর বাক্সের মধ্যে রাখিয়া দেওয়া হয় এবং খাবার দ্বারা পুরস্কৃত করিবার কোন চেষ্টা না করা হয়, তাহা হইলেও ঐ ধাঁধাঁর পথ তাহারা শিখিয়া ফেলে; কারণ কিছুদিন পরে খাবার রাখিয়া দিয়া দেখা গিয়াছে যে, অতি সহজেই তাহারা খাদ্যকক্ষের পথ বাহির করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু যে সকল ইঁদুরকে ঐ ভাবে পূর্ব হইতে ধাঁধাঁর বাক্সে রাখা হয় নাই, তাহাদের পথ চিনিয়া লইতে বিলম্ব হইয়াছে। টোল্‌মান্ প্রথম প্রকারের শিক্ষণের নাম দিয়াছেন 'অপ্রকাশিত বা অব্যক্ত শিক্ষণ' (latent learning)। ইহা সম্ভব হইলে থর্ণডাইকের কার্যফলসম্বন্ধীয় নীতি অনেকাংশে দুর্বল হইয়া পড়ে।

(খ) সাপেক্ষপ্রতিবর্ত ক্রিয়াবাদ (Conditioned Reflex Theory):

আমরা একাদশ অধ্যায়ে (পৃ: ৩৫০-৬০) সবিস্তারে সাপেক্ষপ্রতিবর্ত ক্রিয়াবাদ ব্যাখ্যা করিয়াছি; এখানে তাহার পুনরুল্লেখের আর প্রয়োজন নাই।

সাপেক্ষপ্রতিবর্ত ক্রিয়াবাদও থর্ণডাইকের মতবাদের ন্যায় যান্ত্রিকতাবাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে শিক্ষণকে ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। সাপেক্ষপ্রতিবর্ত ক্রিয়ার কার্যকারিতা নির্ভর করে সাপেক্ষ ও নিরপেক্ষ উদ্দীপকের পুনঃপুনঃ যুগপৎ প্রদানের উপর। উহার ফলে প্রাণি-বিশেষের কোন সহজবৃত্তির তৃপ্তি হয় এবং সেইজন্য সাপেক্ষ উদ্দীপক দর্শনে সে প্রতিক্রিয়া করে (আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কার্য করিতে উহাকে নিবৃত্ত করা যায়)। এই অবস্থাদ্বয়ের সহিত যথাক্রমে থর্ণডাইক-প্রবর্তিত Law of Exercise এবং Law of Effect তুলনীয়।

থর্ণডাইকের পদ্ধতির সহিত পাভ্‌লভের পার্থক্য হইল যে, থর্ণডাইক্ প্রাণি-বিশেষের কোন সহজ প্রবৃত্তির তৃপ্তিসাধনের ঐকান্তিক আগ্রহের সুযোগ লইয়া কৃত্রিম অবস্থায় তাহার ব্যবহার ও ব্যবহারের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করেন। ঐ বৃত্তিকে তৃপ্ত করিবার উপযুক্ত উদ্দীপকের সহিত কোন বিকল্প উদ্দীপককে তিনি সংশ্লিষ্ট করেন নাই। পাভ্‌লভ্ কিন্তু নিরপেক্ষ

উদ্দীপকের সহিত সাপেক্ষ উদ্দীপককে সংশ্লিষ্ট করিয়া দেখিতেন যে, প্রাণি-বিশেষ বিকল্প উদ্দীপক প্রত্যক্ষ করিয়া সাপেক্ষ উদ্দীপকের উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া করে কি না। থর্ণডাইকের লক্ষ্য ছিল যে, কোন উদ্দেশ্য সঠিকভাবে সাধন করিবার জন্য যেরূপ দৈহিক কার্যপরম্পরা প্রয়োজন, প্রাণি-বিশেষ তাহা আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে কি না এবং তাহার জন্য ক্রিয়াপরম্পরার সহিত সুখপ্রদ ফলের সংযোগ-সূত্র স্থাপিত হইয়াছে কি না। অপরপক্ষে, পাভ্‌লভের লক্ষ্য ছিল যে, একটি উদ্দীপকের পরিবর্তে অপর উদ্দীপকের প্রতি উহা একই প্রকার প্রতিক্রিয়া করিতেছে কি না।

থর্ণডাইকের মতানুসারে প্রাণি-বিশেষ নানা প্রকার ভুল করিতে করিতে সঠিক প্রক্রিয়াটি আয়ত্ত করে; পাভ্‌লভের পদ্ধতিতে ধীরে ধীরে ভুল পরিহারের মাধ্যমে শিক্ষণের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই।

ওয়াট্‌সনের মতবাদ:

ব্যবহারবাদী ওয়াট্‌সন্ শিক্ষণ সম্বন্ধে কোন পৃথক্ মতবাদ গঠন করেন নাই। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে, তিনি অনুষঙ্গবাদের সমর্থক ছিলেন। তিনি পরবর্তী কালে পাভ্‌লভ্-পরিচালিত সাপেক্ষপ্রতিবর্ত ক্রিয়াবাদ বিশেষভাবে সমর্থন করেন এবং তাঁহার *Psychology from the Standpoint of a Behaviorist*-গ্রন্থে ইহাকে সকল শিক্ষণের মূল বলিয়া গ্রহণ করেন। কিন্তু সাপেক্ষীকরণের ক্ষেত্রে পুনঃ শক্তিশালীকরণ (reinforcement)-এর ঠিক কী অবদান সে সম্বন্ধে ওয়াট্‌সন্ কোন সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দেন নাই।[১৪]

(গ) গেস্টাল্ট্ মতবাদ:

গেস্টাল্ট্ মতবাদের মূলসূত্রগুলি আমরা পূর্বেই (পৃঃ ১০৪-১০৮) আলোচনা করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে, গেস্টাল্ট্‌বাদীদের মতে আমরা কোন বিষয়বস্তুকে সমগ্রভাবে পর্যবেক্ষণ করি এবং কোন বস্তুর আকার (figure)-কে

১৪ তুলনীয়: "...Watson, despite his interest in the objective methods for the study of animal learning, belongs with the Pre-Thorndikian associationists. Consequently, Watson's views on learning failed to evolve into a form acceptable to contemporary behaviorists". (Chaplin & Krawiec, *Systems & Theories of Psychology*, p. 202).

উহার ক্ষেত্র (ground)-এর পরিপ্রেক্ষিতে দেখি। সুতরাং গেস্টাল্ট্বাদের প্রধান অবদান হইল প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে। তবে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে তাঁহাদের যে মতবাদ তাহারই আলোকে গেস্টাল্ট্বাদীরা শিক্ষণ সম্বন্ধেও তাঁহাদের মতবাদ গঠন করিয়াছেন।

শিক্ষণ সম্বন্ধে কোয়েলার্ (Köhler) কয়েকটি মনোজ্ঞ পরীক্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার অনুসন্ধানের একটি প্রধান বিষয় হইল যে, যখন প্রাণি-বিশেষ কোন উদ্দীপক প্রত্যক্ষ করিয়া প্রতিক্রিয়া করে, তখন সে বিশেষ বিশেষ উদ্দীপকে প্রতিক্রিয়া করিতে শেখে, অথবা বাহ্য পরিবেশের কতকগুলি উদ্দীপকের মধ্যে যে সম্বন্ধ (relation) বিদ্যমান তাহাতে প্রতিক্রিয়া করে।

কোয়েলার্ দুইটি মুরগীকে দুইটি কালো রঙের কাগজের মধ্যে যেটি অধিকতর কালো তাহা হইতে খাদ্য (যথা, মটর দানা) বাছিয়া লইতে শিখাইলেন। তিনি মুরগী দুইটিকে একটি জালের খাঁচার মধ্যে রাখিলেন এবং ঠিক খাঁচার বাহিরেই কাগজ দুইটিতে দানা রাখিয়া দিলেন; তাহা ছাড়া, তিনি এমন ব্যবস্থা করিলেন যে, যখন কোন মুরগী ফিকে বা কম কালো রঙের কাগজের উপর হইতে দানা লইতে যাইবে, তখনই তাহাকে ভয় দেখাইয়া বাধা দেওয়া হইবে, আর যখন সে অপেক্ষাকৃত গাঢ় কালো রঙের কাগজ হইতে কোন কিছু লইবে তখন আর বাধা দেওয়া হইবে না। এই অভ্যাসটি ৫০০।৬০০ পরীক্ষণের মাধ্যমে মুরগীদ্বয় আয়ত্ত করিল। (পরীক্ষণ-কালে কাগজ দুইটির অবস্থান কেবলই বদ্লাইয়া দেওয়া হইত)। ইহার পরই হইল অনুসন্ধানের বিষয় লইয়া প্রধান পরীক্ষা। কোয়েলার্ ইহার পর আরও গাঢ় কালো রঙের একটি কাগজ রাখিলেন এবং ফিকা বা হাল্কা রঙের কাগজটি উঠাইয়া লইলেন; কিন্তু এই নূতন অধিকতর গাঢ় রঙের কাগজের উপর দানা রাখিলেন না; তাহা সত্ত্বেও নূতন কাগজের উপরই মুরগীগুলি মটর-দানা খুঁজিতে লাগিল, যেহেতু এই নূতন পরিপ্রেক্ষিতে এই কাগজটিই অধিকতর কালো। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মনুষ্যেতর জীবেরাও পৃথক্ পৃথক্ উদ্দীপকে প্রতিক্রিয়া করে না, বরং **বিবিধ উদ্দীপকের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহাই অবলোকন করিয়া প্রতিক্রিয়া করে এবং ঐ ভাবে নূতন পরিস্থিতি শিক্ষা করে।** বানর এবং মনুষ্য-শিশুর ক্ষেত্রেও এইপ্রকার পরীক্ষা করিয়া কোয়েলার্ একই রূপ ফল পাইয়াছিলেন।

আফ্রিকার উপকূলভাগে টেনেরিফ্ (Tenerife) দ্বীপে তিনি ১৯১৩-১৭ সাল পর্যন্ত বানরের উপর অনেকগুলি পরীক্ষণ করেন। মনোবিদ্যার ইতিহাসে সেইগুলি যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তাঁহার এই পরীক্ষণগুলির বৈশিষ্ট্য হইল যে, তিনি প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে পরীক্ষণগুলি চালাইয়াছিলেন এবং তাহার ফলে প্রাণিগণের স্বাভাবিক বৃত্তির প্রকাশের পরিচয় পাইবার সুবিধা হয়। তাঁহার অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু ছিল পরিবেশস্থ কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়া উহাকে প্রাণি-বিশেষ লক্ষ্যে পৌছিবার 'সহায়ক বস্তু' (implement) হিসাবে ব্যবহার করিতে পারে কি না, অর্থাৎ 'লক্ষ্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত সহায়ক বস্তু' এইরূপ 'সমগ্র পরিস্থিতি' (gestalt) কল্পনা করিতে পারে কি না।

(ক) তিনি একটি ক্ষুধার্ত শিম্পাঞ্জীকে একটি বিরাট্ পিঞ্জরে বন্ধ করিয়া রাখেন। উহার ছাত খুব উঁচু এবং সেইখানে তিনি কলা বাঁধিয়া দেন ও মাটির উপর একটি হাল্কা প্যাকিং বাক্স ফেলিয়া দেন। ঐ বাক্সের উপর দাঁড়াইয়া সে সহজেই লাফাইয়া কলাগুলি ছিঁড়িয়া লইতে পারিত; কিন্তু সে পূর্বে ঐরূপ বাক্সকে 'সহায়ক বস্তু' হিসাবে ব্যবহার করে নাই বলিয়া উহার উপকারিতা সম্বন্ধে তাহার কোন ধারণা ছিল না। পরে পরীক্ষক খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়া বাক্সের উপর দাঁড়াইয়া দেখাইয়া দিলেন কিভাবে ফল পাড়া যায় এবং বাক্সটিকে আবার দূরে সরাইয়া দিলেন। শিম্পাঞ্জীটি ইহা দেখিয়া নিজেই বাক্সটি টানিয়া লইয়া কলাগুলির ঠিক তলায় রাখিয়া উহার উপর হইতে লাফাইয়া ঐগুলি ছিঁড়িয়া লইল। সুতরাং এখানে দেখা গেল যে, শিম্পাঞ্জীটি 'বাক্স, লাফান, কলা' এইগুলিকে সম্বন্ধযুক্ত করিয়া 'একক' ভাবে দেখিতে শিখিল।

(খ) আর একটি শিম্পাঞ্জীকে কোয়েলার নিবু´দ্ধিশালী মনে করিতেন। ঐ শিম্পাঞ্জীটি অপর শিম্পাঞ্জীর ক্ষেত্রে দেখিয়াছে যে, বাক্সকে কিভাবে ফল পাড়িবার উপায়স্বরূপ ব্যবহার করা যায়; অথচ তাহাকে যখন ঐ একই অবস্থার সম্মুখীন করা হইল, তখন সে নিজে ঐ অবস্থার সদ্ব্যবহার করিতে পারিল না। অথচ বাক্সের উপর যে উঠা যায় বা উহা হইতে লাফান যায়, তাহা সে ভাল ভাবেই জানিত—কিন্তু এ ক্ষেত্রে উহাকে কিভাবে উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায়স্বরূপ ব্যবহার করা যায় তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

(গ) কোয়েলারের পরীক্ষাধীন শিম্পাঞ্জীগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ যেটি ছিল তাহার নাম সুল্‌তান। সে একবার একটি চমকপ্রদ কার্য করিতে সক্ষম হয়। তাহাকে এমন একটি খাঁচার মধ্যে রাখা হয় যাহার বাহিরে একটু দূরে কয়েকটি ফল রাখা ছিল। খাঁচার মধ্যে দুইটি ছড়ি ছিল; কিন্তু ফলগুলিকে খাঁচার বাহিরে এইরূপ দূরে রাখা হইয়াছিল যে, কোন একটি ছড়ি দ্বারা সেগুলিকে পাওয়া যাইবে না। সুল্‌তান প্রথমে একটি ছড়ি এবং পরে অপর ছড়িটি দ্বারা ফলগুলি পাইবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইল; তাহার পর একটি ছড়ি দিয়া অপর ছড়িটিকে ঠেলিতে ঠেলিতে ফল অবধি লইয়া গেল, কিন্তু সেইগুলিকে আর খাঁচার দিকে টানিয়া আনিতে পারিল না। ঐ ছড়ি দুইটির একটি ছিল ফাঁপা এবং একটির ভিতর আর একটি ঢুকাইয়া আট্‌কাইয়া দেওয়া যাইত। একবার পরীক্ষক ফাঁপা ছড়ির মধ্যে তাঁহার একটি আঙ্গুল ঢুকাইয়া সম্ভাব্য সমাধান সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিলেন; কিন্তু ইহাতে কোন ফল হইল না। সুল্‌তান কতকটা হতাশ হইয়া খাঁচার ভিতর বসিয়া রহিল এবং অন্যমনস্কভাবে ছড়ি দুইটি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। হঠাৎ সে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল যে, একটি ছড়ির ভিতর আর একটি ঢুকাইয়া দিয়া উহাকে "বড়" করিয়া ফেলা যায়। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া শিম্পাঞ্জীটি সংযুক্ত ছড়ি দুইটির দ্বারা কেবল যে ফলগুলিই টানিয়া আনিল তাহা নহে, আশে পাশে যত নুড়ি, ঢিল ইত্যাদি ছিল সবগুলিই টানিয়া আনিল। পরের দিন আবার অনুরূপ অবস্থায় ছড়ি দুইটি দিতেই দুই একবার চেষ্টা করিয়া সুল্‌তান ছড়ি দুইটি জুড়িয়া দিয়া ফলগুলি টানিয়া আনিল।[১৫]

গেস্টাল্ট্-মতবাদীরা মনে করেন যে, **শিক্ষণ সম্পূর্ণরূপে যান্ত্রিক পদ্ধতি নহে**। শিক্ষণ বলিতে কেবলমাত্র পরীক্ষা ও ভ্রান্তি পরিহার পদ্ধতি (Trial-and-error method) বুঝায় না। শিক্ষণের মধ্যে আছে **পরিজ্ঞান** (insight)। কিন্তু কোন অবস্থায় প্রাণি-বিশেষের পক্ষে পরিজ্ঞান সম্ভব হয় যদি সে সমগ্র পরিস্থিতি এবং উহার অংশগুলির পারস্পরিক সংযোগ বুঝিতে পারে।

কোন সমস্যা বা অবস্থার সম্মুখীন হওয়ামাত্র উহাকে প্রাণি-বিশেষ আয়ত্ত করিতে পারে না বা শিখিতে পারে না, অর্থাৎ প্রথমাবস্থায় অল্পবিস্তর ভুলভ্রান্তি হইবেই। কোয়েলার প্রমুখ গেস্টাল্টবাদীরাও এ কথা স্বীকার

---

১৫ W. Köhler, *The Mentality of Apes*, p. 127 দ্রষ্টব্য।

করেন ; তবে থর্ণডাইক্ ও তাঁহার সমর্থকদের সহিত গেস্টাল্ট্‌বাদীদের পার্থক্য হইল যে, গেস্টাল্ট্‌বাদীরা মনে করেন না যে, ভ্রান্তি-পরিহার ধীরে ধীরে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিষ্পন্ন হয়—**তাঁহাদের মতে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে সমগ্র পরিস্থিতিটির অবধারণ ঘটে এবং সেই কারণ ভ্রান্ত কার্যাবলী হঠাৎ পরিত্যক্ত হয়।**

শিক্ষণের মূলে প্রত্যক্ষজনিত অবধারণের এবং সংগঠনের যথেষ্ট অবদান আছে। যে পরিস্থিতির মধ্যে শিক্ষণ ঘটে, সেই পরিস্থিতিকে সমগ্রভাবে এবং উহার অংশগুলিকে পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্তভাবে প্রত্যক্ষ করার ফলে প্রত্যক্ষ-ক্ষেত্রের যেন নূতন গঠন ও বিন্যাস (reorganisation of the perceptual field) ঘটে। এইজন্য বলা যাইতে পারে যে, শিক্ষণের মূলে আছে প্রত্যক্ষজনিত অবধারণ (perceptual comprehension)। প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যদি বিষয়-বস্তুতে কোন কিছু অসম্পূর্ণতা থাকে তাহা আমরা অগ্রাহ্য করিয়া উহাকে সম্পূর্ণ আকৃতিবিশিষ্ট মনে করি। শিক্ষণের ক্ষেত্রেও ইহাই ঘটে। উপরের উদাহরণে দেখা যায় যে, পিঞ্জরাবদ্ধ স্থলতানের হঠাৎ মনে হইল যে, দুইটি ছড়ি একত্র করিলে খাঁচার বাহিরের ফলগুলি টানিয়া আনা যাইবে। এক্ষেত্রে পিঞ্জরের মধ্যে শিম্পাঞ্জীর অবস্থান এবং পিঞ্জরের বাহিরে ফলের অবস্থান, এই দুই-এর মধ্যে যে ভেদ বা ফাঁক (gap) আছে তাহা যে ছড়ি দুইটি একত্র করিলে অতিক্রম করা যায়, ইহা বুঝিতে পারার ফলেই সমগ্র ক্ষেত্রটির 'পুনর্গঠন' হইল এবং পরিজ্ঞান (insight)-এর উদ্ভব হইল।

প্রাণি-বিশেষ যখন একটি ক্ষেত্রে পরিজ্ঞানের ফলে সাফল্য লাভ করে, তখন অনুরূপ (similar) ক্ষেত্রেও যে সকল সমস্যার উদ্ভব হয়, সেগুলির ক্ষেত্রেও সে উহা প্রয়োগ করিতে পারে।

অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, সকল প্রাণীরই পরিজ্ঞানের ক্ষমতা সমানভাবে থাকে না। উচ্চ পর্যায়ের জীবের ক্ষেত্রেই ইহার সম্ভাবনা অধিক।

টোল্‌মানের মতবাদ—প্রতীক-শিক্ষণ (E. C. Tolman's theory—Sign-Learning) :

টোল্‌মান্[১৬] মনে করেন যে, সকল শিক্ষণই প্রতীক-শিক্ষণ (sign-learning)। প্রতীক-শিক্ষণের ফলে প্রাণি-বিশেষ একটি উদ্দীপককে প্রত্যক্ষ করিয়া উহার পরে কী আসিতেছে (অর্থাৎ উহার অনুবর্তী উদ্দীপক কী হইতে পারে), তাহা পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে আশা করিতে পারে। সুতরাং শিক্ষণের ফলে কতকগুলি দৈহিক ক্রিয়ার পারম্পর্য আয়ত্তাধীন হয় না —**যাহা শিক্ষার মাধ্যমে আয়ত্তাধীন হয়, তাহা হইল কাহার পর কি আসিবে** (what leads to what) **সে সম্বন্ধে জ্ঞান** (cognition), **আশা** (expectation) **বা ভবিষ্যদ্দৃষ্টির ক্ষমতা।**

প্রতীক-শিক্ষণ সম্বন্ধে টোল্‌মান্ তিনপ্রকারের পরীক্ষণ করেন; যথা—(ক) পুরস্কারের আশা (Reward Expectancy)—বানরের ক্ষেত্রে পরীক্ষণ করিয়া টোল্‌মান্ দেখিয়াছেন যে, যদি দুইটি আধার (container)-এর একটি হইতে বানর পূর্বে তাহার খাবার পাইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ বিশেষ আধারটি হইতেই সে ভবিষ্যতে খাবার আশা করিবে; আবার কোন বিশেষ প্রকারের খাবার সম্বন্ধে যদি তাহাকে পূর্ব হইতে আশা দেওয়া যায়,

১৬ এড্‌ওয়ার্ড টোল্‌মান্ (Edward C. Tolman) তাঁহার মনোবিদ্যায় বাহ্য ব্যবহার পর্যবেক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি ওয়াট্‌সন্‌পন্থী ব্যবহারবাদী (Watsonian Behaviorist) নহেন। তিনি প্রাণি-বিশেষের ব্যবহারকে উদ্দেশ্যমূলক (purposive) বলিয়া মনে করেন। ওয়াট্‌সনের ন্যায় তিনি ব্যবহারকে কেবলমাত্র দেহ-যন্ত্রের কার্য বলিয়া বর্ণনা করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন না; বরং তিনি গেস্টাল্টবাদীদের ন্যায় মনে করেন যে, প্রাণি-বিশেষের বাহ্য প্রতিক্রিয়া বা ব্যবহারের মূলে আছে কোন উদ্দীপককে পৃথক্‌ভাবে প্রত্যক্ষ না করিয়া উহাকে সমগ্র ক্ষেত্রের সহিত সংশ্লিষ্টভাবে অবধারণ করা। এইজন্য তাঁহার মতবাদকে বলা হয় *Sign-Gestalt Theory*। তাঁহার প্রধান ও প্রথম পুস্তক হইল *Purposive Behavior in Animals and Man*; তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, গঠনবাদী দৃষ্টিভঙ্গী (*structuralism*) পর্যাপ্ত নহে—মানুষকে বুঝিবার জন্য তাহার ব্যবহার জানা প্রয়োজন এবং এবং এ বিষয় মনুষ্যেতর প্রাণীর ব্যবহার যথেষ্ট আলোকপাত করে। সাদা ইঁদুর লইয়া প্রাণি-মনোবিদ্যার বহু গবেষণা হইয়াছে বলিয়া তিনি তাঁহার পুস্তক সাদা ইঁদুরকে (*mus norvegious albinus*) উৎসর্গ করিয়াছেন!

তাহা হইলে সে ঐ বিশেষ খাবারটিই আশা করিবে এবং অন্য প্রকারের খাবার দেখিলে নাও খাইতে পারে একবার একটি বানরকে কলা দেখাইয়া উহা তাহার আহারের পাত্রে রাখা হইল এবং পাত্রটি ঢাকিয়া দেওয়া হইল; সেই সময় তাহার অলক্ষ্যে কলার বদলে লেটুস্ (lettuce) রাখিয়া দেওয়া হইল। পরে যখন বানরটিকে তাহার খাবার খাইবার জন্য আহ্বান জানান হইল, তখন সে তাহার পাত্র খুলিয়া দেখিল যে, কলার বদলে লেটুস্ আছে। ইহা দেখিয়া সে কিছু না খাইয়া চলিয়া গেল (অথচ, লেটুস্ বানরের পক্ষে প্রিয় দ্রব্য)। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সে বিশেষ খাদ্য আশা করিতে শিখিয়াছিল এবং তাহা না পাইয়া নিরাশ হইয়া গেল।[১৭]

(খ) পরিবেশ শিক্ষণ (Place Learning)—যখন প্রাণি-বিশেষ কোন বিশেষ পরিবেশের মধ্যে ঘুরিতে ফিরিতে শিখে, তখন সে সমগ্র অবস্থানটি (field বা environment) এবং উহার বিবিধ অংশের পারস্পরিক সম্বন্ধ আয়ত্ত করে। এখানে একটি পরীক্ষণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। একটি সাদা ইঁদুরকে একটি পরীক্ষণ বাক্সে তিনটি 'পথ'-এর মিলনস্থলে রাখা হইল; উহার সহিত তিনটি ছোট ছোট টেবিল সংযুক্ত রহিল—তবে টেবিল তিনটিকে পর্দার দ্বারা এমনভাবে ঢাকা দেওয়া হইল যে, একটি টেবিল হইতে অপরটিকে দেখা যায় না। পথগুলি পরিভ্রমণ করার পর একটি টেবিলে তাহাকে খাবার দেওয়া হইত; কয়েকবার একটি বিশেষ টেবিলে খাবার খাইতে তাহাকে অভ্যস্ত করা হইল। পরে যখন সে ঐ টেবিলে আসিল তখন উহাকে হাতে করিয়া ধরিয়া অন্য টেবিলে বসাইয়া দেওয়া হইল; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সে পথ চিনিয়া যে টেবিলে খাবার খাইতে অভ্যস্ত হইয়াছিল, সেই টেবিলে চলিয়া গেল। বিভিন্ন পথ এবং টেবিল তিনটির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ না জানা থাকিলে ইহা সম্ভব হইত না।

(গ) অব্যক্ত বা অপ্রকাশিত শিক্ষণ (Latent Learning)—যে কার্য করিলে প্রাণি-বিশেষ পুরস্কৃত হয় কেবলমাত্র তাহাই পুনঃ পুনঃ করিয়া সে উহা করিতে অভ্যস্ত হয়, থর্ণডাইকের এই মতবাদ টোল্‌মান্ পরিত্যাগ করেন। টোল্‌মান্ মনে করেন যে, যে কার্য করিলে কোন প্রত্যক্ষ পুরস্কার প্রাণি-বিশেষ

১৭ O. L. Tinkelpaugh, An experimental study of representative factors in monkeys, *Journal of Comparative Psychology*, Vol. 8, দ্রষ্টব্য।

পায় না, তাহাও সে শিক্ষা করে (যদিও ঐ শিক্ষার বাহ্য প্রকাশ বিশেষ দেখা যায় না)। (পৃঃ ৪৪৪ দ্রষ্টব্য)। যখন নোদনার তীব্রতা বৃদ্ধি পায় বা প্ররোচক থাকে, তখন হঠাৎ উহার প্রকাশ দেখা দেয়। টোল্‌মান্ কতকগুলি ইঁদুর লইয়া পরীক্ষণ করেন—তাহাদের তিনটি দলে বিভক্ত করেন এবং প্রতি দলকেই ধাঁধাঁ-পথে চলিতে শিক্ষা দেন। প্রথম দলকে কোন খাবার দেওয়া হইল না, দ্বিতীয় দলকে প্রথম হইতেই পুরস্কৃত করা হইল এবং তৃতীয় দলকে ১১ দিন পর্যন্ত খাবার দেওয়া হইল না ও তাহার পর হইতে খাবার দেওয়া হইতে লাগিল। এই তৃতীয় দলের ক্ষেত্রে দেখা যাইল যে, যদিও ইহারা পরে পুরস্কৃত হইল তাহা সত্ত্বেও ইহাদের ভুলের সংখ্যা দ্বিতীয় দলের (অর্থাৎ যাহারা প্রথমাবধি পুরস্কৃত হইত তাহাদের) ভুলের সংখ্যার অনুরূপ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কোন পরিস্থিতি অবধারণ করিয়া প্রাণি-বিশেষের যে জ্ঞান হইয়াছে তাহারই আলোকে উহার শিক্ষণ সম্ভব হইয়াছে।

আমরা এখানে কোয়েলার্ ও টোল্‌মান্ প্রদত্ত যে দুইটি মতবাদের উল্লেখ করিলাম, তাহাদের **ক্ষেত্র-অবধারণ মতবাদ** (Field Theory) বা **সমগ্র-অবধারণ মতবাদ** (Theory of Whole Learning) বলা হয়। অপর পক্ষে, থর্ণডাইক্ ইত্যাদি কর্তৃক প্রদত্ত মতবাদ **যান্ত্রিকতাবাদ** (Mechanical Theory) বা **অনুষঙ্গবাদ** (Associationism বা Connectionism) বা **'উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া'** মতবাদ (S→R Theory) নামে পরিচিত। এই দুই প্রকার মতবাদের বৈশিষ্ট্য এইরূপ :

যান্ত্রিকতাবাদ	ক্ষেত্র-অবধারণবাদ
(ক) শিক্ষণ বলিতে বুঝায় কতকগুলি পেশীজ ক্রিয়ার মধ্যে পারম্পর্যের সম্বন্ধ স্থাপন (sequence of muscular activities)।	(ক) শিক্ষণের মূলে আছে সমগ্র পরিস্থিতির অবধারণ। এ কথা সত্য যে, প্রতিক্রিয়ার জন্য বিভিন্ন পেশী কার্য করে, কিন্তু এই সকল কার্য যান্ত্রিকভাবে সাধিত হয় না। সমগ্র পরিস্থিতিটি অবধারণ করিয়া বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কার্যগুলি সাধিত হয়।

যান্ত্রিকতাবাদ	ক্ষেত্র-অবধারণবাদ
(খ) প্রাণি-বিশেষ এক একটি উদ্দীপক প্রত্যক্ষ করিয়া কি ভাবে এবং কি কি প্রতিক্রিয়া করে তাহাই প্রধান আলোচ্য বিষয়। (এইজন্য যান্ত্রিকতাবাদীদের রচনায় 'reaction'-পদটি বহুল ব্যবহৃত হয়)।	(খ) সমগ্র পরিস্থিতি এবং উহার বিবিধ অংশের পারস্পরিক সম্বন্ধ কতদূর প্রাণি-বিশেষ অবধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহাই আলোচ্য বিষয়। (এইজন্য এই মতের সমর্থকেরা 'cognitive event'-পদটি বহুল ব্যবহার করেন)।
(গ) প্রাণি-বিশেষের জটিল ব্যবহার কতকগুলি পৃথক্ পৃথক্ ব্যবহারের সমষ্টিমাত্র।	(গ) প্রাণি-বিশেষের ব্যবহারের একটি 'সমগ্রত্ব' আছে যাহা উহার পৃথক্ পৃথক্ অংশের ভিতর বোধগম্য হয় না।
(ঘ) শিক্ষণ বলিতে বুঝায় পুরাতন অভ্যাসের ফলে গঠিত প্রতিক্রিয়া ও উদ্দীপকের পারস্পরিক সম্বন্ধের ধীর অথচ নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তন (slow, yet continuous, modifications of S→R relationship)।	(ঘ) শিক্ষণের মূলে আছে পরিজ্ঞান (insight)। ইহার জন্য প্রয়োজন অতীত সম্বন্ধে জ্ঞান (hindsight) এবং ভবিষ্যদ্দৃষ্টি (foresight)। শিক্ষণের ফলে কতকগুলি তথাকথিত যান্ত্রিক ক্রিয়ার ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটে না—বরং ঐ যে পরিবর্তন আসে, তাহা আকস্মিকভাবে সংঘটিত হয়। এইজন্য যে সকল সুসংবদ্ধ কার্যের (organized acts) মাধ্যমে শিক্ষণের ফল প্রকাশিত হয় তাহাদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্নতা দেখা যায় না, কারণ পরিজ্ঞান হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে। এইজন্য এই অভিজ্ঞতাকে "আঃহা অভিজ্ঞতা" (Aha-experience) বলে।

সাধারণ মন্তব্য :

এই দুই প্রকারের মতবাদের কোনটিই শিক্ষণ-এর একটি সর্বজনগ্রাহ্য ও সার্বিক ব্যাখ্যা দান করিতে পারে না। থর্ণডাইক্, পাভ্‌লভ্ ইত্যাদি অভ্যাসলব্ধ গতিভঙ্গিমা (habitual movements)-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। শিক্ষণের ফলে যে কতকগুলি অভ্যাস আয়ত্ত হইতে পারে, এ কথা সত্য। কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত সমগ্র শিক্ষণ-প্রক্রিয়াটি একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়া। শিক্ষণের মাধ্যমে নূতন অবস্থার সহিত প্রতিযোজনের ক্ষমতা আয়ত্ত করা যায়—সুতরাং শিক্ষণ উদ্দেশ্যের সহিত সংস্রবহীন যান্ত্রিক পদ্ধতি হইতে পারে না। তবে আবার সকল জীবেরই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করিবার ক্ষমতা থাকে না। প্রাণিজগতের স্তরভেদ অনুসারে শিক্ষণেরও স্তরভেদ বা প্রকারভেদ ঘটে। নিম্নপর্যায়ের জীবদের শিক্ষণ-প্রক্রিয়া যান্ত্রিক হইবার সম্ভাবনা অধিক ; কিন্তু উচ্চপর্যায়ের জীবদের শিক্ষণের মধ্যে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা, উদ্দেশ্যের সহিত প্রতিযোজনের প্রচেষ্টা এবং পরিজ্ঞান ইত্যাদিরই সমধিক প্রকাশ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে।[১৮]

মানুষের শিক্ষণ-পদ্ধতি (Human Learning) :

মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণীর শিক্ষণপদ্ধতির ভিতর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। মনুষ্যেতর জীবেরা যেমন পরীক্ষা ও ভ্রান্তি পরিহার করিয়া (অর্থাৎ Trial-and-error method দ্বারা) শিক্ষালাভ করে, মানুষও সেইভাবে অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষালাভ করে। আবার মনুষ্যেতর জীবের ক্ষেত্রে যেমন অনেক সময় পরিজ্ঞান হয়, মানুষেরও সেইরূপ সমগ্র পরিস্থিতি অবধারণ করিবার ফলে হঠাৎ পরিজ্ঞানের প্রকাশ হয়।[১৯]

১৮ এইজন্য কেহ কেহ মনে করেন যে, কোন বিশেষ মতবাদ অন্ধভাবে সমর্থন না করিয়া প্রাণিগণ কিভাবে কার্য করে তাহাই লক্ষ্য করা উচিত। (James Deese, *The Psychology of Learning*, pp. 40-41 দ্রষ্টব্য।)

১৯ তুলনীয় : "...man continues to utilise all the animal ways of learning. He often attacks a problem by trial and error, he becomes conditioned, he becomes negatively adapted to unimportant stimuli. If animals learn by observation, still more does man. His more intellectual methods would not be possible unless he had the primitive sort of learning as a foundation on which to build." (Woodworth, *Psychology*, 12th Ed., p. 308).

তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইতর জীব অপেক্ষা মানুষের সমগ্র পরিস্থিতি অবধারণের ক্ষমতা, অতীতের অভিজ্ঞতা বর্তমানে প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা, উদ্দেশ্যকে বুঝিবার এবং তাহার উপযুক্ত উপায় নির্বাচনের ক্ষমতা অনেক বেশী। সুতরাং যেহেতু মানুষ উচ্চপর্যায়ের মনোবিশিষ্ট জীব, সেই হেতু মানুষের ক্ষেত্রে শিক্ষণকে সম্পূর্ণ যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ব্যাখ্যা করা সমীচীন হইবে না।

•

মনুষ্য-শিশু পরীক্ষা ও ভ্রান্তি পরিহার পদ্ধতির দ্বারা কোন কিছু শিক্ষা করিতে বা কোন বিষয়ে কৌশল (যেমন, তালা খোলার কৌশল) আয়ত্ত করিতে পারে; কিন্তু তাহার পরে অনুরূপ অবস্থায় পড়িলে অতি সহজেই (অর্থাৎ বিশেষ ভুল না করিয়াই) সে ঐরূপ কার্য করিতে পারে। মনুষ্যেতর জীবের ক্ষেত্রে যেমন ধীরে ধীরে ভ্রান্ত ব্যবহার কমিতে থাকে, মানুষের ক্ষেত্রে সেইরূপ হইবার সম্ভাবনা কম; কারণ সাধারণতঃ মানুষ অল্প আয়াসেই পূর্ব অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করিতে পারে। সেইরূপ মানুষের ক্ষেত্রে (বিশেষতঃ মনুষ্য-শিশুর ক্ষেত্রে) সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে (যেমন, ক্ষুধার্ত শিশু দুধের বাটি দেখিয়া বা উহার শব্দ শুনিয়া কিছুক্ষণ শান্ত থাকে); কিন্তু ইহাকে সম্পূর্ণ যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ব্যাখ্যা করা সমীচীন হইবে না। কারণ যখন সাপেক্ষ প্রতিবর্ত উদ্দীপক দেখিয়া মানুষ নিরপেক্ষ উদ্দীপকের উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া করে, তখন বলা যায় যে, সে পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে আশা করে কাহার পর কী আসিবে (অর্থাৎ টোল্‌মানের ভাষায় "what-leads-to-what")। আবার পরিজ্ঞান (insight)-এর অনুরূপ জ্ঞানও মানুষের আছে—যে সকল সমস্যায় চিন্তনের প্রাধান্য আছে সেই সকল সমস্যার সমাধান পরিজ্ঞানের ফলে পরিস্ফুট হইয়া পড়ে। যেমন, জ্যামিতিক সমস্যা সমাধান কালে দেখা যায় যে, অনেক চেষ্টা করিয়াও ব্যক্তি-বিশেষ হয়ত' সমস্যার সমাধান করিতে পারিল না, কিন্তু তাহার পর হঠাৎ (যখন হয়ত' সে অন্য কোন কার্যে ব্যাপৃত) ঐ সমস্যাটির সমাধান তাহার নিকট পরিস্ফুট হইয়া গেল। তাহা ছাড়া, মানুষ উদ্দীপকের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া উহা কিসের প্রতীক বা নির্দেশক এবং উহার সহিত সমগ্র পরিবেশের কি সম্বন্ধ তাহা বুঝিবার চেষ্টা করে।

উচ্চতর মনোবিশিষ্ট জীব হওয়ার জন্য শিক্ষণের ক্ষেত্রে ইতর জীব অপেক্ষা মানুষের কতকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে; যথা—

(ক) মানুষের পর্যবেক্ষণশক্তি উচ্চস্তরের ও উহার ক্ষেত্রও ব্যাপকতর। এই কারণ মানুষ পারিপার্শ্বিক অবস্থা, ঘটনা ও অন্যান্য প্রাণীকে নানাভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে পর্যবেক্ষণ করিতে পারে।

(খ) মানুষের স্মৃতির প্রসর অধিকতর ব্যাপক এবং স্মৃতিশক্তিও দীর্ঘস্থায়ী। আবার তাহার কল্পনাশক্তিও অধিকতর প্রবল। এইজন্য মানুষ সহজেই অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্বাচনের চেষ্টা করিতে সক্ষম হয়।

(গ) ভাষা ব্যবহার (বিশেষতঃ সংখ্যা, নামবাচক পদ ইত্যাদি ব্যবহার) করিবার শক্তির ফলে শিক্ষণের সুবিধা হয়।

(ঘ) চিন্তন শক্তি থাকার ফলে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষ বিশেষ বিশেষ পন্থার দোষগুণ বিচার করিয়া উহাদের নির্বাচন করে।

(ঙ) চিন্তন, স্মৃতি ও কল্পনা—এই তিনের সমবায়ের ফলে মানুষ শিক্ষণের বিষয়বস্তু প্রত্যক্ষ না করিয়া উহাদের সম্বন্ধে ভাবিতে পারে এবং উহাদের সংশ্লিষ্ট সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করে।

(চ) মানুষের চিন্তন উচ্চ পর্যায়ের হওযার জন্য মানুষের শিক্ষণের পরিধি সুদূরপ্রসারী এবং সে জটিল বিষয় আয়ত্ত করিলেও করিতে পারে। মানুষ বিভিন্ন প্রকার তত্ত্ববিদ্যা (যথা, দর্শন, সাহিত্য, গণিত ইত্যাদি) এবং প্রয়োগ-বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে। কিন্তু মনুষ্যেতর জীবের ক্ষেত্রে ইহা অসম্ভব।

ষোড়শ অধ্যায়

মনোযোগ

আমরা দৈনন্দিন জীবনে বহুবিধ বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি এবং নানাবিধ বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করি—কিন্তু সকলগুলির উপর সমান ভাবে আমরা মনঃসংযোগ করিতে পারি না; সুতরাং সকলগুলির সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকে না। অবধান বা মনোযোগের তারতম্য অনুসারে কোন বস্তু বা ভাব সম্বন্ধে আমাদের চেতনার তারতম্য ঘটে। কোন বিষয় সুস্পষ্ট জ্ঞানলাভের অন্যতম উপায় হইল মনোযোগ। আমরা বর্তমান অধ্যায়ে মনোযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

১। মনোযোগের স্বরূপ (Nature of Attention) ঃ

মনোযোগ কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তরে মনোবিদ্‌গণ কোন একটি সর্ববাদিসম্মত মত দান করেন নাই। **মনোযোগ একপ্রকার বৌদ্ধিক ক্রিয়া (intellectual activity)—ইহার ফলে যাহা অস্পষ্ট ছিল তাহা স্পষ্ট হয়, যাহা চেতনার প্রান্তদেশে ছিল তাহা কেন্দ্রে চলিয়া আসে।**

মনোবিদ্‌গণের মধ্যে একদল চেতনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহারা মনে করেন যে, যাহার উপর মনোযোগ দেওয়া যায়, তাহার সম্বন্ধেই সর্বাপেক্ষা অধিক চেতনা জন্মে, অর্থাৎ তাহার উপরই চেতনা সর্বাধিক কেন্দ্রীভূত হয়[১]—ইহাই হইল মনোযোগের একমাত্র বৈশিষ্ট্য।

অবয়ববাদী মনোবিদ্‌গণ (structuralists)—যথা, ভুণ্ড্‌ট্‌, টিচেনার ইত্যাদি—এই মতের সমর্থক। টিচেনার বলেন যে, মনোযোগ বলিতে কোন বিশেষ বৃত্তি (faculty), শক্তি (power), অনুভূতি (feeling) বা ইচ্ছা

১ ক্যামেরা (camera)-র উপমা গ্রহণ করিলে বলা যাইতে পারে যে, ঠিকমত 'ফোকাসিং' (focussing) করিয়া যেমন অস্পষ্ট বস্তুকে স্পষ্টতরভাবে দেখা যায়, সেইরূপ মনোযোগের তারতম্য ঘটাইয়া বস্তু-বিশেষের উপর চেতনা কেন্দ্রীভূত (focussed) হয়।

(will) বুঝায় না—মনোযোগ বলিতে বুঝায় সংবেদনের ক্ষেত্রে সুস্পষ্টতা (sensorial clearness)।[২]

অবয়ববাদীদের এই মতবাদ যে কতকাংশে সত্য তাহা অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু ইহার ত্রুটি হইল যে, কিসের প্রেরণায় বা কেন মনোযোগ কোন কিছুর উপর পড়ে তাহা এই মতবাদে স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। মনোযোগ মাত্রই একটি ক্রিয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে—আমরা সচরাচর বলিয়া থাকি 'মনোযোগ দেওয়া'; তাহা ছাড়া, এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে ইচ্ছাপূর্বক বা চেষ্টা করিয়া মনঃসংযোগ করিতে হয়—এই সকল স্থলে মনোযোগ যে একটি ক্রিয়া-বিশেষ তাহা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। কোন কিছু সম্বন্ধে সুস্পষ্ট অবধারণই (clear comprehension) মনোযোগের একমাত্র নির্দেশক নহে; মনোযোগ মাত্রই কতকগুলি অনুভূতি, ইচ্ছা ও প্রেরণার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে।[৩]

এই দুই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয়সাধন বাঞ্ছনীয়। বাস্তবিকপক্ষে, **মনোযোগ একটি ক্রিয়া-বিশেষ** এবং এই ক্রিয়ার উৎসমূলে আছে সহজাতবৃত্তি এবং আবেগ ও অনুভূতি। এই **ক্রিয়ার ফল হইল** যে, **ইহার বিষয়বস্তুর উপর সর্বাধিক পরিমাণ চেতনা আরোপিত হয় এবং সেইজন্য উহার সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্টতর হয়।**

২ টিচেনারের ভাষায়: "...attention is identical with sensorial clearness." (*A Text-book of Psychology*, p. 267). সেইরূপ Shand বলেন: "The clearer awareness of the object which invariably follows from attention to it is not so much the result of attention, as it is attention itself." আবার Messer-এর মতানুসারে: "Attention is a higher grade of consciousness of an object."

৩ তুলনীয়: (১) "Attention is active apprehension." (Dawes Hicks).

(২) "Attention...has invariably an *active* sense, and there is an appropriate verb, *to attend*." (J. Ward, *Psychological Principles*, p. 61).

(৩) "Attention is merely conation or striving considered from the point of view of its effects on cognitive process. The more strongly we strive to achieve better or fuller cognition, the more attentive are we." (McDougall, *Outline of Psychology*, pp. 271, 272).

(৪) "Where does the drive in the attentive process come from? It comes from the supremely important emotional and conative factors which are entirely neglected in the intellective account." (Ross, *Groundwork of Educational Psychology*, p. 170).

২। মনোযোগের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of attention):

মনোযোগের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ:

(১) মনোযোগ একপ্রকার **মানসিক ক্রিয়া**[৪]—এই ক্রিয়ার ফলে কোন কিছুর উপর চেতনা কেন্দ্রীভূত হয় এবং ঐ সম্বন্ধে স্পষ্টতর ধারণা হয়। যে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকে, তাহার উপর মনোনিবেশ করার প্রয়োজন হয় না।[৫]

(২) মনোযোগ প্রত্যক্ষ বা চিন্তনের বিষয়বস্তুগুলির মধ্য হইতে কতকগুলি **নির্বাচন** (select) করিয়া লয়। সুতরাং ইহার দুইটি দিক্ আছে—ইতিবাচক বা সদর্থক (positive) এবং নেতিবাচক বা নঙর্থক (negative)। যখনই আমরা মনোযোগ প্রদান করি, তখনই আমরা কতকগুলি বিষয় হইতে মনকে সরাইয়া লইয়া অপর কতকগুলির উপর যেন উহাকে ন্যস্ত করি। যেমন, একজন ছাত্র পড়িতে পড়িতে গল্পের দিকে মনোযোগ দিল—ইহার অর্থ হইল যে, সে পাঠ্যপুস্তক হইতে মনকে অপসারিত (withdraw) করিয়া গল্পের উপর মনঃসংযোগ করিল।

(৩) মনোযোগ **পরিবর্তনশীল** (changing বা flickering); অনেকক্ষণ ধরিয়া আমরা একই বস্তুর উপর মনকে ন্যস্ত রাখিতে পারি না। এইজন্য মনোযোগের ভিতর যেন একটা 'উঠা-নামা', 'কম-বেশী' বা 'হ্রাস-বৃদ্ধি'-র ভাব থাকে। সম্পূর্ণ নীরবতার মধ্যে যদি একটি চলমান হাতঘড়ি বা পকেটঘড়ি শুনা যায়, তাহা হইলে মনে হয় যেন টিক্‌টিক্ শব্দ একবার বাড়িতেছে, আবার উহা কমিতেছে। ইহার কারণ মনোযোগের পরিমাণ সমভাবে থাকে না।

---

৪ এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, মনোযোগ দেওয়া যেমন একপ্রকার ক্রিয়া, সেইরূপ চিন্তা করা, প্রত্যক্ষ করা ইহারাও মানসিক ক্রিয়া; কিন্তু এই দুই প্রকারের মানসিক ক্রিয়া ঠিক একই পর্যায়ের নহে। কারণ মনঃসংযোগরূপ ক্রিয়ার ফলে স্পষ্টতর প্রত্যক্ষ, চিন্তন ইত্যাদি সম্ভব হয়। সুতরাং মনঃসংযোগকে স্পষ্টতর প্রত্যক্ষ ও চিন্তনের সহায়ক ক্রিয়া বলা যাইতে পারে।

৫ তুলনীয়: "Attention is not so much concerned with what is already clear and distinct as with what is relatively vague and indeterminate. Prominence, clearness and distinctness are, however, ends to which attention is directed." (Stout *A Manual of Psychology*, p. 160).

(৪) আবার মনোযোগ এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে **সংক্রামিত** (transferred) হইতে পারে। অনেকক্ষণ ধরিয়া এক বস্তুতে মনঃসংযোগ করিয়া রাখিলে মনোযোগের তীব্রতা কমিয়া যায় এবং তখন অন্য বস্তুর প্রতি মন ধাবিত হয়। যেমন, যে ছাত্র অনেকক্ষণ ধরিয়া একটি পাঠ্যপুস্তক পড়িতেছে, সে আর যেন মনকে ধরিয়া রাখিতে পারে না এবং অন্য বিষয় আলোচনার জন্য তাহার মন উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে।

৩। মনোযোগের কারণ (Conditions of Attention) :

মনোযোগ কি ভাবে ঘটে? উহার কারণ কি কি?—এই প্রশ্নের উত্তর দানের জন্য আমরা যদি মনোযোগের কারণ বিশ্লেষণ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, মনোযোগের কারণ বিবিধ। কতকগুলি কারণ উদ্দীপক-সংক্রান্ত (relating to stimulus অর্থাৎ objective conditions), কতকগুলি দৈহিক অবস্থা-সংক্রান্ত (relating to physiological conditions), আর বাকী কতকগুলি মানসিক অবস্থা-সংক্রান্ত (relating to mental conditions)।

(ক) উদ্দীপক-সংক্রান্ত কারণ :

উদ্দীপকের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য অনুসারে আমাদের মন উহার প্রতি আকৃষ্ট হয় অথবা উহার প্রতি আমাদের ঔদাসীন্য আসে। উদ্দীপকের যে সকল গুণ বা বৈশিষ্ট্য আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য :

(১) **নূতনত্ব** (novelty)—যে সকল বস্তু নূতন সেগুলি আমাদের মনের উপর রেখাপাত করে। যাহা আমরা প্রত্যহ বা প্রায়ই অবলোকন করি, তাহাতে আমরা অভ্যস্ত থাকি এবং তাহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ আরোপ করি না। যেমন কলেজে যে সকল অধ্যাপক-অধ্যাপিকা পুরাতন হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের ছাত্রছাত্রীরা বেশী লক্ষ্য করে না; কিন্তু যিনি নূতন আসিয়াছেন, তাঁহার চালচলন, কথাবার্তা সব কিছু ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। সেইরূপ নূতন 'ফ্যাশান' বা 'মডেল্'-এর বাড়ী, গাড়ী, রেডিও, পোষাক, অলঙ্কার ইত্যাদির উপর সহজেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে।

(২) **অদ্ভুত আকৃতি** (strangeness)—যাহা অদ্ভুত বা অত্যাশ্চর্য-জনক তাহা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। যেমন, প্রাগৈতিহাসিক যুগের অদ্ভুত আকৃতি-বিশিষ্ট জীবের কঙ্কাল বা ছবি, অথবা অদ্ভুত পোষাক পরিহিত সার্কাসের 'ক্লাউন' এবং তাহাদের অদ্ভুত আচরণ ইত্যাদির প্রতি সহজেই আমরা আকৃষ্ট হই।

(৩) **পৌনঃপুনিকতা** (repetition)—যাহা বার বার আমাদের ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আসে, তাহার প্রতি আমরা বহুক্ষণ উদাসীন থাকিতে পারি না—তাহা শেষ পর্যন্ত আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবে। যেমন, যে বিষয় ক্লাসে অধ্যাপক অনেকবার আলোচনা করিয়াছেন, তাহার প্রতি একবার না একবার ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগ যাইবে আশা করা যায়। সেইরূপ যে বিজ্ঞাপন বহুবার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহা বেশীদিন পাঠক-পাঠিকাদের দৃষ্টি এড়াইতে পারে না।

(৪) **গোপনতা** (secrecy)—যাহা অপ্রকাশিত বা গোপন তাহার প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। যেমন, জন-নেতাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সহিত আমরা অল্পবিস্তর পরিচিত থাকি, কিন্তু তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবন (private life) সম্বন্ধে অনেক সময় বিশেষ কিছু জানি বলিয়া সে বিষয়ে কৌতূহল থাকে এবং হয়ত' সে সম্বন্ধে যে-কোন গুজব প্রচারিত হয় তাহার প্রতিই আমরা মনোযোগ দিই। সেইরূপ "কবে ? কোথায় ? কী ?" এই জাতীয় বিজ্ঞাপন আমাদের কৌতূহল জাগরিত করিয়া মনোযোগ আকর্ষণ করে।

(৫) **আকার** (size)—যাহা ক্ষুদ্র তাহা অনেক সময় আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়, কিন্তু যাহা বৃহৎ তাহা সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেমন একটি পিপীলিকা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিতে পারে, কিন্তু একটি হস্তী নিশ্চয়ই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবে।

(৬) **উজ্জ্বলতা** (brightness)—যাহার ঔজ্জ্বল্য আছে তাহা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কিন্তু যাহা নিষ্প্রভ তাহা আমাদের নজরে না পড়িতেও পারে। এইজন্য রাত্রিকালে যাহা উজ্জ্বল আলোকমালায় সজ্জিত তাহার প্রতি আমাদের মনোযোগ যায়[৬]।

---

৬ বিভিন্ন রঙের মধ্যে হলুদ ও লাল এই দুই রঙ, দিবালোকে বিশেষ উজ্জ্বল প্রতীত হয়,

(৭) **গতিশীলতা** (mobility)—যাহা স্থির, নিশ্চল তাহা অপেক্ষা যাহা চলনশীল বা গতিশীল তাহা আমাদের দৃষ্টি অধিকতর বেশী আকর্ষণ করে।

(খ) দৈহিক অবস্থা-সংক্রান্ত কারণ:

দেহের সাধারণ সুস্থতা মনোযোগের একটি অন্যতম কারণ। দেহ যদি অসুস্থ হয়—যেমন, যদি খুব বেশী জ্বর হয়, মাথার যন্ত্রণা হয় অথবা অন্য কোন প্রকার অস্বস্তি হয়—তাহা হইলে কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিয়া রাখা কঠিন হইয়া পড়ে।

(গ) মানসিক অবস্থা-সংক্রান্ত কারণ:

(১) দেহের সুস্থতা যেমন মনোযোগের সহায়ক, সেইরূপ **মানসিক সুস্থতা** (যথা, আবেগের সুস্থিতি, উত্তেজনার অভাব ইত্যাদি) মনোযোগের সহায়ক। যেমন, যে ব্যক্তি কোন কারণে শোকগ্রস্ত বা বিষাদগ্রস্ত হইয়াছে, তাহার পক্ষে কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করা নিতান্ত অসুবিধাজনক।

সেইরূপ যদি কাহাকেও মনঃসংযোগ কালে নানাভাবে বাধাদান করা হয়, তাহা হইলে তাহার বিরক্তি উৎপাদন হইবে এবং তাহার পক্ষে মনঃসংযোগ করা কষ্টকর হইবে। (পৃঃ ৪৭৪-৭৫)

(১) মনোযোগের মানসিক কারণগুলির অন্যতম হইল **অনুরাগ** বা **ঔৎসুক্য** (interest)। যে বিষয়ে আমাদের ঔৎসুক্য আছে, তাহার প্রতি আমাদের মনোযোগ সহজেই আরোপিত হয়। ঔৎসুক্যকে বর্ণনা করিতে হইলে বলা যায় যে, ইহা ঔদাসীন্যের বিপরীত অবস্থা—ইহার মূলে আছে কতকগুলি আবেগ ও কার্যবৃত্তিকে তৃপ্ত করিবার প্রবৃত্তি এবং ইহা একটি ভাব বা ধারণা (idea)-কে কেন্দ্র করিয়া থাকে[৭]। যাহার প্রতি আমাদের ঔৎসুক্য থাকে তাহা সহজেই আমাদের অন্তরে সাড়া জাগায়। যেমন, যাহার শিকারের প্রতি ঔৎসুক্য আছে, সে বন্য জীবজন্তু সম্বন্ধে যে কোন কাহিনী শুনিলেই উহার প্রতি আগ্রহ দেখায় এবং সেই দিকে তাহার মনোযোগ ধাবিত হয়।

এবং ম্লান আলোকে বা গোধূলির আলোকে সবুজ ও নীল রঙ বিশেষ উজ্জ্বল মনে হয়। পুরকিন্‌য়ী (Purkinjie) এই অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বলিয়া ইহাকে *Purkinjie phenomenon* বলা হয়।

৭ ঔৎসুক্য (interest) অনেক সময়ই কোন-না-কোন সহজবৃত্তি (instinct)-কে জাগরিত করে। ইহার মধ্যে সহজপ্রবৃত্তি ও তৎসংলগ্ন কোন আবেগের প্রাধান্য থাকে বলিয়া

ঔৎসুক্যের তারতম্য অনুসারে মনোযোগের বিষয়বস্তুর কিরূপ পরিবর্তন ঘটে তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় যখন বিভিন্ন ব্যক্তি একই খবরের কাগজের বিভিন্ন অংশে মনোযোগ অর্পণ করে। যে চাকুরী-প্রার্থী সে কর্মখালির বিজ্ঞাপন পাঠে মন দেয়, যে ক্রীড়ামোদী সে খেলাধূলার পাতায় মন দেয়; যে রাজনৈতিক ঘটনা জানিতে ভা॰ াসে, সে ঐ বিষয়ের সংবাদ পাঠে তৎপর হয়।

ঔৎসুক্য দুই প্রকারের হইতে পারে—সাময়িক ও স্থায়ী ইহাদের প্রত্যেকটি আবার ব্যক্তিগত ও জাতিগত এই দুই প্রকারের হইতে পারে।

(ক) ব্যক্তিগত সাময়িক ঔৎসুক্য—ছাত্রছাত্রীরা যখন কোন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে, তখন ঐসব পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্ন সম্বন্ধে তাহাদের মনে ঔৎসুক্য থাকে। এই ঔৎসুক্য বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে (যেমন, যাহারা পরীক্ষা দিতে চাহে তাহাদের মধ্যে এবং কতকাংশে তাহাদের বন্ধুবান্ধব ও শুভার্থীদের মধ্যে) সীমাবদ্ধ থাকে এবং যতদিন পরীক্ষা শেষ না হয় ততদিন পর্যন্ত চলিতে থাকে। ঐ সময় পর্যন্ত ঐ সকল ছাত্রছাত্রী (এবং তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা) প্রশ্ন সম্বন্ধে সকল সংবাদ বা গুজবে সহজেই মনোযোগ দান করে।

সেইরূপ যখন কোন ব্যক্তি কোন একটি বিশেষ জিনিষ (যেমন, বাড়ী, গাড়ী, রেফ্রিজারেটর, রেডিও ইত্যাদি) কিনিতে মনস্থ করে, তখন ঐ বস্তু সম্বন্ধে কোন আলোচনা, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি সহজেই তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করে। ঐ বস্তু কিনিবার পর উহার প্রতি ঠিক ঐ প্রকারের ঔৎসুক্য থাকে না।

(খ) ব্যক্তিগত স্থায়ী ঔৎসুক্য—এক এক ব্যক্তির এক এক বিষয়ে যাবজ্জীবন ঔৎসুক্য থাকে। ইহাকে ব্যক্তিগত স্থায়ী ঔৎসুক্য বলা যাইতে পারে। যেমন, কাহারও শরীরচর্চার প্রতি, কাহারও সঙ্গীতের প্রতি, কাহারও গণিতশাস্ত্রের প্রতি, কাহারও দর্শনশাস্ত্রের প্রতি সমগ্র জীবনই অনুরাগ বা ঔৎসুক্য থাকে এবং তাহারা স্ব স্ব বিষয়ে সহজেই মনোযোগ অর্পণ করে।

অনেকেই ইহাকে emotive-conative attitude বলিয়াই বর্ণনা করেন। যথা: (১) "An interest is a disposition in its dynamic aspect." (Drever, *Intro. to Psy. of Educ.*, p. 126); (২) "Interest is conative rather than cognitive; the emotions must be organized round the idea of the object of interest." (Ross, *Groundwork of Educ. Psy.*, p. 173).

(গ) জাতিগত সাময়িক ঔৎসুক্য—সমগ্র জাতি (nation)-এরই কোন বিষয় সাময়িকভাবে ঔৎসুক্য দেখা দিতে পারে। যেমন, যুদ্ধের সময়, জাতীয় বিপ্লবের সময়, অন্য কোন জাতীয় বিপদ্ বা দুর্বিপাকের সময় (যথা, দুর্ভিক্ষের সময়, বন্যার সময়) ঐ ঐ বিষয় সম্বন্ধে মোটামুটি সমগ্র জাতিই ঔৎসুক্য দেখায় এবং জাতির অন্তর্ভুক্ত প্রায় সকলেই ঐ বিষয় অল্পবিস্তর মনোযোগ অর্পণ করে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের I. N. A.-এর কাহিনী প্রকাশিত হইবার পর সমগ্র ভারতীয় জাতিই ঐ বিষয়ে একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করে এবং ঐ সংক্রান্ত সকল বিষয়েই মনোযোগ দান করিতে থাকে।

(ঘ) জাতিগত স্থায়ী ঔৎসুক্য—এক একটি জাতির এক এক বিষয় স্থায়ী ঔৎসুক্য থাকে; যেমন এক এক জাতির বিশেষ বিশেষ ক্রীড়া, নৃত্যগীত, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদির প্রতি বিশেষ অনুরাগ থাকে। ঐ জাতির অন্তর্ভুক্ত প্রায় সকলেই ঐ সকল বিষয় সম্বন্ধে অল্পবিস্তর মনোযোগী থাকে।[৮]

এই প্রসঙ্গে **ম্যাক্‌ডুগালের মতবাদ**-এর উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি মনে করেন যে, ঔৎসুক্য (interest) এবং মনোযোগ (attention) এই দুইয়ের মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই; কারণ কোন বিষয়ে কাহারও ঔৎসুক্য থাকার অর্থ হইল ঐ বিষয়ে সর্বদা মনোযোগ দানের জন্য তাহার মানসিক প্রস্তুতি। এইজন্য ম্যাক্‌ডুগাল বলেন যে, ঔৎসুক্য হইল সুপ্ত বা অব্যক্ত মনোযোগ, আর মনোযোগ হইল প্রকাশিত বা ব্যক্ত ঔৎসুক্য।[৯] কিন্তু ম্যাক্‌ডুগালের এই মতবাদ অতিশয়োক্তি দোষে দুষ্ট বলিয়া মনে হয়। এ কথা সত্য যে, ঔৎসুক্য মনোযোগ আকর্ষণের একটি প্রধান কারণ; কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, ইহাই একমাত্র কারণ। এইজন্য ঔৎসুক্য ও মনোযোগকে সমার্থক বলিয়া বর্ণনা করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। এমন অনেক বিষয় আছে যাহাতে আমাদের বিশেষ অনুরাগ বা

৮ আমরা উপরে মনোযোগের যে সকল কারণ বর্ণনা করিলাম, শিক্ষাদান কালে শিক্ষকেরা ছাত্রদের এবং বিজ্ঞাপনদাতারা সম্ভাব্য ক্রেতাদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য সেইগুলি ব্যবহার করেন।

৯ McDougall-এর-ভাষায়: "To have an 'interest' in any object is then, to be ready to pay attention to it. 'Interest' is latent attention; and attention is interest in action." (*Outline of Psychology*, p. 277).

ঔৎসুক্য নাই, অথচ তাহা জোর করিয়া মনকে অধিকার করিয়া বসে। যেমন, একজন ছাত্র হয়ত' নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিতেছে। এমন সময় রাস্তায় একটি বিকট শব্দ হওয়ায় ঐ দিকে তাহার মনোযোগ ধাবিত হইল। এক্ষেত্রে বলা যায় যে, ঐরূপ শব্দের প্রতি তাহার চেতনস্তরে কোনই ঔৎসুক্য বা আগ্রহ ছিল না এবং উহা তাহার তদানীন্তন প্রধান ঔৎসুক্য (অর্থাৎ, পুস্তক পাঠ)-এর পরিপন্থী।[১০]

সুতরাং ঔৎসুক্য হইল মনোযোগের অন্যতম কারণ এবং একটি প্রধান কারণ, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহাকে একমাত্র কারণ বলা চলে না।

৪। মনোযোগের প্রকারভেদ (Types of Attention):

বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে মনোযোগের বিভিন্ন শ্রেণীকরণ করা যাইতে পারে।[১১]

(ক) মনোযোগের বিষয়-বস্তুর তারতম্য অনুসারে মনোযোগ **বস্তুবিষয়ক** বা **সংবেদনকেন্দ্রিক** (sensorial) ও **ভাবকেন্দ্রিক** (ideational) হইতে পারে।

যখন আমরা আমাদের সম্মুখস্থ কোন কিছু অবধারণ করি, অর্থাৎ মনোযোগের বিষয়-বস্তু কোন-না-কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করি, তখন আমাদের মনোযোগকে সংবেদনকেন্দ্রিক (sensorial) বলা যায়; অপর পক্ষে, যখন মনোযোগের বিষয়-বস্তু প্রত্যক্ষের বিষয় নহে এবং উহা মানসিক ভাবগত, তখন উহাকে ভাবকেন্দ্রিক বলা যায়। যেমন, আমার সম্মুখে একটি নূতন ধরণের গাড়ী আছে, অথবা একটি বিরাটাকার বা অদ্ভুত প্রাণী আছে এবং আমি উহাকে মনোনিবেশ-সহকারে পর্যবেক্ষণ করিতেছি—

১০ তুলনীয়: "A barrel organ or a German band striking up in the street immediately before an open window will, in general, force its way into the distinct consciousness of the student, however, zealously he may be pursuing his studies. It is not that he is more interested in dwelling on the intrusive noise than on the problems previously occupying his mind." (Srout, *A Manual of Psychology*, pp. 168-69).

১১ কোন কোন লেখক মনে করেন যে, মনোযোগরূপ মানসিক ক্রিয়া বা অবস্থার কোন শ্রেণীকরণ সম্ভব নহে; তবে যে প্রকার মানসিক কার্যের ফলে মনোনিবেশ সম্ভব হয়, তাহার প্রকারভেদ আছে।

এক্ষেত্রে আমার মনোযোগকে সংবেদনকেন্দ্রিক বলা যায়। সেইরূপ যখন আমি মনোযোগ-সহকারে সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছি, অথবা কোন ভোজ্য দ্রব্যের স্বাদ গ্রহণ করিতেছি, তখন আমার মনোযোগকে সংবেদনকেন্দ্রিক বলা যায়। আবার বৈজ্ঞানিক যখন একমনে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণু পর্যবেক্ষণ করেন, অথবা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দূরস্থ গ্রহনক্ষত্রাদির অবস্থান পর্যবেক্ষণ করেন, তখন সেইরূপ মনোযোগকেও সংবেদনকেন্দ্রিক বলা যায়।

অপরপক্ষে, যখন আমরা কোন বিশেষ ধারণা বা ভাব (concept বা idea) লইয়া একাগ্রচিত্তে চিন্তা করি, তখন উহাকে ভাবকেন্দ্রিক বলা যাইতে পারে। যেমন, আমি যখন কোন গল্প বা উপন্যাসে বর্ণিত কোন কাহিনী সম্বন্ধে চিন্তা করি, অথবা অতীত স্মৃতি মন্থন করি, অথবা কোন দার্শনিক প্রত্যয় (philosophical concept)-এর কী অর্থ হইবে তাহা একমনে ভাবিতে থাকি, অথবা ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন থাকি, তখন আমার মনোযোগকে ভাবকেন্দ্রিক আখ্যা দেওয়া যায়।

(খ) মনোযোগের উপর ইচ্ছাশক্তির নিয়ন্ত্রণ থাকা বা না থাকা অনুসারে মনোযোগকে **ঐচ্ছিক বা সচেষ্ট (voluntary), স্বতঃসঞ্জাত বা নিশ্চেষ্ট (spontaneous)** এবং **অনৈচ্ছিক বা ইচ্ছাবিরোধী (involuntary)**, এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

যেখানে কোন বিষয় মনঃসংযোগ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হয়, সেখানে মনোযোগকে ঐচ্ছিক বলা যায়।[১২] যেখানে বিষয়-বস্তু মনের স্বাভাবিক ইচ্ছার অনুকূল, সেখানে ঐ বিষয়ে মনঃসংযোগ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হয় না এবং ঐ প্রকার মনোযোগকে স্বতঃসঞ্জাত বলা যায়।[১৩] যেখানে মনোযোগের বিষয়-বস্তু আকর্ষণীয় ত' নহেই, বরং বিরক্তিকর, কিন্তু

১২ Ross ঐচ্ছিক মনোযোগকে আবার অব্যক্ত (implicit) এবং ব্যক্ত (explicit) এই দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে একবার চেষ্টা করিলেই মনঃসংযোগ হয়, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিয়া মনঃসংযোগ করিতে হয়। (*Groundwork*, p. 175).

১৩ অনেক সময় এইরূপ হয় যে, যে বস্তুর প্রতি একদিন আকর্ষণ ছিল না এবং চেষ্টা করিয়া মনঃসংযোগ করিতে হয়, তাহাও অভ্যাসের ফলে আকর্ষণীয় হইয়া পড়ে (অন্ততঃপক্ষে উহার অনাকর্ষণীয় ভাব কমিয়া যায়) এবং উহার দিকে মনোযোগ দিবার জন্য তখন আর বিশেষ চেষ্টা করিতে হয় না।

জোর করিয়া মনোরাজ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে, সেখানে মনোযোগকে অনৈচ্ছিক বা ইচ্ছাবিরোধী (involuntary) বলা যায়।[১৪]

যেমন, একজন ছাত্রের অঙ্ক কষিতে ভাল লাগে না, অথচ সে পরীক্ষার পূর্বে চেষ্টা-সহকারে অঙ্ক কষিবার চেষ্টা করিতেছে এবং ঐ বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতেছে—এক্ষেত্রে ঐ মনোযোগকে ঐচ্ছিক বা সচেষ্ট বলা যায়। ধরা যাউক্, ঐ ছাত্রটি সঙ্গীতপ্রিয় এবং সে যখন অধ্যয়ন করিতেছে, তখন প্রতিবেশীর গৃহ হইতে স্থললিত সঙ্গীতের স্থর ভাসিয়া আসিতে লাগিল এবং তাহার মন স্বতঃই ঐ দিকে ধাবিত হইল—এক্ষেত্রে সঙ্গীতের প্রতি মনঃসংযোগ করিবার জন্য কোন চেষ্টার প্রয়োজন হইল না; ইহাকে স্বতঃসঞ্জাত বা অনৈচ্ছিক মনোযোগ বলা যায়। আবার কল্পনা করা যাউক্ যে, ছাত্রটি যখন অধ্যয়ন করিবার চেষ্টা করিতেছে, সেই সময় রাস্তায় কয়েকজন পথচারার মধ্যে তুমুল কলহ আরম্ভ হইল, অথবা রাস্তা দিয়া দীর্ঘ শোভাযাত্রা উচ্চৈঃস্বরে নানারূপ ধ্বনি করিতে করিতে যাইতেছে—ছাত্রটির পক্ষে কলহ বা ঐ সব ধ্বনি নিতান্ত বিরক্তিকর, সে উহা শুনিতে চাহে না, তথাপি চীৎকারের তীব্রতার জন্য ঐ দিকে তাহার মন গেল। স্থতরাং এইরূপ মনোযোগকে অনৈচ্ছিক বা ইচ্ছাবিরোধী বলা যায়।

(গ) মনোযোগের বিষয়-বস্তু স্বভাবতঃই আকর্ষণীয় বা অনাকর্ষণীয় হওয়া অনুসারে মনোযোগকে **প্রত্যক্ষ** বা **মুখ্য** (**immediate**) এবং **পরোক্ষ** বা **গৌণ** (**mediate** বা **derived**) এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

যদি মনোযোগের বিষয়-বস্তু নিজেই চিত্তাকর্ষক হয়, তাহা হইলে ঐ কারণেই (অর্থাৎ উহার নিজস্ব আকর্ষণীয়তার জন্য) উহার প্রতি মনোযোগ অর্পিত হয়—এরূপক্ষেত্রে মনোযোগকে প্রত্যক্ষ বা মুখ্য (direct বা immediate) বলা যায়। অপরপক্ষে, বিষয়-বস্তু হয়ত' নিতান্ত সাধারণ

১৪ 'Involuntary attention'-পদটি স্টাউট্ ব্যবহার করেন। তিনি বলেন: "When we attend not merely without an express volition to attend, but *in opposition to* such a volition, attention is in the strictest sense 'involuntary' and not merely non-voluntary." (*A Manual of Psychology*, p. 650).

অথবা অনাকর্ষণীয় ; কিন্তু উহার সহিত এমন এক ব্যক্তি বা বস্তু বা স্থানের বা কালের সংস্রব আছে যাহাতে আমাদের ঔৎসুক্য বা অনুরাগ বা আকর্ষণ আছে ; সুতরাং ঐরূপ সংস্রবের ফলে আপাতদৃষ্টিতে অনাকর্ষণীয় দ্রব্যও আকর্ষণীয় হইয়া পড়ে। যেমন, মধুর সঙ্গীত যখন সঙ্গীত-রসিকের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তখন উহাকে প্রত্যক্ষ বা মুখ্য মনোযোগ বলা যায়। কিন্তু যখন নগণ্য বা সাধারণ বস্তু কোন কিছু বৃহৎ বা মহৎ বা আকর্ষণীয়ের সংস্রবে আকর্ষণীয় হইয়া উঠে, তখন উহার প্রতি মনোযোগকে পরোক্ষ বলা যায় ; যেমন, রৌপ্যমুদ্রা আমরা অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু যখন সম্রাট্ অশোকের যুগের রৌপ্যমুদ্রা দেখি তখন ঐদিকে মনঃসংযোগ করি ; লেখনী বা কলম আমরা অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু যখন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক ব্যবহৃত একটি পুরাতন কলম দেখি, তখন উহার প্রতি মনোনিবেশ করি ; রিষ্ট-ওয়াচ বা হাত ঘড়ি আমরা অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু যখন নেতাজী সুভাষ কর্তৃক ব্যবহৃত হাত-ঘড়ি দেখি, তখন উহা আমরা মনোযোগ-সহকারে নিরীক্ষণ করি।

(ঘ) মনোযোগের বিষয়-বস্তুকে সমগ্রভাবে অবধারণ করা বা না করা অনুসারে মনোযোগকে **সংশ্লেষাত্মক** (**synthetic**) ও **বিশ্লেষাত্মক** (**analytic**) এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

যখন আমরা কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে একটি 'সমগ্র' বা 'একক'ভাবে দেখি, তখন মনোযোগকে সংশ্লেষাত্মক বলা যায় ; অপরপক্ষে, যখন উহাকে বিভিন্ন অংশে বিশ্লেষণ করিয়া ঐ অংশগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পর্যবেক্ষণ করি, তখন ঐ প্রকার মনোযোগকে বিশ্লেষাত্মক বলা যায়। যেমন, একটি সুন্দর নূতন বাড়ী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল—বাহির হইতে বাড়ীটিকে একটি সমগ্র বস্তু (one whole object) ভাবে দেখিলাম ; এক্ষেত্রে মনোযোগকে সংশ্লেষাত্মক বলা যায়। অপরপক্ষে, যদি ঐ গৃহটির বিভিন্ন অংশকে একটির পর একটি পৃথক ভাবে দেখি (অর্থাৎ, উহার সম্মুখভাগ কিরূপ, পশ্চাদ্ভাগ কিরূপ, উহাতে কয়খানি ঘর আছে, উহার নির্মাণকার্যে ব্যবহৃত উপাদানগুলি কিরূপ ইত্যাদি বিষয় মনঃসংযোগ করি), তখন ঐরূপ মনোযোগকে বিশ্লেষাত্মক বলা যায়।

৫। মনোযোগ সম্বন্ধে বিভিন্ন পরীক্ষণ (Some experiments relating to attention) ঃ

(ক) মনোযোগের ক্ষেত্র, ব্যাপকতা বা বিস্তার (Field, Range or Span of Attention) ঃ

আমরা একসঙ্গে একই সময়ে যতগুলি বস্তুর উপর মনঃসংযোগ করিতে পারি, তাহা লইয়া 'মনোযোগের ক্ষেত্র' বা 'বিস্তার' রচিত হয়। সুতরাং এখানে প্রশ্ন হইল ঃ আমরা একসঙ্গে কতগুলি বস্তুর উপর মনোনিবেশ করিতে পারি ? আমরা যখন একাধিক বিষয়ের উপর মনঃসংযোগ করি, তখন ঐ মনঃসংযোগ কি যুগপৎ (simultaneous) অথবা ক্রমিক (successive)? যখন আমরা একই সময় ক, খ, গ তিনটি বস্তু দেখিলাম, তখন কি আমরা তিনটির উপর একই সঙ্গে মনোযোগ দিলাম, অথবা একটির পর একটিতে মনোযোগ দিলাম ?

এই প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর দান করা কঠিন। একদল লেখক বলেন যে, আমরা একই সঙ্গে একাধিক বস্তু অবধান করিতে পারি ; সুতরাং ক, খ, গ তিনটি বস্তুর একই সঙ্গে অবধান ঘটে। অপরপক্ষে, আর একদল লেখক বলেন যে, আমরা একই সঙ্গে একাধিক বস্তুর উপর মনঃসংযোগ করিতে পারি না ; সুতরাং যখন ক, খ, গ তিনটি বস্তু দেখিলাম, তখন একটির পর একটি পর্যায়ক্রমে অবধান করি—তবে ঐ তিনটি মনঃসংযোগ বা অবধানের মধ্যে ব্যবধান এত অল্প যে, উহাদের সমকালীন বা যুগপৎ বলিয়া মনে হয়।

এই বিষয়ে নানারূপ পরীক্ষণ করা হইয়াছে। পরীক্ষণের জন্য বিভিন্ন জ্যামিতিক ক্ষেত্র (geometrical figures), বিন্দু (dots), গাণিতিক সংখ্যা (digits), অক্ষর (letters) ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দেখা গিয়াছে যে, পরীক্ষণ-পাত্র একসঙ্গে ছয় পর্যন্ত বিন্দু বা সংখ্যা বা অপর কোন কিছুর উপর মনঃসংযোগ করিতে পারে। অবশ্য অক্ষর লইয়া যেখানে পরীক্ষা করা হয় সেখানে ঐ অক্ষরগুলি এমনভাবে ব্যবহার করা হয়, যাহাতে ঐগুলি মিলিয়া একটি অর্থহীন (meaningless) শব্দ গঠন করে ; কারণ পরিচিত অর্থপূর্ণ শব্দ যদি ছয়ের অধিক অক্ষর দ্বারাও গঠিত হয়, তাহা হইলে ঐ অক্ষরগুলি মিলিয়া

অথবা অনাকর্ষণীয়; কিন্তু উহার সহিত এমন এক ব্যক্তি বা বস্তু বা স্থানের বা কালের সংস্রব আছে যাহাতে আমাদের ঔৎসুক্য বা অনুরাগ বা আকর্ষণ আছে; সুতরাং ঐরূপ সংস্রবের ফলে আপাতদৃষ্টিতে অনাকর্ষণীয় দ্রব্যও আকর্ষণীয় হইয়া পড়ে। যেমন, মধুর সঙ্গীত যখন সঙ্গীত-রসিকের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তখন উহাকে প্রত্যক্ষ বা মুখ্য মনোযোগ বলা যায়। কিন্তু যখন নগণ্য বা সাধারণ বস্তু কোন কিছু বৃহৎ বা মহৎ বা আকর্ষণীয়ের সংস্রবে আকর্ষণীয় হইয়া উঠে, তখন উহার প্রতি মনোযোগকে পরোক্ষ বলা যায়; যেমন, রৌপ্যমুদ্রা আমরা অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু যখন সম্রাট্ অশোকের যুগের রৌপ্যমুদ্রা দেখি তখন ঐদিকে মনঃসংযোগ করি; লেখনী বা কলম আমরা অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু যখন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক ব্যবহৃত একটি পুরাতন কলম দেখি, তখন উহার প্রতি মনোনিবেশ করি; রিষ্ট-ওয়াচ বা হাত ঘড়ি আমরা অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু যখন নেতাজী সুভাষ কর্তৃক ব্যবহৃত হাত-ঘড়ি দেখি, তখন উহা আমরা মনোযোগ-সহকারে নিরীক্ষণ করি।

(ঘ) মনোযোগের বিষয়-বস্তুকে সমগ্রভাবে অবধারণ করা বা না করা অনুসারে মনোযোগকে **সংশ্লেষাত্মক** (**synthetic**) ও **বিশ্লেষাত্মক** (**analytic**) এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

যখন আমরা কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে একটি 'সমগ্র' বা 'একক'ভাবে দেখি, তখন মনোযোগকে সংশ্লেষাত্মক বলা যায়; অপরপক্ষে, যখন উহাকে বিভিন্ন অংশে বিশ্লেষণ করিয়া ঐ অংশগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পর্যবেক্ষণ করি, তখন ঐ প্রকার মনোযোগকে বিশ্লেষাত্মক বলা যায়। যেমন, একটি সুন্দর নূতন বাড়ী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল—বাহির হইতে বাড়ীটিকে একটি সমগ্র বস্তু (one whole object) ভাবে দেখিলাম; এক্ষেত্রে মনোযোগকে সংশ্লেষাত্মক বলা যায়। অপরপক্ষে, যদি ঐ গৃহটির বিভিন্ন অংশকে একটির পর একটি পৃথক ভাবে দেখি (অর্থাৎ, উহার সম্মুখভাগ কিরূপ, পশ্চাদ্ভাগ কিরূপ, উহাতে কয়খানি ঘর আছে, উহার নির্মাণকার্যে ব্যবহৃত উপাদানগুলি কিরূপ ইত্যাদি বিষয় মনঃসংযোগ করি), তখন ঐরূপ মনোযোগকে বিশ্লেষাত্মক বলা যায়।

৫। মনোযোগ সম্বন্ধে বিভিন্ন পরীক্ষণ (Some experiments relating to attention):

(ক) মনোযোগের ক্ষেত্র, ব্যাপকতা বা বিস্তার (Field, Range or Span of Attention):

আমরা একসঙ্গে একই সময়ে যতগুলি বস্তুর উপর মনঃসংযোগ করিতে পারি, তাহা লইয়া 'মনোযোগের ক্ষেত্র' বা 'বিস্তার' রচিত হয়। সুতরাং এখানে প্রশ্ন হইল: আমরা একসঙ্গে কতগুলি বস্তুর উপর মনোনিবেশ করিতে পারি? আমরা যখন একাধিক বিষয়ের উপর মনঃসংযোগ করি, তখন ঐ মনঃসংযোগ কি যুগপৎ (simultaneous) অথবা ক্রমিক (successive)? যখন আমরা একই সময় ক, খ, গ তিনটি বস্তু দেখিলাম, তখন কি আমরা তিনটির উপর একই সঙ্গে মনোযোগ দিলাম, অথবা একটির পর একটিতে মনোযোগ দিলাম?

এই প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর দান করা কঠিন। একদল লেখক বলেন যে, আমরা একই সঙ্গে একাধিক বস্তু অবধান করিতে পারি; সুতরাং ক, খ, গ তিনটি বস্তুর একই সঙ্গে অবধান ঘটে। অপরপক্ষে, আর একদল লেখক বলেন যে, আমরা একই সঙ্গে একাধিক বস্তুর উপর মনঃসংযোগ করিতে পারি না; সুতরাং যখন ক, খ, গ তিনটি বস্তু দেখিলাম, তখন একটির পর একটি পর্যায়ক্রমে অবধান করি—তবে ঐ তিনটি মনঃসংযোগ বা অবধানের মধ্যে ব্যবধান এত অল্প যে, উহাদের সমকালীন বা যুগপৎ বলিয়া মনে হয়।

এই বিষয়ে নানারূপ পরীক্ষণ করা হইয়াছে। পরীক্ষণের জন্য বিভিন্ন জ্যামিতিক ক্ষেত্র (geometrical figures), বিন্দু (dots), গাণিতিক সংখ্যা (digits), অক্ষর (letters) ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দেখা গিয়াছে যে, পরীক্ষণ-পাত্র একসঙ্গে ছয় পর্যন্ত বিন্দু বা সংখ্যা বা অপর কোন কিছুর উপর মনঃসংযোগ করিতে পারে। অবশ্য অক্ষর লইয়া যেখানে পরীক্ষা করা হয় সেখানে ঐ অক্ষরগুলি এমনভাবে ব্যবহার করা হয়, যাহাতে ঐগুলি মিলিয়া একটি অর্থহীন (meaningless) শব্দ গঠন করে; কারণ পরিচিত অর্থপূর্ণ শব্দ যদি ছয়ের অধিক অক্ষর দ্বারাও গঠিত হয়, তাহা হইলে ঐ অক্ষরগুলি মিলিয়া

একটি অর্থপূর্ণ শব্দ রচনা করে বলিয়া **সমগ্র শব্দটির** উপর (উহা যতগুলি অক্ষর দ্বারাই গঠিত হউক না কেন) মনঃসংযোগ ঘটিবে।
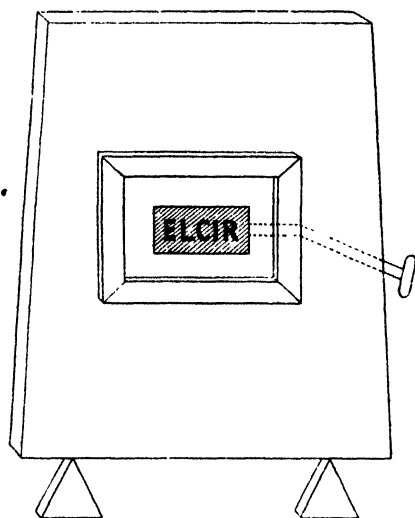
১ নং চিত্র।
ক্ষণদৃক্ যন্ত্র।

এইরূপ পরীক্ষণকালে সাধারণতঃ ক্ষণদৃক্ (tachistoscope) নামক যন্ত্র ব্যবহৃত হয় (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। উহাতে একটি স্বল্পপরিসর অবলোকন-ক্ষেত্র থাকে। উহাতে 'কার্ড' আট্‌কাইবার ব্যবস্থা থাকে; কার্ডের উপর ৯ ১ ৩ ৬ ৭ ৫ ইত্যাদি সংখ্যা অথবা ক ট আ প বি জ ইত্যাদি অক্ষর লিখিয়া অবলোকন-ক্ষেত্রে আট্‌কাইয়া দেওয়া যায়। উহা একটি আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে। আবরণটি ক্ষণকালের জন্য সরাইয়া দিয়াই পুনঃস্থাপন করা হয় এবং পরীক্ষণ-পাত্রকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, সে কয়টি সংখ্যা বা অক্ষর অবলোকন করিল। উপরেই বলা হইয়াছে যে, সাধারণ লোকের ছয়টির অধিক সংখ্যা বা অক্ষরের উপর যুগপৎ মনঃসংযোগ করার ক্ষমতা থাকে না।

কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রেও বলা হয় যে, পরীক্ষণ-পাত্র যখন ছয়টি অক্ষর বা সংখ্যা একসঙ্গে অবধান করে, তখন উহাদের সে আর পৃথক্ পৃথক্ ছয়টি 'বস্তু'-রূপে অবধান করে না—পাঁচটি বা ছয়টি মিলিয়া একটি 'সমগ্র এককে' রূপান্তরিত হয়।

অভ্যাসলব্ধ কার্য সম্বন্ধে বলা হয় যে, আমরা একই সঙ্গে একাধিক কার্যের প্রতি মনোনিবেশ করিতে পারি। যেমন, মোটর-চালক একই সময় গাড়ী চালাইতেছে, ধূমপান করিতেছে, পার্শ্ববর্তীর সহিত গল্প করিতেছে এবং হয়ত' বা রেডিও শুনিতেছে। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে বলা যায় যে, মোটর-চালক সকলগুলির উপর যুগপৎ একই প্রকার মনোযোগ দান করিতে পারে না—কখনও বা রাস্তার প্রতি অধিক মনোযোগ দেয়, কখনও বা কথোপকথনের উপর, কখনও বা অন্য কিছুর উপর। অর্থাৎ সবগুলিই একই সময় সমানুভাবে মনোযোগের ক্ষেত্র অধিকার করে বলিয়া মনে হয় না। তাহা ছাড়া, অভ্যাসজাত কর্মগুলি মনের অবচেতন স্তর দ্বারা অনেকাংশে সাধিত হয় বলিয়া চেতনার ক্ষেত্রে অধিক 'চাপ' (pressure) পড়ে না।

জুলিয়াস সীজার সম্বন্ধে শুনা যায় যে, তিনি একই সঙ্গে তাঁহার সহকর্মীকে চারিটি চিঠির উত্তর বলিয়া যাইতেন এবং নিজে সেই একই সময় অপর একটি চিঠি লিখিতেন। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলেও বলিতে হইবে তাঁহার মন অতি দ্রুত একটি চিঠির বিষয়-বস্তু হইতে অপর চিঠির বিষয়-বস্তুতে যাইত এবং ইহা এত দ্রুত গতিতে সাধিত হইত যে, তিনি যুগপৎ সবগুলির উপর সমভাবে মনোযোগ দিতেন বলিয়া বোধ হইত।

সুতরাং পরিশেষে বক্তব্য হইল যে, মনোযোগের ক্ষেত্র স্বল্প পরিসর—আমরা এককালীন একটি বিষয়ের উপরই পরিপূর্ণ মনোযোগ দান করিতে পারি। তবে অভ্যাস ও শিক্ষণের ফলে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে আমরা দ্রুত গমন করিবার ক্ষমতা আয়ত্ত করিতে পারি[১৫]। যেখানে আমরা একাধিক বস্তুকে একই সময় অবধান করি বলিয়া মনে হয়, সেখানে উহাদের একটি সমগ্র বস্তুরই অংশরূপে দেখি।

(খ) মনোযোগের স্থায়িত্ব (Duration of Attention) :

আমরা অনেকক্ষণ ধরিয়া কোন একটি বিষয় মনঃসংযোগ করিয়া রাখিতে পারি না। অবধান-তরঙ্গের যেন সর্বদাই উত্থান-পতন বা হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। ঘড়ির দোলক যেমন সর্বদাই দুলিতেছে, আমাদের মনও সেইরূপ দোদুল্যমান ;

১৫ তুলনীয় : "We do not really attend to two things at once ; there is more or less rapid alternation of the two at the focus of consciousness." (Ross, *op. cit.*, p. 179).

সেইজন্য একাগ্রচিত্তে অনেকক্ষণ ধরিয়া কোন এক বিষয়ের উপর মনকে ন্যস্ত করিয়া রাখা যায় না। অবশ্য এই বিষয়ে ব্যক্তিগত পার্থক্য আছে এবং অভ্যাসের ফলে অবধান-কালের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।[১৬]

আমরা অনেক সময় বলিয়া থাকি যে, আমরা মনোযোগ সহকারে একই বিষয় একঘণ্টা বা দুই ঘণ্টা ধরিয়া অনুধাবন করিতেছি। কিন্তু ইহার অর্থ নহে যে, সমগ্র সময়টি ব্যাপিয়া আমরা একইভাবে মনোযোগ দিতেছি। চেতনার কেন্দ্রে সর্বক্ষণ যে একই বস্তু থাকে তাহা নহে—**আমাদের অবধান-তরঙ্গ নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে না, উহার মধ্যে মধ্যে ছেদ থাকে।**

এবিষয়ে একটি পরীক্ষণ করা হইয়া থাকে। পরীক্ষণ-পাত্রকে অতি ক্ষীণ একটি চাক্ষুষ বা শ্রৌত্র (visual বা auditory) উদ্দীপক প্রদান করা হয় এবং তাহাকে অনুরোধ করা হয় ঠিক কখন্ তাহার মনোযোগের হ্রাস পায় এবং কখন্ আবার উহা পুনঃপ্রদত্ত বা নিয়োজিত হয় তাহা বলিতে। পরীক্ষণের ফলে দেখা গিয়াছে যে, অধিকাংশ পরীক্ষণ-পাত্রের ক্ষেত্রেই প্রতি ৫ বা ৬ সেকেণ্ড অন্তর মনোযোগ কমিয়া যায় এবং আবার উহা পুনরুত্থিত হয়। অবশ্য এবিষয়ে সকল পরীক্ষক একমত নহেন।[১৭]

(গ) মনোযোগের অভিযোজন (Accommodation of Attention) :

যদি দুইটি উদ্দীপককে একই সময় মনোযোগের জন্য প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে উহাদের দুইটির সম্বন্ধে সুস্পষ্ট মনোযোগ একই সময় ঘটে না। যদি একটি চাক্ষুষ এবং একটি শ্রৌত্র উদ্দীপক যুগপৎ কোন পরীক্ষণ-পাত্রকে প্রদান করা হয়, তাহা হইলে যেটির জন্য তাহার মনে পূর্ব হইতে

১৬ যোগশাস্ত্রে পঞ্চচিত্তভূমির উল্লেখ আছে : যথা, ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। সাধারণ লোকের মন বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে—ইহা সদা পরিবর্তনশীল। কিন্তু যোগাভ্যাসের ফলে ব্যক্তি-বিশেষ একাগ্র ও নিরুদ্ধ চিত্তভূমিতে থাকিতে পারে—এই অবস্থায় মন দীর্ঘ সময় অচঞ্চল অবস্থায় থাকে।

১৭ অধ্যাপক টিচেনার (Titchener) এই মত গ্রহণ করেন না। তিনি বলেন: "We do not know how long attention may continue. It may, undoubtedly, remain constant for two or three minutes. In the writer's judgement it may remain constant for much longer periods." (*A Text-book of Psychology*, p. 291).

অভিযোজন (accommodation) বা প্রস্তুতি (preparation) আছে, সেইটি সম্বন্ধে পরীক্ষণ-পাত্র প্রথমে অভিজ্ঞতা লাভ করে।

এবিষয়ে নিম্নলিখিত পরীক্ষণ করা যাইতে পারে।[১৮] একটি মাত্রা-মাপক ঘণ্টাযন্ত্র (bell metronome)-এ একটি কাঁটা (pointer) ও স্কেল আটকাইয়া দেওয়া হইল; কাঁটাটি ২২°-তে আসিলে ঘণ্টাটি বাজিবে (২নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। পরীক্ষণ-পাত্রকে প্রথমে কাঁটাটির উপর মনোযোগ
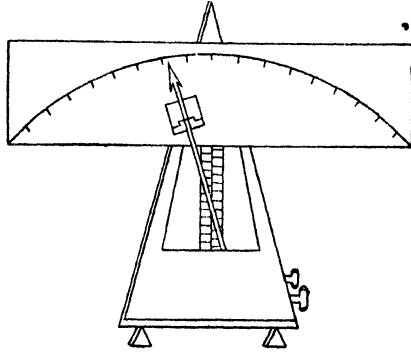
২নং চিত্র।
মাত্রা-মাপক ঘণ্টা যন্ত্র।

দিতে বলা হইল এবং জিজ্ঞাসা করা হইল কাঁটাটি কত ডিগ্রীতে পৌছাইলে ঘণ্টাটি বাজে। দেখা গিয়াছে যে, পরীক্ষণ-পাত্র সাধারণতঃ বলে যে, কাঁটাটি ৩০° বা উহার কাছাকাছি যাইলে ঘণ্টাটি বাজিতেছে। আবার তাহাকে ঘণ্টার শব্দের উপর মনঃসংযোগ করিতে বলা হইল, তখন পরীক্ষণ-পাত্র বলিল যে, ১৫°-তে পৌছাইলে ঘণ্টাটি বাজিতেছে। সুতরাং যখন কাঁটার গতি (অর্থাৎ চাক্ষুষ উদ্দীপকের) উপর মন ন্যস্ত থাকে, তখন মনে হয় যে, কাঁটাটি ৩০°-তে পৌছাইলে শব্দ শুনা যায় এবং যখন ঘণ্টার উপর মন ন্যস্ত থাকে, তখন মনে হয় যে, ১৫°-তে উহা বাজিতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুইটি ক্ষেত্রেই কাঁটাটি ২২°-তে পৌছিলে ঘণ্টা বাজিতেছে।

(ঘ) প্রতীক্ষা-সঞ্জাত মনোযোগ (Expectant Attention):

যেখানে মনোযোগের বিষয়-বস্তুর জন্য পূর্ব হইতে মানসিক প্রস্তুতি থাকে এবং কী উদ্দীপক প্রদত্ত হইবে, তাহা জানা থাকে

১৮ Titchener, *op. cit.*, 297.

বলিয়া তাহার উপস্থিতি সম্বন্ধে বিশেষরূপে প্রতীক্ষা বা প্রত্যাশা করা যায়, সেখানে মনোযোগকে প্রতীক্ষা-সঞ্জাত মনোযোগ (Expectant Attention) বলা যায়।

প্রতীক্ষা-সঞ্জাত মনোযোগের সুবিধা হইল যে, ইহাতে প্রতিক্রিয়া-কালের সময় কমিয়া যায়। দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতাতেও ইহা আমরা দেখিতে পাই। আমরা হয়ত' কাহারও জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছি—কড়া-নাড়া, বা ঘণ্টা-ধ্বনি শুনা বা 'দরজায় মৃদু করাঘাত মাত্র আমরা তৎক্ষণাৎ উহা শুনিতে পাই এবং প্রতিক্রিয়া করিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব হয় না।

এই বিষয় ভুণ্ড্ট্ অনেকগুলি পরীক্ষণ করেন। তিনি পরীক্ষণ-পাত্রকে পূর্ব হইতে সতর্ক করিয়া দেন যে, একটি শব্দ হইলে তাহাতে প্রতিক্রিয়া করিতে হইবে। দেখা গেল যে, পূর্ব হইতে সতর্ক না থাকিলে প্রতিক্রিয়া-কাল হইত গড়ে ০'২৫৩ সেকেণ্ড, কিন্তু সতর্কতার পরে উহা কমিয়া গড়ে হইল ০'০৭৬ সেকেণ্ড।

তবে ইহার অসুবিধা হইল যে, অনেক সময় পূর্ব-প্রতীক্ষার ফলে উদ্দীপকের অবস্থিতি সম্বন্ধে ব্যক্তি-বিশেষের ভ্রান্তি ঘটে। যেমন, উপরের উদাহরণে বলা যায় যে, যখন আমরা কাহারও জন্য একাগ্রভাবে অপেক্ষা করি, তখন সামান্য শব্দ শুনিলেই মনে হয় যে, উহা তাহার 'পদধ্বনি' বা পায়ের শব্দ, অথবা সেই দরজায় করাঘাত করিতেছে! ছাপাখানার প্রুফ-সংশোধকেরও ঐ একই কারণে মধ্যে মধ্যে ভ্রান্তি ঘটে। তিনি যখন প্রুফ-সংশোধন করিতেছেন, তখন মধ্যে মধ্যে অশুদ্ধ বানান তাহার দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। যেমন, যেখানে প্রকৃত শব্দটি হইবে 'অনবধান', কিন্তু 'অনবধন' ছাপা আছে, সেখানে তিনি হয়ত' উহা দেখিলেন না, কারণ এক্ষেত্রে তিনি 'ধ'-এর পর আ-কার হইবে জানেন বলিয়া উহা ঠিকই আছে এইরূপ আশা করেন এবং সেইজন্য তাঁহার ভ্রান্তি হয়।

(ঙ) মনোযোগ ও বিক্ষেপ (Attention and Distraction):

মনোযোগ কালে মানসিক বিক্ষেপের প্রভাব লইয়া কয়েকটি পরীক্ষা করা হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, বিরক্তিকর উদ্দীপক (যথা, ঘণ্টাধ্বনি বা অন্য প্রকার শব্দ) দ্বারা মনোযোগ-কালে বাধা দান করিলে ব্যক্তি-

বিশেষ মনোযোগ ধরিয়া রাখিবার অধিকতর চেষ্টা করে; ফলে মনোযোগ ব্যাহত হয় না। আবার দেখা গিয়াছে যে, অভিভাবন (suggestion)-এর জন্য একই উদ্দীপক একবার বিরক্তিকর মনে হইতে পারে, আর একবার ঐরূপ মনে নাও হইতে পারে। যেমন, পরীক্ষণ-পাত্রকে একটি বিষয় মনঃসংযোগ করিতে বলা হইল এবং সেই সঙ্গে ইহাও বলা হইল যে, 'এইবার সঙ্গীত আরম্ভ হইবে এবং উহা মনোযোগের পক্ষে বিঘ্নকারী'—এ-ক্ষেত্রে পরীক্ষণ-পাত্রের মনোযোগ ব্যাহত হইবে। কিন্তু যদি বলা যায় যে, 'সঙ্গীত মনোযোগের সহায়ক', তাহা হইলে পরীক্ষণ-পাত্রের মনঃসংযোগে সুবিধা হইবে, অর্থাৎ উহাকে বিঘ্নকারী বলিয়া মনে হইবে না।

৬। মনোযোগ ও প্রত্যক্ষ (Attending and Perceiving) :

মনোযোগের ফলে প্রত্যক্ষের বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান স্পষ্টতর হয়। তবে মনোযোগ কেবলই পরিবর্তনশীল; সেইজন্য যদি একই বস্তু প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহা হইলে পর্যায়ক্রমে উহার এক একটি অংশের উপর মনোযোগ ন্যস্ত হইবে। নিম্নলিখিত চিত্রটির (৩নং চিত্র) উপর মনোযোগ দিলে পর্যায়ক্রমে বাতিদান ও দুইটি মানুষের মুখ দেখা যাইবে:
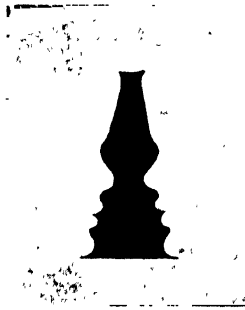
৩নং চিত্র।
বাতিদান না মানুষের মুখ?

আবার পরপৃষ্ঠায় অঙ্কিত চিত্র (৪নং চিত্র) দ্রষ্টব্য। উহা একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি; কিন্তু উহার মধ্যে কয়েকটি মানুষের মুখ লুক্কায়িত আছে। ঐ ছবিটি প্রত্যক্ষ করিলে একবার মুখগুলি দেখা যাইবে, আবার সেগুলি যেন মিলাইয়া যাইবে।

৪নং চিত্র।
মজার ছবি—ইহার মধ্যে কয়টি মানুষের মুখ লুকানো আছে?

সেইরূপ, মনোযোগের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন অনুসারে উহার আকারের পরিবর্তন হয় বলিয়া মনে হয় (৫নং চিত্রটি দ্রষ্টব্য)। এটিকে যদি কেন্দ্রাভিমুখী করিয়া ঘুরান যায় এবং কেন্দ্রের উপর যদি দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে ক্ষেত্রটি যেন বিস্তৃত (expanded) হইতেছে মনে হয়। আবার ঘূর্ণায়মান চক্র প্রত্যক্ষ করিতে করিতে হঠাৎ যদি অপর কোন পরিচিত বস্তু দেখা যায়, তাহা হইলে ঐ বস্তুটি যেন সঙ্কুচিত (contracted) হইতেছে মনে হইবে।

৫ নং চিত্র।
আর্কিমিডিসের চক্র
(Archimedean Spiral)।

৭। চেতনা ও মনোযোগ (Consciousness & Attention):

আমরা প্রথম অনুচ্ছেদে মনোযোগের স্বরূপ আলোচনাকালে লক্ষ্য করিয়াছি যে, মনোযোগের ফলে উহার বিষয়-বস্তুর উপর চেতনা কেন্দ্রীভূত

হয় এবং সেইজন্য ঐ সম্বন্ধে স্পষ্টতর ধারণা হয়। সুতরাং এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠে: **চেতনার সহিত মনোযোগের সম্বন্ধ কী?** ইহার উত্তরে বিভিন্ন মনোবিৎ বিভিন্ন প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন।

(১) অবয়ববাদী মনোবিদ্‌গণ মনে করেন যে, মনোযোগের অর্থ হইল উহার বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান বা চেতনা (পৃঃ ৪৫৭-৫৮)। অতএব, এই মত অনুসারে চেতনা (consciousness) হইল শ্রেণী (genus) এবং মনোযোগ হইল উহার অন্তর্গত জাতি বা উপশ্রেণী (species)।

কিন্তু এই মত পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নহে। আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি যে, মনোযোগ একপ্রকার মানসিক ক্রিয়া যাহার ফলে বস্তু-বিশেষের উপর চেতনা কেন্দ্রীভূত হয়।

(২) যদি মনোযোগকে মানসিক ক্রিয়া বলিয়া বর্ণনা করা যায়, তাহা হইলে মনোযোগের সহিত চেতনার কী সম্বন্ধ হয় দেখা যাউক্।

(ক) একদল লেখক বলেন যে, পূর্বে চেতনা না থাকিলে মনোযোগ সম্ভব হয় না। আমরা যে বস্তুর উপর মনঃসংযোগ করি, পূর্ব হইতে সে সম্বন্ধে ধারণা না থাকিলে কাহার উপর মনঃসংযোগ করিতাম? প্রথমে বস্তু-বিশেষের সম্বন্ধে ধারণা বা চেতনা থাকা চাই—অবশ্য ঐ ধারণা বা চেতনা অস্পষ্ট থাকে, এবং তাহাকে স্পষ্টতর করিবার জন্যই মনোযোগের প্রয়োজন হয়।

এই মত যে অনেকাংশে সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে এই মত ঐচ্ছিক মনোযোগের ক্ষেত্রেই বিশেসভাবে প্রযোজ্য। স্বতঃসঞ্জাত এবং বিশেষতঃ ইচ্ছাবিরোধী মনোযোগের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য নহে, কারণ এরূপ ক্ষেত্রে মনোযোগের বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে পূর্ব হইতে বিন্দুমাত্র চেতনা বা ধারণা না থাকিলেও উহা যেন বলপূর্বক চেতনার ক্ষেত্র অধিকার করিয়া লয়। এই দিক্ হইতে বিচার করিলে উপরের মতবাদটিকে অসম্পূর্ণ বলা যায়।[১৯]

(খ) অপর আর একদল লেখক বলেন যে, পূর্বে মনোযোগ না ঘটিলে চেতনা সম্ভব নহে। অর্থাৎ মনঃসংযোগের ফলেই কোন বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে সুস্পষ্ট চেতনা জন্মে।

১৯ অবশ্য এ কথা স্বীকার্য যে, মনযোগ অথবা যে কোন মানসিক কার্যের জন্ত সাধারণ চেতনার একান্ত প্রয়োজন ; কারণ সংজ্ঞাহীন বা চেতনালুপ্ত ব্যক্তির দ্বারা কোন কার্য সম্ভব নহে।

এই মতও আংশিকভাবে সত্য। মনোযোগ ব্যতীত কোন বিষয় সম্বন্ধে সুস্পষ্ট চেতনা জন্মে না এবং কোন কিছু সম্বন্ধে সুস্পষ্ট চেতনা হয় যখন উহা চেতনার কেন্দ্র (focus of consciousness)-এ অবস্থান করে। এ কথা সত্য যে, কোন কিছুকে চেতনার কেন্দ্রে আনয়নের জন্য ঐ বিষয় পূর্ব হইতে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক, কিন্তু তাহা হইলেও ইহা বলা যায় না যে, চেতনামাত্রেরই—এমন কি প্রান্তঃস্থ চেতনা (marginal consciousness) বা অস্পষ্ট জ্ঞান (vague consciousness)-এর জন্যও মনোযোগ পূর্ব হইতে প্রয়োজন।

সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, **কোন বিষয় মনঃসংযোগের জন্য সাধারণভাবে চেতনার অস্তিত্ব প্রয়োজন, কিন্তু কোন একটি বিশেষ বিষয় মনঃসংযোগের ক্ষেত্রে পূর্ব হইতে ঐ সম্বন্ধে ধারণা বা চেতনা নাও থাকিতে পারে; অপরপক্ষে, কোন বিষয়কে চেতনার কেন্দ্রে আনয়নের জন্য মনোযোগের প্রয়োজন, কিন্তু মনোযোগ ব্যতীতও কোন বিষয় সম্বন্ধে অস্পষ্ট চেতনা থাকিতে পারে।**

৮। মনোযোগ ও দৈহিক পরিবর্তন (Physiological changes & Attention):

মনোযোগের জন্য কতকগুলি দৈহিক পরিবর্তনের প্রয়োজন, এই পরিবর্তনগুলির কয়েকটি হইল পূর্বগামী (antecedent) এবং কয়েকটি হইল সহগামী (concomitant)। মনোযোগের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে প্রয়োজন হয় কোন কিছুর উপর মনকে নিয়োজিত করা এবং অপর কিছু হইতে মনকে অপসারণ করা। এই উভয়বিধ কার্যের জন্য দৈহিক অঙ্গচালনা প্রয়োজন হয়, অর্থাৎ পেশীসমূহকে সক্রিয় হইতে হয়।

(১) সংবেদন-কেন্দ্রিক বা বস্তু-বিষয়ক মনোযোগের ক্ষেত্রে দৈহিক পরিবর্তনগুলি সাধারণতঃ নিম্নলিখিতরূপ :

(ক) ক্রিয়াবাহী স্নায়ুগুলি উদ্দীপিত হয় এবং উহাদের মাধ্যমে যে শক্তি পরিবাহিত হয়, তাহাতেই দেহ বিভিন্ন ভঙ্গিমা গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়।

(খ) **বিশেষ বিশেষ জ্ঞানেন্দ্রিয় উদ্দীপিত হয়** এবং তাহারই ফলে অন্তর্মুখী স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের সংবেদন-কেন্দ্রে উদ্দীপন পরিবাহিত হয়।

(গ) **ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয়-বস্তুর উপর ন্যস্ত রাখিবার জন্য কয়েকটি প্রতিযোজনমূলক প্রতিক্রিয়া** (adaptive adjustments)

করিতে হয়; যেমন, যদি বিষয়-বস্তুকে চক্ষু দ্বারা অবলোকন করিতে হয়, তাহা হইলে চক্ষুর পেশী ও লেন্স (lens) তদনুসারে পরিবর্তন করিতে হইবে। আবার সেই সঙ্গে মনোযোগের বিষয়-বস্তু নহে (অথচ ঐ বিশেষ ক্ষেত্রে উহার বিঘ্নকারী হইতে পারে) এমন বস্তু যাহাতে ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত না করিতে পারে সেজন্য কতকগুলি 'বাধমূলক' (inhibitory) ক্রিয়া করিতে হয়; যেমন, কখনও কখনও কোন কিছু বিশেষভাবে দেখিবার সময় একটি চক্ষু বুজিয়া ফেলিতে হয়, কোন কিছু শুনিবার সময় একটি কানকে খোলা রাখিয়া অপর কানকে চাপিয়া ধরিতে হয়। ইহা ব্যতীত সমগ্র দেহও যেন এক বিশেষ ভঙ্গিমা গ্রহণ করে; যেমন, কখনও আমরা বিষয়-বস্তুর উপর একবারে ঝুঁকিয়া পড়ি, কখনও বা রুদ্ধশ্বাস হইয়া স্থির বা নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া থাকি ইত্যাদি।

(২) ভাবকেন্দ্রিক মনোযোগ—**যেখানে মনোযোগের বিষয়-বস্তু কোন ভাব বা ধারণা, সেখানে দৈহিক পরিবর্তন বিশেষ প্রকাশমান হয় না**। এরূপ ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের সংবেদনকেন্দ্রগুলি উদ্দীপিত হইবার প্রশ্ন উঠে না। তবে এরূপক্ষেত্রে ব্যক্তি-বিশেষ যখন প্রতিরূপের কল্পনা করে, তখন কেহ কেহ বাস্তবক্ষেত্রে কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করিবার জন্য ইন্দ্রিয়-বিশেষকে যেভাবে ব্যবহার করে, তাহার অনুরূপভাবে ইন্দ্রিয়গুলিকে ব্যবহার করে। যেমন, চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষগোচর কোন বস্তুর কল্পনাকালে অনেকে ভ্রূযুগল সঙ্কুচিত করে (আবার কেহ কেহ একেবারে চক্ষু বুজিয়া ফেলে)।

ইহা ছাড়া, উভয় প্রকার মনোযোগের ক্ষেত্রে **এক এক ব্যক্তি এক এক প্রকার বিশেষ আচরণ করিয়া থাকে**। যেমন, কেহ কোন কিছু বিশেষ মনোযোগ-সহকারে প্রত্যক্ষ করিবার সময় অথবা কোন বিশেষ ধারণার উপর মনোনিবেশকালে কপাল কুঞ্চিত করে, অথবা নিজের ঠোঁট চাপিয়া ধরে, অথবা মাথা চুল্‌কাইতে থাকে অথবা পা দুলাইতে থাকে বা অনুরূপ কিছু করে। এইগুলিকে ব্যক্তি-বিশেষের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য (idiosyncrasies) বলা যায়।

৯। অমনোযোগ (Inattention):

মনোযোগের কথা আলোচনা করিলে স্বতঃই অমনোযোগের কথা আসিয়া পড়ে। অমনোযোগ বলিতে বুঝায় মনোযোগের অভাব। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে: সম্পূর্ণ অমনোযোগ সম্ভব কি না? ইহার উত্তরে বলিতে হয় যে, সম্পূর্ণ অমনোযোগের অবস্থা বোধ হয় কোন স্বাভাবিক সচেতন ব্যক্তির ক্ষেত্রে সম্ভব

নহে। সম্পূর্ণরূপে উদ্‌ভ্রান্ত অস্বভাবী ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইহা সম্ভব হইলেও হইতে পারে, কিন্তু স্বভাবী ব্যক্তি (normal person)-এর ক্ষেত্রে ইহা ঘটিতে পারে কি না তাহা বিতর্কমূলক। তবে স্বভাবী-ব্যক্তির ক্ষেত্রে এমন হইতে পারে যে, কোন কারণবশতঃ সে অত্যন্ত অস্থির (listless) হইয়া উঠিয়াছে এবং সেইজন্য কোন কিছুর উপর অধিকক্ষণ মনঃসংযোগ করিয়া রাখিতে পারিতেছে না এবং তাহার মন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে অতি দ্রুত চলিয়া যাইতেছে।[২০]

তবে 'অমনোযোগ' পদটি আপেক্ষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ যখন বলা যায় যে, **ব্যক্তি-বিশেষ কোন কিছুর প্রতি অমনোযোগী, তাহার অর্থ হইল যে, সে অন্য কোন কিছুর প্রতি মনোযোগী।** যেমন, যদি বলা যায় যে, কোন ছাত্র পড়াশুনার ক্ষেত্রে অমনোযোগী, তাহা হইলে উহার অর্থ হয় যে, সে অন্য কোন বিষয় (যথা, খেলাধূলায়, ব্যায়ামচর্চায়, গল্প করায় ইত্যাদিতে) অতিরিক্ত মনোযোগী। অনেক সময়ই দেখা যায় যে, মনোযোগ ও অমনোযোগ এই দুইয়ের মধ্যে আপেক্ষিক হ্রাস-বৃদ্ধির সম্বন্ধ বিদ্যমান—কোন বিষয়ে যদি মনোযোগ হ্রাস পায়, তাহা হইলে অপর কোন বিষয়ে মনোযোগ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বলা যায় যে, কোন বিষয়ে অমনোযোগ দেওয়ার অর্থ হইল অপর কোন বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া।[২১]

---

২০ মনঃসংযোগের ক্ষমতার অভাবকে অনেক সময় **ক্ষীণ-মনোযোগ** (*Aprosexia*) বলে। উনমানস (feebleminded) ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তাহারা কোন কিছুর উপরই বিশেষ মনঃসংযোগ করিতে পারে না—ইহার অর্থ নহে যে, তাহারা এক বিষয়ের পরিবর্তে অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করে; মনোযোগের জন্য বিষয়-নির্বাচন ও অবধানের যে ক্ষমতা তাহাই তাহাদের থাকে না, বা থাকিলেও উহা অত্যন্ত ক্ষীণ বা দুর্বল। চিত্তভ্রংশী ও খেদোন্মত্ত বাতুলদের এই অবস্থা আরও প্রকট হয়।

ইহার বিপরীত অবস্থাকে **অতি-মনোযোগ** (*Hyperprosexia*) বলে। এ ক্ষেত্রে একবিষয়ে অত্যন্ত মনঃসংযোগ করার জন্য অন্য বিষয় সম্বন্ধে ব্যক্তি-বিশেষ একেবারে অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে। আর্কিমিডিস্ সম্বন্ধে শুনা যায় যে, তিনি এক গাণিতিক সমস্যার সমাধানে এমনই বিভোর হইয়াছিলেন যে তাঁহার দেশ শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, এমনকি শত্রুপক্ষীয় সৈন্যেরা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত, তাহা তিনি জানিতেন না।

সেইরূপ তুচ্ছ বিষয়ে অতিরিক্ত মনঃসংযোগ করাকে **অপ-মনোযোগ** (*Paraprosexia*) বলে।

২১ এই দিক্ হইতে বিচার করিলে বলিতে হয় যে, 'অমনোযোগ'-পদটি 'মনোযোগ'-পদের বিপরীতার্থক শব্দ (antonym) নহে; কারণ মনোযোগ ও অমনোযোগের পার্থক্য হইল পরিমাণের বা স্তরভেদের। এইজন্য Ward বলেন: "Between attentive consiousness and inattentive consciousness there is only a difference of degree." (*Principles of Psychology*, p. 65).

সপ্তদশ অধ্যায়

অনুভূতি ও আবেগ

মানুষ নিজেকে চিন্তাশীল প্রাণী মনে করিয়া গর্ব অনুভব করে। প্রাচীন কাল হইতেই মানুষকে বুদ্ধিশীল জীব বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইতেছে। কিন্তু যে-কোন ব্যক্তির প্রাত্যহিক জীবনের কয়েকটি ঘটনা অনুধাবন করিলেই দেখা যায় যে, তাহার জীবন সর্বদাই বিশুদ্ধ যুক্তিদ্বারা পরিচালিত নহে—সহজাত সংস্কার, অনুভূতি ও আবেগ তাহার জীবনের অনেকাংশ অধিকার করিয়া আছে। তাহার জীবন সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, উত্তেজনা-অবসাদ, অনুরাগ-বিরাগ, ভয়-ক্রোধ, ঘৃণা-ভালবাসা ইত্যাদিতে পূর্ণ; তাহা ছাড়া, তাহার আছে সূক্ষ্ম অনুভূতির ক্ষমতা—রসানুভূতি ও রসসৃষ্টির প্রচেষ্টা। এইগুলি না থাকিলে মানুষের জীবন কঠোর, রুক্ষ ও বৈচিত্র্যবিহীন হইয়া উঠিত। এইজন্য মানুষের মন আলোচনা-কালে মনোবিদ্‌গণ এই সকল অনুভূতি ও আবেগ (বা প্রক্ষোভ)-এর উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা ইহা লইয়া বিশদ আলোচনা করিব।

১। অনুভূতির স্বরূপ (Nature of Feeling):

যদিও আমরা প্রত্যেকেই দৈনন্দিন জীবনে নানারূপ অনুভূতির ঘাত-প্রতিঘাত অনুভব করি, তাহা হইলেও অনুভূতির কোন সুষ্ঠু সংজ্ঞাদান করিতে পারি না—এমন কি যথাযথভাবে উহার স্বরূপ বর্ণনা করিতেও পারি না। তবে আমরা সাধারণভাবে উহার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিতে পারি:

(১) অনুভূতি হইল **ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ব্যাপার (subjective experience)।**

প্রত্যেক ব্যক্তির অনুভূতি হইল একান্তভাবে তাহার নিজস্ব। একই অবস্থার মধ্যে দুই ব্যক্তির সম্পূর্ণ বিভিন্ন অনুভূতি হইতে পারে। আবার যেখানে দুই ব্যক্তির অনুভূতির মধ্যে সাদৃশ্য আছে, সেখানেও

দুই ব্যক্তির অনুভূতি অবিকল এক হইতে পারে না। যেমন, দুই বন্ধু মিলিয়া একটি ছায়াচিত্র দর্শন করিল, দু'জনেরই আনন্দ হইল; কিন্তু তবুও তাহাদের আনন্দানুভূতির মধ্যে পার্থক্য থাকিবে। এইজন্য বলা হয় যে, অনুভূতি নিতান্ত ব্যক্তিগত (supremely subjective)।

এ ক্ষেত্রে অবশ্য ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যদিও অনুভূতিকে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলা হয়, তাহা হইলেও ইহার অর্থ এই নহে যে, ইহা বস্তুর সহিত একেবারে সংস্রবহীন। কারণ বস্তুর সহিত ব্যক্তির, অথবা বিষয়ের সহিত বিষয়ীর সংযোগ ঘটার ফলেই ব্যক্তি বা বিষয়ীর মনে কোন-না-কোন অনুভূতির উদয় হয়। তাহা ছাড়া, যেখানে ব্যক্তি-বিশেষ নিজের মনে কোন কিছু কল্পনা করার ফলে অনুভূতির উদয় হয়, সেখানেও বলা যায় যে, কল্পনার মূলে অল্প-বিস্তর বাহ্য জগতের বস্তু থাকে এবং ব্যক্তি-বিশেষ নিজেকে কল্পনার বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া রাখে।

যাহা হউক, যদিও অনুভূতির মধ্যে ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতার প্রাধান্য সর্বাধিক, তাহা হইলেও এই বৈশিষ্ট্য একমাত্র অনুভূতির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নহে; কারণ স্বপ্ন, ভ্রান্তি (illusion), অমূল প্রত্যক্ষ (hallucination) ইত্যাদিও ব্যক্তিগত।

(২) অনুভূতির ক্ষেত্রে **ব্যক্তি-বিশেষ নিষ্ক্রিয় (passive) থাকে।**

ব্যক্তি-বিশেষ ইচ্ছা করিয়া কোন অনুভূতি সৃষ্টি করিতে পারে না। বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে যখন সংবেদন জন্মে বা অন্তরে কোন ভাবের উদয় হয়, তখন স্বতঃই অনুভূতির উদয় হয়—উহার আবির্ভাবকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ব্যক্তি-বিশেষের থাকে না। যেমন, সুমিষ্ট আম খাইলে ব্যক্তি-বিশেষের মনে স্বতঃই তৃপ্তি বা সুখের অনুভূতি হয়; পথিমধ্যে হঠাৎ ব্যাঘ্র দেখিলে স্বতঃই ভয়ের উদ্রেক হয়; কাহারও দ্বারা অপমানিত হইলে স্বতঃই ক্রোধের সঞ্চার হয়। এই সব অনুভূতিগুলি স্বতঃসঞ্জাত এবং কৃত্রিম উপায়ে উহাদের সৃষ্টি করা যায় না।

কিন্তু ব্যক্তি-বিশেষের অর্থাৎ অনুভূতি-অভিজ্ঞতাকারীর নিষ্ক্রিয়তাই অনুভূতির একমাত্র বৈশিষ্ট্য হইতে পারে না; উহা অন্যপ্রকার মানসিক অভিজ্ঞতার মধ্যেও থাকিতে পারে। যেমন, সংবেদন, ভ্রান্তি এগুলিও ব্যক্তি-বিশেষ ইচ্ছাপূর্বক বা সক্রিয়ভাবে সৃষ্টি করে না।

(৩) অনুভূতি একপ্রকার **মানসিক উত্তেজনা (mental excitement)।**

অনুভূতির ফলে দেহে ও মনে একটা তান (tension)-এর সৃষ্টি হয়; কিন্তু ইহাকেও অনুভূতির একমাত্র বৈশিষ্ট্য বলা যায় না। তাহা ছাড়া, তান বা উত্তেজনারও তারতম্য আছে। আনন্দানুভূতির ক্ষেত্রে উত্তেজনা অপেক্ষা প্রশান্তির ভাবেরই আধিক্য থাকে; অপরপক্ষে ক্রোধ, ভয় ইত্যাদি জটিল অনুভূতি (complex feeling) বা আবেগের ক্ষেত্রে উত্তেজনার ভাব প্রকট হয়। এইজন্য ইহাকে সকল অনুভূতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলা বোধ হয় যুক্তিযুক্ত হইবে না।

(৪) অনুভূতি সাধারণতঃ **তৃপ্তি বা অতৃপ্তি, সুখ বা দুঃখ, এই দুইটি বিপরীত গুণের একটি হইবে।**

যদিও অনেক অনুভূতির মধ্যে অল্প-বিস্তর সুখ বা দুঃখ (অন্ততঃপক্ষে তৃপ্তি বা অতৃপ্তির ভাব) থাকে, তাহা হইলেও সকল অনুভূতির মধ্যে ইহাদের একটির অস্তিত্ব থাকিবেই এ কথা সকল লেখক স্বীকার করেন না। একদল লেখক বলেন যে, সুখ-দুঃখ ব্যতীত অনুভূতির অন্য গুণ থাকিতে পারে (পৃঃ ৪৮৮); আবার অনেক লেখক সুখ-দুঃখ নিরপেক্ষ (neutral) অনুভূতির অস্তিত্বের কথা বলেন (পৃঃ ৪৮৭)।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অনুভূতির সুষ্ঠু সংজ্ঞা দান অসম্ভব। তবে মোটামুটিভাবে বলা যাইতে পারে যে, ইহা এমন এক মানসিক অবস্থা **যাহা একান্তভাবে অভিজ্ঞতাকারীর অন্তরের বিষয়, যাহার উদ্ভব সে ইচ্ছাশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না, যাহার আবির্ভাবে অনেক ক্ষেত্রে অন্তরে চাঞ্চল্য, উত্তেজনা অথবা অন্য কোন পরিবর্তন আসে এবং যাহা সাধারণতঃ সুখ বা দুঃখ ইহাদের কোন একটি রূপে আমাদের নিকট মূর্ত হইয়া উঠে।**[১]

১ 'অনুভূতি'-পদের ইংরাজী প্রতিশব্দ Feeling পদটিরও অর্থ সুনির্ধারিত নহে। যথা—(ক) 'Feeling' বলিতে অস্পষ্ট চেতনা বা বিশ্বাস (vague consciousness or belief) বুঝায়; যেমন, I have a *feeling* that he is a bad man; এখানে তাহাকে খারাপ লোক মনে করিবার বিশেষ কারণ জানা নাই; (খ) 'Feeling' বলিতে দৃঢ়বিশ্বাস সমন্বিত প্রত্যক্ষ জ্ঞান বুঝায়; যেমন, I *feel* the existence of God. (গ) ইহা স্পার্শন ও পেশীজ সংবেদন (tactuo-muscular sensation) বুঝায়; যেমন, I can *feel* my way in the dark. (ঘ) ইহা যে কোন সংবেদনও বুঝায়। (ঙ) ইহা কেবলমাত্র সুখ বা দুঃখের অনুভূতিও বুঝায়।

২। অনুভূতির কারণ (Conditions of Feeling)—সুখ-দুঃখ সম্বন্ধীয় নীতি (Laws of Pleasure and Pain) :

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, অনুভূতি সাধারণতঃ সুখ বা দুঃখের মূর্তিতে আমাদের অভিজ্ঞতায় প্রকাশিত হয়; অর্থাৎ যে সমস্ত অনুভূতি আমরা বোধ করি, তাহা সাধারণতঃ এই দুই শ্রেণীর একটির অন্তর্ভুক্ত হয়—সেগুলি সুখের অনুভূতি, আর না হয় দুঃখের অনুভূতি হয়; তাহাদের ফলে তৃপ্তি বা শান্তি দেখা দেয়, আর না হয় তাহারা অতৃপ্তি, অশান্তি সৃষ্টি করে। সুতরাং এই দুইটিকে 'অনুভূতির গুণ' (attributes of feeling) বলা হয়। অতএব অনুভূতির কারণ অনুসন্ধানের অর্থ হইল সুখ-দুঃখের কারণ নির্ণয় করা। সুখ-দুঃখের কারণ ব্যাখ্যা করিবার জন্য সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে তিনটি নিয়ম গঠিত হইয়াছে—ইহারাই 'সুখ-দুঃখ সম্বন্ধীয় নীতি' নামে পরিচিত। এই তিনটি নিয়ম বা নীতি হইল : (ক) উদ্দীপন সম্বন্ধীয় নীতি (Law of Stimulation), (খ) পরিবর্তন সম্বন্ধীয় নীতি (Law of Change), এবং (গ) সামঞ্জস্য সম্বন্ধীয় নীতি (Law of Harmony)।

(১) **উদ্দীপন-সম্বন্ধীয় নীতি**—এই নীতি অনুসারে **উদ্দীপন যদি পরিমাণে মধ্যম প্রকারের তীব্রতাবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহা সুখবিধান করে; কিন্তু উহা যদি অতি ক্ষীণ (too weak) বা অতি তীব্র (too strong) হয়, তাহা হইলে দুঃখ দান করে।** অর্থাৎ মধ্যম পরিমাণের সব কিছু সুখকর—কিন্তু কোন কিছুর অতি অল্প বা অতিরিক্ত দুঃখদায়ক। যেমন, কোন ব্যক্তি যদি কোন পুস্তক পড়িতে চাহে, তাহা হইলে অতিরিক্ত ক্ষীণ আলোকে বা অতিরিক্ত তীব্র আলোকে পড়িবার চেষ্টা করিলে উহা তাহার চক্ষুর পক্ষে পীড়াদায়ক হইবে; কিন্তু যদি মাঝারি আলোকে সে পড়িবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে সে ভালভাবে পড়িতে পারিবে এবং উহা তাহার চক্ষুর পক্ষেও তৃপ্তিদায়ক হইবে।

এই নিয়মের একটি ব্যতিক্রম আছে। যদি কোন বস্তু স্বরূপতঃ বা স্বভাবতঃ কষ্টদায়ক (intrinsically painful) হয়, তাহা হইলে অতি অল্প পরিমাণে তাহার প্রয়োগ হইলেই ব্যথা বা দুঃখের সৃষ্টি হইবে এবং উহার মধ্যম পরিমাণের প্রয়োগে ব্যথা বা দুঃখ আরও বৃদ্ধি পাইবে; যেমন, একটি সুঁচ দেহে অল্প ফুটাইলেই যন্ত্রণা বোধ হয়, কিন্তু তাই বলিয়া সামান্য একটু

জোরে (অর্থাৎ মধ্যম পরিমাণে) ফুটাইলে যে উহা সুখদায়ক হইবে, তাহা নহে। কালমেঘ পাতার তিক্তরস অল্প পরিমাণে খাইলেই তাহা বিস্বাদ ও অপ্রীতিকর বোধ হয়, কিন্তু তাই বলিয়া উহা মধ্যম পরিমাণে খাইলে যে উহা সুস্বাদু এবং প্রীতিকর বোধ হইবে তাহা নহে।

(২) **পরিবর্তন-সম্বন্ধীয় নীতি**—চেতনার একটি সাধারণ ধর্ম হইল যে ইহা সর্বদাই পরিবর্তন চাহে—পরিবর্তনের অভাব ঘটিলে বৈচিত্র্যহীনতা বা একঘেঁয়েমির সৃষ্টি হয় (পৃঃ ৩২৫-২৬ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং **পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য আমাদের সুখদান করে এবং উহাদের অভাব আমাদের নিকট পীড়াদায়ক বা কষ্টকর হয়।** এইজন্য আমরা এক বই সর্বদা পড়িতে ভালবাসি না, একই প্রকার আহার্য প্রতিদিন খাইতে চাহি না, একই স্থানে প্রত্যহ বেড়াইতে পছন্দ করি না, একই প্রকার সাজপোষাক নিত্য ব্যবহার করিতে আমাদের ভাল লাগে না। এই কারণে বিবিধ ব্যবহার্য বস্তুর গঠন-বৈচিত্র্যের আদর্শ ('মডেল') এবং আদবকায়দা, চালচলন (ফ্যাশান)-এর প্রায়ই পরিবর্তন ঘটে ; কারণ বৈচিত্র্যহীন বস্তু বা কার্য আমাদের তৃপ্তিদান করিতে পারে না।

এই নিয়মের কয়েকটি ব্যতিক্রম আছে :

(ক) যদি পরিবর্তন অতি দ্রুত সংঘটিত হয়, তাহা হইলে উহা সুখবিধান করে না। যেমন, যদি অতি দ্রুত বিভিন্ন আহার্য বস্তু ভক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে তৃপ্তি বা সুখ আসে না ; কারণ একটি বস্তুর স্বাদ উপভোগ করিতে না করিতেই আর একটি আসিলে কোনটিরই স্বাদ বুঝা যায় না এবং তৃপ্তিও আসে না।

(খ) যদি অল্প পীড়াদায়ক বা অপ্রীতিকর অবস্থা পরিবর্তিত হইয়া অধিকতর পীড়াদায়ক বা অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে এই পরিবর্তনের ফলে সুখের সৃষ্টি হইতে পারে না। সেইরূপ সুখকর পরিস্থিতির পরিবর্তে দুঃখকর পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে তাহাতেও সুখের সৃষ্টি হয় না।

(গ) উচ্চ পর্যায়ের অনুভূতির—যথা, প্রেম, প্রীতি, শ্রদ্ধা ইত্যাদির—ক্ষেত্রে বিষয়-বস্তুর পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন হয় না। যেমন, স্নেহবৎসল পিতামাতার এরূপ মনে হয় না যে, তাঁহারা একই পুত্রকন্যাদের বহুদিন স্নেহ

করিয়া আসিতেছেন বলিয়া ঐ সকল পুত্রকন্যার প্রতি স্নেহ তাঁহাদের আর তৃপ্তি দান করিতেছে না।

(৩) সামঞ্জস্য-সম্বন্ধীয় নীতি—যাহার ভিতর ছন্দ বা সামঞ্জস্য আছে তাহা প্রীতিপ্রদ বা সুখকর এবং যাহার ভিতর উহার অভাব আছে তাহা দুঃখদায়ক বা অপ্রীতিকর। যেমন, গর্দভের চীৎকারের মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য নাই বলিয়া উহা শ্রবণযন্ত্রের পক্ষে পীড়াদায়ক, কিন্তু সুমধুর সঙ্গীতে সামঞ্জস্য থাকার জন্য উহা আমাদের পক্ষে সুখদায়ক হয়। সেইরূপ কেহ যদি লাফাইতে থাকে, তাহা আমাদের ভাল লাগে না; কিন্তু সুসমঞ্জস নৃত্য আমাদের তৃপ্তি দেয়।

আমরা যে সকল নীতি আলোচনা করিলাম সেগুলি সম্পূর্ণভাবে সঠিক নহে, অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রে উহারা প্রযোজ্য নহে এবং উহাদের ব্যতিক্রম আছে। কোন কোন লেখক ইহাদের একটিমাত্র সর্বজনীন রূপ দিবার জন্য একটি মতবাদ (theory) গঠন করিয়াছেন। **মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে** নিম্নলিখিত সূত্র রচিত হইয়াছে—**যাহা ইচ্ছাশক্তির সহায়ক, তাহা সুখদান করে এবং যাহা ইচ্ছাশক্তির পরিপন্থী তাহা দুঃখ-দায়ক।** আমরা যাহা করিতে ইচ্ছা করি, তাহাতে বাধা পড়িলে আমরা দুঃখ পাই, কিন্তু ঐ ইচ্ছার সহায়ক যাহা কিছু তাহাই আমাদের সুখদান করে।

উদ্দীপন সম্বন্ধীয় নীতির ক্ষেত্রে আমরা উদাহরণ দিয়াছিলাম যে, মাধ্যমিক তীব্রতাসম্পন্ন আলোক সুখকর। বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আমরা বলিতে পারি যে, যেহেতু উহা পড়িবার বা অন্য কিছু দেখিবার ইচ্ছা-পূরণে সুষ্ঠুভাবে সাহায্য করে, সেই হেতু উহা সুখকর; কিন্তু অতি তীব্র বা অতি ক্ষীণ আলোক ঐরূপ ইচ্ছার পথে বাধা দান করে, সেই হেতু উহা দুঃখদায়ক। সেইরূপ আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, বৈচিত্র্য বা পরিবর্তন সুখ আনয়ন করে। আমরা বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বলিতে পারি যে, যেহেতু ঐরূপ পরিবর্তন চেতনার সাধারণ ধর্মের অনুকূল, সেই হেতু উহা সুখদান করে।

৩। সুখ-দুঃখনিরপেক্ষ অনুভূতি ও মিশ্র অনুভূতি (Neutral Feeling & Mixed Feeling):

সুখ-দুঃখকে যদি অনুভূতির দুইটি বিপরীত গুণ বলা যায়, তাহা হইলে

মনে হয় যে, সুখ-দুঃখহীন অনুভূতি অথবা দুইটির সংমিশ্রণ সমন্বিত কোন অনুভূতি থাকা সম্ভব নহে। কিন্তু ইহা সকলে স্বীকার করেন না।

(ক) একদল লেখক মনে করেন যে, সুখ-দুঃখনিরপেক্ষ বা সম্পূর্ণরূপে সুখ-দুঃখহীন (neutral) অনুভূতি থাকা সম্ভব। বিস্ময় বা আশ্চর্যের ঠিক প্রথম অভিঘাত বা 'ধাক্কা' (first shock of surprise or wonder) সুখকরও নহে, দুঃখকরও নহে। যেমন, অনেকদিন পরে অপ্রত্যাশিতভাবে এক বাল্যবন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় বিস্ময়ের প্রথম মুহূর্তটি সুখ-দুঃখ-নিরপেক্ষ—অবশ্য তাহার পরেই সুখ বা আনন্দের আবির্ভাব হয়। সেইরূপ কোন ব্যক্তি তাহার উপার্জিত অর্থ যে ব্যাঙ্কে জমা রহিয়াছে, সেই ব্যাঙ্ক হঠাৎ একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে, এইরূপ নিদারুণ সংবাদ শুনার প্রথম মুহূর্তটিতে সুখদুঃখের অনুভূতি থাকে না—কিন্তু তাহার পরেই দুঃখের আবির্ভাব হয়।

অপর একদল লেখক এই মত স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা মনে করেন যে, বিস্ময় বা আশ্চর্যের ফলে ঠিক প্রথম অবস্থায় যে বিমূঢ়ভাবের (confusion) সৃষ্টি হয়, তাহা সকল অবস্থাতেই দুঃখকর; কিন্তু তাহার অব্যবহিত পরে সমগ্র পরিস্থিতিটি অবধারণের জন্য কেবল সুখ বা কেবল দুঃখ দেখা দেয়।

সুতরাং সম্পূর্ণভাবে সুখ-দুঃখনিরপেক্ষ অনুভূতির অস্তিত্ব বিতর্কমূলক।

(খ) সেইরূপ মিশ্র অনুভূতির সম্বন্ধে মতবিরোধ আছে। একদল মনোবিৎ বলেন যে, সুখ ও দুঃখের সংমিশ্রণ সম্ভব। যেমন, কোন প্রিয়জনকে তাহার মঙ্গলের বা উন্নতির জন্য বিদায়দানের মুহূর্তে বিদায়দানকারীর অন্তরে সুখ ও দুঃখের সংমিশ্রণ সমন্বিত অনুভূতি দেখা দিতে পারে। যেমন, ছাত্রদের কোন প্রিয় অধ্যাপক অন্যত্র উচ্চতর পদগ্রহণের জন্য যখন কোন বিদ্যায়তন হইতে অবসর ল'ন, তখন তাঁহাকে বিদায় দিবার কালে ছাত্রদের মনে যুগপৎ সুখ ও দুঃখ দেখা দেয়—সুখ এই কারণে যে, তাহাদেরই প্রিয় অধ্যাপকের উন্নতি হইবে, আর দুঃখ এই কারণে যে, তাহারা শীঘ্রই তাহাদের প্রিয় অধ্যাপকের সাহচর্য হইতে বঞ্চিত হইবে।[২]

২ তুলনীয়: "Melancholy must always be tinged with sorrow or it would not be melancholy at all; yet there is such a thing as *pleasing melancholy.*" (Stout, *Manual of Psychology*, p. 109).

এই মতের সমালোচনা করিয়া অপর একদল লেখক বলেন যে, উপরে বর্ণিত মানসিক অবস্থা প্রকৃতপক্ষে সুখ ও দুঃখের মিশ্রিত অবস্থা নহে—ঐরূপ অবস্থায় সুখ ও দুঃখের ক্রমাগত দ্রুত পরিবর্তন হয় বলিয়া মনে হয় যে, তাহারা যুগপৎ মিশ্রিত অবস্থায় আছে। প্রকৃতপক্ষে একান্তরভাবে সুখ ও দুঃখের দ্রুত পরিবর্তন ঘটে।

সুতরাং মিশ্র অনুভূতির অস্তিত্বও বিতর্কমূলক।

৪। অনুভূতির ত্রি-মূর্তি সম্বন্ধীয় নীতি—ভুণ্ড্‌টের মতবাদ (Wundt's Tridimensional Theory of Feeling):

অনুভূতিকে সাধারণতঃ সুখ ও দুঃখ এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। ভুণ্ড্‌ট্ এই মতের পরিবর্তন সাধন করিয়া একটি নব মতের প্রবর্তন করেন। ইহাই অনুভূতির ত্রি-মূর্তি সম্বন্ধীয় নীতি।[৩] ভুণ্ড্‌টের এই মতের বৈশিষ্ট্য নিম্নলিখিতরূপ :

(১) সুখ এবং দুঃখ অনুভূতির একমাত্র সরল গুণ নহে।

(২) অনুভূতির তিনটি মূর্তি (dimension) আছে। প্রতি মূর্তিরই দুইটি করিয়া বিপরীত গুণ আছে।

(৩) অনুভূতি প্রথমতঃ সুখ ও দুঃখ (pleasantness and unpleasantness) এই দুইটির মধ্যে থাকিতে পারে; দ্বিতীয়তঃ, উহা উত্তেজনা ও স্থৈর্য বা বিষণ্ণতা (excitement and calm or depression) এই দুই-এর মধ্যে থাকিতে পারে; আবার তৃতীয়তঃ, উহা তান ও শ্লথন (tension and relaxation)-এর মধ্যেও থাকিতে পারে। (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

(৪) সুখ-দুঃখ, উত্তেজনা-বিষণ্ণতা এবং তান-শ্লথন এই তিনটি হইল অনুভূতির তিনটি মূর্তি—ইহারা নিজেরা আবার সরল গুণ নহে, কারণ ইহাদের প্রত্যেকটির অধীনে আবার অনেকগুলি গুণ আছে।

ভুণ্ড্‌টের এই মত প্রবর্তিত হইবার পর অনেকে ইহা সমর্থন করেন। তবে অবয়ববাদের অন্যতম সমর্থক এবং ভুণ্ড্‌টের শিষ্য টিচেনার এই মত

---

[৩] ১৮৯৩ সালে তাঁহার রচিত 'Physiological Psychology'-এর চতুর্থ সংস্করণে ভুণ্ড্‌ট্ Tridimensional Theory of Feeling সম্বন্ধে তাঁহার মতবাদ প্রকাশ করেন। পূর্বে এক সময় তিনি অনুভূতিমাত্রকেই সংবেদনের গুণ (attribute of sensation) মনে করিতেন।

পরিত্যাগ করেন। ইহার বিরুদ্ধে তিনি নিম্নলিখিত যুক্তি উত্থাপন করেন[৪] :—

(ক) ভুণ্ড্ট যে শ্রেণীকরণ প্রবর্তন করেন তাহা সম্পূর্ণ নহে। স্থান ও কালের অভিজ্ঞতা (spatial and temporal experience)-এর সহিতও অনুভূতি সংশ্লিষ্ট থাকে। সুতরাং যদি অনুভূতির সকল মূর্তিরই উল্লেখ করিতে হয়, তাহা হইলে স্থান ও কালের সহিত সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতারও উল্লেখ করা ভুণ্ড্টের উচিত ছিল।

(খ) তাহা ছাড়া, উত্তেজনা-বিষণ্ণতা এবং তান-শ্লথনকে সুখ-দুঃখের সহিত সমপর্যায়ভুক্ত করা যায় না। যে অর্থে দুঃখ সুখের বিপরীত, সেই অর্থে কি শ্লথন তানের বিপরীত? তান কমিতে কমিতে যখন শূন্য ডিগ্রীতে পৌছায়, তখন তাহাকে শ্লথন বলে; কিন্তু দুঃখ বলিতে কেবলমাত্র সুখের অভাবই বুঝায় না, উহার একটি বিপরীত অবস্থাও বুঝায়। তাহা ছাড়া, উত্তেজনার বিপরীত অবস্থা ঠিক কী হইবে তাহা ভুণ্ড্ট নিজেই সঠিকভাবে বলিতে পারেন নাই; তিনি কখনও বলিয়াছেন বিষণ্ণতা (depression), কখনও বলিয়াছেন শান্তি বা স্থৈর্য (calm), আবার কখনও বলিয়াছেন রুদ্ধশক্তির অবস্থা (arrest)। সুতরাং তথাকথিত বিপরীত গুণের দ্বি-মুখিতার সাহায্যে ভুণ্ড্ট অনুভূতির যে তিনটি মূর্তি গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা ত্রুটিপূর্ণ থাকিয়া যাইতেছে।

(গ) এই ত্রুটি যে কেবল যুক্তিশাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গী (logical standpoint) হইতে তাহা নহে; মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী (psychological standpoint) হইতেও ভুণ্ড্টের মতবাদ ত্রুটিপূর্ণ। সুখ-দুঃখ যেরূপ সরল গুণ (simple attributes), উত্তেজনা-বিষণ্ণতা বা তান-শ্লথন সেরূপ সরল গুণ নহে—ইহারা জটিল এবং ইহাদের সহিত দেহযান্ত্রিক সংবেদন (organic sensation) যথেষ্ট 'মিশ্রিত' বা সংশ্লিষ্ট থাকে। সুতরাং সুখ দুঃখের বৈপরীত্যের সহিত ভুণ্ড্ট-কথিত অন্য দুইটি বৈপরীত্য সমপর্যায়ভুক্ত নহে।

(ঘ) তাহা ছাড়া, পরীক্ষণের মাধ্যমেও দেখা গিয়াছে যে, সুখ বা দুঃখের ক্ষেত্রে যে সকল দৈহিক পরিবর্তন দেখা দেয়, তাহাদের সহিত

৪ Titchener, *A Text-book of Psychology*, pp. 251-54.

অন্য প্রকার অনুভূতির (যথা, উত্তেজনা ও বিষণ্নতা, বা তান ও শ্লথন)-এর ক্ষেত্রে যে সব পরিবর্তন হয় সেগুলি সমতুল্য নহে।

১ নং চিত্র।
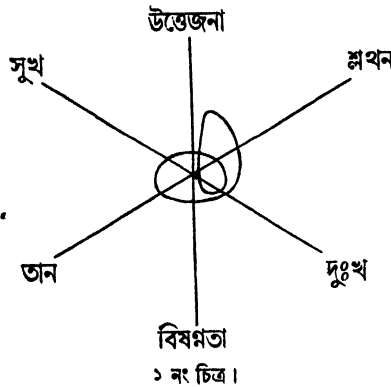
অনুভূতির ত্রি মূর্তি। (ভুণ্ড্টের মতবাদ)।

আধুনিক কালের অধিকাংশ মনোবিৎই অবয়ববাদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিহার করিয়াছেন এবং তাঁহারা অনুভূতির (অথবা তদনুরূপ কোন মানসিক অবস্থার) গুণ-বিশ্লেষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন না। এইজন্য সাম্প্রতিক কালের রচনায় ভুণ্ড্টের এই মতবাদের ঐতিহাসিক মূল্য ছাড়া আর কিছুই নাই।

৫। অনুভূতির বিভিন্ন শ্রেণী (Classes of Feelings):

অনুভূতিকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—সংবেদন-অনুষঙ্গী অনুভূতি (sense-feeling) এবং আবেগ বা প্রক্ষোভ (emotion)।

(ক) সংবেদন-অনুষঙ্গী অনুভূতিসমূহ সংবেদনের সহিত সংশ্লিষ্ট বা অনুষঙ্গবদ্ধ (associated with sensations) থাকে। যেমন, কোন মিষ্টরস আস্বাদন করিলে বা সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিলে বা নয়নাভিরাম দৃশ্য অবলোকন করিলে যে সুখানুভূতি হয়, তাহাকে সংবেদন-অনুষঙ্গী অনুভূতি বলা যাইতে পারে। আবার যে অনুভূতির মূলে কোন ভাব বা ধারণা (idea) আছে, তাহাকে আবেগ বা প্রক্ষোভ বলে—সুতরাং আবেগকে বলা যায় ভাবসঞ্জাত অনুভূতি (ideally excited feeling)।[৫]

[৫] শরীরতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বলা হইয়া থাকে: Feelings are peripherally excited and emotions are centrally excited. (আবেগের মূলে কোন-না-কোন ভাব বা idea থাকার জন্য অনেকে 'আবেগ'-পদের পরিবর্তে 'ভাবাবেগ' পদটি পছন্দ করেন।)

(খ) সংবেদন-অনুষঙ্গী অনুভূতি হইল অপেক্ষাকৃত সরল, কিন্তু প্রক্ষোভ বা আবেগ হইল জটিল।

(গ) সংবেদন-অনুষঙ্গী অনুভূতির দৈহিক প্রকাশ বিশেষ প্রকট নহে, কিন্তু অধিকাংশ আবেগেরই দৈহিক প্রকাশ বিশেষভাবে প্রকট বা প্রকাশমান হয়।

(ঘ) সংবেদন-অনুষঙ্গী অনুভূতির সহিত সহজবৃত্তি (instinct)-এর প্রত্যক্ষ সংযোগ নাই, কিন্তু অধিকাংশ আবেগেরই মূলে আছে কোন-না-কোন সহজবৃত্তি; যেমন, ভয়রূপ আবেগের মূলে আছে আত্মরক্ষার্থ পলায়ন প্রবৃত্তি। (পৃঃ ৪১৮–২৩)।

৬। প্রক্ষোভ বা আবেগের স্বরূপ (Nature of Emotion):

প্রক্ষোভ বা আবেগ এক প্রকার জটিল অনুভূতি—ইহার মূলে থাকে কতকগুলি সহজবৃত্তি; বিশেষ বিশেষ ধারণা বা বস্তু ইহাকে জাগরিত করে; ইহার ফলে দেহের আন্তরযন্ত্রীয় পরিবর্তন সাধিত হয় এবং ইহার বাহ্য প্রকাশগুলি বিশেষভাবে প্রকট হয়; ইহা হঠাৎ আমাদের বিবিধ কার্যে প্রবৃত্ত করে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রক্ষোভ বা আবেগকে বিভিন্ন দিক্ হইতে আলোচনা করা যাইতে পারে:

(ক) আবেগ-অভিজ্ঞতাকারীর দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বলা যাইতে পারে যে, ইহা সুখ, দুঃখ বা অনুরূপ কোন অনুভূতির অভিজ্ঞতা।

(খ) দৈহিক পরিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বলা যায় যে, ইহা দ্বারা বিবিধ আন্তরযন্ত্রীয় পরিবর্তন সূচিত হয়।

(গ) বাহির হইতে আবেগ-প্রত্যক্ষকারী অন্য ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বলা যায় যে, ইহা কতকগুলি ক্রিয়া-বিশেষ; যথা, চীৎকার করা, হাত-পা ছোঁড়া, হাসা, কাঁদা ইত্যাদি। এই সকল ক্রিয়ার মধ্যে যুক্তির বিশেষ প্রকাশ নাই, এগুলি অনেক ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খল বা 'এলোমেলো'।

(ঘ) যেহেতু ইহা আমাদের কার্যে প্রবৃত্ত করে, সেই হেতু ঐ সকল কার্যের কারণের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বলা যায় যে, আবেগ আমাদের অনেক কার্যের উদ্দেশ্য (motive)-রূপে কার্য করে, অর্থাৎ আবেগ বা প্রক্ষোভ

আমাদের কতকগুলি বিশেষ লক্ষ্যের দিকে চালিত করে এবং অপর কতকগুলি ব্যক্তি বা বস্তু হইতে আমাদের দূরে রাখে।

বলা বাহুল্য, সকল মনোবিৎ আবেগের বিভিন্ন দিকের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করেন না—কেহ বা অভিজ্ঞতার দিক্ বিশ্লেষণ করেন, কেহ বা বাহ্য প্রকাশ লইয়া আলোচনা করেন, কেহ বা ইহাকে প্রেষণার উৎসভাবে দেখেন।[৬]

আমরা সাধারণভাবে আবেগের বা প্রক্ষোভের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিতে পারি :

(১) আবেগ বা প্রক্ষোভ **বস্তুমুখী** (directed upon an object)—কোন বাহ্য ব্যক্তি বা বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিয়া অথবা উহার চিন্তায় বা ধারণায় ইহা জাগরিত হয়। এইজন্য বলা হয় যে, আবেগমাত্রই **ভাব বা ধারণা দ্বারা উদ্দীপিত** (excited by ideas); যেখানে কোন কিছু প্রত্যক্ষ করার ফলে আবেগের সঞ্চার হয়, সেখানে প্রত্যক্ষের মধ্যেই কোন-না-কোন ভাব (idea) থাকে। যেমন, এক পরিচিত ব্যক্তি আমার ক্ষতি করিবার চেষ্টা করিতেছে, ইহা আমি চিন্তা করিলাম এবং তাহার জন্য ক্রোধ হইল। আমি হঠাৎ এক ভীষণাকৃতি জন্তু প্রত্যক্ষ করিলাম এবং আমার ভয় হইল।

(২) আবেগের বাহ্য প্রকাশ বিশেষভাবে প্রকাশমান হয় এবং সেইজন্য উহারা লক্ষণীয়; যেমন. ক্রোধের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ক্রুদ্ধ ব্যক্তির

---

৬ বিভিন্ন মনোবিৎ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আবেগের আলোচনা করিয়াছেন :

(ক) টিচেনার ইত্যাদি অবয়ববাদিগণ মনে করেন যে, সংবেদন ও প্রতিরূপের ন্যায় অনুভূতি (affection)·ও একটি মৌলিক উপাদান। প্রতি আবেগের মধ্যে ইহা আছে। সেইজন্য, তাঁহারা আবেগকে বিশ্লেষণ করিয়া উহার মধ্যে কী কী অনুভূতি (affection) আছে এবং উহার সহিত কী কী দৈহিক পরিবর্তন আছে তাহা বিশ্লেষণ করেন।

(খ) ব্যবহারবাদী ওয়াট্সন্ বলেন যে, আবেগ হইল একপ্রকার দৈহিক প্রতিক্রিয়া (reaction pattern) যাহার ফলে সমগ্র দেহে—বিশেষতঃ আন্তরযন্ত্রে এবং গ্রন্থিসমূহে—ভীষণ আলোড়ন হয়

(গ) গেস্টাল্টবাদিগণ আবেগের উপর খুব বেশী গুরুত্ব অর্পণ করেন না ; তবে তাঁহারা আবেগকে সকল উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কার্যের (motivated bebaviour) 'সহকারী অঙ্গ'-রূপে দেখেন।

(ঘ) হরমিক্ মনোবিদ্যা আবেগের উপর গুরুত্ব আরোপ করে ; কারণ ইহার মতে প্রতি সহজাত বৃত্তি (instinct)-এরই মূলে আছে আবেগ।

গলার স্বর রুক্ষ হয়, চক্ষু রক্তবর্ণ হয়, দেহ কাঁপিতে থাকে, এবং একটা হিংস্র আক্রমণাত্মক ভাব ফুটিয়া উঠে। দেহাভ্যন্তরে স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র (autonomic nervous system) বিশেষভাবে সক্রিয় হইয়া উঠে এবং ফলে আন্তরযন্ত্র উদ্দীপিত হয়; কয়েকটি নালিকাবিহীন গ্রন্থিও (ductless glands) উদ্দীপিত হয়।

(৩) দেহযন্ত্রে এই সব পরিবর্তনের ফলে দেহযান্ত্রিক সংবেদন (organic sensations)-এর সৃষ্টি হয় এবং সেগুলি আবার আবেগের প্রকাশকে তীব্রতর করিয়া তুলে (reinforce emotions)।

(৪) আবেগ-সমূহের মধ্যে একটা **আকস্মিকতা** (suddenness) আছে—ইহারা হঠাৎ বা আকস্মিকভাবে জাগরিত হয়। যেমন, এখন যে ব্যক্তি শান্ত আছে, পরমূহূর্তেই এমন কিছু ঘটিতে পারে যাহার ফলে সে ক্রোধোন্মত্ত হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু যদিও ইহারা হঠাৎ আবির্ভূত হয়, তাহা হইলেও ইহারা হঠাৎ তিরোহিত হয় না—ধীরে ধীরে ইহারা প্রশমিত হয়।

(৫) আবেগ-প্রণোদিত যে সকল কার্য সাধিত হয়, সেইগুলি যুক্তি-নিরপেক্ষ, এবং যদিই বা কিছু যুক্তি থাকে তাহা অনেক সময়ই অনেকাংশে মিথ্যা যুক্তি। এইজন্য এই সকল কার্য এমন আকারের হইতে পারে যে, কোন শান্ত অবস্থায় ব্যক্তি-বিশেষ উহা করিতে পারে না। যেমন, ক্রোধের বশে এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে হত্যা করিতে পারে, অথবা ভীত হইয়া একজন উচ্চস্থান হইতে লাফাইয়া পড়িতে পারে।

(৬) যদিও আবেগসমূহ কোন-না-কোন ভাব বা ধারণা দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে জাগরিত হয়, তাহা হইলেও উহাদের প্রাথমিক কারণ (remote or primary cause) হইল কোন-না-কোন সহজবৃত্তি—ঐ সহজবৃত্তিগুলিই আবেগসমূহকে উদ্দীপিত করিয়া নিজেদের তৃপ্তির পথ খুঁজিয়া থাকে। যেমন, যখন কোন বিড়ালী তাহার নবজাত সন্তান-সন্ততিকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে থাকে, তখন কোন অপরিচিত ব্যক্তি বা ইতর জীব যাইলে সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। এখানে বলা যাইতে পারে যে,

বিড়ালীর সহজাত মাতৃত্ব-বৃত্তিই তাহাকে সতর্ক করিয়া তুলে এবং সে ক্রুদ্ধ হইয়া আক্রমণোদ্যত হয়।[৭]

আমরা উপরে আবেগের কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিলাম। সকল আবেগের ক্ষেত্রেই যে ইহারা সমভাবে প্রকাশিত হয়, তাহা নহে। তীব্র আবেগ (strong emotion)-এর ক্ষেত্রে (যথা, ক্রোধ, ভয়) ইহারা যেরূপ প্রকাশমান থাকে, মৃদু আবেগ (softer emotions)-এর ক্ষেত্রে (যথা, প্রেম, সহানুভূতি, দয়া ইত্যাদির ক্ষেত্রে) সেরূপ প্রকাশমান হয় না।

৭। আবেগ ও দৈহিক পরিবর্তন (Emotion and bodily Changes):

আবেগের একটি অন্যতম প্রধান লক্ষণ হইল দৈহিক পরিবর্তন। আমরা যে বাহ্য পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করি তাহাদের পশ্চাতে দেহাভ্যন্তরে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয় এবং বাহ্য আচরণসমূহ উহাদের দ্বারাই প্রভাবিত হয়।

দেহাভ্যন্তরে যে সমস্ত পরিবর্তন ঘটে তাহাদের অধিকাংশ স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে পরিবাহিত শক্তির দ্বারা সাধিত হয়। এই স্নায়ুতন্ত্রের দুইটি বিভাগ—সমবেদী (sympathetic) এবং পরাসমবেদী (parasympathetic)। ইহাদের সহিত মুখমণ্ডল, হৃদ্‌যন্ত্র পাকযন্ত্র, ইত্যাদির সংযোগ আছে। আবেগের সময় এই সব অঙ্গ স্বতঃক্রিয়স্নায়ুতন্ত্র-বাহিত শক্তি দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া নানাভাবে কার্য করে। সমবেদী এবং পরাসমবেদী অংশের কার্য একরূপ নহে। মৃদু আবেগের ক্ষেত্রে পরাসমবেদী অংশ কার্য করে এবং ইহার ফলে হৃদ্‌যন্ত্র মৃদুভাবে কার্য করে, রক্তের চাপ কমিয়া যায়, পরিপাকযন্ত্রে অধিক পরিমাণে রক্ত সঞ্চালিত হয় এবং উহার ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়। অপর পক্ষে,

তুলনীয়: (১) "(Another) feature of emotion is what we may call its *parasitical* character. So far as emotions are excited by general situations, and not merely by general organic changes, they are usually secondary phenomena and presuppose the existence of more specific tendencies." (Stout, *op. cit.*, p. 365).

(২) "...it is characteristic of an emotion that it is a total state of mind which includes a *conation* or *impulsion* to some kind of behaviour." (Thouless, *General and Social Psychology*, p. 74).

তীব্র আবেগের ক্ষেত্রে সমবেদী অংশ কার্য করে, এবং ইহার ফলে হৃদযন্ত্র দ্রুত চলিতে থাকে, রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায়, পেশীসমূহে অধিক পরিমাণে রক্ত চালিত হয়। তাহা ছাড়া পরিপাক যন্ত্রের ক্রিয়া ব্যাহত হয়, তালুদেশ শুষ্ক হইয়া যায় ও চক্ষুযুগল বিস্ফারিত হয়। এ্যাড্রিনাল গ্রন্থি হইতে এ্যাড্রিনিন্ নামক রসক্ষরণ হয় এবং এই রস (বা হর্‌মোন্) দেহকে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত করে। (বিস্তারিত বিবরণের জন্য পৃঃ ১৮১-৮২ ও পৃঃ ২৬৩-৬৪ দ্রষ্টব্য)।

তীব্র উত্তেজনার সময় স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র স্বেদগ্রন্থি (sweat glands)-এর উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং অধিক পরিমাণে স্বেদ বা ঘর্ম নির্গত হয়। ইহার সহিত আরও লক্ষ্য করা যায় যে, চর্মেন্দ্রিয়ের পক্ষে বিদ্যুৎ শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া করিবার ক্ষমতাও (Galvanic Skin Response বা সংক্ষেপে, GSR) কমিয়া যায়।

৮। (ক) জেম্‌স্-লাঙ্গে মতবাদ : (James-Lange Theory of Emotion) :

আমরা পূর্বেই (পৃঃ ৪৯১) বলিয়াছি যে, আবেগ বা প্রক্ষোভের বিভিন্ন দিক্ আছে—ইহাদের মধ্যে প্রধান দুইটি দিক্ হইল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা (subjective experience)-এর দিক্ এবং দৈহিক পরিবর্তন (bodily changes)-এর দিক্। এখন প্রশ্ন হইল : প্রথমে ক্রোধ বা ভয় বা অন্য কোন আবেগের অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা হয় এবং তদনুরূপ দৈহিক পরিবর্তন ঘটে, অথবা প্রথমে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ দৈহিক পরিবর্তন ঘটে, এবং তাহার পরে তদনুরূপ আবেগের অভিজ্ঞতা জন্মে ?

সাধারণ মত হইল যে, আমরা প্রথমে কোন উত্তেজক পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করি বা চিন্তা করি, এবং তখন আবেগ জন্মে এবং তৎক্ষণাৎ দৈহিক পরিবর্তন প্রকাশ পায়। যেমন, আমার কেহ ক্ষতি করিয়াছে ইহা বুঝিতে পারিয়া তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলাম এবং তাহার পর তাহাকে আঘাত করিতে উদ্যত হইলাম ; আমি কোন দুঃসংবাদ শুনার ফলে অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম এবং উহার ফলে কাঁদিতে লাগিলাম ; আমি কোন রসাত্মক কাহিনী শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলাম এবং হাসিতে লাগিলাম ;

আমি পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ একটি সর্প দেখিয়া ভীত হইলাম এবং তাহার ফলে দৌড়াইতে লাগিলাম। এই সব উদাহরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, সাধারণ বিশ্বাস অনুসারে প্রথমে আসে আবেগসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি (emotional experience or feeling) এবং তাহার ঠিক পরেই উহার কার্যভাবে আসে আবেগের দৈহিক প্রকাশ (emotional expression)।

আমেরিকার প্রখ্যাতনামা মনোবিৎ **উইলিয়ম জেম্‌স্** (William James) **এই প্রচলিত মতবাদ পরিত্যাগ করেন। তিনি বলেন যে, উত্তেজক ঘটনার সম্মুখীন হইবামাত্র বিভিন্ন দৈহিক পরিবর্তন আসে এবং এই সকল পরিবর্তন সম্বন্ধে যে অনুভূতি বা প্রতীতি জন্মে, তাহাকেই বলা হয় আবেগ (অর্থাৎ আবেগ সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা)**। সুতরাং জেম্‌সের মতে আমি প্রথমে আমার ক্ষতিকারককে দেখিয়া তাহাকে আঘাত করিলাম এবং তাহার পর ক্রোধ হইল; আমি প্রথমে কাঁদিতে লাগিলাম এবং তাহার ফলে দুঃখ হইল; আমি হাসিতে লাগিলাম এবং ফলে আমার আনন্দ হইল ইত্যাদি।[৮]

এ ক্ষেত্রে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জেম্‌স্ মনে করেন যে, তাঁহার এই মতবাদ তীব্র বা রুক্ষ আবেগের ক্ষেত্রেই প্রধানতঃ প্রযোজ্য।[৯]

জেম্‌স্-এর এই মতবাদ ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে প্রচারিত হয়। পরবর্তী সালে ডেনমার্কের কার্ল লাঙ্গে (Carl Lange) স্বাধীনভাবে অনুরূপ মত প্রকাশ

৮ James-এর ভাষায়: "My theory...is that *the bodily changes follow directly the perception of the exciting fact and that our feeling of the same changes as they occur* IS *the emotion.* Common-sense says we lose our fortune, are sorry and weep; we meet a bear, are frightened and run; we are insulted by a rival, are angry and strike. ...The more rational statement is that we feel sorry because we cry, angry because we strike, afraid because we tremble..." (*Principles of Psychology,* Vol. II, pp. 449-50).

৯ মৃদু আবেগ (softer emotion)-এর ক্ষেত্রে এই মত প্রযোজ্য হইবে কি না সে সম্বন্ধে জেম্‌স্ তত সুস্পষ্ট মত ব্যক্ত করেন নাই। তবে তাঁহার মতবাদ যে অত্যন্ত তীব্র, কঠোর বা রুক্ষ আবেগ (coarser emotions)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাহা তিনি সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। (*Ibid.*, p. 449).

করেন[১০]। তবে লাঙ্গে তাঁহার রচনায় বাহনিয়ামক প্রতিক্রিয়া (vasomotor reactions)-এর উপর এবং জেম্‌স্ আন্তরযন্ত্রীয় প্রতিক্রিয়া (visceral reactions)-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

যেহেতু জেম্‌স্ ও লাঙ্গের মতানুসারে দৈহিক পরিবর্তনের উপর আবেগ-সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা নির্ভরশীল, সেইজন্য এই দুইজনের মতকে **জেম্‌স্-লাঙ্গে মতবাদ** বলা হয়। এই মতকে সংক্ষেপে এই ভাবে ব্যক্ত করা যায়: উত্তেজক পরিস্থিতি→দৈহিক পরিবর্তন→দৈহিক পরিবর্তনজনিত সংবেদন বা অবগতি =আবেগের অভিজ্ঞতা।

সমালোচনা:

(১) জেম্‌স্-লাঙ্গে মতবাদ কোন পরীক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। জেম্‌স্ তাঁহার মতবাদের সপক্ষে কতকগুলি যুক্তির অবতারণা করেন। প্রথমে আমরা এই যুক্তিগুলির যথার্থ আলোচনা করিব।

(ক) জেম্‌স্ বলেন যে, যদি আমরা কোন তীব্র আবেগের কল্পনা করিবার কালে তাহার উপযুক্ত সকল দৈহিক প্রকাশগুলিকে কল্পনা না করি, তাহা হইলে ঐ আবেগের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।[১১] অর্থাৎ দৈহিক প্রকাশ ব্যতীত কোন আবেগই থাকিতে পারে না বা উহার চিন্তা ব্যতীত কোন আবেগের কল্পনা করা যায় না; যেমন, একজন লোক ক্রুদ্ধ হইয়াছে, অথচ তাহার গলার স্বর কর্কশ নহে, চক্ষু রক্তবর্ণ নহে, দেহে কোন কম্পন নাই (অর্থাৎ ক্রোধকালীন কোন দৈহিক প্রকাশই নাই), ইহা আমরা কল্পনা করিতে পারি না।

ইহার উত্তরে বলা যায় যে, তীব্র আবেগমাত্রই দৈহিক প্রকাশ থাকিবে, কিন্তু ইহার অর্থ নহে যে, দৈহিক প্রকাশগুলিই আবেগজনিত অনুভূতির কারণ। যদি দুইটি বস্তু বা গুণের মধ্যে সাহচর্য বা সহ-অবস্থিতি থাকে, তাহা হইলে সকল ক্ষেত্রে বলা যায় না যে, একটি অপরটির কারণ। স্বর্ণের অস্তিত্ব হলুদ বর্ণ ব্যতীত কল্পনা করা যায় না, কিন্তু উহা হইতে সিদ্ধান্ত করা

১০ প্রকৃতপক্ষে লাঙ্গে জেম্‌সের ন্যায় অত সুস্পষ্টভাবে তাঁহার মতকে ব্যক্ত করেন নাই। লাঙ্গে প্রশ্ন করেন: "Is it possible that vasomotor disturbances, varied dilation of the blood vessels and consequent excess of blood, in the separate organs, are the real primary effects of the affections, whereas the other phenomena are only secondary disturbances...?" (C. Lange, *The Emotions*, p. 58). সম্ভবতঃ লাঙ্গে মনে করিয়াছিলেন যে, এই প্রশ্নের উত্তর সদর্থক (affirmative) হইবে।

১১ জেম্‌সের ভাষায়: "If we fancy some strong emotion and then try to abstract from our consciousness of it all the feelings of bodily symptoms, we find we have nothing left behind." (*op. cit.*, p. 451).

যায় না যে, হলুদ রঙ্ স্বর্ণের কারণ। সেইরূপ একটি গাড়ী জোরে চলিতে থাকার সময় উহা কাঁপিতে থাকে; কিন্তু সেজন্য বলা যায় না যে, গাড়ীটি কাঁপিতেছে বলিয়াই উহা চলিতেছে।

(খ) জেম্‌স্ মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের (pathological cases-এর) কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, তাহাদের ক্ষেত্রে আবেগের প্রকাশ বস্তুকেন্দ্রিক নহে—অর্থাৎ বাহ্যজগতে উত্তেজক কোন পরিস্থিতি না থাকিলেও নানাপ্রকার আবেগসূচক দৈহিক প্রকাশ তাহাদের ঘটে। অনেক সময়ই দেখা যায় যে, অস্বভাবী (abnormal) ব্যক্তি অকারণে কাঁদিতেছে, হাসিতেছে, রাগিয়া উঠিতেছে ইত্যাদি।[১২] সেইরূপ পানোন্মত্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রেও সাময়িকভাবে কারণহীন বা প্রকৃত উত্তেজক বস্তুর সহিত সংস্রবহীন আবেগ দেখা যায়।

এই যুক্তির বিরুদ্ধে কয়েকটি আপত্তি উঠিতে পারে :

প্রথমতঃ, স্বভাবী মনের আলোচনার সময় অস্বভাবী মনের উপমা দান করা সকল ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত নহে। স্বভাবী মনের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে হয়ত' কোন একটি পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ না হইতে পারে বা বিশেষ কোন আবেগের অনুকূল না হইতে পারে; কিন্তু অস্বভাবী মনের দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্ন প্রকারের এবং কোন একটি পরিস্থিতি অস্বাভাবী মনের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আবেগসৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট উত্তেজনাপূর্ণ হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, মদ্যপ বা উন্মত্ত ব্যক্তি অনেক সময় বিশেষ বিশেষ মেজাজ (mood)-এ থাকে এবং ঐ সব ব্যক্তির মনে সর্বদাই উত্তেজনা (excitement)-এর উদ্ভব হয়। ফলে, অতি তুচ্ছ কোন কারণে তীব্র আবেগ হঠাৎ প্রকাশিত হয়।

(গ) জেম্‌স্ আরও বলেন যে, তাঁহার মতবাদ সত্য হইলে এই সিদ্ধান্তই হইবে যে, ইচ্ছাপূর্বক বা কৃত্রিম উপায়ে যদি কোন আবেগের উপযুক্ত বাহ্য প্রকাশগুলি অনুকরণ করা যায়, তাহা হইলে ঐ সব আবেগের উদ্ভব হইবে। জেম্‌স্ বলেন যে, বাস্তব ঘটনার সহিত এইরূপ সিদ্ধান্তের মিল আছে; অতএব ইহার যাথার্থ্য সম্বন্ধে তিনি সুনিশ্চিত।

আমাদের অভিজ্ঞতায় কিন্তু দেখিতে পাই যে, এই সিদ্ধান্ত সকল ক্ষেত্রে

---

১২ জেম্‌স্ বলেন : "The best proof that the immediate cause of emotions is a physical effect on the nerves is furnished by *those pathological cases in which the emotion is objectless.* ......The emotion here is nothing but the feeling of a bodily state, and it has a purely bodily cause." (*op. cit*, pp. 458-59).

সত্য নহে। প্রক্ষোভ বা আবেগের একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, উহা হঠাৎ জাগরিত হয় এবং একবার উঠিলে উহা চলিয়া যাইতে সময় লাগে। আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখি যে, অভিনেতা বা অভিনেত্রী রঙ্গমঞ্চের উপর শোকের অভিনয় করিলেন—হয়ত' বা করুণভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। ইহার ফলে যদি প্রকৃত শোকের অনুভূতি হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহা কিছুক্ষণ স্থায়ী হইত। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, শোকের অভিনয়ের পর যবনিকার অন্তরালে অভিনেতা স্বাভাবিক অবস্থাতেই আছেন (এমন কি, অভিনয়ের সাফল্যে হয়ত' বেশ উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন)। যদি প্রকৃত শোক হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এত দ্রুত উহার পরিবর্তন হইত না।[১৩] জেম্‌স্ এই প্রসঙ্গে উদাহরণ দিয়াছেন যে, ভীত ব্যক্তি দ্রুত পলাইতে থাকার ফলে তাহার ভয় বৃদ্ধি পায়, শোকগ্রস্ত ব্যক্তি করুণভাবে ক্রন্দন করার ফলে শোকের তীব্রতা বাড়িতে থাকে। কিন্তু এই সব উদাহরণ দ্বারা জেম্‌সের মতের সত্যতা প্রমাণিত হয় না। প্রথমে কোন ভয় বা দুঃখরূপ আবেগের যদি উদ্ভব না হইত, তাহা হইলে কেবলমাত্র পলায়ন বা কেবলমাত্র ক্রন্দনের ফলে উহাদের তীব্রতা বৃদ্ধির কোন প্রশ্নই উঠিত না। এই সব উদাহরণ দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, বাহ্য প্রকাশগুলি আবেগসমূহকে শক্তিশালী করিতে পারে, তাহাদের স্থায়িত্ব দীর্ঘতর করিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া উহাদের সূচনা বা প্রাথমিক উদ্ভব বাহ্য প্রকাশ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না।

(খ) সাধারণ বিশ্বাস এই যে, আবেগের সুষ্ঠু প্রকাশ ঘটিলে উহার তীব্রতা বৃদ্ধি না পাইয়া বরং কমিয়া যায়। অপরপক্ষে আবেগের যদি প্রকাশ না ঘটিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহা মানসিক বৈলক্ষণ্যের সৃষ্টি করে। জেম্‌স্ প্রচলিত এই বিশ্বাসের সমালোচনা করিয়াছেন এবং উহা পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়।[১৪]

১৩ জেম্‌স্ অবশ্য ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে, অভিনয়কালে অভিনেতৃগণ বাহ্য দৈহিক পরিবর্তনের অনুকরণের জন্য প্রকৃত আবেগ সকল সময় অনুভব করেন না (*Principles of Psychology*, Vol. II, p. 464)। কিন্তু তিনি এই সকল ব্যতিক্রমের কোন পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা দান করিতে পারেন নাই।

১৪ এইজন্য সাধারণ বিশ্বাস এই যে, যদি কেহ তীব্র শোক পায়, তাহার পক্ষে ক্রন্দন করা ভাল, কারণ ক্রন্দনের মাধ্যমে শোকের ভার কতকটা যেন কমিয়া যায়। কবি টেনিসন্ এই মতের প্রতিধ্বনি করিয়া তাঁহার এক কবিতায় বলিয়াছেন:

তবে জেম্‌স্ এই সাধারণ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়া ঠিক কী বলিতে চাহিয়াছেন, তাহা বুঝা কঠিন। তিনি প্রথমতঃ বলিয়াছেন যে, সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দৈহিক প্রকাশকালীন আবেগ এবং প্রকাশোত্তর আবেগের মধ্যে সুষ্ঠু পার্থক্য করা হয় নাই। তবে তিনি ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে, ক্রোধ বা ভয়ের উপযুক্ত বস্তুর উপস্থিতি সত্ত্বেও যদি উহাদের প্রকাশকে অবদমনের চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে উহা অন্য পথে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু দৈহিক প্রকাশের পথ রুদ্ধ হইলে জেম্‌সের মতানুসারে আবেগ অন্তর্হিত হওয়াই উচিত ছিল; তবে অন্য পথে উহা আত্মপ্রকাশ করে কেন?

জেম্‌স্ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, শিশুদের যখন আবেগপূর্ণ আচরণ সংযত করিতে বলা হয়, তখন তাহাদের অনুভূতির প্রাবল্য বাড়ে না; বরং চিন্তাশক্তির ক্ষমতা বাড়ে। কিন্তু এই উদাহরণেও জেম্‌সের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইল না; কারণ এই সকল ক্ষেত্রে যে সংযত শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার অর্থ কেবলমাত্র আবেগের দৈহিক প্রকাশের নিয়ন্ত্রণ নহে, তাহার অর্থ হইল আবেগানুভূতির প্রাথমিক নিয়ন্ত্রণ—অর্থাৎ এইরূপ শিক্ষায় কাম, ক্রোধ ইত্যাদি আবেগকেই নিয়ন্ত্রণ করিতে বলা হয়।

(২) আমরা উপরে জেম্‌স্-প্রদত্ত যুক্তিগুলির সমালোচনা করিলাম। ইহা ব্যতীত আমরা জেম্‌সের বিরুদ্ধে আরও কয়েকটি যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারি—

(ক) যদি কেবলমাত্র উদ্দীপকের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগের ফলেই দৈহিক পরিবর্তনের সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে মোটামুটি একই প্রকারের দুইটি অবস্থার সম্মুখীন হইলে ক্ষেত্রবিশেষে ভিন্ন প্রতিক্রিয়া হয় কি প্রকারে? যেমন, জেম্‌স্ ওয়ার্ড (James Ward) পরিহাস ছলে প্রশ্ন করিয়াছেন: যদি জেম্‌স্ প্রথমে একটি পিঞ্জরাবদ্ধ ভল্লুক দেখেন এবং তাহার পর পিঞ্জরমুক্ত স্বাধীন ভল্লুক দেখেন, তাহা হইলে তিনি প্রথমটির ক্ষেত্রে কিছু ভোজ্য দ্রব্য

"Home they brought her warrior dead;
She nor swooned nor uttered cry;
All the maidens watching, said,
"She must weep or she will die."

জেম্‌স্-এর বিরুদ্ধ যুক্তির জন্য তাঁহার *Principles*, Vol. II, p. 466, 3rd. Objection ও Reply দ্রষ্টব্য।

কেন দিবেন এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে কেন দিবেন "চম্পটি পরিপাটি" ? ইহার কারণ হইল আমরা প্রতিটি উদ্দীপকের ব্যাখ্যা করি অর্থাৎ সমগ্র পরিস্থিতির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করি। পিঞ্জরাবদ্ধ ভল্লুককে নিরাপদ মনে করা হয় এবং পিঞ্জর হইতে উন্মুক্ত ভল্লুককে বিপদ্‌জনক মনে করা হয় বলিয়াই প্রতিক্রিয়া তথা আবেগের তারতম্য ঘটে।

(খ) তাহা ছাড়া, আবেগগুলি কোন-না-কোন সহজ প্রবৃত্তির সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে এবং উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হইলে ঐ প্রবৃত্তি জাগরিত হয় এবং উহা আমাদের যুগপৎ কার্যে প্রবৃত্ত করে ও বিশেষ আবেগের সৃষ্টি করে। জেম্‌স্ সহজপ্রবৃত্তি ও আবেগের এই সম্বন্ধের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করেন নাই।[১৫]

(গ) যদি দৈহিক পরিবর্তন আবেগের কারণ হয়, তাহা হইলে একই প্রকার পরিবর্তন বিভিন্ন প্রকার আবেগের এবং আবেগহীন অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারিত না। যেমন, ক্রোধ, ভয়, ম্যালেরিয়া জ্বর ইত্যাদি বিভিন্ন অবস্থায় দৈহিক কম্পন থাকা কিভাবে সম্ভব হয়? দৈহিক কম্পন যদি ক্রোধের কারণ হয়, তাহা হইলে তাহা ভয়ের কারণ হইবে কি প্রকারে?

(৩) আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, জেম্‌স্ বা লাঙ্গে কেহই পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত কোন উপাত্তের (experimental data-র) ভিত্তিতে তাঁহাদের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। আধুনিককালে কয়েকজন মনোবিৎ জেম্‌স্-লাঙ্গে মতবাদের যাথার্থ্য নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষণের সাহায্য লইয়াছেন ; কিন্তু পরীক্ষণপ্রাপ্ত উপাত্তসমূহ এই মতবাদকে সমর্থন করে না।

(ক) শেরিংটন (Sherrington) একটি কুকুরীর উপর এক বিশেষ পরীক্ষণ করেন—তিনি অস্ত্রোপচার দ্বারা উহার মেরুদণ্ডের গলদেশের অংশ (cervical spinal cord) এবং 'ভ্রাম্যমাণ স্নায়ু' (vagus nerve)

১৫ জেম্‌সের মতবাদের সমালোচনা করিয়া McDougall বলিয়াছেন : "...conative experience cannot be reduced to or identified with sensory experience... the *felt* impulse is an essential part of all instinctive reactions...Hence the ordinary statement, 'I struck because I was angry' is truer,...for ...the person whom I struck had so behaved as to provoke in me the impulse of the *combative instinct*..." (*Outlines of Psychology*, p. 328).

নামক মস্তিষ্ক স্নায়ু (cranial nerve) কাটিয়া দেন। ইহার ফলে মস্তিষ্কের সহিত হৃদ্‌যন্ত্র, উদর ইত্যাদির সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং তাহার আন্তরযন্ত্রীয় নিষ্ক্রিয়তা (visceral paralysis) দেখা দেয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহার ক্রোধ, আনন্দ, বিরক্তি, কাম ইত্যাদি সকল আবেগই প্রকাশ পাইত—এমন কি অপর কুকুরের মাংস খাইতে কুকুরের যে স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা তাহাও দেখা যাইত।

(খ) ক্যানন্ (Cannon) এবং তাঁহার সহিত লুইস্ (Lewis) ও ব্রিটন (Britton) অনুরূপ পরীক্ষণ বিড়ালের উপর করেন। তাঁহারা কয়েকটি বিড়ালের সমগ্র স্বতঃক্রিয় স্নায়ুযন্ত্রটি অস্ত্রোপচারের সাহায্যে অপসারিত করেন। ইহার ফলে এ্যাড্রিনাল গ্রন্থি হইতে অধিক পরিমাণ রসক্ষরণ, পাকযন্ত্রের কার্যের ব্যাঘাত, রোমাঞ্চন ইত্যাদি কোন কিছুই হইতে পারিত না। তাহা সত্ত্বেও বিড়ালগুলি অপরিচিত কুকুরের চীৎকার শুনিলে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিত এবং (রোমাঞ্চন ব্যতীত) ক্রোধের সকল লক্ষণই তাহাদের মধ্যে প্রকাশ পাইত।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যে সব জীবের ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপায়ে আন্তরযন্ত্রীয় (visceral) এবং বাহনিয়ামক (vasomotor) প্রতিক্রিয়ার পথ রুদ্ধ বা ব্যাহত করা হইয়াছে, তাহাদের ক্ষেত্রেও ক্রোধের বা অন্য কোন আবেগের সকল লক্ষণ বাহ্যতঃ প্রকাশ পাইত।

(গ) মানুষের ক্ষেত্রে ক্যানন্ দেখিয়াছেন যে, এ্যাড্রিনাল-নিঃসৃত হরমোন্ 'এ্যাড্রিনিন্' ইন্‌জেক্‌সন্ দিলে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বাড়ে, নাড়ী দ্রুতগতিতে চলে, রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায় ইত্যাদি—অর্থাৎ ক্রোধের সময় যে সব লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা সবই উৎপন্ন হয়; অথচ পরীক্ষণ-পাত্রকে (অর্থাৎ যাহাকে ঐরূপ ইন্‌জেক্‌সন্ দেওয়া হইয়াছে) যদি প্রশ্ন করা যায় যে, তাহার ক্রোধ হইতেছে কি না, সে উত্তরে বলে 'না'।

ক্যানন্ এই প্রসঙ্গে আরও যুক্তি দেখাইয়াছেন যে, যদি আন্তরযন্ত্রীয় প্রতিক্রিয়াই আবেগের প্রত্যক্ষ কারণ হইত, তাহা হইলে বিভিন্ন আবেগের ক্ষেত্রে একই প্রকার পরিবর্তন ঘটিত না। তাহা ছাড়া, আন্তরযন্ত্রের সাধারণ কার্য সম্বন্ধে আমাদের অবগতি জন্মে না এবং সহজে উহারা উদ্দীপিত

হয় না ; সুতরাং উহারা তীব্র আবেগানুভূতির প্রত্যক্ষ কারণ হওয়ার সম্ভাবনা কম।[১৬]

(খ) ক্যানন্‌-বার্ড মতবাদ (Cannon-Bard Theory of Emotion) :

পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্তের ভিত্তিতে ক্যানন্ জেম্‌স্‌-লাঙ্গে মতবাদ পরিহার করেন। ইহার পরিবর্তে তিনি আর একটি মতবাদ প্রবর্তন করেন। ইহাতে **তিনি মধ্যমস্তিষ্ক, বিশেষতঃ থ্যালামাসের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন**। এই মতবাদ সম্বন্ধে তিনি যে সমস্ত পরীক্ষণ চালাইয়াছিলেন তাহাতে ফিলিপ্ বার্ড (Philip Bard) তাঁহার সহযোগিতা করেন। এইজন্য এই মতবাদ যুক্তভাবে ক্যানন্-বার্ড মতবাদ নামে সুপরিচিত। অবশ্য ক্যানন্ এই প্রসঙ্গে ডঃ হেড্ (Dr. Head)-পরিচালিত পরীক্ষণের ফলাফল দ্বারাও প্রভাবিত হইয়াছিলেন। যেহেতু এই মতবাদে থ্যালামাসের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে, সেইজন্য ইহা বিকল্পভাবে 'থ্যালামাস-অধিষ্ঠান মতবাদ' (Thalamic theory of Emotion) এবং 'মস্তিষ্কাধিষ্ঠান মতবাদ' (Central theory of Emotion) নামেও পরিচিত। অপরপক্ষে, জেম্‌স্-লাঙ্গে মতবাদ 'ইন্দ্রিয়প্রান্ত উদ্দীপন মতবাদ' (Peripheral Theory) নামে খ্যাত।

ক্যাননের মতবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, তিনি থ্যালামাসের উপরই প্রাধান্য আরোপ করেন। তিনি বলেন যে, **গুরুমস্তিষ্কের সহিত থ্যালামাসের মিথস্ক্রিয়ার ফলেই আবেগের উদ্ভব হয়**। ক্যানন্

---

১৬ Cannon তাঁহার যুক্তির মূলসূত্রগুলি এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন :

(1) "Total separation of the viscera from the central nervous system does not alter emotional behaviour."

(2) "The same visceral changes occur in very different emotional states and in non-emotional states."

(3) "The viscera are relatively insensitive structures and cannot supply the nerve processes necessary for intense and elaborate emotion."

(4) "Visceral changes are too slow to be a source of emotional feeling."

(5) "Artificial induction of the visceral changes typical of strong emotions does not produce them."

বিড়ালের উপর পরীক্ষণ করেন—তিনি অস্ত্রোপচারের দ্বারা বিড়ালের গুরুমস্তিষ্ক অপসারিত করেন; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উহারা উত্তেজিত হইলে ক্রোধের প্রকাশ ঘটিত (এবং সম্ভবতঃ অবস্থান্তরে অন্য আবেগও প্রকাশ পাইতে পারিত)। সুতরাং ক্যানন্ সিদ্ধান্ত করেন যে, গুরুমস্তিষ্কের নিম্নাঞ্চল হইতে আবেগের উপযুক্ত প্রকাশের জন্য উদ্দীপন আসে। ক্যাননের পর বার্ড প্রায় পঞ্চাশটি বিড়ালের উপর পরীক্ষণ করেন—তিনি গুরুমস্তিষ্ক (cerebrum) এবং মস্তিষ্ককাণ্ড (brain-stem)-এর বিভিন্ন অংশ অপসারণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ন যে, **আবেগ-প্রকাশের উপযুক্ত উদ্দীপন আসে থ্যালামাসের নিম্নভাগ হইতে।**

ক্যানন্, বার্ড ও তাঁহাদের সমর্থকদের মূল বক্তব্য হইল যে, থ্যালামাসের নিম্নাঞ্চল—যাহা হিপোথ্যালামাস্ (পৃঃ ১৬৯) নামে পরিচিত—আবেগের অধিষ্ঠান ('seat of Emotion')। উত্তেজক পরিস্থিতি অবলোকন করার ফলে উদ্দীপন অন্তর্মুখী স্নায়ুর মাধ্যমে থ্যালামাসে পৌঁছে। থ্যালামাস্ তথা হিপোথ্যালামাস্ উদ্দীপিত হইলে যুগপৎ উদ্দীপন মস্তিষ্কে পৌঁছে এবং বহির্মুখী স্নায়ুপথে উত্তেজনা পরিচালিত হইয়া আন্তরযন্ত্র, নালিকাবিহীন গ্রন্থি ইত্যাদি উদ্দীপিত করে। আবার ইহারা উদ্দীপিত হইলে যে সকল পরিবর্তন সূচিত হয়, সেই সকল পরিবর্তনজনিত যে সংবেদনের সৃষ্টি হয়, তাহা আবেগ-বিশেষকে তীব্রতর বা শক্তিশালী (reinforced) করিয়া তোলে।[১৭] তাহা ছাড়া, যখন আবেগ-প্রকাশের আর প্রয়োজনীয়তা থাকে না, তখন গুরুমস্তিষ্ক আর একটি পথে উহার প্রকাশকে নিয়ন্ত্রণ বা বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করে।

কয়েকটি বিশেষ রোগগ্রস্ত ব্যক্তির রোগের লক্ষণ ক্যাননের মতের সপক্ষে যায়। গুরুমস্তিষ্কের চেষ্টাধিষ্ঠান (motor area)-তে আঘাতের ফলে এক ব্যক্তির আংশিক পক্ষাঘাত (hemiphlegia বা partial paralysis) হয় এবং সে একটি দিকে তাহার মাথা ঘুরাইতে পারিত না। কিন্তু যখন সে কোন কারণে আনন্দিত হইত, তখন তাহার মুখমণ্ডলের উভয় দিকই

---

১৭ ক্যাননের বহু পূর্বে ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে বেক্‌টেরেভ্ (Bechterev) পরীক্ষণের ফলে লক্ষ্য করেন যে, গুরুমস্তিষ্ক অপসারিত করিলেও প্রাণিবিশেষের ক্ষেত্রে আবেগের প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু থ্যালামাস্ না থাকিলে উহা প্রকাশ পায় না।

আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত; আবার বিষণ্ণাবস্থায় মুখমণ্ডলের উভয় দিকই বিষাদগ্রস্ত ভাব ধারণ করিত। তাহার থ্যালামাস্ সম্পূর্ণরূপে সুস্থ থাকার ফলে ইহা সম্ভব হইত। অপরপক্ষে, আর একটি রোগীর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সে দুই দিকেই ইচ্ছা করিলে তাহার মাথা ঘুরাইতে পারিত, কিন্তু যখন সে হাসিত, তখন মাত্র একদিকের গণ্ডদেশ হাস্যোদ্ভাসিত হইয়া উঠিত এবং অপর দিক্ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিত। অস্ত্রোপচারের ফলে দেখা যায় যে, তাহার থ্যালামাসের একদিকে একটি ছোট 'আব্' (tumour) হইয়াছিল।

অবশ্য ক্যাননের মত সকলে গ্রহণ করেন না এবং ইহার বিরুদ্ধ সমালোচনাও হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, থ্যালামাস্-উদ্দীপনের ফলে যে উদ্দীপনের সৃষ্টি হয় তাহা অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ এবং সম্ভবতঃ তাহা সকল উত্তেজনাপূর্ণ আবেগের কারণ হইতে পারে না।

জেম্‌স্-লাঙ্গে মতবাদের সহিত ক্যানন্-বার্ড মতের তুলনা ঃ

ক্যানন্-বার্ড মতের সহিত জেম্‌স্-লাঙ্গে মতবাদের প্রধান পার্থক্য হইল এইরূপ ঃ

জেম্‌সের মতে উত্তেজক অবস্থার সম্মুখীন হইলেই ব্যক্তি-বিশেষের আন্তরযন্ত্রীয় প্রতিক্রিয়া হয় এবং এই কারণে যে সংবেদনের সৃষ্টি হয় তাহাই হইল আবেগসম্বন্ধীয় অনুভূতি। অপর পক্ষে ক্যানন্ ও তাঁহার সমর্থকেরা বলেন যে, উত্তেজক অবস্থার সম্মুখীন হইলে হিপোথ্যালামাস উদ্দীপিত হয় এবং ইহারই ফলে যুগপৎ আবেগসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা এবং আন্তরযন্ত্রীয় ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়[১৮]। সংক্ষেপে বলিতে গেলে,

(১) জেম্‌স্ ও লাঙ্গের মতে ঃ

উত্তেজক পরিস্থিতি→আন্তরযন্ত্রীয় পরিবর্তন→আবেগ।

(২) ক্যানন্ ও বার্ডের মতে ঃ

উত্তেজক পরিস্থিতি→হিপোথ্যালামাসের উদ্দীপন ↗ আবেগ ↘ আন্তরযন্ত্রীয় পরিবর্তন

১৮ কোন কোন লেখক (যথা, M. A. Wenger) মনে করেন যে, ইন্দ্রিয়-প্রান্ত উদ্দীপন মতবাদ (Peripheral Theory) এবং থ্যালামাস্-অধিষ্ঠান মতবাদ (Thalamic Theory) এই দুই-এর মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই—পার্থক্য হইল পরিভাষাগত। (M. L. Reymert-সম্পাদিত *Feelings and Emotions*, p. 7 দ্রষ্টব্য)।

নিম্নাঙ্কিত চিত্রদ্বয়ের (২নং ও ৩নং) সাহায্যেও এই দুই মতের পার্থক্য অনুধাবন করা যাইতে পারে :
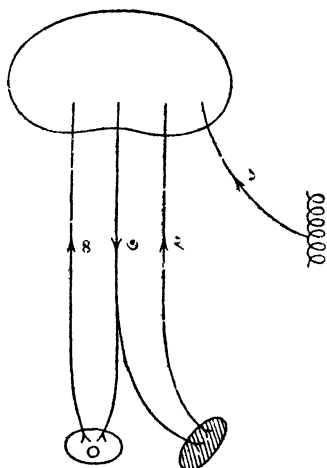
২নং চিত্র।

উপরের চিত্র জেম্‌স্‌-লাঙ্গে মতবাদের ইঙ্গিত করিতেছে।

উপরস্থ এই চিত্রটি জেম্‌স্‌-লাঙ্গে মতবাদকে ইঙ্গিত করিতেছে। এই অনুসারে ১নং স্নায়ুপথে আবেগ-সৃষ্টিকারী বস্তু হইতে উদ্দীপন মস্তিষ্কে পৌছে। মস্তিষ্ক হইতে ৩নং স্নায়ুপথে উত্তেজনা আন্তরযন্ত্র ও পেশীতে পৌছে এবং উহারা উদ্দীপিত হয় ও দৈহিক পরিবর্তন ঘটে। ঐ পরিবর্তন-জনিত উদ্দীপন পেশী হইতে ২নং পথে এবং আন্তরযন্ত্র হইতে ৪নং পথে মস্তিষ্কে পৌছে এবং তখনই আবেগসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা (emotional experience) জন্মে।

পরপৃষ্ঠার চিত্রটি (৩নং চিত্র) ক্যানন্‌-বার্ড মতবাদকে ইঙ্গিত করিতেছে। এই মতানুসারে ১নং পথে উদ্দীপন মস্তিষ্কে পৌছে। এই উদ্দীপন থ্যালামাসের মধ্য দিয়া যাইবার ফলে উহা থ্যালামাসকে (ও তৎসহ হিপোথ্যালামাসকে) উদ্দীপিত করে। হিপোথ্যালামাস্‌ উদ্দীপিত হওয়ায় ২নং পথে ক্রিয়াশক্তি আন্তরযন্ত্র ও পেশীতে পরিবাহিত ঘটে। ঐ একই সময় ৪নং পথে থ্যালামাস্‌ গুরুমস্তিষ্কে উদ্দীপন প্রেরণ করে এবং উহার ফলে আবেগ-সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা (emotional experience) জন্মে। কিন্তু বহুক্ষণ ধরিয়া আবেগের প্রকাশ বাঞ্ছনীয় নহে; উহাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার

জন্য ৩নং পথে মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভূত শক্তি আসিয়া হিপোথ্যালামাসে বাধ (inhibition)-এর সৃষ্টি করে এবং ক্রমশঃ আবেগের প্রকাশ বন্ধ হয়।[১৯]
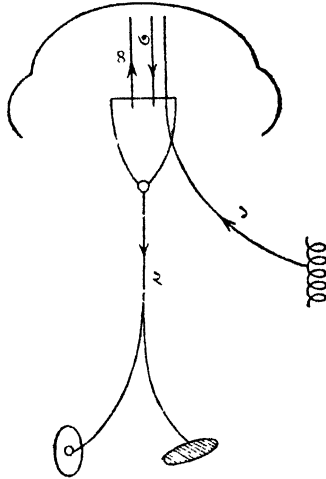
৩ নং চিত্র।

উপরের চিত্র ক্যানন্-বার্ড মতবাদের নির্দেশ করিতেছে।

সাম্প্রতিক কালের একদল লেখক (যথা, ফ্রীম্যান্ ইত্যাদি) মনে করেন যে, জেম্স্-লাঙ্গে ও ক্যানন্-বার্ড মতের সমন্বয়ই বাঞ্ছনীয়। আবেগ সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা ও আবেগের দৈহিক প্রকাশ এই দুইটির কোন্‌টি আগে, আর কোন্‌টি পরে এ প্রশ্ন নিরর্থক, কারণ আবেগ বলিতে উহার অভিজ্ঞতা ও দৈহিক প্রকাশ এই দুইটির সংযুক্ত এক অবস্থা বুঝায়। তাহা ছাড়া, হিপোথ্যালামাস্ কর্তৃক উদ্দীপিত আন্তর-যন্ত্রের ক্রিয়া এবং ঐ সকল ক্রিয়াজনিত যান্ত্রিক সংবেদন মিশিয়া জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। (এই মতবাদকে ফ্রীম্যান্ Dynamotor Theory of Emotion নাম দিয়াছেন)।

৯। আবেগকালীন দৈহিক প্রকাশের উদ্ভব সম্বন্ধে বিবিধ মতবাদ (Different Theories relating to the origin of Emotional expressions) :

আবেগের দৈহিক পরিবর্তন প্রধানতঃ দুই প্রকারের—আন্তর ও বাহ্য। আন্তর পরিবর্তন নানা প্রকারের হইতে পারে এবং ইহার মূলে আছে

১৯ *Psychological Review*, Vol. 38 (1931) p. 282 দ্রষ্টব্য।

স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়া (৭ম অনুচ্ছেদ, পৃঃ ৪৯৪-৯৫)। বলা বাহুল্য আবেগকালীন দৈহিক পরিবর্তন দেহাভ্যন্তরেই সীমিত থাকে না—নানাভাবে বহির্জগতে উহা আত্মপ্রকাশ করে এবং এইগুলি লক্ষ্য করিয়াই আমরা ব্যক্তিবিশেষের মানসিক অবস্থা অনুমান করি।

আবেগকালীন বাহ্য আচরণগুলির মধ্যে অধিকাংশ হইল শিক্ষা-নিরপেক্ষ (unlearned) বা সহজাত (innate); যেমন, হাস্য করা, ক্রন্দন করা, চীৎকার করা, লম্ফ-ঝম্ফ করা ইত্যাদি। আবার কতকগুলি বাহ্য আবরণ শিক্ষালব্ধ (learned)—শিক্ষার দ্বারা আমরা সহজাত প্রকাশগুলি কিছু পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিবার অভ্যাস করি (যেমন, লোকসমক্ষে হাস্য, ক্রন্দন ইত্যাদির প্রকাশকে সংযত করিবার অভ্যাস করি অথবা বিশেষ ভঙ্গিমায় উহাদের প্রকাশ করিতে শিখি)। আবার নূতন নূতন প্রকাশ ভঙ্গিমা আয়ত্ত করিতে শিখি এবং যেখানে ভাষার সাহায্যে আবেগ প্রকাশ করিতে হয়, সেখানে নানাভাবে ভাষাও আয়ত্ত করি ; অর্থাৎ বিস্ময়, লজ্জা, ঘৃণা ইত্যাদি প্রকাশ করিবার জন্য বিভিন্ন ভঙ্গিমা (যেমন, নিজের গণ্ডদেশে হাত দেওয়া ইত্যাদি) শিক্ষা করি এবং বিভিন্ন প্রকার ভাষা ব্যবহারও (যথা, এমা, ওমা, ইস্, ছি-ছি ইত্যাদি বলা) শিখি।

এখন প্রশ্ন হইল : কেন এক এক প্রকার আবেগ প্রকাশ করিবার জন্য এক এক প্রকারের প্রকাশ-ভঙ্গিমা দেখা দেয়? রাগ বা ক্রোধের সময় আমরা যে-ভাবে আত্মপ্রকাশ করি, ভয়ের সময় আমরা সে-ভাবে আচরণ করি না কেন? বিবর্তনবাদের দৃষ্টিভঙ্গী (evolutionary standpoint) হইতে ডারউইন্, স্পেন্সার ইত্যাদি এই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, কতকগুলি বাহ্য আচরণ হইল অতীতে প্রয়োজনীয় ছিল এইরূপ আচরণের শেষ চিহ্ন বা দুর্বলতর প্রকাশ। সুদূর অতীতে মানুষ ক্রুদ্ধ হইলে তাহার বিপক্ষকে দাঁত দিয়া কামড়াইয়া দিত, নখ দিয়া চিরিয়া দিত ও কিল-চড় ইত্যাদি বসাইত ; আজ সে সভ্যতার প্রভাবে কেবল দাঁত কড়মড় করে, ঘুঁষি পাকায় ইত্যাদি। আবার কতকগুলি আচরণ হইল এমন যে, সেগুলি বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের সহিত সংযুক্ত ছিল, কিন্তু সেইরূপ ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তু না থাকিলেও আচরণগুলি প্রকাশ পায়। যেমন, নাসিকা মধ্যে দুর্গন্ধ প্রবেশ করিলে আমরা নাক ঝাড়িয়া তাহার প্রবেশ রোধ করিবার চেষ্টা করি ;

সেইরূপ কোন কাহিনী শ্রবণ করিয়া ঘৃণার উদ্রেক হইলে অনেকে মুখে ঘৃণাসূচক ধ্বনি করিবার সময় 'নাক ঝাড়ার' ন্যায় শব্দ করে। কোন কিছু বীভৎস ঘটনা চক্ষুর সম্মুখে ঘটিতে দেখিলে আমরা চক্ষু বুজিয়া ফেলি; সেইরূপ কোন বীভৎস ঘটনার কাহিনী শুনিবার সময় কেহ কেহ চক্ষু বুজিয়া ফেলে।

যদিও আবেগের মুহূর্তে সুচিন্তিত উপায়ে কোন উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব নহে, তাহা হইলেও আবেগকালীন দৈহিক প্রকাশসমূহ অনেকাংশে প্রতিযোজনমূলক (adaptive movements)। ম্যাক্‌ডুগাল্‌ ইত্যাদি মনে করেন যে, যেহেতু প্রধান প্রধান আবেগসমূহ এক একটি সহজাত বৃত্তির সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে, সেই হেতু আবেগকালীন দৈহিক প্রকাশসমূহ স্বতঃই ঐ সকল বৃত্তির লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সাধনের দিকে পরিচালিত হয়। ক্রোধের সহিত যুক্ত আছে "যুদ্ধং দেহি"-মনোভাব (combative instinct); সেইজন্য ক্রোধকালীন আচরণসমূহ বিপক্ষকে পরাভূত করা, শাস্তি দেওয়া ইত্যাদি উদ্দেশ্য সাধনের উপযুক্ত। আবার এই সকল বাহ্য আচরণের সময় দেহাভ্যন্তরে যে সমস্ত পরিবর্তন (internal changes) ঘটে, সেইগুলিও ঐরূপ উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক (auxiliary)। যেমন, রাগ বা ভয়ের সময় পাকস্থলীর কার্য ব্যাহত হয়, কারণ ঐরূপ কার্যের জন্য যে পরিমাণ রক্তের প্রয়োজন তাহা পেশীতে চালিত হইলে শত্রুকে পরাভূত করার বা শত্রুর নিকট হইতে পলায়ন করার সুবিধা হয়। সেইরূপ উত্তেজনার সময় এ্যাড্রিনাল গ্রন্থি হইতে এ্যাড্রিনিন্‌ নিঃসৃত হইয়া লিভার হইতে শর্করা নির্গমনে সহায়তা করে এবং এই শর্করা দেহে শক্তির সৃষ্টি করে। (পৃঃ ২৬৩ দ্রষ্টব্য)।

ম্যাক্‌ডুগালের মতবাদকে একটি সুষ্ঠু প্রকল্প (valid hypothesis) ভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। তবে আবেগকালীন সকল আচরণকেই প্রতিযোজনমূলক বলা যাইতে পারে কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। মধ্যে মধ্যে এরূপ হয় যে, অতিরিক্ত ভয় হইলে আমরা ভীতিজনক বস্তুর সম্মুখ হইতে পলায়ন করিতে পারি না এবং ভয়ে নিশ্চল হইয়া পড়ি—এরূপ আচরণকে সম্ভবতঃ প্রতিযোজনমূলক বলা ঠিক হইবে না।

১০। (ক) মেজাজ (Emotional mood) ও স্বভাব (Emotional disposition):

যখন আমরা কাহারও উপর ক্রুদ্ধ হইলাম বা ভয়ঙ্কর কোন

দেখিয়া ভীত হইলাম, তখন আমাদের মানসিক অবস্থাকে বলা হয় প্রক্ষোভ বা আবেগ। এইরূপ আবেগের প্রকাশ আকস্মিকভাবে ঘটে এবং আকস্মিকভাবে ঘটিয়া উহা নিজেকে যেন নিঃশেষ করিয়া ফেলে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে এইরূপ হয় যে, কাহারও উপর বিশেষভাবে ক্রুদ্ধ না হইলেও মন বিরক্তিকর বা খিটখিটে (irritable) অবস্থায় থাকে; সেইরূপ বিশেষ কোন কিছু লইয়া দুঃখিত না হইলেও মন একটি বিষাদগ্রস্ত (melancholic) অবস্থায় থাকিতে পারে। এইরূপ অবস্থাকে 'মেজাজ' (mood) বলে।[২০] **মেজাজ আবেগ অপেক্ষা অধিকতর স্থায়ী হয়, অথচ আবেগের ন্যায় ইহা কোন বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তি বা পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করিয়া থাকে না—ইহার স্থায়িত্বকালে বিভিন্ন ব্যক্তি বা বস্তু বা পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করিয়া অতি তুচ্ছ কারণেও ইহা হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে।**

মেজাজের উৎপত্তি বিভিন্ন কারণে হইতে পারে—যেমন, কোন একটি আবেগের প্রকাশ ব্যাহত হইলে, শারীরিক কোন অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটিলে ইত্যাদি। রাত্রিতে অনিদ্রা ঘটিলে অনেক সময় প্রাতঃকালে একটা বিরক্তিবোধ আসে এবং ঐ বিরক্তি কখনও খবরের কাগজের উপর, কখনও বা প্রাতরাশের উপর, কখনও বা ব্যক্তি-বিশেষের উপর সামান্য কারণেই প্রকাশ পাইতে পারে। সেইরূপ একজন ছাত্র কলেজে অধ্যাপক দ্বারা কোন কারণে তিরস্কৃত হইয়া সেখানে ক্রোধ প্রকাশ করিতে পারিল না; কিন্তু বাড়ী আসিয়া ছোট ভাইবোনদের সামান্য কারণে মারিল, মা'র সঙ্গে ঝগড়া করিল, খাবারের থালা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। সেইরূপ পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করিয়া কৃতী ছাত্র উৎফুল্ল হইয়া উঠিল (অর্থাৎ cheerful mood-এ রহিল)—সে বন্ধুবান্ধবদের খাওয়াইল, সিনেমা দেখিল, ভিখারীকে দান করিল ইত্যাদি।

---

২০ **তুলনীয়:** (১) "Mood is an affective condition or attitude, enduring for some time, characterized by particular emotions in a condition of subexcitation, so as to be readily evoked, e. g., an irritable mood, or a cheerful mood." (J. Drever's *A Dictionary of Psychology*).

(২) "An emotional mood...tends to persist when once it is aroused and to fasten upon any object which presents itself...The cook angered by her mistress will box the ears of the scullion." (Stout, *Manual*, p. 364).

স্বভাব (Disposition)[২১] হইল মেজাজ অপেক্ষা অধিকতর দীর্ঘকাল স্থায়ী—ইহা ব্যক্তি-বিশেষ জীবদ্দশায় আয়ত্ত করিতে পারে, অথবা ইহা সহজাতও হইতে পারে। **স্বভাব কোন একটি বিশেষ অনুভূতি বা আবেগের প্রকাশ নহে—ইহা হইল কোন কিছুকে কেন্দ্র করিয়া বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ আবেগ অনুভব করা এবং তদনুযায়ী কার্য করা।** যেমন, মাতা তাঁহার স্নেহশীল স্বভাব (affectionate disposition)-এর জন্য তাঁহার সন্তানের ক্ষেত্রে অবস্থানুযায়ী বিবিধ আবেগ বোধ করেন। তিনি সর্বদাই যে একটি আবেগময় অবস্থায় থাকেন তাহা নহে ; তবে অবস্থার পরিবর্তন অনুযায়ী সন্তানের সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ, আশায় আশা ইত্যাদি ভাবাবেগ অনুভব করেন।

মেজাজ ও স্বভাবের পরস্পরের সহিত তুলনা করিলে নিম্নলিখিত পার্থক্য পাওয়া যায় :

(ক) মেজাজ হইল অপেক্ষাকৃত স্বল্পস্থায়ী; কিন্তু স্বভাব হইল দীর্ঘস্থায়ী বা একেবারে স্থায়ী।

(খ) মেজাজের প্রকাশ একটি আবেগের মাধ্যমে হয়। যেমন, যে খিটখিটে মেজাজে আছে, তাহার মেজাজের প্রকাশ ঘটে ক্রোধের মাধ্যমে, যে আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় (panicky mood-এ) আছে, তাহার প্রকাশ ঘটে কেবল ভয়ের মাধ্যমে। কিন্তু স্বভাবের প্রকাশ বিভিন্ন আবেগের মাধ্যমে ঘটিতে পারে ; যেমন, উপরের উদাহরণে আমরা দেখিয়াছি যে, মাতার স্নেহশীল স্বভাবের প্রকাশ আনন্দ, ভয় ক্রোধ ইত্যাদি বিবিধ আবেগের মাধ্যমে ঘটিতে পারে।

(গ) মেজাজের ক্ষেত্রে আবেগের বিষয়বস্তু বহুবিধ হইতে পারে (যেমন, উপরের উদাহরণে আমরা দেখিয়াছি, যে তুচ্ছ কারণে বিভিন্ন বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া ইহা প্রকাশ পায়।) অপরপক্ষে, স্বভাবের প্রকাশক আবেগ একটি সময়ে একটি বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া প্রকাশ পায়।

---

২১ Disposition-পদের অন্যতম সংজ্ঞা হিসাবে Drever বলেন যে, ইহা হইল "...individual's totality of natural tendencies to act in certain ways—usually with emphasis on *affective* and *impulsive* aspects". (*Dictionary of Psychology*).

(ঘ) মেজাজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ব্যক্তি-বিশেষ অল্পাধিক সচেতন থাকে; যেমন, ব্যক্তি-বিশেষ অপরকে সতর্ক করিতে পারে, 'আমি এখন চটিয়া আছি; আমাকে বিরক্ত করিও না'। স্বভাব সাধারণতঃ চেতনার অগোচরে থাকিয়াই মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে; যেমন, স্নেহশীলা মাতা তাঁহার স্নেহের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকিয়া কার্য করেন না।

(খ) অতিরাগ (Passion) এবং আয়ান (Temperament):

'অতিরাগ' পদটির অর্থ সুস্পষ্ট নহে। ইহা কোন বিষয় বা বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি অত্যধিক অনুরাগ বা আকর্ষণ ইঙ্গিত করে; যেমন, "তাস খেলার উপর তাহার অতিরাগ আছে"—ইহার অর্থ ঐ বিষয় তাহার অত্যধিক আসক্তি আছে। অনেক সময় আবার নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে যাহা সমর্থনীয় নহে তাহার প্রতি অতিরিক্ত আবেগপ্রবণতা ও আসক্তি বুঝাইবার জন্যও এই পদটি ব্যবহৃত হয়। আবার যে কোন আবেগের তীব্র প্রকাশকেও অতিরাগ (Passion)[২২] বলে।

তবে মনোবিদ্যায় একটি বিশেষ অর্থে ইহা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। **যদি কোন আবেগের প্রকাশের পথ রুদ্ধ হয় এবং তাহাকে মনের সঙ্গোপনে পোষণ করা হয়, তাহা হইলে অতিরাগ জন্মে এবং উহা কোন বিশেষ মুহূর্তে তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে।** যেমন, ক্রোধ একটি আবেগ; ইহাকে ব্যক্তি-বিশেষ প্রকাশ করিতে দিল না, কিন্তু সযত্নে পোষণ করিতে লাগিল (অর্থাৎ যাহার প্রতি আক্রোশ, তাহার অন্যায়ের কথা ভুলিল না)—ইহার ফলে প্রতিহিংসার ভাব (revengefulness) জন্মিল। সুতরাং ইহা হইল অতিরাগ (passion)। সুযোগমত ইহা হঠাৎ প্রকাশিত হয়; যেমন, ঐ ব্যক্তি হঠাৎ তাহার প্রতিপক্ষকে হত্যা করিতে পারে। সেইরূপ ভয় একটি আবেগ; কিন্তু বিষাদ বা 'দৌর্মনস্য' (melancholy) হইল একটি 'অতিরাগ'—ইহার বশে হঠাৎ বিষাদগ্রস্ত ব্যক্তি আত্মহত্যা করিয়া বসিতে পারে।

২২ তুলনীয়: "*Passion*: used by the older writers for emotion in general, but now reserved for violent emotional outbreaks." (Drever's *Dictionary*).

'আয়ান' (Temperament) পদটিরও অর্থ বিশেষ নির্দিষ্ট নহে। **ব্যক্তি-বিশেষের সহজাত আবেগপ্রবণতা** (congenital emotional tendencies) **এবং তদনুযায়ী কার্য করিবার ইচ্ছা ব্যক্তি-বিশেষের আয়ান নির্দেশ করে।**[২২] ইহার মূলে থাকে বিভিন্ন নালিকাবিহীন গ্রন্থির হরমোন্—এইগুলির প্রভাবে কেহ কেহ স্বভাবতঃই উত্তেজনা-প্রবণ আবার কেহ কেহ ধীর বা শান্ত হইয়া থাকে। ইহা যেহেতু সহজাত, সেইজন্য ইহা ব্যক্তিত্বেরই 'অংশ'-বিশেষ এবং ইহা আবেগ, মেজাজ ইত্যাদি অস্থায়ী বা স্বল্পস্থায়ী মানসিক অবস্থা হইতে পৃথক্।[২৩]

১১। বিবিধ আবেগ (Different kinds of Emotion) :

আবেগ বহুবিধ হইতে পারে। **কতকগুলি আবেগ আত্ম-কেন্দ্রিক** (egoistic) **এবং কতকগুলি পর-কেন্দ্রিক** (altruistic)।

ভয়, ক্রোধ, আশা, অসূয়া, ঘৃণা, অহঙ্কার ইত্যাদি হইল আত্ম-কেন্দ্রিক। আবার প্রেম, দয়া, সহানুভূতি, বন্ধুত্ব ইত্যাদি হইল পরকেন্দ্রিক। এই উভয় প্রকার আবেগের ক্ষেত্রেই বিষয়বস্তু হইল কোন মূর্ত সত্তা (concrete being)। ইহা ছাড়া, **কতকগুলি অমূর্ত ধারণা** (abstract idea)-**কে কেন্দ্র করিয়াও আবেগ দেখা দিতে পারে—এই ধারণাগুলি হইল কোন আদর্শ** (ideal বা value)-**এর ধারণা।**

আমরা এখানে কয়েকটি আবেগের অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিব।

ভয়—যেখানে আমরা কোন ক্ষতির আশঙ্কা করি, অথচ উহাকে প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা আমাদের থাকে না, সেখানে ভয়ের আবির্ভাব

২২ তুলনীয় : "Temperament is the characteristic difference in the congenital constitution of individuals manifested, e.g., by differences in their emotional susceptibilities, in the rapidity of their mental processes, in the fixity of their conations etc." (Baldwin's *Dictionary*).

২৩ পূর্বে Temperament-কে *choleric, sanguine, phlegmatic* এবং *melancholic* এই চারিভাগে ভাগ করা হইত।

(১) Choleric—শীঘ্র চিন্তা করিয়া সমস্যার সমাধান করে এবং তীব্র অনুভূতি আছে।

২) Sanguine—শীঘ্র চিন্তা করিতে পারে ; কিন্তু অনুভূতির তীব্রতা নাই।

৩) Phlegmatic—ধীরে ধীরে চিন্তা করে, কিন্তু অনুভূতির তীব্রতা নাই।

(৪) Melancholic—ধীরে ধীরে চিন্তা করে এবং গভীর অনুভূতি আছে।

ঘটে। মানুষ এবং মনুষ্যেতর জীবের সকলেরই অবস্থাবিশেষে ভয়ের উদ্রেক হইতে পারে। ইহা পলায়ন বৃত্তি (instinct of escape)-এর সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া অনেকে বর্ণনা করেন। সেইজন্য ইহা আত্মরক্ষার অন্যতম সহায়ক বলিয়া গণ্য হয়।

ভীতির সময় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দৈহিক পরিবর্তন ঘটে: নেত্র বিস্ফারিত হয়, ভ্রূযুগল কিছু পরিমাণ তির্যক্ আকৃতিবিশিষ্ট হয়, দেহ কাঁপিতে থাকে, মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়, জিহ্বা ও তালুদেশ শুষ্ক হইয়া যায়, বাক্‌যন্ত্রের ক্রিয়া ব্যাহত হয়, দেহের সর্বত্র রোমাঞ্চন হয়, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া মন্দীভূত হয় ইত্যাদি।

যখন কোন ক্ষেত্রে ভয়ের কোন যৌক্তিকতা থাকে না, অথচ তীব্র ভয়ের উদ্রেক হয় এবং উহাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, তখন উহাকে **আতঙ্ক** (phobia) বলে; যেমন বদ্ধস্থানাতঙ্ক (claustrophobia), মুক্তস্থানাতঙ্ক (agoraphobia), উচ্চস্থানাতঙ্ক (acrophobia), জনতাতঙ্ক (ochlophobia), মরণাতঙ্ক (thanatophobia), ইত্যাদি। যাহার বদ্ধস্থানাতঙ্ক হয়, সে ঘরের মধ্যে থাকিতে ভয় পায়; যাহার উচ্চস্থানাতঙ্ক আছে, সে উচ্চ স্থানে উঠিতে ভয় পায় ইত্যাদি।

উৎকণ্ঠা (anxiety) ভয়ের একটি অস্পষ্ট অবস্থা। এক্ষেত্রে উহা কোন বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে ভয় নহে—ইহা হইল সাধারণ ভয়; অথচ ইহার বিশেষ যৌক্তিকতা নাই। উৎকণ্ঠার ক্ষেত্রে ব্যক্তি-বিশেষ কেন ভয় করিতেছে, কী ভয় করিতেছে, কাহাকে ভয় করিতেছে ইত্যাদি কিছুই নিশ্চিতভাবে জানে না—অথচ সর্বদাই তাহার ভয় হয়।

ক্রোধ—ক্রোধও একটি আত্মকেন্দ্রিক আবেগ। ইহা জীবের স্বাভাবিক যুদ্ধবৃত্তি বা আক্রমণাত্মক বৃত্তি (instinct of combat or aggression)-এর সহিত সংশ্লিষ্ট।

ভয় ও ক্রোধের মধ্যে কতকগুলি বৈপরীত্য আছে—(ক) ভয়ের প্রভাবে ব্যক্তি-বিশেষ বিপজ্জনক পরিস্থিতি হইতে পলায়ন করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু ক্রোধের প্রভাবে ব্যক্তি-বিশেষ ক্ষতিকারককে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। (খ) ভয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তি-বিশেষ নিজেকে দুর্বল বা অসহায় মনে করে, ক্রোধের ক্ষেত্রে সে নিজেকে বিপক্ষ অপেক্ষা অধিকতর

শক্তিশালী মনে করে। (গ) ভয়ের উৎপত্তি ঘটে ভবিষ্যতের বিপদের আশঙ্কা কল্পনা করিয়া; কিন্তু অতীতের ক্ষতি স্মরণ করার ফলে সাধারণতঃ ক্রোধ দেখা দেয় (আবার ভবিষ্যতে কেহ ক্ষতি করিবে এ চিন্তাতেও ক্রোধ হইতে পারে)।

ক্রোধের সময় কতকগুলি দৈহিক লক্ষণ বিশেষভাবে প্রকাশমান হয়; যথা—দেহ আক্রমণোদ্যতক ভাব গ্রহণ করে, হাত অনেক সময় মুঠা থাকে, মুখ বন্ধ থাকে এবং দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ হয়, চক্ষু রক্তবর্ণ হয়, মুখমণ্ডল রক্তাভ হয়, গলার স্বর রুক্ষ ও কর্কশ হয়, হৃদ্‌যন্ত্র অতি দ্রুত চলিতে থাকে, ঘন ঘন এবং জোরে জোরে শ্বাস পড়িতে থাকে ইত্যাদি।

কেবল যে অপরের দ্বারা কৃত অনিষ্ট বা ক্ষতির চিন্তাতেই ক্রোধের উদ্ভব হয় তাহা নহে; যে কোন ক্ষেত্রে ব্যর্থতা ঘটিলেও ক্রোধ তথা আক্রমণাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে (পৃঃ ৩৮০)।

প্রেম—ইহা একটি পরকেন্দ্রিক আবেগ (altruistic emotion)। ইহার স্বরূপ লইয়া মতভেদ আছে। ইহা সকল সময় তীব্র আবেগের ন্যায় হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে না—ইহা অনেক সময়েই একটি স্থায়ী প্রেমসুলভ স্বভাব (loving disposition)-এ রূপান্তরিত হয়।

(ক) 'প্রেম' পদটিকে কখনও কখনও কাম (libido বা lust)-এর সহিত একার্থবোধকভাবে ব্যবহার করা হয়। ইহার পশ্চাতে একটি যৌন আবেদন থাকে[২৪]। (খ) কখনও কখনও 'প্রেম' বলিতে যে কোন কোমল অনুভূতি (tender feeling) বুঝায় (যেমন, পিতামাতার স্নেহ)। (গ) আবার ইহা একটি বিশেষ অনুভূতিপ্রবণ স্থায়ী স্বভাবও বুঝায়। যথা, মাতৃপ্রেম; ইহা বিভিন্ন অবস্থার বিভিন্ন আবেগের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে; যেমন, পুত্র-কন্যার আনন্দে আনন্দ, শোকে শোক, ভয়ে ভয়, আশায় আশা ইত্যাদি।

প্রেম পরকেন্দ্রিক আবেগ—ইহার প্রভাবে ব্যক্তি-বিশেষ নিজেকে ভুলিয়া প্রেম-পাত্র (object of love)-এর পরিতুষ্টি-সাধন, মঙ্গল-বিধান ইত্যাদি করিবার চেষ্টা করে। প্রেমের তীব্রতা অনুসারে প্রেমিকের আত্মবিসর্জন, আত্মোৎসর্গ (self-sacrifice) বা আত্ম-অবলুপ্তি (abnegation)-এর চেষ্টারও তীব্রতা বৃদ্ধি পায়।

---

২৪ ফ্রয়েডীয় দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সকল প্রেমকেই কাম . ibido)-এর প্রকাশরূপে গণ্য করা হয়।

ঘৃণা—ইহা হইল প্রেমের বিপরীত। ইহা একটি আত্ম-কেন্দ্রিক (egoistic) অনুভূতি। ইহা আবেগরূপেও হঠাৎ প্রকাশ পায়, আবার স্থায়ী স্বভাবরূপেও থাকে। ম্যাক্‌ডুগালের মতে, ইহা একটি মিশ্র অনুভূতি—ইহার মধ্যে ক্রোধ, ভয়, বিরক্তি এই তিন প্রকার আবেগের 'সংমিশ্রণ' থাকে। যাহাকে ঘৃণা করা যায় তাহার উপর আমাদের ক্রোধ হয়, আমরা তাহাকে সভয়ে পরিহার করিয়া চলিবার চেষ্টা করি এবং তাহার উপর বিরক্তি আসে।

সহানুভূতি (sympathy)—সহানুভূতি একটি পরকেন্দ্রিক (altruistic) অনুভূতি। ব্যুৎপত্তির দিক্ হইতেই দেখা যায় যে, ইহার অর্থ হইল একজনের অনুভূতির সহ বা সহিত অনুভূতি—অর্থাৎ একজনের সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ। কিন্তু আমাদের সাধারণ কথাবার্তায় সহানুভূতি বলিতে অপরের দুঃখে দুঃখবোধই বুঝায়।

সহানুভূতির উদ্রেকের জন্য প্রয়োজন অপরের অনুভূতির প্রকাশ লক্ষ্য করা, ঐ প্রকাশের মর্মার্থ কল্পনার সাহায্যে অনুধাবন করা, এবং তদনুরূপ অনুভূতি বোধ করা। একজনকে দুঃখে কাঁদিতে দেখিলে যদি আমার সহানুভূতি হয়, তাহা হইলে আমাকে তাহার ক্রন্দন লক্ষ্য করিতে হইবে, এবং কল্পনা ও অনুমানের সাহায্যে তাহার দুঃখের গভীরতা বোধ করিতে হইবে ও তদনুরূপ দুঃখের অনুভূতিও বোধ করিতে হইবে।

সহানুভূতি উদ্ভবের সহায়ক কারণগুলি (conditions of sympathy) নিম্নলিখিতরূপ:

(ক) সহানুভূতিকারী অনুভূতিপ্রবণ হওয়া প্রয়োজন; নহিলে অপরের অনুভূতি সহজে তাহার অন্তরে সাড়া জাগাইতে পারিবে না।

(খ) সহানুভূতিকারী ও সহানুভূতির পাত্র উভয়েরই সমান অবস্থার অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়। যেমন, একই কার্যালয়ের কর্মীদের মধ্যে সহজেই পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি জাগিতে পারে।

(গ) সহানুভূতিকারী এবং সহানুভূতির পাত্র উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক অনুরাগ থাকা বাঞ্ছনীয়। আমাদের বন্ধুর প্রতি যেরূপ সহজে সহানুভূতি জাগে, সেইরূপ সহজে শত্রুর প্রতি সহানুভূতি জাগে না।

(ঘ) অনুভূতিকারী কল্পনাপ্রবণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। অনেক সময় ভোগ-বিলাসে লালিত-পালিত ধনী ব্যক্তি দরিদ্রের মর্মব্যথা কল্পনা করিতে পারে না বলিয়া দরিদ্রের দুঃখে সহজে তাহাদের সহানুভূতি জন্মে না।

(ঙ) অপরের আচার-ব্যবহার আগ্রহভরে লক্ষ্য করিবার ক্ষমতা (capacity for observation with interest) থাকা বাঞ্ছনীয়। যে উদাসীন, যে-কোন দিকেই কিছু লক্ষ্য করে না, সে সহানুভূতিপ্রবণ হইতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে অনেক লেখক **সহানুভূতি** (sympathy) এবং **সমানুভূতি** (empathy) এই দুই-এর মধ্যে পার্থক্য করিয়া থাকেন। সমানুভূতিতে ব্যক্তি-বিশেষের যেন বস্তুর মধ্যে অভিক্ষেপ (projection) ঘটে। ইহা কেবলমাত্র একজনের অনুভূতির সহিত অনুভূতি (feeling *with*) নহে—ইহা যেন বস্তু-বিশেষের ভিতর অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বা তদ্গত হইয়া অনুভূতি বোধ করা (feeling *into* the object)। যেমন, একটি বালক ঘুড়ি উড়ান দেখিবার সময় আনন্দে বিহ্বল হইয়া লাফাইতে থাকে—ইচ্ছা যেন সেও ঘুড়িরই মত আকাশে উড়িতে পারে।[২৫]

১২। রস (Sentiment):

(ক) রসের বিভিন্ন অর্থ (Different meanings of the term 'Sentiment'):

ইংরাজী 'Sentiment' অথবা উহার প্রতিশব্দ 'রস'[২৬] পদটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। (ক) Sentiment বা রস বলিতে সাধারণতঃ কোমল

---

২৫ **তুলনীয়:** "As sympathy means 'feeling with', empathy means 'feeling into', and the idea is that the observer identifies himself with the object observed, and gets some of the satisfaction from watching an object that he would get from *being* that object." (Woodworth, ***Psychology***, 12th Ed., p. 557).

২৬ প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত লেখকগণ কাব্যের আলোচনাকালে রসের স্বরূপ লইয়া বহু মনোজ্ঞ আলোচনা করিয়াছেন। "রস্যতে ইতি রসঃ"—ইহাই হইল 'রস'-পদের ব্যুৎপত্তি। রসের বৈশিষ্ট্য হইল স্বাদন ধর্ম। রস ও আনন্দ এক নহে—আনন্দ হইল রসাস্বাদনের ফল। স্থায়ী ভাবকে আশ্রয় করিয়াই রসের উৎপত্তি। ভরতের মতে রস আট প্রকার—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর ভয়ানক, বীভৎস এবং অদ্ভুত। ইহারা যথাক্রমে আটটি স্থায়ী ভাবকে আশ্রয় করিয়া থাকে—যথা,—রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময়। (বাংলায় বিস্তারিত আলোচনার জন্য ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত প্রণীত 'কাব্যালোক' দ্রষ্টব্য)।

অনুভূতি বুঝায় (যেমন, আমরা কোমলচিত্ত বা করুণাপ্রবণ ব্যক্তিকে sentimental বলিয়া অভিহিত করি)। (খ) আবার উহার বিপরীত অর্থেও ঐ পদটি ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ sentiment (বা রস) বলিতে তীব্র রস বা অনুভূতিও বুঝায় এবং ইহা মানুষকে কোন কঠোর কার্যে প্রবৃত্ত করে (যেমন, ভয়, ক্রোধ, ঘৃণা ইত্যাদি)।[২৭] (গ) কোনঃ কোন লেখক 'রস' (sentiment) বলিতে বুঝিয়াছেন একাধিক সহজপ্রবৃত্তির সমন্বয়।[২৮] (ঘ) 'রস' বলিতে স্বভাব বা স্বাভাবিক অনুভূতিপ্রবণতা (emotional disposition) বুঝায়। (পৃঃ ৫১১)। যেমন, বন্ধুর বন্ধুর প্রতি সৌখ্যরস, সন্তানের প্রতি পিতামাতার স্নেহরস। এইগুলি মোটামুটি স্থায়ী ভাব।[২৯] (ঙ) আবার রস বলিতে কোন আদর্শ (ideal)-এর চিন্তায় জাগরিত অনুভূতি বা আবেগ বুঝায়। সাধারণতঃ "সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্" (The True, The Good and The Beautiful)-এর চিন্তায়, কল্পনায় বা ধ্যানে রস (বা sentiment)-এর উদ্রেক হয়।

(খ) রসের প্রকারভেদ :

আমরা পূর্বেই দেখিলাম যে, রস পদটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ইহাকে নানা শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

কোন আদর্শের চিন্তায় যে অনুভূতির উদ্রেক হয় (feelings in contemplation of an ideal) সেই অর্থে আমরা রস (sentiment)-পদটি বর্তমান অনুচ্ছেদে ব্যবহার করিব। এই অর্থে রস-পদটি গ্রহণ করিলে ইহাকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে : (১) সত্যাশ্রয়ী

২৭ তুলনীয় : "When the feeling is at all strong the attitude is called a *sentiment*. Such sentiments as love, hate, ambition, and patriotism are powerful motives in adult life." (Woodworth, *op. cit.*, p. 387).

২৮ যেমন, McDougall মনে করেন যে, "Each sentiment is a higher integration; within one sentiment several instinctive dispositions may be integrated." (McDougall, *Abnormal Psychology*, p. 425). [বর্তমান গ্রন্থের পৃঃ ২৪২-৪৩ দ্রষ্টব্য।]

২৯ অনেক আধুনিক লেখক এই অর্থেই Sentiment পদটি ব্যবহার করিয়াছেন। যথা, Stout বলেন : "It is a complex emotional disposition which manifests itself variously under varying conditions." (*Manual of Psychology*, p. 627).

রস (Intellectual Sentiment), (২) সৌন্দর্য রস (Æsthetic Sentiment) এবং (৩) নীতিবোধাশ্রয়ী রস (Moral Sentiment)।

(১) **সত্যাশ্রয়ী রস**—সত্যের অনুসন্ধানে, আবিষ্কারে, প্রচারে ও চিন্তায় যে রসের অভ্যুদয় হয় তাহাকে বলে সত্যাশ্রয়ী রস। যাঁহারা সত্যের পূজারী (যেমন, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ইত্যাদি) তাঁহারা সত্যের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকিয়া, সত্যকে আবিষ্কার করিয়া, সত্যকে প্রচার করিয়া যে বিমল আনন্দ লাভ করেন তাহা এই রস হইতেই উদ্ভূত। এই রস আবার বিভিন্ন প্রকার আবেগের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে—যেমন, অভূতপূর্ব বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময়বোধ জাগে, উহার কারণ অজ্ঞাত থাকিলে ঐ সম্বন্ধে কৌতূহল হয় এবং শেষ পর্যন্ত সন্তোষজনক পদ্ধতিতে উহা আবিষ্কার করিলে আনন্দানুভূতির উদ্রেক হয়।

(২) **নীতিবোধাশ্রয়ী রস**—নৈতিক আদর্শের চিন্তা করিলে, তদনুসারে কার্য করিলে এবং অন্যকে ঐরূপ করিতে দেখিলে যে রসের উদ্রেক হয়, তাহাকে নীতিবোধাশ্রয়ী রস বলা হয়। ইহার মধ্যে সাধারণতঃ একটি সামাজিক ও সার্বিক বোধ থাকে। নৈতিক আদর্শের অনুধাবন করিতে পারিলে আত্মতৃপ্তি জাগে এবং তাহা না করিতে পারিলে অনুতাপ জাগিতে পারে। সেইরূপ অপরে যখন নৈতিক আদর্শানুযায়ী কাজ করিতে সক্ষম হয়, তখন তাহার প্রতি সাধারণতঃ অনুরাগ, শ্রদ্ধা, ভক্তি ইত্যাদি দেখা দেয়; তাহা যে না করিতে পারে তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা, অভক্তি, বিরক্তি, ঘৃণা ইত্যাদি নানাপ্রকার ভাব অবস্থাবিশেষে দেখা দিতে পারে।

(৩) **সৌন্দর্য রস**—সুন্দরের ধ্যানে, কল্পনায় বা চিন্তায় যে বিশুদ্ধ অনুভূতির উদ্রেক হয়, তাহাকে সৌন্দর্য রস বলে। সুঠাম গঠনে, উজ্জ্বল বর্ণে, মধুর স্বরে আমাদের অন্তরে সৌন্দর্যরসের সঞ্চার হয়। যাহা সুন্দর তাহার ভিতর মানব মন শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য ইত্যাদি আবিষ্কার করে। সৌন্দর্য রসের উদ্রেকের জন্য উপকরণ বা উদ্দীপকের আবশ্যক। আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ (বিশেষতঃ দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়) বাহ্য জগৎ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করে: কিন্তু উপকরণ প্রত্যক্ষ করাই যথেষ্ট নহে—উহার মধ্যে শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য আবিষ্কার করিলে সৌন্দর্য রসের অভ্যুদয় হয়।

সৌন্দর্য রসের অন্তর্ভুক্ত দুইটি প্রধান রস হইল—**বিরাট্ রস** (Sentiment of the Sublime) **এবং অদ্ভুত রস** (Sentiment of the Ludicrous)।

বিরাট্‌রস— মহৎ বা বিরাট্ (The Sublime)-এর জ্ঞান হইতে যে ভাবাবেগ বা অনুভূতির উদ্রেক হয় তাহা হইল বিরাট্ রস। ইহা একটি মিশ্র অনুভূতি—ইহার ভিতর বিস্ময় ও বিনয়ের অপূর্ব সমন্বয় হয়। মহৎ বা বিরাট্‌কে দর্শন করিলে বিস্ময় বা আশ্চর্যের ভাব জাগে; আবার সেই সঙ্গে প্রত্যক্ষকারী নিজের ক্ষুদ্রত্বের কথা চিন্তা করায় তাহার মনে বিনয়ের এবং ভয়মিশ্রিত ভক্তি (awe)-এর ভাব আসে। যেমন, সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া ব্যক্তি-বিশেষের মনে হইতে পারে যে, সমুদ্র কত বড় এবং সে নিজে কত সামান্য! ভগবানের চিন্তায় নিমগ্ন ভক্তের মনে হইতে পারে ভগবান্ কী বিরাট্, কী মহান্ এবং সে কত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানব! সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিরাটত্বের সহিত ক্ষুদ্রত্বের আপেক্ষিক তুলনায় এই বিরাট্ রসের উদ্রেক হয়।

অদ্ভুত রস—ইহা হইল বিরাট্ রসের বিপরীত। অদ্ভুত, সামঞ্জস্যবিহীন, শৃঙ্খলাহীন কোন কিছু প্রত্যক্ষ করিলে অদ্ভুত রসের অভ্যুদয় হয়। অদ্ভুত রসের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাকারী নিজেকে রস-উদ্রেককারী বস্তুর তুলনায় বড় বা মহৎ বলিয়া মনে করে; অর্থাৎ ব্যক্তি-বিশেষ নিজে 'মহৎ' এবং তাহার তুলনায় অপর বস্তুটি ক্ষুদ্র—এই আপেক্ষিক তুলনাতেই অদ্ভুত রসের আবির্ভাব হয়। এই অদ্ভুতরসের ফলে কৌতুকানুভূতি (comic feeling) হয় এবং ইহা হইতে হাস্যের উদ্রেক হয়।

বিরাট্ রসের সহিত অদ্ভুত রসের তুলনা করিলে নিম্নলিখিত পার্থক্য দেখা যায়:

(ক) বিরাট্ রসের ক্ষেত্রে রস-অভিজ্ঞতাকারী নিজেকে ক্ষুদ্র বা নগণ্য মনে করে; অদ্ভুত রসের ক্ষেত্রে রস-অভিজ্ঞতাকারী নিজেকে বড় বা মহৎ মনে করে।

(খ) বিরাট্ রসের ক্ষেত্রে রস-উদ্রেককারী বস্তু বা ব্যক্তিকে মহান্ মনে করা হয়; অদ্ভুত রসের ক্ষেত্রে রস-উদ্রেককারী বিষয়কে ক্ষুদ্র বা সামান্য মনে করা হয়।

(গ) বিরাট্ রসের ফলে গাম্ভীর্যবোধ আসে; কিন্তু অদ্ভুতরসের ফলে কৌতুকবোধ হয় এবং হাস্যোদ্রেক হইতে পারে।

(ঘ) বিরাট্ রসের ক্ষেত্রে একদিকে থাকে বিস্ময়, আর অপর দিকে থাকে দৈন্য

বা হীনতা; অদ্ভুত রসের ক্ষেত্রে একদিকে থাকে তুচ্ছতা, অপর দিকে থাকে দম্ভ।

(গ) হাসির কারণ (Causes of Laughter):

অদ্ভুত রস (Sentiment of the Ludicrous)-এর আলোচনায় আমরা দেখিলাম যে, ইহা হইতে হাস্যের উদ্রেক হয়। সুতরাং এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠে: আমরা কেন হাসি?

(১) আমরা নানা কারণে হাসি এবং অদ্ভুত রসের উদ্রেক হাসির অন্যতম কারণ। কিন্তু এই অদ্ভুত রসের অভ্যুদয় হইতে পারে দুইটি কারণে—(ক) অপরে যদি অকারণে দম্ভ প্রদর্শন করে ও নিজের 'মহত্ত্ব'[30] প্রমাণ করিতে চাহে এবং তাহার যদি আকস্মিক পতন ঘটে, তাহা হইলে আমরা অনেক সময় হাসি। প্রায়ই মিথ্যা বলে বা অতিশয়োক্তি করে এরূপ ব্যক্তি যখন মিথ্যা কথা বলার সময় ধরা পড়িয়া যায়, তখন আমরা হাসিতে থাকি; অথবা সাইকেলের হাতলে হাত না রাখিয়া সাইকেল চালান সোজা বলিয়া দম্ভ করে এইরূপ একজন ঐভাবে সাইকেল চালাইবার সময় যদি পড়িয়া যায়, তাহা হইলে আমরা হাসিতে থাকি। এরূপ ক্ষেত্রে আমরা নিজেদের 'মহৎ' বা 'বড়' মনে করি এবং অপরের পতনে নিজেরা 'গৌরববোধ' করি।

(খ) আবার অসামঞ্জস্যপূর্ণ, বিশৃঙ্খল কোন কিছু প্রত্যক্ষ করিলে হাসির উদ্রেক হয়। যেমন, একটি ছোট ছেলে যখন প্রবীণের মতন কথা বলে, অথবা বড়দের জুতা পায়ে দিয়া ঘুরিতে থাকে অথবা তাহার দাদুর লম্বা কোট পরিয়া দাদু হইবার চেষ্টা করে, তখন আমরা সামঞ্জস্য বা সঙ্গতির অভাবে হাসিতে থাকি। সংস্কৃত নাটকের বয়স্য বা সার্কাসের ক্লাউনের অঙ্গভঙ্গী, সাজ-পোষাক, চালচলন, কথাবার্তা সব কিছুই প্রচলিত আদর্শ হইতে ভিন্ন বলিয়া আমরা উহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য পাই না এবং সেই কারণে হাসিতে থাকি।

অবশ্য এই দুই ক্ষেত্রে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অন্য কোন ভাবাবেগের উদয় হইলে অদ্ভুত রস তিরোহিত হইয়া যায়। যেমন, উপরের উদাহরণে

---

৩০ বলা বাহুল্য যে, এই 'মহত্ত্ব' অসার—ইহার পশ্চাতে আছে অকারণ অহমিকাবোধ; প্রকৃত মহৎ লোকের পতনে হাসির পরিবর্তে দুঃখই আসে।

সাইকেল আরোহী পড়িয়া যাইয়া বেশী আঘাত পাইলে যদি অনুকম্পার উদ্রেক হয়, অথবা ছোট ছেলে দাদুর 'কোট' নষ্ট করার জন্য যদি ক্রোধ হয়, তাহা হইলে আর হাসি আসিবে না।

(২) স্পেন্সার মনে করেন যে, হাসি হইল শরীরের রুদ্ধশক্তির আকস্মিক প্রকাশ। আমরা অসাধারণ বা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটিবে এই আশঙ্কায় শরীরের সমস্ত শক্তি লইয়া অপেক্ষা করি, কিন্তু যখন তাহা ঘটিল না—যখন দেখিলাম যে তথাকথিত ভয়ঙ্কর বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে ভয়ঙ্কর নয়—তখন আর আমরা হাসি না।

স্পেন্সারের এই ব্যাখ্যা সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। অধিকাংশ স্থলেই হাসিবার পূর্বে আমরা কোন উত্তেজনা বোধ করি না। তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে সকল হাসিকেই রুদ্ধশক্তির আকস্মিক প্রকাশ বলা যুক্তিযুক্ত হইবে না।

(৩) ফ্রয়েডের মতে রসিকতাবোধ হইতে আমাদের হাসি আসে; কিন্তু এই রসিকতা বোধের পশ্চাতে থাকে আমাদের অবদমিত কাম প্রবৃত্তি। ঐ প্রবৃত্তি অবদমিত হইলেও তিরোহিত হয় না—রসিকতা এবং ব্যঙ্গোক্তির মধ্য দিয়া উহা আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে।

সকল ইচ্ছার মূলেই কাম আছে এবং ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা উহা তৃপ্তির সন্ধান করে—এই মত সকল হাসির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে।

(৪) এক প্রকার হাসি আছে যাহা নিতান্ত যান্ত্রিক। অনেক সময় অপরে দলবদ্ধভাবে হাসিতেছে দেখিয়া আমরা স্বতঃই তাহাদের হাসির অনুকরণ করিয়া ফেলি, অথচ হাসির কারণ তখনও জানি না বা বুঝি না।

আবার মাদক দ্রব্য, 'হাসির গ্যাস' (laughing gas) ইত্যাদির প্রভাবেও যান্ত্রিক ভাবে হাসির উদ্রেক হয়।

(৫) ফরাসী দার্শনিক বের্গসেঁা মনে করেন যে, হাসির পশ্চাতে একটি উদ্দেশ্য থাকে—তাঁহার মতে আমরা হাসির দ্বারা অপরের দোষ-ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করি। যেমন, কোন বাতিকগ্রস্ত লোকের বাতিক লইয়া আমরা যখন বিদ্রূপ করি, তখন উহার দ্বারা তাহার বাতিক সংশোধনের চেষ্টা করি।

সকল প্রকার হাসিকেই বের্গসেঁার মতানুসারে ব্যাখ্যা করা যায় না। ব্যঙ্গ-চিত্র, ব্যঙ্গ-উক্তি ইত্যাদির পশ্চাতে ঐরূপ প্রচেষ্টা থাকিতে

পারে; কিন্তু সকল হাসিই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত এই কথা বলা চলে না। প্রতিহিংসা, ঈর্ষা ইত্যাদির প্রভাবেও আমরা ব্যঙ্গ-চিত্র ইত্যাদি প্রকাশিত করিতে পারি। সুতরাং সাধারণভাবে বলা যায় যে, সংশোধন বা অনুরূপ কোন উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হইয়া আমরা হাসি না—বরং কোন একটি পরিস্থিতি উপভোগ করি বলিয়াই আমরা হাসি।

(৬) মনোবিৎ ম্যাক্‌ডুগাল বলেন যে, যে সমস্ত ক্ষতি সামান্য, যে সমস্ত দুঃখের বোধ তীব্র নহে, সেইগুলির ভারে আমাদের মনে ব্যথা যাহাতে না বাড়িতে পারে, সেইজন্যই আমরা হাসি। অর্থাৎ আমাদের দুঃখের ভার লঘু করিবার জন্যই আমরা হাসি।

এই মতবাদও অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। কারণ দুঃখকে চাপা দিবার জন্যই আমরা সর্বদা হাসি এ কথা বলা চলে না।

পরিশেষে আমরা মন্তব্য করিতে পারি যে, কোন একটি বিশেষ মতবাদ দ্বারা সকল হাসিকে ব্যাখ্যা করা সমীচীন নহে। তবে হাসির পশ্চাতে অসামঞ্জস্যবোধ বা অনুরূপ কোন কারণজনিত কৌতুকবোধ তথা অদ্ভুতরস (Sentiment of the Ludicrous) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

সংবেদন

প্রাণিমাত্রই সদা পরিবর্তনশীল বাহ্য জগতের সহিত সর্বদা সংস্পর্শে আসিতেছে এবং তাহার ফলে বিবিধ প্রতিক্রিয়া করিতেছে। এই প্রতিক্রিয়াগুলির দ্বারা সে কতকগুলি বস্তু পাইবার চেষ্টা করে এবং অপর কতকগুলি পরিহারের চেষ্টা করে। সকল প্রাণীর ক্ষেত্রেই যাহা সত্য মানুষের ক্ষেত্রে তাঁহা নিশ্চয়ই প্রযোজ্য, বরং মানুষের ক্ষেত্রে বিবিধ প্রতিক্রিয়া জটিল আকার ধারণ করে। কিন্তু কোন বিষয় প্রতিক্রিয়া করিবার পূর্বে উহাকে প্রত্যক্ষ করা এবং উহার অর্থ বা তাৎপর্য বুঝা প্রয়োজন। প্রত্যক্ষ নিজেই আবার জটিল—উহাকে বুঝিবার জন্য উহাকে বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। প্রত্যক্ষ জ্ঞান (perceptual knowledge) সম্ভব হয় যদি ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্যজগতের কোন কিছুর সংযোগ বা সংস্পর্শ ঘটে। ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্য জগতের সংস্পর্শ ঘটামাত্র উদ্দীপন অন্তর্মুখী স্নায়ুপথে মস্তিষ্কে চালিত হয় এবং তাহার ফলে গুরুমস্তিষ্কে কিছু না কিছু পরিবর্তন সূচিত হয় এবং সাধারণ অবস্থায় তৎক্ষণাৎ ঐ সম্বন্ধে চেতনা জন্মে। ইন্দ্রিয়ের সহিত বস্তুর সংস্পর্শ ঘটামাত্র যে মানসিক পরিবর্তন সূচিত হয় তাহার ঠিক প্রথম মুহূর্তকে সংবেদন বলা হয়। যে বস্তু সংবেদনের সৃষ্টি করে, তাহাকে **উদ্দীপক** (stimulus) বলে। বাস্তবিক মানবের মনে সংবেদনের পৃথক্ কোন সত্তা নাই—প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের সরলতম উপাদান এবং মূল উৎসভাবে ইহাকে কল্পনা বা অনুমান করিয়া লইতে হয়। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে সংবেদন একটি বিমূর্ত মানসিক অবস্থা[১]।

১ ভুণ্ড্ট, টিচেনার প্রমুখ অবয়ববাদিগণ (Structuralists) সংবেদনের আলোচনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেন। তাঁহারা সংবেদনকে অবিভাজ্য মানসিক উপাদান (indivisible mental element) রূপে গণ্য করিতেন। টিচেনার তাঁহার *Text-book of Psychology*-নামক গ্রন্থে প্রথমে সংবেদন ও উহার গুণাবলী বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহার পর নয়টি অধ্যায় ঐ বিষয় লইয়া আলোচনা করেন। তিনি sensation বা সংবেদনের সংজ্ঞা দিয়াছেন: "an elementary mental process which is constituted of at least four attributes—*quality, intensity, clearness and duration.*" (*Ibid*, p. 52).

১। সংবেদনের স্বরূপ (Nature of Sensation) :

সংবেদনের বৈশিষ্ট্য নিম্নলিখিতরূপ :

(ক) প্রত্যক্ষ (Perception) হইল একটি জটিল মানসিক পরিস্থিতি। উহার **সরলতম 'উপাদান'** (যাহাকে কেন্দ্র করিয়া প্রত্যক্ষ গড়িয়া উঠে) হইল **সংবেদন**।

(খ) **ইন্দ্রিয় ও বাহ্যজগতের সংস্পর্শ** (sense-object contact)-এ এই **সংবেদনের অভ্যুদয়**। বাহ্যজগৎ হইতে উদ্দীপন্ অন্তর্মুখী স্নায়ুপথে মস্তিষ্কে পৌঁছিলে সংবেদন দেখা দেয়।[২] এইজন্য সংবেদনের মাধ্যমে ব্যক্তি-বিশেষ বাহ্যজগতের সংবাদ পায়।[৩]

(গ) সংবেদনের ক্ষেত্রে মন বাহ্যজগৎ হইতে উদ্দীপন গ্রহণ করে ; এই কারণ বলা যাইতে পারে যে, মন ঐ অবস্থায় **নিষ্ক্রিয়ভাবে** (passive state-এ) থাকে। (অবশ্য ইহার পরমুহূর্তেই মন সক্রিয় হইয়া উঠিয়া উহার অর্থ অবধারণ করিবার চেষ্টা করে)। সংবেদনের প্রারম্ভিক অবস্থায় মন নিষ্ক্রিয় থাকে ; এইজন্য বলা হয় যে, ইন্দ্রিয় কিসের উদ্দীপন পাইবে তাহা মন সৃষ্টি করে না। চক্ষুর সহিত কোন রঙীন দ্রব্যের সংস্পর্শ ঘটিলে ঐ দ্রব্যের যে রঙ্ প্রতিভাত হইবে, মনে কেবলমাত্র সেই রঙেরই সংবেদন হইবে এবং মন ইহার কোন পরিবর্তন সাধন করিতে পারে না।

সাম্প্রতিক কালের আলোচনায় ক্রিয়াবাদ (functionalism) বা গতীয়তাবাদ (dynamism)-এর প্রাধান্য (পৃঃ ১৪-১৬)। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে মানুষ কি ভাবে পারিপার্শ্বিক অবস্থায় প্রতিক্রিয়া করে তাহাই আলোচিত হয়। এইজন্য ক্রিয়াবাদীরা সংবেদনরূপ কোন সরলতম উপাদান আলোচনা না করিয়া প্রত্যক্ষ (perceiving)-রূপ মানসিক ক্রিয়া (mental act) লইয়া অধিক আলোচনা করেন। তাঁহারা কোন সংবেদন ক্রিয়া আলোচনা-কালে উহার প্রতিযোজনমূলক মূল্য (adaptive value)-এর উপরই বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন। (উদাহরণস্বরূপ Carr, *Psychology—A Study of Mental Activity* নামক গ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতে পারে।)

২ অধ্যাপক সালি (Sully) সংবেদনের সংজ্ঞা দিয়াছেন : "A sensation is a simple psychical phenomenon resulting from the stimulation of the peripheral extremity of an afferent nerve, when this is propagated to the brain." যদিও উদ্দীপক ব্যতীত সংবেদন সম্ভব নহে, তাহা হইলেও মধ্যে মধ্যে উদ্দীপকের অভাব সত্ত্বেও মিথ্যা সংবেদন (false sensation)-এর সৃষ্টি হইতে পারে। ইহাকে অপসংবেদন (*Paraesthesia*) বলে। যেমন, উদ্দীপক ব্যতীতও কখন কখন মনে হইতে পারে যে, যেন একটি আলোক-রেখা ঝিক্ করিয়া চোখের সামনে জ্বলিয়া উঠিল, অথবা কানের পাশ দিয়া কি যেন গুণ্‌গুণ্ করিয়া গেল!

৩ এইজন্য বলা হয় : "Sensations have a foreign implication."

(ঘ) **সংবেদন বস্তু-কেন্দ্রিক (objective)** ; কারণ সংবেদন মাত্রই মনের বাহিরে অস্তিত্বশীল কোন কিছুর কোন গুণ বা অবস্থা নির্দেশ করে।[৪]

(ঙ) সংবেদন যেন বলপূর্বক চেতনার ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। ইন্দ্রিয় যদি সুস্থ থাকে এবং উহা যদি উহার উপযুক্ত উদ্দীপকের সংস্পর্শে আসে, তাহা হইলে উদ্দীপনের সৃষ্টি হইবে এবং উহা মস্তিষ্কে উহার নির্দিষ্ট অধিষ্ঠানে পৌঁছাইয়া সংবেদনের সৃষ্টি করিবে। এইজন্য বলা হয় যে, সংবেদনের মধ্যে একটি **বাধ্যবাধকতা (compulsion বা aggressiveness)**-এর ভাব আছে।

উপরের এই বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনার ফলে বুঝা যাইতেছে যে, উদ্দীপক, দেহ ও মন এই তিনের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলে সংবেদনের উদ্ভব হয়। যদিও মানবমনে সংবেদনমাত্রই প্রত্যক্ষে পরিণত হয়, তাহা হইলেও ইহাকে বুঝিবার সুবিধার জন্য ইহাকে পৃথক্‌ভাবে (abstractly) আলোচনা করা প্রয়োজন।[৫]

২। সংবেদনের ধর্ম (Attributes of Sensation) :

সংবেদনের নিজস্ব কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য সংবেদনকে অন্যান্য মানসিক অবস্থা হইতে পৃথক্ করে। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলিই হইল **সংবেদনের ধর্ম** (attributes of sensation)।

সংবেদনের ধর্মসমূহ গুণগত ও পরিমাণগত এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। পরিমাণগত ধর্ম আবার বিভিন্ন প্রকারের হয় : তীক্ষ্ণতা (intensity), স্থায়িত্ব (protensity বা duration), বিস্তৃতি (extensity)।

টিচেনার এই প্রসঙ্গে চারিটি প্রধান ধর্মের উল্লেখ করিয়াছেন : **গুণ (quality), তীক্ষ্ণতা (intensity), বিশদতা (clearness), স্থায়িত্ব (duration)**। আমরা ইহাদের সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করিব।

৪ এই বিষয় সংবেদনের সহিত অনুভূতির পার্থক্য। যদিও সংবেদনের সহিত অনুভূতি সংশ্লিষ্ট থাকে (পৃঃ ৪১০), তাহা হইলেও সংবেদনকে অনুভূতির নামান্তর বলা যায় না। সংবেদন হইল প্রধানতঃ বিষয়কেন্দ্রিক (objective), অনুভূতি হইল ব্যক্তি-কেন্দ্রিক বা বিষয়ি-কেন্দ্রিক (subjective)। আবার, অপরপক্ষে অনুভূতিকেও সংবেদনের অন্যতম গুণ বা ধর্ম (attribute) বলা যুক্তিযুক্ত হইবে না। ভুণ্ট্‌ এককালে (১৮৮৭ খ্রঃ অঃ-এর পূর্বে) মনে করিতেন যে, অনুভূতি সংবেদনের একটি গুণ। পরে তিনি এই মত পরিত্যাগ করেন এবং বলেন যে অনুভূতি সংবেদনেরই ন্যায় একটি পৃথক্ উপাদান।

৫ Drever তাঁহার *Dictionary of Psychology*-তে বলিয়াছেন : "(Sensation is) really an abstraction, but generally discussed.......as if it were an elementary experience."

গুণ—গুণ হইল জাতিগত ধর্ম; ইহাই একটি সংবেদনকে অপর সংবেদন হইতে পৃথক্ করে। এক একটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এক একটি বিশেষ উদ্দীপক দ্বারা উদ্দীপিত হইলে এক একটি বিশেষ প্রকারের সংবেদনের উদ্ভব হয়। যেমন, চক্ষু যদি আলোকতরঙ্গ দ্বারা উদ্দীপিত হয়, তাহা হইলে চাক্ষুষ সংবেদন হয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয় যদি বায়ুতরঙ্গ দ্বারা উদ্দীপিত হয়, তাহা হইলে শ্রৌত্র সংবেদন হয়। চাক্ষুষ সংবেদন (visual sensation) এবং শ্রৌত্র সংবেদন (auditory sensation) উভয়ই সংবেদন; কিন্তু উহাদের মধ্যে জাতিগত পার্থক্য আছে। ইহার কারণ হইল যে, এই দুই প্রকারের সংবেদন দুইটি পৃথক্ গুণের অধিকারী।

এই প্রসঙ্গে **য়োহানেস্ মুয়েলার** (Johannes Müller) প্রবর্তিত 'অন্তর্মুখী স্নায়ুর শক্তি-বৈশিষ্ট্য' সম্বন্ধীয় নীতি (Theory of Specific Energy)-এর উল্লেখ করা যাইতে পারে (পৃঃ ৮৯ দ্রষ্টব্য)। এই নীতি অনুসারে স্নায়ুগুলির মধ্যে এক প্রকারের শ্রমবিভাগ আছে—এক একটি ইন্দ্রিয় এবং তৎসংলগ্ন অন্তর্মুখী স্নায়ুসমূহ কেবলমাত্র এক একটি বিশেষ প্রকারের উদ্দীপন দ্বারা উদ্দীপিত হইতে পারে এবং উহার উপযুক্ত উদ্দীপক ব্যতীত অন্য কোন উদ্দীপক দ্বারা উদ্দীপিত হয় না। যেমন, চক্ষুর উপযুক্ত উদ্দীপক হইল আলোক-রশ্মি; সুতরাং উহা যদি আলোক-তরঙ্গ ব্যতীত অন্য কোন কিছু দ্বারা (যেমন, বায়ু-তরঙ্গ দ্বারা) উদ্দীপিত হয়, তাহা হইলে আলোক-সংবেদন জন্মিতে পারে না। আবার যদিই বা অন্য কোন প্রকারে উদ্দীপিত হয়, তাহা হইলে একমাত্র উহার জন্য নির্দিষ্ট সংবেদনই হইবে; যেমন, চক্ষুতে হঠাৎ তীব্র আঘাত লাগিলে আলোক-সংবেদন হয়। আবার, এক এক প্রকারের সংবেদনের জন্য যে কেবলমাত্র এক এক প্রকার ইন্দ্রিয় ও স্নায়ু সুনির্দিষ্ট আছে তাহা নহে, পরন্তু বিশেষ প্রকার সংবেদনের তারতম্যের জন্যও বিশেষ বিশেষ স্নায়ুতন্তু (nerve-fibril) নির্দিষ্ট আছে; যেমন, নীলরঙের সংবেদন হইবার কালে যে স্নায়ুতন্তুসমূহ উদ্দীপিত হয়, লালরঙের সংবেদন হইবার কালে সেগুলি উদ্দীপিত না হইয়া অন্য স্নায়ুতন্তুসমূহ উদ্দীপিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ইন্দ্রিয়, অন্তর্মুখী স্নায়ু এবং স্নায়ুতন্তু সকলগুলির মধ্যেই শ্রমবিভাগ আছে।

—কোন্‌টি কোন্‌ প্রকার সংবেদনের উপযুক্ত উদ্দীপন বহন করিবে তাহা সুনির্দিষ্ট আছে।

তীক্ষ্ণতা—সংবেদনের মধ্যে তীব্রতা অনুযায়ী পার্থক্য থাকে। সংবেদন-গুলির মধ্যে কোনটি তীব্র, কোনটি মৃদু, আবার কোনটি উজ্জ্বল, কোনটি ম্লান, আবার কোনটি ভারী, কোনটি হাল্কা—এইরূপ পার্থক্য থাকে। এই পার্থক্য নির্দেশকারী ধর্মকে বলা হয় সংবেদনের তীক্ষ্ণতা (intensity)।

বিশদতা—সকল সংবেদন চেতনার ক্ষেত্রে একই স্থান অধিকার করে না—কোনটি বা চেতনার কেন্দ্রে থাকে, আবার কোনটি বা প্রান্তে থাকে; অর্থাৎ কোন সংবেদন সুস্পষ্ট বা বিশদ (clear) থাকে, আবার কোন সংবেদন অস্পষ্ট, অবিশদ বা ম্লান থাকে।

স্থায়িত্ব—সাময়িক স্থায়িত্ব অনুসারে সংবেদনের পার্থক্য আছে; কোনটি অল্পস্থায়ী আবার কোনটি দীর্ঘস্থায়ী—কোনটি ১ সেকেণ্ড থাকে আবার কোনটি বা ১০ মিনিট স্থায়ী। সময়ের এই তারতম্য অনুসারে সংবেদনের স্থায়িত্ব নিরূপিত হয়। সংবেদনের এই বৈশিষ্ট্য থাকার জন্য আমাদের কাল-জ্ঞান (consciousness of time) জন্মে।

বিস্তৃতি (extensity)—উদ্দীপিত ইন্দ্রিয়ের কতখানি উদ্দীপিত হইয়াছে তাহার উপর বিস্তৃতি নির্ভর করে। প্রধানতঃ চর্মেন্দ্রিয় এবং চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্য থাকে। হাতের একটি আঙ্গুল পুড়িয়া গেলে যে সংবেদন হয়, তাহার বিস্তৃতি সমগ্র হাতটি পুড়িয়া যাওয়ার সংবেদন অপেক্ষা কম। সংবেদনের এই বৈশিষ্ট্য থাকার জন্য আমাদের দেশ-জ্ঞান (consciousness of space) জন্মে।

চর্মেন্দ্রিয় এবং চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের কোন্‌ অংশ উদ্দীপিত হইতেছে সে সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে। যেমন, যদি দেহের কোন অংশে কিছু ফুটিয়া যায়, তৎক্ষণাৎ ব্যক্তি-বিশেষ বুঝিতে পারে যে, ঐ অংশে কিছু ফুটিয়াছে—যদি হাতের কোন আঙ্গুলে একটি পিন্‌ ফুটিয়া যায়, তাহা হইলে কোথায় উহা ফুটিয়াছে তাহা জানিবার জন্য সমগ্র দেহে অনুসন্ধান করিতে হয় না। ব্যক্তি-বিশেষ বেদনা-সংবেদন হইবামাত্র বুঝিতে পারে যে, একটি বিশেষ আঙ্গুলে পিন্‌টি ফুটিয়াছে। ইন্দ্রিয়ের বিশেষ অংশ উদ্দীপিত হইবার

ফলে সংবেদনের যে পার্থক্যমূলক বৈশিষ্ট্য জন্মায় তাহাকে **দেশাভিজ্ঞান** (**local sign** বা **local character**) বলে।

৩। মানস-দৈহিক সম্বন্ধ-সংক্রান্ত নীতি বা ভেবের্-ফেক্‌নের নীতি (Law of Psycho-physics—Weber-Fechner Law):

আমরা পূর্ব অনুচ্ছেদে দেখিলাম যে, তীক্ষ্ণতা (intensity) সংবেদনের একটি ধর্ম। তীক্ষ্ণতা একটি পরিমাণগত ধর্ম এবং ইহার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। এখন প্রশ্ন হইল: সংবেদনের তীক্ষ্ণতা কি ভাবে বৃদ্ধি পায়? ইহার উত্তরে বলা হয়: উদ্দীপকের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইলে সংবেদনের তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু উদ্দীপকের তীব্রতা অতি সামান্য বৃদ্ধিতে সংবেদনের তীক্ষ্ণতা বাড়ে না—উহা একটু বেশী বাড়িলে সংবেদনের তীক্ষ্ণতা অল্প একটু বাড়িল বলিয়া চেতনা জন্মে।

সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতেই দেখা যায় যে, যে ২০ কিলোগ্রাম ওজনের জিনিষ বহিতেছে তাহাতে যদি তাহার অজ্ঞাতে এক গ্রামের কোন কিছু যোগ দেওয়া যায়, তাহা হইলে ওজন বৃদ্ধি পাইয়াছে এরূপ কোন চেতনা তাহার জন্মে না; অথচ ১০০ গ্রাম ওজন যোগ করিলে ওজন-বৃদ্ধি সম্বন্ধে তাহার অবগতি জন্মিবে। সেইরূপ, যে ঘরে ১০০ বাতির আলো জ্বলিতেছে, সেই ঘরে যদি ব্যক্তি-বিশেষের অলক্ষ্যে আর একটি বাতি জ্বালাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আলোর পরিমাণ বাড়িয়াছে কি না, তাহা হইলে সে বলিবে 'না'; আবার ১০।১২টি বাতি একত্রে জ্বালাইয়া ঐ প্রশ্ন করিলে সে বলিবে 'হাঁ'। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, **উদ্দীপকের বৃদ্ধি হইলেই সংবেদন বৃদ্ধি পায় না; উদ্দীপক একটু বেশী পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে সংবেদন অল্প বৃদ্ধি পায়।**

ইহা ছাড়া, আমরা দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় ইহাও দেখিতে পাই যে, উদ্দীপক যদি অত্যন্ত মৃদু (too weak) হয়, তাহা হইলে ঐ সম্বন্ধে সংবেদন জন্মে না; যেমন, যদি ব্যক্তি-বিশেষের অজ্ঞাতে তাহার দেহের উপর অতি সূক্ষ্ম দু'একটি বালুকণা রাখা হয়, তাহা হইলে সে কিছু জানিতে পারে না। আবার যখন কেহ একটি ভারী দ্রব্য বহন করিতেছে, তখন যদি উহার

সহিত একটি হাল্কা জিনিষ যোগ দেওয়া যায়, তাহা হইলে সে কিছুই বুঝিতে পারে না।[৬] (উপরের উদাহরণ দ্রষ্টব্য)।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, উদ্দীপকের একটি **নিম্নসীমা** (lower limit) আছে এবং একটি **ঊর্দ্ধসীমা** (upper limit) আছে যাহার মধ্যে উদ্দীপকের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিলে সংবেদনের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্বন্ধে প্রতীতি জন্মে। আবার এই দুই সীমারেখার মধ্যে উদ্দীপকের যে-কোন পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটিলেই সংবেদনের বৃদ্ধি ঘটিবে না—**উদ্দীপক একটু বেশী পরিমাণ বাড়াইলে তবে সংবেদন অল্প বাড়িবে।**

উদ্দীপক ও সংবেদনের পারস্পরিক বৃদ্ধির হার সম্বন্ধে জার্মানীর এর্ন্‌ষ্ট হাইন্‌রিশ্‌ ভেবের্ (Ernst Heinrich Weber) ও গুস্তাভ্‌ থিওডর ফেক্‌নের (Gustav Theodor Fechner) অনুসন্ধান কার্য চালান এবং তাঁহাদের নামানুসারে যুক্ত-ভাবে একটি নীতি প্রবর্তিত হইয়াছে—ইহার নাম **ভেবের্-ফেক্‌নের নীতি।**

ভেবেরের নীতি—ভেবেরই প্রথম এই বিষয়ে অনুসন্ধান-কার্য আরম্ভ করেন। ভেবের্ লক্ষ্য করেন যে, একটি উদ্দীপকের পর উহা অপেক্ষা পরিমাণগত ভাবে অধিক আর একটি উদ্দীপক প্রদান করিলে ব্যক্তি-বিশেষের যখন উদ্দীপক-বৃদ্ধি ঘটিয়াছে বলিয়া সংবেদন জন্মে, তখন দ্বিতীয় উদ্দীপক সম্বন্ধে তাহার পৃথক্ সংবেদন জন্মে না—**প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টির সম্বন্ধে আপেক্ষিকভাবে সংবেদন জন্মে।** ভেবের্ লক্ষ্য করেন যে, যদি ব্যক্তি-বিশেষকে প্রথমে ৫০ মিলিমিটারের সরলরেখা দেখাইয়া পরে ৫০·৫ মিলিমিটারের রেখা দেখান হয়, তাহা হইলে সে দ্বিতীয়টিকে প্রথম অপেক্ষা দীর্ঘ বলিবে ; কিন্তু যদি প্রথমে ১০০ মিলিমিটারের সরলরেখা দেখান যায়, তাহার পর ১০১ মিলিমিটারের রেখা দেখাইলে তবে দ্বিতীয় রেখাটি দীর্ঘতর বলিয়া প্রতীতি জন্মিবে (১০০·৫ মিলিমিটারের রেখা দেখাইলে ঐরূপ প্রতীতি জন্মিবে না)। সেইরূপ ওজনের ক্ষেত্রেও ভেবের্ লক্ষ্য করেন যে, প্রথমে ৩০ আউন্সের ওজন দিয়া পরে ৩১ আউন্সের ওজন দিলে ব্যক্তি-বিশেষ উহাকে অপেক্ষাকৃত ভারী বলিবে ; কিন্তু প্রথমে ১৫ আউন্সের ওজন দেওয়া হইলে পরে ১৫·৫ আউন্সের ওজন দিলেই উহাকে অপেক্ষাকৃত ভারী বোধ হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উদ্দীপকের বৃদ্ধি একটি বিশেষ অনুপাত (fixed ratio)-তে ঘটিলে তবে সংবেদন-বৃদ্ধির প্রতীতি জন্মে।

---

৬ এইজন্য প্রবাদ-বাক্য হইয়াছে : "বোঝার ওপর শাকের আঁটি।"

একটি পূর্ববর্তী এবং একটি অনুবর্তী উদ্দীপকের মধ্যে যে পার্থক্য তাহাকে **অবমগ্রাহ্যান্তর** (difference limen বা সংক্ষেপে, D. L.) বলা হয়। ভেবের্ মনে করেন যে, যাহা আমরা অবমগ্রাহ্যান্তর হিসাবে প্রত্যক্ষ করি, তাহা দুইটি উদ্দীপকের বাস্তব পার্থক্য নহে —উহা হইল দুইটি বস্তুর পরিমাণগত পার্থক্যের আপেক্ষিক অনুপাত (ratio)। সুতরাং ইহা পূর্ববর্তী উদ্দীপকের (যাহাকে আদর্শ উদ্দীপক বা standard stimulus বলে তাহার) ভগ্নাংশ—এই ভগ্নাংশ হইবে অপরিবর্তিত (constant)। উপরের উদাহরণে আমরা দেখিলাম যে, ১০০ মিলিমিটারের একটি সরলরেখা প্রত্যক্ষ করিবার পর উহার তুলনায় ১০১ মিলিমিটারের রেখা একটু দীর্ঘতর মনে হয়। সুতরাং এখানে অবম-গ্রাহ্যান্তর হইল ১ মিলিমিটার; ইহা ১/১০০ এই ভগ্নাংশ দ্বারা ১০০কে গুণ করার ফলে পাওয়া গিয়াছে। সেইরূপ যদি প্রথমে ২০০ মিলিমিটারের রেখা দেখান যায়, তাহা হইলে উহার পর ১/১০০ × ২০০ বা ২ মিলিমিটার বাড়াইলে অর্থাৎ ২০২ মিলিমিটারের রেখা দেখিলে তবে উহাকে ২০০ মিলিমিটারের তুলনায় দীর্ঘতর বলিয়া মনে হইবে। অপরপক্ষে, ৫০ মিলিমিটারের তুলনায় ১/১০০ × ৫০ = ০·৫ মিলিমিটার বেশী দীর্ঘ রেখা, অর্থাৎ ৫০·৫ মিলিমিটারের রেখা দীর্ঘতর প্রতিভাত হইবে।

ভেবের্ শেষ পর্যন্ত সমগ্র পরিস্থিতিটি নিম্নলিখিত সমীকরণের আকারে প্রকাশ করেন (ইহাই দেহ-মানস-সম্বন্ধ বিষয়ক নীতি হিসাবে গৃহীত হয়):

$$\frac{dR}{R} = C \text{ (a constant) বা } \frac{\text{অবমগ্রাহ্যান্তর}}{\text{উদ্দীপক}} = \text{নির্দিষ্ট ভগ্নাংশের হার।}$$

[এখানে dR বলিতে Difference Limen বা অবমগ্রাহ্যান্তর বুঝিতে হইবে; R অর্থে *Reiz* (এটি জার্মাণ শব্দ—অর্থ 'উদ্দীপক'); C অর্থে constant fraction বা যে নির্দিষ্ট হারে পূর্ববর্তী উদ্দীপককে বাড়াইতে হইবে তাহা বুঝিতে হইবে।] যেমন, ২০০ মিলিমিটারের ক্ষেত্রে দেখা গেল যে, ২ মিলিমিটার অবমগ্রাহ্যান্তর; সুতরাং সরলরেখার ক্ষেত্রে ২/২০০ অর্থাৎ ১/১০০ হইবে নির্দিষ্ট হারের ভগ্নাংশ। সেইরূপ ওজনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট গুণক হইল ১/৩০।

ফেক্‌নেরের নীতি—ফেক্‌নের ভেবের্-প্রদত্ত সমীকরণ (equation) গ্রহণ করেন। তিনি বলেন যে, উদ্দীপকের তীব্রতা বাড়ানর জন্য যে বর্ধিত সংবেদনের

সৃষ্টি হয়, তাহা হইল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংবেদনের সমন্বয় বা যোগফল; এবং অবমগ্রাহ্যান্তর-গুলি (just noticeable differences, সংক্ষেপে, j. n. d.) হইল সমান। এই বিষয়টিকে তিনি নিম্নলিখিত নীতি দ্বারা প্রকাশ করেন: যদি **উদ্দীপককে প্রতি ক্ষেত্রেই একটি বিশেষ ভগ্নাংশ দ্বারা গুণ করা যায়, তাহা হইলে সংবেদনের ক্ষেত্রে একটি করিয়া নির্দিষ্ট অবমগ্রাহ্যান্তর যোগ হয়।**[৭]

একটি উদাহরণ লওয়া যাউক্। মনে করা যাউক্ যে, একটি ঘরে ১০ বাতির আলোক জ্বলিতেছে এবং তাহার ফলে ব্যক্তি-বিশেষের আলোক-সংবেদন হইয়াছে। (অবশ্য ইহার এই অর্থ নহে যে, ১০ বাতির কম আলোকে সংবেদন হয় না)। এখন প্রশ্ন হইল: কি ভাবে উদ্দীপকের পরিমাণ বাড়াইলে সংবেদন-বৃদ্ধি হইবে ?

	উদ্দীপক		সংবেদন
১০	বাতির আলোক	→	সং
১০ × ১০১/১০০	" "	→	সং + ১
১০ × ১০১/১০০ × ১০১/১০০	" "	→	সং + ২
	....		....

এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, উদ্দীপককে একটি বিশেষ ভগ্নাংশ দ্বারা গুণ করা হইতেছে এবং তাহার ফলে সংবেদনের তীক্ষ্ণতা একটি করিয়া 'একক' বা unit (যাহা হইল just noticeable difference) বাড়িতেছে।

ভেবেরের সূত্র অপেক্ষা ফেক্‌নেরের সূত্র উন্নততর। ভেবের্ কেবলমাত্র উদ্দীপক-বৃদ্ধির হার বা অনুপাতের নির্দিষ্ট ভগ্নাংশ লইয়া আলোচনা করেন। ফেক্‌নের সংবেদনের তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি কী অনুপাতে হইবে তাহাও নির্দেশ

৭ গণিতের ভাষায়—"If the stimulus increases in G. P., sensation increases in A.P." (এখানে G P. বলিতে বুঝায় Geometrical Progression এবং A.P. বলিতে বুঝায় Arithmetical Progression)। G.P. হইল এমনই একটি সংখ্যা-সারি যাহাতে প্রতি পূর্ববর্তী সংখ্যাকে নির্দিষ্ট সংখ্যা দ্বারা গুণ করিলে পরবর্তী সংখ্যা পাওয়া যায়, যথা, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২......(এখানে প্রতি পূর্ববর্তী সংখ্যাকে ২ দ্বারা গুণ করা হইয়াছে)। আবার A.P. হইল এমনই একটি সংখ্যা-সারি যাহাতে প্রতি পূর্ববর্তী সংখ্যার সহিত একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা যোগ করা হয়; যথা, ২, ৪, ৬, ৮, ১০......(এখানে প্রতি পূর্ববর্তী সংখ্যার সহিত ২ যোগ করা হইয়াছে)। সুতরাং G.P. সারি যে হারে বাড়িতে থাকে, A P. সারি তাহা অপেক্ষা অনেক কম বাড়ে। (যেমন, উপরের উদাহরণে যদিও দুইটি ক্ষেত্রেই আমরা ২-সংখ্যা হইতে সুরু করিয়াছি, তাহা হইলেও G. P. সারিতে যখন পঞ্চম অঙ্ক ৩২, তখন A. P. সারিতে উহা ১০)।

করেন। সুতরাং ফেক্‌নের উদ্দীপক এবং সংবেদনের 'কার্মিক সম্বন্ধ' (functional relation) সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করিয়াছেন।

[ফেক্‌নেরের সূত্রকে সংবর্গমান (logarithm)-এর আকারে প্রকাশ করা যায়। সংবর্গমানের তালিকা (log. table) হইতে দেখা যায় যে,

log ১=০

log ১০=১

log ১০০=২

log ১০০০=৩

এখানে দেখা যাইতেছে যে, বাম দিকের অঙ্ককে এক বিশেষ সংখ্যা দ্বারা গুণ করা হইতেছে এবং ডান দিকের অঙ্কে এক বিশেষ সংখ্যা যোগ হইতেছে, অর্থাৎ বাম দিকের অঙ্ক-সারি G.P. এবং ডান দিকের অঙ্ক-সারি A.P. অনুসারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই কারণ ফেক্‌নের তাঁহার সূত্রকে logarithm-এর আকার দান করিয়া নিম্নলিখিত সমীকরণ (equation)-টি প্রদান করেন : $S=C\log R$

এখানে S অর্থে সংবেদন (sensation), R অর্থে উদ্দীপক (stimulus) এবং C অর্থে নির্দিষ্ট ভগ্নাংশের হার বুঝিতে হইবে।]

সমালোচনা :

ভেবের্‌-ফেক্‌নের নীতি পরীক্ষণমূলক মনোবিদ্যার ইতিহাসে এক নূতন ইতিহাসের সৃষ্টি করে। ইহা লইয়া বহু মনোবিৎ নানা প্রকার গবেষণা করেন এবং বহুক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ ঘটে।

তবে এই নীতির কয়েকটি ত্রুটি আছে :

(ক) ভেবেরের নীতি যে সকল প্রকার সংবেদনের ক্ষেত্রে নিখুঁতভাবে বা অভ্রান্তভাবে (accurately) প্রযোজ্য তাহা নহে; তবে ইহা মোটামুটিভাবে (approximately) সত্য।

(খ) আবার এই নীতি মধ্যম তীক্ষ্ণতাবিশিষ্ট উদ্দীপকের ক্ষেত্রে যত সত্য, অতি ক্ষীণ উদ্দীপক বা অতি তীব্র উদ্দীপকের ক্ষেত্রে তত বেশী সত্য নহে। অর্থাৎ উদ্দীপকের সর্বনিম্ন রেখা (threshold)-এর ঠিক উপরে এবং সর্বোচ্চরেখা (height of sensibility)-এর ঠিক নীচে এই নীতির যাথার্থ্য বিশেষ প্রমাণিত হয় নাই।

(গ) ফেক্‌নের এই নীতির যে পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন, তাহাও

সর্বজনস্বীকৃত নহে। ফেক্‌নের মনে করেন যে, বর্ধিত হারের সংবেদন কতকগুলি প্রাথমিক সংবেদনের যোগফল (যেমন, উপরের উদাহরণ সং২ = সং১ + ১ অবমগ্রাহ্যান্তর)। কিন্তু সংবেদনের ক্ষেত্রে এই গাণিতিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রযোজ্য নহে। যেমন, বিশেষ অনুপাতে উদজান এবং অম্লজান মিশাইলে যখন জলের উদ্ভব ঘটে তখন উহা একটি নূতন পদার্থ, সেইরূপ পূর্বতন সংবেদনের 'সংমিশ্রণে' যে নূতন সংবেদনের উদ্ভব হয়, তাহা একটি নূতন অভিজ্ঞতা।

(ঘ) অবমগ্রাহ্যান্তর (*j. n. d.*)-এর কোন সর্বজনীন হার নির্দিষ্ট করা সম্ভব নহে। 'বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট এবং বিভিন্ন সময় একই ব্যক্তির নিকট বিভিন্ন কারণে (যথা মনোযোগ, প্রতিযোজন ইত্যাদির ক্ষমতার তারতম্য অনুসারে) অবমগ্রাহ্যান্তর পরিবর্তিত হইয়া থাকে।[৮]

(ঙ) সংবেদনের সর্বনিম্ন পরিমাণ কী হইবে? কোন্ অবস্থায় সংবেদনকে "শূন্য" বলা যাইবে? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর দান করা কঠিন, কারণ যে পরিমাণ মৃদু-উদ্দীপক প্রাথমিক সংবেদনের সৃষ্টি করিতে পারিত, অমনোযোগ, ক্লান্তি, প্রতিযোজন ইত্যাদির ফলে ঐ পরিমাণ উদ্দীপক পরে অনেক সময় আর সংবেদন সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয় না। সুতরাং "শূন্য" বা সর্বনিম্ন সংবেদনের সীমারেখা পরিবর্তনশীল।

এই সকল কারণে আধুনিক মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে ভেবের্-ফেক্‌নের নীতির সীমিত প্রয়োগ হইয়া থাকে।

---

৮ ভেবের-ফেক্‌নের নীতির বিরুদ্ধে উত্থাপিত এই আপত্তিকে ব্যাখ্যা করিয়া অধ্যাপক ডঃ গোপেশ্বর পাল বলেন: "No sensation wears upon its face *just* noticeable difference. Just noticeability is not, as it seems at first, a matter of observation; it is an inference or an assumption. It is, therefore, a theoretical or an abstract concept." কিন্তু এই আপত্তি পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নহে। ডঃ পালের মতে এই নীতি লইয়া গবেষণার ক্ষেত্রে বিভিন্ন গবেষক কর্তৃক প্রাপ্ত ফলের মধ্যে যে বৈষম্য দেখা গিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ হইল সম্পূর্ণ বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন গবেষক তাঁহাদের পরীক্ষণ চালাইয়াছিলেন। এইজন্য প্রয়োজন হইল তুল্য অবস্থার মধ্যে বহুসংখ্যক উপাত্ত-সংগ্রহ তাহা ছাড়া, দুইটি পরীক্ষণের ফলের তুলনা করিবার সময় ইহাও দেখিতে হইবে যে, উদ্দীপক-প্রয়োগের প্রণালী যেন একই রীতিতে হয়; যেমন, নিরবচ্ছিন্নভাবে উদ্দীপক-বৃদ্ধি (continued increase of stimulus) করিলে দেহ-মানসক্ষেত্রে যে পরিবর্তন হয়, উদ্দীপক ধীরে ধীরে থামিয়া থামিয়া বৃদ্ধি (step by step increase) করিলে ঠিক সেইরূপ হয় না। (Dr. G. Pal's Paper on 'Measurements in Psychology', ***Proceedings of the 29th. Indian Science Congress*** দ্রষ্টব্য)।

দেহ-মানস সম্বন্ধের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিচার্য বিষয় (Some Problems of Psycho-Physics):

ভেবের্ ও ফেক্‌নের কর্তৃক প্রবর্তিত নীতির প্রয়োগ জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে ঘটিয়া থাকে। যেমন, চা-বিক্রেতা অনুসন্ধান করেন যে, এক প্রকারের চা-র সহিত অপর প্রকার চা কোন্ পরিমাণে মিশাইলে একটি নূতন স্বাদ (flavour)-এর সৃষ্টি হয়। দূরভাষ বা টেলিফোন যন্ত্র নির্মাতারা ফেক্‌নের-প্রবর্তিত নীতির প্রয়োগ করেন, কারণ পরীক্ষণের মাধ্যমে দেখা গিয়াছে যে, উদ্দীপক বা কম্পনের তীব্রতার সহিত শব্দ-সংবেদনের তীব্রতার যে সম্বন্ধ তাহা সংবর্গমানের সম্বন্ধ (logarithmic relation)।

দেহ-মানস সম্বন্ধের ক্ষেত্রে যে সকল প্রশ্ন উঠে তাহারা মোটামুটি সাত প্রকারের[১]—

(১) উদ্দীপকের সর্বনিম্ন সীমারেখা কী? উদ্দীপকের তীব্রতা ঠিক কী পরিমাণের হইলে সামান্যতম সংবেদনের সৃষ্টি হয়? (যেমন, কোন দ্রব্যের ওজন কত কম হইলেও ওজন সম্বন্ধীয় সংবেদন জন্মে?)

(২) উদ্দীপকের বৃদ্ধি কত সামান্য পরিমাণের ঘটিলে সংবেদনের সামান্যতম পরিবর্তন সম্বন্ধে অবগতি জন্মিবে? অর্থাৎ উদ্দীপকের সর্বনিম্ন কী পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটিলে অবমগ্রাহ্যান্তর সম্বন্ধে সংবিত্তি জন্মিবে?

(৩) একই শ্রেণীভুক্ত দুইটি বিভিন্ন উদ্দীপক কী কী পরিমাণের হইলে দুইটি সংবেদনের তীক্ষ্ণতা অনুরূপ হইবে? (পরীক্ষণের মাধ্যমে দেখা গিয়াছে যে, সবুজ রঙের আলোক অপেক্ষা লাল রঙের আলোক আট গুণ বেশী তীক্ষ্ণতা-সম্পন্ন হইলে দুইটি ক্ষেত্রের আলোক-সংবেদন পরিমাণগতভাবে সমান বলিয়া প্রতীত হয়।)

(৪) কতকগুলি উদ্দীপক যদি দেওয়া থাকে, তাহা হইলে মৃদু হইতে তীব্র পর্যন্ত কী পর্যায়ে তাহাদের সাজান যাইবে?

(৫) অভিজ্ঞতার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে মধ্যবর্তী একটি সংবেদনকে দুইটি অনুরূপ সংবেদন হইতে কখন সমান "দূরত্বসম্পন্ন" মনে হয়?

(৬) উদ্দীপকের পরিমাণগত অনুপাত কী হারের হইলে একটি উদ্দীপককে অপর উদ্দীপকের অর্ধেক মনে হয়? (যেমন, পরীক্ষণের ফলে দেখা

১ S. S. Stevens-সম্পাদিত *Handbook of Experimental Psychology*, pp. 32-42 দ্রষ্টব্য।

গিয়াছে যে, এক পাউণ্ডের ওজন বহন করিবার পর সাধারণতঃ ১১ আউন্সের ওজন উহার অর্ধেক বলিয়া বোধ হয়।)

(৭) কোনরূপ মাপযন্ত্রের ব্যবহার না করিয়া কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় সংবেদনের মাধ্যমে কত দূর সঠিকভাবে উদ্দীপকের পরিমাণ অনুমান করা যায়? যেমন, চলন্ত গাড়ী দেখিয়া উহার গতি কত দূর সঠিকভাবে অনুমান করা যায়? (বিভিন্ন কারণে এই অনুমানের ভ্রান্তি হইতে পারে; সুতরাং ভ্রান্তির কারণও নির্ণয়ের চেষ্টা করা উচিত)।

.৪। **সংবেদনের শ্রেণীকরণ (Classification of sensations):**

উদ্দীপিত ইন্দ্রিয়ের প্রকারভেদ অনুসারে সংবেদনকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: (ক) যান্ত্রিক বেদন বা সার্বদেশিক সংবেদন (organic sensation), (খ) প্রাদেশিক বা বাহ্যেন্দ্রিয়জ সংবেদন (special sensation) এবং (গ) পেশীয় বেদন (muscular sensation)।

(ক) যান্ত্রিক বা সার্বদেশিক বেদন—

দেহযন্ত্রের অভ্যন্তরে পরিবর্তন ঘটার ফলে যে উদ্দীপনের সৃষ্টি হয়, তাহা যখন অন্তর্মুখী স্নায়ুপথে গুরুমস্তিষ্কে পৌঁছে, তখন যান্ত্রিক বা সার্বদেশিক সংবেদনের উদ্ভব ঘটে। যেহেতু ইহা দেহযন্ত্রের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন দ্বারা সূচিত হয়, সেই হেতু ইহাকে যান্ত্রিক সংবেদন বলে; আবার যেহেতু ইহা শরীরের কোন বিশেষ স্থানে সীমিত থাকে না এবং ক্রমশঃ সর্বাঙ্গব্যাপী হইয়া পড়ে, সেইজন্য ইহাকে অনেক সময় সার্বদেশিক সংবেদন বলা হয়।

এই প্রকার সংবেদনের আবার **তারতম্য** আছে:

(১) কতকগুলি যান্ত্রিক বেদনের উৎপত্তি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা যায়; যেমন, আঙ্গুলে কিছু ফুটিয়া গেলে যদি যন্ত্রণা হয়, তাহা হইলে ঐ সংবেদনের উৎপত্তি স্থল সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা যায়।

(২) কতকগুলি যান্ত্রিক বেদনের উৎপত্তিস্থল সুনির্দিষ্ট নহে—উহা অস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা যায়; যেমন, মাথাধরা, পেটের যন্ত্রণা, বুক ধড়্ফড়ানি ইত্যাদির ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে আমরা সংবেদনের উৎপত্তিস্থল নির্দেশ করিতে পারি।

(৩) আর কতকগুলি যান্ত্রিক বেদন আছে যাহাদের উৎপত্তি মোটেই

নির্দেশ করা যায় না। যেমন, দেহের সাধারণ স্বাচ্ছন্দ্য বা অস্বাচ্ছন্দ্য জনিত সংবেদন এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

যাহা হউক্, যদিও কতকগুলি যান্ত্রিক বেদনের উৎপত্তিস্থল দেহের কোন বিশেষ অংশ হইতে পারে, তাহা হইলেও সংবেদন ক্রমশঃ সমগ্র দেহযন্ত্রে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এইজন্য ইহাদের ক্ষেত্রে উৎপত্তিস্থল স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিলেও ইহারা সার্বদেশিক হইয়া পড়ে।

যান্ত্রিক বেদনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল নিম্নলিখিতরূপ :

(১) ইহাদের জন্য সুনির্দিষ্ট বাহ্য ইন্দ্রিয় নাই। ইহারা **দেহযন্ত্রের অভ্যন্তরেই উদ্ভূত।**

(২) ইহারা দেহের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন সম্বন্ধে সংবাদ দেয়।

(৩) ইহারা শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য বা অস্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে সংবাদ পরিবহন করে এবং ইহাদের ফলে সুখ বা দুঃখ যে-কোন রূপ অনুভূতির সৃষ্টি হয়। (এইজন্য ইহাদের 'barometer of bodily life' বলে)।

(৪) ইহারা 'প্রাথমিক সংবেদন' (primitive type of sensation) এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবের মধ্যেও এই প্রকার সংবেদন সম্ভব বলিয়া মনে হয়।

(খ) প্রাদেশিক বা বাহ্যেন্দ্রিয়জ সংবেদন—

আমাদের বাহ্যেন্দ্রিয় পাঁচটি—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ; ইহারা বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান দান করে বলিয়া ইহাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় বলা হয়। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের যে-কোন ইন্দ্রিয় উদ্দীপিত হইলে যখন উদ্দীপন গুরুমস্তিষ্কে পৌছে, তখন যে সংবেদন জন্মে তাহাকে প্রাদেশিক বা বাহ্যেন্দ্রিয়জ সংবেদন (special sensation [১০]) বলে।

ইহাদের **বৈশিষ্ট্যসমূহ** নিম্নলিখিতরূপ :

(১) কোন বাহ্যেন্দ্রিয় উদ্দীপিত হইলে ইহারা উদ্ভূত হয়।

(২) ইহাদের মাধ্যমে বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে। এই কারণ ইহাদের 'বাহ্য জগৎ-সমাচারবাহী' এবং 'জ্ঞানবিস্তারের সহায়ক' বলা হয়।

(৩) এই সকল ইন্দ্রিয়ের প্রত্যেকের জন্য বিশেষ বিশেষ প্রকারের

---

১০ পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়কে special sense-organs বলা হয় ; এইজন্য ইহাদের মাধ্যমে উদ্ভূত সংবেদনকে ইংরাজিতে special sensations বলা হয়।

উদ্দীপক সুনির্দিষ্ট আছে। কোন ইন্দ্রিয় উদ্দীপিত হইতে হইলে তাহার নিজস্ব উদ্দীপকের প্রয়োজন।

(৪) ইহাদের পরস্পরকে পরস্পর হইতে পৃথক্ করা যায় এবং ইহাদের প্রত্যেকটিরই উৎপত্তিস্থল সুনির্দিষ্ট।

(গ) পেশীয় বেদন—

ঐচ্ছিক পেশীসমূহের উদ্দীপন ও সঙ্কোচনের ফলে যে সকল সংবেদনের উদ্ভব হয়, তাহাদের পেশীয় বেদন বলা হয়। পেশীগুলির মধ্যস্থ স্নায়ুকেন্দ্রগুলি উদ্দীপিত হইলে পেশীগুলি ক্রিয়াশীল হইয়া উঠে (পৃঃ ৪০৪)।

পেশীয় বেদন একটি জটিল সংবেদন ; ইহাকে 'বিশ্লেষণ' করিলে আমরা নিম্নলিখিত সংবেদনগুলি পাই—

(১) আমরা যখন কোন কার্য সম্পাদন করি, তখন বাহ্য জগতের কোন কিছুর উপর শক্তি প্রয়োগ করি। এই কারণে শক্তি প্রয়োগজনিত সংবেদনের উদ্ভব হয়[১১]।

(২) আবার পেশী ইত্যাদি চালনা করিলে যে পরিবর্তন সূচিত হয় তাহার জন্য যে সংবেদন জন্মে তাহাকে **চেষ্টা-বেদন** (Kinaesthetic sensation) বলে।

(৩) আবার যখন আমরা বাহ্য জগতে পরিবর্তন আনিবার জন্য কার্য করি, তখন আমাদের অঙ্গ এক বা একাধিক বিবিধ বস্তুর সংস্পর্শে আসে। ইহার ফলে **স্পার্শন বেদন** (tactile sensation) জন্মে।

আমরা বিভিন্নভাবে পেশীচালনা করার ফলে আমাদের বিভিন্ন প্রকার পেশীয় সংবেদন হইতে পারে ; যেমন,

(১) আমরা কোন দেহাঙ্গকে একটি বিশেষ ভঙ্গিমায় রাখিতে পারি (যথা, একখানি হাত আমরা লম্বা করিয়া তুলিয়া ধরিতে পারি)—ইহার ফলে ঐ দেহাঙ্গের ঐ বিশেষ অবস্থান (position) সম্বন্ধে সংবেদন জন্মিবে।

(২) আমরা যখন দেহাঙ্গকে চালনা করিতে যাই, তখন কোন কোন ক্ষেত্রে উহা বাধা (resistance) পাইতে পারে (যেমন, কাহাকেও ধাক্কা

---

১১ শক্তিপ্রয়োগ সম্বন্ধে যে সংবেদন হয় তাহাকে sensation of innervation বলা হয়। এই প্রকার সংবেদনের পৃথক্ অস্তিত্ব সম্বন্ধে মনোবিদ্‌গণের মধ্যে মতভেদ আছে। ভুণ্ড্‌ট্ ইত্যাদি ইহাকে বিশেষ প্রকারের সংবেদন বলিয়া মনে করিতেন ; কিন্তু জেম্‌স্ ইহা অস্বীকার করেন। আধুনিক কালে স্টাউট্, ম্যাক্‌ডুগাল্ ইত্যাদি মনে করেন যে, ইহা সাধারণ ইচ্ছাশক্তিরই রূপান্তর।

দিলে, বা কোন ভারী জিনিষ তুলিতে বাধা সম্বন্ধে প্রতীতি হয়)—এই সকল ক্ষেত্রে ঐ বাধাজনিত সংবেদন (sensation of resistance) হইবে।

(৩) আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এইরূপ হইতে পারে যে, অঙ্গসঞ্চালন করিতে কোন বাধা হয় না। এই সব ক্ষেত্রে অব্যাহত অঙ্গচালনা-সম্বন্ধীয় সংবেদন (sensation of unimpeded movement) জন্মে।

আমরা সংক্ষিপ্তভাবে তিনটি প্রধান প্রধান সংবেদনের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিলাম। পরবর্তী অনুচ্ছেদসমূহে কয়েকপ্রকার সংবেদনের বিস্তৃততর আলোচনা করা হইবে।

৫। যান্ত্রিক সংবেদন (Organic Sensation):

(ক) ক্ষুধা (Hunger):

ক্ষুধাজনিত সংবেদন প্রাণিমাত্রেরই অন্যতম প্রাথমিক সংবেদন। এই সংবেদনের উৎপত্তি কি ভাবে হয়? অনেকে মনে করেন যে, দেহের পেশীসমূহের (bodily muscles and tissues) পুষ্টির প্রয়োজন হইতে ক্ষুধার উদ্রেক হয়। কিন্তু ইহা সত্য নহে। ইহা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে কয়েকদিন ক্রমান্বয়ে অনশন করিবার ফলে ক্ষুধার তীব্রতা হ্রাস পাইত না।

ক্ষুধাজনিত সংবেদন (hunger sensation)-এর অব্যবহিত পূর্ববর্তী কারণ হইল উদরের অনৈচ্ছিক পেশীসমূহের সঙ্কোচন। যদি আমরা অনেকক্ষণ আহার না করি, তাহা হইলে ঐরূপ পেশীসমূহ সঙ্কুচিত হয় এবং ঐ সঙ্কোচনের ফলে যে সংবেদন হয় তাহাই ক্ষুধাজনিত সংবেদন।

এ বিষয় ক্যানন্ (Cannon) এবং ওয়াশ্‌বার্ণ (Washburn) একটি অভিনব পরীক্ষণ করেন।[১২] তিনি পরীক্ষণ-পাত্রকে পূর্ব হইতে একটি বেলুন গলদেশ দিয়া চালিত করিয়া উদরে রাখিতে অভ্যস্ত করাইয়াছিলেন। ঐ বেলুনের সহিত রবারের নল দ্বারা একটি মাপযন্ত্রের সংযোগ ছিল; সুতরাং উদরের অনৈচ্ছিক পেশী সঙ্কুচিত হইলে বেলুনটির উপর চাপ পড়িত এবং উহার ফলে শেষ পর্যন্ত মাপযন্ত্রে সঙ্কোচনের হ্রাসবৃদ্ধি-নির্দেশক

১২ Cannon, 'Hunger and Thirst'. *A Handbook of Experimental Psychology* (Ed. by Murchison), Ch. V দ্রষ্টব্য।

নানা রেখা পড়িত। অপরপক্ষে, পরীক্ষণ-পাত্রকে বলা থাকিত যে, তিনি যখনই ক্ষুধার তীব্রতা বা তাড়না বোধ করিবেন, ততবারই যেন একটি যোজক (key)-কে আঙ্গুল দ্বারা চাপিয়া দেন। (যোজকটি যতবার টিপা হইত, ততবার উহা মাপযন্ত্রের ফলকে সূচিত হইবার ব্যবস্থা ছিল)। পরীক্ষণের ফলে দেখা যায় যে, যতবারই উদরের পেশী-সঙ্কোচন বেলুনটির দ্বারা নির্দিষ্ট হইতেছে, ততবারই পরীক্ষণ-পাত্রও ক্ষুধার তীব্রতা সম্বন্ধে তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতা নির্দেশ করিবার জন্য যোজক টিপিতেছেন। এই দুইটির পারম্পর্যের ফলে অনুমান করা হয় যে, **ক্ষুধাজনিত সংবেদনের উদ্ভব ঘটে উদরের অনৈচ্ছিক পেশীর সঙ্কোচনের ফলে।**

এই প্রসঙ্গে ক্ষুধার যন্ত্রণা (hunger pangs) এবং আহারের ইচ্ছা (hunger as appetite), এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করিতে হইবে। মোটামুটিভাবে উদর পূর্ণ হইয়া যাইবার পরও অনেকের আহারের বাসনা থাকে (যেমন, অনেকে 'শেষ পাতে' একটু চাটনি বা একটু দই বা একটু রাবড়ী খাইতে ভালবাসে); এরূপ ক্ষেত্রে উদরের অনৈচ্ছিক পেশী সঙ্কোচনের জন্য কোন সংবেদন নাই, অথচ আহারের ইচ্ছা বর্তমান আছে। উদর পূর্ণ হইলে ক্ষুধার তাড়না চলিয়া যায়। এমন কি, ভোজ্য দ্রব্য ব্যতীত অন্য কিছুর দ্বারাও যদি উদর পূর্ণ করা যায়, তাহা হইলেও সাময়িকভাবে ক্ষুধার যন্ত্রণার উপশম হয়। তীব্র আবেগের আবির্ভাবেও সাময়িকভাবে উদরের অনৈচ্ছিক পেশী-সঙ্কোচন বন্ধ থাকে এবং সেই কারণ ঐ অবস্থায় ক্ষুধার যন্ত্রণাবোধ হয় না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সাধারণ অবস্থায় উদরের অনৈচ্ছিক পেশী সঙ্কোচনের ফলে যে সংবেদনের সৃষ্টি হয় তাহারই সহিত ক্ষুধার যন্ত্রণা সংশ্লিষ্ট থাকে। উদর পূর্ণ হইলে এই যন্ত্রণার উপশম হয়; তবে ইহার উপশম ঘটিলেও ব্যক্তি-বিশেষের আহারের ইচ্ছা (বিশেষতঃ, কোন বিশেষ প্রকার খাদ্য খাইবার ইচ্ছা) থাকিতে পারে।[১৩]

১৩ অবশ্য বিশেষ প্রকারের রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, উদর পূরণের অল্প পরেই ক্ষুধার উদ্রেক হয়। যেমন, বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছে এরূপ ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, প্রচুর খাদ্য খাইবার কিছুক্ষণ পরেই সে ক্ষুধা বোধ করে। এ-সকল ক্ষেত্রে কেহ কেহ বলেন যে, দেহের পেশীর প্রয়োজনেই ক্ষুধা দেখা দেয়; আবার কেহ কেহ বলেন যে, রক্তের মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটার ফলেই ক্ষুধা দেখা দেয়।

(খ) তৃষ্ণা (Thirst):

ক্ষুধার ন্যায় তৃষ্ণাও প্রাথমিক সংবেদন। তৃষ্ণারূপ সংবেদনের 'অধিষ্ঠান' হইল 'গলবিল' (pharynx)। লালানিঃসরণকারী গ্রন্থি (salivary gland) সাধারণতঃ তালুদেশকে ভিজা (moistened) রাখে। যখন এই গ্রন্থি হইতে রসক্ষরণ হয় না বা উহা কমিয়া যায়, তখন মুখাভ্যন্তর ও গলদেশ শুষ্ক হইয়া যায় এবং উহাকে পুনরায় ভিজাইয়া তুলিবার জন্য জলের প্রয়োজন হয়।

তৃষ্ণা-সংবেদনের তীব্রতার তারতম্য নানাভাবে ঘটে। প্রথমাবস্থায় ইহা যেন মৃদুভাবে দেহাভ্যন্তরে জলের অভাব সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দেয়। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরিয়া যদি জলের অভাব দূর না হয়, তাহা হইলে ক্রমশঃ ইহা যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠে।

মুখাভ্যন্তর শুষ্ক হওয়া ব্যতীত অন্যভাবেও তৃষ্ণার উদ্রেক হইতে পারে। যেমন, যদি কেহ বহুমূত্ররোগে অথবা মূত্রাশয়ের কোন রোগে ভোগে, অথবা যদি কাহারও অস্বাভাবিক পরিমাণ স্বেদনির্গমন হয়, তাহা হইলে দেহের জলীয় ভাগ অতিরিক্ত নিষ্কাশনের ফলে তৃষ্ণা দেখা দিতে পারে। সেইরূপ, যদি সুস্থ ব্যক্তিকে এ্যাট্রোপিন্ (atropine) ইন্‌জেকশন্ দেওয়া হয়, তাহা হইলেও কৃত্রিম উপায়ে তৃষ্ণার সৃষ্টি হয়। কেহ কেহ বলেন যে, এইগুলি তৃষ্ণার প্রত্যক্ষ কারণ নহে; ইহাদের ফলে লালাগ্রন্থির কার্য ব্যাহত হয় এবং সেইজন্যই তৃষ্ণার উদ্রেক হয়। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে লালাগ্রন্থির সুষ্ঠু কার্য ব্যাহত হয় বলিয়া মুখাভ্যন্তর শুষ্ক হইয়া পড়ে এবং এই শুষ্কতাই তৃষ্ণা-সংবেদনের প্রাথমিক কারণ।

৬। চার্ম সংবেদন (Cutaneous Sensation):

ত্বক্ বা চর্ম হইল পঞ্চেন্দ্রিয়ের অন্যতম। কিন্তু অন্যান্য চারিটি হইতে ইহা পৃথক্। ইহা দেহের কোন একটি বিশেষ অংশে অবস্থিত নহে—ইহা সমগ্র দেহকেই ব্যাপিয়া আছে।[১৪] অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি প্রত্যেকে এক এক

১৪ দেহের বাহ্য চার্মিক আবরণ ব্যতীত মুখ ও নাসিকার অভ্যন্তরেও চার্মিক সংবেদনের উপযুক্ত বিন্দু আছে।

প্রকার সংবেদনের অধিষ্ঠান; কিন্তু চর্ম বা ত্বক্ চারিটি বিভিন্ন প্রকার সংবেদনের কেন্দ্র। চর্মের উপরিভাগ সমভাবে সংবেদনশীল নহে—সমগ্র দেহ ব্যাপিয়া বিভিন্ন প্রকারের বিন্দু (spots বা points) আছে এবং ইহারা উদ্দীপিত হইলে বিভিন্ন প্রকারের চার্ম সংবেদনের উদ্ভব হয়। চার্ম সংবেদন চারি প্রকারের—উত্তাপ সংবেদন (heat sensation), শৈত্য সংবেদন (cold sensation), ব্যথন সংবেদন (pain sensation) এবং প্রেষ সংবেদন (pressure sensation)। বিভিন্ন প্রকারের সংবেদনের জন্য বিভিন্ন প্রকারের বিন্দু সুনির্দিষ্ট আছে এবং ইহাদের উদ্দীপনের ফলে বিভিন্ন প্রকারের চার্ম সংবেদনের সৃষ্টি হয়।

চর্মের দুইটি প্রধান স্তর আছে—উপত্বক্ (epidermis) এবং ত্বক্ (dermis)। বিভিন্ন প্রকার চার্ম সংবেদনের জন্য নির্দিষ্ট বিন্দুর প্রান্তভাগগুলির অধিকাংশই থাকে ডার্মিস্ স্তরে বা ত্বকে।

মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, নিম্নলিখিত ইন্দ্রিয়সমূহের মাধ্যমে এক এক প্রকারের চার্ম সংবেদনের উদ্ভব হয়[১৫] (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

	ইন্দ্রিয়	সংবেদন
(১)	পাসিনি ও রুফিনি করপাসল্স্ (Pacini & Ruffini Corpuscles) ...	উষ্ণতা বা উত্তাপ (Warmth)
(২)	গল্গি ম্যাজোনি করপাসলস্ ও ক্রাউস্ এণ্ড্ বাল্ব (Golgi Mazzoni Corpuscles & Krause End Bulbs)	শৈত্য (Cold)
(৩)	মাইস্নার্ করপাসল্স্ ও কেশোদ্গমবিন্দু (Meissner Corpuscles & Hair Roots) ...	প্রেষ (Touch)
(৪)	ফ্রী নার্ভ এণ্ডিংস্ (Free Nerve Endings)	ব্যথন (Pain)

---

১৫ উপরে যে শ্রেণীকরণ প্রদত্ত হইল তাহা সম্পূর্ণভাবে অভ্রান্ত বা সুনিশ্চিত না হইতে পারে। হেরিক্ (Herrick)-এর ভাষায়: "The correlation of the data of physiological experiments with the anatomical structure of the cutaneous end-organs is still somewhat problematical, and the assignment of endorgans here to the various cutaneous senses should be regarded as provisional rather than as demonstrated."

চার্মিক সংবেদনের উপযুক্ত বিভিন্ন বিন্দুগুলির অবস্থান ও পার্থক্য সম্বন্ধে গবেষণা করেন ব্লিক্স্ (Blix), গোল্ডশাইডের্ (Glodscheider) এবং ডোনাল্ড্‌সন্ (Donaldson)। ইঁহারা প্রধানতঃ উত্তাপ ও শৈত্য বিন্দু লইয়া অনুসন্ধান করেন। সূচ্যগ্রতুল্য প্রান্ত-সমন্বিত একটি ধাতব শলাকাকে যদি ধীরে ধীরে দেহের উপর দিয়া বুলান যায়, তাহা হইলে
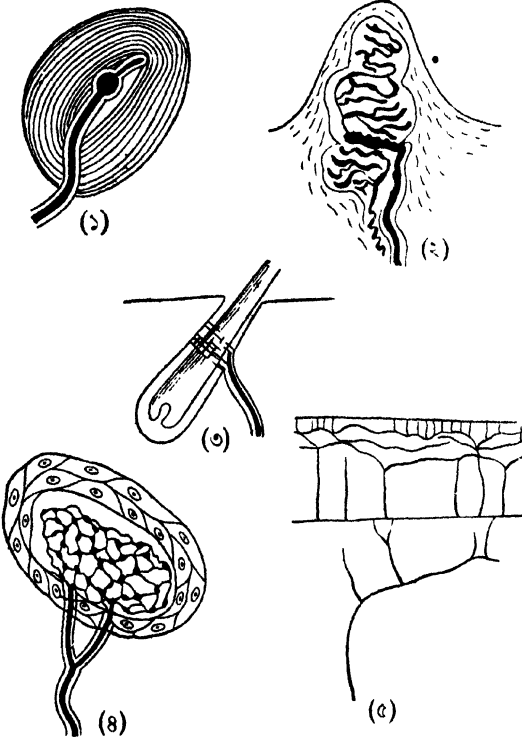
১নং চিত্র।

বিভিন্ন চার্ম সংবেদনের কেন্দ্র।

(১) পাসিনি কর্‌পাসল্‌স্ ; (২) মাইস্‌নার্ কর্‌পাসল্‌স্ ; (৩) কেশোদ্গম কেন্দ্র ; (৪) ক্রাউস্ এণ্ড্ বাল্‌ব ; (৫) ফ্রী নার্ভ এণ্ডিংস্।

এই সকল বিন্দুর অবস্থান আবিষ্কার করা যায়। দেহের অভ্যন্তরীণ রক্তের উত্তাপ প্রায় ৯৮° (ফারেন্‌হাইট্) হইলেও, চর্মের উপরিভাগের উত্তাপ

প্রায় ৮৫°—৯০° ফা. (অথবা প্রায় ২৮° সেন্টিগ্রেড্) থাকে। যদি ঐ শলাকাবিন্দুর উত্তাপ চর্মের উপরিভাগের উত্তাপ অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে চর্মের উপর উহাকে ধীরে ধীরে বুলাইবার সময় স্থানে স্থানে শৈত্য-সংবেদন হইবে এবং স্থানে স্থানে কেবলমাত্র প্রেষসংবেদন হইবে। যে সকল বিন্দু উদ্দীপনমাত্র শৈত্য-সংবেদন হয়, সেইগুলিকে শৈত্যবিন্দু (cold spots) এবং বাকীগুলিকে প্রেষবিন্দু (pressure spots) বলা হয়। অপরপক্ষে, ঐ শলাকাবিন্দুর উত্তাপ যদি চর্মের উপরিভাগের উত্তাপ অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে উহার স্পর্শে স্থানে স্থানে উত্তাপ সংবেদন (heat sensation) হইবে এবং স্থানে স্থানে প্রেষসংবেদন হইবে। যে সকল বিন্দু উদ্দীপিত হওয়ায় উত্তাপ সংবেদন হয়, সেইগুলি উত্তাপবিন্দু এবং বাকীগুলিকে প্রেষবিন্দু বলা যায়।[১৬]

প্রেষবিন্দু ও ব্যথনবিন্দুগুলি আবিষ্কার করেন ফন্ ফ্রে (Von Frey)। বিভিন্ন আকারের ক্ষীণ তন্তু দ্বারা চর্মের বিভিন্ন স্থানগুলি স্পর্শ করিয়া তিনি প্রেষবিন্দুসমূহ আবিষ্কার করেন। সেইরূপ অতি সূক্ষ্ম সূচ দ্বারা স্পর্শ করিয়া চর্মের ব্যথন বিন্দুগুলি আবিষ্কার করা যায়।

পরীক্ষণের ফলে বিভিন্ন প্রকার বিন্দুর সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ পাওয়া গিয়াছে—

ব্যথনবিন্দু — ৩,০০০, ০০০ হইতে ৪,০০০,০০০ ;
প্রেষবিন্দু — ৫,০০,০০০ ;
শৈত্যবিন্দু — ১৫০,০০০ ;
উত্তাপবিন্দু — ১৬,০০০।

হেড্ (Head) এবং রিভার্স্ (Rivers)-পরিচালিত পরীক্ষণের ফল :

হেড্ এবং রিভার্স একটি অভিনব পরীক্ষণ করেন। তাঁহারা নিজেদের চার্ম সংবেদনবাহী নার্ভ কাটিয়া দেন এবং ঐ নার্ভগুলি ধীরে ধীরে

১৬ যদি উদ্দীপক (যেমন, শলাকাবিন্দু)-এর উত্তাপ চর্মের উপরিভাগের উত্তাপের সমান হয় (অর্থাৎ ৮৫°—৯০° ফা.) হয়, তাহা হইলে ঐ উদ্দীপক দ্বারা শৈত্য বা উত্তাপবিন্দুগুলিকে উদ্দীপিত করিলে উত্তাপ বা শৈত্য সংবেদন হয় না। এইজন্য এই উত্তাপকে 'Physiological zero' বলা হয়।

পুনর্বার সংযুক্ত হওয়ার ফলে কী প্রকারের সংবেদনের পুনরাবির্ভাব ঘটে তাহা লক্ষ্য করেন। তাঁহারা লক্ষ্য করেন যে, চর্মেন্দ্রিয় হইতে উদ্দীপন-বহনকারী স্নায়ুতন্তু দুই প্রকারের। বিচ্ছিন্ন নার্ভগুলি পুনর্বার ধীরে ধীরে সংযুক্ত হওয়ার ফলে প্রথমে যে সংবেদন জন্মে তাহা অস্পষ্ট এবং তাহাদের মধ্যে বিনিশ্চয়তাবোধ (sense of discrimination) বিশেষ থাকে না। এই অবস্থায় যে স্নায়ুতন্তুগুলি ক্রিয়াশীল হয় তাহাদের মাধ্যমে ব্যথনসংবেদন জন্মে এবং তাহা ছাড়া, ইহারা অত্যন্ত উষ্ণতা বা অত্যন্ত শৈত্য সম্বন্ধেও সংবেদন জন্মাইতে পারে ; কিন্তু এই অবস্থায় বিভিন্ন প্রকারের চার্মিক সংবেদনের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য সম্বন্ধে কোন জ্ঞান জন্মে না। এই অবস্থার সংবেদনকে **অবিলক্ষ্য বেদিতা** (**protopathic sensibility**) বলে। পরবর্তী অবস্থায় যে সকল অন্তর্মুখী স্নায়ুগুলি ক্রিয়াশীল হইয়া উঠে তাহাদের মাধ্যমে যে সংবেদন জন্মে, তাহার ফলে বিভিন্ন প্রকারের চার্মিক সংবেদনের মধ্যে (অর্থাৎ শৈত্য, উত্তাপ, প্রেষ ও ব্যথন সংবেদনের মধ্যে) সুস্পষ্ট পার্থক্য সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে। বিভিন্ন পরিমাণের উত্তাপের মধ্যে যদি স্বল্প পার্থক্য থাকে তাহাও এই প্রকারের স্নায়ুতন্তুগুলি বুঝিতে পারে। তাহা ছাড়া, বস্তু-বিশেষকে স্পর্শ করিলে উহার আকার ও গঠন সম্বন্ধে যে সংবেদন হয়, তাহাও এই প্রকারের স্নায়ুতন্তুগুলির মাধ্যমে সম্ভবপর হয়। ইহাদের মাধ্যমে পরিবাহিত উদ্দীপন জনিত যে সংবেদন হয় তাহাকে **বিলক্ষ্য বেদিতা** (**epicritic sensibility**) বলে।

হেড্ মনে করেন যে, চর্মেন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত অন্তর্মুখী স্নায়ুতন্তুসমূহের এই পার্থক্য মেরুদণ্ড পর্যন্ত থাকে। গুরুমস্তিষ্কের সংবেদন-অধিষ্ঠান (**sensory area**)-তে এই দুই প্রকার স্নায়ুর কোন পৃথক্ কেন্দ্র নাই।

হেডের এই মতবাদ সম্পূর্ণভাবে সকল পর্যবেক্ষক গ্রহণ করেন নাই। তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার অনুসন্ধানের ফলে এইটুকু প্রমাণিত হয় যে, চর্মেন্দ্রিয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট স্নায়ুতন্তুর মধ্যে গঠনগত পার্থক্য না থাকিলেও চার্মিক সংবেদনের দুইটি প্রাথমিক প্রকারভেদ আছে।

৭। রাসন সংবেদন (Gustatory Sensation):

রাসন সংবেদনের প্রধান ইন্দ্রিয় হইল জিহ্বা। রাসনেন্দ্রিয়ের কার্যক্ষমতার

ফলে আমরা বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করিতে পারি। রাসন সংবেদন অনেক সময়ই ঘ্রাণজ সংবেদনের সহিত মিশ্রিত থাকে; এইজন্য সর্দির জন্য নাসিকার মাধ্যমে খাদ্যের আঘ্রাণ গ্রহণ কার্য যদি ব্যাহত হয়, তাহা হইলে ঐ খাদ্যের স্বাদ সম্বন্ধেও স্পষ্ট বোধ বা জ্ঞান জন্মে না।[১৭] তবে চারিটি স্বাদের রাসন সংবেদনকে 'প্রাথমিক রাসন সংবেদন' বলা যাইতে পারে; যথা তিক্ত, মিষ্ট, অম্ল এবং লবণাক্ত স্বাদ।
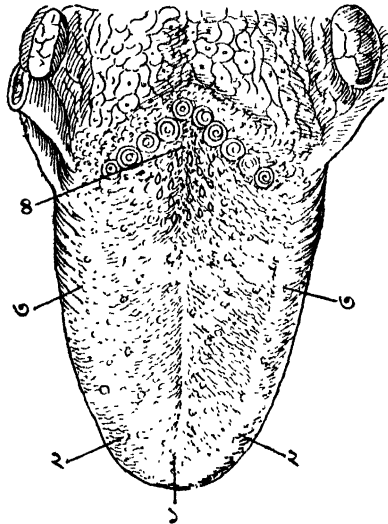
২নং চিত্র।
জিহ্বার উপরিভাগ।

(১) মিষ্টতা আস্বাদন কোরক;
(২) লবণাক্ততা " " ;
(৩) অম্ল " " ;
(৪) তিক্ততা " " ।

বিভিন্ন প্রকার স্বাদ গ্রহণের জন্য গ্রাহক-যন্ত্র (receptors) হইল স্বাদ-কোরক (taste-buds)। জিহ্বাকে পর্যবেক্ষণ করিলে উহার উপরিভাগে

১৭ এই বিষয় একটি পরীক্ষণ করা যায়। যদি পরীক্ষণ-পাত্রের চোখ বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে কয়েক টুক্‌রা আপেল খাইতে দেওয়া হয় এবং ঠিক একই সময় যদি নাসিকার সম্মুখে নাশপাতি রাখিয়া উহার আঘ্রাণ লইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে কোন্ ফল খাইতেছে তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারিবে না।

বহুস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানার ন্যায় গোলাকার সামান্য উন্নত বিন্দু দেখা যায়। জিহ্বার অগ্রভাগে এই উন্নত দানাগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং পশ্চাদ্‌ভাগে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ দানা থাকে। এই উন্নত বিন্দুগুলিকে বলে 'প্যাপিলা' (papilla)। ইহাদের মধ্যে থাকে **স্বাদকোরক (taste buds)**। সর্বসমেত প্রায় ৯ হাজার স্বাদকোরক জিহ্বার উপর আছে বলিয়া অনুমিত হয়। স্বাদকোরক হইতে উদ্গত অন্তর্মুখী স্নায়ুগুলি গুরুমস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্রে সংবেদন পরিবহন করিয়া লইয়া যায় এবং সেখানে উদ্দীপন পৌছিলে রাসন সংবেদন জন্মে।

জিহ্বার এক একটি অংশ এক এক প্রকার প্রাথমিক স্বাদের উদ্দীপক দ্বারা সহজেই এবং তীব্রভাবে উদ্দীপিত হয়। জিহ্বার অগ্রভাগ মিষ্ট স্বাদ দ্বারা সহজেই উদ্দীপিত হয় এবং উহার সন্নিকটেই দুই পার্শ্বে থাকে লবণাক্ত স্বাদ গ্রহণের কেন্দ্র। জিহ্বার দুই পার্শ্ববর্তী অংশ অম্লস্বাদ গ্রহণের প্রধান কেন্দ্র এবং পশ্চাদ্‌বর্তী অংশ তিক্ত স্বাদের প্রধান কেন্দ্র। (২নং চিত্র)। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দ্রবণীয় পদার্থসমূহই স্বাদকোরকগুলিকে উদ্দীপিত করিতে পারে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত কোন পদার্থ কিছু পরিমাণ দ্রবীভূত না হয়, ততক্ষণ উহার স্বাদ বুঝা যায় না; যেমন, মুখের মধ্যে চিনির দানা যখন গলিতে আরম্ভ করে, তখন উহার মিষ্টতা বুঝা যায়।[১৮]

৮। ঘ্রাণজ সংবেদন (Olfactory Sensation):

রাসন সংবেদনের ক্ষেত্রে যেমন দ্রবীভূত রাসায়নিকের সহিত স্বাদ-কোরকগুলির সংস্পর্শ ঘটিলে রাসন সংবেদন ঘটে, সেইরূপ নাসিকার ঘ্রাণ-কোষগুলির সংস্পর্শে বাষ্পীয় পদার্থ আসিলে ঘ্রাণজ সংবেদন হয়। তরল পদার্থ এই ঘ্রাণ-কোষগুলিকে উদ্দীপিত করিতে পারে না। নাসিকার ঘ্রাণ কোষগুলি নাসা গহ্বরের উপরের অংশে শ্লেষ্মা-ঝিল্লীতে অবস্থিত। (৩নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

১৮ যদি একখণ্ড শুক্‌না কাপড় দ্বারা জিহ্বার অগ্রভাগ পুঁছিয়া উহাকে শুষ্ক করিয়া ফেলা যায় এবং তাহার পর ঐ স্থানে চিনির একটি দানা রাখা যায়, তাহা হইলে মিষ্টতার স্বাদ পাওয়া যাইবে না; কিন্তু জিহ্বা চুষিয়া ফেলিলে ঐ স্থান পুনরায় লালাসিক্তি হইয়া যাইবে এবং তখন আবার মিষ্টতা বোধ জাগিবে।

যখন আমরা শ্বাস গ্রহণ করি, তখন যে বায়ু নাসিকা মধ্যে প্রবেশ করে তাহা একটি নালীর মধ্য দিয়া শ্বাসযন্ত্রে যায়; কিন্তু বায়ু ঐ পথ দিয়া যাইবার সময় ঘ্রাণযন্ত্রের ঘ্রাণকোষগুলি বায়ুর সহিত মিশ্রিত গন্ধকণা (effluvia) দ্বারা উদ্দীপিত হয় এবং উহাদের সংশ্লিষ্ট অন্তর্মুখী স্নায়ুপথে
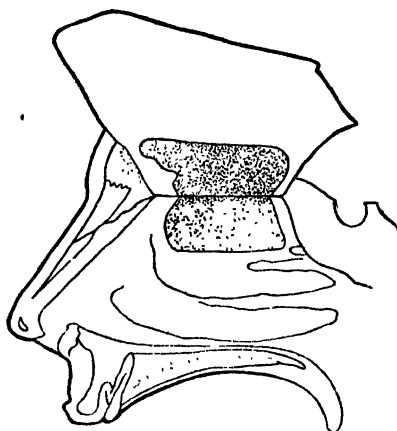
৩নং চিত্র।

নাসিকার ঘ্রাণ গ্রহণ-কেন্দ্র। (ছবিতে ঘন কালো বিন্দু দ্বারা চিহ্নিত)।

গুরুমস্তিষ্কের ঘ্রাণকেন্দ্রে ঐ উদ্দীপন পৌঁছিলে ঘ্রাণজ সংবেদন হয়। বার বার একই উদ্দীপক দ্বারা উহাদের উদ্দীপিত করিলে উহারা ক্লান্ত হইয়া পড়ে—এইজন্য প্রথমে নাসারন্ধ্রে কোন গন্ধ প্রবেশ করিলে উহা যত তীব্র বোধ হয়, কিছুক্ষণ পরে আর সেইরূপ বোধ হয় না।

৯। শ্রবণ বা শ্রৌত্র সংবেদন (Audition বা Auditory Sensation):

(ক) শ্রবণ-যন্ত্রের গঠন (Structure of ear):

আমাদের কর্ণযুগল হইল শ্রবণেন্দ্রিয়—ইহারা যখন বায়ুতরঙ্গ দ্বারা উদ্দীপিত হয় এবং ঐ উদ্দীপন যখন গুরুমস্তিষ্কের শ্রবণাধিষ্ঠানে পৌঁছায় তখন আমাদের শ্রৌত্র সংবেদন হয়, অর্থাৎ আমরা শ্রবণ করি।

মনুষ্যের কর্ণের তিনটি বিভাগ আছে: বাহ্য কর্ণ (outer ear), মধ্য কর্ণ (middle ear) এবং আভ্যন্তর কর্ণ (inner ear)। (৪নং চিত্র)।

(ক) বাহ্য কর্ণ—কর্ণের যে অংশ বাহির হইতে দৃষ্টিগোচর হয় তাহা এবং কর্ণবিবর (ear hole) লইয়া বাহ্য কর্ণ গঠিত। কর্ণবিবরের গাত্র সূক্ষ্ম রোমাবৃত এবং দৈর্ঘ্যে ইহা প্রায় ২'৫ সেণ্টিমিটার। ইহার কার্য হইল বায়ুতরঙ্গ গ্রহণ করিয়া উহাকে মধ্য কর্ণের অভিমুখে চালিত করা।
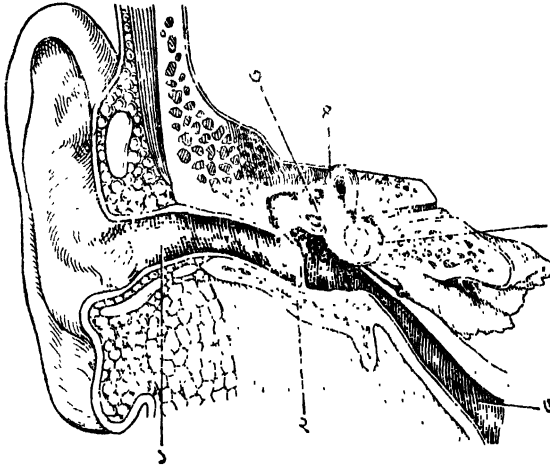
৪নং চিত্র।

শ্রবণ-যন্ত্র বা কর্ণ।

১—কর্ণবিবর ; ২—কর্ণপটহ ; ৩—মধ্যকর্ণের অস্থিত্রয় ; ৪—অর্ধবৃত্তাকার প্রণালী ; ৫—শঙ্কুলী ; ৬—ইউস্টেকিয়ান্ নালী।

(খ) মধ্য কর্ণ—ইহা একটি বায়ুপূর্ণ গহ্বর। ইহার অপর নাম পটহগহ্বর। ইহার দুই পার্শ্বে দুইটি ঝিল্লী (membrane) আছে—বাহ্য কর্ণ হইতে কর্ণ-বিবর যেখানে মধ্য কর্ণের সহিত মিলিত হইয়াছে, সেইখানে একটি ঝিল্লী আছে—ইহা স্থিতিস্থাপকতা-বিশিষ্ট (elastic)। ইহাকে বলে কর্ণ-পটহ (ear-drum বা tympanum)। আবার মধ্যকর্ণ যেখানে আভ্যন্তর বা অন্তঃকর্ণের সহিত মিলিত হইয়াছে, সেইখানে আর একটি ঝিল্লী আছে। এই পটহ-গহ্বরে তিনটি অস্থি আছে—যথা, মুদ্গরাস্থি (hammer), নেহাই অস্থি (anvil) এবং রেকাব অস্থি (stirrup)। (এই তিনটি

অস্থিকে ossicles বলা হয়)। মধ্য কর্ণের সহিত ইউস্টেকিয়ান্ নালী (Eustachian Tube) পথে গলদেশ এবং নাসিকার সংযোগ আছে।[১৯]

(গ) আভ্যন্তর কর্ণ বা অন্তঃকর্ণ—ইহার তিনটি অস্থিময় অংশ আছে; যথা :—

(১) মধ্যকর্ণের 'রেকাব' অস্থির সম্মুখস্থ ঝিল্লী আভ্যন্তর কর্ণের একটি উন্মুক্ত অংশকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে; এই অংশটি আকারে ডিম্বাকৃতি (ইহাকে oval window বলে)।

(২) অর্ধবৃত্তাকার প্রণালী (semi-circular canal)—ইহা কর্ণশঙ্কুলীর উপরে অবস্থিত। ইহা তিনটি অর্ধবৃত্তাকার নালীর সমন্বয়। ইহা আকারে তিনটি ফাঁস দেওয়া একটি ফিতার ন্যায়।

(৩) কর্ণশঙ্কুলী বা শ্রুতি-শম্বুক (Cochlea)—ইহা আকারে শম্বুক বা শামুকের ন্যায়। ইহার ভিতরে এক প্রকার তরলপদার্থ আছে (ইহাকে বলে endolymph); ইহার মধ্যে আছে উদ্দীপন কোষ (বা sensory cells)। (৫নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

ইহার ভিতরের দুইটি ঝিল্লী (membrane) ইহাকে তিনটি কক্ষে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে। মধ্যম কক্ষটিই হইল প্রকৃত শ্রবণেন্দ্রিয় (real organ of hearing বা Corti)। ইহার উপর সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র রোম বা রোঁয়া আছে; বায়ুতরঙ্গের আঘাত যখন কর্ণশঙ্কুলীর অন্তঃস্থ তরলপদার্থকে আন্দোলিত করে, তখন এই সকল রোঁয়াও আন্দোলিত তথা উদ্দীপিত হয়।

(খ) শ্রবণ-প্রক্রিয়ার ক্রম (Stages of Auditory Process):

উপরে সংক্ষেপে কর্ণের তিনটি প্রধান অংশের গঠন-বৈচিত্র্য বর্ণনা

১৯ উড়োজাহাজ বা এরোপ্লেনে উপরে উঠিবার সময় মনে হয় যেন কানের উপর চাপ পড়িতেছে। কিন্তু মুখ হাঁ করিলে এই অস্বস্তিকর ভাব কিছু পরিমাণ দূর হয়। কারণ উপরের বায়ু হাল্কা, সুতরাং কর্ণপটহের উপর বায়ুর চাপ কমিয়া যায়; কিন্তু মধ্যকর্ণে বায়ুর চাপ পূর্বের ন্যায় থাকার জন্য উহাকে ঠেলিয়া দেয়। মুখ হাঁ করিলে ইউস্টেকিয়ান্ নালি পথে মধ্যকর্ণের বায়ু খানিকটা বাহির হইয়া যায় এবং দুই পার্শ্বের চাপ সমান হইয়া পড়ায় এই অস্বস্তিকর ভাব দূর হয়। সেইরূপ যুদ্ধক্ষেত্রে কামানের গোলা ফাটার আওয়াজের সময় সৈন্যরা মুখ হাঁ করে—তাহা না করিলে কেবল বাহ্য কর্ণের ভিতর দিয়া বাতাস আসিয়া কর্ণপটহে আঘাত করিলে উহা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে; কিন্তু ইউস্টেকিয়ান নালিপথে কিছু পরিমাণ বাতাস বাহির হইয়া গেলে দুইদিকে বাতাসের চাপের সাম্য রক্ষা হয়।

করা হইল। এখন প্রশ্ন হইল: শব্দ-সংবেদন কী ভাবে ঘটে? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, ইহা কয়েকটি ক্রম (stage)-এর মধ্য দিয়া ঘটে। (ক) বাহ্য জগতে এক বিশেষ গতিতে বায়ু-কম্পন হইলে বাহ্যকর্ণ উহাকে গ্রহণ করিয়া কর্ণবিবরের পথে উহাকে মধ্যকর্ণের অভিমুখে চালিত করে।
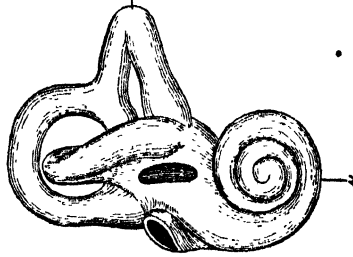
৫নং চিত্র।

উপরের চিত্রে পৃথক্‌ভাবে আভ্যন্তর কর্ণের অর্ধবৃত্তাকার প্রণালী ও শঙ্কুলী দেখান হইয়াছে।
১—অর্ধবৃত্তাকার প্রণালী ; ২—কর্ণশঙ্কুলী বা শ্রুতি-শম্বুক।

শব্দতরঙ্গ আসিয়া কর্ণপটহে (অর্থাৎ মধ্যকর্ণের প্রথম ঝিল্লীতে) আঘাত করে। (খ) উহার ফলে মুদ্গরাস্থি নেহাই-অস্থির উপর এবং নেহাই-অস্থি রেকাব-অস্থির উপর আঘাত করে। রেকাব-অস্থি তখন আভ্যন্তর কর্ণের ডিম্বাকৃতি গবাক্ষের আবরণকারী ঝিল্লীকে আঘাত করে। (এই তিনটি অস্থি একটি অপরটির উপর আঘাত করিয়া বায়ুতরঙ্গকে ২০।৩০ গুণ অধিকতর শক্তিশালী বা magnify করিয়া তুলে)। এইভাবে বায়ুতরঙ্গ মধ্যকর্ণের মধ্য দিয়া আভ্যন্তর কর্ণের অভিমুখে যায়। (গ) আভ্যন্তর কর্ণের ডিম্বাকৃতি গবাক্ষঝিল্লী উদ্দীপিত হইয়া উহার অন্তঃস্থ তরলপদার্থে কম্পনের সৃষ্টি করে; সেই কম্পনের ফলে শ্রুতিযন্ত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রোঁয়াগুলি আন্দোলিত হয়।[20] ঐ উদ্দীপন উহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্তর্মুখী স্নায়ুপথে গুরু-মস্তিষ্কের

২০ আমরা অতিসংক্ষেপে শ্রবণযন্ত্রের কার্যাবলী তথা শব্দসংবেদনের বর্ণনা করিলাম। কিন্তু শ্রুতিযন্ত্রের সকল রহস্য এখনও উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। শ্রুতিযন্ত্রের যে পরিবর্তন তাহা নিছক দৈহিক; উহা কি ভাবে স্নায়ুতন্তুতে বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক পরিবর্তন আনয়ন করে এবং সেইগুলি আবার মস্তিষ্কে পৌঁছাইয়া কি ভাবে মানস সংবেদনের সৃষ্টি করে, তাহা সম্পূর্ণরূপে আমাদের জানা নাই।

শ্রবণ-কেন্দ্র (auditory area)-তে যায় এবং তখন ব্যক্তি-বিশেষের শব্দ-সংবেদন হয়। (৬নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।
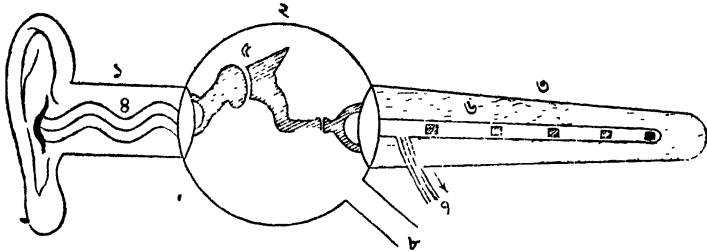
৬নং চিত্র।
শ্রবণ-যন্ত্রের কাল্পনিক নক্সা।

উপরের চিত্রে শ্রবণ-যন্ত্রের একটি নক্সা অঙ্কিত হইয়াছে। ইহাতে শ্রবণ-প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায় বুঝিবার সুবিধা হইবে।

১—কর্ণ বিবর ; ২—মধ্যকর্ণ ; ৩— কর্ণশঙ্কুলী (এখানে কল্পনা করা হইয়াছে যে, উহা জড়ান বা পাকান নাই—উহা খোলা আছে) ; ৪—বায়ুতরঙ্গ ; ৫—মুদ্গার অস্থি, নেহাই অস্থি ও রেকাব অস্থি ; ৬—অন্তঃকর্ণের কম্পমান তরলপদার্থ ; ৭— অন্তর্মুখী স্নায়ু ; ৮—ইউস্টেকিয়ান্ নালী।

বায়ুতরঙ্গ কর্ণবিবরে প্রবেশ করিয়া মধ্যকর্ণের অস্থি-ত্রয়কে ক্রিয়াশীল করিয়া তোলে। ফলে রেকাব অস্থি অন্তঃকর্ণের আবরণকারী ঝিল্লীতে আঘাত করে এবং সেই আঘাতের ফলে উহার তরল-পদার্থে কম্পনের সৃষ্টি হয় ও সূক্ষ্ম রোমগুলি উদ্দীপিত হয়। ঐ উদ্দীপন অন্তর্মুখী স্নায়ুপথে গুরুমস্তিষ্কের শ্রবণ-কেন্দ্রে যায়।

(গ) দেহসাম্য (Equilibrium of the body) :

এ পর্যন্ত আভ্যন্তর বা অন্তঃকর্ণের একটি বিশেষ অংশ—যথা কর্ণশঙ্কুলী বা শম্বুক—কী ভাবে শ্রবণ কার্যে অংশ গ্রহণ করে তাহা বর্ণনা করা হইল। কিন্তু অন্তঃকর্ণের আর একটি অংশের, অর্থাৎ অর্ধবৃত্তাকার প্রণালীর কার্য কী? এই অংশ শ্রবণযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত থাকিলেও ইহা শ্রবণ কার্যে নিযুক্ত থাকে না—ইহা দেহের সাম্যাবস্থা-রক্ষণে সহায়তা করে। ইহার প্রতিটি 'প্রণালী' (canal)-এর প্রান্তদেশ স্ফীত এবং উহার অন্তঃস্থলে সূক্ষ্ম রোম বা উদ্দীপন-স্নায়ুতন্তু থাকে (ইহাদের বলা হয় cristæ)। শ্রুতিযন্ত্র হইতে উদ্গত অন্তর্মুখী স্নায়ুসূত্র যেমন গুরুমস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত, সেইরূপ অর্ধবৃত্তাকার প্রণালীর সহিত সংশ্লিষ্ট স্নায়ুসূত্রগুলি গুরুমস্তিষ্কের নিম্নাঞ্চলের সহিত সংযুক্ত এবং তথা হইতে বহির্মুখী স্নায়ুপথে চক্ষু, স্কন্ধ ইত্যাদির ঐচ্ছিক পেশী এবং আন্তরযন্ত্রের অনৈচ্ছিক পেশীর সহিত সংযুক্ত। কর্ণের এই অংশ

প্রত্যক্ষভাবে কোন সংবেদনের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে; তবে ইহা দ্বারা যে দৈহিক প্রতিক্রিয়া ঘটে তাহার ফলে দেহযন্ত্রীয় বেদন ও পেশীয় বেদন (organic and kinaesthetic sensation) দেখা দেয়।

(ঘ) শব্দতরঙ্গের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of sound waves):

শব্দ-সংবেদনের প্রাথমিক উদ্দীপক হইল বায়ুতরঙ্গ (air waves)। যে কম্পমান বস্তুটির কম্পনের ফলে বায়ুতরঙ্গের সৃষ্টি হয়, তাহা হইল শব্দের উৎস। ইহা কম্পিত হওয়ার ফলে বায়ুমণ্ডলে পর্যায়ক্রমে ঘনীভবন (condensation) এবং লঘুকরণ (rarefaction) হয় এবং ইহারই জন্য তরঙ্গের সৃষ্টি হয়।

বায়ুতরঙ্গের পার্থক্য অনুসারে শব্দের পার্থক্য ঘটে, অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলে কম্পনের বিস্তৃতি ও কম্পন-সংখ্যার তারতম্য অনুসারে শব্দের তারতম্য ঘটে।

কম্পনের বিস্তৃতি বা পরিধি যত বেশী হইবে, শব্দের উচ্চতা (loudness)-ও তত বেশী হইবে। যেমন, একটি সেতারের তারকে খুব জোরে টানিয়া ছাড়িয়া দিলে প্রথমে উহার বিস্তৃতি যেরূপ অধিক স্থানব্যাপী হইবে, সেইরূপ কম্পনের বিস্তৃতিও অধিক হইবে; ফলে উচ্চ শব্দ শুনা যাইবে। কিন্তু উহার কম্পন ক্রমশ: কমিয়া আসিলে শব্দতরঙ্গের পরিধিও কমিয়া যাইবে এবং শব্দও ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যাইবে।

আবার কম্পন যত দ্রুত হইবে, অর্থাৎ কম্পন সংখ্যায় যত বেশী হইবে, শব্দের স্বনতীক্ষ্ণতা বা **শব্দ-গ্রাম (pitch) তত উচ্চ হইবে।** শব্দ-গ্রাম যত বেশী হইবে, শব্দ তত সরু বা 'মিহি' হইবে। আবার উহা যত কম হইবে, শব্দও তত মোটা হইবে।[২১]

[২১] পুরুষের স্বরনালী (vocal cords) নারীর স্বরনালী অপেক্ষা সাধারণত: স্থূলতর। ইহার ফলে পুরুষের স্বরনালী নারীর অপেক্ষা ধীরে কম্পিত হয়। সুতরাং পুরুষের স্বরের কম্পন-সংখ্যা নারীর স্বরের কম্পন-সংখ্যা অপেক্ষা কম। এইজন্য পুরুষের স্বর সাধারণতঃ মোটা বা ভারী এবং নারীর স্বর সরু।

বাদ্যযন্ত্রও এই প্রণালীতে গঠিত ও ব্যবহৃত হয়। পিয়ানোর বামদিকের রীডের সহিত সংযুক্ত তার ডানদিক অপেক্ষা মোটা; এইজন্য বামদিকে নিম্নগ্রামের শব্দ এবং ডানদিকে উচ্চগ্রামের শব্দ হয়। সেইরূপ সেতার বাজাইবার সময় বামহস্ত দ্বারা তারের দৈর্ঘ্যের হ্রাসবৃদ্ধি করা হয়। তার যত দীর্ঘ হইবে, স্বনকম্পাঙ্ক তত কম হইবে এবং উহা যত ছোট হইবে, স্বনকম্পাঙ্ক তত বেশী হইবে।

বায়ুতরঙ্গের এই দুই বৈশিষ্ট্যকে সংযুক্ত করিলে আমরা চারি প্রকারের শব্দ পাই: মৃদু এবং নিম্নগ্রামের শব্দ (এক্ষেত্রে বায়ু-তরঙ্গের পরিধি ও কম্পন উভয়ই কম); (২) মৃদু অথচ উচ্চগ্রামের শব্দ—যেমন, পাখীর কাকলি (এক্ষেত্রে বায়ু-তরঙ্গের পরিধি কম, কিন্তু কম্পন-সংখ্যা অধিক); (৩) উচ্চ অথচ নিম্নগ্রামের শব্দ—যেমন, সিংহের গর্জন (এক্ষেত্রে বায়ু-তরঙ্গের পরিধি ব্যাপক, কিন্তু স্বনকম্পাঙ্ক কম); (৪) উচ্চ গ্রামের উচ্চ শব্দ—যেমন, মিহি খাদে খুব জোরে কোন বাদ্যযন্ত্র বাজান (এক্ষেত্রে বায়ু-তরঙ্গের পরিধিও ব্যাপক এবং স্বনকম্পন খুব দ্রুত)।

মানুষ খুব নিম্ন স্বনকম্পাঙ্ক হইতে খুব উচ্চ স্বনকম্পাঙ্কবিশিষ্ট শব্দ শুনিতে পায়। তবে ইহার একটি নিম্ন এবং উচ্চ সীমারেখা আছে। শ্রুতিগোচর হওয়ার জন্য স্বনকম্পাঙ্ক সেকেণ্ডে অন্ততঃ ১২ হওয়া প্রয়োজন; এবং মানুষ সাধারণতঃ সেকেণ্ডে ৫০,০০০ কম্পন-বিশিষ্ট পর্যন্ত শব্দ শুনিতে পায়।[২২] তবে এই সীমাদ্বয় সকলের পক্ষে সমান নয়। আবার মানুষ যে শব্দ স্বনকম্পনের সর্বোচ্চ সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে বলিয়া শুনিতে পায় না, অনেক পশু (যেমন, কুকুর) তাহা শুনিতে পায়, আবার মানুষ যে স্বনকম্পবিশিষ্ট শব্দ শুনিতে পায়, অনেক ইতর জীবে হয়ত' তাহা শুনিতে পায় না।

আবার যদিও দুইটি শব্দ একই উচ্চতা ও স্বনকম্পাঙ্কবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলেও তাহাদের পৃথক্ করা যায়। যেমন, হারমোনিয়াম ও ভাইওলিন্ (বা বেহালা) একই সুরে বাজাইলেও উহাদের শব্দকে পৃথক্ করা যায়। ইহা সম্ভব হয় উহাদের **উপস্বন** (**timbre**)-এর পার্থক্যের ফলে। প্রধান স্বন (tone)-এর সহিত ইহা যুক্তভাবে থাকিয়া পার্থক্যের সৃষ্টি করে।

২২ তুলনীয়: 'The range of audible tones is much wider, from about 12 to about 50,000 vibrations." (Titchener, *A Text-book of Psychology*, p. 98).

জেট্-প্লেন (jet plane) উড়িতে আরম্ভের সময় যে কর্ণ-বিদারী শব্দ হয়, তাহা বন্ধ করিবার বিবিধ উপায়ের কথা বৈজ্ঞানিকেরা চিন্তা করিতেছেন। একটি উপায় হইল যে, উহার যন্ত্রচালনার সময় যে বায়ুকম্পনের সৃষ্টি হয়, তাহা যদি এত উচ্চগ্রাম (pitch)-এ করা যায় যে, তাহা মানুষের কর্ণের পক্ষে শ্রুতিগোচর সর্বোচ্চ স্বনকম্পাঙ্কের উর্ধ্বে হইবে, তাহা হইলে মানুষের পক্ষে ঐ শব্দ আর শ্রুতিগোচর হইবে না! এই প্রকার বায়ুতরঙ্গ হইবে শব্দাতীত (*super-sonic*)। হয়ত' কুকুর বা অন্য কোন জীবের পক্ষে উহা আরও অস্বস্তিকর হইবে, কিন্তু মানুষের কোন অসুবিধা হইবে না।

আবার আর একটি দৃষ্টিভঙ্গী হইতে শব্দ দুই প্রকারের হইতে পারে—**সতান শব্দ** (harmony) এবং **বিতান শব্দ** (noise)। যদি শব্দকারী বস্তু দ্বারা বায়ু-তরঙ্গ এলোমেলোভাবে চালিত হয়, এবং তাহা যদি আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তাহা হইলে বিতান শব্দের সৃষ্টি হইবে। অপরপক্ষে, যদি বায়ু-তরঙ্গ কোন মাত্রাসমন্বিতভাবে পরিচালিত হয়, তাহা হইলে যে শব্দের সৃষ্টি হইবে, তাহা হইবে সতান। বাদ্যযন্ত্রে পারদর্শী কোন ব্যক্তি বাদ্যযন্ত্র বাজাইলে সতান শব্দের সৃষ্টি হয়। সতান শব্দ শ্রবণ করিলে মনোমধ্যে সুখানুভূতির উদয় হয়। অবশ্য কোন্ সতান শব্দ কাহার পক্ষে সুখকর মনে হইবে, তাহা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে শিক্ষণ ও অভ্যাসের উপর। সঙ্গীতে উপযুক্ত শিক্ষা না থাকিলে ভারতীয় খেয়াল সঙ্গীত হয়ত' কাহারও কাহারও নিকট সুখকর মনে হইবে না।

(ঙ) শ্রবণ সম্বন্ধে হেল্ম্হোলৎসের মতবাদ (Helmholtz's Theory of Audition):

হেল্ম্হোলৎস শ্রবণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মতবাদ প্রবর্তন করেন। তিনি মনে করেন যে, কর্ণশঙ্কুলীর মাধ্যমে ঝিল্লী (basilar membrane)-এর উপর যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোম বা রোঁয়া আছে, সেইগুলি প্রতিনাদ বা প্রতিধ্বনি (resonance)-এর ক্ষমতাসমন্বিত। যেমন পিয়ানোর সম্মুখে একটি বিশেষ গ্রাম (pitch)-এর শব্দ বাজাইলে ঐ শব্দ-গ্রামের জন্য নির্দিষ্ট তার (string) কাঁপিতে থাকে, সেইরূপ কোন বায়ু-তরঙ্গ কর্ণে প্রবেশ করিলে উহা কর্ণশঙ্কুলীর একটি নির্দিষ্ট রোমাকৃতি স্নায়ুতন্তুকে কম্পিত করে অর্থাৎ উদ্দীপিত করে এবং অন্যান্য তন্তুগুলি অকম্পিত থাকে। এই ক্ষুদ্র রোমাকৃতি স্নায়ুতন্তুসমূহ দৈর্ঘ্যে বিভিন্ন আকার সমন্বিত। যেগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্র, সেইগুলি উচ্চ শব্দে উদ্দীপিত হয় এবং যেগুলি অপেক্ষাকৃত বড়, সেইগুলি ক্ষীণ শব্দে উদ্দীপিত হয়।

এই মতবাদ বিভিন্ন প্রকার বধিরত্ব ব্যাখ্যা করিতে পারে। যেমন, কেহ কেহ উচ্চ স্বরের শব্দ শুনিতে পায় না; ইহাদের সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র স্নায়ুতন্তু নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া অনুমান করা হয়। আবার কেহ কেহ বিশেষ বিশেষ স্বনকম্পের শব্দ শুনিতে পায় না, অথবা মাত্র একটি

বিশেষ স্বনকম্পের শব্দ শুনিতে পায় এবং উহা অপেক্ষা কম বা বেশী স্বনকম্পের শব্দ শুনিতে পায় না।[২৩] এই সকল ক্ষেত্রে কল্পনা করা হয় যে, ঐ সকল ব্যক্তি যে সকল স্বনকম্পের শব্দ শুনিতে পায়, তাহাদের উপযুক্ত রোমাকৃতি স্নায়ুতন্তু সুস্থ আছে এবং যেগুলি শুনিতে পায় না, তাহাদের উপযুক্ত স্নায়ুতন্তু নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

এই মতবাদের অসুবিধা হইল যে, ইহা ধারণা করা কষ্টসাধ্য। যেখানে স্নায়ুতন্তুর সংখ্যা হইল ২৪,০০০ এবং দৈর্ঘ্য মাত্র ০'০৪ হইতে ০'৪৯ মিলিমিটার, এবং যেখানে প্রায়ই ১৫ হইতে ২০,০০০ পর্যন্ত স্বনকম্পনে উহাদের প্রতিক্রিয়া করিতে হয়, সেখানে প্রতিটি বিভিন্ন কম্পনের জন্য এক একটি করিয়া স্নায়ুতন্তু কাজ করিতেছে, ইহা কল্পনা করা দুঃসাধ্য।

হেল্‌ম্‌হোলৎসের পরবর্তী কালে পর্যবেক্ষকগণ কয়েকটি পরীক্ষণ করেন; তাহাতে তাঁহার মতবাদ সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত না হইলেও একেবারে মিথ্যা প্রমাণিতও হয় নাই। কয়েকটি গিনিপিগের কানের নিকট ক্রমান্বয়ে তীক্ষ্নস্বরে বাঁশী (whistle) বাজান হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ তাহাদের কর্ণশষ্কুলীর কতকাংশ নষ্ট হইয়া যায়। পরে অস্ত্রোপচার করিয়া দেখা যায় যে, কর্ণশষ্কুলীর কেবলমাত্র কয়েকটি দীর্ঘতন্তু নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহা নহে, বরং উহার একটি দিক্ (যে দিকে দীর্ঘতন্তুগুলি আছে) নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এই পরীক্ষণের আলোকে বলা যাইতে পারে যে, হেল্‌ম্‌হোলৎসের মতবাদ আংশিকভাবে বা মোটামুটি গ্রহণযোগ্য।

১০। চাক্ষুষ সংবেদন (Visual sensation):

(ক) অক্ষির গঠন (Structure of eye):

চক্ষুরিন্দ্রিয় হইল দৃষ্টি-যন্ত্র। করোটির অক্ষি-গহ্বরে অক্ষিদ্বয় অবস্থিত। চক্ষু গোলক দুইটি উহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট পেশী দ্বারা অক্ষিগহ্বরে বিভিন্ন দিকে চালিত হয়। সম্মুখভাগে উহারা অক্ষিপুট (eye lid) দ্বারা সংরক্ষিত থাকে।

২৩ ইহাদের যথাক্রমে 'tonal gaps' এবং 'islands of hearing' বলে।

চক্ষু-গোলকের গাত্র তিনটি স্তর লইয়া গঠিত। (ক) বাহির দিক্ হইতে আরম্ভ করিলে প্রথম স্তরটি হইল একটি **অস্বচ্ছ শ্বেতস্তবক** (scleotic coat)। ইহা সম্মুখ ভাগের শ্বেত অংশের সহিত মিলিত হইয়াছে। সম্মুখ ভাগের শ্বেত অংশকে (যাহা বাহির হইতে দেখা যায়) বলে অচ্ছোদ পটল (cornea)। (খ) শ্বেত স্তবকের পরবর্তী স্তর হইল **রক্তনালী ঘটিত ঝিল্লী** (choroid)। (গ) তাহার পরবর্তী স্তর হইল **অক্ষিপট** (retina)। ইহারই উপর দৃষ্ট-বস্তুর প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়। ইহা হইল অত্যন্ত সংবেদনশীল (sensitive)। ইহার আবার অনেকগুলি স্তর আছে। এই স্তরগুলির মধ্যে দণ্ডকোষ (rod cells) এবং শঙ্কুকোষ (cone cells), এই দুইটির স্তরই হইল সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়।

অক্ষিগোলকের মধ্যে **তিনটি তরল পদার্থ** থাকে। (ক) অচ্ছোদ-পটলের পশ্চাতে এক প্রকার তরল পদার্থ থাকে (ইহাকে বলে **aqueous humour**); (খ) তাহার পর একটি তরল পদার্থ জমাট বাঁধিয়া স্বচ্ছ কাচের আকার ধারণ করিয়াছে। ইহাকে বলে 'কাঁচ', 'অক্ষিমুকুর' বা লেন্স (lens)। ইহার মধ্য দিয়া আলোক রশ্মি যাইয়া অক্ষিপটের উপর প্রতিফলিত হয়। ইহা পেশীর সাহায্যে অক্ষিগোলকের সহিত সংযুক্ত। (গ) তাহার পশ্চাতে অক্ষিগোলকের মধ্যভাগে জেলির ন্যায় গাঢ়, স্বচ্ছ, তরলপদার্থ আছে (ইহাকে বলে **vitreous humour**)।

বাহির হইতে চক্ষুকে পর্যবেক্ষণ করিলে উহার মধ্যে নিম্নলিখিত অংশ দেখা যায়। (ক) প্রথমে আছে বাহিরের অস্বচ্ছ শ্বেত আস্তরণ। ইহাকে বলে **অচ্ছোদ পটল** (cornea)। (খ) ইহার পশ্চাতে আছে একটি কৃষ্ণবর্ণ বৃত্ত—ইহাকে বলে **কনীনিকা** (iris)। (গ) ইহার মধ্য স্থলে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে—ইহাকে বলে **তারারন্ধ্র** (pupil)। ইহার পশ্চাতে আছে কাঁচ বা লেন্স। তারারন্ধ্রের মধ্য দিয়া আলোক রশ্মি যাইয়া লেন্সের উপর পড়ে। কনীনিকার সহিত সংশ্লিষ্ট পেশীগুলির সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণের ফলে তারারন্ধ্রকে বিস্তারিত ও সঙ্কুচিত করা যায়।

চক্ষুর সহিত **সংশ্লিষ্ট পেশী** প্রধানতঃ দুই প্রকারের : (ক) চক্ষু-গোলকের বাহিরে থাকে চারিটি পেশী (যাহাদের বলে **muscles recti**)—

ইহাদের সাহায্যে চক্ষুকে উপরে উঠান-নামান এবং ডান ও বাম দিকে ঘুরান যায়। তাহা ছাড়া, চক্ষুকে একদিকে ঘুরানর জন্য আর দুইটি পেশী আছে (ইহাদের বলে **muscles obliqui**)। (খ) অক্ষিমুকুর বা লেন্সকে ধরিয়া রাখিয়াছে আর একদল পেশী (ইহাদের বলে **ciliary muscles**)। এই পেশীগুলি সঙ্কুচিত হইলে লেন্সটি শ্লথ বা উত্তল (**convex**) হইয়া পড়ে এবং এইগুলি প্রসারিত হইলে লেন্সটি সমতল বা চেপ্টা হইয়া পড়ে। সুতরাং এই সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে আলোকরশ্মির প্রতিসরণের পরিবর্তন ঘটে।
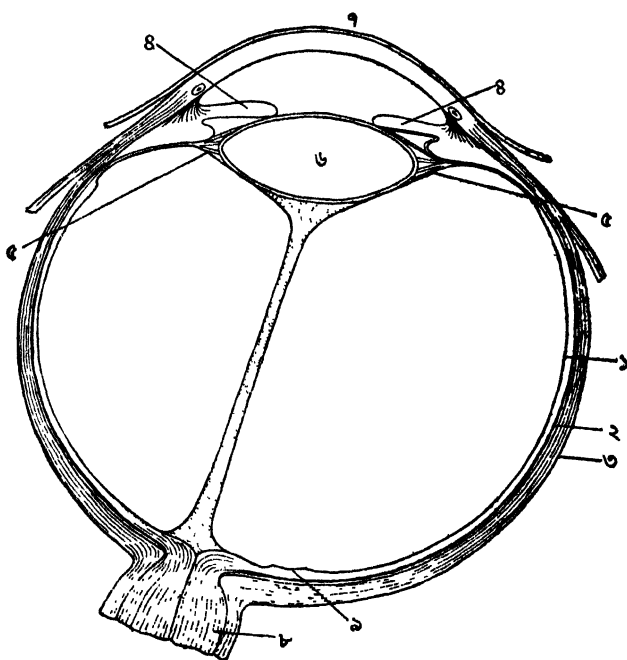
৭নং চিত্র।
চক্ষু।

১—অক্ষিপট; ২—রক্তনালী ঘটিত ঝিল্লী, ৩—অস্বচ্ছ শ্বেতস্তবক; ৪—কনীনিকা (ইহার মধ্যে তারারন্ধ্র); ৫—সিলিয়ারি পেশী; ৬—লেন্স; ৭—অচ্ছোদ পটল; ৮—অন্তর্মুখী স্নায়ু; ৯—ফোভিয়া।

(খ) অক্ষিপটের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the Retina): চক্ষুর গঠনবৈশিষ্ট্য আলোচনা করিতে হইলে পৃথক্‌ভাবে অক্ষিপটের আলোচনা আবশ্যক।

অক্ষিপট হইল সর্বাপেক্ষা সংবেদনশীল স্তর (most sensitive layer)। ইহা স্নায়ুতন্তু ও স্নায়ুকোষ লইয়া গঠিত। ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট স্নায়ুগুলি অক্ষিগোলোকের দ্বিতীয় এবং প্রথম স্তবক (choroid ও sclerotic coat) ছিন্ন করিয়া একটি স্নায়ুপথ (nerve tract) গঠন করিয়াছে এবং উহা শেষ পর্যন্ত গুরুমস্তিষ্কের চাক্ষুষ সংবেদন কেন্দ্রে (visual centre-এ) পৌছিয়াছে।

অক্ষিপটটি সমগ্র অক্ষিগোলকের অন্তর্ভাগ ব্যাপিয়া আছে এবং উহা দুই পার্শ্বে সিলিয়ারি পেশীর নিকট আসিয়া পরিসমাপ্ত হইয়াছে। অক্ষিপটের কেন্দ্রস্থলে তারারন্ধ্রের বিপরীত দিকে **পীতাভ বিন্দু** (yellow spot) আছে। ইহার কেন্দ্রটি অবনমিত (depressed)—ইহাকে বলে 'ফোভিয়া' (fovea centralis)।

যদি অক্ষিপটের প্রস্থচ্ছেদ (cross-section of the retina) অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায়, তাহা হইলে তাহার মধ্যে দশটি স্তর দেখা যায়।[২৪] ইহাদের মধ্যে নবম স্তরটি চাক্ষুষ সংবেদনের প্রকৃত 'গ্রাহক' বা 'ধারক' (true receptors বা end-organs)। এই নবম স্তরে দুই প্রকারের কোষ থাকে। কতকগুলি কোষ দেখিতে ক্ষুদ্র দণ্ডের ন্যায় লম্বা—ইহাদের বলা হয় **দণ্ডাকৃতি কোষ বা দণ্ডকোষ** (rod cells); আবার কতকগুলি কোষ চূড়া বা শঙ্কু (cone)-এর ন্যায়—ইহাদের বলা হয় **শঙ্কুকোষ বা চূড়াকৃতি কোষ** (cone cells)। (৮নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। **দিবালোকে** পীতাভবিন্দু তথা ফোভিয়া অতিমাত্রায় সংবেদনশীল থাকে; তখন **শঙ্কুকোষগুলি কার্য করে** এবং ইহাদের মাধ্যমে যে সংবেদন জন্মে, তাহা **বিভিন্ন বস্তুর**

২৪ **এই দশটি স্তর হইল:** (১) Membrana limitans interna; (২) Layer of optic nerve fibres; (৩) Ganglionic layer; (৪) Inner molecular layer; (৫) Inner nuclear layer; (৬) Outer molecular layer; (৭) Outer nuclear layer; (৮) Membrana limitans externa; (৯) Layer of rods and cones এবং (১০) Layer of Pigment cells.

রঙ্ বা বর্ণ (যথা, লাল, সবুজ, নীল, হলুদ) সম্বন্ধে জ্ঞান দান করে। অপর পক্ষে, **সন্ধ্যা বা গোধূলির আলোকে বা ম্লান আলোকে দণ্ডকোষগুলি কার্য করে**—ইহারা কিন্তু বর্ণসংবেদন জন্মাইতে পারে না। অক্ষিপটের কেন্দ্রবিন্দু (fovea centralis)-এতে কেবল মাত্র শঙ্কুকোষ থাকে এবং তাহার পর শঙ্কুকোষ ও দণ্ডকোষ পাশাপাশি থাকে; কিন্তু ক্রমশঃ অক্ষিপটের প্রান্তসীমার দিকে শঙ্কুকোষ কমিয়া যাইতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত কেবল দণ্ডকোষ থাকে। যেহেতু, ফোভিয়াতে কেবল মাত্র শঙ্কুকোষ থাকে, সেই হেতু উহার অন্ধকার-প্রতিযোজন (**dark adaptation**)-এর ক্ষমতা নাই। স্বল্পালোকে বা ম্লান আলোকে কিন্তু অক্ষিপটের প্রান্তসীমা সর্বাপেক্ষা উদ্দীপিত হয়।
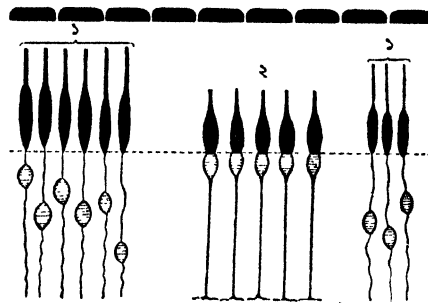
৮নং চিত্র।

অক্ষিপটের কোষ-স্তর।

১—দণ্ড-কোষ ; ২—শঙ্কু-কোষ।

চাক্ষুষ স্নায়ুগুলি যেখানে অক্ষিপট হইতে বাহির হইয়াছে, সেইখানে শঙ্কুকোষ বা দণ্ডকোষ কোনটিই নাই; সেইজন্য এই অংশে যদি কোন বস্তুর প্রতিচ্ছবি পড়ে, তাহা হইলে কোন সংবেদনই হয় না। এই কারণে এই অংশকে **অন্ধবৃত্তক বা দৃষ্টিহীন বিন্দু** (**blind spot**) বলে। একটি সহজ পরীক্ষা দ্বারা উহার অবস্থান জানা যায়। পরপৃষ্ঠার ছবিতে বাম চক্ষু বন্ধ করিয়া ডান চক্ষু দ্বারা গুণচিহ্নটি দেখিতে হইবে। এই অবস্থায় ছবিটি প্রায় ৩০।৩৫ সেন্টিমিটার দূরে ধরিলে গুণচিহ্ন ও গোলক উভয়ই দেখা যাইবে। তাহার পর ধীরে ধীরে দ্রষ্টা উহাকে নিজের

দিকে সরাইয়া আনিলে হঠাৎ এক সময় গোলকটি যেন 'অন্তর্হিত' হইয়া যাইবে। সুতরাং এই অবস্থায় গোলকটির প্রতিচ্ছবি দৃষ্টিহীন বিন্দুতে পড়িল বলিয়া উহাকে দেখা গেল না বুঝিতে হইবে।
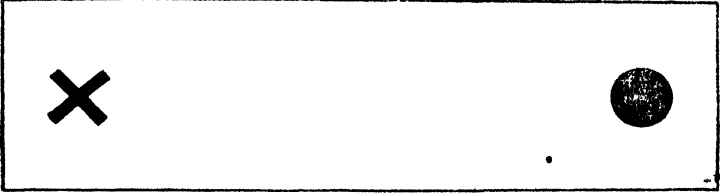
৯নং চিত্র।
দৃষ্টিহীন বিন্দুর অবস্থান-নির্ণয়।

(গ) চাক্ষুষ সংবেদনের বিভিন্ন পর্যায় (Different stages of Visual Sensation) :

চক্ষুরিন্দ্রিয়ের উপযুক্ত উদ্দীপক হইল আলোকরশ্মি।[২৫] যে বস্তুটি আমরা দেখি তাহার প্রতিটি বিন্দু হইতে আলোকরশ্মি বিকীর্ণ হইয়া চক্ষুর উপর আসিয়া পড়ে। **ঐ সকল আলোকরশ্মি কনীনিকার মধ্যস্থ তারারন্ধ্রের পথে আসিয়া লেন্সের উপর পড়ে এবং তথা হইতে অক্ষিগোলকের মধ্যস্থ স্বচ্ছ দ্রবীভূত পদার্থের মধ্য দিয়া যাইয়া অক্ষিপটের উপর প্রতিফলিত হয়।** তাহার ফলে উহার কোষগুলি উদ্দীপিত হয় এবং ঐ স্নায়বিক উদ্দীপন (যাহা বৈদ্যুতিক তরঙ্গের অনুরূপ) স্নায়ুপথে শেষ পর্যন্ত গুরুমস্তিষ্কের চাক্ষুষ সংবেদন কেন্দ্রে (পৃঃ ১৭১) উপনীত হয়। তখন চাক্ষুষ সংবেদন জন্মে। বলা বাহুল্য, ইহাদের কোন একটি কোন কারণে ত্রুটিযুক্ত বা নষ্ট হইলে চাক্ষুষ সংবেদন ব্যাহত হইবে অথবা একেবারেই হইবে না।

এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, **অক্ষিপটের উপর যে প্রতিচ্ছবি পড়ে, তাহা প্রকৃত বস্তুর বিপরীত** (inverted image)।[২৬]

২৫ আলোকরশ্মির তরঙ্গের দৈর্ঘ্যকে প্রকাশ করিবার জন্য যে 'একক' (unit) ব্যবহৃত হয়, তাহাকে মিলিমাইক্রন (millimicron) বলা হয়। এক মিলিমাইক্রন হইল এক মিলিমিটারের ১০,০০০০০ ভাগ। সাধারণতঃ ৪০০ হইতে ৮০০ মিলিমাইক্রনের তরঙ্গ আলোক-সংবেদন সৃষ্টি করে।

২৬ ফোটো তুলিবার পর ক্যামেরার ফিল্মগুলি ধৌত করিয়া আলোতে ধরিলে উহাতে যে বস্তুর ছবি তোলা হইয়াছে তাহার বিপরীত প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। এইজন্য ইহাকে *negative* বলা হয়। চক্ষুর অক্ষিপটেও ঠিক অনুরূপ ঘটনা হয়।

বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া আলোকরশ্মি যখন যায়, তখন উহা সরল রেখার পথে যায়। সুতরাং প্রত্যক্ষগোচর বস্তু হইতে যে সকল রশ্মি চক্ষুর প্রতি ধাবিত হয়, সেগুলি সমান্তরালভাবে চলিতে থাকে। কিন্তু লেন্সে প্রবেশ করিয়া উহারা বাঁকিয়া যায়—যেটি লেন্সের যত বেশী প্রান্তদেশে আসিয়া পড়ে সেটি তত বেশী বাঁকিয়া যায়। ইহার ফলে আলোকরশ্মিসমূহ লেন্সকে অতিক্রম করার পর অক্ষিগোলকের মধ্যে (অর্থাৎ vitreous body-তে আসিয়া) কোন এক বিন্দুতে মিলিত হয়। (১০ নং ছবি দ্রষ্টব্য)। লেন্সের বাহিরে আসিয়া আলোকরশ্মি আর বাঁকিয়া যায় না এবং উহারা আবার সরল পথে চলিতে থাকে। নিম্নাঙ্কিত চিত্রে দেখা যাইতেছে যে, ১নং রশ্মি যাহা দৃষ্ট বস্তুর (এখানে বৃক্ষের) উপরিভাগ হইতে বিচ্ছুরিত হইয়াছিল, তাহা সর্বনিম্নে চলিয়া আসিয়াছে এবং উহার সর্বনিম্ন অংশ হইতে যে রশ্মি (৪নং রশ্মি) বিচ্ছুরিত হইয়াছিল তাহা সর্বোপরি চলিয়া আসিয়াছে। সুতরাং অক্ষিপটে যে প্রতিচ্ছবি
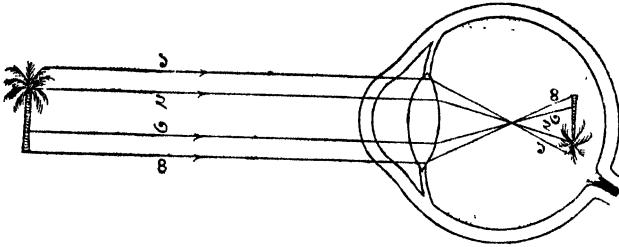
১০ নং চিত্র।

অক্ষিপটে দৃষ্ট বস্তুর প্রতিচ্ছবি কিরূপে বিপরীত হইয়া প্রতিফলিত হয়, তাহাই দেখান হইয়াছে।

পড়িল, তাহা প্রকৃত বস্তুর প্রতিচ্ছবির বিপরীত। মস্তিষ্কে যখন উহার উদ্দীপন পৌছে, মস্তিষ্ক তখন উহাকে সোজাভাবে দেখে।[২৭]

২৭ একদল লোক দূরের জিনিষ দেখিতে পায় না। ইহাদের অক্ষিগোলক স্বাভাবিক অপেক্ষা লম্বা এবং লেন্স উত্তল হইয়া পড়ে। দৃষ্ট বস্তুর ছবি ইহাদের অক্ষিপটের ঠিক উপরে না পড়িয়া সম্মুখে পড়ে। ইহাদের দৃষ্টি-ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে (এইজন্য ইহাকে বলে *Nearsightedness* বা *astigmatism*); অপর আর একদল লোক দূরের জিনিষ দেখিতে পায়, কিন্তু কাছের জিনিষ দেখিতে পায় না (এই অবস্থাকে বলে দূরদৃষ্টিসম্পন্নতা বা *farsightedness*)। ইহাদের অক্ষিগোলক অতিরিক্ত ছোট এবং লেন্স পাতলা হইয়া পড়ে। ইহাদের ক্ষেত্রে দৃষ্ট বস্তুর ছবি অক্ষিপটের পশ্চাতে যাইয়া পড়ে। প্রথম ক্ষেত্রে *minus* এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে *plus* শক্তির চশমা ব্যবহার করিলে ত্রুটি দূর হয়।

(ঘ) চক্ষু ও আলোকচিত্রগ্রহণ-যন্ত্র (Eye & Camera) :

আমরা উপরে চক্ষুর গঠন ও কার্য-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিলাম, তাহা হইতে দেখিতে পাই যে, আলোকচিত্রগ্রহণ-যন্ত্র বা ক্যামেরার সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অনেকাংশে **সাদৃশ্য** আছে ; যথা—

(১) চক্ষুর কনীনিকা (iris) যেমন সঙ্কুচিত বা বিস্ফারিত করিয়া চক্ষুমধ্যে কী পরিমাণ আলোক প্রবেশ করিবে তাহা নিয়ন্ত্রণ করা যায়, সেইরূপ ক্যামেরার ডায়াফ্রাম (diaphragm) নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে কী পরিমাণ আলোক ক্যামেরার ভিতরে প্রবেশ করিবে, তাহা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। (২) চক্ষুর মুকুর বা লেন্সে দৃষ্ট বস্তু হইতে আলোক প্রতিফলিত হইয়া যেমন অক্ষিপট (retina)-তে পড়ে, ক্যামরার লেন্সের মাধ্যমেও যে বস্তুর ছবি তোলা হইতেছে তাহার ছবি ফিল্ম (film)-এ প্রতিফলিত হয়। (৩) অক্ষিপটে দৃষ্ট বস্তুর ছবি বিপরীতভাবে প্রতিফলিত হয়, ক্যামেরার ফিল্মের উপরও ঐরূপ হয়। (৪) চক্ষুর ক্ষেত্রে তারারন্ধ্রের মধ্য দিয়া ব্যতীত অন্য কোন পথে কোন আলোক প্রবেশ করিতে পারে না ; ক্যামেরার ক্ষেত্রেও সম্মুখস্থ ছিদ্র ব্যতীত অন্য কোন পথে আলোক প্রবেশের পথ থাকে না। ক্যামেরার ছিদ্রপথের সম্মুখস্থ আবরণ বন্ধ রাখিলে যেমন উহার ভিতরে আলোক প্রবেশ করে না, সেইরূপ চক্ষুর পাতা বন্ধ রাখিলে উহাতে কোন আলোক প্রবেশ করিতে পারে না।

বলা বাহুল্য যে, কোন কৃত্রিম যন্ত্র কোন সজীব প্রাণীর অঙ্গের পূর্ণভাবে সমতুল্য হইতে পারে না। স্থতরাং চক্ষু ও ক্যামেরার মধ্যে মিল থাকিলেও ঐ দুইটি সম্পূর্ণ একই প্রকারের নহে। উহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে **পার্থক্য** আছে :—

(১) দূরের ও কাছের জিনিষ দেখিবার জন্য প্রয়োজনমত চক্ষুর লেন্সের আকার পরিবর্তন করা যায়—উহাকে কখনও উত্তল, কখনও ন্যুব্জ করা যায় (পৃঃ ৫৯৮)। ক্যামেরার লেন্স শক্ত কাঁচ দ্বারা তৈয়ারী বলিয়া ঐরূপ স্থবিধা নাই—অন্যভাবে উহার 'ফোকাসিং'-এর ব্যবস্থা থাকে। (২) ক্যামেরার ফিল্মে একবারই একটি ছবি তোলা যায় এবং উহাকে পরিবর্তন না করিয়া ছবি তুলিলে ছবি নষ্ট হইয়া যায় ; কিন্তু চক্ষুর অক্ষিপট প্রতিনিয়তই নূতন নূতন বস্তুর 'ছবি' গ্রহণ করিতেছে—উহাকে পরিবর্তনের পৃথক্ কোন ব্যবস্থা নাই (পৃঃ ৫৭৫)। (৩) অক্ষিপটে দৃষ্ট বস্তুর ছবি প্রতিফলিত হওয়া মাত্র আমরা স্বাভাবিক অবস্থায় উহা কিসের ছবি, কোন্ বস্তুর ছবি ইত্যাদি বুঝিতে পারি ; কিন্তু ক্যামেরায়

ব্যবহৃত ফিল্মটি বাহির করিয়া বিশেষ প্রক্রিয়ায় ছাপিলে (develop ও print করিলে) ছবিটি পাওয়া যায়। (৪) চক্ষুর অক্ষিপটে যেমন পৃথক্ পৃথক্ বর্ণের নির্দিষ্ট মণ্ডল (retinal zone) আছে এবং একটি বিন্দু দৃষ্টিহীন, ক্যামেরার ফিল্মে ঐরূপ কোন পৃথক্ পৃথক্ স্থান নাই। (৫) সাধারণ ক্যামেরার ছবিতে বস্তু-বিশেষের 'ঘনত্ব' দেখা যায় না, কিন্তু আমরা দুই চক্ষু দ্বারা যখন ঘনবস্তু (solid object) দেখি, তখন উহার ঘনত্ব বুঝি (পৃঃ ৬৮০)। (৬) সাধারণ ফিল্মে বস্তু-বিশেষের বিভিন্ন বর্ণ (colour) বুঝা যায় না (উহাতে গৃহীত ছবিতে কেবল সাদা-কালো বা আলো-ছায়ার পার্থক্য থাকে), কিন্তু চক্ষুর অক্ষিপটে স্বাভাবিক অবস্থায় (যখন দিবালোকে শঙ্কুকোষগুলি কাজ করে) দৃষ্ট বস্তুর বিবিধ বর্ণ সম্বন্ধে সংবেদন জন্মে। (৭) চক্ষুর জল উহার লেন্সকে সর্বদা পরিষ্কার রাখে, কিন্তু ক্যামেরার লেন্সকে পরিষ্কার রাখিবার ঐরূপ কোন ব্যবস্থা নাই।

১১। বর্ণ-সংবেদন সম্বন্ধীয় কয়েকটি ঘটনা (Some phenomena relating to Colour Sensation) :

পূর্ব অনুচ্ছেদে চাক্ষুষ সংবেদন কি ভাবে সংঘটিত হয় তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, দিবালোকে যখন শঙ্কুকোষগুলি উদ্দীপিত হয়, তখন বর্ণ সংবেদন জন্মে। এই বর্ণ-সংবেদনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। বর্তমান অনুচ্ছেদে এইগুলি আলোচনা করা হইল।

(ক) প্রাথমিক বা মূল বর্ণ (Primary Colours) :

প্রাথমিক বর্ণের সুনির্দিষ্ট তালিকা দেওয়া সম্ভব নহে, কারণ বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে 'প্রাথমিক'-পদটি বিভিন্ন বর্ণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হইয়াছে।

সূর্যের আলোর রঙ্ সাদা। বর্ণালী-বীক্ষণ যন্ত্র (spectroscope)-এ ইহাকে বিশ্লেষণ করিলে উহার মধ্যে সাতটি রঙের সমাবেশ পাওয়া যায়। এই সাতটি রঙ্ হইল,—বেগুনী (violet), নীলবেগুনী (indigo), নীল (blue), সবুজ (green), হলুদ (yellow), কমলা (orange) এবং লাল (red)।[২৮] কেহ কেহ এই সাতটিকে প্রাথমিক বর্ণ বলেন। কিন্তু এই মতের বিরুদ্ধে আপত্তি এই যে, সাতটি বর্ণের সকল-গুলিই সমপর্যায়ভুক্ত নহে ; যেমন, লাল ও হলুদ রঙের সংমিশ্রণে কমলা রঙ্ হয়।

কেহ কেহ বলেন যে, লাল, হলুদ, সবুজ ও নীল (R, Y, G, B) হইল প্রাথমিক বর্ণ। শারীরবিদ্যা (Physiology)-র দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ইহা

২৮ এই সাত বর্ণের আদি অক্ষর গ্রহণ করিয়া ইহাদের সংক্ষেপে একত্রে বলা হয় *vibgyor*।
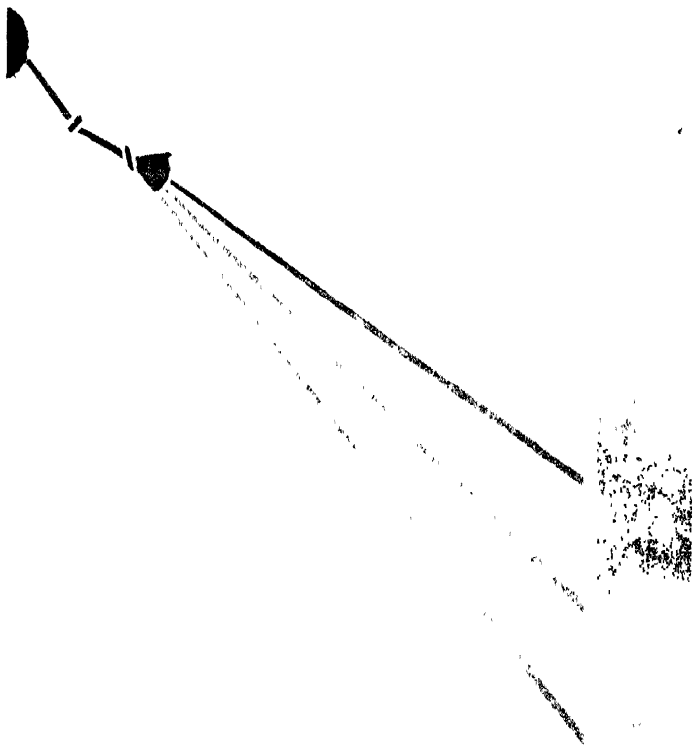
সূর্যের শ্বেত আলোকরশ্মিকে বিশ্লেষণের ফলে বিবিধ প্রাথমিক বর্ণ দেখা যাইতেছে।

(পৃঃ ৫৬৪)

গ্রহণযোগ্য, কারণ অক্ষিপটে এই চারি বর্ণের জন্য চারিটি মণ্ডল (zone) আছে (পৃঃ ৫৬৯)। কিন্তু, পদার্থবিদ্যা (Physics)-এর দৃষ্টিভঙ্গী হইতে একদল বৈজ্ঞানিক হলুদ রঙ্‌কে প্রাথমিক বর্ণ মনে করেন না; তাঁহাদের মতে লাল, সবুজ ও নীল (R, G, B) হইল প্রাথমিক। কারণ তাঁহারা বলেন যে, বিশেষ অনুপাতে লাল ও সবুজ মিশাইলে হলুদ রঙের আবির্ভাব ঘটে এবং লাল, সবুজ ও নীল রঙের সংমিশ্রণে সাদা রঙের উৎপত্তি।

চিত্রশিল্পীর প্রয়োজনের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে লাল, হলুদ ও নীল (R, Y, B) হইল প্রাথমিক; কারণ এই তিন রঙের মিশ্রণের তারতম্য ঘটাইয়া শিল্পী প্রকৃতির বহু বিষয়েরই ছবি আঁকিতে পারেন।

মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে এই প্রশ্নের বিশেষ অর্থ নাই; কারণ আমাদের যখনই বর্ণসংবেদন হয়, তখনই উহা একটি 'সরল' সংবেদন রূপে প্রতীত হয়। যেমন, যখন কেহ কমলা রঙ্‌ প্রত্যক্ষ করে, তখন উহাকে লাল ও হলুদ বর্ণের সংমিশ্রণভাবে দেখে না; সেইরূপ সকল প্রাথমিক বর্ণের সমন্বয়ে সাদা রঙের উৎপত্তি, কিন্তু তাই বলিয়া কোন সাদা রঙ্‌ দেখিবার সময় সব কয়েকটি রঙের যুগপৎ সংবেদন হয় না।[২৯]

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বর্ণবিন্যাস অপেক্ষাকৃত জটিল। ঔজ্জ্বল্য ইত্যাদির পার্থক্য অনুসারে ইহাদের স্থান নির্ণয়ের জন্য যদি কোন রেখাঙ্কন ব্যবহার করিতে হয়, তাহা হইলে সরলরেখার সাহায্যে ইহাদের স্থান নির্দেশ করা যায় না। এইজন্য একটির ভূমির উপর অপরটি স্থাপিত এইরূপ বিপরীতমুখী দুইটি 'পিরামিড্‌' বা শঙ্কু অঙ্কন করিয়া বর্ণবিন্যাস বুঝাইবার চেষ্টা করা হয়। ইহাকে বলে **বর্ণ শিখর** (colour pyramid)। সাদা এবং কালো রঙ্‌কে দুইটি শঙ্কুর শীর্ষে স্থাপন করা হয়; ঐ দুই শীর্ষকে সংযোগকারী রেখার উপর ধূসরবর্ণকে দেখান হয় এবং উহাদের ভূমি (base)-এর চারিকোণে লাল, হলুদ, নীল, এবং সবুজ রঙের স্থান নির্দেশ করা হয়।[৩০]

(খ) পরিপূরক বর্ণ (Complementay colours) :

প্রতি বর্ণেরই তাহার বিপরীত একটি পরিপূরক বর্ণ থাকে। বিশেষ

২৯ তুলনীয় : "...psychologically regarded, all colours are equally simple : it is impossible, for instance, by introspective analysis to split up orange into yellow and red." (Titchener, *Text-book of Psychology*, p. 85).

৩০ বিস্তারিত বর্ণনার জন্য Titchener, *Text-book*, p. 63 দ্রষ্টব্য।

অনুপাতে উহাদের মিশাইলে বর্ণহীন সংবেদন (achromatic or colourless sensation) হয়। সাধারণভাবে বলা যায় যে, লাল এবং সবুজ (R-G) রঙ্, আবার হলুদ এবং নীল (B Y) রঙ্ হইল পরস্পরের পরিপূরক।

(গ) অনুবেদন (After-sensation বা **after-image**):

উদ্দীপকের দ্বারা কোন ইন্দ্রিয় উদ্দীপিত হইলে সংবেদন হয়। কিন্তু উদ্দীপক সরাইয়া লইবামাত্র সকলক্ষেত্রে সংবেদনের পরিসমাপ্তি হয় না। অনেকক্ষেত্রে উদ্দীপক অপসারণের অব্যবহিত পরেও অল্পক্ষণ যেন ক্ষীণভাবে সংবেদন চলিতে থাকে। এই প্রকার সংবেদনকে অনুবেদন বলে।

চাক্ষুষ উদ্দীপনের ক্ষেত্রে অনুবেদন দুই প্রকারের হইতে পারে: **সবর্ণ** (positive) এবং **অসবর্ণ** (negative)।[৩১] সবর্ণ সংবেদনের ক্ষেত্রে মূল সংবেদন এবং অনুবেদন একই প্রকারের হয় (তবে তীক্ষ্ণতার পার্থক্য থাকে)। যেমন, ভোরবেলায় উদীয়মান সূর্যের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া যদি চোখ বুজিয়া ফেলা যায় বা ঘরের ভিতরে শাদা দেওয়ালের দিকে তাকান যায়, তাহা হইলে মনে হয় চোখের সামনে তখনও কী যেন জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। সেইরূপ, একটি জ্বলন্ত কাঠি যদি কিছুক্ষণ চক্রাকারে চোখের সাম্‌নে ঘুরান যায় এবং তাহার পর চোখ বুজিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলেও অল্পক্ষণ মনে হইবে যেন আগুন চক্রাকারে ঘুরিতেছে। এইগুলি হইল সবর্ণ অনুবেদন। আবার, যদি লালরঙের কোন কাগজের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া তাহার পরই একটি সাদা কাগজের দিকে তাকান যায়, তাহা হইলে ঐ সাদা কাগজে অল্পক্ষণ যেন একটি ক্ষীণ সবুজ রঙের ছাপ দেখা যাইবে। এক্ষেত্রে মূল সংবেদন ছিল লালরঙের, কিন্তু অনুবেদনটি হইল সবুজ রঙের। ইহাকে অসবর্ণ অনুবেদন বলা যায়। অসবর্ণ অনুবেদনের ক্ষেত্রে মূল উদ্দীপনের সময় যে রঙ্‌টি দেখা যায়, অনুবেদনের সময় তাহার পরিপূরক বর্ণ ক্ষীণভাবে অল্পক্ষণ দেখা যায়।[৩২]

৩১ চাক্ষুষ সংবেদন ব্যতীত অন্যপ্রকার উদ্দীপনের ক্ষেত্রে বিপরীত অনুবেদন (negative after-sensation) সম্ভব নহে।

৩২ এই বিষয় একটি সহজ পরীক্ষণ করা যাইতে পারে। দুইটি ছোট কার্ড লইতে হইবে। একটির উপর একটি পরিষ্কার সাদা কাগজ মারিতে হইবে, অপরটির উপর একটি হলুদ রঙের কাগজ মারিয়া দিতে হইবে। আবার হলুদ রঙের কাগজের মধ্যস্থলে ছোট গোলাকার বা চতুষ্কোণ নীল রঙের আর একটি কাগজ আট্‌কাইয়া দিতে হইবে। এখন যদি কিছুক্ষণ রঙীন কার্ডের দিকে তাকাইয়া সাদা কাড দেখা যায়, তাহা হইলে সাদা কার্ডটির মধ্যস্থল হলুদ রঙ্ এবং চারিপাশ নীল আভাযুক্ত মনে হইবে।

(ঘ) বর্ণ-বৈসাদৃশ্য (Colour-contrast) :

কোন বর্ণের ঔজ্জ্বল্য তাহার সহিত সহ-অবস্থানকারী অথবা উহার অব্যবহিত পরে প্রত্যক্ষগোচর অন্যান্য বর্ণের সহিত তুলনায় হ্রাস বা বৃদ্ধি পায়। যেমন, উজ্জ্বল আলোক দ্বারা সজ্জিত ঘর হইতে যদি অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করা যায়, তাহা হইলে অন্ধকার ঘরের অন্ধকার যেন গাঢ়তর বলিয়া প্রথমে প্রতীত হয়।

এই বৈসাদৃশ্য দুই প্রকারের হইতে পারে—যুগপৎ বা সমকালীন (simultaneous) এবং অনুবর্তী (successive)। যদি একটি কালো এবং একটি সাদা কাগজের উপর উহাদের অপেক্ষা ছোট আকারের দুইটি ধূসর বর্ণের কাগজ লাগাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে যে ধূসর বর্ণ কাগজটি কালো কাগজের উপর লাগান হইয়াছে সেটি অপর ধূসরবর্ণের কাগজ অপেক্ষা উজ্জ্বলতর মনে হইবে। যদি একটি রঙীন কাগজের উপর ধূসরবর্ণের টুক্‌রা টুক্‌রা কাগজ মারিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ ধূসর বর্ণের অংশগুলিতে রঙীন কাগজটি যে রঙের তাহার পরিপূরক বর্ণের ক্ষীণ আভা দেখা যায়। এইগুলিকে বলা যায় যুগপৎ বা সমকালীন বৈসাদৃশ্য।

আবার অনুবর্তী বৈসাদৃশ্য বলিতে অসবর্ণ অনুবেদনকে বুঝায়।

(ঙ) বর্ণান্ধতা (Colour-blindness) :

সকল ব্যক্তির সকল বর্ণের সংবেদন ক্ষমতা থাকে না। কোন বর্ণ সম্বন্ধে যাহার সংবেদন জন্মে না তাহাকে বর্ণান্ধ (colour-blind) বলে। বর্ণান্ধতা দুই প্রকারের, **আংশিক** (partial) এবং **সম্পূর্ণ** (complete)। কেহ কেহ একটি বিশেষ বর্ণ দেখিতে পায় না, এবং ঐ বর্ণ-বিশিষ্ট কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করিলে তাহা ঐ বর্ণের পরিপূরক বর্ণ দ্বারা রঞ্জিত বলিয়া তাঁহার নিকট প্রতীত হয়। যেমন, কোন কোন ব্যক্তি সবুজ বর্ণের ক্ষেত্রে অন্ধ। তাহারা যদি সবুজ বর্ণের কিছু প্রত্যক্ষ করে, তাহা হইলে তাহাদের নিকটে ঐ বস্তু হয়ত' লালবর্ণের বলিয়া মনে হয় ; যেমন, তাহারা সবুজ ঘাস, গাছের সবুজ পাতা ইত্যাদি দেখিয়া বলিবে লাল ঘাস, লাল পাতা। আবার কাহারও কাহারও একাধিক বর্ণ সম্বন্ধে অন্ধতা থাকিতে পারে। আবার কেহ কেহ সম্পূর্ণ বর্ণান্ধ হইতে পারে—ইহাদের নিকট নানাবর্ণ শোভিত সমগ্র জগৎ ধূসর বলিয়া প্রতীত হয়।[৩৩]

---

৩৩ বর্ণান্ধতা সাধারণতঃ বংশানুক্রমিকভাবে আসে। পুরুষদের ভিতর ৮%, এবং নারীর ভিতর ০·৪%-এর কোন না কোন প্রকারের বর্ণান্ধতা আছে বলিয়া অনুমিত হয়।

(চ) বর্ণ-সংমিশ্রণ (Colour-mixture) :

বিভিন্ন বর্ণের মিশ্রণকে বর্ণ-সংমিশ্রণ (Colour-mixture) বলে। এই বর্ণ-সংমিশ্রণ সম্বন্ধে তিনটি প্রধান নিয়ম আছে—ইহাদের বর্ণসংমিশ্রণ সম্বন্ধীয় নীতি (Laws of Colour-mixture) বলে। (ক) প্রথম নিয়ম হইল যে, যদি দুইটি পরিপূরক বর্ণকে বিশেষ অনুপাতে মিশান যায়, তাহা হইলে যে মিশ্রবর্ণের উৎপত্তি হয়, তাহা হইল ধূসর-বর্ণ এবং এই ধূসর বর্ণের ঔজ্জ্বল্য[৩৪] দুইটি মিশ্রিত বর্ণের ঔজ্জ্বল্যের মাঝামাঝি হইবে। (খ) দ্বিতীয় নিয়ম হইল যে, পরিপূরক নহে এইরূপ দুইটি বর্ণকে বিশেষ অনুপাতে মিশাইলে যে বর্ণ হইবে, তাহার বর্ণমাত্র (hue) মিশ্রিত দুইটি বর্ণের মাঝামাঝি হইবে ; যেমন, লাল ও হলুদ রঙ্‌কে মিশাইলে কমলা (orange) রঙের উৎপত্তি হয়। (গ) তৃতীয় নিয়মটি প্রথম নিয়মের রূপান্তর। একটি মিশ্র-বর্ণকে আর একটি মিশ্র-বর্ণের সহিত মিশাইলে যে বর্ণ হইবে, তাহা হইবে ধূসর বর্ণ। আবার এই মিশ্র বর্ণের ঔজ্জ্বল্য মিশ্রিত বর্ণদ্বয়ের ঔজ্জ্বল্যের মাঝামাঝি হইবে।

একটি বৃত্তাকার ক্ষেত্রকে বর্ণালীবীক্ষণযন্ত্রে দৃষ্ট প্রাথমিক বর্ণে রঞ্জিত সাতটি অংশে বিভক্ত করিয়া যদি উহাকে চক্রাকারে খুব জোরে ঘুরান যায়, তাহা হইলে বর্ণ-সংমিশ্রণের ফল প্রত্যক্ষ করা যায়, অর্থাৎ মনে হইবে যে, একটি সাদা রঙের চাকা ঘুরিতেছে। এই প্রকার রঙীন বৃত্তাকার ক্ষেত্রকে **বর্ণচক্র** (Colour wheel) বলে। (মাত্র কয়েকটি রঙ্‌ ব্যবহার করিয়াও এরূপ চক্র গঠন করা যায়)।

(ছ) আলোক এবং অন্ধকার প্রতিযোজন (Light and Dark-adaptation) :

আলোর ঔজ্জ্বল্য যদিও রশ্মির বিস্তৃতি (amplitude) ও শক্তি (energy)-র উপর নির্ভর করে, তাহা হইলেও ঔজ্জ্বল্য সম্বন্ধে প্রতীতি ব্যক্তি-বিশেষের অব্যবহিত পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার উপর কতকাংশে নির্ভরশীল। মধ্যাহ্নকালে সূর্যালোকে আলোকিত পথ হইতে যখন আমরা সিনেমা বা থিয়েটারের অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করি, তখন প্রথমে কিছুই দেখা যায় না ; কিন্তু একটু পরে প্রেক্ষাগৃহের আসন ও দর্শকদের অস্পষ্টভাবে দেখা যায়। ইহার কারণ হইল যে, অন্ধকারে স্বল্পক্ষণ অবস্থানের ফলে চক্ষুদ্বয় উহাতে অভ্যস্ত হইয়া

৩৪ আলোকতরঙ্গের দৈর্ঘ্যের দ্বারা বর্ণমাত্রা (hue) নির্ধারিত হয় এবং উহার বিস্তৃতি (amplitude) দ্বারা উহার শক্তি তথা ঔজ্জ্বল্য (brightness বা luminance) নির্ধারিত হয়।
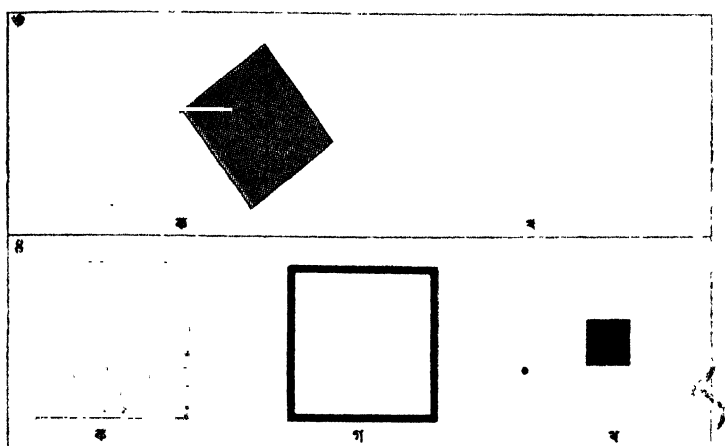
(৩) পরিপূরক বর্ণ (পৃঃ ৫৬৫)

(৪) অনুবেদন সম্বন্ধে পরীক্ষণ—প্রথমে 'ক' অথবা 'খ' চতুষ্কোণের প্রতি কিছুক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া ঠিক পরেই মধ্যস্থ 'গ' চিহ্নিত স্থানে শ্বেত চতুষ্কোণ দেখিলে অনুবেদনের ফল বুঝা যাইবে। (পৃঃ ৫৬৬)
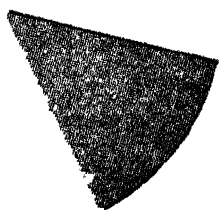
বর্ণচক্র (পৃঃ ৫৬৮

গেল। ইহাকে অন্ধকার-প্রতিযোজন (dark-adaptation) বলে। আবার অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহ হইতে আলোকিত পথে আসিলে প্রথমে বাহিরের আলোক অতি উজ্জ্বল বলিয়া প্রতীত হয়; অল্পক্ষণ পরে উহা আর তত উজ্জ্বল বোধ হয় না। ইহা হইল আলোক-প্রতিযোজন (light-adaptation)

(জ) পুর্‌কিন্‌য়ী ঘটনা (Purkinjie phenomenon) :

দিবালোকে বা অত্যুজ্জ্বল কৃত্রিম আলোকে এবং গোধূলির আলোকে বা ম্লান নিষ্প্রভ আলোকে বর্ণের ঔজ্জ্বল্যের কিরূপ তারতম্য ঘটে সে বিষয়ে অষ্ট্রিয়াবাসী পুর্‌কিন্‌য়ী দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বিভিন্ন বর্ণের ঔজ্জ্বল্যের যে পার্থক্য আবিষ্কার করেন, তাহাই 'পুর্‌কিন্‌য়ী ঘটনা' (Purkinjie phenomenon) নামে পরিচিত। তিনি দেখান যে, অত্যুজ্জ্বল আলোকে বা দিবালোকে অভ্যস্ত বা প্রতিযোজিত চক্ষুর নিকট লাল এবং হলুদ বর্ণ (এবং উহাদের সংমিশ্রণে উৎপন্ন কমলা রঙ্) উজ্জ্বলতর বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু ম্লান আলোকে বা অন্ধকারে প্রতিযোজিত চক্ষুদ্বয়ের পক্ষে সবুজ এবং নীল রঙ্ অন্যান্য রঙ্ অপেক্ষা উজ্জ্বলতর বলিয়া বোধ হয়।

(ঝ) অক্ষিপটের মণ্ডল (Retinal zones) :

অক্ষিপটের সকল অংশের সংবেদনশীলতা সমান নহে। আমরা পূর্বে (পৃঃ ৫৬০) দেখিয়াছি যে, অক্ষিপটের যে অংশ হইতে অন্তর্মুখী স্নায়ু বাহির হইয়াছে, সেখানে কোন বস্তুর প্রতিচ্ছবি পড়িলে, চাক্ষুষ সংবেদন হয় না। উহা হইল 'অন্ধ বিন্দু' (blind spot)। আবার বাকী অংশেও সকল বর্ণের সংবেদন হয় না। কেন্দ্রবিন্দু (fovea centralis)-তে প্রতিচ্ছবি পড়িলে সকল বর্ণের সংবেদন হয়। অক্ষিপটের প্রান্তদেশে প্রতিচ্ছবি পড়িলে কোন বর্ণেরই সংবেদন হয় না। মধ্য মণ্ডল (intermediate-zone)-এ কেবল নীল ও হলুদ বর্ণের সংবেদন হয়। সুতরাং বর্ণসংবেদন অনুসারে অক্ষিপটকে তিনটি মণ্ডলে ভাগ করা যায়: কেন্দ্রমণ্ডল বা সর্ববর্ণমণ্ডল (central বা panchromatic zone), মধ্যমণ্ডল (intermediate zone) এবং প্রান্ত-মণ্ডল বা বর্ণহীন মণ্ডল (peripheral বা achromatic zone)।[৩৫]

---

৩৫ পরিধিমাপক যন্ত্র 'পেরিমিটার' (Perimeter)-এর সাহায্যে বিবিধ বর্ণমণ্ডলের অস্তিত্ব স্থিরীকরণ করা হয়। ঐ যন্ত্রে একটি রঙীন চাকা (যেমন, লাল রঙের চাকা) একটি পথে ধীরে ধীরে সরান হয় এবং পরীক্ষণ-পাত্রকে একটি চক্ষু বন্ধ করিয়া একটি ছিদ্র মধ্য দিয়া উহা দেখিতে

১২। চাক্ষুষ সংবেদন সম্বন্ধীয় বিবিধ মতবাদ (Different Theories of Vision) :

আমরা পূর্ব অনুচ্ছেদে চাক্ষুষ সংবেদন-সংক্রান্ত কয়েকটি অবস্থা ও ঘটনার উল্লেখ করিলাম। এই সকল ঘটনার ব্যাখ্যার জন্য বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন মতবাদের প্রবর্তন করিয়াছেন। আমরা এইবার কয়েকটি প্রধান মতবাদের উল্লেখ করিব।

(ক) ইয়ং-হেল্‌ম্‌হোলৎস্ মতবাদ (Young-Helmholtz Theory Vision) :

এই মতবাদ ইয়ং কর্তৃক প্রবর্তিত হয় এবং হেল্‌ম্‌হোলৎস্ কর্তৃক পরিমার্জিত হয়; এইজন্য এই দুইজনের নামানুসারে এই মতবাদের নামকরণ হইয়াছে। এই মতবাদের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হইল নিম্নরূপ :—

(১) **মূল বর্ণ (elementary colour) হইল তিনটি—লাল, সবুজ ও নীল।**[৩৬]

(২) এই তিন প্রকার বর্ণের উদ্দীপন গ্রহণের জন্য **অক্ষিপট (retina)-তে তিন প্রকার 'আলোক-রাসায়নিক পদার্থ' (photo-chemical substance) আছে।** ইহাদেরই জন্য বিভিন্ন বর্ণ সম্বন্ধে সংবেদন সম্ভব হয়।

(৩) সকল বর্ণ-সংবেদনকারী উদ্দীপকই এই তিন প্রকার পদার্থের উপর প্রক্রিয়া করে, কিন্তু বিভিন্ন মাত্রায়। প্রতি পদার্থই তাহার উপযুক্ত উদ্দীপক দ্বারা সর্বাপেক্ষা প্রভাবিত হয়।

(৪) তবে শ্বেতবর্ণের সংবেদনের ক্ষেত্রে তিনটি পদার্থই সমভাবে উদ্দীপিত হয় এবং কৃষ্ণবর্ণ বা কালো রঙের সংবেদনের ক্ষেত্রে ইহারা একেবারেই উদ্দীপিত হয় না।

বলা হয়। কেন্দ্রস্থলে (যেখানে পরীক্ষণ-পাত্র দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে) চাকাটি থাকাকালীন সে চাকাটি লাল রঙের বলিয়া দেখিতে পাইবে; কিন্তু ধীরে ধীরে উহাকে সরাইতে থাকিলে এক সময় সে চাকাটি দেখিতে পাইবে, উহা নড়িতেছে বুঝিতে পারিবে, কিন্তু উহা আর লাল রঙের বলিয়া বোধ হইবে না (হয়ত' উহাকে ধূসর বর্ণের মনে হইবে)। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে চাকাটির প্রতিচ্ছবি অক্ষিপটের এমন এক মণ্ডলে পড়িতেছে যেখানে লাল রঙের সংবেদন সম্ভব নহে।

৩৬ এই তিনটি বর্ণকে আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলিতে হইলে বলিতে হয় : 'carmine red', 'slightly yellowish green' ও 'ultramine blue'।

(৫) যদি অনেকক্ষণ ধরিয়া কোন লাল বর্ণের দ্রব্য প্রত্যক্ষ করিয়া কোন ধূসর বা সাদা রঙের দ্রব্য দেখা যায়, তাহা হইলে উহা ক্ষীণ সবুজ বর্ণাভ বলিয়া প্রতীত হয়। ইহাকে বলা হয় অসবর্ণ অনুবেদন (**negative after-image**) (পৃঃ ৫৬৬)। ইহার কারণস্বরূপ হেল্‌ম্‌হোলৎস্ বলেন যে, লাল রঙের উদ্দীপন গ্রহণের উপযুক্ত আলোক-রাসায়নিক পদার্থটি উদ্দীপনের ফলে ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং ইহারই জন্য সবুজরঙের জন্য নির্দিষ্ট পদার্থটি সক্রিয় হইয়া উঠে।

(৬) বর্ণান্ধতা (colour-blindness)-এর ব্যাখ্যা এই মতানুসারে অপেক্ষাকৃত সরল। যে ব্যক্তি লাল বা সবুজ বর্ণ সম্বন্ধে অন্ধ, তাহার কে.., কারণে ঐ বর্ণের জন্য নির্দিষ্ট 'পদার্থ' ক্রিয়াশীল নহে বুঝিতে হইবে।

(৭) বর্ণ-সংমিশ্রণ (colour-mixture)-কে ব্যাখ্যা করিয়া এই মত বলে যে, তিনটি 'পদার্থের' যুগপৎ উদ্দীপন এবং গুরুমস্তিষ্কে তাহাদের পুনঃ সংশ্লেষণের ফলেই সকল প্রাথমিক রঙের সংমিশ্রণে সাদা রঙের সংবেদন ঘটে।

সমালোচনা ঃ

এই মতবাদ সকলে গ্রহণ করেন না। ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, ইহা জটিল বর্ণ-সংবেদন প্রক্রিয়ার অতি সরল ব্যাখ্যা দান করিয়াছে; ফলে ইহা চাক্ষুষ সংবেদন-সংক্রান্ত সকল ঘটনাকে সুষ্ঠুরূপে ব্যাখ্যা করিতে পারে নাই।

অসবর্ণ অনুবেদন (negative after-sensation বা after-image)-এর ক্ষেত্রে এই মতবাদ যে ব্যাখ্যা দিয়াছে সে সম্বন্ধে আপত্তি এই যে, এই প্রকার অনুবেদন সকল ক্ষেত্রে ক্লান্তির জন্য হয় না। কারণ অতি অল্পক্ষণ প্রত্যক্ষ করিবার পর অথবা দীর্ঘকাল চক্ষুকে বিশ্রাম দিবার পরও উপযুক্ত অবস্থায় অসবর্ণ অনুবেদন হয়। সুতরাং ক্লান্তির ফলেই যে অসবর্ণ অনুবেদন হয়, ইহা বলা সমীচীন হইবে না।

বর্ণান্ধতা সম্বন্ধেও প্রদত্ত ব্যাখ্যা ত্রুটিহীন নহে। এই মত অনুসারে যে ব্যক্তি সবুজ বর্ণ বিষয়ে 'অন্ধ' তাহার ঐ বর্ণসম্বন্ধীয় 'পদার্থ' নষ্ট হইয়া গিয়াছে; ইহা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে ঐরূপ ব্যক্তির পক্ষে সাদা

রঙ্ প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হইত না, কারণ সাদা রঙের উৎপত্তি ঘটে সকল প্রাথমিক রঙের সংমিশ্রণে।

(খ) **হেরিং-এর মতবাদ** (**Hering's Theory of Vision**) **:**

চাক্ষুষ সংবেদন সম্বন্ধে হেরিং যে মতবাদ প্রচার করেন, তাহার বৈশিষ্ট্য নিম্নলিখিতরূপ :

(১) বর্ণ সংবেদন **চারিটি বর্ণ** সম্বন্ধে জ্ঞান দান করে—**লাল, সবুজ, হলুদ ও নীল**। **সাদা ও কালো** সম্বন্ধে যে সংবেদন, তাহা **বর্ণহীন সংবেদন** (colourless sensation)। ইহাদের এক একটি জোড়ায় সাজান যায়—লাল-সবুজ, হলুদ-নীল, সাদা-কালো।

(২) **প্রত্যেক জোড়া রঙের উদ্দীপনের উপযুক্ত একটি করিয়া আলোক রাসায়নিক পদার্থ** থাকে। প্রত্যেক পদার্থের দুইটি বিপরীত ধর্ম থাকে—একটি **গঠন** (**anabolism** বা **assimilation**), **অপরটি অপচিতি** (**katabolism** বা **dissimilation**)।

লাল, হলুদ এবং সাদা আলোকের প্রভাবে ঐ সব 'পদার্থের' অপচিতি ঘটে এবং সবুজ, নীল এবং কালো রঙের আলোকে উহাদের পুনর্গঠন ঘটে।

(৪) প্রত্যেক বর্ণের উপযুক্ত উদ্দীপক কেবল যে তাহার জন্য নির্দিষ্ট 'পদার্থের' উপর ক্রিয়া করে তাহা নহে, উহা সাদা-কালোর জন্য নির্দিষ্ট পদার্থের উপরও ক্রিয়া করে। এইজন্য সকল বর্ণেরই অল্পবিস্তর ঔজ্জ্বল্য থাকে।

(৫) অক্ষিপটে বিভিন্ন বর্ণমণ্ডলের বিভাগ ঐ মণ্ডলে এক এক প্রকারের পদার্থের অস্তিত্ব অনুসারে হইয়াছে বলা যায়।

(৬) সবর্ণ অনুবেদন (positive after-image)-এর কারণ হইল যে, কোন উদ্দীপকের উপর অনেকক্ষণ চক্ষুকে ন্যস্ত রাখার ফলে উহার রাসায়নিক পদার্থের পুনর্গঠন শক্তি অনেক পরিমাণে দুর্বল হইয়া পড়ে।

অপরপক্ষে অসবর্ণ অনুবেদনের কারণ হইল নিম্নরূপ। যখন অক্ষিপটে উদ্দীপন ঘটে, তখন তিনটি পদার্থ নূতন সাম্যাবস্থা গ্রহণ করে। উদ্দীপন শেষ হইলে উহারা পুনরায় পূর্বের সাম্যাবস্থা গ্রহণ করে; উহাদের এই 'প্রত্যাবর্তন' কালে উহারা গুরুমস্তিষ্কে বিপরীত উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

ইহারই ফলে যে বর্ণ প্রথমে উদ্দীপনের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার পরিপূরক বর্ণ দ্বারা উদ্দীপনের অনুরূপ উদ্দীপন সৃষ্ট হয়, অর্থাৎ অসবর্ণ অনুবেদন ঘটে।

(৭) বর্ণান্ধতা নিম্নলিখিতভাবে ঘটিয়া থাকে। যেখানে পূর্ণ বর্ণান্ধতা হয়, সেখানে কেবলমাত্র সাদা-কালোর উপযুক্ত পদার্থ অক্ষিপটে আছে। যেখানে লাল-সবুজ বর্ণযুগল সম্বন্ধে অন্ধতা হয়, সেখানে ইহাদের উপযুক্ত পদার্থ নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং যেখানে নীল ও হলুদ বর্ণদ্বয় সম্বন্ধে অন্ধতা হয়, সেখানে ইহাদের উপযুক্ত পদার্থ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

(৮) পদার্থগুলি একটি একটি নূতন সাম্যাবস্থা গ্রহণ করার ফলে অভিযোজন (adaptation) ঘটে।

সমালোচনা :

হেরিং-এর মতবাদ ইয়ং-হেল্‌ম্‌হোলৎসের মতবাদ অপেক্ষা শ্রেয়ঃ। কিন্তু এই মতেরও কয়েকটি ত্রুটি আছে। কেবলমাত্র রাসায়নিক প্রক্রিয়া—যথা, অপচিতি ও পুনর্গঠন—বর্ণসংবেদনের প্রধান কারণ, ইহা সকলে গ্রহণ করেন না। তাহা ছাড়া, হেরিং বর্ণ-সমুদয়ের যে শ্রেণীকরণ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধেও আপত্তি উঠিতে পারে; কারণ সাদা ও কালো রঙ্ লাল-সবুজ এবং নীল-হলুদ রঙের সহিত ঠিক সমপর্যায়ভুক্ত নহে—যদি লাল-সবুজ বা নীল-হলুদের উপযুক্ত 'পদার্থ' সাম্যাবস্থায় থাকে, তাহা হইলে কোন বর্ণসংবেদন হইবে না, অথচ যদি সাদা-কালোর উপযুক্ত 'পদার্থ' সাম্যাবস্থায় থাকে, তাহা হইলে ধূসর বর্ণের সংবেদন হয়। আবার, বর্ণান্ধতার ক্ষেত্রে হেরিং-প্রদত্ত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে যে, যে সকল ব্যক্তি লাল ও সবুজ দুইটি বর্ণ সম্বন্ধে অন্ধ না হইয়া কেবলমাত্র একটি বর্ণ (অর্থাৎ লাল, সবুজ, নীল, হলুদ এই চারিটির যে কোন একটি) সম্বন্ধে অন্ধ তাহাদের কোন্ 'পদার্থ' নষ্ট হইয়াছে? যদি কেহ লাল সম্বন্ধে অন্ধ হয়, তাহার কি লাল-সবুজের জন্য নির্দিষ্ট পদার্থের মাত্র অর্ধাংশ নষ্ট হইয়াছে বলিতে হইবে? নিশ্চয়ই এইরূপ ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত নহে।

(গ) ফন্ ক্রীসের দ্বৈতবাদ (Duplex Theory of Von Kries):

ফন্ ক্রীস্ বলেন যে, অক্ষিপটে বর্ণ-সংবেদন এবং বর্ণহীন সংবেদনের জন্য

দুইটি পৃথক্ ব্যবস্থা আছে। **বর্ণ-সংবেদনের কালে চূড়াকৃতি বা শঙ্কুকোষ-গুলি (cone cells) এবং বর্ণ-হীন সংবেদনের কালে দণ্ডকোষগুলি (rod cells) ক্রিয়াশীল হয়।** উজ্জ্বল আলোকে বা দিবালোকে শঙ্কুকোষ (cone)-গুলি কার্য করে এবং অস্পষ্ট, নিষ্প্রভ আলোকে বা সন্ধ্যার ম্লান আলোক (**twilight**)-এ দণ্ডাকৃতি কোষগুলি কার্য করে। শঙ্কু বা চূড়াকৃতি কোষগুলি উদ্দীপিত হইলে বর্ণ-সংবেদন জন্মে; অপরপক্ষে দণ্ডাকৃতি কোষগুলি কেবলমাত্র বর্ণহীন আলোছায়ার সংবেদন (colourless বা light & shade sensation) জন্মায়। অক্ষিপটের কেন্দ্রবিন্দু বা ফোভিয়া (fovea)-তে কেবল শঙ্কুকোষ আছে এবং অক্ষিপটের প্রান্তদেশে কেবল দণ্ডাকৃতি কোষ আছে। এইজন্য যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে বর্ণান্ধ তাহার অক্ষিপটের কেন্দ্রবিন্দুস্থ চূড়াকৃতি কোষগুলি কোন কারণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলা যাইতে পারে—তাহার ক্ষেত্রে কেবল দণ্ডাকৃতি কোষগুলি কার্য করিতেছে। পুরকিন্‌য়ী-আবিষ্কৃত ঘটনা কেবলমাত্র সন্ধ্যার ম্লান আলোকে দেখা যায়; অতএব ইহা প্রত্যক্ষ-কালে কেবলমাত্র দণ্ডাকৃতি কোষগুলি কার্য করে।

(ঘ) ল্যাড্-ফ্রাঙ্ক্লিনের মতবাদ (Ladd-Franklin's Theory):

শ্রীমতী ল্যাড্-ফ্রাঙ্কলিন্ (Mrs. Ladd-Franklin) বিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে একটি বর্ণবাদ (colour theory) প্রচার করেন। তিনি মনে করেন যে, বর্তমানে মানুষের যে বর্ণ সংবেদনের ক্ষমতা আছে তাহা সে ধীরে ধীরে বিবর্তনের ফলে লাভ করিয়াছে। আদিম বা প্রাথমিক স্তরে যে সংবেদন ছিল তাহা বর্ণহীন; অর্থাৎ বর্ণহীন সংবেদনের অবস্থা হইতে সবর্ণ-সংবেদনের অবস্থা উদ্ভূত হইয়াছে। অক্ষিপটের প্রান্তদেশে আজও সেই প্রাথমিক অবস্থা বিদ্যমান আছে; সেইজন্য সেখানে কোন কিছুর প্রতিচ্ছবি বা প্রতিবিম্ব পড়িলে বর্ণ-সংবেদন জন্মে না।

এই মত অনুসারে চূড়াকৃতি কোষ এবং দণ্ডাকৃতিকোষ উভয়েতেই একই প্রকারের আলোক-রাসায়নিক পদার্থ আছে। দণ্ডাকৃতি কোষগুলিতে এই 'পদার্থ' অপরিবর্তিত অবস্থায় আছে। কিন্তু কতকগুলি চূড়াকৃতি কোষে এই পদার্থের এইরূপ বিভাগ হইয়াছে যে, উহাদের মাধ্যমে হলুদ এবং নীল বর্ণের সংবেদন জন্মে। আরও পরবর্তী অবস্থায় কতকগুলি চূড়াকৃতি কোষের

মধ্যে এইরূপ পরিবর্তন সংঘটিত হয় যাহার ফলে লাল ও সবুজ রঙ্ প্রত্যক্ষ করিবার ক্ষমতা জন্মে। এইভাবে দুইটি পর্যায়ের মাধ্যমে ক্রমশঃ বর্ণসংবেদনের ক্ষমতার সৃষ্টি হইয়াছে।

(৬) হেক্ট্-প্রবর্তিত মতবাদ (Hecht's Theory of Vision):

সাম্প্রতিক কালে চাক্ষুষ সংবেদন (বিশেষতঃ বর্ণ-সংবেদন) সম্বন্ধে যে সব মতবাদ প্রবর্তিত হইয়াছে, সেগুলি ফন্ ক্রীস্-প্রবর্তিত মতবাদের আলোকেই গঠিত হইয়াছে। এই সব মতবাদের মধ্যে সেলিগ্ হেক্ট্ (Selig Hecht)-এর মত উল্লেখযোগ্য। অক্ষিপটে বর্ণহীন সংবেদন (achromatic sensation) এবং বর্ণ-সংবেদন (chromatic sensation)-এর জন্য দুইটি পৃথক্ ব্যবস্থা আছে—অর্থাৎ দণ্ডাকৃতি কোষ বর্ণহীন সংবেদনের ক্ষেত্রে এবং চূড়াকৃতি কোষ বর্ণ-সংবেদনের ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল হয়—এই মত তিনি গ্রহণ করেন। তাহা ছাড়া, অক্ষিপটকে আলোকচিত্রগ্রহণ-যন্ত্র বা 'ক্যামেরা'র ফিল্মের সহিত তুলনা করিয়া তিনি বলেন যে, ঐ প্রকার ফিল্মে একটি ছবি গ্রহণ করিলে উহা পুনরায় ব্যবহারের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে; কিন্তু অক্ষিপট প্রতিবার ব্যবহারের অব্যবহিত পরেই পুনরায় ব্যবহারের উপযুক্ত হয়। হেক্ট্ মনে করেন যে, অক্ষিপটে আলোক সংবেদনশীল যে পদার্থ (photosensitive substance) থাকে, তাহা আলোক দ্বারা উদ্দীপিত হইবামাত্র কয়েকটি গৌণ বা উপজাত পদার্থ (by-product)-এ বিশ্লিষ্ট (decomposed) হইয়া পড়ে এবং আলোক-উদ্দীপনের অভাব অর্থাৎ অন্ধকার হওয়া মাত্র উহারা পুনরায় সংশ্লিষ্ট (resynthesised) হয়। তাঁহার মতকে সাঙ্কেতিক রূপ দান করিয়া নিম্নলিখিত উপায়ে হেক্ট্ উহা ব্যক্ত করেন:

$$S \underset{\text{Dark}}{\overset{\text{Light}}{\rightleftarrows}} P + A$$
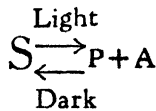
(এখানে 'S' অর্থে বুঝিতে হইবে photosensitive substance বা আলোক-সংবেদনশীল পদার্থ এবং 'P' ও 'A' হইল ঐ পদার্থের বিশ্লেষণের ফলে প্রাপ্ত দুইটি উপজাত বা গৌণ পদার্থ। আলোক-উদ্দীপনের ফলে 'S'-পদার্থটি 'P' এবং 'A'-তে বিশ্লিষ্ট হয় এবং অন্ধকারে উহারা পুনঃ সংশ্লিষ্ট হওয়ায় 'S' পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে)।

আমরা উপরে কয়েকটি প্রধান মতবাদের উল্লেখ করিলাম। ইহাদের কোনটিই চাক্ষুষ সংবেদন-সংক্রান্ত সকল ঘটনার স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারে না। তবে ইহারা চাক্ষুষ সংবেদন-সংক্রান্ত কতকগুলি ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তথা আংশিক ব্যাখ্যা দেয়—এই দিক্ হইতে ইহাদের উপকারিতা আছে।[৩৭]

১৩। সহসংবেদন (Synaesthesia):

এক একটি বিশেষ প্রকারের উদ্দীপক দ্বারা এক একটি ইন্দ্রিয় উদ্দীপিত হয়—ইহা হইল সাধারণ নিয়ম; কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম আছে। মাঝে মাঝে মনে হয় যে, যেন এক ইন্দ্রিয়ের সহিত আর এক ইন্দ্রিয়ের সংযোগ স্থাপিত হয়; ফলে এক ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপনজনিত সংবেদনের সহিত অপর এক ইন্দ্রিয়োচিত সংবেদন দেখা দেয়—অর্থাৎ **একটি ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপনের ফলে একই সঙ্গে দুইটি বিভিন্ন শ্রেণীর সংবেদন হয়। ইহাকে বলে সহসংবেদন** (synæsthesia)। যেমন, কাহারও কাহারও ক্ষেত্রে এইরূপ দেখা গিয়াছে যে, শব্দ শ্রবণ করিলে শব্দ সম্বন্ধে জ্ঞান ত' হয়ই; উপরন্তু ঐ শব্দকে রঙীন্ বলিয়াও জ্ঞান জন্মে। যেমন, এক ব্যক্তির ইংরাজী 'a' অক্ষর শুনিলে হলুদ্ রঙ্ এবং 'e' অক্ষর শুনিলে সবুজ রঙের সংবেদন হইত।[৩৮] সেইরূপ কাহারও কাহারও রাসন সংবেদনের সহিত বর্ণসংবেদন হয় (যেমন, এক ব্যক্তি বলিত যে, তাহার নিকট লবণাক্তস্বাদ হইল লাল, অম্লস্বাদ হইল সবুজ এবং মিষ্টস্বাদ হইল নীল!) এইগুলি অস্বাভাবিকের পর্যায়ে পড়ে। তবে কোন ধাতব বস্তুর সহিত আর একটি ধাতব বস্তুর ঘর্ষণ শুনিলে (যেমন, রাঁধিবার সময় খুন্তি দিয়া কড়া চাঁচার শব্দ শুনিলে) অনেকেরই সমগ্র শরীরে শিহরণ জাগে।

---

৩৭ তুলনীয়: "None of these theories can be said to be complete or to explain all the facts, but they are useful in summarising a number of diverse facts." (Wenger, Jones & Jones, *Physiological Psychology*, p. 225).

৩৮ Galton এই বিষয় লইয়া আলোচনা করেন। তাঁহার রচিত *Inquiries into Human Faculty & its Development* দ্রষ্টব্য।

ঊনবিংশ অধ্যায়

প্রত্যক্ষ

আমরা পূর্ব অধ্যায়ে সংবেদন আলোচনা কালে বলিয়াছিলাম যে, সংবেদনের প্রত্যয়টি একটি বিমূর্ত প্রত্যয় (abstract concept)। পৃথক্‌ভাবে কেবলমাত্র সংবেদনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের অবগতি জন্মে না—কারণ ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষের ফলে সংবেদন হইবামাত্র উহাকে আমরা বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ব্যাখ্যা (interpret) করি এবং উহার উপর নূতন অর্থ আরোপ করি। সংবেদনকে কেন্দ্র করিয়া এই যে অভিজ্ঞতা জন্মে ইহাকে বলা হয় প্রত্যক্ষ।[১] এই প্রত্যক্ষের স্বরূপ নির্ধারণই বর্তমান অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

১। প্রত্যক্ষের স্বরূপ (Nature of Perception):

প্রত্যক্ষ বলিতে আমরা বুঝি **আমাদের সম্মুখে বর্তমানে উপস্থিত আছে এমন কোন বস্তু বা প্রাণী বা ঘটনা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা।** ইহার মূলে আছে ইন্দ্রিয়-উদ্দীপনজনিত সংবেদন এবং এই সংবেদনের ফলে জন্মে কোন কিছু সম্বন্ধে সাক্ষাৎ প্রতীতি।

(ক) ক্রিয়াবাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বলা যায় যে, **প্রত্যক্ষও এক প্রকার ক্রিয়া**—ইহা হইল বাহ্য পরিবেশে কোন পরিবর্তন ঘটিলে তাহাতে প্রতিক্রিয়া করা। বাহ্য পরিবেশ যদি সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত থাকিত, তাহা হইলে প্রত্যক্ষজনিত বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া সম্ভব হইত না। যেমন, বাহ্য পরিবেশে কোন না কোন উত্তাপ (temperature) সর্বদাই আছে; কিন্তু উত্তাপের যখন পরিবর্তন ঘটে, তখন শৈত্য (cold) বা উত্তাপ (warmth) সম্বন্ধে অবগতি জন্মে। অর্থাৎ শৈত্য বা উত্তাপ সম্বন্ধে সংবেদন অনেক পরিমাণে আপেক্ষিক। সেইরূপ আলো বা অন্ধকার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষও আপেক্ষিক।

১ 'প্রত্যক্ষ'-পদের ব্যাস-বাক্য হইল "অক্ষ্ণোঃ সমীপম্"; কিন্তু ব্যাপক অর্থে কেবল অক্ষি নহে যে কোন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে জ্ঞান আসে তাহাই প্রত্যক্ষ-জনিত জ্ঞান।

(খ) আমরা আমাদের পরিবেশের সব কিছু প্রত্যক্ষ করি না; কতকগুলি **নির্বাচিত (selected) বিষয়-বস্তু** প্রত্যক্ষ করি। প্রতি মুহূর্তেই নানাবিধ উদ্দীপক আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে উদ্দীপিত করিতেছে—ইহাদের মধ্যে কতকগুলিকে মন যেন বিশেষভাবে নির্বাচন করিয়া লইয়া সেইগুলির প্রতি মনোযোগ অর্পণ করে এবং তাহাদের বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করে। যেমন, রাস্তায় পথ চলিতে চলিতে পথচারীর দৃষ্টি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তির উপর নিবদ্ধ হয়। হয়ত' উদ্দীপক হিসাবে এইগুলি নূতন বা উজ্জ্বল বা বৃহৎ, অথবা কোন কারণে প্রত্যক্ষকারীর ঐ সকল বিষয়ের প্রতি ঔৎসুক্য বা আগ্রহ আছে। মোট কথা, মনোযোগের যে সকল কারণ পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে (পৃঃ ৪৬০-৬৫), সেইগুলির কোনটি বর্তমান থাকিলেই আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ সেইদিকে যেন ধাবিত হয়। আবার, মনোযোগের ফলে প্রত্যক্ষের বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্টতর হয়।

(গ) প্রত্যক্ষকারীর দৃষ্টিভঙ্গী হইতে তাহার **প্রত্যক্ষের ক্ষেত্র যেন পুনর্বার সুবিন্যস্ত ও সুগঠিত (organized)** হয়। যেমন, যে সকল বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য থাকে, অথবা যেগুলি পরস্পরের নিকটবর্তী, অথবা যাহাদের মধ্যে প্রতিসাম্যতা (symmetry) আছে, সেগুলি সহজেই একত্রে পরিলক্ষিত হয়, অর্থাৎ ঐগুলি এক একটি 'দল' (group) গঠন করে। (পৃঃ ৫৮৩-৫৮৫)।

(ঘ) ইন্দ্রিয় মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্তসমূহের উপর একটি **অর্থ (meaning) আরোপিত** হয়। এই অর্থ কী হইবে, তাহা কতকাংশে নির্ভর করে ব্যক্তিগত প্রাক্তন অভিজ্ঞতা ও শিক্ষণের উপর, সমাজ ও কৃষ্টির প্রভাবের উপর এবং মানসিক প্রস্তুতি (set), প্রতিন্যাস (attitude) ও দৃষ্টিভঙ্গীর উপর।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যক্ষ একটি জটিল প্রক্রিয়া। প্রথমে কোন একটি উদ্দীপন প্রদত্ত হয় এবং তাহাকে কেন্দ্র করিয়া তাহারই উপর নূতন ব্যাখ্যা (interpretation) আরোপিত হয়। এই ভাবে প্রত্যক্ষের বিষয়-বস্তু গঠিত হয়।

২। সংবেদন ও প্রত্যক্ষ (Sensation and Perception):

যদিও আমাদের অভিজ্ঞতায় সংবেদন বলিয়া কোন কিছুর পৃথক্ সত্তা

নাই, তাহা হইলেও আমরা অনুমানের সাহায্যে ইহার কল্পনা করিতে পারি। সেইজন্য প্রশ্ন উঠিতে পারে: সংবেদনের সহিত প্রত্যক্ষের পার্থক্য কোথায়?

এক্ষেত্রে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সংবেদনের সহিত প্রত্যক্ষের মূলগত পার্থক্য নাই—সংবেদনই ব্যাখ্যার ফলে প্রত্যক্ষে রূপান্তরিত হয়। তবে উহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত আপেক্ষিক পার্থক্য আছে:

(ক) সংবেদন হইল সরল, প্রত্যক্ষ হইল জটিল। সংবেদন ব্যাখ্যাত অবস্থায় প্রত্যক্ষের রূপ ধারণ করে—সুতরাং সংবেদনের উপর আরও কিছু আরোপিত হইলে তবে প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়।

(খ) প্রত্যক্ষকে পরিস্ফুট জ্ঞান বলা যায়, কিন্তু সংবেদনে সুস্পষ্ট জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় না। সংবেদন হইল উদ্দীপকের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগের ঠিক প্রথমাবস্থা।

(গ) সংবেদনকে বলা যাইতে পারে, বস্তুর গুণের সহিত পরিচিতির প্রথমাবস্থা; যেমন, লালত্ব, গোলাকারত্ব ইত্যাদি। কিন্তু ঐ সকল গুণের সহিত পরিচিতি ঘটিবামাত্র বস্তু সম্বন্ধে যখন ধারণা জন্মে, তখন তাহাকে প্রত্যক্ষের পর্যায় বলা যায়।

(ঘ) সংবেদনের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, উহা হইল কোন বস্তুর গুণাবলী সদ্যোমাত্র ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে উপস্থাপিত (presented) হইয়াছে এইরূপ অবস্থা এবং প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, যাহা উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহার সহিত আরও কিছু পূর্ব অভিজ্ঞতা ইত্যাদির আলোকে যুক্ত হইয়াছে।[২]

বাস্তবিক পক্ষে, **'বিশুদ্ধ' সংবেদন** (pure sensation)—অর্থাৎ যাহার উপর কোন ব্যাখ্যাই আরোপিত হয় নাই—**সম্ভব নহে।** কারণ যখনই কোন সংবেদন হয়, তখনই আমরা উহাকে কোন-না-কোন প্রকারে ব্যাখ্যা

২ এইজন্য Perception-কে presentative-representative process বলা হয়। যাহা সংবেদনের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়, তাহাই হইল প্রদত্ত 'অংশ' (presentative element) এবং যাহা পুনরায় স্মৃতির মাধ্যমে জাগরিত হয় এবং প্রদত্ত অংশের উপর আরোপিত হয়, তাহাকে বলে আরোপিত বা পুনরুত্থিত 'অংশ' (representative element)। এইভাবে সংবেদনকে ব্যাখ্যা করা হয় বলিয়া অনেক সময় perception = sensation + interpretation এই সমীকরণ (equation) প্রদান করা হয়।

করিবার চেষ্টা করি; অর্থাৎ উহা কী তাহা বুঝিবার চেষ্টা করি। সংবেদন হইবামাত্র উহা নিজেকে 'বিস্তৃত' করিবার চেষ্টা করে। যেমন, যদি ঈষৎ রক্তাভ, ঈষৎ হরিদ্রাভ গোলাকার একটি দ্রব্য দেখি, তখন কেবলমাত্র উহার বর্ণ বা আকার সম্বন্ধে পরিচিতি হইয়াই থামিয়া যায় না—উহা কোন্ বস্তুর বর্ণ ও আকার সে সম্বন্ধে তৎক্ষণাৎ প্রতীতি জন্মে। যেমন আলোচ্য ক্ষেত্রে এইরূপ সংবেদন হইবামাত্র হয়ত' 'কমলালেবু' বলিয়া উহাকে চিনিতে পারি।

সুতরাং সাধারণ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সংবেদন বলিয়া কোন অবস্থা থাকিতে পারে না। যদি বিশুদ্ধ সংবেদন বলিয়া কোন কিছু সম্ভব হয়, তাহা নবজাত শিশুর পক্ষেই সম্ভব হইতে পারে।[৩] কারণ বয়োবৃদ্ধির সহিত যতই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হইতে থাকে, ততই পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে নূতন উদ্দীপককে ব্যাখ্যা করিবার প্রচেষ্টা হয়।

৩। প্রত্যক্ষের বিষয়-বস্তুর সংগঠন (Construction of the Object of Perception):

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে দেখা গেল যে, প্রত্যক্ষের মাধ্যমে আমাদের কোন সুবিন্যস্ত বা সুসংবদ্ধ 'বস্তু' সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হয়। যদিও আমরা প্রত্যক্ষের মাধ্যমে বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি, তাহা হইলেও যাহা আমরা প্রত্যক্ষ করি বলিয়া বিশ্বাস করি (অর্থাৎ প্রত্যক্ষের বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে আমরা যে ধারণা করি), তাহা কেবলমাত্র বাহ্য জগতের বস্তুগত নহে—উহার সহিত আমাদের মনোগত কিছু ভাব বা ধারণা জড়িত হইয়া পড়ে। সুতরাং **প্রত্যক্ষগত জ্ঞান পুরাপুরি বস্তুগত নহে—ইহা কতকাংশে বস্তুগত আর কতকাংশে প্রত্যক্ষকারীর মনঃসঞ্জাত।**[৪]

প্রত্যক্ষের বিষয়-বস্তু গঠনে মন ঠিক কী অংশ গ্রহণ করে, তাহা ব্যাখ্যা করিবার জন্য বিভিন্ন মনোবিৎ মনের বিভিন্ন অবদানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ

---

৩ **কারণ নবজাত শিশুর চেতনা নিতান্ত অস্পষ্ট ও অব্যক্ত। এইরূপ চেতনাকে উইলিয়াম জেম্‌স্** "Booming, buzzing consciousness" **বলিয়াছেন।**

৪ **তুলনীয়:** "In all cases the mind contributes something to the form of what it perceives...It is not only the physical character of the object which determines the pattern." (A. W. P. Walters, *The Evidence of Our Senses*, p. 25).

করিয়াছেন।[৫] আমরা এখানে প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তু রচনায় মনের কয়েকটি প্রধান অবদানের উল্লেখ করিব।

(ক) পুরাতন অভিজ্ঞতার প্রভাব:

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষের ফলে যে সংবেদন জন্মে, পুরাতন অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা উহাদের অনেকাংশে ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। যেমন, দূর হইতে আমরা একটি ঈষৎ রক্তাভ, ঈষৎ হরিদ্রাভ বা সবুজ বর্ণাভ গোলাকার বস্তু দেখিলাম এবং উহাকে কমলালেবু বলিয়া বুঝিতে পারিলাম। ইহার মূলে পূর্ব অভিজ্ঞতার অবদান রহিয়াছে। আমরা পূর্বে কমলালেবু অনেকবার খাইয়াছি, স্পর্শ করিয়াছি, উহার আঘ্রাণ লইয়াছি এবং তখন উহার রঙ্ বা বর্ণ এবং আকার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এখন উহার বর্ণ ও আকার প্রত্যক্ষ করিবামাত্র উহাদের সহিত অনুষঙ্গবদ্ধ পুরাতন অভিজ্ঞতার স্মৃতি জাগরিত হইয়া বর্তমান অভিজ্ঞতার সহিত 'সংমিশ্রিত' হইয়া প্রত্যক্ষের বিষয়-বস্তু গঠনে অংশ গ্রহণ করিল। সুতরাং আমরা কেবলমাত্র আকার ও বর্ণ দেখিয়া উহাদের 'আধার'-স্বরূপ বস্তুটি যে নরম, রসপূর্ণ, সুগন্ধযুক্ত ইত্যাদিও বুঝিতে পারিলাম এবং ইহাও প্রত্যক্ষের

---

৫ **অবয়ববাদী বা গঠনবাদীরা** (যথা, ভুণ্ড্ট্, টিচেনার ইত্যাদি) মনে করেন যে,প্রত্যক্ষ হইল একটি জটিল মানসিক অবস্থা—ইহার মূলে প্রধানতঃ সংবেদন ও প্রতিরূপ, এই দুই উপাদান আছে। ইঁহারা পৃথক্‌ভাবে অর্থ (meaning)-এর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ইঁহাদের মতে প্রত্যক্ষকে বিশ্লেষণ করিয়া উপাদান নির্ণয় করিলেই উহার ব্যাখ্যা পর্যাপ্ত হইবে।

ব্যবহারবাদীরা (যথা, ওয়াট্‌সন্) প্রত্যক্ষের পৃথক্ কোন আলোচনা প্রয়োজনীয় মনে করেন না। তাঁহারা মনে করেন যে, প্রত্যক্ষ ও উহার অন্তর্ভুক্ত তথাকথিত 'অর্থ'-এর আলোচনা কেবলমাত্র কাল্পনিক মানসিক সত্তায় আস্থাবান্ ব্যক্তিরা করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা উহার উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করেন না।

মনঃসমীক্ষণবাদীরা (যথা, ফ্রয়েড্) প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে কোন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন নাই। তবে নব্য ফ্রয়েডীয়রা 'উদ্দেশ্য-প্রত্যক্ষ' (goal-perception) এবং 'আত্ম-প্রত্যক্ষ' (self-perception)-এর কথা বলিয়াছেন।

হরমিক্‌বাদীরা (যথা, ম্যাক্‌ডুগাল) প্রত্যক্ষকে ক্রিয়ারূপে গণ্য করেন এবং উহা যে মূলতঃ নির্বাচনী ক্রিয়া (selective activity), সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

গেস্টাল্ট্‌বাদীরা (যথা, কফ্‌কা, কোয়েলার ইত্যাদি) প্রত্যক্ষের আলোচনায় এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সূচনা করেন; তাঁহারা প্রত্যক্ষের ক্ষেত্র কি ভাবে গঠিত হয়, তাহাই বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। (পৃঃ ৫৮২)।

[প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে বিবিধ মতবাদের আলোচনার জন্য F. H. Allport-প্রণীত *Theories of Perception & the Concept of Structure* দ্রষ্টব্য।]

অভিজ্ঞতার অন্তর্গত হইল। বাস্তবিক যে সকল বস্তু বা যাহাদের সদৃশ বস্তু আমরা বার বার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সেগুলি প্রত্যক্ষ করার এবং তদনুসারে প্রতিক্রিয়া করার ব্যাপারে যেন একটি অভ্যাস জন্মিয়া যায় এবং উহাদের সম্বন্ধে কোন সংবেদন হইবামাত্র আমরা অভ্যাসবশে উহাদের বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করি।[৬]

পুরাতন অভিজ্ঞতার প্রভাবে বিষয়-বস্তুর আকৃতি আমরা 'অপরিবর্তিত' (constant) রূপে প্রত্যক্ষ করি। যখন প্রত্যক্ষের বস্তু আমাদের নিকট হইতে অল্প দূরে লইয়া যাওয়া হয়, অথবা আমরা উহা হইতে অল্প দূরে যাই, তখন অক্ষিপটে উহার প্রতিকৃতি অপেক্ষাকৃত ছোট হইয়া যায় ; অথচ পুরাতন অভ্যাসের প্রভাবে উহাকে আমরা একইভাবে দেখি, অর্থাৎ উহার আকৃতি (size) আমাদের নিকট অপরিবর্তিত থাকে।

পুরাতন অভিজ্ঞতা যে কি ভাবে বর্তমানের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাহার আর একটি উদাহরণ পাওয়া যায় জন্মান্ধ ব্যক্তি যে সব ক্ষেত্রে দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়াছে তাহাদের ক্ষেত্রে। জন্মের সময় কোন কারণে 'ছানি' ছিল এবং পরে তাহা অপসারিত হইয়াছে এরূপ ব্যক্তি যখন দৃষ্টিশক্তি লাভ করিল, তখন দেখা গিয়াছে যে, সে তাহার পূর্বপরিচিত বস্তু বা ব্যক্তিকে কেবল চক্ষু দ্বারা অবলোকন করিয়া ভাল চিনিতে পারিল না, অথচ স্পর্শ করিবার ফলে (যেরূপ প্রক্রিয়া সে অন্ধাবস্থায় গ্রহণ করিত) সে উহাকে ভাল করিয়া চিনিতে পারিল।

বলা বাহুল্য, যেহেতু পূর্ব অভিজ্ঞতা বর্তমানের উপর প্রভাব বিস্তার করে, সেই হেতু পূর্ব অভিজ্ঞতার তারতম্য অনুসারে বর্তমানের দৃষ্টিভঙ্গীরও তারতম্য ঘটে।

(খ) পরিবেশ ও প্রসঙ্গের প্রভাব (Influence of environment and context) :

পরিবেশের তারতম্য আমাদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং তদনুসারে প্রত্যক্ষকারীর মনের দৃষ্টিভঙ্গীরও পার্থক্য ঘটে। অসৎ প্রকৃতির

---

৬ তুলনীয় : "With the few possible exceptions provided by primitive organizations, all perceiving is dependent upon past experience—the so-called *habit factor*." (Munn, *Psychology*, p. 329).

লোকের সংসর্গে যদি আমরা একটি সৎলোককেও দেখি, তাহা হইলে তাহাকে প্রত্যক্ষ করিলে আমরা অনেক সময় তাহাকে অসৎ ব্যক্তিরূপেই 'প্রত্যক্ষ' করিব।

আবার যে প্রসঙ্গে কোন একটি বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা জানা থাকিলে তাহার দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রভাবিত হয়। যেমন, ৪৭৬ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত 'মজার ছবি'র ক্ষেত্রে বলা হইয়াছে যে, তথাকথিত প্রাকৃতিক দৃশ্যের পশ্চাতে কতকগুলি মানুষের মুখ লুকান রহিয়াছে; সুতরাং ছবিটি দেখিবামাত্র মুখগুলি বাহির করিবার চেষ্টা হয় এবং একবার দেখিলে পরে উহাদের উপর প্রায়ই দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়।

(গ) ক্ষেত্র এবং মূর্তি প্রত্যক্ষ—সমগ্রীকরণের প্রচেষ্টা (গেস্টাল্ট্ মতবাদ):

প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে গেস্টাল্ট্ মতবাদের অবদান অপরিসীম। গেস্টাল্ট্-বাদীরা অনুষঙ্গবাদের বিরোধিতা করেন এবং তাঁহারা বলেন যে, আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করি, তাহা কতকগুলি পৃথক্ পৃথক্ সংবেদন এবং অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিরূপের সংযোগ নহে—প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তুর একটি সামগ্রিক রূপ আছে এবং ইহা তাহার অংশগুলির সংযোগের মধ্যে পাওয়া যায় না। মোট কথা, প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তুর 'সমগ্রত্ব'-এর একটি নিজস্ব সত্তা আছে। (পৃঃ ১০৭ দ্রষ্টব্য)।
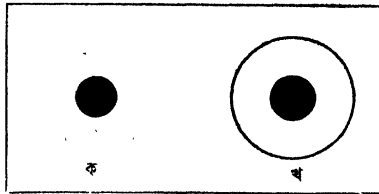
১নং চিত্র।

ক্ষেত্র ও মূর্তির পার্থক্য অনুসারে দৃষ্ট-বস্তুর বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন।

প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে গেস্টাল্ট্‌বাদীদের মতের বৈশিষ্ট্য দুইটি:—(ক) আমরা যখনই কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করি, তখন উহাকে 'এক বিশেষ ক্ষেত্রের পরি-

প্রেক্ষিতে একটি মূর্তি' (a figure in relation to a ground) হিসাবে দেখি। এই ক্ষেত্রের পরিবর্তন ঘটিলে মূর্তিরও যেন পরিবর্তন ঘটে। ১নং ছবিতে দুইটি বৃত্ত দেখান হইয়াছে—উহারা দুইটিই একই আকারের। কিন্তু প্রথমটি হইতেছে কালো ভূমির পরিপ্রেক্ষিতে একটি শাদা বৃত্ত এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে শাদা ভূমির পরিপ্রেক্ষিতে একটি কালো বৃত্ত। কিন্তু ভূমির তারতম্যের জন্য বৃত্ত দুইটিকে বিভিন্ন রূপের মনে হইতেছে।

তাহা ছাড়া, প্রত্যক্ষ-গোচর প্রতি বিষয়বস্তুকে একটি 'সমগ্র একক' ('one whole' বা 'unit') রূপে দেখিবার প্রতি প্রবণতা থাকে।

সে সকল বস্তুর মধ্যে **সাদৃশ্য** (similarity) আছে, তাহারা মিলিয়া একটি 'দল' গঠন করে; যেমন, ২ (ক) নং চিত্রে ত্রিভুজ, বৃত্ত এবং গুণচিহ্ন মিশাইয়া থাকিলেও ত্রিভুজগুলি, বৃত্তগুলি এবং গুণচিহ্নগুলি মিলিয়া তিনটি পৃথক্ দল গঠন করিয়াছে। ইহার ফলে হয় ত্রিভুজগুলির প্রতি, না হয় গুণচিহ্নগুলির প্রতি, আর না হয় বৃত্তগুলির প্রতি সংযুক্তভাবে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

যে সকল বস্তুর মধ্যে **নৈকট্য** (proximity) আছে, তাহারা মিলিতভাবে একটি দল গঠন করে। যেমন ২ (খ) নং চিত্রে যে সকল বিন্দু পরস্পরের নিকটবর্তী আছে সেগুলি এক একটি পৃথক্ দল গঠন করিয়াছে।

প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তুর মধ্যে যদি অবচ্ছেদ থাকে, তাহা হইলেও আমরা উহা অগ্রাহ্য করিয়া যাই এবং উহাকে একটি সমগ্র **নিরবচ্ছিন্ন** বস্তু বলিয়া দেখি। যেমন, ২ (গ) নং চিত্রে সরলরেখা ও বক্ররেখা পরস্পরকে কর্তন করিয়াছে, অথচ উভয়কেই নিরবচ্ছিন্ন মনে হইতেছে।

আবার যেখানে কোন অসম্পূর্ণতা আছে, সেখানে উহা অগ্রাহ্য করিয়া উহাকে সম্পূর্ণভাবে বা যথাযথভাবে দেখিবার প্রবণতা আমাদের আছে। (ইহাকে বলা হয় **Prägnanz** বা preciseness)। আবার সেইজন্য যেখানে কোন কিছুর মধ্যে কোন ব্যবধান বা ফাঁক (gap) আছে, সেইখানে উহাকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ মূর্তিরূপে দেখি (ইহাকে বলে 'gap filling' বা 'closure')।

২ (ঘ) নং চিত্রে অনেকগুলি অসম্পূর্ণ রূপরেখা দেখান হইয়াছে। ইহাদের প্রথমটিকে বলিব ত্রিভুজ, দ্বিতীয়টিকে বৃত্ত, তৃতীয়টিকে তারকা এবং চতুর্থটিকে

মানুষের মুখ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রতিটির বর্ণনাই ত্রুটিপূর্ণ—প্রতিটি মূর্তির মধ্যেই অসম্পূর্ণতা বা অবচ্ছিন্নতা আছে, অথচ আমরা উহা অগ্রাহ্য করিয়া প্রতিটি মূর্তিকে সম্পূর্ণভাবে দেখিতে চাই।
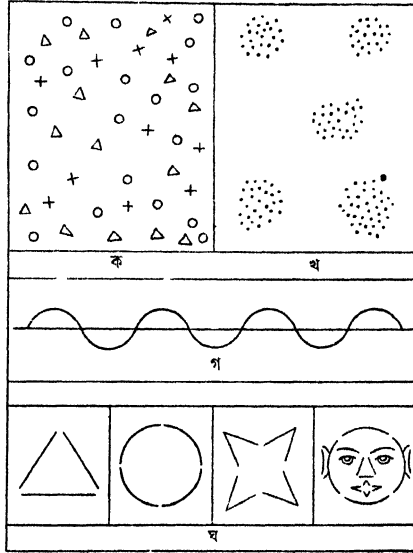
২ নং চিত্র।

উপরের বিভিন্ন চিত্র গেস্টাল্ট্ মতবাদ অনুসারে প্রত্যক্ষ্যের বিষয়-বস্তু কিভাবে গঠিত হয় তাহা ইঙ্গিত করিতেছে।

আমরা যখন কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করি, তখন উহাকে অনেক সময় পরিচিত বস্তুর অনুরূপ বলিয়া প্রত্যক্ষ করি। ৩ নং চিত্রটির প্রথম রেখাঙ্কনটি ঘরের ভিতরের ছবি এবং দ্বিতীয়টি সিঁড়ির ছবি বলা হয়, অথচ প্রকৃতপক্ষে উহাদের প্রত্যেকটিই বিশেষ ভঙ্গিমায় প্রদত্ত কয়েকটি রেখার সমাবেশ মাত্র।
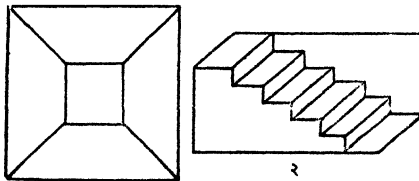
৩ নং চিত্র।

আবার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন অনুসারে প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রের বিন্যাস বা সংঠন (organisation)-এর পরিবর্তন ঘটে। যেমন, নিম্নে (৪নং চিত্রে) একই দৈর্ঘ্যের প্রতিসাম্যবিশিষ্ট তিনটি সরলরেখা দেখান হইয়াছে। ইহাদের মধ্যবিন্দু একই স্থানে; কিন্তু যদি "খ" রেখাগুলি উহ্য করা যায়, তাহা হইলে মধ্যবিন্দু যেন ডানদিকে একটু সরিয়া গিয়াছে মনে হয় এবং যদি "ক" রেখাগুলি উহ্য করা যায়, তাহা হইলে মনে হয় যে, মধ্যবিন্দু যেন বামদিকে একটু সরিয়া গিয়াছে।
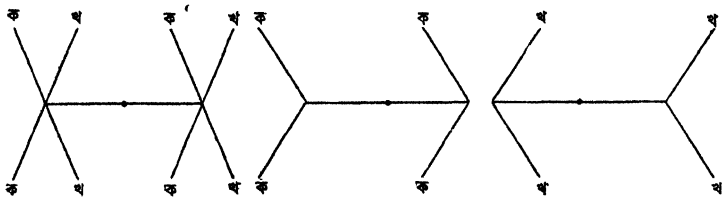
৪ নং চিত্র।

গেস্টাল্ট্‌বাদীরা মনে করেন যে, দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের পশ্চাতে প্রধান স্নায়ুতন্ত্রে (বিশেষতঃ গুরুমস্তিষ্কে) অনুরূপ পরিবর্তন হইয়া থাকে। সুতরাং উদ্দীপক ও স্নায়ুতন্ত্রের সমন্বয়ে "প্রত্যক্ষের ক্ষেত্র" গঠিত হয়। আমরা যখন উদ্দীপকের এক এক প্রকার রূপ (pattern) প্রত্যক্ষ করি, তখন গুরুমস্তিষ্কেও এক এক প্রকার পরিবর্তন (change in pattern) ঘটে এবং "প্রত্যক্ষের ক্ষেত্র" (field of perception) গঠনে উহা বিশেষ অংশ গ্রহণ করে[৭]।

[আমরা এই প্রসঙ্গে গেস্টাল্ট্‌ মতবাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধীয় কয়েকটি নীতির উল্লেখ করিতে পারি[৮]:

(১) প্রত্যক্ষের ক্ষেত্র সর্বদাই কোন-না-কোন ভাবে সুগঠিত ও সংঘবদ্ধ।

(২) প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে অংশগুলির বৈশিষ্ট্য 'সমগ্র'-এর বৈশিষ্ট্য হইতে

---

৭ রসায়নশাস্ত্র (Chemistry) হইতে *isomorphism*-এর উপমা গ্রহণ করিয়া গেস্টাল্ট-বাদীরা বলেন যে, প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রের আকার-বৈচিত্র্যের তুল্য অবস্থা গুরুমস্তিষ্কে থাকে (ইহাকে 'isomorph for brain action' বলে)। তবে গেস্টাল্ট্‌বাদীরা এই মতের সপক্ষে বিশেষ প্রমাণ দেখান নাই। (W. Köhler, *Gestalt Psychology*, pp. 184-85 দ্রষ্টব্য।)

৮ R. H. Wheeler, *The Laws of Human Nature*, pp. 129-138 দ্রষ্টব্য।

উদ্ভূত। যেমন, একটি সমবাহু ত্রিভুজের বাহুগুলি ত্রিভুজত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে উহারা তিনটি সরলরেখামাত্র।

(৩) 'সমগ্রটি' ইহার 'অংশ'-গুলিকে নির্ধারণ করে; অর্থাৎ অংশগুলি কী প্রকারের হইবে, তাহা নির্ভর করে উহারা কোন্ সমগ্র বস্তুর অংশ তাহার উপর। একই সরলরেখা ত্রিভুজের বাহু হইলে উহার এক অর্থ এবং চতুর্ভুজের অংশ হইলে উহার আর এক অর্থ।

(৪) প্রথমে কোন বস্তু একটি সমগ্র 'একক' ভাবে প্রত্যক্ষগোচর হয় এবং ধীরে ধীরে উহার অংশের প্রতি দৃষ্টি অর্পিত হয়।

(৫) 'সমগ্র' বস্তুর যে 'সমগ্রত্ব' তাহা সমগ্র বস্তু হইতেই উদ্ভূত হয়, উহার অংশগুলি হইতে উহার 'অর্থ' উদ্ভূত হয় না। চারিটি সরলরেখা হইতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে চতুর্ভুজের অর্থ উদ্ভূত হয় না—উহারা চতুর্ভুজের রূপ দান করিবার জন্য এক বিশেষভাবে মিলিত হইয়াছে বলিয়াই উহারা চতুর্ভুজের বাহু।

(৬) যেখানে অসাম্যতা, অসম্পূর্ণতা ইত্যাদি আছে, সেখানে ঐগুলি সাধারণতঃ অগ্রাহ্য করা হয়।

(৭) আবার ঐগুলি কেবল অগ্রাহ্য করাই হয় না, বরং প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে যে অসম্পূর্ণতা থাকে সেগুলিকে সাধারণতঃ পূরণ করা হয়।]

(ঘ) মানসিক প্রস্তুতি (Mental preparation বা set):

পূর্ব হইতে যদি কোন মনোভাব গ্রহণ করা যায় এবং তদনুসারে যদি প্রত্যক্ষকারী নিজের মনকে 'প্রস্তুত' করে, তাহা হইলে প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রের উপর উহার প্রভাব পড়ে। যদি কোন জ্যোতির্বিৎ (astronomer) পূর্ব হইতে এই ধারণা করিয়া ল'ন যে, মঙ্গল গ্রহের পরিবেশ পৃথিবীর পরিবেশের অনুরূপ, তাহা হইলে তিনি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মঙ্গলগ্রহ প্রত্যক্ষ করিবার কালে ঐরূপ সাদৃশ্য যেন 'অধিক' দেখিতে পান।

(ঙ) প্রক্ষোভ বা আবেগ বা কোন মানসিক উত্তেজনার প্রভাব:

ক্রোধ, ভয় বা অন্য কোন মানসিক উত্তেজনার প্রভাবে আমরা প্রত্যক্ষের বিষয়-বস্তু যথাযথভাবে দেখি না এবং তাহার উপর অবাস্তব বা অলীক গুণের অভিক্ষেপ (project) করি। সেইরূপ ভালবাসা ও ঘৃণাও[৯]

[৯] তুলনীয়: "যারে দেখতে নারি, তা'র চলন বাঁকা"।

আমাদের প্রত্যক্ষকে বিভ্রান্ত করে; যেমন, স্নেহশীল মাতা তাঁহার পুত্রকন্যাদের অনেক অন্যায় আচরণ যেন দেখিতে পান না। সেইরূপ, উত্তেজনার সময় প্রত্যক্ষকারী যথাযথভাবে ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। যদি 'প্রত্যক্ষদর্শী' তিনজন ব্যক্তিকে একটি অগ্নিকাণ্ডের বর্ণনা দিতে বলা হয়, তাহা হইলে তিনজনের বর্ণনার মধ্যে পূর্ণ সাদৃশ্য থাকে না।

(চ) অভিভাবনের প্রভাব (Influence of Suggestion) :

অভিভাবন (suggestion)-ও ক্ষেত্রবিশেষে প্রত্যক্ষের বিষয়-বস্তুকে রূপায়িত করে। প্রত্যক্ষকারীকে 'বিষয়বস্তু' প্রদানকালে উহাকে যেভাবে 'বর্ণনা' করা যায়, প্রত্যক্ষকারীও উহাকে অনেকসময় সেইভাবে দেখিয়া থাকে।[১০] এই বিষয়ে একটি পরীক্ষণ করা যায়। ৫নং চিত্রের মধ্যস্থলে

৫ নং চিত্র।
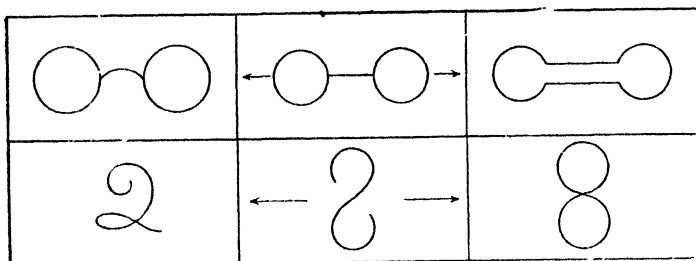
উপরের চিত্রে প্রত্যেকের উপর অভিভাবনের প্রভাব ইঙ্গিত করা হইয়াছে। মধ্যস্থলে 'উদ্দীপক-বস্তু' (stimulus object) দেখান হইয়াছে। উপরের ছবিটির ক্ষেত্রে একজনকে বলা হইয়াছিল যে উহা 'চশমা' এবং আর একজনকে বলা হইল যে উহা 'ডাম্বেল'; প্রত্যেক পরীক্ষণ-পাত্র অভিভাবনের প্রভাবে 'উদ্দীপক বস্তু'-কে ঐ ভাবেই প্রত্যক্ষ করিয়াছিল এবং স্মৃতি হইতে তাহারা উদ্দীপক-বস্তুকে ঐ ভাবেই আঁকিয়াছিল। (যথাক্রমে বাম ও ডান দিকের ছবি দ্রষ্টব্য)। সেইরূপ নিম্নের ছবিটির ক্ষেত্রে উদ্দীপক দেখিয়া অভিভাবনের প্রভাবে একজন ইংরাজি '২' এবং আর-একজন '৮' রূপে উহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল।

[Carmichael, Hogan এবং Walter কর্তৃক পরিকল্পিত। *Jr of Exp Psy.*, Vol. 15 দ্রষ্টব্য।]

১০ গল্পে আছে যে, একবার এক সরলমনা লোক এক ছাগশিশু লইয়া যাইতেছিলেন। উহা দেখিয়া কয়েকজন দুষ্ট-বুদ্ধি লোকের লোভ হইল এবং তাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে দেখিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জিজ্ঞাসা করিল যে, তিনি কেন কুকুর লইয়া যাইতেছেন। বার বার ঐরূপ শুনিয়া শেষ পর্যন্ত তাঁহার মনে হইল যে, তাঁহার স্কন্ধস্থ জীবটি বুঝি সত্যই কুকুর।

প্রকৃত উদ্দীপক (stimulus object) দেখান হইয়াছে। দুইজন পরীক্ষণ-পাত্রের নিকট উহাকে দুইভাবে বর্ণনা করা হইল এবং তাহাদের প্রত্যেককে সে যে ছবি দেখিয়াছে তাহা স্মৃতি হইতে আঁকিতে বলা হইল—দেখা গেল যে, যাহাকে যেরূপভাবে উদ্দীপকের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছিল, সে সেই অনুসারে পূর্বদৃষ্ট ছবিকে আঁকিল।

(ছ) সঙ্ঘ ও সমাজের প্রভাব :

আমরা সকলেই এক একটি সঙ্ঘ বা দল (group)-এর অন্তর্ভুক্ত; আবার বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে বলিতে হয় যে, আমরা সকলেই এক একটি সমাজের অন্তর্ভুক্ত। সঙ্ঘ তথা সমাজ-এর আচার-ব্যবহার, আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী উহার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি-বিশেষের প্রত্যক্ষকে প্রভাবিত করে। যেমন, পাশ্চাত্ত্য সমাজের প্রভাবে যে ব্যক্তি লালিত-পালিত হইয়াছে, সে প্রাচ্যের অনেক আচার-ব্যবহারকে যেভাবে প্রত্যক্ষ করিবে (অর্থাৎ উহাকে যে ভাবে ব্যাখ্যা করিবে), প্রাচ্য সমাজের লোকেরা সেইভাবে করিবে না। আবার, ক্ষুদ্র দল বা সঙ্ঘও প্রত্যক্ষকে প্রভাবিত করে; যেমন, কোন কারখানায় ধর্মঘট চলিতেছে—উহার প্রবেশমুখে ধর্মঘটকারী শ্রমিকদের অন্য শ্রমিকরা যে ভাবে দেখিবে, মালিকশ্রেণীভুক্ত লোকেরা সেইভাবে দেখিবে না। শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত কোন লোক ধর্মঘটকারীদের কার্যকে 'মেহনতী মানুষের ন্যায্য দাবীর সংগ্রাম' রূপে 'প্রত্যক্ষ' করিবে, আর মালিক শ্রেণীভুক্ত অপর কোন লোক উহাকে 'অজ্ঞ, অশিক্ষিত লোকের স্বার্থবিরোধী কার্য' রূপে 'প্রত্যক্ষ' করিবে।

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, **আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করি বলিয়া দাবী করি, তাহা সম্পূর্ণভাবে বস্তুগত নহে। উদ্দীপক হইল বাস্তব অংশ, কিন্তু উহাকে পৃথক্‌ভাবে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নহে—উদ্দীপক ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগমাত্র উহার উপর নানা প্রভাব তথা ব্যাখ্যা আসিয়া পড়ে এবং দু'য়ের সমন্বয়ে প্রত্যক্ষের বিষয়-বস্তু গঠিত হয়।**

৪। ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ ও অমূল প্রত্যক্ষ (Illusion & Hallucination) :

মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে শুদ্ধ প্রত্যক্ষ এবং ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ বা ভ্রান্তির

পার্থক্য নাই। আমরা যাহাকে ভ্রান্তি বলি, তাহারও মূলে কোন না কোন বাস্তব উদ্দীপক আছে ; কিন্তু কোন কারণবশতঃ উহার উপর এমনই ব্যাখ্যা বা অর্থ আরোপিত বা অধ্যস্ত হইয়াছে যে, তাহার প্রকৃত রূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই আবরণ ও বিক্ষেপের প্রশ্ন উঠে যখন আমরা উহার যাথার্থ্য বা সত্যাসত্য নির্ধারণ করিতে যাই। ইহা হইল মূলতঃ দর্শনের বিচার্য বিষয়।

মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আমরা এইটুকুমাত্র বলিতে পারি যে, ভ্রান্ত প্রত্যক্ষও প্রত্যক্ষ ; তবে ইহাকে ভ্রান্ত আখ্যা দিবার কারণ এই যে, ইহার মাধ্যমে যে 'জ্ঞান' পাওয়া যায় তাহার সহিত বাস্তবতার অন্যান্য 'মান' (standard)-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানের বিরোধ আছে এবং ঐ জ্ঞান অনুসারে কার্য করিতে যাইলে ব্যর্থতা দেখা দিবে। অন্ধকারে বা অস্পষ্ট আলোকে রজ্জুতে সর্পভ্রম বা সমুদ্রতীরে উজ্জ্বল রৌদ্রালোকে শুক্তিতে রজতভ্রম ভ্রান্তির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ভ্রান্তি নানা কারণে ঘটিতে পারে ; যথা, পুরাতন অভ্যাসের ফলে, অন্যদিকে মনোযোগ থাকার জন্য, প্রতীক্ষা-সঞ্জাত মনোযোগের জন্য, ইন্দ্রিয়ের ত্রুটির জন্য ইত্যাদি।[১১]

বিশেষ বিশেষ ভঙ্গিমায় অঙ্কিত জ্যামিতিক রেখাঙ্কন অনেক সময় ভ্রান্ত প্রত্যক্ষের সৃষ্টি করে। এবিষয়ে **মুয়েলার-লায়ার** (Müller-Lyer)-প্রদত্ত উদাহরণটি উল্লেখযোগ্য (৬নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। নিম্নের চিত্রের
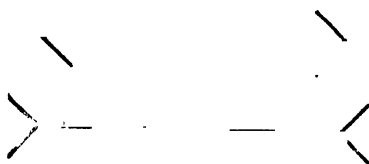
৬নং চিত্র।

মুয়েলার-লায়ার প্রদর্শিত ভ্রান্ত প্রত্যক্ষের উদাহরণ।

১১ James, *Principles of Psychology,* Vol. II, p. 86 দ্রষ্টব্য।

দুইটি সরল রেখার দৈর্ঘ্য একই; অথচ প্রথমটিকে দ্বিতীয় অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বা ছোট বলিয়া বোধ হয়।[১২]

এই ভ্রান্তির কারণ কি? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, যখনই আমরা কিছু প্রত্যক্ষ করি, তখনই উহাকে 'সমগ্র একক' (unified whole)-রূপে দেখি—উহাকে উহার 'অংশ' হইতে বিচ্ছিন্নভাবে দেখিতে পারি না।[১৩] এক্ষেত্রে প্রথম রেখাটির দুই পার্শ্বস্থ রেখাগুলি যেন বন্ধনীর ইঙ্গিত করিতেছে; সেইজন্য দৃষ্টি সীমিত থাকিতেছে। অথচ দ্বিতীয় রেখাটির পার্শ্বস্থ রেখাগুলি ঐরূপ বন্ধনের কোন নির্দেশ দিতেছে না এবং দৃষ্টি দুই পার্শ্বে সীমিত না থাকিয়া উহা যেন ব্যাপকতর হইতে পারিতেছে।[১৪] যাহা হউক, ইহা হইতে দুইটি বিষয় প্রমাণিত হয়: (ক) এইরূপ ভ্রান্তির জন্য চক্ষুরিন্দ্রিয় বা অন্য কোন ইন্দ্রিয় দায়ী নহে; (খ) আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করি বলিয়া বিশ্বাস করি, তাহা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবজগতের প্রতিচ্ছবি নহে—উহার মধ্যে মনের অবদানও যথেষ্ট আছে।

মুয়েলার-লায়ার ব্যতীত আরও অনেকে **জ্যামিতিক রেখাঙ্কন সম্বন্ধে চাক্ষুষ ভ্রান্তি** (Geometrical optical illusions)-এর উদাহরণ দিয়াছেন (পর পৃষ্ঠায় ৭নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

অমূল প্রত্যক্ষ (hallucination)-এর **ক্ষেত্রে বাস্তব কোন ভিত্তি নাই; অথচ যেন কোন কিছু প্রত্যক্ষগোচর হয় বলিয়া ভ্রম জন্মে।** সাধারণতঃ মদ্যপান ইত্যাদির ফলে অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তি এবং মানসিক রোগগ্রস্ত অস্বভাবী ব্যক্তি (mentally ill বা abnormal person)-এর ক্ষেত্রে এইরূপ অমূল প্রত্যক্ষ ঘটিতে পারে (যেমন, চিত্তভ্রংশী বাতুল বা schizophrenic ব্যক্তিরা প্রায়ই অমূল প্রত্যক্ষ করেন)। অমূল প্রত্যক্ষের প্রকৃত কারণ রহস্যাবৃত।

---

১২ এই প্রকার ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ সাধারণ ভ্রমের ন্যায় নহে। প্রকৃত জ্ঞানের উদয়ে ভ্রম দূর হয়। কিন্তু এখানে মাপকাঠি দ্বারা সমান্তরাল রেখা দুইটি মাপিয়া দেখিবার পরও 'ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ' থাকিয়া যায়।

১৩ 'সমগ্র' ও 'অংশের' পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে কেহ কেহ 'confluence' আখ্যা দিয়াছেন।

১৪ যদি সমান্তরাল রেখা দুইটি অন্য রঙে (যেমন একটি লাল, আর একটি নীল কালিতে) আঁকা যায়, তাহা হইলে ভ্রান্তির সম্ভাবনা কমিয়া যায়।

সুতরাং ভ্রান্ত প্রত্যক্ষের সহিত অমূল প্রত্যক্ষের পার্থক্য এই যে, **ভ্রান্ত প্রত্যক্ষের পশ্চাতে বাস্তব কোন উদ্দীপক থাকে, কিন্তু অমূল প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে উহা থাকে না।**
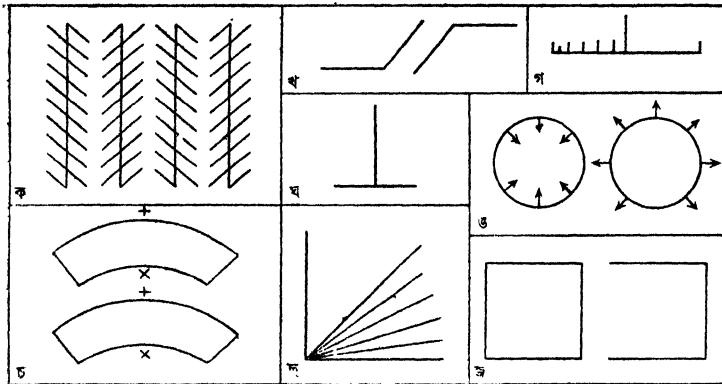
৭নং চিত্র।

উপরের চিত্রে বিভিন্ন প্রকারের রেখাঙ্কন ক্ষেত্রে যে সকল ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ ঘটিতে পারে, তাহা দেখান হইয়াছে।

ক—লম্বরেখাগুলি সমান্তরাল; অথচ মনে হইতেছে যে, ইহারা একটু বাঁকিয়া গিয়াছে। খ—দুইটি কোণই সমান; অথচ মনে হইতেছে যে, কোণ দুইটি যেন অসমান। গ—একটি সরলরেখাকে দ্বিখণ্ডিত করা হইয়াছে; অথচ বাম দিকের অর্ধাংশকে পুনরায় খণ্ডিত করার জন্য উহাকে অপেক্ষাকৃত বড় মনে হইতেছে। ঘ—দুইটি রেখা দৈর্ঘ্যে সমান। অথচ লম্ব রেখাটিকে শয়ান রেখা অপেক্ষা বড় মনে হইতেছে। ঙ—দুইটি বৃত্তেরই পরিধি সমান; অথচ প্রথম বৃত্তটিকে দ্বিতীয় অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বোধ হইতেছে। চ—দুইটি মূর্তি একই আকারের; অথচ + চিহ্নিত রেখাগুলি পরস্পর অসমান এবং × চিহ্নিত রেখাগুলি অসমান বোধ হইতেছে। ছ—একটি কোণকে সমদ্বিখণ্ডিত করা হইয়াছে; কিন্তু যেটিকে পুনরায় খণ্ডিত করা হইয়াছে, সেটিকে অপেক্ষাকৃত বড় বোধ হইতেছে। জ—যেটি অসম্পূর্ণ চতুষ্কোণ সেটি যেন সম্পূর্ণ চতুষ্কোণ অপেক্ষা বড় বোধ হইতেছে; অথচ উভয়ই সমান।

একটি উদাহরণের সাহায্যে যথার্থ প্রত্যক্ষ (correct perception), ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ (illusion বা erroneous perception) এবং অমূল প্রত্যক্ষ (hallucination)-এর পার্থক্য বুঝা যাইতে পারে। মনে করা যাউক, প্রত্যক্ষকারীর কিছু দূরে অন্ধকারে একটি গাছের শাখা হইতে কাপড় ঝুলিতেছে। প্রত্যক্ষকারী যদি কাপড়কে কাপড় বলিয়া বুঝিতে পারে, তাহা হইলে উহা হইবে যথার্থ বা শুদ্ধ প্রত্যক্ষ; কিন্তু যদি উহাকে বস্ত্র-পরিহিত

মনুষ্যমূর্তি মনে হয়, তাহা হইলে উহা হইবে ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ। আবার গাছও নাই, কাপড়ও নাই—ফাঁকা মাঠে যদি অবাস্তব একটি মনুষ্যমূর্তি কেহ প্রত্যক্ষ করে, তাহা হইলে উহা হইবে অমূল প্রত্যক্ষ।[১৫]

৫। গৌণ প্রত্যক্ষ (Indirect or Acquired Perception) :

এক একটি ইন্দ্রিয় এক একটি বিশেষ প্রকারের জ্ঞান দান করে—যেমন, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বস্তু-বিশেষের বর্ণ, আকার ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান দেয়; ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ গন্ধ সম্বন্ধে জ্ঞান দেয়; চার্ম প্রত্যক্ষ বস্তুর শৈত্য, উত্তাপ ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান দেয়। কিন্তু মধ্যে মধ্যে এমন হয় যে, **যে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে জ্ঞান সাধারণতঃ পাওয়া যায়, তাহার মাধ্যমে উহা না পাইয়া অন্য কোন ইন্দ্রিয় উদ্দীপনের ফলে ঐরূপ জ্ঞান জন্মে; ইহাকে বলে গৌণ প্রত্যক্ষ।** যেমন, আমরা কেবল চক্ষু দ্বারা ধূমায়মান চা দেখিয়া বুঝিতে পারি যে, উহা গরম; এবং বাষ্প উঠিতেছে এরূপ বরফ দেখিয়াই বুঝিতে পারি যে, উহা ঠাণ্ডা। অথচ, চক্ষু উষ্ণতা বা শৈত্য সংবেদনের জন্য নির্দিষ্ট ইন্দ্রিয় নহে; উহার নির্দিষ্ট ইন্দ্রিয় হইল ত্বক্। সেইরূপ দূর হইতে কেবল চক্ষু দ্বারা এক খণ্ড চন্দনকাষ্ঠ দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, ইহা সুগন্ধি।[১৬]

সেইরূপ আমরা চক্ষু দ্বারা দূরত্ব, ঘনত্ব ইত্যাদি বিষয় জানিতে পারি। অথচ এইগুলি মুখ্যতঃ স্পার্শন ও পেশীজ সংবেদনের ফলে সরাসরি জানিতে পারা যায়। সুতরাং এইগুলি সবই হইল গৌণ প্রত্যক্ষ।

৬। দূরত্ব প্রত্যক্ষ (Perception of Distance) :

দূরত্বকে মুখ্যতঃ বা সরাসরি (directly) স্পার্শন ও পেশীজ প্রত্যক্ষ

---

১৫ শেক্সপীয়রের *Macbeth*-নাটকে অলীক ছুরিকা 'প্রত্যক্ষ' কালে ম্যাক্‌বেথের উক্তি লক্ষণীয় :

"Is this a dagger which I see before me,
The handle toward my hand ?
Come, let me clutch thee :—
I have thee not, and yet, I see thee still."

(*Macbeth*, Act II, Scene I).

১৬ ন্যায়দর্শনের ভাষায় ইহাকে 'জ্ঞানলক্ষণ-প্রত্যক্ষ' বলে।

দ্বারা জানা যায়। চার্ম সংবেদনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহার দেশাভিজ্ঞানের ক্ষমতা আছে। ইহার ফলে, চর্মের কোন্ স্থান উদ্দীপিত হইতেছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। (পৃঃ ৫২৮-২৯ দ্রষ্টব্য)। যদি আমরা কোন বস্তু হস্ত বা অন্য কোন অঙ্গ দ্বারা স্পর্শ করি, তাহা হইলে চর্মের অনেকগুলি স্পর্শবিন্দু উদ্দীপিত হয় এবং তাহার ফলে বুঝা যায় যে, উহা কতটা স্থান ব্যাপিয়া আছে। বস্তুর আয়তন যেখানে ক্ষুদ্র, সেখানে কেবল স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই উহা বুঝা যায়। ইহাকে 'নিষ্ক্রিয় বা গতিহীন স্পর্শ' (passive touch) বলা যায়।[১৭] আবার, যদি বস্তুর আয়তন বা বিস্তার বেশী হয়, তাহা হইলে আমরা উহার বিভিন্ন বিন্দু ক্রমিকভাবে স্পর্শ করিয়া বিস্তৃত ক্ষেত্র জুড়িয়া অবস্থিত বিন্দুগুলির পরস্পরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠি। অন্ধকার ঘরে ঢুকিয়া আলো জ্বালিবার পূর্বে আমরা ঘরে অবস্থিত কোন বস্তুর (যথা, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদির) বিভিন্ন অংশ স্পর্শ করিয়া উহার বিস্তার সম্বন্ধে সচেতন হই। অন্ধলোক কেবলমাত্র হস্ত বা হস্তস্থ যষ্টি দ্বারা বিভিন্ন বিন্দু স্পর্শ করিয়া বস্তুর বা স্থানের বিস্তার নির্ণয় করিতে পারে। ইহাকে 'সক্রিয় স্পর্শ' (**active touch**) বলা হয়। তাহা ছাড়া, আমরা যখন এক স্থান হইতে অপর স্থানে হাঁটিয়া যাই, তখন পদযুগলের সহিত সংশ্লিষ্ট পেশীসমূহ চালনার দ্বারাও আমরা ঐ দুই স্থানের অন্তর্বর্তী দূরত্ব সম্বন্ধে অবগত নই। যদি দূরত্ব অল্প হয়, তাহা হইলে যে পরিমাণ পেশী চালনার প্রয়োজন হয়, দূরত্ব অধিক হইলে তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ পেশী চালনার প্রয়োজন হয়। সুতরাং পেশীজ সংবেদনের তারতম্য হইতেও আমাদের দেশাভিজ্ঞান বা দূরত্ব, স্থান বা বিস্তার সম্বন্ধে জ্ঞান হয়।

অতএব, বলা যাইতে পারে যে, **স্থান, বিস্তার ও দূরত্ব সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাহা স্পার্শন ও পেশীজ সংবেদন (tactuo-muscular sensation)-এর মাধ্যমে সরাসরি (directly) জানা যায়।**

চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ দ্বারা দূরত্ব অবধারণ (Knowledge of Space through Visual Perception):

আমরা যে কেবল স্পার্শন ও পেশীজ সংবেদনের সাহায্যে দূরত্ব নির্ণয়

১৭ অবশ্য সম্পূর্ণ গতিহীন স্পর্শ প্রায় অসম্ভব বলা যাইতে পারে।

করিতে পারি তাহা নহে—চক্ষুর সাহায্যেও দূরত্ব বুঝিতে পারি। অতএব চাক্ষুষ সংবেদন দেশাভিজ্ঞান বা স্থান ও দূরত্ব সম্বন্ধে এবং ঘন বস্তু (solid object) সম্বন্ধে জ্ঞান দান করে। বলা বাহুল্য, **চাক্ষুষ সংবেদনের মাধ্যমে দূরত্ব এবং ঘনত্ব সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাহা গৌণ** (indirect knowledge)। চক্ষু সরাসরি ভাবে এই জ্ঞান পায় না, কারণ নিশ্চয়ই চক্ষুর্দ্বয় স্ব স্ব অক্ষিগোলক হইতে বাহির হইয়া দূরত্ব মাপিয়া আবার ফিরিয়া আসে না! চক্ষু দ্বারা আমরা কতকগুলি 'প্রতীক' (signs বা clues) লক্ষ্য করি এবং ইহাদের মাধ্যমে গৌণভাবে দূরত্ব সম্বন্ধে প্রতীতি জন্মে। দার্শনিক বার্কলে (Berkeley) এই বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[১৮]

আমরা যখন স্পর্শ ও পেশীয় বেদন দ্বারা কোন বস্তুর দূরত্ব সরাসরিভাবে জানিতে পারি, তখন চক্ষু দ্বারা কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য অবলোকন করি। পরে যখন কেবলমাত্র ঐ সকল বৈশিষ্ট্য চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করি, তখন উহাদের মাধ্যমে (অর্থাৎ গৌণভাবে বা indirectly) **দূরত্ব বুঝিতে পারি। সুতরাং ঐ সকল বৈশিষ্ট্য 'দূরত্ব-নির্দেশক চাক্ষুষ চিহ্ন বা প্রতীক'** (visual signs, symbols বা clues) **রূপে কার্য করে,** অর্থাৎ ঐগুলি দেখিয়াই দূরত্ব সম্বন্ধে আমাদের ধারণা জন্মে।

আমরা এখানে কতকগুলি **প্রধান প্রধান চাক্ষুষ প্রতীকের** উল্লেখ করিতে পারি (৫৯৭ পৃষ্ঠায় ৮নং চিত্র দ্রষ্টব্য):

(ক) **বস্তুর আকারের আপাত পরিবর্তন**—আমরা যখন কোন একটি নির্দিষ্ট স্থান হইতে দেখি যে, কোন গতিশীল বস্তু ধীরে ধীরে ছোট হইয়া যাইতেছে, তখন বুঝিতে পারি যে, উহা দূরে চলিয়া যাইতেছে (যেমন, উড্ডীয়মান একটি ঘুড়ি ক্রমশঃ ছোট হইয়া যাইলে আমরা বুঝি উহা দূরে যাইতেছে ; আবার যখন দেখি যে, একটি গতিশীল 'ছোট' বস্তু ধীরে ধীরে 'বড়' হইয়া যাইতেছে, তখন বুঝিতে পারি যে, উহা নিকটে আসিতেছে। [৮ (ক) ছবি দ্রষ্টব্য।]

১৮ তাঁহার *New Theory of Vision* দ্রষ্টব্য। তিনি মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে ইহা রচনা করেন।

(খ) **উপস্থাপন** (Interposition)—একটি বস্তুর সম্মুখে যদি আর একটি বস্তু উপস্থাপিত হয়, তাহা হইলে যেটি সম্মুখবর্তী থাকে, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে দেখা যায় এবং যেটি পশ্চাতে থাকে, তাহার কিছু অংশ দেখা যায় না। সুতরাং যদি পরস্পরের পশ্চাৎবর্তী দুই বা ততোধিক বস্তুর সম্মুখে দাঁড়ান যায়, তাহা হইলে যেটিকে পূর্ণভাবে দেখা যায়, সেটিকে অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী এবং যেটির প্রতিকৃতি ব্যাহত (obstructed) হয়, সেটিকে অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী বলিয়া অনুমিত হয়। [৮ (খ) ছবি দ্রষ্টব্য।]

(গ) **আকাশ ও ভূমির আপাত মিলন**—আকাশ পৃথিবীর সহিত মিশিতে পারে না; কিন্তু কোন ফাঁকা মাঠে দাঁড়াইলে মনে হয় যেন দূরদিগন্তে আকাশ আসিয়া মাটিতে মিশিয়াছে। অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গিয়াছে যে, এই আপাত মিলনস্থল বিশেষ দূরবর্তী। সুতরাং যেখানে এইরূপ মনে হয়, সেই স্থানটি খুবই দূরে প্রত্যক্ষকারীর এইরূপ প্রতীতি জন্মে। [৮ (গ) ছবি দ্রষ্টব্য।]

(ঘ) **সমান্তরাল রেখার আপাত মিলন**—প্রকৃত সমান্তরাল (parallel) দুইটি রেখা কখনই পরস্পরের সহিত মিশিতে পারে না; কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এইরূপ 'মিলন' সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। যেমন, রেলওয়ে লাইনের নিকট দাঁড়াইলে মনে হয় যে, কিছু দূরে যেন লাইন দুইটি মিলিত হইয়াছে; আবার সেখানে যাইলে দেখা যাইবে যে, সেখানে তাহারা মিলিত হয় নাই, তবে আরও কিছুদূরে যেন মিলিত হইয়াছে। পুরাতন অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে, প্রতিটি আপাত মিলনস্থলই যথেষ্ট দূরবর্তী। সুতরাং ঐরূপ 'মিলনস্থল' দেখিলেই স্থানটি দূরবর্তী বলিয়া প্রতীতি জন্মে। [৮ (ঘ) ছবি দ্রষ্টব্য।]

(ঙ) **স্থিতি বা আকার বৈলক্ষণ্য** (parallax)—যদি কোন দ্রুতগামী গাড়ীতে বসিয়া বাহিরের দিকে দেখা যায়, তাহা হইলে মনে হয় যে, যেগুলি নিকটবর্তী সেগুলি যেন গাড়ী যেদিকে ছুটিতেছে তাহার বিপরীত দিকে দৌড়াইতেছে এবং যেগুলি অতি দূরবর্তী সেগুলি যেন গাড়ী যেদিকে যাইতেছে সেইদিকে ধীরে ধীরে চলিতেছে। সুতরাং চলমান যান হইতে স্থিতিশীল বস্তুসমূহের আপাত গতির দিক্ বিচার করিলে উহারা নিকটবর্তী বা দূরবর্তী সে সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে। [৮ (ঙ) ছবি দ্রষ্টব্য।]

(চ) **আলো ও ছায়া**—আমরা সাধারণতঃ ধরিয়া লই যে, কোন বস্তুর সম্মুখভাগের উপর আলো পড়িতেছে এবং উহার পশ্চাদ্‌বর্তী অংশে ছায়া
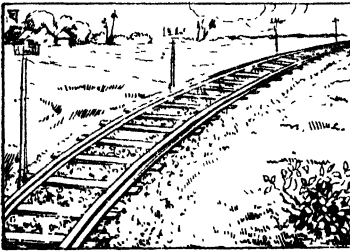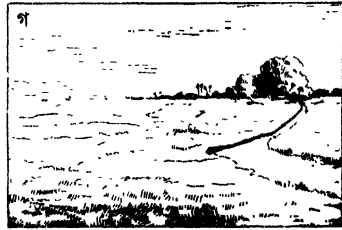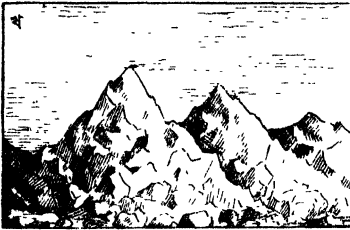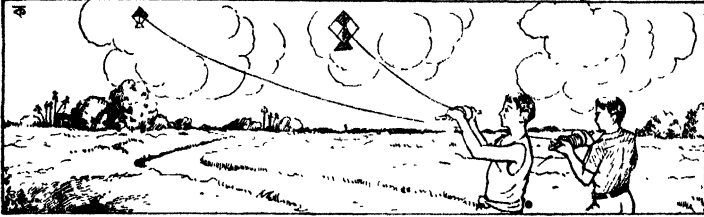
৮নং চিত্র।

উপরের ছবিগুলি দূরত্ব-নির্ধারক বিবিধ চাক্ষুষ প্রতীকের ইঙ্গিত করিতেছে।

পড়িতেছে। সুতরাং যেখানে 'আলো ছায়ার খেলা' আছে, সেখানে আলোকোজ্জ্বল অংশটি অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী বলিয়া বিশ্বাস জন্মে।

(ছ) **স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতা**—নিকটবর্তী বস্তু স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয় এবং দূরবর্তী বস্তু অস্পষ্ট দেখা যায়। সুতরাং স্পষ্টতা-অস্পষ্টতার মাধ্যমেও আমরা দূরত্ব বুঝিতে পারি।

(জ) **চক্ষুর 'কাচ' বা লেন্সের অভিযোজন (Accommodation of lens)**—নিকটবর্তী বস্তু প্রত্যক্ষ করিবার জন্য প্রতি চক্ষুর লেন্সে এমনভাবে

অভিযোজন হওয়া প্রয়োজন যাহাতে বস্তুর প্রতিকৃতি ঠিক স্পষ্টভাবে লেন্সের উপর পড়ে। এইজন্য লেন্সকে একটু উত্তল (convex) করিতে হয়। এই প্রক্রিয়ার প্রভাবেও বস্তুর নৈকট্য সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে।

(ঝ) **দৃষ্টিরেখার অভিসৃতি** (Convergence of lines of vision) —যেখানে দুইটি চক্ষুর দ্বারা কোন দূরবর্তী বস্তু (যেমন, ৫০।৬০ ফীট্ দূরের বস্তু) প্রত্যক্ষ করা যায়, সেখানে দৃষ্টিরেখাদ্বয় সমান্তরাল থাকে এবং এইজন্য চক্ষুর পেশীগুলি অপেক্ষাকৃত শ্লথ থাকে। কিন্তু যখন অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী বস্তু প্রত্যক্ষ করিতে হয়, তখন দৃষ্টিরেখাদ্বয়ের অভিসৃতি (convergence) হয় এবং তাহারা পরস্পর মিলিত হয়। এইজন্য চক্ষুর পেশীগুলির এক প্রকার সঙ্কোচন হয়। পেশীদের এই শ্লথন ও সঙ্কোচন প্রত্যক্ষকারী সচেতনভাবে না করিলেও উহাদের প্রভাবে বস্তুর দূরত্ব বা নৈকট্য সম্বন্ধে অবগতি জন্মিবার সুবিধা হয়।[১৯]
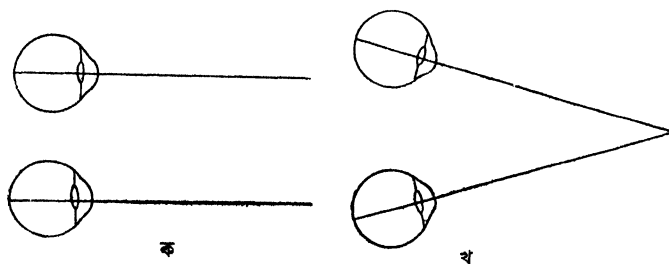
৯ নং চিত্র।

দৃষ্টিরেখা।

ক—অতি দূরবর্তী বস্তু প্রত্যক্ষকালে দৃষ্টিরেখার সমান্তরাল অবস্থান। খ—নিকটবর্তী বস্তু প্রত্যক্ষকালে দৃষ্টি রেখার অভিসৃতি।

উপরে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য দূরত্ব-নির্দেশক যে সকল প্রতীকের উদাহরণ দেওয়া হইল, তাহা হইতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, দূরত্ব-অবধারণের জন্য চক্ষুর নিজস্ব কোন ক্ষমতা নাই। বার্কলে (Berkeley) এই মতের সমর্থক। বার্কলের মতের সপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তি উত্থাপন করা যায়:

১৯ যাহারা এক চক্ষু-বিশিষ্ট তাহাদের পক্ষে দৃষ্টিরেখার সুষ্ঠু অভিসৃতি সম্ভব নহে এবং তাহারা অনেক সময় ৬।৭ ফীটের অধিক দূরবর্তী বস্তুসমূহের মধ্যে দূরত্বের পার্থক্য বিশেষ বুঝিতে পারে না।

(১) চক্ষুর গঠনই এইরূপ যে, ইহার দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে (directly) স্থান বা দূরত্ব নির্ধারণ সম্ভব নহে। অক্ষিপটে বস্তু-বিশেষের যে প্রতিকৃতি পড়ে, তাহা 'ক্যামেরার' ছবির ন্যায় দ্বি-আকৃতি-বিশিষ্ট (two dimensional) অর্থাৎ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বিশিষ্ট এবং উহার মধ্যে সম্মুখ ও পশ্চাতের পার্থক্য (front-back dimension) নাই। আবার, চক্ষু উহার কোটর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াও দূরত্ব মাপিতে পারে না।

(২) শিশু জন্মের পর চক্ষুর মাধ্যমে কোন্‌টি নিকটে, কোন্‌টি দূরে এ সকল কিছুই ঠিক করিতে পারে না। ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির ফলে সে এই ক্ষমতা আয়ত্ত করে।

(৩) ছানির জন্য জন্মান্ধ ছিল এরূপ ব্যক্তির যে সকল ক্ষেত্রে ছানি অপসারণ সম্ভব হইয়াছে, সেইরূপ ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়া প্রথম প্রথম কেবলমাত্র চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের সাহায্যে বস্তুর দূরত্ব, নৈকট্য কিছুই ঠিক করিতে পারে নাই।

(৪) চিত্রকর যখন কোন সমতল ক্ষেত্র (যেমন, শাদা কাগজ)-এর উপর নানা ভঙ্গিমায় সুকৌশলে রেখাঙ্কন করেন, তখন তাহা দেখিলে তিনি কোন্‌টি দূরে এবং কোন্‌টি নিকটে বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহা বেশ বুঝা যায়। এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই প্রতীকের মাধ্যমেই দূরত্ব এবং ঘনত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে।

একদল মনোবিৎ (যথা, জেম্‌স্‌, স্টাউট্‌ ইত্যাদি) বার্কলের মত পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা মনে করেন যে স্থান ও দূরত্ব নির্ধারণের ব্যাপারে চক্ষুর নিজস্ব বা সহজাত একটা ক্ষমতা আছে। তাহা যদি না থাকিত, তাহা হইলে অতি দূরে অবস্থিত বস্তুর (যথা, গ্রহ, নক্ষত্র পর্বতচূড়া ইত্যাদির) পারস্পরিক দূরত্ব আমরা চক্ষুর দ্বারা বুঝিতে পারিতাম না—ঐ সকল বস্তুর নিকট গমন করা সম্ভব নহে ; সুতরাং এ ক্ষেত্রে মৌলিক স্পার্শন ও পেশীজ সংবেদনের প্রশ্ন উঠে না। তাহা ছাড়া, পরস্পরের অতি নিকটবর্তী দুইটি বিন্দুর মধ্যে যে স্থানগত পার্থক্য আছে, তাহা আমরা চক্ষুর দ্বারাই বুঝিতে পারি, কারণ এরূপ স্থলেও কোন মৌলিক স্পার্শন সংবেদন সম্ভব নহে।

আমরা এক্ষেত্রে এই মন্তব্য করিতে পারি যে, অধিকাংশ স্থলেই বার্কলের মতবাদই গ্রহণযোগ্য। তবে দূরত্ব ও স্থান প্রত্যক্ষের নিজস্ব কোন ক্ষমতা

যদি চক্ষুর থাকে, তাহা হইলে উহা সুপ্তভাবে থাকে এবং তাহা অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই প্রকাশমান হইতে পারে।[20]

৭। **ঘনবস্তুর প্রত্যক্ষ (Perception of Solid Objects):**

দূরত্ব প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে পূর্ব অনুচ্ছেদে যাহা বলা হইয়াছে, ঘনবস্তুর প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রেও তাহাই প্রযোজ্য। ঘনবস্তু মাত্রই ত্রি-মূর্তি-বিশিষ্ট (three dimensional); অর্থাৎ **ঘনবস্তু মাত্রেরই দৈর্ঘ্য** (length), **প্রস্থ** (breadth) **ও গভীরতা** বা **ঘনত্ব** (depth) **থাকে।** (১০ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। ঘন বস্তুর ঘনত্বই হইল প্রধান বৈশিষ্ট্য।
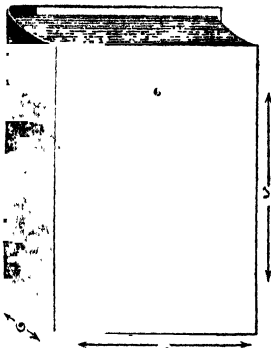
১০ নং চিত্র।

উপরের ছবিটি একটি ঘনবস্তুর (যথা, পুস্তকের) বৈশিষ্ট্য ইঙ্গিত করিতেছে। ১ – দৈর্ঘ্য ; ২—প্রস্থ ; ৩—গভীরত্ব বা ঘনত্ব।

ইহাকে সরাসরিভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় স্পার্শন ও পেশীজ সংবেদনের মাধ্যমে। যখন কোন জড়বস্তুকে আমরা হাত দিয়া আঁকড়াইয়া ধরি, তখন আমরা সরাসরিভাবে উহার ঘনত্ব বুঝিতে পারি।

তবে **অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সহিত আমরা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের সাহায্যে ঘনবস্তুকে ঘন বলিয়া বুঝিতে পারি।** আমরা দুইটি চক্ষু দ্বারা যখন কোন ঘনবস্তু প্রত্যক্ষ করি, তখন দুইটি চক্ষুর অক্ষিপটের উপর যে দুইটি প্রতিকৃতি পড়ে তাহাদের মধ্যে যেমন সাদৃশ্যও থাকে সেইরূপ বৈসাদৃশ্যও থাকে। ডান চক্ষু দ্বারা আমরা ডানদিকের অংশ অধিকতর দেখিতে পাই এবং বাম চক্ষুদ্বারা বামদিকের অংশ অধিকতর দেখিতে পাই। এই দুইটি সামান্য পৃথক্ প্রতিকৃতির উদ্দীপন গুরুমস্তিষ্কে পৌছাইয়া সংমিশ্রিত (fused) হইয়া একটি সম্পূর্ণ ঘনবস্তুর প্রতিকৃতিতে রূপান্তরিত হয়।

এই মতের সত্যতা ঘনদৃক্‌যন্ত্র (stereoscope)-এর বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে

২০ Stout, *Manual of Psychology*, pp. 487-488 দ্রষ্টব্য।

প্রমাণিত হয়। ঘনদৃক্‌যন্ত্রে একই বস্তুর দুইটি সামান্য পৃথক্ ছবি একত্রে দেখান হয়। ছবি দুইটির একটি ডানচক্ষুর দৃষ্টিকোণ হইতে গৃহীত এবং অপরটি বাম চক্ষুর দৃষ্টিকোণ হইতে গৃহীত হয়। এইজন্য ছবি দুইটি একই বস্তুর হইলেও সামান্য পৃথক্ হয়। এই দুইটি ছবি ঘনদৃক্‌যন্ত্রে যথাস্থানে আটকাইয়া যদি দুইটি চক্ষু 'অবলোকন গোলক' (view finder)-এর উপর স্থাপিত করা যায়, তাহা হইলে দুইটি মিশিয়া একটি ঘনবস্তুর ছবি দেখা যায়।

৮। উপর-নীচু, ডান-বাম প্রত্যক্ষ (Visual Perception of Up and Down, Right and Left) :

আমরা পূর্ব অধ্যায়ে (পৃঃ ৫৬২) লক্ষ্য করিয়াছি যে, অক্ষিপটের উপর বস্তুর যে প্রতিচ্ছবি পড়ে, তাহা প্রকৃত বস্তুর ঠিক বিপরীত, প্রকৃতবস্তুর যাহা উপরিভাগ প্রতিকৃতির তাহা নিম্নাংশ এবং প্রকৃতবস্তুর যাহা নিম্নাংশ প্রতিকৃতির তাহা উপরিভাগ; আবার প্রকৃতবস্তুর যেটি বাম দিক্, প্রতিকৃতির সেটি ডান দিক্ এবং প্রকৃত বস্তুর যেটি ডান দিক্, অক্ষিপটের উপর পতিত প্রতিকৃতির সেটি বাম দিক্। কিন্তু প্রশ্ন হইল যে, প্রতি বস্তুর প্রতিকৃতি যদি উল্টাভাবে পড়ে, তাহা হইলে বস্তুগুলিকে সোজাভাবে বুঝি কি করিয়া? ইহার সম্পূর্ণ উত্তর আমাদের জানা নাই। এ বিষয় গুরুমস্তিষ্ক নিশ্চয়ই কিছু অংশ গ্রহণ করে; কিন্তু উহা ঠিক কী ভাবে অক্ষিপটের প্রতিকৃতিকে আবার সোজা করিয়া লয় তাহা আমাদের অজ্ঞাত। তবে আমরা এইটুকু বলিতে পারি যে, স্পার্শন ও পেশীয় সংবেদন এ বিষয়ে চাক্ষুষ সংবেদনের সহযোগিতা করে। যখন আমরা কোন বস্তুর উপরিভাগ দেখিতে চাহি, তখন আমাদের স্কন্ধ ও মুখাবয়ব উপর দিকে করিতে হয়, এবং যখন নীচের দিকে কিছু দেখিতে হয়, তখন মাথা নামাইতে হয়। সেইরূপ ডান-বাম দেখিবার জন্যও মুখমণ্ডল ঘুরাইতে হয়। তাহা ছাড়া, উঁচু জায়গা হইতে কিছু নামাইতে হইলে হাত উপর দিকে তুলিতে হয় এবং মাটি হইতে কিছু কুড়াইতে হইলে হাত নীচের দিকে করিতে হয়। এইরূপভাবে বিভিন্ন দিকে অঙ্গ সঞ্চালনের ফলে বিভিন্ন প্রকার পেশীয় সংবেদন হয় এবং অভিজ্ঞতার ফলে এক এক প্রকার অঙ্গসঞ্চালন এক একটি দিকের নির্দেশক হইয়া পড়ে; অর্থাৎ ব্যক্তি-বিশেষ অভিজ্ঞতার ফলে ইহাই বুঝিতে পারে যে, অক্ষিপটের

প্রতিকৃতিতে যাহা নিম্নভাগ, তাহাকে দেখিতে মুখমণ্ডল তথা চক্ষুযুগল উপর দিকে করিতে হয়, এবং উহাকে স্পর্শ করিতে উপর দিকে হাত তুলিতে হয়।

উপর-নীচ এবং ডান-বাম ধারণা করিবার ব্যাপারে চক্ষুগোলকের ঘূর্ণন অপেক্ষা স্পার্শন ও পেশীয় সংবেদন যে বিশেষ সহায়তা করে, তাহা প্রমাণিত হয় ষ্ট্রাটন্ (G. M. Stratton)-পরিচালিত এক পরীক্ষণের মাধ্যমে।[২১] তিনি এক বিশেষ প্রকারের চশমা নির্মাণ করেন যাহা ব্যবহার করিলে ব্যবহারকারীর অক্ষিপটের উপর প্রতিফলিত প্রতিকৃতি স্বাভাবিক অবস্থায় (অর্থাৎ ঐ বিশেষ প্রকারের চশমাবিহীন অবস্থায়) প্রতিফলিত প্রতিকৃতির ঠিক উল্টা হইবে; অর্থাৎ প্রকৃত বস্তুর প্রতিকৃতি সোজাভাবেই অক্ষিপটে পড়িবে। কিন্তু গুরুমস্তিষ্কে উদ্দীপন পৌঁছাইলে অক্ষিপটের প্রতিকৃতিটি আবার উল্টা হইয়া যাইবে। ফলে হইল যে, সমস্ত জাগতিক বস্তুই যেন ১৮০° কোণ রচনা করিয়া ঘুরিয়া গেল। এই চশমা সর্বদা ব্যবহারের অবস্থায় পরীক্ষণকারীকে প্রথম প্রথম বিশেষ বিভ্রাটে পড়িতে হইল—যাহা উপরে আছে মনে হইতেছে, তাহাকে স্পর্শ করিতে হাত নীচুর দিকে নামাইতে হইল; সেইরূপ, যাহা ডানদিকে আছে তাহার নিকটে যাইবার জন্য যতই ডান দিকে যাওয়া যায়, ততই উহা যেন আরও দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল! সুতরাং, উহাকে পাইবার জন্য বাম দিকে যাইতে হইল। কিছুদিন ব্যবহারের পর পরীক্ষণকারী যেন উহাতে অভ্যস্ত হইয়া গেলেন—সুতরাং নূতন অভ্যাসের ফলে যখন উপর হইতে কিছু নামাইতে হইল তখন তিনি স্বতঃই মাথা নীচু দিকে করিয়া হাত উপরের দিকে তুলিতে লাগিলেন এবং নীচের কিছু দেখিবার জন্য মাথা উঁচু করিতে লাগিলেন।

শ্রৌত্র সংবেদন ও দিক্‌নির্ণয়—কেবল যে চাক্ষুষ সংবেদনের মাধ্যমে দিক্ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা নহে; শ্রৌত্র সংবেদনও এই ব্যাপারে সহায়তা করে। আমরা সাধারণতঃ দুই কর্ণের সাহায্যে (বা binaural hearing-এর ফলে) শুনিয়া থাকি; কিন্তু যে দিক্ হইতে বায়ুতরঙ্গ আসে, সেই দিকের কর্ণ অপর কর্ণ অপেক্ষা যেন একটু বেশী উদ্দীপিত হয় এবং সেই দিকের কর্ণদ্বারা শ্রুত শব্দ যেন অপেক্ষাকৃত

---

২১ *Psychological Review* (Vols. III & IV) এবং তৎসহ *Genetic Psychological Monogram* (1930) দ্রষ্টব্য।

উচ্চঃস্বরের মনে হয়। সেইজন্য যদি শব্দের উৎপত্তিস্থল দুই কর্ণ হইতে সমান দূরত্ব বিশিষ্ট হয় তাহা হইলে শ্রৌত্র সংবেদন দ্বারা শব্দের দিক্ নির্ণয় করার অসুবিধা হয়। তবে চাক্ষুষ সংবেদনের সাহায্য ব্যতীত কেবলমাত্র শ্রৌত্র সংবেদন দিক্‌নির্ণয় যথাযথভাবে করিতে পারে না।

এই বিষয়ে ইয়ং (P. T. Young) একটি অভিনব 'স্বনযন্ত্র' (pseudo-phone) তৈয়ারী করেন। (১১নং চিত্র)। ইহাতে দুইটি চোঙ্ আছে —একটি চোঙের সরু দিক্‌টি বাম কাণে আটকান্ থাকে, কিন্তু চোঙের মুখটি মাথার উপর দিয়া ডান কানের সম্মুখে থাকে ; অপর চোঙের সরু দিক্‌টি ডান কানে আটকান্ থাকে, কিন্তু চোঙের মুখটি মাথার উপর দিয়া আসিয়া বাম কানের সম্মুখে থাকে। পরীক্ষণ-পাত্রের চোখ দুইটি বাঁধিয়া দিয়া স্বনযন্ত্রটি (pseudophone) লাগাইয়া দেওয়া হইল। ইহার ফলে খুবই অসুবিধার সৃষ্টি হইল। যেমন, তাহার ডান দিক্ হইতে কেহ তাহাকে কাছে আসিতে বলিলে সে তাহার কাছে যাইবার জন্য বাম দিকে চলিয়া যাইত, কারণ ঐ যন্ত্র ব্যবহারের ফলে বাম দিক্ হইতে শব্দ আসিতেছে বলিয়া তাহার মনে হইত। তবে চোখের বাঁধন খুলিয়া ফেলিবার পর এইরূপ ভ্রম কমিয়া গেল। ইহা হইতে বুঝা গেল যে, শ্রৌত্র সংবেদনও দিক্‌নির্ণয়ে কিছু অংশ গ্রহণ করে।

১১ নং চিত্র।
ইয়ং কর্তৃক পরিকল্পিত স্বনযন্ত্র।

৯। গতি প্রত্যক্ষ (Perception of Movement):

স্পার্শন ও পেশীয় বেদন, এবং চাক্ষুষ সংবেদনের মাধ্যমে গতি সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে।

স্পার্শন ও পেশীয় বেদনের মাধ্যমে গতি বুঝা যায়। যদি কাহারও চর্মের উপর কোন কিছু (যেমন, একটি পিপীলিকা) চলিয়া বেড়ায়, তাহা হইলে উহার দ্বারা চর্মের বিভিন্ন স্পর্শ বিন্দুগুলি একটির পর একটি উদ্দীপিত হইতে থাকে এবং ইহার ফলে সে ঐ বস্তুটি যে গতিশীল তাহা বুঝিতে পারে। এক্ষেত্রে স্পর্শ হইল নিশ্চেষ্ট (passive)।

আবার, যদি কোন চলমান বস্তুর উপর (যথা, ছেলেদের খেলার

মোটর গাড়ীর উপর) হাত রাখা যায় এবং উহা চলার সহিত হাতটিকেও চালান যায়, তাহা হইলে গতি সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে। [এ ক্ষেত্রে স্পর্শ হইল সচেষ্ট (active)—ইহার সহিত স্পার্শন ও পেশীয় সংবেদন উভয়ই থাকে।

আবার **চাক্ষুষ সংবেদনের সাহায্যেও গতি সম্বন্ধে অবগতি জন্মে।** যেমন, যদি চক্ষুদ্বারা কোন গতিশীল বস্তুকে স্থিরভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহা হইলে একই বস্তু সম্বন্ধে চাক্ষুষ সংবেদনের একটি পরম্পরার সৃষ্টি হয়। চাক্ষুষ সংবেদনের এই দ্রুত পরিবর্তন আমাদের ইচ্ছাধীন নহে; সুতরাং ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, এই পরিবর্তনের কারণ হইল বিষয়-বস্তুর নিজস্ব গতি।

তাহা ছাড়া, চলমান বস্তুর গতির সহিত আমরাও চক্ষুর দ্বারা উহাকে অনুসরণ করিতে পারি। এক্ষেত্রে চক্ষুসঞ্চালনের গতি ও দিক্ আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন নহে—সুতরাং আমরা অনুমান করি যে, প্রত্যক্ষের বিষয়-বস্তুর গতিই এই সঞ্চালনের কারণ।

ইহা ব্যতীত আবার **আপাত বা ভ্রান্ত গতিরও প্রত্যক্ষ** হয়। অর্থাৎ বাস্তবিক বস্তু-বিশেষের গতি নাই, অথচ উহা গতিশীল বলিয়া মনে হয়।[২২] যদি একই আকারের দুইটি সরলরেখার একটিকে দেখাইয়া তাহার পর $\frac{১}{১৫}$ সেকেণ্ড বাদে আর একটি সরলরেখা দেখান যায়, তাহা হইলে মনে হয় যেন একই রেখা এক স্থান হইতে অপর স্থানে সরিয়া গেল। আবার ঐরূপ রেখাদ্বয়ের একটিকে লম্বভাবে দেখাইয়া তাহার পরই অতি অল্প ব্যবধানে যদি একই দৈর্ঘ্যের আর একটি রেখাকে শয়ানভাবে দেখান যায়, তাহা হইলে মনে হয় যে, একই রেখা যেন পড়িয়া গেল। (১২ নং চিত্র)। গেস্টাল্ট্‌বাদীরা এই বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করেন (পৃঃ ১০৬-১০৭)। ইহাকে বলা হয় **ফাই-ব্যাপার (Phi-phenomenon)**।

ছায়াচিত্রে যে সকল ছবি দেখান হয় সেগুলি প্রকৃতপক্ষে হইল এক একটি ব্যক্তি বা বস্তুর বিভিন্ন অবস্থার কতকগুলি নিশ্চল প্রতিরূপ। কিন্তু এগুলি এত দ্রুত পর্দার উপর অভিক্ষিপ্ত হয় যে, মনে হয় একই বস্তু বা ব্যক্তি

২২ ইহাকে ভ্রমিদৃক্-সংক্রান্ত দৃষ্টি (stroboscopic vision) বলা হয়।

নড়িতেছে। একটি ছবির পর আর একটি ছবি প্রদর্শিত হওয়ার মধ্যে সাময়িক ব্যবধান এত অল্প যে, দর্শকবৃন্দ উহা লক্ষ্য করে না।
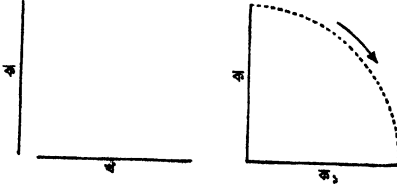
১২নং চিত্র।

প্রথমে 'ক' এবং তাহার অব্যবহিত পরেই 'খ'-কে দেখাইলে মনে হয় যেন 'ক'-রেখাটিই ৯০° কোণ গঠন করিয়া পড়িয়া গেল। প্রকৃতপক্ষে, তথাকথিত 'ক১'-রেখাটি হইল 'খ'-রেখা।

এইজন্য গেস্টাল্ট্‌বাদীরা মনে করেন যে, গতিপ্রত্যক্ষের ক্ষমতা চক্ষুর পক্ষে একটি মৌলিক ক্ষমতা এবং উহা অনুমান-লব্ধ নহে। আমরা উপরে চক্ষু দ্বারা গতিপ্রত্যক্ষের যে ব্যাখ্যা দিয়াছি গেস্টাল্ট্‌বাদীরা তাহা গ্রহণ করেন না।

১০। কাল প্রত্যক্ষ (Perception of Time):

স্থান প্রত্যক্ষ (space perception)-এর ক্ষেত্রে যেমন বিশেষ ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপনের ফলে স্থান সম্বন্ধে অবগতি জন্মে, কাল প্রত্যক্ষ (temporal perception)-এর ক্ষেত্রে সেইরূপ কোন নির্দিষ্ট ইন্দ্রিয় নাই। সময় সম্বন্ধে ব্যক্তিগত ধারণার মূলে আছে কতকগুলি ঘটনা সম্বন্ধে অবগতি—যে ঘটনাগুলির কতকগুলি অতীত, কতকগুলি বর্তমান এবং কতকগুলি ভবিষ্যতের। অর্থাৎ ঘটনাস্রোত অবধারণের ফলে আমরা উহার মধ্যে ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের যে সীমারেখা টানি তাহারই সাহায্যে সময়ের প্রবাহ সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে।

সময় সম্বন্ধে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়, তাহার মধ্যে ব্যাপকতা (duration) এবং ক্রমপর্যায় (succession)-এর জ্ঞান থাকে। একটি ঘটনা সম্বন্ধে আমরা কিছুক্ষণ ধরিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করি এবং তাহার পর আর একটি ঘটনা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করি—ইহার ফলে ব্যাপকতা (duration) সম্বন্ধে অবগতি জন্মে। আবার এইভাবে ঘটনা হইতে ঘটনান্তরের অভিজ্ঞতার ফলে ক্রমপর্যায় (succession) সম্বন্ধেও জ্ঞান জন্মে; অর্থাৎ **আমাদের সচেতন অবস্থায় একটি অভিজ্ঞতা-পরম্পরা (series of experience) চলিয়াছে—যাহা এখন বর্তমান, পর মুহূর্তেই তাহা অতীত হইয়া পড়িতেছে এবং যাহা ছিল ভবিষ্যৎ**

তাহা বর্তমান হইতেছে; সময়ের অবগতি ইহারই ফলে জন্মে। সময়ের অভিজ্ঞতার মধ্যে 'এখন' (now), 'তখন' (no more) এবং 'এখনও নয়' (not yet) এই তিনের সংযোগ ঘটিয়াছে। এইজন্য সময়ের অভিজ্ঞতার জন্য **স্মৃতি, কল্পনা ও আশা** (memory, imagination and expectation), ইহাদের সাহায্য প্রয়োজন।

তবে 'এখন' বা 'বর্তমান'-এর তাৎপর্য কী? সম্পূর্ণ বা নিছক বর্তমান বলিতে কিছু নাই। বর্তমানের সাময়িক ব্যাপকতা যত কমই হউক্ না কেন, উহা অবধারণ করিতে না করিতে উহার কিয়দংশ অতীতে চলিয়া যাইতেছে এবং ভবিষ্যতের কিয়দংশ উহার সহিত যুক্ত হইতেছে। এইজন্য জেম্‌স্ বলিয়াছেন যে, তথাকথিত 'বিশুদ্ধ' বর্তমান হইল 'অলীক বর্তমান' (specious present)। আমরা যখন 'বর্তমান' কথাটি উচ্চারণ করি, তখন 'ব' অক্ষরটি যখন বলিতেছি, তখন 'ন' অক্ষরটি ভবিষ্যতের অন্তর্গত, আবার যখন 'ন' অক্ষরটি উচ্চারণ করিলাম, তখন 'ব' অক্ষরটি অতীত হইয়া গিয়াছে। আমরা দৈনন্দিন কথাবার্তায় যাহাকে 'বর্তমান' বলি তাহা কতকটা 'স্থূল', অর্থাৎ তাহার মধ্যে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে।[২৩] অবশ্য এই ক্ষেত্রে 'ভূত' বা অতীত বলিতে 'সাম্প্রতিক অতীত' বা 'সদ্যোবিগত বর্তমান' (very recent past) এবং 'ভবিষ্যৎ' বলিতে 'অতি নিকটবর্তী ভবিষ্যৎ' (very near future) বঝিতে হইবে। অতীত ও ভবিষ্যতের এই ধারণা মনোযোগের ফলে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। মনোযোগ সহকারে যদি মানসিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে বর্তমানের সহিত সংশ্লিষ্ট অতীত ও ভবিষ্যতের ধারণা স্পষ্টতর হয়।[২৪]

২৩ জেম্‌সের ভাষায় '...the practically cognised present is no knife-edge, but a saddle-back with a certain breadth of its own; and from which we look in two directions into time. The unit of composition of our perception of time is a *duration* with a bow and a stern, as it were—a rearward- and a forward-looking end." (James, *Principles of Psychology*, I, p. 609).

২৪ তুলনীয়: 'In general temporal perception is bound up with the process of attention. The primary experience of 'pastness' is involved in the cumulative effect of attention on its own process. The primary experience of 'futureness'...is involved in the essentially prospective nature of attention." (Stout, *Manual of Psychology*, pp. 499-500).

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, **সময় সম্বন্ধে ব্যক্তিগত ধারণা** (subjective estimate of time) **সময় সম্বন্ধে বাস্তব ধারণা** (objective estimate of time) **হইতে পৃথক্।** সময়ের বাস্তব ধারণা করিবার জন্য কতকগুলি ব্যক্তি-নিরপেক্ষ মান আছে; যেমন, দিনরাত্রির পরিবর্তন, সূর্য-চন্দ্রের অবস্থান ইত্যাদির মধ্যে একটা নিয়মানুবর্তিতা আছে এবং ইহাদের সাহায্যে সময়ের ধারণা জন্মে। তাহা ছাড়া, সভ্যজগতে ঘড়ির আবিষ্কারের পর হইতে সময়ের ব্যক্তি-নিরপেক্ষ মান নির্ধারণের সুবিধা হইয়াছে।

সময়ের ব্যক্তিগত ধারণা কিন্তু এই ব্যক্তি-নিরপেক্ষ মান দ্বারা সূচিত সময় হইতে অনেক সময়েই পৃথক্ হইয়া পড়ে। যেহেতু সময়ের ব্যক্তিগত ধারণা মনোযোগের উপর নির্ভর করে, সেইজন্য যাহার উপর সহজেই মনোযোগ দেওয়া যায়, তাহা স্বল্পস্থায়ী মনে হয়। যে জিনিষ চিত্তাকর্ষক, আনন্দদায়ক, তৃপ্তিকর সেইগুলির উপর সহজেই মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এবং ঐগুলি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাকালে মনে হয় যে, সময় অত্যন্ত দ্রুত চলিয়া যাইতেছে। সুমধুর সঙ্গীত, ভাল গল্প ইত্যাদি শুনিবার কালে সময় যেন খুব তাড়াতাড়ি চলিয়া যায়। কিন্তু যাহা বিরক্তিকর এরূপ কোন কিছু অভিজ্ঞতাকালে মনে হয় যেন সময় আর কাটিতেছে না। যেমন, কোন বক্তৃতা শোনার কালে বক্তা যদি সরল ও চিত্তাকর্ষকভাবে বক্তব্য বিষয় বলিতে না পারেন, অথবা কোন নাটক দর্শনকালে যদি কাহিনীবিন্যাস, অভিনয় ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে সাধিত না হয়, তাহা হইলে মনে হয় যেন সময় আর কাটিতেছে না। সেইরূপ উৎসবমুখর গৃহে সময় কখন কাটিয়া যাইতেছে তাহা কেহ বুঝিতে পারে না; অপর পক্ষে শোকাচ্ছন্ন গৃহের অধিবাসীদের পক্ষে মনে হয় যে, ঘড়ি যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছে—সময় আর চলিতেছে না।

ইহা ছাড়া, আমরা সকলেই এক এক সময় বিশেষ বিশেষ কার্য করার অভ্যাস করিয়াছি (যেমন, প্রাতঃকৃত্যাদি করা, প্রাতরাশ আহার করা, স্নান করা, নিদ্রা যাওয়া ইত্যাদি)। এক একটি সময়ের ব্যবধানে দেহ ও মনের দিক্ হইতে ঐ সব কার্যের জন্য যেন 'তাগিদ' আসে। ইহা হইতেও আমরা সময়ের গতির কিছু পরিমাণ আন্দাজ করিতে পারি।

বিংশ অধ্যায়

স্মৃতি

আমরা যখন কোন কিছু প্রত্যক্ষ করি, তখন বিষয়-বস্তু আমাদের সম্মুখে উপস্থিত থাকে। কিন্তু যখন বিষয়-বস্তু আমাদের সম্মুখে থাকে না, তখন কি উহার সম্বন্ধে কিছু চিন্তা করিতে পারি না, তখন কি উহার সম্বন্ধে কোন ধারণা করিতে পারি না? প্রাক্তন অভিজ্ঞতার বিষয়-বস্তুর একটি 'আলেখ্য' বা 'ছবি' আমাদের অন্তরে থাকিতে পারে এবং ইহারই ফলে বিষয়-বস্তু ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে না থাকিলেও আমরা উহার ধারণা করি। বস্তু-বিশেষের এই মানসিক আলেখ্যকে বলে 'প্রতিরূপ' এবং উহাকে মনে রাখা ও প্রয়োজন মত জাগরিত করাকে বলে স্মৃতি। এই স্মৃতির বিবিধ বৈশিষ্ট্য বর্তমান অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

১। প্রত্যক্ষের বিষয়-বস্তু এবং স্মৃতি-প্রতিরূপ (Percept and Memory-image):

প্রত্যক্ষ ও স্মৃতি-প্রতিরূপের পার্থক্য নিম্নলিখিত প্রকার:

(ক) যখন কোন বস্তু ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আসে এবং আমরা ঐ বস্তুকে বস্তু বলিয়া বুঝিতে পারি, তখন উহাকে প্রত্যক্ষের বিষয়-বস্তু বলা হয়। আবার **যখন কোন বস্তুকে অতীতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং যখন উহা আমাদের সম্মুখে নাই, অথচ উহার আলেখ্য আমাদের মনে জাগরিত হইতেছে, তখন উহাকে বলে স্মৃতি-প্রতিরূপ।** সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যক্ষের মূলে আছে ইন্দ্রিয়-উদ্দীপন, কিন্তু স্মৃতি-প্রতিরূপের ক্ষেত্রে যে বস্তুর স্মৃতি হইতেছে তাহা দ্বারা ইন্দ্রিয়-উদ্দীপন সম্ভব নহে। আমার সম্মুখে একটি বই আছে, আমি উহা দেখিতেছি—এক্ষেত্রে বইটি হইল প্রত্যক্ষের বিষয়-বস্তু। কিন্তু আমি গতবৎসর তাজমহল দেখিয়াছিলাম এবং এখন উহা স্মরণ করিতেছি—এক্ষেত্রে তাজমহলের প্রতিরূপ আমার অন্তরে জাগরিত হইতেছে। ইহাই হইল প্রত্যক্ষের বিষয়-বস্তু ও প্রতিরূপের মধ্যে মূল পার্থক্য।

(খ) **প্রত্যক্ষের বিষয়-বস্তুর মধ্যে একটি সজীবতা (liveliness) আছে, কিন্তু স্মৃতি-প্রতিরূপের মধ্যে উহার অভাব।** প্রত্যক্ষের বিষয়-বস্তু যেন কতকটা জোর করিয়া বাহির হইতে আসিয়া মনের উপর 'আঘাত' করে, কিন্তু স্মৃতি-প্রতিরূপের ক্ষেত্রে বাহির হইতে মনের উপর 'আঘাত' করিবার কোন প্রশ্ন উঠে না; কিন্তু স্মৃতি-প্রতিরূপ যত স্পষ্টই হউক উহার মধ্যে এই সজীবতার অভাব আছে।[১] কেহ যদি অতি মৃদুস্বরে বা চুপি চুপি কথা বলে তাহার মধ্যেও যে সজীবতা আছে, তাহা কোন বজ্রের শব্দের স্মৃতির মধ্যে পাওয়া যাইবে না। এই পার্থক্য কেবল পরিমাণগত নহে, ইহা প্রকৃতিগতও বটে; কারণ এই যে সজীবতা ইহা উদ্দীপকের তীক্ষ্নতা বা তীব্রতা (intensity)-এর নির্দেশক এবং উদ্দীপকমাত্রেরই কোন-না-কোন প্রকারের তীব্রতা বা তীক্ষ্নতা থাকে।

(গ) **প্রত্যক্ষের বিষয়-বস্তু বাস্তবের সহিত যে-ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকে স্মৃতি-প্রতিরূপ সেইভাবে বাস্তবের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে না—** অতীতের যে বাস্তব পরিবেশের সহিত ইহা সংশ্লিষ্ট ছিল তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মনোজগতে ইহা আবির্ভূত হয়।

(ঘ) যখনই কোন কিছুকে আমরা কোন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করি, তখন সেই বিশেষ ইন্দ্রিয় ত' উদ্দীপিত হয়ই, পরন্তু অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও উহার সহিত সহযোগিতা করে। যেমন, রাসন সংবেদনের সহিত ঘ্রাণজ সংবেদন এবং চার্ম সংবেদন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে; কিন্তু যখন আমরা অতীতের রাসন অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করিবার চেষ্টা করি, তখন উহার সহিত জড়িত অন্য সংবেদনের স্মৃতি জাগরিত হয় না। আবার যখন আমরা কোন শব্দ শুনি, তাহার সহিত দিক্ সম্বন্ধেও অভিজ্ঞতা হয় (পৃঃ ৬০২)। কিন্তু যখন অতীতের কোন শব্দের স্মৃতি ভাসিয়া উঠে, তখন দিক্ সম্বন্ধীয় কোন অভিজ্ঞতার স্মৃতি তাহার সহিত সাধারণতঃ জড়িত

১ দার্শনিক হিউম্ (Hume) প্রতিরূপ (image) হইতে প্রত্যক্ষ (impression)-এর পার্থক্য করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষের বৈশিষ্ট্য হইল, "force or liveliness with which they *strike upon* the mind."

থাকে না। **প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তুর যে সমগ্রত্ব থাকে, প্রতিরূপের ক্ষেত্রে তাহা যেন কতকটা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।**[২]

(ঙ) প্রত্যক্ষের মূলে আছে 'উদ্দীপক'—এই উদ্দীপক যতক্ষণ ইন্দ্রিয়ের সহিত সংস্পৃষ্ট থাকে, ততক্ষণ প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তু মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু ইহার তুলনায় **প্রতিরূপ হইল অপেক্ষাকৃত চঞ্চল** (flickering)—মনঃসংযোগ দ্বারা চেষ্টাপূর্বক ইহাকে চেতনার কেন্দ্রে ধরিয়া না রাখিলে ইহা যেন অচিরে অদৃশ্য হইয়া যায়। এমন কি যেখানে চেষ্টা সহকারে ইহাকে ধরিয়া রাখা যায়, সেখানেও ইহার স্পষ্টতার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে, কারণ আমাদের অবধান-তরঙ্গ যেন সর্বদাই 'উঠা-নামা' করে (পৃঃ ৪৭২)।

(চ) যেমন, একদিক্‌ হইতে প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তু অপেক্ষাকৃত স্থির এবং প্রতিরূপ চঞ্চল ও পরিবর্তনশীল, সেইরূপ আর এক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে **প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তু পরিবর্তিত হইতে পারে, অথচ প্রতিরূপ অপেক্ষাকৃত অপরিবর্তিত থাকিতে পারে।** ইহা সম্ভব হয় যখন প্রত্যক্ষকারী এক স্থান হইতে অন্যস্থানে গমন করে, অথচ তাহার মন একই ব্যক্তি বা বস্তুর চিন্তা করে। যেমন, একজন ব্যক্তি তাহার মাতার অসুখের সংবাদ পাইয়া রেলযোগে দেশে ফিরিতেছে। সে গাড়ীর জানালা দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছে; সুতরাং রেলগাড়ী যখন ছুটিতেছে, তখন ঐ ব্যক্তির প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তুর দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতেছে; কিন্তু সে হয়ত' একমনে তাহার রোগক্লিষ্টা মাতার কথা ভাবিতেছে এবং তাহার মাতার মুখচ্ছবি ক্রমাগতই তাহার মানসচক্ষুর সম্মুখে যেন ভাসিয়া উঠিতেছে। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে বলা যায় যে, প্রতিরূপ মোটামুটি একই থাকিতেছে।

২। প্রতিরূপ ও ধারণা (Image and Idea):

সংবেদনের উপর ব্যাখ্যা আরোপিত হইলে উহাকে যেমন প্রত্যক্ষ বলে,

২ তুলনীয়: "In the mental image there is little or no reinstatement of consentience. The sensory elements of the image are detached from the total mass of impressional experience of which they could form part, if they occurred as actual sensation." (Stout, *Manual of Psychology*, p. 135).

সেইরূপ প্রতিরূপের উপর ব্যাখ্যা যুক্ত হইলে উহাকে **ধারণা** (idea) বলে। অর্থাৎ সংবেদনের সহিত প্রত্যক্ষের যে সম্বন্ধ, প্রতিরূপের সহিত ধারণারও সেই সম্বন্ধ। ইহার অর্থ এই নহে যে, প্রতিরূপ ও ধারণা চেতনার দুইটি বিভিন্ন অবস্থা; চেতনার যে অবস্থাকে অতীত সংবেদনের অভিজ্ঞতার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিলে কেবলমাত্র প্রতিরূপ বলা যাইতে পারে, সেই একই অবস্থাকে উহার উপর আরোপিত অর্থের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিলে 'ধারণা' বলা যায়।[৩] অবশ্য 'বিশুদ্ধ সংবেদন' যেমন পৃথক্‌ভাবে থাকিতে পারে না, যেমন সংবেদনের আবির্ভাবমাত্র উহা ব্যাখ্যাত হয়, সেইরূপ প্রতিরূপ মাত্রই অল্পবিস্তর ব্যাখ্যাত (interpreted) হয়, অর্থাৎ উহা কিসের প্রতিরূপ সেই সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু প্রতীতি জন্মে। আবার প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে যেরূপ সংগঠন ও বিন্যাস (organisation and arrangement) হয়, সেইরূপ প্রতিরূপেরও পুনর্গঠন ও বিন্যাস হয় (পৃঃ ৬১৮-১৯ দ্রষ্টব্য)।

৩। প্রতিরূপের প্রকারভেদ (Kinds of Images):

প্রতিরূপ প্রধানতঃ দুই প্রকারের—স্মৃতি-প্রতিরূপ এবং কল্পনার প্রতিরূপ (memory image এবং image of imagination)। স্মৃতি-প্রতিরূপের ক্ষেত্রে আমরা পূর্বতন অভিজ্ঞতাকে মানসিক প্রতিচ্ছবির আকারে পুনরুত্থিত করিবার চেষ্টা করি। ইহাতে আমরা অতীতে ঘটনাপরম্পরা যেরূপভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, প্রতিরূপের আকারে সেইভাবে উহাদের জাগ্রত করিবার চেষ্টা করি (যদিও কার্যক্ষেত্রে উহারা সকল সময় অতীত অভিজ্ঞতার যথাযথ প্রতিলিপি হয় না)। অপরপক্ষে, কাল্পনিক প্রতিরূপ গঠনে আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে।

স্মৃতি-প্রতিরূপ বলিতে এমনই এক অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিলিপি বুঝায় যাহা বিস্মৃতির গর্ভে লীন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু স্মৃতি-প্রতিরূপ এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যবর্তী কতকগুলি প্রতিরূপ থাকিতে পারে—এইগুলি সদ্য অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিচ্ছবি হইতে পারে।

---

৩ তুলনীয়: "Images and ideas do not refer to two different states of consciousness, but to one and the same state, looked at now from the side of sensory character, and now from the side of meaning." (Angell, *Psychology*, p. 201).

(১) **অনুবেদন** (**after-image**)—উদ্দীপক সদ্য তিরোহিত হইয়াছে, অথচ সংবেদন অল্পক্ষণ চলিতেছে—এইরূপ অবস্থাকে অনুবেদন বলে। চাক্ষুষ সংবেদনের ক্ষেত্রে ইহা আবার সবর্ণ (positive) এবং অসবর্ণ (negative) এই দুই প্রকারের হইতে পারে। (পৃঃ ৫৬৬ দ্রষ্টব্য)।

ইহা পুরাপুরি স্মৃতি-প্রতিরূপ নহে, কারণ সংবেদনের সহিত অনুবেদনের একটি নিরবচ্ছিন্নতা (continuity) থাকে, কিন্তু স্মৃতির ক্ষেত্রে 'অতীত অভিজ্ঞতা' এবং 'প্রতিরূপের মাধ্যমে উহার পুনর্জাগরণ' এই দুইয়ের মধ্যে একটি ছেদ থাকে।

(২) **পৌনঃপুনিক প্রতিরূপ** (**Recurrent or Resilient Image**) :

আমরা যদি কোন চিত্তাকর্ষক বা উত্তেজক ঘটনা গভীর মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে মধ্যে মধ্যে এরূপ হয় যে, কিছু সময়ের ব্যবধান অন্তর কেবলই ঐ ঘটনার প্রতিরূপ জাগরিত হয়। যেমন, অনুবীক্ষণযন্ত্রে অনেকক্ষণ ধরিয়া ক্ষুদ্র জীবাণু পর্যবেক্ষণ করার পর এমন হইতে পারে যে, মধ্যে মধ্যে পর্যবেক্ষকের মানসচক্ষে যেন উহাদের ছবি হঠাৎ জাগিয়া উঠে। সেইরূপ কোন বীভৎস দৃশ্য (যেমন, নরহত্যা) দর্শন করিলে এমন হইতে পারে যে, প্রত্যক্ষদর্শীর মনে কিছু সময় পর পর ঐ দৃশ্য যেন ভাসিয়া উঠে। এইরূপ মানস প্রতিচ্ছবিকে 'পৌনঃপুনিক প্রতিরূপ' বলে।

(৩) **প্রাথমিক স্মৃতি-প্রতিরূপ** (**Primary memory-image**):

যে উদ্দীপক সদ্যোবিগত হইয়াছে মধ্যে মধ্যে তাহার স্মৃতির উদ্রেক হয়। যেমন, এই মাত্র কেহ যেন দরজায় কড়া নাড়িল, বা নাম ধরিয়া ডাকিল বা কে যেন রাস্তায় পাশ দিয়া চলিয়া গেল; ঠিক সেই মুহূর্তে উহা প্রত্যক্ষ না করিলেও উহার অব্যবহিত পরেই ঐ সম্বন্ধে প্রতীতি হইতে পারে।[৪] এখানে বলা যাইতে পারে যে, উদ্দীপক সদ্যোবিগত হইলেও উহার যেন ক্ষীণরেখা

---

৪ Ward-**এর ভাষায় :** **"A knock at the door, the hour struck on the clock, the face of a friend whom we have passed unnoticed, can sometimes be recognised a few moments later by means of the persisting image, although *apparently* the actual impression was entirely disregarded." (*Psychological Principles*, p. 175).**

প্রতিরূপের মাধ্যমে জাগরূক থাকে এবং উহাই উদ্দীপক সম্বন্ধে প্রতীতি জন্মায়। প্রাথমিক স্মৃতি-প্রতিরূপ উহার আবির্ভাবের প্রথম অবস্থায় উদ্দীপকেরই ন্যায় সুস্পষ্ট থাকে।

(৪) **আইডেটিক্ প্রতিরূপ** (Eidetic Image) :

এক প্রকারের প্রতিরূপ আছে যে সম্বন্ধে সাধারণতঃ ১২।১৩ বৎসর বয়স পর্যন্ত বালক-বালিকাদের অভিজ্ঞতা জন্মে। ইহাকে 'আলোকচিত্রতুল্য স্মৃতি' (**photographic memory**) বলা হয়। এ বিষয়ে গবেষণা সুরু করেন জার্মান মনোবিৎ য়েন্‌শ্ (E. R. Jaensch); এবং অ্যাল্‌পোর্ট (G. W. Allport) ইত্যাদিও অনুরূপ অনুসন্ধান কার্য চালান।[৫] এইরূপ যথাযথ প্রতিরূপকে বলা হয় 'আইডেটিক্ প্রতিরূপ' (Eidetic Image)।

আইডেটিক্ প্রতিরূপের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি এইরূপ :

(১) **ইহা সাধারণতঃ ১২ বৎসরের (কেহ কেহ বলেন, ১৪ বৎসরের) নিম্নবয়স্ক বালক-বালিকাদের ক্ষেত্রে দেখা যায়।** এই বয়সের শতকরা ৫০ হইতে ৬০ জনের মধ্যেই আইডেটিক্ প্রতিরূপ পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা দেখা যায়। পরিণতবয়স্কদের শতকরা ১ হইতে ১০ জনের এইরূপ ক্ষমতা থাকিলেও থাকিতে পারে।

(২) যদি শিশুদের অতি অল্পক্ষণ (যেমন, কমবেশী ৩৫ সেকেণ্ড) কোন ছবি দেখাইয়া বন্ধ করা যায় এবং তাহার পর যদি তাহাদের কোন ধূসর ক্ষেত্রের দিকে তাকাইয়া ছবিটি বর্ণনা করিতে বলা হয়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, তাহারা **যথাযথভাবে ঐ ছবি বর্ণনা করিতে পারিতেছে; এমন কি, অনেক স্থলে জটিল ও সূক্ষ্ম বৈচিত্র্যও তাহারা সঠিকভাবে বর্ণনা করিতে পারিতেছে।**[৬]

৫ ১৯২৪ সালের *British Journal of Psychology*-তে একটি প্রবন্ধে অ্যাল্‌পোর্ট তাঁহার পর্যবেক্ষণের ফলাফল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

৬ অনেক সময় দেখা যায় যে, শিশুগণ ছবির সকল বৈচিত্র্যই প্রায় সম্পূর্ণরূপে বলিতে পারে; অর্থাৎ ছবিতে অঙ্কিত ব্যক্তি-বিশেষের জামার কয়টি বোতাম আছে, কয়টি গাছ আছে, কয়টি গাড়ী আছে, গাড়ীগুলি কি ভাবে দাঁড়াইয়া আছে ইত্যাদি ইত্যাদি সব কিছুই তাহারা ছবিটি দেখিবার পর হুবহু বলিতে পারে। অ্যাল্‌পোর্ট-প্রদর্শিত একটি ছবিতে সাইন্-বোর্ডে একটি জার্মান শব্দ লেখা ছিল। ঐ ভাষার সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ কয়েকটি ইংরাজ-শিশু নির্ভুলভাবে উহার বানান পর্যন্ত বলিতে পারিয়াছিল।

(৩) সাধারণ স্মৃতি-প্রতিরূপের ক্ষেত্রে প্রতিরূপের 'অধিষ্ঠান' ব্যক্তি-বিশেষ তাহার মনের মধ্যেই আছে বলিয়া মনে করে; কিন্তু **আইডেটিক্ প্রতিরূপের ক্ষেত্রে শিশু মনে করে যে, তাহার সম্মুখেই সে যেন পূর্ব-দৃষ্ট ছবিটি দেখিতেছে।** তবে তাই বলিয়া পর্যবেক্ষণকারীর সম্পূর্ণ বিভ্রান্তি ঘটে না; অর্থাৎ সে বুঝিতে পারে যে, সে যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছে তাহা বাস্তব নহে—উহা তাহারই মনের সৃষ্টি।[৭] এইজন্য কেহ কেহ ইহাকে 'অসম্পূর্ণ অমূল প্রত্যক্ষ'(pseudo-hallucination) বলেন।

(৪) যদিও এইরূপ প্রতিরূপকে ফোটোগ্রাফের প্রতিরূপ (photographic image)-এর সহিত তুলনা করা হয়, তাহা হইলেও ফোটোগ্রাফের ছবির ন্যায় উহা সম্পূর্ণ নিখুঁত নহে। কারণ দেখা যায় যে, **শিশুগণ তাহাদের ঔৎসুক্যের তারতম্য অনুসারে ছবির এক একটি অংশের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। তাহা ছাড়া, তাহাদের কল্পনায় তাহারা ছবির সামান্য সামান্য পরিবর্তনও করে।**[৮]

(৫) **বয়োবৃদ্ধির সহিত আইডেটিক্ প্রতিরূপ গঠনের ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং পরিণতবয়স্কদের মধ্যে এই ক্ষমতার যথেষ্ট অভাব দেখা দেয়।** ইহার কারণ-স্বরূপ আল্‌পোর্ট প্রমুখ লেখকগণ মনে করেন যে, এই প্রকার প্রতিরূপ গঠনের মাধ্যমে শিশুর মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পায় —এই বয়সে শিশুরা সাধারণতঃ বিবিধ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্যাদি পর্যবেক্ষণ করিয়া মূর্তচিন্তা (concrete thought) করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এইজন্য শিশুরা যাহা পর্যবেক্ষণ করে তাহার প্রায় সকল বৈশিষ্ট্যের উপরই তাহারা অনেক সময় মনোযোগ অর্পণ করে এবং এইগুলি তাহাদের মনে গভীর

৭ তুলনীয়: "It is never localized 'within the head' as the memory image so often is, but 'out there', attached to the mat or a wall or some other surface...However, despite this 'outer' character of the image, the subject always recognizes that it is a purely subjective phenomenon." (I. M. L. Hunter, *Memory*, p. 147).

৮ তুলনীয়: "This (eidetic) image is not strictly photographic, but rather *plastic*, and is likely to be modified by the subject's interest." (Woodworth, *Psychology*, 12th Ed., p. 350).

রেখাপাত করে; সেইজন্য সহজেই তাহাদের অভিজ্ঞতা প্রতিরূপের আকারে তাহাদের মানসচক্ষে যেন ভাসিয়া উঠে। এই সকল প্রতিরূপের মাধ্যমে শিশুরা তাহাদের স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিষয়বস্তুকে সুস্পষ্টভাবে এবং সম্ভবতঃ নূতন ভঙ্গিমায় পর্যবেক্ষণের সুযোগ লাভ করে। বয়োবৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ বিমূর্ত-চিন্তা (abstract thinking)-এর ক্ষমতা আয়ত্ত হয় এবং তখন প্রতিরূপের মাধ্যমে অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তুকে আয়ত্তাধীন করিবার প্রয়োজন আর অধিক অনুভূত হয় না।[৯]

৪। প্রতিরূপ-গঠনের ক্ষমতার পার্থক্য (Differences in respect of image-formation):

স্মৃতি-প্রতিরূপ-গঠনের ক্ষমতা সকলের সমানভাবে থাকে না। কাহারও কাহারও প্রতিরূপ খুব স্পষ্ট থাকে, কাহারও অস্পষ্ট থাকে এবং কাহারও কাহারও প্রতিরূপ গঠনের ক্ষমতা নাই বলিলেই হয়। এ বিষয় গ্যাল্টন্ একটি অনুসন্ধানকার্য চালান। তিনি ১০০ জন ব্যক্তিকে প্রশ্ন করিয়া পাঠান যে, প্রাতরাশের টেবিল (breakfast table)-এর কথা চিন্তা করিলে কী ছবি বা প্রতিরূপ তাঁহাদের মানসচক্ষে ভাসিয়া উঠে, এবং ঐ প্রতিরূপে কোন্ প্রকার সংবেদনের স্মৃতির প্রাধান্য আছে এবং ঐ প্রতিরূপ কতদূর স্পষ্ট। গ্যাল্টন্ যখন বিভিন্ন উত্তরদাতার উত্তরগুলি আলোচনা করিলেন, তখন দেখিলেন যে, এই ব্যাপারে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রচুর পার্থক্য আছে। দেখা গেল যে, কাহারও কাহারও ক্ষেত্রে প্রাতরাশের টেবিল এবং উহার উপর রক্ষিত পাত্রাদির আকার, রঙ্ ইত্যাদির স্মৃতির প্রাধান্য, কাহারও কাহারও ক্ষেত্রে ভোজ্যদ্রব্যের গন্ধের স্মৃতির প্রাধান্য, আবার কাহারও কাহারও ক্ষেত্রে স্পর্শের স্মৃতির প্রাধান্য। আবার ইহাও দেখা গেল যে, কাহারও প্রতিরূপ স্পষ্ট, কাহারও অস্পষ্ট, আবার কেহ কেহ বা কোন

৯ অল্‌পোর্টের ভাষায়: "The eidetic image seems to serve essentially the same purpose in the mental development of the child as does the repetition of the stimulus situation. It permits the concrete 'sensory' aspects of the surrounding world to penetrate thoroughly into his mind." (*British Journal of Psychology*, 1924).

প্রতিরূপ-গঠনে একেবারে অক্ষম এবং তাহারা কেবলমাত্র ভাষার মাধ্যমেই তাহাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতেছে।[১০]

গ্যাল্টনের পরও মনোবিদ্গণ এ বিষয় অনুসন্ধান করেন। তাঁহাদের অনুসন্ধানের ফল মোটামুটি এই প্রকার। সকল ব্যক্তির প্রতিরূপ গঠনের ক্ষমতা সমান নহে—কাহার প্রতিরূপগুলি সুস্পষ্ট (vivid), কাহারও বা অস্পষ্ট (hazy), আর কেহ কেহ এই ব্যাপারে প্রায় অপারগ। যাহারা প্রতিরূপ-গঠনে সক্ষম তাহাদেরও প্রতিরূপের বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন প্রকারের। কাহারও প্রতিরূপে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার স্মৃতির প্রাধান্য—ইহাদের বলা হয় **দৃষ্টিধর বা চাক্ষুষ-প্রতিরূপ-গোষ্ঠীভুক্ত** (**visual type**); কাহারও স্মৃতিরূপে শ্রৌত্র অভিজ্ঞতার প্রাধান্য—ইহাদের বলা হয় **শ্রুতিধর বা শ্রৌত্র-প্রতিরূপ-গোষ্ঠীভুক্ত** (**auditory type**); কাহারও অভিজ্ঞতায় গতিবৈচিত্র্যের অভিজ্ঞতার প্রাধান্য—ইহাদের বলা হয় **গতীয়-প্রতিরূপ-গোষ্ঠীভুক্ত** (**motor type**)। ইহা ছাড়া, রাসন, স্পার্শন ও ঘ্রাণজ প্রতিরূপ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিও আছে (তবে মনে হয় যে, ঘ্রাণজ-প্রতিরূপ-বিশিষ্ট মানুষ বোধ হয় সর্বাধিক কম)। ইহা ব্যতীত এমন অনেক ব্যক্তি আছে যাহাদের প্রতিরূপে একাধিক সংবেদনের স্মৃতি মিশ্রিত থাকে—ইহাদের বলা হয় **মিশ্র শ্রেণীভুক্ত** (**mixed type**)। তবে এই প্রকার শ্রেণী-বিভাগ আপেক্ষিক অর্থে ধরিতে হইবে—তথাকথিত শ্রেণীগুলি একটি অপরটি হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বা পৃথক্ থাকে না।

আবার স্মৃতিপ্রতিরূপ-গঠনের উপযোগী সময়ও এক একটি থাকে। মানুষ যখন কর্মব্যস্ত থাকে, তখন তাহার মনোরাজ্যে প্রতিরূপের প্রাধান্য কম থাকে; অপরপক্ষে, নিদ্রার অব্যবহিত পূর্বে ব্যক্তি-বিশেষ যখন 'অর্ধনিদ্রিত অর্ধজাগ্রত অবস্থা' (hypnagogic state)-তে থাকে তখন প্রতিরূপের প্রাধান্য ঘটে।

তাহা ছাড়া, মূর্ত বস্তুর চিন্তায় প্রতিরূপ সাধারণতঃ প্রাধান্য লাভ করে, কিন্তু বিমূর্ত চিন্তায় প্রতিরূপের স্থান বিশেষ থাকে না। এইজন্য যে

---

১০ আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতাতেও দেখিতে পাই যে, একই অভিজ্ঞতার স্মৃতিকে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নভাবে বর্ণনা করে। যেমন, কয়েকজন বন্ধু মিলিয়া যদি কোন অভিনয় দেখিয়া আসিয়া উহা বর্ণনা করে, তাহা হইলে দেখা যায় যে, কেহ বর্ণনা করে অভিনেতৃবর্গ কিরকম সাজ-পোষাক করিয়াছে, কেহ বর্ণনা করে তাহারা রঙ্গমঞ্চে কিরূপ হাত-পা নাড়িতেছিল, আর কেহ বা বর্ণনা করে তাহারা কী ভাষা অভিনয় কালে ব্যবহার করিতেছিল।

সকল ব্যক্তি সাধারণতঃ বিমূর্ত চিন্তায় লিপ্ত থাকে, তাহাদের প্রতিরূপ-গঠনের ক্ষমতা কমিয়া যায়।

৫। স্মৃতির স্বরূপ ও উহার বিশ্লেষণ (Nature and analysis of Memory):

আমরা দৈনন্দিন জীবনে বহুবিধ বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। ইহাদের সবগুলি আমাদের মনের উপর সমানভাবে রেখাপাত করে না। ইহাদের কতকগুলি প্রত্যক্ষের অবসানের পর অবলুপ্ত হইয়া যায়, আর কতকগুলির প্রভাব মনোমধ্যে সুপ্তভাবে থাকিয়া যায় এবং ভবিষ্যতে সুযোগমত তাহারা 'মানসিক আলেখ্য' বা প্রতিরূপের আকারে আত্মপ্রকাশ করে। **অতীতের অভিজ্ঞতাকে যতদূর সম্ভব প্রতিরূপের আকারে পুনরুজ্জীবিত করাকে স্মরণ করা বা স্মৃতি বলে।**

স্মৃতিকে 'বিশ্লেষণ' করিলে উহার মধ্যে নিম্নলিখিত 'উপাদান' (factors) পাওয়া যায়:

(১) স্মৃতির জন্য প্রথম প্রয়োজন **অভিজ্ঞতালাভ ও শিক্ষণ (acquisition & learning)**। যে বস্তু বা ঘটনা সম্বন্ধে আমরা কখনও অভিজ্ঞতা লাভ করি নাই, বা যাহা কখনও আমরা শিক্ষা করি নাই, সে সম্বন্ধে কোন স্মৃতি সম্ভব নহে। যেমন, যে কখনও ইংলণ্ডে যায় নাই এবং বাকিংহাম রাজপ্রাসাদ প্রত্যক্ষ করে নাই, তাহার পক্ষে ঐ রাজপ্রাসাদের স্মৃতি হইতে পারে না। সেইরূপ যে কখনও একটি বিশেষ পুস্তক পড়ে নাই, সে ঐ পুস্তকে কী আছে তাহা স্মরণ করিতে পারে না। যে কখনও মোটর গাড়ী চালনা শিক্ষা করে নাই, তাহার পক্ষে ঐরূপ গাড়ী যথাযথভাবে চালাইবার স্মৃতি হইতে পারে না। সুতরাং **অভিজ্ঞতা** হইল স্মৃতির প্রথম সোপান।

(২) যদিও স্মৃতির জন্য অভিজ্ঞতা প্রয়োজন, তাহা হইলেও অভিজ্ঞতা-মাত্রেরই স্মৃতি সম্ভব নহে। স্মৃতির জন্য অভিজ্ঞতালব্ধ বা শিক্ষালব্ধ বিষয়-বস্তুকে সংরক্ষণ করিয়া রাখা প্রয়োজন। আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয়-বস্তুগুলির মধ্যে যেগুলি মনের উপর রেখাপাত করিতে পারে, সেইগুলির

চিহ্ন (trace) মনোমধ্যে সংরক্ষিত হয়। যে সকল অভিজ্ঞতা কোন-না-কোন প্রকারে মনোমধ্যে রক্ষিত হয় না, সেগুলির স্মৃতি সম্ভব হয় না। সুতরাং **সংরক্ষণ** (retention) হইল স্মৃতির দ্বিতীয় সোপান।

(৩) পুরাতন অভিজ্ঞতা মনোমধ্যে সংরক্ষিত হওয়াই যথেষ্ট নহে। উহাকে আবার পুনরায় প্রতিরূপের মাধ্যমে পুরাতন অভিজ্ঞতার সহিত সমতা রাখিয়া জাগ্রত করিতে হইবে। সুতরাং **পুনর্জনন** বা **পুনরুজ্জীবীকরণ** (reproduction বা revival) হইল স্মৃতির তৃতীয় সোপান।

(৪) আবার ইহাই যথেষ্ট নহে। যে অভিজ্ঞতা প্রতিরূপের মাধ্যমে পুনরুজ্জীবিত হয়, তাহা যে ব্যক্তি-বিশেষের স্বীয় পুরাতন অভিজ্ঞতারই প্রতিরূপ সেইভাবে সে যেন উহাকে বুঝিতে পারে বা চিনিতে পারে। ইহাকে বলে **প্রত্যভিজ্ঞা** (recognition)। অর্থাৎ ব্যক্তি-বিশেষ যখন কোন কিছু স্মরণ করে, তখন তাহার মনে এই ধারণা থাকে যে, যে ব্যক্তি এখন স্মরণ করিতেছে সেই ব্যক্তিই মূল (original) বিষয়টি অমুক স্থানে, অমুক সময়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। পুনরুজ্জীবিত প্রতিরূপের সহিত যেন থাকে পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা (familiarity)। এইজন্য স্মৃতিমাত্রেরই পশ্চাতে ব্যক্তিগত ঐকাত্ম্যের চেতনা (consciousness of personal identity) থাকে।[১১]

এখানে যেভাবে স্মৃতিকে বর্ণনা তথা বিশ্লেষণ করা হইল তাহাতে এরূপ ভ্রান্ত ধারণা হইতে পারে যে, স্মৃতি হইল অভিজ্ঞতাসঞ্চয়, সংরক্ষণ, পুনর্জনন এবং প্রত্যভিজ্ঞা এই চারিটি পৃথক্ উপাদানের সমষ্টিমাত্র (aggregate)। **এই চারিটি তথাকথিত উপাদান স্থিতিশীল মানসিক অবস্থা** (static mental states) **নহে। স্মৃতির পশ্চাতে আছে এই চারিটির মিথস্ক্রিয়া** (inter-action)। **স্মৃতি একটি ক্রিয়াবিশেষ এবং এই ক্রিয়ার ফলে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে নূতন করিয়া যেন সংগঠন ও**

---

১১ বিষণ্ণাবস্থায় অহং-জ্ঞানের নিরবচ্ছিন্নতা নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া ব্যক্তি-বিশেষ অনেক সময় স্বীয় অতীতকে ভুলিয়া যায়। (পৃঃ ২৭৫-৭৯)। স্মৃতির ক্ষেত্রে অহং-জ্ঞানের নিরবচ্ছিন্নতার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া অনেকে বলেন : "Memory is not so much the memory of the thing remembered as of the *self* remembering."

বিন্যাস (new organization and arrangement) **সাধিত হয়।**[১২] এইজন্য যদিও স্মৃতির সংজ্ঞায় বলা হয় যে, ইহা অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুজ্জীবন, তাহা হইলেও স্মৃতি-প্রতিরূপ অতীত অভিজ্ঞতার যথাযথ আলেখ্য বা অনুলিপি (copy) হইতে পারে না। স্মৃতির প্রতিরূপের ভিতরও অল্পবিস্তর নূতনত্ব আছে—কারণ ইহা অতীত অভিজ্ঞতাকে কোন-না-কোন ভাবে পরিবর্তিত করিয়া প্রতিরূপের আকার দেয়। অতীত অভিজ্ঞতাকে কি ভাবে পুনরুজ্জীবিত করা যাইতে পারে, তাহা অনেকাংশে নির্ভর করে স্মরণকারীর প্রতিন্যাস (attitude) ও আবেগ (emotional state)-এর উপর।[১৩]

৬। মনে রাখা বা সংরক্ষণ (Problem of Retention):

স্মৃতির একটি প্রধান সমস্যা হইল অতীত অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ (retention of past experiences)। এই প্রসঙ্গে দুইটি প্রশ্ন উঠে: (ক) কি ভাবে পুরাতন অভিজ্ঞতা সংরক্ষিত হয়? (খ) অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তুগুলির মধ্যে কোন্‌গুলি মনের উপর বিশেষ রেখাপাত করে যাহার ফলে তাহারা সংরক্ষিত হয়?

১২ তুলনীয়: "It is certainly fallacious to assume that the previous experience has gone into cold storage in the interval and re-emerged intact. A memory is a *new* experience determined by the dispositions laid down by a previous experience." (Ross, *Groundwork of Educational Psychology*, p. 184).

১৩ প্রাচীনপন্থী অনুষঙ্গবাদী এবং অবয়ববাদিগণ স্মৃতিকে কতকগুলি স্থিতিশীল অবস্থার সমাবেশ বলিয়া মনে করিতেন। তাহা ছাড়া, তাঁহারা অনুষঙ্গের শক্তি (associative force)-কে যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ব্যাখ্যা করিতেন।

ক্রিয়াবাদের প্রসারের ফলে স্মৃতিকে মানসিক কার্য (mental act) রূপে ব্যাখ্যা করা হইতে লাগিল। স্মৃতির কার্যের ফলে পুরাতন অভিজ্ঞতা যে পুনঃ সংগঠিত হয় তাহা ক্রমশঃ স্বীকৃত হইল—স্মৃতিকে reduplicative না বলিয়া reconstructive আখ্যা দেওয়া হইল। বার্টলেট (Bartlett), লেভিন্ (Lewin) প্রমুখ মনোবিদ্‌গণ স্মৃতির ক্ষেত্রে মানসিক প্রতিন্যাস, অর্থ (meaning) ইত্যাদির উপর গুরুত্ব আরোপ করিলেন। স্মৃতির ক্ষেত্রে নির্জ্ঞান স্তরের প্রভাবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ফ্রয়েড্ ও তাঁহার অনুগামিগণ।

আবেগ ইত্যাদি যে অনুষঙ্গকে প্রভাবিত করিতে পারে সে বিষয় Thomas Brown উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

(ক) আমাদের প্রথম প্রশ্ন হইল: সংরক্ষণ কিভাবে হয়?—এই প্রশ্নের উত্তরে মনোবিদ্‌গণ প্রধানতঃ দুই দলে বিভক্ত।

একদল দেহযন্ত্রের মাধ্যমে সংরক্ষণকে ব্যাখ্যা করেন।

মিল (Mill), কার্‌পেণ্টার (Carpenter) ইত্যাদি মনে করেন যে, যখন আমরা কোন কিছু প্রত্যক্ষ করি, তখন আমাদের মস্তিষ্কের স্নায়ুসমূহে উদ্দীপনের ফলে কম্পন সুরু হয়; কিন্তু যখন আমরা উহা আর প্রত্যক্ষ করি না, তখনও কিছু কিছু স্নায়ু অতি ক্ষীণভাবে কাঁপিতে থাকে। যদি এই কম্পনের মাত্রা কোনভাবে একটু দ্রুত বা শক্তিশালী করিয়া তোলা যায়, তাহা হইলে আবার পুরাতন অভিজ্ঞতার স্মৃতি সম্ভব হয়।

সেইরূপ জেম্‌স্ মনে করেন যে, অতীত অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ একপ্রকারের দৈহিক ঘটনা (physical phenomenon)। জেম্‌স্ বলেন যে, যখন কোন অভিজ্ঞতা শেষ হইয়া যায়, তখন উহা মস্তিষ্কের কোন অংশে কিছু পরিবর্তন সাধন করিয়া যায়। অর্থাৎ মস্তিষ্ক মধ্যে ইহারা নূতন স্নায়ুপথ রচনা করে এবং উহারই ফলে অতীত অভিজ্ঞতাকে আবার পুরুজ্জীবিত করা যায়। (এই মতবাদকে বলে 'theory of permanent modifications of the brain-structure')।[১৪]

ব্যবহারবাদী ওয়াট্‌সন্ মনে করেন যে, স্মৃতি হইল পূর্ব হইতে হস্ত, বাক্‌যন্ত্র অথবা আন্তরযন্ত্র যে সংগঠন গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহারই পুনঃপ্রকাশ।[১৫]

বলা বাহুল্য, এই সকল মতবাদ স্মৃতির কোন সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দেয় না। স্মৃতি একটি মানসিক ক্রিয়া; সুতরাং নিছক দেহযন্ত্রের মাধ্যমে ইহাকে ব্যাখ্যা করা সমীচীন হইবে না। তাহা ছাড়া, মিল্ বা জেম্‌স্ যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা দ্বারা একটি অভিজ্ঞতার স্মৃতি হইতে আর একটি অভিজ্ঞতার স্মৃতিকে পৃথক্ করা যায় না। আমরা কত বিষয় প্রত্যক্ষ করিতেছি—ইহারা যে সূক্ষ্ম স্নায়ুপথ রচনা করিতেছে বলিয়া জেম্‌স্ মনে করেন, সেগুলি অল্পবিস্তর একই প্রকারের এবং একটি স্নায়ুপথ অপর স্নায়ুপথের

১৪ James *Principles of Psychology*, Vol. I, Ch. XVI দ্রষ্টব্য।

১৫ ওয়াট্‌সনের ভাষায়: "(Memory)...is any exhibition of manual, verbal or visceral organization put on prior to the time of task." (*Behaviorism*, p. 212).

সহিত এরূপভাবে মিশিয়া আছে যে, তাহাদের পৃথক্ করা কঠিন। সেইরূপ মিল্ স্নায়ুতন্তুর যে কম্পনের কথা বলিয়াছেন তাহাতেও বিশেষ কিছু ব্যাখ্যাত হয় না; কম্পনসমূহের মধ্যে পরিমাণগত পার্থক্য থাকিলেও গুণগত পার্থক্য নাই। সুতরাং বিভিন্ন প্রকার অভিজ্ঞতার নির্দেশক একই প্রকারের কম্পনগুলির একটি হইতে অপরটিকে পৃথক্ করিবার উপায় নাই।

ব্যবহারবাদী ওয়াট্‌সন্ যাহা বলিয়াছেন তাহারও বিশেষ মূল্য নাই। তিনি যেন একই কথার দ্বিরুক্তি করিয়াছেন। পূর্বে হস্ত, বাক্‌যন্ত্র ও আন্তরযন্ত্র যাহা যাহা করিয়াছিল কেন তাহাদের পুনঃপ্রকাশ হইল, ওয়াট্‌সন্ তাহাই ব্যাখ্যা করেন নাই।

এইজন্য আমরা যে সকল মতবাদ কেবল দেহযন্ত্রের ক্রিয়া বলিয়া স্মৃতিকে ব্যাখ্যা করে, সেইগুলি পরিত্যাগ করিলাম।

সুতরাং স্মৃতিকে মানসিক ক্রিয়ারূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। **আমরা অতীত অভিজ্ঞতার কিয়দংশ প্রতিরূপ (image)-এর আকারে মনের নির্জ্ঞান বা অবচেতন স্তরে সংরক্ষণ করিয়া রাখি এবং সেইগুলিই মধ্যে মধ্যে চেতন স্তরে আসিয়া আত্মপ্রকাশ করে।** আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, নির্জ্ঞানের (পৃঃ ৩৩০-৩২) অস্তিত্ব একটি সুষ্ঠু প্রকল্প এবং ইহা ব্যতীত আমরা স্মৃতি প্রভৃতি বিবিধ মানসিক কার্যাবলী সম্যক্‌রূপে ব্যাখ্যা করিতে পারি না। সুতরাং স্মৃতির সংরক্ষণ সাধিত হয় চেতনার ক্ষেত্র বহির্ভূত অথচ মনের অন্তর্ভুক্ত নির্জ্ঞান স্তরে।

(খ) আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন হইল: **কোন্ কোন্ প্রকারের অভিজ্ঞতা মনের উপর রেখাপাত করে বলিয়া সংরক্ষিত হয়?**

আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতায় দেখিতে পাই যে, যাহা কিছু আমরা প্রত্যক্ষ করি তাহাই আমরা সাধারণতঃ স্মরণ করিতে পারি না। এবং যাহা মনে রাখিবার চেষ্টা করি, তাহাও সকল সময় মনে রাখিতে পারি না। সুতরাং ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, উদ্দীপক এক বিশেষ প্রকারের হইলে এবং উহা মনের বিশেষ অবস্থার অনুকূল হইলে উহা মনে রাখিবার সম্ভাবনা বেশী।

মানসিক সংরক্ষণের প্রধান সহায়ক হইল মনোযোগ। আমরা যে সকল বিষয়ের উপর অধিক মনঃসংযোগ করি, তাহা আমরা অনেকদিন মনে ধারণ করিয়া রাখিতে পারি। এই দিক্ হইতে দেখিলে বলা যা

যে, যেগুলি মনোযোগের কারণ সেইগুলিই স্মৃতি-প্রতিরূপ সংরক্ষণের সহায়ক। আমরা মনোযোগের কারণগুলি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি (পৃঃ ৪৬০-৬৫)। এই কারণগুলি যেখানে বর্তমান, সেখানে অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তু মনের উপর গভীর রেখাপাত করে। (১) উদ্দীপক যদি **তীব্র বা তীক্ষ্ণ** (intense) এবং **স্পষ্ট** (vivid) হয়, তাহা হইলে উহা মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং সেই বিষয় আমরা বহুদিন মনে রাখি। (২) যদি কোন উদ্দীপক **বার বার প্রত্যক্ষ করা** যায় (যেমন, যদি কোন কিছু বার বার পড়া যায়, শুনা যায়, দেখা যায় ইত্যাদি), তাহা হইলে উহা বহুদিন মনে থাকে। এইজন্য পাঠ্য বিষয় বার বার আবৃত্তি করিয়া আয়ত্ত করিতে হয়। (৩) যে জিনিষকে আমরা **পুরাতন অভিজ্ঞতার আলোকে ভাল করিয়া প্রত্যক্ষ করি** (সংপ্রত্যক্ষ বা apperceive করি), তাহাও আমরা মনে রাখিতে পারি। (৪) যে বস্তু বা ঘটনা আমাদের **ঔৎসুক্য বা অনুরাগ (interest)-এর অনুকূল** তাহাও আমরা বহুদিন স্মরণ রাখি। যেমন, যে গণিতশাস্ত্রের প্রতি অনুরাগী, সে অতি সহজেই ঐ বিষয়ে মনোযোগ দিবে এবং ঐ শাস্ত্র-সংক্রান্ত বিষয়-বস্তু সে বহুদিন মনে রাখিবে। (৫) আবার **দেহ ও মনের সুস্থতা** মনঃসংযোগের অন্যতম কারণ; অতএব ইহাও স্মৃতির সহায়ক। সেইজন্য যখন আবেগের সুস্থিতির অভাব ঘটে বা অন্য কোন কারণে মানসিক অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য দেখা যায় বা যখন দেহ অসুস্থ থাকে, তখন যে বিষয় প্রত্যক্ষ করা যায় বা যে সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়, তাহা মনের উপর বিশেষ রেখাপাত করে না এবং উহার স্মৃতিও দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

ইহা ছাড়া, কতকগুলি ব্যাপারে—যেমন, আবৃত্তি (rote learning)-এর ক্ষেত্রে—প্রৌঢ় ও বার্ধক্য অবস্থা অপেক্ষা তারুণ্য ও শৈশবাবস্থা অধিকতর অনুকূল।

শিক্ষার ক্ষেত্রে এই বিষয়ে যে সকল গবেষণা করা হইয়াছে তাহার ফলাফল নিম্নরূপ :

(ক) যে সকল ব্যক্তির **বুদ্ধ্যঙ্ক (I. Q.) অপেক্ষাকৃত অধিক,** তাহারা দ্রুত অধিকতর বিষয় আয়ত্ত করিতে পারে এবং মনে রাখিতে পারে।

(খ) যাহারা **দ্রুত অধীত বিষয় আয়ত্ত করে** বা শিক্ষা করে, তাহাদের ধারণা বা সংরক্ষণের ক্ষমতা অধিক। যাহারা মন্থর গতিতে শিক্ষা করে (অর্থাৎ যাহারা slow learner), তাহাদের ধারণাশক্তি অধিক নহে।

(গ) যেগুলি **অর্থবোধক** (meaningful), সেগুলি অর্থহীন শব্দ অপেক্ষা দ্রুত আয়ত্ত করা যায় এবং বহুদিন মনে রাখা যায়।

(ঘ) যেখানে অধীতব্য বিষয়বস্তু **অধিকতর ব্যাপক হয়,** সেখানে সংরক্ষণ দীর্ঘস্থায়ী হয়। ব্যাপকতর বিষয়বস্তু আয়ত্ত করিবার জন্য যে শক্তি ব্যয়িত হয়, সংরক্ষণের স্থায়িত্ব বৃদ্ধির দ্বারা তাহার যেন ক্ষতিপূরণ হইয়া যায়।

(ঙ) যেখানে শিক্ষিতব্য বিষয়বস্তু **তৃপ্তিদায়ক** (pleasant), তাহা সহজেই শিক্ষা করা যায় এবং বহুদিন মনে রাখা যায়।[১৬]

(চ) কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বহুদিন মনে রাখিতে হইবে এইরূপ **সঙ্কল্প বা মানসিক প্রস্তুতি** (set বা preparation) লইয়া যখন কেহ কোন কিছু শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে, তখন সে উহা বহুদিন মনে রাখিতে পারে।

(ছ) তাহা ছাড়া, **কিছু সময়ের ব্যবধান অন্তর** যখন কেহ কোন বিষয় **পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি** করে বা শিক্ষা করিবার চেষ্টা করে (যাহাকে বলা হয়, 'spaced repetition') তখন সে বহুদিন উহা মনে রাখিতে পারে।

৭। মনে করা, পুনর্জনন বা পুনরুজ্জীবন (Problem of Revival, Recall or Reproduction):

স্মৃতির সার্থকতা সংরক্ষিত বিষয়বস্তুকে পুনরুজ্জীবিত করার মধ্যে। যেখানে মনের বিষয় মনেই থাকিয়া যায়, সেখানে তাহা কার্যক্ষেত্রে উপকারী হয় না।

১৬ কেবল পড়াশুনার ক্ষেত্রে নয়, সকল অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেই ইহা দেখা যায়। একবার এক অধ্যাপক খ্রীষ্টমাসের ছুটির পরই ছাত্রদের বলেন যে, ছুটির সময় তাহারা যে সকল বিষয়ে আনন্দ পাইয়াছিল এবং যে সকল বিষয়ে তাহারা দুঃখ পাইয়াছিল সেগুলি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে লিপিবদ্ধ করিতে। অধ্যাপক তাহাদের বিবৃতিগুলি রাখিয়া দিলেন। ছয় সপ্তাহ পরে হঠাৎ তাহাদের ঐ একই বিষয় আবার লিপিবদ্ধ করিয়া দিতে বলিলেন। দুইটি বিবৃতি তুলনা করিয়া দেখা গেল যে, প্রথম বিবৃতিতে তাহারা যে সকল ঘটনা অতৃপ্তিকর বা দুঃখদায়ক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিল, সেগুলির শতকরা ৪০ ভাগ তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে।

এই পুনরুজ্জীবন কি ভাবে সম্ভব হয়? ইহা সম্ভব হয় অভিভাবন (suggestion)-এর ফলে। কিন্তু কেন এক বিষয় অপর বিষয় মনে করাইয়া দেয়? ইহার উত্তরে সাধারণতঃ বলা হয় যে, যে সকল বিষয় কোন-না-কোন ভাবে মনোমধ্যে অনুষঙ্গবদ্ধ (associated) হইয়া আছে, তাহাদের কোন একটি চিন্তা করিলে বা অভিজ্ঞতা করিলে অপরটি মনে পড়িয়া যায়।

অনুষঙ্গ সাধারণতঃ তিন প্রকারের—নৈকট্য-অনুষঙ্গ (contiguous association), সাদৃশ্য-অনুষঙ্গ (association by similarity) এবং বৈপরীত্য-অনুষঙ্গ (association by contrast)। ইহাদের ভিত্তিতে অনুষঙ্গ সম্বন্ধে তিনটি নিয়ম (law) রচিত হইয়াছে—(ক) **নৈকট্য-সম্বন্ধীয় নীতি (Law of Contiguity)**, (খ) **সাদৃশ্য-সম্বন্ধীয় নীতি (Law of Similarity)** এবং (গ) **বৈপরীত্য-সম্বন্ধীয় নীতি (Law of Contrast)**।

(ক) নৈকট্য-সম্বন্ধীয় নীতি—

যেখানে দুই বা ততোধিক বিষয়বস্তুর মধ্যে স্থানগত বা কালগত নৈকট্য থাকে, তাহাদের একটি অপরটিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। যদি দুই বা ততোধিক বস্তু বা ব্যক্তিকে একই স্থানে পূর্বে বহুবার প্রত্যক্ষ করা হইয়া থাকে বা যদি দুইটি ঘটনা সম্বন্ধে একই সময়ে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের একটি প্রত্যক্ষ করিলে বা চিন্তা করিলে বা একটির কথা শুনিলে, অপরটি সম্বন্ধে স্মৃতি জাগরিত হইতে পারে। যেমন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-ভবন ও গোলদীঘি পরস্পরের সন্নিকটে অবস্থিত—ইহাদের দুইটিকে আমরা যুগপৎ বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সুতরাং ইহাদের মধ্যে নৈকট্যের অনুষঙ্গ স্থাপিত হইয়াছে। এইজন্য ইহাদের একটির কথা ভাবিলে অপরটির কথা মনে পড়িবার সম্ভাবনা; অর্থাৎ গোলদীঘির কথা ভাবিলে বিশ্ববিদ্যালয়-ভবন এবং বিশ্ববিদ্যালয়-ভবনের কথা চিন্তা করিলে গোলদীঘির কথা মনে পড়িতে পারে। সেইরূপ একই সময় যদি দুইটি ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে একটির কথা স্মরণ করিলে অপর একটির কথা মনে পড়িতে পারে—যেমন, ১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল;

ইহা স্মরণ করিলে ঐ সালে সিপাহী বিদ্রোহ হইয়াছিল তাহা মনে পড়িয়া যাইতে পারে। আবার, দুইটি ছাত্র ক্লাসে একই সঙ্গে বসে, একই সঙ্গে বেড়াইতে যায়, একই সঙ্গে অধ্যাপকের নিকট আলোচনার জন্য আসে— তাহাদের দুইজনকে একই স্থানে এবং সময়ে অনেকবার দেখার জন্য অধ্যাপক যদি কখনও তাহাদের একজনকে একাকী দেখেন, তাহা হইলে তাঁহার অপর ছাত্রটির কথা মনে পড়িতে পারে।

(খ) সাদৃশ্য-সম্বন্ধীয় নীতি—

যদি দুই বা ততোধিক বিষয়বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য থাকে, তাহা হইলে তাহাদের একটি অপরটিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। যেমন, যদি দুই ভ্রাতার মধ্যে আকৃতিগত সাদৃশ্য যথেষ্ট পরিমাণে থাকে, তাহা হইলে তাহাদের একজনকে দেখিলে অপরকে মনে পড়িয়া যায়। সেইরূপ কবি কালিদাসের প্রতিভা কবি শেক্সপীয়রের প্রতিভাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। কবিরা যে সকল উপমা ব্যবহার করেন, তাহাদের মূলে আছে সাদৃশ্য; যেমন, ব্যক্তি-বিশেষের সৌন্দর্য কবিকে চন্দ্রের সৌন্দর্য স্মরণ করাইয়া দিতে পারে।

(গ) বৈপরীত্য-সম্বন্ধীয় নীতি—

যদি দুইটি বিষয়ের মধ্যে বৈপরীত্য থাকে, তাহা হইলে তাহাদের একটি অপরটিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। যেমন, সুন্দর কুৎসিতকে, দীর্ঘাঙ্গ খর্বাকারকে, স্থূলদেহী ক্ষীণদেহীকে, সাধু অসাধুকে, আলো অন্ধকারকে স্মরণ করাইয়া দিতে পারে।

অনুষঙ্গ-সম্বন্ধীয় এই তিন নীতি পরস্পর হইতে একেবারে পৃথক্ নহে। বৈপরীত্য-সম্বন্ধীয় নীতি সম্পূর্ণ পৃথক্ বা স্বাধীন নীতি নহে। বৈপরীত্যের পশ্চাতেও এক হিসাবে সাদৃশ্য থাকে, কারণ যে দুই গুণ বা বৈশিষ্ট্যের বৈপরীত্যের সম্বন্ধ থাকে, তাহারা একই শ্রেণীর অন্তর্গত দুইটি বিপরীত গুণ; যেমন, দীর্ঘাঙ্গ ও খর্বাকারের যে বৈপরীত্য তাহা দৈর্ঘ্য (height)-সম্বন্ধীয়; আবার সাধু ও অসাধুর যে বৈপরীত্য তাহা নৈতিক গুণ সম্বন্ধীয়—এইজন্য দীর্ঘাঙ্গ ও অসাধু এই দুই-এর মধ্যে বৈপরীত্যের কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না। সুতরাং যেহেতু বৈপরীত্য সাদৃশ্যেরই অন্তর্ভুক্ত সেইজন্য বৈপরীত্য-সম্বন্ধীয় নীতি পৃথক্ নীতি নহে।

আবার কেহ কেহ নৈকট্য-সম্বন্ধীয় নীতিকে সাদৃশ্য-সম্বন্ধীয় নীতিতে রূপান্তরিত করেন। আবার অপর এক দল সাদৃশ্য-সম্বন্ধীয় নীতিকে নৈকট্য-সম্বন্ধীয় নীতিতে রূপান্তরিত করেন।

সুতরাং এই তিন নীতির কোন্‌টি প্রধান সে আলোচনার মীমাংসা নিরর্থক। হ্যামিল্‌টন্‌ (Hamilton) এই তিনটি নীতিকে আর একটি নীতির অন্তর্গত করেন—তিনি তাঁহার নূতন নীতির নাম দেন 'সমগ্রাকরণ সম্বন্ধীয় নীতি' (Law of Redintegration)। এই নীতি হইল: "যদি একটি সমগ্র শ্রেণীর একটি অংশকে মনে পড়ে, তাহা হইলে উহা সমগ্র শ্রেণীকে মনে পড়াইয়া দিতে পারে।"[১৭] যেমন, কলিকাতার গোলদীঘি, বিশ্ব-বিদ্যালয়-ভবন ইত্যাদি মিশিয়া একটি সমগ্র স্থান—ঐ সমগ্র স্থানের অন্তর্ভুক্ত একটি স্থানকে (যথা, গোলদীঘি) মনে পড়িলে উহা সমগ্র স্থানকে মনে পড়াইয়া দেয় এবং সেই কারণে ঐ সমগ্র স্থানের আর একটি অংশ (যথা, বিশ্ববিদ্যালয়-ভবন) মনে পড়িতে পারে। এইভাবে নৈকট্য-সম্বন্ধীয় নীতি হ্যামিল্‌টনের নীতিতে রূপান্তরিত করা যায়। কলিকাতার অক্টারলোনি মনুমেণ্ট দিল্লীর কুতব মিনারকে মনে পড়াইয়া দিতে পারে—কারণ এই দুইটিই দীর্ঘ স্তম্ভ-শ্রেণীভুক্ত; সুতরাং ইহাদের একটিকে মনে পড়িলে সমগ্র স্তম্ভ-শ্রেণীটিই মনে পড়ে এবং ইহার ফলে অপরটি মনে পড়িয়া যায়। এই ভাবে আবার সাদৃশ্য-সম্বন্ধীয় নীতিকে হ্যামিল্‌টনের নীতিতে রূপান্তরিত করা যায়।

অভিসারী ও অপসারী অভিভাবন:

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, অনুষঙ্গবদ্ধ বিষয়গুলির একটি অপরটিকে মনে করাইয়া দেয়, কারণ অনুষঙ্গবদ্ধ বিষয়বস্তুগুলির মধ্যে অভিভাবনশক্তি (suggestive force) আছে।

অভিভাবন দুই প্রকারের হইতে পারে—অভিসারী অভিভাবন (convergent suggestion) এবং অপসারী অভিভাবন (divergent suggestion)। অভিসারী অভিভাবনের ক্ষেত্রে বিবিধ ধারণা (ideas) একই বিষয়বস্তুর উপর কেন্দ্রীভূত হয়। যেমন, 'ক', 'খ', 'গ', 'ঘ', 'ঙ', এই পাঁচটি ধারণা 'ব' নামক একই বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারে;

১৭ তুলনীয়: "Part being given, it tends to revive the whole."

সুতরাং ক, খ, গ, ঘ, ঙ প্রতিটি হইতেই আমরা ‘ব’-এর ধারণা বা চিন্তায় উপনীত হইতে পারি। যেমন, হয়ত' আমার কলম হারাইয়া গিয়াছে, উহা কোথায় রাখিয়া দিয়াছি তাহা মনে করিতে পারিতেছি না। আমি একবার জামার পকেট, একবার টেবিলের ড্রয়ার, একবার যে বন্ধুকে ধার দিয়াছিলাম তাহার কথা ইত্যাদি চিন্তা করিতে করিতে কোথায় কলমটি রাখিয়া দিয়াছি তাহা হয়ত' মনে করিতে পারিলাম। এইভাবে বিবিধ ধারণা কলমটির চিন্তার উপর কেন্দ্রীকরণকে অভিসারী অভিভাবন বলা যায়।

অপরপক্ষে, যদি একটি বিষয়বস্তুর চিন্তা হইতে আমরা বিবিধ ধারণায় চলিয়া যাই, তাহা হইলে উহাকে অপসারী অভিভাবন বলে। যেমন, ‘ব’ নামক বস্তুর চিন্তা হইতে যদি আমরা, ক, খ, গ, ঘ, ঙ ইত্যাদি বিবিধ ধারণায় উপনীত হই, তাহা হইলে উহা হইবে অপসারী অভিভাবন। যেমন, ইংলণ্ড-এর কথা চিন্তা করিতে করিতে শৈত্য, ইংরাজী ভাষা, বাকিংহাম রাজপ্রাসাদ, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি বিবিধ বিষয় মনে পড়িতে পারে। এইভাবে ‘এক’ হইতে ‘বহু’-তে গমনকে অপসারী অভিভাবন বলা যায়।

অনুষঙ্গের সহায়ক অন্যান্য উপাদান ঃ

প্রাচীনপন্থী মনোবিদ্‌গণ অনুষঙ্গবাদ (Associationism)-এর প্রভাবে বিশ্বাস করিতেন যে, বিভিন্ন মানসিক অভিজ্ঞতাগুলি পরস্পর হইতে পৃথক্‌ এবং অনুষঙ্গের প্রভাবে উহারা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হয়। আধুনিক মনোবিদ্যা এই দৃষ্টিভঙ্গী পরিত্যাগ করিয়াছে। সাধারণতঃ আধুনিক মনোবিদ্‌গণ মানসিক অভিজ্ঞতাগুলিকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন স্থিতিশীল অবস্থা বলিয়া মনে করেন না—বাহ্যপরিবেশের সহিত মনের প্রতিক্রিয়ার ফলে বিবিধ অভিজ্ঞতার উৎপত্তি। এইগুলির প্রত্যেকেরই একটি সামগ্রিক রূপ আছে যাহাকে কেবলমাত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে বুঝা যায় না।

প্রাচীন অনুষঙ্গবাদীরা মনে করিতেন যে, যে-কোন দুইটি বিষয়ের একই সঙ্গে কয়েকবার অভিজ্ঞতা ঘটিলে উহাদের মধ্যে অনুষঙ্গের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ঠিক নহে। **যে বিষয়গুলি অনুষঙ্গবদ্ধ হয়, তাহাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকার জন্যই তাহারা সহজে**

অনুষঙ্গবদ্ধ হইতে পারে ; সুতরাং দুই বা ততোধিক বিষয়ের অনুষঙ্গ কেবলমাত্র অভিজ্ঞতার সংখ্যার উপরই নির্ভর করে না, উহাদের নিজস্ব গুণাগুণের উপর নির্ভর করে। রসায়নশাস্ত্রে যেমন দেখা যায় যে, যে-কোন মৌলিক উপাদান যে-কোন মৌলিক উপাদানের সহিত সংযুক্ত হইয়া কোন যৌগিক দ্রব্য গঠন করে না, সেইরূপ মনোজগতেও যে-কোন বিষয়বস্তুর অভিজ্ঞতা যে-কোন অন্য বিষয়বস্তুর অভিজ্ঞতার সহিত সংযুক্ত হয় না। অভিজ্ঞতার প্রতি বিষয়বস্তুরই নিজস্ব একটি গঠন (organization) থাকে এবং দুইটি বিষয়বস্তুর গঠন-বৈচিত্র্য পরস্পরের অনুকূল হইলে উহারা সহজেই অনুষঙ্গবদ্ধ হইতে পারে। সুতরাং অনুষঙ্গ নিজেই হইল বিশেষ প্রকার সংগঠনের ফল।[১৮]

বিষয়বস্তুসমূহের যে সংগঠন থাকে তাহা সকল সময়ই বস্তুগত নহে, তাহা অনেকাংশে অভিজ্ঞতাকারীর মনের দ্বারা আরোপিত হয়। (পৃঃ ৬১৮-১৯)। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, অভিজ্ঞতাকারীর মানসিক অবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গী—যথা, আবেগ, প্রতিন্যাস (attitude) ইত্যাদি—দ্বারাও অনুষঙ্গ প্রভাবিত হয়। তাহা ছাড়া, পাঠ-শিক্ষণের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যেখানে বিষয়বস্তুগুলির মধ্যে সুসংবদ্ধ অর্থ (meaning) থাকে, সেগুলির মধ্যে সহজেই অনুষঙ্গ স্থাপিত হয়।

কেবল যে অভিজ্ঞতাকালীন অনুষঙ্গের উপরই বিবিধ মানসিক অবস্থা ও প্রতিন্যাস (mental conditions and attitudes) প্রভাব বিস্তার

১৮ গেস্টাল্টবাদীরা এই অবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রচলিত অনুষঙ্গবাদের সমালোচনা করিয়া কোয়েলার (Köhler) বলেন: "A and B happen to occur together and, whatever the nature of A and B may be, the bond is produced between them! I do not know a single law or rule in physics or chemistry which might be compared in this respect with the concept of association...The assumption of discrete bits of process, altogether indifferent to each other underlies the classical concept of association, for, without even mentioning the actual properties of A and B in their relations to each other, it states that *any* A and *any* B may acquire that neutral bond, if it is supposed only that they occur together a number of times." "Our conclusion is that association depends upon organization because association is just an after-effect of an organized process." (***Gestalt Psychology***, pp. 280-81, 299).

করে, তাহা নহে ; **পুনরুজ্জীবন বা মনে করার সময়ও মানসিক অবস্থা এবং প্রতিন্যাস প্রভাব বিস্তার করে।** অর্থাৎ অভিভাবনজনিত শক্তি (suggestive force) কোন যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্রিয়া করে না। সুতরাং অতীতকে কিভাবে, কত দূর এবং কখন আমরা মনে করিতে পারিব, তাহা মনে করিবার চেষ্টাকালীন মানসিক অবস্থা ও প্রতিন্যাস দ্বারা প্রভাবিত হয়।[১৯] বার্টলেট্, হার্টমান্, ক্লার্ক ইত্যাদি যে সকল পরীক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাতে এই সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়।[২০]

আধুনিক মনোবিদ্গণ অনুষঙ্গবাদের যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহার অর্থ ইহা নহে যে, মানসিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে কখনই কোন অনুষঙ্গ হইতে পারে না। মানসিক অনুষঙ্গ যে ঘটিতে পারে বা ঘটে তাহা অস্বীকার করা যায় না ; তবে ইহা বস্তু-বিশেষের বৈশিষ্ট্য ও সংগঠন এবং অভিজ্ঞতাকারীর মানসিক প্রতিন্যাস, আবেগানুভূতি, সহজবৃত্তি, শিক্ষণ ইত্যাদির উপরও অনেকাংশে নির্ভর করে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, আধুনিক মনোবিদ্যা অনুষঙ্গকে স্মৃতির মূল কারণ না বলিয়া উহার আবার যে সকল সম্ভাব্য কারণ থাকিতে পারে, তাহার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছে।[২১]

---

১৯ তুলনীয় : "It we are to treat the problems of association as functional, we have to use attitudes, orientation, appetitive and instinctive tendencies and interests as our active, organising factors." (Bartlett, *Remembering*, p. 307).

২০ হার্টমান্, এড্ওয়ার্ডস্ ইত্যাদি একটি পরীক্ষণের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেন যে, পরীক্ষণ-পাত্রের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী স্মৃতির বিষয়বস্তুকে প্রভাবিত করিয়াছে। সেইরূপ ক্লার্ক আর একটি পরীক্ষণ করেন : তিনি একদল ছাত্রছাত্রীকে একটি কাহিনী বলেন যাহার বিষয়বস্তু ছিল নারী ও পুরুষের মধ্যে সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভের জন্য পারস্পরিক প্রতিযোগিতা ; পরে যখন ঐ কাহিনীটি স্মরণ করিতে বলা হয়, তখন অধিকাংশ ছাত্রই পুরুষের প্রাধান্য এবং ছাত্রীরা নারীর প্রাধান্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া কাহিনীটি পুনর্বার বলিল।

২১ বার্টলেট্ (Bartlett)-এর ভাষায়: "In various senses associationism is likely to remain, though its outlook is foreign to the demands of modern psychological science. It tells us something about the characteristics of associated details, when they are associated, but it explains nothing whatever of the activity of conditions by which they are brought about together." (*op. cit.*, p. 308).

অনুষঙ্গবাদ সম্বন্ধে সাম্প্রতিক কালের অভিমত আলোচনার জন্য Murphy, *Historical Introduction to Modern Psychology*, Ch. 19 দ্রষ্টব্য।

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠিতে পারে: যদি ব্যক্তিগত আবেগ, প্রতিন্যাস ইত্যাদি অনুষঙ্গের কারণরূপে কার্য করে, তাহা হইলে স্মৃতিকে অতীত অভিজ্ঞতার যথাযথ প্রতিলিপি (exact copy) বলা কি ঠিক হইবে? উপরের আলোচনার আলোকে আমরা বলিতে পারি যে, স্মৃতিপ্রতিরূপ হিসাবে আমরা যাহা পুনরুজ্জীবিত করি, তাহা অতীত অভিজ্ঞতার যথাযথ প্রতিলিপি নহে—তবে উহার সহিত অতীত অভিজ্ঞতার যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকে। **স্মৃতিপ্রতিরূপভাবে আমাদের মনে যাহা জাগ্রত হয়, তাহার মূলে আছে অতীত অভিজ্ঞতা; কিন্তু সংরক্ষণকালে এবং পুনরুজ্জীবনকালে উহা ব্যক্তি-বিশেষের প্রতিন্যাস, আবেগ, প্রয়োজন, প্রেরণা, ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং ফলে পুরাতনের ভিত্তিতে নূতনভাবে সংগঠিত হইয় স্মৃতিপ্রতিরূপগুলি জাগরিত হয়।**

৮। স্মৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি পরীক্ষণ (Some experiments on Memory):

(ক) এবিংহাউস্-কৃত পরীক্ষণের ফলাফল:

এবিংহাউস্ স্মৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি পরীক্ষা করেন। তিনি পরীক্ষার বিষয়বস্তুরূপে কতকগুলি অর্থহীন শব্দসমষ্টি গ্রহণ করেন (যথা, lut, vol, nuz, roz)। যেহেতু অর্থপূর্ণ পদ গ্রহণ করিলে পদের অর্থের সাহায্যে পদটিকে স্মরণ করা সম্ভব হইতে পারে, সেইজন্য তিনি অর্থহীন পদ গ্রহণ করেন।

এই পরীক্ষণের ক্ষেত্রে তিনি নিজেই পরীক্ষক ও পরীক্ষণ-পাত্র উভয় ভূমিকাই গ্রহণ করেন। তাঁহার পরীক্ষণের ফলাফল নিম্নরূপ:

(১) তিনি দেখেন যে, শব্দ-সমষ্টিতে শব্দ-সংখ্যা যত কম থাকে, তাহাকে আবৃত্তি করার সংখ্যাও তত কম প্রয়োজন হয়, আবার উহাকে আয়ত্ত করিতে সময়ও কম লাগে। আবার শব্দ-সংখ্যা বাড়িলে উহাদের আয়ত্ত করিতে আবৃত্তি-সংখ্যাও বেশী লাগে, আবার সময়ও বেশী লাগে। বিশুদ্ধরূপে সমগ্র শব্দ-সমষ্টিকে পুনরাবৃত্তি করাকেই তিনি আয়ত্তীকরণের আদর্শরূপে গ্রহণ করেন।

এবিংহাউসের পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলের বৈশিষ্ট্য হইল যে, যে অনুপাতে অল্পসংখ্যক শব্দসম্বলিত সমষ্টিকে আবৃত্তি করিতে হয় এবং তাহার জন্য যে সময় লাগে, তাহার তুলনায় অনেক বেশীবার আবৃত্তি এবং অধিক সময়ের প্রয়োজন হয় অধিক সংখ্যক শব্দসম্বলিত সমষ্টিকে আয়ত্তীকরণের জন্য। যেমন, ৭ শব্দ সংখ্যক সমষ্টিকে আয়ত্ত করিবার জন্য এবিংহাউসের পক্ষে আবৃত্তি করার প্রয়োজন হয় ১ বার এবং সময় লাগে ৩ সেকেণ্ড (অর্থাৎ প্রতি শব্দের জন্য ০'৪ সেকেণ্ড); কিন্তু ৩৬ শব্দ সংখ্যক সমষ্টিকে আয়ত্ত করিবার জন্য তাঁহাকে আবৃত্তি করিতে হয় ৫৫ বার এবং সময় লাগে ৭৯২ সেকেণ্ড (অর্থাৎ প্রতি শব্দে গড়ে ২২ সেকেণ্ড)। অর্থাৎ শব্দসমষ্টি দীর্ঘতর হইলে বিভিন্ন শব্দের মধ্যে 'বাধ' এর সৃষ্টি হয় (ইহাকে বলা হয় inter-syllablic inhibition) এবং উহার ফলে অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়।

আবৃত্তির সংখ্যা ও সময়-সংক্ষেপ (time-saving)-এর বিষয়ও এবিংহাউস্ অনুসন্ধান করেন। তিনি পরীক্ষণের সাহায্যে দেখেন যে, কোন বিষয়কে প্রথমবার আয়ত্ত করার জন্য যতবার আবৃত্তি এবং যে সময়ের প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা যদি ভুলিয়া যাওয়া যায় তাহা হইলেও তাহাকে আয়ত্ত করিতে পরে অল্পবার আবৃত্তি করিতে হয় এবং সময়ও অল্প লাগে। যেমন, তিনি দেখেন যে, ১২ শব্দসম্বলিত সমষ্টিকে প্রথমবার আয়ত্ত করিতে ১৬'৫ বার আবৃত্তি করিতে হয়; কিন্তু ২৪ ঘণ্টা পরে উহাকে পুনরায় নির্ভুলভাবে আয়ত্ত করিতে মাত্র ১১ বার আবৃত্তি করিতে হয় অর্থাৎ ৫'৫ বার কম আবৃত্তি করিতে হয়। পুনর্বার শিক্ষণের সময় এইভাবে কিছু সময় সংক্ষিপ্ত হইল এবং আবৃত্তির সংখ্যাও কম লাগিল। ইহাকে বলা হয় **সঞ্চয়-পদ্ধতি (saving method)**।

এবিংহাউসের গবেষণার আর একটি বিষয়বস্তু হইল কি ভাবে আমরা ভুলিয়া যাই এবং কি ভাবে নূতন করিয়া শিখিতে হয়। তিনি শিক্ষণ এবং পুনঃশিক্ষণের মধ্যে বিবিধ সাময়িক ব্যবধান রাখিতেন—২০ মিনিট, ১ ঘণ্টা, ৯ ঘণ্টা, ২৪ ঘণ্টা এবং ৩১ দিন। তাঁহার অনুসন্ধানের ফলে তিনি লক্ষ্য করেন যে, প্রথম প্রথম বিস্মরণ যত দ্রুত হয় তাহার পর ক্রমশঃ বিস্মরণের হার কমিয়া যাইতে থাকে। প্রথম আয়ত্তীকরণ বা শিক্ষণের ১ ঘণ্টা পরে আয়ত্তীকৃত শব্দ-সমষ্টির অর্ধেকের উপর নূতন করিয়া শিখিয়া

তবে তিনি বিশুদ্ধভাবে ঐ শব্দ সমষ্টিকে পুনরাবৃত্তি করিতে পারিলেন। ৯ ঘণ্টা পরে তিনি অধীত বিষয়ের ⅔ অংশ পুনর্বার শিখিয়া শুদ্ধভাবে বলিতে পারেন, ৬ দিন বাদে অধীত বিষয়ের ¾ অংশ এবং ১ মাস বাদে প্রায় ⅘ অংশ আবার মুখস্থ করিয়া তবে শুদ্ধভাবে বলিতে পারেন।

এই বিষয়ে এবিংহাউস্ যে পরীক্ষণ পরিচালিত করিয়াছিলেন তাহার ফলাফল নিম্নরূপ[২২] :

প্রথম শিক্ষণ ও পুনঃশিক্ষণের মধ্যে সময়ের ব্যবধান			সংরক্ষণের শতকরা হার		ভুলিয়া যাওয়ার শতকরা হার
২০ মিনিট	...	...	৫৮	...	৪২
১ ঘণ্টা	...	...	৪৪	...	৫৬
৯ ঘণ্টা	...	...	৩৬		
২৪ ঘণ্টা	...	...	৩৪	...	৬৬
২ দিন	...	...	২৮	...	৭২
৬ দিন	...	...	২৫	...	৭৫
৩১ দিন	...	...	২১	...	৭৯

এই তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, কুড়ি মিনিট হইতে ২ দিনের ব্যবধানের ক্ষেত্রে বিস্মরণের হার যে পরিমাণ দ্রুত ঘটিতেছিল, তাহার পর উহা আর তত দ্রুত ঘটিতেছিল না।

(খ) প্রতিন্যাস, আবেগ ইত্যাদির প্রভাব সম্বন্ধে পরীক্ষণ :

এবিংহাউস্ যে সকল পরীক্ষণ করিয়াছিলেন তাহাতে অর্থহীন শব্দ (nonsense syllable) ব্যবহার করা হইত বলিয়া অনেকে আপত্তি করেন। ইঁহাদের অভিযোগ হইল যে, দৈনন্দিন জীবনের সহিত সম্পর্কবিহীন কতকগুলি অর্থহীন শব্দকে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে আবৃত্তি (rote-memory) হইতে স্মৃতির পূর্ণ বৈশিষ্ট্য বুঝা যায় না। স্মৃতি কোন নিষ্ক্রিয় পদ্ধতি নহে—কতকগুলি পৃথক্ পৃথক্ উপাদানের অনুষঙ্গ হইতে স্মৃতির স্বরূপ বুঝা যায় না। (পৃঃ৬১৭-১৮)।

---

২২ এই পরিস্থিতিকে গ্রাফের মাধ্যমে প্রকাশ করিলে যে রেখা অঙ্কিত হয়, তাহাকে curve of retention বলে এবং ইহার মধ্যে logarithmic সম্বন্ধ পাওয়া যায়।

আধুনিক গবেষণার ফলে দেখা যায় যে, কেবল পুরাতন অনুষঙ্গের সাহায্যেই পুরাতন স্মৃতির পুনরুজ্জীবন বুঝান যায় না—কারণ অভিভাবন, প্রতিন্যাস, ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধা, আবেগ ইত্যাদি দ্বারা উহা প্রভাবিত হয় (পৃঃ ৬৩০)। এই কারণে 'মনে করা' বা স্মৃতির 'পুনরুজ্জীবন'-এর অনিশ্চয়তা দেখা দেয়।

কতকগুলি রেখাঙ্কন (linear drawing)-এর সাহায্যে ভুল্‌ফ (Wulf) দেখান যে, আমরা অতীতে যাহা দেখিয়াছি তাহা যখন স্মরণ করিতে চেষ্টা করি, তখন স্মৃতিপ্রতিরূপের স্বতঃই কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। এই পরিবর্তন প্রধানতঃ তিন প্রকারের হয়: **বর্জন ও সমীকরণ (rejection & levelling), প্রধানীকরণ (sharpening)** এবং **শ্রেণীকরণ (assimilation)**। আমরা যে বস্তুকে স্মরণ করিতে চেষ্টা করি তাহার কতকগুলি অংশকে বাদ দিয়া আমরা তাহার ভিতর প্রতিসাম্যতা (symmetry) আনিবার চেষ্টা করি, অর্থাৎ উহাকে সুসম আকার দিই। আবার যে অংশ বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহার উপর আমরা প্রাধান্য অর্পণ করি। সেইরূপ দৃষ্ট বস্তুর সহিত সচরাচর দৃষ্ট অর্থাৎ পরিচিত কোন বস্তুর সহিত যদি সাদৃশ্য থাকে, তাহা হইলে উহাকে স্মরণ করিবার কালে আমরা উহাকে পরিচিত বস্তুর সহিত সদৃশ বলিয়া বর্ণনা করি।

নিম্নাঙ্কিত ছবিতে 'উ' হইল উদ্দীপক। কয়েকজন ব্যক্তিকে ইহা দেখাইয়া স্মৃতি হইতে উহাকে আঁকিতে বলা হইল। পুনরায় অঙ্কিত ছবিগুলি (১, ২, ৩, ৪ চিহ্নিত) দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, কোন ক্ষেত্রে কিছু বর্জিত কোন ক্ষেত্রে কিছু সমীকৃত, আবার কোন ক্ষেত্রে কিছু প্রধানীকৃত হইয়াছে।
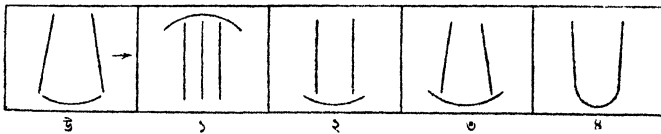
স্মৃতিপ্রতিরূপের পরিবর্তন।

[পরীক্ষণটি Gibson কর্তৃক পরিকল্পিত ও পরিচালিত। *Jr. of Exp. Psy.*, Vol. 12 দ্রষ্টব্য।]

ভুল্‌ফের পরে যে সকল গবেষক পরীক্ষা চালান তাঁহারা মনে করেন

যে, কেবল সময়ের গতিতেই যে ধীরে ধীরে বিকৃতি বা পরিবর্তন ঘটে, তাহা না হইতে পারে; হয়ত' ছবিগুলিকে প্রথম দর্শনের সময়ই মনে মনে কোন না কোন পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত আর এক প্রকার পরীক্ষণের ফলেও দেখা যায় প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তু কত দ্রুত পরিবর্তিত হয়। একটি ছবি একজন পরীক্ষণ-পাত্র দেখিয়া উহা স্মৃতি হইতে আঁকিল, দ্বিতীয় পরীক্ষণ-পাত্র প্রথম ব্যক্তির অঙ্কিত ছবি একবার দেখিয়া লইয়া স্মৃতি হইতে আঁকিল, তৃতীয় ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির ছবি দেখিয়া স্মৃতি হইতে আঁকিল—এইভাবে দশম ব্যক্তি যে ছবি আঁকিল তাহার সহিত মূল ছবির প্রচুর প্রভেদ হইয়া গেল।[২৩]

এইজন্য আধুনিক অনেক লেখক স্মৃতির সংজ্ঞা দিবার সময় বলেন যে, উহা পুরাতন অভিজ্ঞতার যথাযথ প্রতিলিপি নহে, তবে উহা পুরাতন অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করিয়া নূতন সংগঠন।[২৪] (পৃঃ ৬১৮)।

(গ) স্মৃতি-প্রসর (memory span) সম্বন্ধে পরীক্ষণ:

পরীক্ষণ-পাত্র উদ্দীপক একবার প্রত্যক্ষ করিবার অব্যবহিত পরেই উহা কতদূর স্মরণ করিতে পারে, সে সম্বন্ধে বিবিধ পরীক্ষণ করা হইয়া থাকে। ক্ষণদৃক্‌যন্ত্রে অর্থহীন শব্দসমষ্টি অথবা কতকগুলি সংখ্যা উদ্দীপক হিসাবে প্রদান করা হয়; ঐ উদ্দীপক সরাইয়া লইয়া দেখা হয় পরীক্ষণ-পাত্র উদ্দীপককে কতদূর স্মরণ করিতে পারিতেছে (পৃঃ ৪৭০)। ব্যক্তি-বিশেষের স্মৃতি-প্রসর নির্ধারণ করিবার জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থা এইরূপ: যদি প্রথম শব্দ-সমষ্টি বা সংখ্যাসমষ্টি সে নির্ভুলভাবে বলিতে পারে, তাহা হইলে উত্তরোত্তর সংখ্যা বা শব্দ বাড়ান হয় এবং যে সংখ্যা পর্যন্ত সে নির্ভুলভাবে স্মরণ করিতে

২৩ আমরা দৈনন্দিন জীবনে দেখিতে পাই যে, একই ঘটনার বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের মধ্যে কত প্রভেদ রহিয়াছে। আকস্মিক দুর্ঘটনা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সময় লোকের মুখে মুখে যখন তথাকথিত "সত্য কাহিনী" প্রচারিত হইতে থাকে, তখন বর্জন, সমীকরণ, প্রধানীকরণ ইত্যাদি প্রক্রিয়ার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

২৪ তুলনীয়: "Remembering is not the re-excitation of innumerable fixed, lifeless and fragmentary traces. It is an imaginative reconstruction or construction, built out of the relation of our attitude towards a whole active mass of organised past reactions or experience..." (Bartlett, *op. cit.*, p. 213).

পারে, তাহাই হইল তাহার স্মৃতি-প্রসর। অপরপক্ষে প্রথম উদ্দীপকের ক্ষেত্রে যদি ব্যক্তি-বিশেষ নির্ভুলভাবে স্মরণ করিতে পারে না, তখন উদ্দীপক হিসাবে প্রদত্ত শব্দ বা সংখ্যাসমষ্টি ধীরে ধীরে কমাইয়া দেখা হয়, কোন্ পর্যায় পর্যন্ত সে নির্ভুলভাবে স্মরণ করিতেছে।

পরীক্ষণের ফলে দেখা গিয়াছে যে, সংখ্যা বা শব্দসমষ্টির ক্ষেত্রে শৈশবে স্মৃতি-প্রসর সাধারণতঃ চারিটি শব্দ বা সংখ্যা পর্যন্ত হয়; কিন্তু ক্রমশঃ বয়সের সহিত উহা বৃদ্ধি পাইয়া সাধারণতঃ আট পর্যন্ত উঠিতে পারে। অবশ্য ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়।

আবার যদি পরীক্ষণ-পাত্রের মনকে অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত (over loaded) করা হয়, তাহা হইলে তাহার স্মৃতি-প্রসর সঙ্কুচিত হইতে পারে। যেমন, যাহার স্মৃতি-প্রসর ৮, তাহাকে হঠাৎ ১৪ সংখ্যার সমষ্টি প্রদান করিলে সে মাত্র ৫ বা ৬টি সংখ্যা নির্ভুলভাবে স্মরণ করিতে পারে; অর্থাৎ তাহার স্মৃতি-প্রসর ৮ হইতে 'সঙ্কুচিত' হইয়া গেল।

[প্রতীপবাধ সম্বন্ধে পরীক্ষণের আলোচনার জন্য ১০(৩) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।]

৯। স্মৃতি-প্রাখর্যের লক্ষণ (Marks of Good Memory):

স্মৃতি-প্রাখর্য বলিতে স্মৃতিরতীক্ষ্ণতা বুঝায়। আমরা ৫ম অনুচ্ছেদে দেখিয়াছি যে, স্মৃতির জন্য প্রথম প্রয়োজন কোন কিছু সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা, সঞ্চয় করিয়া উহাকে সংরক্ষণ করা এবং সংরক্ষিত বিষয়বস্তুকে পুনরুজ্জীবিত করা। ইহার আলোকে আমরা স্মৃতি-প্রাখর্যের লক্ষণগুলি নিরূপণ করিতে পারি।

(ক) স্বল্পায়াসে বিষয়বস্তু আয়ত্তীকরণ—

যাহার স্মৃতি প্রখর সে স্বল্পায়াসে বিষয়বস্তু আয়ত্ত করিতে পারে। যদি এক ব্যক্তি কোন বিষয়বস্তু দুইবার চেষ্টা করিয়াই শিখিতে পারে এবং আর এক ব্যক্তি যদি দশবার চেষ্টা করিয়া উহা আয়ত্ত করিতে পারে, তাহা হইলে প্রথমোক্ত ব্যক্তির স্মৃতি-প্রাখর্যের এই প্রথম লক্ষণটি আছে বলা যায়।

(খ) বিষয়বস্তুর দীর্ঘস্থায়িত্ব—

কেবলমাত্র শীঘ্র বিষয়বস্তু আয়ত্ত করাই যথেষ্ট নহে; উহাকে দীর্ঘদিন মনে রাখা প্রয়োজন। সুতরাং যে ব্যক্তি অধীত বিষয়বস্তু বহুদিন মনে

রাখিতে পারে তাহার স্মৃতি প্রখর; কিন্তু যে ব্যক্তি সদ্য-শিক্ষিত বিষয় ভুলিয়া যায়, তাহার স্মৃতি দুর্বল।

(গ) **দ্রুত শুদ্ধভাবে এবং প্রয়োজন অনুসারে পুনর্জনন—**

আবার অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয় সংরক্ষণ করিয়া রাখাই যথেষ্ট নহে—উহাকে প্রয়োজন অনুসারে দ্রুত ও শুদ্ধভাবে পুনরুজ্জীবিত করা স্মৃতির আর একটি লক্ষণ। যেমন, পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রের উত্তর দানকালে এক ছাত্রের বিষয়বস্তু মনে পড়িল না; কিন্তু উত্তরপত্র দিয়া দিবার পর সব মনে পড়িয়া গেল। যেহেতু কাজের সময় তাহার মনে পড়িল না, সেই হেতু তাহার স্মৃতিকে দুর্বল বলিতে হইবে।

১০। বিস্মৃতি (Forgetting):

স্মৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে স্বতঃই প্রশ্ন উঠে: আমরা কেন ভুলিয়া যাই? ভুলিয়া যাওয়া বা বিস্মৃতির অব্যবহিত পূর্ববর্তী কারণ স্বরূপ বলা যায় যে, স্মৃতি-প্রতিরূপগুলি সংরক্ষিত হয় নাই এবং সংরক্ষিত হইলেও যে যে কারণে উহারা সংগঠিত ও অনুষঙ্গবদ্ধ হইয়া পুনরুজ্জীবিত হয়, সেই সেই কারণগুলির অভাব ঘটিয়াছে। এরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি না; কারণ এখানে আবার আমাদের মনে প্রশ্ন জাগিবে: কেন স্মৃতিপ্রতিরূপ সংরক্ষণে ও সংগঠনে ব্যাঘাত ঘটে?

আমরা ৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদে (পৃঃ ৬২১) লক্ষ্য করিয়াছি যে, বিশেষ বিশেষ প্রকারের উদ্দীপক আমাদের মনের উপর রেখাপাত করে এবং ঐগুলি অধিক দিন স্থায়ী হয়। সুতরাং যে যে কারণে উদ্দীপকগুলি আমাদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, সেইগুলির অভাব ঘটিলে বিস্মৃতি দেখা দিবে। সুতরাং সাধারণভাবে বলিতে পারা যায় যে, যে উদ্দীপকের পুনরাবৃত্তি ঘটে নাই, যে উদ্দীপক তীব্রতা ও ঔজ্জ্বল্য বিশিষ্ট নহে, যে উদ্দীপক আমাদের আবেগ, প্রতিন্যাস ও স্বাভাবিক অনুরাগের প্রতিকূল (বা উহাদের প্রতি উদাসীন), যে উদ্দীপকের মধ্যে কোন নূতনত্ব, বৈচিত্র্য ইত্যাদি নাই, যে উদ্দীপক আমরা মানসিক ও দৈহিক সুস্থতাকালে পর্যবেক্ষণ করি নাই—মোট কথা, যাহা আমাদের মনোযোগ বিশেষ আকর্ষণ করিতে পারে নাই, তাহার স্মৃতি মনোমধ্যে সংরক্ষিত থাকে না এবং তাহা আমরা সহজেই ভুলিয়া যাই।

উদ্দীপকের এই সকল বিশেষ বিশেষ সম্ভাব্য 'ক্রটি' ব্যতীত কতকগুলি সাধারণ কারণেও স্মৃতিভ্রংশতা ঘটিতে পারে। এই সকল কারণের ভিত্তিতে এক এক দল লেখক এক একটি মতবাদ রচনা করিয়াছেন। এই সকল মতবাদ সম্পূর্ণরূপে পরস্পর-বিরোধী নহে এবং ইহাদের সকলের মধ্যেই আংশিক সত্য আছে।

(১) অব্যবহারজনিত ক্ষীণতা—

যদি কোন স্মৃতিরূপকে বার বার কাজে লাগান না হয়, যদি তাহাকে মধ্যে মধ্যে জাগরিত করা না যায়, তাহা হইলে ঐ স্মৃতিপ্রতিরূপ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া তিরোহিত হইয়া যায়, অর্থাৎ কালের গতিতে উহা ক্রমশঃ লুপ্ত হয়। আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাতেও দেখিতে পাই যে, আমরা অতীতে যে সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহার খুঁটিনাটিগুলি ক্রমশঃ ভুলিয়া যাই এবং ঐসব সম্বন্ধে একটি স্থূল ধারণা (rough outline) মনের মধ্যে থাকে।

এই মতবাদ সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। মাঝে মাঝে এরূপ দেখা যায় যে, সুদূর অতীতের যে কাহিনী ভুলিয়া গিয়াছি, তাহা হঠাৎ স্মৃতিপথে পূর্ণরূপে জাগরিত হয়। এমন কি বার্ধক্যজনিত ভ্রমরতি (বা ভীমরতি) যাহাদের ঘটিয়াছে, তাহারা অতীত যৌবনের কোন কোন কাহিনী সম্পূর্ণরূপে স্মরণ করিতে পারে। সুতরাং 'অব্যবহার'-এর ফলে স্মৃতিলোপ ঘটে, ইহা সকল ক্ষেত্রে সমর্থনযোগ্য নহে।

(২) মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য স্মৃতির পরিবর্তন বা বিকৃতি—

আমরা স্মৃতিভাবে যাহাকে পুনরুজ্জীবিত করি তাহাতে অতীত অভিজ্ঞতা যথাযথ জাগরিত হয় না। নানা কারণে (যথা, প্রতিন্যাস ইত্যাদির দ্বারা) উহা পরিবর্তিত হয়—উহার কতকাংশ বর্জিত হয়, কতকাংশের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপিত হয় ইত্যাদি (এইগুলি আমরা ৬৩০ এবং ৬৩২-৩৪ পৃষ্ঠায় সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি)। ইহার ফলে অতীত অভিজ্ঞতার কোন কোন অংশ আমরা ভুলিয়া যাই।

এই মতবাদ যে বহুলাংশে সত্য তাহা বিবিধ পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণিত হইয়াছে। তবে ইহা দ্বারা পূর্ণ বিস্মৃতি কেন ঘটে, তাহা বুঝান যায় না। ইহা দ্বারা বিস্মৃতি অপেক্ষা স্মৃতির আংশিক পরিবর্তনের কারণই অধিক নির্দেশ করা হয়।

(৩) 'বাধ' (inhibition)-জনিত বিস্মৃতি—

কোন কিছু শিখিবার পরেই (অর্থাৎ কোনরূপ বিশ্রাম না করিয়া) যদি নূতন কোন কিছু শিখা যায়, তাহা হইলে প্রথমে যাহা শিক্ষা করা হইয়াছিল, তাহা মনে রাখায় বাধ (inhibition)-এর সৃষ্টি হয়। ইহাকে বলা হয় **প্রতীপ বাধ (retroactive inhibition)**। ইহার ফলে স্মৃতিবিলোপ ঘটে। একটি পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রতীপ বাধকে বুঝা যায়। দুই দল পরীক্ষণ-পাত্র নির্বাচন করিতে হইবে যাহারা বিদ্যা, বুদ্ধি, বয়স ইত্যাদিতে পরস্পরের সমকক্ষ (বা equally matched)। প্রথম দলের পরীক্ষণ-পাত্রদের প্রথমে একটি তালিকার বিষয়বস্তু আয়ত্ত করিতে বলিয়া তাহার পর আর একটি তালিকার বিষয়বস্তু আয়ত্ত করিতে বলা হইল ; উহার পর আবার প্রথম তালিকার বিষয়বস্তু স্মরণ করিতে বলা হইল। আর এক দলকে দ্বিতীয় তালিকার বিষয়বস্তু মোটেই শিক্ষা করিতে বলা হইল না—কেবল প্রথম তালিকা আয়ত্ত করিতে বলা হইল এবং তাহার পর বিশ্রাম করিতে বলা হইল। দেখা গেল যে, দ্বিতীয় দল প্রথম দল অপেক্ষা প্রথম তালিকার বিষয়বস্তু ভালভাবেই আয়ত্ত করিয়াছে। সমগ্র পরিস্থিতিটি এইরূপ :

(১) প্রথম দল—

১নং তালিকা শিক্ষণ•••২নং তালিকা শিক্ষণ•••১নং তালিকা পুনরাবৃত্তির চেষ্টা

[দেখা গেল অনেক ক্ষেত্রে বিস্মৃতি ঘটিয়াছে]

(২) দ্বিতীয় দল—

১নং তালিকা শিক্ষণ ••• বিশ্রাম ••• ১নং তালিকার পুনরাবৃত্তির চেষ্টা

[দেখা গেল বিস্মৃতির সংখ্যা নগণ্য]

এখানে এই সিদ্ধান্ত করা হইল যে, ১নং তালিকা শিক্ষণের অব্যবহিত পরে ২নং তালিকা 'শিক্ষণের ফলে ১নং তালিকার স্মৃতি যথেষ্ট ব্যাহত হইয়াছে। দৈনন্দিন জীবনেও দেখা যায় যে, দিনমানে কর্মব্যস্ততার মধ্যে আমরা যাহা শিক্ষা করি তাহার বেশ কিছু অংশ ভুলিয়া যাই ; অতি দ্রুত কার্য হইতে কার্যান্তরে যাওয়ার জন্য এইরূপ ঘটে। কোন কিছু শিক্ষার পর যদি সুনিদ্রা হয়, তাহা হইলে অধীত বিষয়বস্তুকে ভালভাবেই মনে রাখা যায়।

আবার ইহার বিপরীতও হইতে পারে। যেমন, প্রথম দল ১নং তালিকা শিখিয়া ২নং তালিকা শিখিল এবং তাহার পর ২নং তালিকা মনে করিবার চেষ্টা করিল। দ্বিতীয় দল বিশ্রামের পর কেবলমাত্র ২নং তালিকা শিক্ষা করিল এবং তাহার পর উহা স্মরণ করার চেষ্টা করিল। দেখা গেল, দ্বিতীয় দল ২নং তালিকা ভালভাবেই স্মরণ করিতে পারিল। অর্থাৎ পরিস্থিতিটি এইরূপ :

(১) প্রথম দল—

১নং তালিকা শিক্ষণ···২নং তালিকা শিক্ষণ ·· ···· ২নং তালিকা স্মরণের চেষ্টা

[বিস্মৃতির সংখ্যা অধিক]।

(২) দ্বিতীয় দল—

বিশ্রাম ··· ঐ ২নং তালিকা স্মরণ

[বিস্মৃতির সংখ্যা নগণ্য]।

এই প্রকার বাধকে বলে **সম্মুখগামী বাধ** (**proactive inhibition**)।

এই দুই প্রকারের পরীক্ষণের ফলে ইহা দেখা যায় যে, যদি একাধিক বিষয়বস্তু কোন সাময়িক ব্যবধান ব্যতীত শিক্ষা করা যায়, তাহা হইলে একটি অপরটির স্মৃতির পরিপন্থী হয়।[২৫] তবে সেইজন্য বাধকে বিস্মৃতির একমাত্র কারণ বলা যায় না—ইহাকে বিস্মৃতির অন্যতম কারণ বলা যাইতে পারে ; কারণ কোন প্রকার 'বাধ' হয় নাই, অথচ বিস্মৃতি ঘটিয়াছে এইরূপ দৃষ্টান্ত আমরা অনেক পাই।

(৪) প্রেষণা-জনিত বিস্মৃতি—

ফ্রয়েড্ ও তাঁহার অনুগামিগণ মনে করেন যে, যখন কোন বিষয়ে আমাদের বিস্মৃতি ঘটে, তখন বুঝিতে হইবে যে, উহা আমাদের নির্জ্ঞানদ্বারা প্রেষিত। যে বিষয় আমরা ভুল করি, তাহা আমরা কোন কারণে পছন্দ করি না বলিয়া ভুলিয়া যাই। এইজন্য আমরা নাম ভুলিয়া যাই, কথা বলিতে ভুল করি, লিখিতে ভুল করি, কোন্ জিনিষ কোথায় রাখিয়াছি তাহা ভুলিয়া যাই ইত্যাদি (পৃঃ ৩৩৫-৩৬, ৩৮৬-৮৮ দ্রষ্টব্য)।

২৫ সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, অধীত বিষয়বস্তুকে মনোমধ্যে দৃঢ়ীকরণ (consolidation)-এর জন্য কোন কিছু শিক্ষার পর অল্প সময় বিশ্রাম প্রয়োজন। শিশুদের শিক্ষাদানকালে ইহা বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, যদি কয়েকঘণ্টা ধরিয়া বিরামবিহীনভাবে তাহাদের কয়েকটি বিষয় শিখান যায়, তাহা হইলে শিক্ষিতব্য বিষয়গুলি তাহাদের পক্ষে মনে রাখা কষ্টকর হয়।

কিন্তু ফ্রয়েডীয় দৃষ্টিভঙ্গী সকলে গ্রহণ করেন না। সকল ভুলের মূলেই নির্জ্ঞানস্তরের কোন অতৃপ্ত বাসনা থাকে তাহা নাও হইতে পারে, আবার ব্যক্তি-বিশেষ যদি একই প্রকার ভুল বারে বারে করে, তাহা হইলে তাহার পশ্চাতে কোন সুপ্ত বাসনা থাকিলেও থাকিতে পারে।

(খ) একদল মনোবিদের মতে যে সকল কার্য সম্পূর্ণ করিতে হইবে সেগুলি আমাদের মনে থাকে এবং যেগুলি পূর্বেই সম্পন্ন হইয়াছে সেগুলির বর্ণনা আমরা বেশী মনে রাখি না। সাইগারনিক্ (Zeigarnik) এ বিষয়ে নিম্নলিখিতরূপে পরীক্ষণ করেন। তিনি পরীক্ষণপাত্রকে প্রায় কুড়িটি কার্য করিতে দেন; যেমন, অঙ্ক কষা, মাটির পুতুল তৈয়ারী করা, শব্দশৃঙ্খলে ঘর-পূরণ করা ইত্যাদি। কতকগুলি কাজ করার সময় পরীক্ষক পরীক্ষণ-পাত্রকে বাধাদান করিয়া উহাদের অসমাপ্ত রাখিতে বাধ্য করেন এবং বাকীগুলি সমাপ্ত করিতে দেন। ইহার পর পরীক্ষক বিষয়বস্তুগুলি সরাইয়া দেন এবং সমাপ্ত ও অসমাপ্ত সকল কাজের বর্ণনা দিতে বলেন। দেখা গেল যে, সমাপ্ত অপেক্ষা অসমাপ্ত কার্যকেই পরীক্ষণ-পাত্র সবিস্তারে বর্ণনা করিতে পারেন। ইহা হইতে মনে হয় যে, কাজ অসম্পূর্ণ থাকার জন্য যে তান (tension)-এর সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাই স্মৃতির সহায়ক; কিন্তু যে সকল কার্য সম্পূর্ণ হইয়াছিল তাহাতে ঐরূপ তান না থাকায় সেগুলি অনেকাংশে বিস্মৃতির গর্ভে লীন হইয়া গিয়াছিল।

এই মতবাদও সকল বিস্মৃতির কারণকে বুঝাইতে পারে না। যে সকল ক্ষেত্রে কার্যের সম্পূর্ণতা বা সাফল্যের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়, কেবল সেই সকল ক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণতা তানের তীব্রতা বাড়াইয়া তুলে এবং উহার স্মৃতিকে জাগরূক রাখিতে পারে।

পরিশেষে মন্তব্য করা যায় যে, কোন একটি কারণ দ্বারা সকল প্রকার বিস্মৃতিকে ব্যাখ্যা করা যায় না; এক একটি ক্ষেত্রে এক এক প্রকার কারণ বর্তমান থাকিতে পারে।

১১। স্মৃতি-সংক্রান্ত বিবিধ রোগ (Diseases of Memory):

স্মৃতি-সংক্রান্ত রোগ দুই প্রকারের হইতে পারে: স্মরণ করিতে অপারগতা বা অক্ষমতা অর্থাৎ বিস্মৃতিজনিত রোগ এবং স্মৃতি-সংক্রান্ত ভ্রান্তি।

(১) স্মরণ করার অপারগতা বা বিস্মৃতি-সংক্রান্ত রোগ নিম্নলিখিত প্রকারের হইতে পারে—

(ক) **অস্মার (Amnesia)**—'অস্মার' বলিতে বুঝায় কোন কিছু স্মরণ করার অক্ষমতা। ইহা আংশিক (partial) হইতে পারে; যেমন, কোন বিশেষ স্থান বা কাল অথবা কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তু বা ঘটনা সম্বন্ধীয় কোন অভিজ্ঞতা মনে করিবার অক্ষমতা। আবার ইহা পূর্ণ (complete) হইতে পারে; যেমন, দৈহিক বা মানসিক কোন বিশেষ অভিঘাত (shock)-এর ফলে উহার পূর্বেকার সকল ঘটনার বিস্মরণ। এখানে ব্যক্তি বিশেষের অহং-সম্বন্ধীয় জ্ঞান ব্যাহত হয় এবং বিযঙ্গ (dissociation)-এর সৃষ্টি হয়। (পৃঃ ২৭৬ দ্রষ্টব্য)। এরূপ অস্মারকে অনেক সময় 'প্রতীপ অস্মার' (retroactive বা antero-grade amnesia) বলে।

(খ) **বাগ্‌বিস্মৃতি (Aphasia)—ইহা হইল** উপযুক্ত বাক্য ব্যবহার করা বা বাক্যের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার অক্ষমতা। গুরুমস্তিষ্কের বাগ্‌-অঞ্চল (speech centre)-এ কোন বৈলক্ষণ্য থাকিলে ইহা দেখা দেয়। ইহার ফলে ব্যক্তিবিশেষ কথা বলিতে পারে না (ইহাকে বলে motor aphasia), অথবা কথার অর্থ বুঝিতে পারে না (ইহাকে বলে sensory aphasia)।

(২) স্মরণ করার বিশেষ অপাগরতা যেমন রোগ বলিয়া পরিগণিত হয়, সেইরূপ **অতিস্মরণ** (hypermnesia)-ও এক প্রকার রোগ। অতীত অভিজ্ঞতাকে সকল খুঁটিনাটি সহকারে মনে রাখা এবং মনে করার অস্বভাবী (abnormal) ক্ষমতাকে 'অতিস্মরণ' বলা যায়। যেমন বিস্মৃতি বাঞ্ছনীয় নহে, সেইরূপ অতিস্মরণও বাঞ্ছনীয় নহে। যদি আমাদের প্রাক্তন অভিজ্ঞতার কিছু কিছু ভুলিয়া যাইতে না পারি, তাহা হইলে মন অকারণে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে।

(৩) আবার স্মৃতির আর এক প্রকার রোগ হইল **স্মৃতি-সংক্রান্ত ভ্রান্তি (illusion of memory)**। ইহা সাধারণতঃ পূর্ব-পরিচিতির ভ্রান্তিরূপে দেখা দেয়। যাহার সহিত পূর্বে কোন পরিচয় ছিল না, তাহাকে দেখিয়া পরিচিত মনে করাই এই রোগের লক্ষণ। ইহাকে বলে স্মৃত্যাভাস paramnesia বা ফরাসী ভাষায় বলে *deja vu*)—ইহাতে আছে স্মৃতির আভাস (বা appearance), কিন্তু প্রকৃত স্মৃতি ইহা নহে। যেমন, হঠাৎ কোন অপরিচিত পথের ছবি দেখিয়া মনে হইতে পারে যে, ইহা পূর্বপরিচিত

কোন পথের ছবি। সেইরূপ, পথিমধ্যে কোন গৃহ বা ব্যক্তি বা অন্য কোন কিছু দেখিয়া কোন কোন ব্যক্তির হঠাৎ এরূপ মনে হইতে পারে যে, উহা তাঁহার বহুদিনের পরিচিত। স্মৃত্যাভাস সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা না হইতে পারে—বিভিন্ন পুরাতন অভিজ্ঞতার ভ্রান্ত সমাবেশ বা ভ্রান্ত স্থান বা কালে উহাদের নির্দেশ (wrong localization)-এর জন্য ইহার উৎপত্তি।

আবার যে বস্তু বা ঘটনার কোন অস্তিত্ব ছিল না, অথচ ব্যক্তি-বিশেষ তাহা অভিজ্ঞতা করিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস আছে, তাহাকে বলা যায় **'অমূল স্মৃতি' (hallucinatory memory)**। যেমন, একজন ব্যক্তি হয়ত' বলিল যে, "আমার স্পষ্ট মনে পড়ে যে, অমুক দিন অমুক ঘটনা ঘটিয়াছিল", কিন্তু অনুসন্ধানে জানা গেল যে, ঐরূপ ঘটনা ঐ দিন ঐ ব্যক্তি মোটেই প্রত্যক্ষ করে নাই।

১২। স্বল্পায়াসে শিক্ষণ ও স্মরণ রাখিবার রীতি (Principles of economy in learning and memorization):

স্মৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট আর একটি সমস্যা হইল: কি ভাবে শিক্ষা করিলে স্বল্প পরিশ্রমে দীর্ঘস্থায়ী শিক্ষা লাভ করিতে পারা যায়?

এই বিষয়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক সার্বিক নীতি রচনা করা দুরূহ; তবে কতকগুলি সাধারণ নিয়মের নির্দেশ দেওয়া যাইতে পারে।

(১) একাধিক বস্তু শিক্ষাকালে বিষয়-বস্তু এক সঙ্গে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা না করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কিছু সময়ের ব্যবধান অন্তর শিক্ষা করিবার চেষ্টা করা উচিত। (অর্থাৎ massed practice পরিহার করিয়া distributed practice-এর পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত)। ইহার কারণ-স্বরূপ অনেকে মনে করেন যে, কোন একটি বিষয় শিক্ষা করিবার পর কিছু সময় বিশ্রাম করিলে বিশ্রাম কালে শিক্ষিত বিষয়ের দৃঢ়ীকরণ (consolidation) হয়। (পৃঃ ৬৩৯)।

(২) কিছু সময়ের ব্যবধান অন্তর পুনরাবৃত্তি (spaced repetition) প্রয়োজন। কোন কিছু আয়ত্ত করিতে হইলে উহা কিছু সময়ের বাদ আবার শিক্ষা করিলে মনোমধ্যে গ্রথিত হয়। নামতা পাঠ, কবিতা শিখা, ব্যাকরণ পাঠ, অথবা টাইপরাইটার, মোটরগাড়ী ইত্যাদি যন্ত্র চালনা শিক্ষায় ইহা বিশেষভাবে

প্রয়োজনীয়। উচ্চতর বিষয়-বস্তু (যথা, দর্শন, অর্থনীতি, গণিত ইত্যাদি) শিক্ষাকালেও অধীত বিষয়বস্তুর মধ্যে মধ্যে পর্যালোচনা আবশ্যক। যেমন, আজ যাহা পড়া গেল, দুই এক্‌দিন বাদে পুনরায় তাহার আলোচনা করিলে ভাল হয়।

(৩) শিক্ষিতব্য বিষয়-বস্তুর অর্থ বাহির করিয়া উহা বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত। পরীক্ষণের মাধ্যমে দেখা গিয়াছে যে, অর্থহীন শব্দসমষ্টি আয়ত্ত করা অপেক্ষা অর্থপূর্ণ শব্দসমষ্টি আয়ত্ত করিতে অল্প সময়ের প্রয়োজন হয়।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থের তাৎপর্য বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। যেমন, অসংবদ্ধ এলোমেলো বস্তুরাশি অপেক্ষা সুসংবদ্ধ বস্তুসমষ্টি হইলে উহা অর্থবোধক হয়। সেইজন্য শিক্ষিতব্য বিষয়বস্তুগুলিকে সুসংবদ্ধভাবে গঠন (organize) করা প্রয়োজন। তাহা ছাড়া, শিক্ষিতব্য বিষয়ের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে সকল যৌক্তিক সম্বন্ধ (logical connection) আছে, তাহা অবধারণ করা উচিত; যেমন, উচ্চস্তরের কোন বিষয় অধ্যয়ন করিবার কালে 'কোন্‌টি কারণ, কোন্‌টি কার্য,' 'কোন্‌টি শ্রেণী, কোন্‌টি উপশ্রেণী', 'কোন্‌টি হেতু, কোন্‌টি সিদ্ধান্ত' এইরূপভাবে বিবিধ সম্বন্ধ নির্ণয় করিলে বিষয়বস্তুর অর্থ বুঝা সরল হয় এবং উহা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হয়। আবার, কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষিতব্য বিষয়-বস্তুর বিভিন্ন অংশের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিলে উহার জটিল অংশগুলির অর্থ বুঝা সহজ হয়। বিশেষতঃ কোন যন্ত্র পরিচালনা শিক্ষা করিবার কালে কোন্ অংশের কী সার্থকতা, বা কোন্‌টি চালাইলে কী হয় ইত্যাদি কৌশল (know-how technique) আয়ত্ত করিতে পারিলে উহা শিক্ষা করা সহজতর হয়।

(৪) অনেকক্ষেত্রে অধীতব্য বিষয়-বস্তুকে সমগ্রভাবে বুঝিয়া তাহাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া আয়ত্ত করিলে সুফল পাওয়া যায়। যেখানে বিষয়-বস্তু দীর্ঘ ও জটিল সেখানেই বিশেষ করিয়া প্রশ্ন উঠে: কোন্ পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত—**সমগ্র-অবধারণ পদ্ধতি অথবা অংশ-অবধারণ পদ্ধতি (whole method or part method)**? দুইটি পদ্ধতিরই সুবিধা-অসুবিধা আছে। তবে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, **সমগ্র-অবধারণ পদ্ধতিই অধিকতর ফলপ্রদ:**

(ক) যেখানে বিষয়-বস্তু আয়ত্ত করিবার জন্য অধিক বুদ্ধির প্রয়োজন, সেখানে সমগ্র-অবধারণ পদ্ধতিই শ্রেয়ঃ।

(খ) যেখানে অনেকগুলি বিষয়-বস্তু শিখিতে হয়, সেখানে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এক একটি বিষয়-বস্তু সমগ্রভাবে অবধারণ করিয়া অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

(গ) যেখানে অর্থপূর্ণ বিষয়-বস্তু আয়ত্ত করিতে হয় সেখানে সমগ্র-অবধারণই শ্রেয়ঃ।

কিন্তু কতকগুলি বিষয় আছে যেখানে অংশ-অবধারণ পদ্ধতি অনুসরণ করিলে সুবিধা হয়। যেমন, নামতার ক্ষেত্রে এক একটি ঘরের নামতা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে মুখস্থ করিলে সুবিধা হয়। ক্রিকেট খেলা শিখিবার সময় বোলিং করা ও ব্যাটিং করার কৌশল পৃথক্ ভাবে আয়ত্ত করা যায়। তাই বলিয়া যেখানে বিষয়-বস্তুগুলি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত, সেখানে সমগ্রটি না বুঝিয়া কেবল অংশকে আয়ত্ত করিয়া লাভ নাই।[২৬] অংশগুলি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিলে এক একটি অংশকে আয়ত্ত করিতে কম সময় লাগে। সেইজন্য আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, অংশগুলি পৃথক্‌ভাবে শিখিলে ভাল হয়। কিন্তু অংশগুলি পৃথক্‌ভাবে আয়ত্ত করাই যথেষ্ট নহে—উহাদের আবার পরস্পর যুক্ত করা কষ্টসাধ্য কার্য, কারণ অংশগুলির পারস্পরিক অনুবর্তিতা (sequence) মনে রাখিতে হইবে ; তাহা ছাড়া, একটি অনুবর্তী অংশ আয়ত্ত করিবার ফলে পূর্ববর্তী অংশ কিছু পরিমাণ ভুলিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে।

যাহাদের শিক্ষণ-শক্তির ক্ষমতা ক্ষীণ, তাহারা সকল সময় সমগ্র-পদ্ধতি সুষ্ঠুভাবে অনুসরণ করিতে পারে না—তাহাদের জন্য প্রয়োজন যতটা বেশী একসঙ্গে আয়ত্ত করিবার ক্ষমতা আছে, ততটা একসঙ্গে আয়ত্ত করা।

পরিশেষে মন্তব্য এই যে, কোন বিষয় শিক্ষা করিবার সময় অন্ধভাবে কোন একটি পদ্ধতি অনুসরণ না করিয়া প্রয়োজন মত উহাদের যে কোন একটি অথবা

২৬ আমাদের দেশে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্য বিষয়ের অংশগুলি অনেক সময় পৃথক্ পৃথক্ ভাবে মুখস্থ করিতে বলা হয় ; যেমন ইতিহাসের ক্লাশে হয়ত 'অশোকের রাজত্বকাল' এই অধ্যায়ের প্রথম ৪ প্যারাগ্রাফ ছাত্রদের 'তৈয়ারী' করিবার আদেশ দেওয়া হইল। সমগ্র কাহিনীটি পূর্বে না শিখিলে এই পদ্ধতিতে সুফল পাওয়া যায় না।

উহাদের যুক্ত ব্যবহার করাই ভাল। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, উচ্চ পর্যায়ের কোন কিছু আয়ত্ত করিবার সময় প্রথমে সমগ্র বিষয়-বস্তুটি সম্বন্ধে একটি ধারণা করিয়া লইয়া উহার সারমর্ম বুঝিতে হইবে; তাহার পর প্রয়োজনমত উহাকে কয়েকটি বিশেষ অংশে বিভক্ত করিয়া তাহাদের আয়ত্ত করার চেষ্টা এবং যেগুলি কঠিন অংশ সেগুলির উপর অধিকতর মনোযোগ দেওয়া উচিত।

(৫) কোন কিছু শিখিবার কালে শিক্ষা করিবার জন্য একটি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনোভাব থাকাও প্রয়োজন। তাহা ছাড়া, প্রতি ব্যক্তিরই নিজের অনুরাগ, কুতূহল ইত্যাদি জানা প্রয়োজন এবং সেইগুলির সহিত বিষয়-বস্তুর যতদূর সম্ভব সামঞ্জস্য বিধান করিবার চেষ্টা করা উচিত। ইহাতে বিষয়-বস্তু সরস ও মনোজ্ঞ হইয়া উঠে।

একবিংশ অধ্যায়

কল্পনা

স্মৃতির ন্যায় কল্পনাতেও আমরা ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপন ব্যতীত প্রতিরূপের মাধ্যমে বিষয়-বস্তুর চিন্তা করিতে পারি। কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক ইত্যাদি কল্পনার সাহায্যে বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াই তাঁহাদের বিষয়-বস্তু সৃষ্টি করেন। আবার আমরা যখন তাঁহাদের শিল্পসৃষ্টি অনুধাবন করি, তখনও কল্পনার আশ্রয় লই। আবার, শিশুরা যখন খেলা করে, তখনও তাহারা কল্পনার আশ্রয় লয়। কল্পনার প্রভাবেই আমরা অলীক, অসার বস্তুর কথা ভাবিতে পারি। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা কল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

১। কল্পনার স্বরূপ (Nature of Imagination):

অতীতের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা হইতে কতকগুলি প্রতিরূপ সংগ্রহ করিয়া আমরা যখন তাহাদের নূতনভাবে সাজাইয়া কোন মানসিক চিত্র অঙ্কন করি, তখন উহাকে কল্পনা[১] বলে। কল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল বিবিধ পুরাতন অভিজ্ঞতার আলোকে নূতন কিছু সংগঠন। কল্পনার প্রভাবে এই যে 'নূতন কিছু' সংগঠিত হয় ইহার কারণ মন পুরাতন অভিজ্ঞতার 'উপাদানগুলি' প্রয়োজনমত বিচ্ছিন্ন করে বা সংযুক্ত করে, বাড়ায় বা কমায়। যেমন, পক্ষীরাজ ঘোড়ার কল্পনা সম্ভব হইয়াছে, যেহেতু আমরা ঘোড়া ও পাখী উভয়ই দেখিয়াছি। কিন্তু এখানে আমরা উহাদের যে ভাবে দেখিয়া থাকি সে ভাবে কল্পনা করিতেছি না—আমরা পাখী হইতে ডানাগুলি মনে

---

১ ইংরাজী 'Imagination'-পদটি হইল কল্পনার প্রতিশব্দ। কিন্তু Imagination পদটি ব্যাপক ও সঙ্কীর্ণ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিলে Imagination বলিতে বুঝায় যে কোন মানসিক অবস্থা বা ক্রিয়া যাহাতে আমরা প্রতিরূপ (image) ব্যবহার করি। সুতরাং স্মৃতি ও কল্পনা উভয়ই imagination-পদের অন্তর্ভুক্ত। সঙ্কীর্ণ এবং সাধারণ অর্থে imagination বলিতে বুঝায় কল্পনা। এইজন্য অনেক লেখক স্মৃতি (memory)-কে 'reproductive imagination' এবং কল্পনাকে 'productive imagination' নামে অভিহিত করেন।

মনে বিচ্ছিন্ন করিয়া ঘোড়ার সহিত সংযুক্ত করিয়াছি। আবার ইচ্ছা করিলে কল্পনাবলে সাধারণ অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তুকে আমরা বিরাটাকার বা অতি ক্ষুদ্রাকাররূপে কল্পনা করিতে পারি; যেমন, মানুষের আকৃতিকে নানা ভাবে পরিবর্তিত করিয়া বিরাটাকার দৈত্যের কল্পনাও করিতে পারি, আবার অতি ক্ষুদ্র লিলিপুটেরও কল্পনা করিতে পারি।[২]

যুক্তির ক্ষেত্রে যেমন আমরা পূর্ব অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়বস্তুগুলিকে নানাভাবে ব্যবহার করি, কল্পনার ক্ষেত্রেও সেইরূপ করি; কিন্তু **যুক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে বাস্তব যে সম্পর্ক আছে, তাহাই অনুধাবন করার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু কল্পনার ক্ষেত্রে নূতন নূতন সম্পর্ক মন সৃষ্টি করে। যেহেতু কল্পনা মনঃসৃষ্টি, সেই হেতু সত্যাসত্যের প্রশ্ন এখানে উঠে না (তবে সম্ভাব্যতা-অসম্ভাব্যতার প্রশ্ন উঠে)।**

যেহেতু কল্পনা বাস্তবের সহিত সম্পর্কশূন্য হইতে পারে, সেই হেতু কল্পনার একটা নিজস্ব **স্বাধীনতা** আছে। (তবে ইচ্ছা করিলে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের চিন্তায় কল্পনাকে প্রয়োগ করিতে পারা যায়; তখন উহাকে ঐ উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে হয়।) কল্পনায় যে পরিমাণ স্বাধীনতার সম্ভাবনা আছে, তাহা প্রত্যক্ষ, স্মৃতি বা যৌক্তিক চিন্তন কোনটিতেই সম্ভব নহে।

যদিও কল্পনাকে স্বাধীন বলা হয়, তাহা হইলেও একদিক্ হইতে ইহা সীমিত। উপযুক্ত উপাদান সংগ্রহের ব্যাপারে কল্পনাকে পুরাতন অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিতে হয়।[৩] আবার ঐ সকল অভিজ্ঞতার সহিত সংশ্লিষ্ট প্রতিরূপগুলিকে প্রয়োজনমত উজ্জীবিত করারও ক্ষমতা চাই।

২। কল্পনার প্রকাশ ও পরিচয় (Expression of Imagination):

কল্পনার প্রকাশ নানা সময় পাওয়া যায়। আমাদের বিবিধ আমোদ-

২ **তুলনীয়:** "Imagination is ***mental manipulation.*** When the individual recalls facts previously observed in reality and then proceeds to rearrange these facts into a new pattern, he is said to show imagination." (Woodworth, ***Psychology***, 12th Ed., p. 552).

৩ **দার্শনিক** Hume-**এর ভাষায়:** "All the creative power of the mind amounts to no more than the faculty of compounding, transposing, augmenting or diminishing the materials afforded by the senses and experience." (***Enquiries***).

প্রমোদ ও ক্রীড়ার মধ্যে কল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়। শিল্প, সৌন্দর্য ইত্যাদির উপলব্ধির ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কল্পনার প্রয়োজন। সেইরূপ ভবিষ্যতের কোন পরিকল্পনার জন্য, ভবিষ্যৎ কিরূপ হইবে তাহা অনুমানের জন্য, কল্পনার আবশ্যক। আবার শিল্পকলার ক্ষেত্রে সৌন্দর্য-সৃষ্টির কার্যেও কল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়। উত্তেজনা, আতঙ্ক ইত্যাদির সময়ও কল্পনার প্রভাবে নানা অদ্ভুত, আতঙ্কজনক প্রতিরূপ মন স্বতঃই সৃষ্টি করে। এইগুলি যদি অতিরিক্ত বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে উহা অস্বভাবী মনের পরিচায়ক হইবে।

শিশু-জীবনে কল্পনার স্থান সর্বাধিক। শিশু যখন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নানাভাবে ব্যবহার করার কৌশল আয়ত্ত করে, তখন হইতে সে বাহ্য জগতের যে সকল বস্তুকে ব্যবহার করিবার 'অধিকার' লাভ করে, সেগুলিকে নানাভাবে সাজাইয়া নূতনরূপ দানের চেষ্টা করে। তাহা ছাড়া, যে সকল খেলনা লইয়া সে খেলা করে, তাহাদের দ্বারা সে কল্পনার জগৎ রচনা করে।[৪] বাস্তব বা সত্য বস্তুর সহিত সে যেমন আচরণ করে, তাহার বিবিধ খেলনার (পুতুল, গাড়ী ইত্যাদির) সহিতও সেইরূপ আচরণ করে। তাহার কল্পনা আরও বিস্তার লাভ করে যখন সে বিভিন্ন গল্প, কাহিনী, উপকথা ইত্যাদি শুনে এবং উহাদের বিষয় লইয়া নূতন 'জগৎ' রচনা করে। শিশু কল্পনার যে জগৎ গঠন করে, তাহাতে অনেক সময় সে কোন কার্যের প্রধান নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করিতে পছন্দ করে।[৫] ইহাতে সে কল্পনায় আত্মশ্লাঘা লাভ করে। মোট কথা, শিশু কল্পনার সাহায্যে যে সকল 'জীবজন্তু', 'বন্ধুবান্ধব' রচনা করে, তাহাদের চিন্তায় সে অনেক সময় মগ্ন থাকে এবং তাহার নানাপ্রকার খেলা, বিভিন্ন নাটকীয় আচরণ, ভঙ্গিমা ইত্যাদির মাধ্যমে তাহার কল্পনা আত্মপ্রকাশ করে। শিশু যখন শৈশব অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ কৈশোর ও যৌবনে

৪ মণ্টেসরি মনে করেন যে, শিশুকে যদি অবাস্তব খেলনা লইয়া খেলা করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে তাহার কল্পনাকে ভবিষ্যতে গঠনমূলক কার্যে প্রয়োগ করিতে পারে না। সকলে তাঁহার এই অভিমত গ্রহণ করেন না। তবে এ বিষয়ে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করাই ভাল—শিশুজীবনে যাহাতে বাস্তব ও কল্পনা (fact and fancy)-এর সমন্বয় হয় সেইদিকেই লক্ষ্য রাখা উচিত।

৫ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'শিশু' কবিতাগ্রন্থে 'বীরপুরুষ' কবিতায় শিশু-মনের কল্পনার একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়াছেন। খোকা কল্পনা করিতেছে যে, সে তাহার মাকে লইয়া অনেক দূরে যাইতেছে—মা পাল্কি চড়িয়া যাইতেছেন এবং খোকা তাঁহার পাশে পাশে ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছে।

পদার্পণ করে, তখন সে তাহার সমবয়সী সঙ্গীর সাহচর্য কল্পনা করে। নানারূপ সামাজিক আচরণের মাধ্যমে, বিভিন্ন দ্রব্য সঞ্চয়ের অভ্যাস (hobby) ইত্যাদির মাধ্যমে তাহার কল্পনা প্রকাশ পায়। এই সময় কখনও কখনও সে অবাস্তব দিবাস্বপ্নে মগ্ন থাকে; আবার তাহার কল্পনার সাহায্যে সে নানারূপ গঠনমূলক পরিকল্পনাও করিতে পারে।[৬]

৩। স্মৃতি-প্রতিরূপ ও কল্পনা-প্রতিরূপ (Memory-images & Images of Imagination):

স্মৃতি ও কল্পনার মধ্যে কিছু **সাদৃশ্য** আছে:

স্মৃতি ও কল্পনা উভয়ই অতীত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। উভয়ই প্রতিরূপ লইয়া গঠিত। উভয় ক্ষেত্রেই আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত চিন্তা করিতে পারি।

উভয়ের মধ্যে এই প্রকার সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকিলেও উহাদের মধ্যে কয়েকটি বিষয় **পার্থক্য** আছে:

(ক) **স্মৃতি-প্রতিরূপগুলি যতদূর সম্ভব ব্যক্তি-বিশেষের নিজস্ব অভিজ্ঞতার অনুলিপি-স্বরূপ।** স্বীয় অভিজ্ঞতায় ঘটনাগুলি যখন, যে ভাবে, যে পরম্পরায় ঘটিয়াছিল, ব্যক্তি-বিশেষ সেই অনুযায়ী উহাদের পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা করে; অন্ততঃ সেইভাবে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছে বলিয়া তাহার বিশ্বাস থাকে।

কল্পনার প্রতিরূপগুলি যদিও অতীতের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা হইলেও উহারা ব্যক্তি-বিশেষের কোন একটি বিশেষ অভিজ্ঞতার অনুরূপ নহে। **কল্পনা হইল বিভিন্ন অভিজ্ঞতা হইতে সংগৃহীত প্রতিরূপসমূহের এক নূতন সমন্বয়।**

পথিমধ্যে ডাকাতেরা তাহাদের আক্রমণ করিল। খোকাও ডাকাতদের সহিত বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিল। খোকা কল্পনা করিতেছে:

"ছুটিয়ে ঘোড়া গেলেম তাদের মাঝে,
ঢাল তলোয়ার ঝনঝনিয়ে বাজে—
কী ভয়ানক লড়াই হল মা যে
শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা।
কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে,
কত লোকের মাথা পড়ল কাটা।"

৬ Ames & Learned-রচিত প্রবন্ধ 'Imaginary Companions & related phenomena' (*Journal of Genetic Psychology*, 1946, pp. 147-167) দ্রষ্টব্য।

যেমন, আমি যদি ছাত্রজীবনে কলেজে আমার প্রথম দিনের কথা মনে করি, তাহা হইলে উহা হইবে আমার স্মৃতি। আর আমি যদি আমার এক বন্ধুর ছাত্রজীবনে কলেজে প্রথম দিনে কী ঘটিয়াছিল, তাহা শুনিয়া সেইরূপভাবে চিন্তা করি, তাহা হইলে আমি আমার বন্ধুর প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা কল্পনা করিতেছি বলা যায়। সেইরূপ, আমি যদি কল্পনা করি যে, তৃতীয় মহাযুদ্ধ বাধিলে হাইড্রোজেন বোমা ইত্যাদি নিক্ষেপের ফলে কিরূপ ধ্বংসের লীলা স্বরু হইবে বা রকেট অভিযানের আরও উন্নতি হইলে মানুষ কেমন চাঁদে যাইবে, তাহা হইলে উহা হইবে কল্পনা।

আমরা স্মৃতি-প্রতিরূপ আলোচনা কালে দেখিয়াছি যে, উহা অতীত অভিজ্ঞতার হুবহু নকল নহে—উহাতেও নূতন সংগঠন হয়। তাহা হইলে কল্পনার সহিত প্রভেদ কোথায়? স্মৃতি-প্রতিরূপে যদিও নূতন সংগঠন হয়, ব্যক্তি-বিশেষ তাহা ইচ্ছাপূর্বক করে না। মূল বিষয় প্রত্যক্ষ কালে অথবা উহাকে স্মৃতিরূপে জাগরিত করিবার কালে বিষয়-বস্তুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুসারে এবং ব্যক্তি-বিশেষের নিজের আবেগ, প্রতিন্যাস ইত্যাদি অনুযায়ী অতীত অভিজ্ঞতা নূতনভাবে সংগঠিত হয় (পৃঃ ৬৩২-৩৪); কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ব্যক্তি-বিশেষ যখন কোন কিছু স্মরণ করে, তাহা পুরাতন অভিজ্ঞতার অনুরূপ হইযাছে বলিয়াই ব্যক্তি-বিশেষের বিশ্বাস থাকে। স্বাভাবিক (normal) কল্পনার ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যক্তি-বিশেষের এই বিশ্বাস থাকে যে, সে তাহার অভিরুচি অনুযায়ী বা কোন বর্ণনানুযায়ী পুরাতন অভিজ্ঞতাগুলি স্বাধীনভাবে বিচ্ছিন্ন ও সংযুক্ত করিতেছে।[৭] এ কথা সত্য যে, অস্বভাবী কল্পনা (abnormal imagination)-এর ক্ষেত্রে কল্পনা যে মনঃসৃষ্টি ব্যক্তি-বিশেষ সে জ্ঞান হারাইয়া ফেলে এবং উহাকে বাস্তব বলিয়া মনে করে। সে ক্ষেত্রে স্মৃতি-প্রতিরূপের সহিত অস্বভাবী কল্পনার পার্থক্য হইল এই যে, প্রতিরূপগুলি যে প্রতিরূপ (image)-মাত্র এই জ্ঞান স্মৃতির ক্ষেত্রে আছে, কিন্তু অস্বভাবী কল্পনার ক্ষেত্রে নাই।

৭ টিচেনার বলেন যে, স্মৃতিপ্রতিরূপগুলি ধীরে ধীরে জাগরিত হয় বলিয়া উহারা অস্পষ্ট ও আবছা (filmy and vaporous) এবং পরিবর্তনশীল বা চঞ্চল (subject to change). কিন্তু কল্পনার প্রতিরূপগুলি অপেক্ষাকৃত স্থায়ী। স্মৃতিপ্রতিরূপগুলি চঞ্চল বলিয়া উহাদের যেন জোর করিয়া মনোমধ্যে ধরিয়া রাখিতে হয়, কিন্তু কল্পনার ক্ষেত্রে সকল সময় ঐরূপ নহে। (Titchener, *Text-book*, p. 417 দ্রষ্টব্য)।

(খ) **স্মৃতি মাত্রেরই অতীত অভিজ্ঞতার প্রতি একটা ইঙ্গিত (reference to the past) থাকে**; অর্থাৎ স্মৃতি সর্বদাই হইল অতীতের স্মৃতি; আমাদের কখনও ভবিষ্যতের স্মৃতি বা বর্তমানের স্মৃতি হইতে পারে না। **কল্পনায় কিন্তু ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান যে কোন কালের প্রতিই ইঙ্গিত থাকিতে পারে।** অতীতে কী হইয়াছিল তাহা আমরা কল্পনা করিতে পারি; যেমন, কল্পনা করিতে পারি যে, মহারাজ অশোকের রাজত্বকালে প্রজারা সুখে শান্তিতে বাস করিত। বর্তমানে অন্যত্র কী ঘটিতেছে তাহা আমরা কল্পনা করিতে পারি; যেমন, কলিকাতায় বসিয়া আমরা কল্পনা করিতে পারি যে, এখন নূতন দিল্লীতে লোকসভায় প্রধান মন্ত্রী বক্তৃতা দিতেছেন। আবার আমরা ভবিষ্যতেরও কল্পনা করিতে পারি; যেমন, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পাঁচ বৎসর পরে ভারতবর্ষের কিরূপ উন্নতি হইবে, তাহা আমরা ভাবিতে পারি।[৮]

(গ) **স্মৃতির মধ্যে 'অহং' (ego)-এর প্রাধান্য থাকে**; কারণ স্মরণকারীর সর্বদাই এই জ্ঞান থাকে যে, "আমি এখন যাহা স্মরণ করিতেছি, তাহার মূল বিষয় (original) আমি নিজেই অতীতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।" **কল্পনার ক্ষেত্রে অহং-এর ধারণা থাকিতেও পারে, নাও থাকিতে পারে**; যেমন, আমি কল্পনা করিতে পারি যে, কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে আর্যঋষিগণ কি ভাবে আশ্রমে ধ্যানমগ্ন থাকিতেন—এখানে অহং-এর সম্বন্ধে কোন স্মৃতি বা ধারণা নাই। আবার, আমি যদি চিন্তা করি যে, দশ বৎসর পরে আমি কী করিব, তাহা হইলে কল্পনাবলে আমি যেন আমারই অহংকে একটা ভবিষ্যতের রূপ দিই।

স্মৃতি ও কল্পনার মধ্যে পারস্পরিক প্রভেদ থাকিলেও বাস্তবক্ষেত্রে উহারা সংমিশ্রিত হইয়া যায়। যাহা নিছক কল্পনা বলিয়া রচনা করা হয়, তাহার পশ্চাতে বাস্তব ঘটনার স্মৃতি থাকে। অনেক কবি, ঔপন্যাসিক ইত্যাদির কাল্পনিক রচনার মধ্যে তাঁহাদের আত্মজীবনের ঘটনার প্রভাব সুস্পষ্ট থাকে। অপর পক্ষে স্মৃতির মধ্যেও কল্পনার প্রভাব আসিয়া পড়ে। (পৃঃ ৬১৯)।

৮ ভবিষ্যতে কোন কিছু ঘটিবে এইরূপ মনে করিয়া তদনুরূপ নিজেকে প্রতিযোজন করাকে আশা (expectation) করা বলে।

৪। কল্পনার প্রকারভেদ (Types of Imagination) ঃ

কল্পনাকে প্রথমতঃ দুইটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—স্বভাবী (normal) এবং অস্বভাবী (abnormal)।

স্বভাবী কল্পনা বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে ঃ

(ক) সচেষ্ট কল্পনা ও নিশ্চেষ্ট কল্পনা (Active & Passive Imagination) ঃ

সচেষ্ট কল্পনাতে আমরা ইচ্ছাপূর্বক মানস প্রতিরূপগুলিকে নানাভাবে মিশ্রিত করিয়া এক নূতন মানস 'বস্তু' সৃষ্টি করি। এক্ষেত্রে মন ইচ্ছাপূর্বক পুরাতন অভিজ্ঞতা হইতে কিছু কিছু 'উপাদান' সংগ্রহ করিয়া তাহাদের সংযোগে নূতনের কল্পনা করে; অর্থাৎ বিভিন্ন অভিজ্ঞতা হইতে কতকগুলি অংশ বাদ দিয়া এবং কতকগুলি অংশ রাখিয়া দিয়া মন তাহাদের সমাবেশ ঘটায়। যেমন, শিল্পী যদি তাহার শিল্পসৃষ্টি করিবার পূর্বে চিন্তা করিয়া বিভিন্ন প্রতিরূপের সমাবেশ করেন, তাহা হইলে উহা হইবে সচেষ্ট কল্পনা। এখানে তিনি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া বিশেষ ভাবে ও বিশেষ পথে নিজের কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ ও চালিত করিতেছেন।

অপর পক্ষে, **যদি কোন চেষ্টা ব্যতীতই মনোমধ্যে স্বতঃই কল্পনার স্রোত চলে, তাহা হইলে উহা হইবে নিশ্চেষ্ট কল্পনা।** ব্যক্তি-বিশেষ যখন দিবাস্বপ্নে মগ্ন থাকে, তখন উহা হইবে নিশ্চেষ্ট কল্পনা। এখানে সে মনের 'বল্গা' যেন শ্লথ করিয়া দিয়াছে—তাই কত উদ্ভট চিন্তা বা ধারণা মনের মধ্যে একের পর এক আসিতেছে, চলিয়া যাইতেছে; কিন্তু কোনটিকেই সে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে না বা বাধা দিতেছে না। সেইরূপ স্বতঃচিন্তন, স্বপ্ন ইত্যাদিও হইল নিশ্চেষ্ট কল্পনার উদাহরণ।

(খ) বুদ্ধিবিষয়ক, সৌন্দর্যবিষয়ক এবং ব্যবহারিক কল্পনা (Intellectual, Æsthetic and Practical Imagination) ঃ

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বা সচেষ্ট কল্পনা বিভিন্ন উদ্দেশ্য সিদ্ধির কার্যে প্রযোজিত হইতে পারে। উদ্দেশ্য অনুযায়ী কল্পনা বুদ্ধিবিষয়ক, শিল্পীয় এবং ব্যবহারিক হইতে পারে।

কল্পনা যখন সত্যের সন্ধানে নিয়োজিত হয়, তখন উহাকে বুদ্ধি-বিষয়ক বলে। বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক ইত্যাদি মনস্বী ব্যক্তি যখন সত্যানুসন্ধানের কার্যে লিপ্ত হ'ন, তখন তাঁহারা প্রথমে প্রকল্প গঠন

করিয়া তাঁহাদের কার্য পরিচালিত করেন। এই প্রকার কল্পনাকে **বুদ্ধিবিষয়ক (Intellectual) কল্পনা** বলে।

আবার কল্পনা সৌন্দর্যের উদ্বোধক হইতে পারে। **সৌন্দর্যসৃষ্টির কার্যে কল্পনা যখন নিয়োজিত হয়, তখন উহাকে সৌন্দর্যবিষয়ক বা শিল্পীয় (Æsthetic) কল্পনা বলে।** কাব্যে, চিত্রে, সঙ্গীতে, নৃত্যে আমরা সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা করি। কিন্তু এই সৌন্দর্য সৃষ্টি করিবার পূর্বে কবি, চিত্রকর, গায়ক ইত্যাদি শিল্পী যাহা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন, সে সম্বন্ধে প্রথমে কল্পনা করিয়া তাহাকে বাহ্যরূপ দান করেন। সুতরাং এই প্রকার কল্পনাকে শিল্পীয় বা সৌন্দর্যবিষয়ক বলা হয়।

কল্পনা আবার কর্মেরও প্রবর্তক। সেইজন্য ব্যবহারিক কার্যেও কল্পনা প্রযুক্ত হয়। কোন্ বস্তুর দ্বারা কোন্ অভাব দূরীভূত হইবে, তাহা পূর্ব হইতে কল্পনা করিয়া মানুষ কার্যে প্রবৃত্ত হয়। যে কোন যন্ত্র নির্মাণের পশ্চাতে যে উদ্ভাবনী কল্পনা কার্য করে তাহাকে ব্যবহারিক কল্পনা বলা চলে। ছুরি, কাঁচি,, কলম ইত্যাদি নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য-নির্মাণ হইতে আরম্ভ করিয়া মহাশূন্যযান নির্মাণ পর্যন্ত সকল কার্যেরই মূলে কোন-না-কোন কল্পনা বিদ্যমান ছিল। এই সকল **ব্যবহারিক দ্রব্য নির্মাণের পরিকল্পনার কার্যে নিযুক্ত কল্পনাকে ব্যবহারিক (Practical) কল্পনা বলে।**

অবশ্য এই প্রসঙ্গে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সত্য ও তাহার ব্যবহারিক প্রয়োগকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ করা যায় না।

(গ) সংভাবিনী এবং সংগ্রাহিণী কল্পনা (Creative and Receptive Imagination) :

কবি যখন কাব্য রচনা করেন বা ঔপন্যাসিক যখন তাঁহার উপন্যাস রচনা করেন, তখনও তিনি কল্পনার আশ্রয় ল'ন; আবার পাঠক যখন উহা পাঠ করেন, তখনও তিনি কল্পনার আশ্রয় ল'ন। কিন্তু এই উভয় প্রকার কল্পনার মধ্যে একটু প্রভেদ আছে। কবি বা সাহিত্যিক বা শিল্পী যে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেন সে কল্পনায় তাঁহার স্বাধীনতা আছে—তিনি ইচ্ছামত কল্পনার স্রোত নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন। যেমন, গল্পলেখক তাঁহার গল্পের পরিণতি যেরূপ করিয়াছেন, হয়ত' তাহা নাও করিতে পারিতেন। এইরূপ কল্পনাকে সংভাবিনী কল্পনা (creative imagination) বলে।

কিন্তু পাঠক যখন কাব্য, উপন্যাস ইত্যাদি পাঠ করেন বা দর্শক যখন শিল্পীর শিল্প উপভোগ করেন, তখন তিনি যে কল্পনার আশ্রয় ল'ন, তাহাতে তাঁহার নিজের স্বাধীনতা নাই ; লেখক বা শিল্পী যে ভাবে বা যেরূপে ঘটনা-পরম্পরা বা দৃশ্য-পরম্পরা উপস্থাপিত করেন, পাঠক বা দর্শক তাহাই অনুসরণ করিয়া চলেন। যেমন, কোন নাটকের শেষ পরিণতি যদি বিয়োগান্তক হয়, তাহা হইলে পাঠক বা দর্শককে ঐভাবেই উহা কল্পনা করিতে হইবে (যদিও এমন হইতে পারে যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে উহার মিলনান্তক পরিণতি পছন্দ করেন)। সুতরাং' যেটি যেরূপ বর্ণিত আছে, সেইটি তিনি সেইভাবে কল্পনা করেন ; অর্থাৎ তিনি কিছু সৃষ্টি করেন না—তিনি কেবল গ্রহণ করেন। এইজন্য তাঁহার কল্পনাকে সংগ্রাহিণী (receptive) কল্পনা বলে।

(ঘ) সবিশ্বাস ও বিশ্বাসহীন কল্পনা (Imagination with belief and Imagination without-belief) :

'আমরা কোন ক্ষেত্রে কল্পনার বিষয়বস্তুকে বিশ্বাস করি, আর কোন ক্ষেত্রে বিশ্বাস করি না। **যদি আমরা কল্পনার বিষয়বস্তুতে বিশ্বাস করি, তাহা হইলে উহা হইবে সবিশ্বাস কল্পনা** ; যেমন, যখন আমরা ইতিহাসের ঘটনাবলী পাঠ করি বা ভূগোলে কোন দেশের অবস্থান ও বৈচিত্র্য পাঠ করি, তখন উহা আমরা কল্পনা করিতে পারি এবং উহার যাথার্থ্য সম্বন্ধে বিশ্বাস করি। সেইরূপ যখন আমরা কোন কিছু আশা করি, তখন আমরা উহার বাস্তবতাতে বিশ্বাস করি ; যেমন, যদি আমি আশা করি যে, আগামী কাল আমার বন্ধু আসিবে, তাহা লইলে ঐ কল্পনাতে বিশ্বাস থাকে (অবশ্য এমন হইতে পারে যে, বন্ধু আসিল না এবং বিশ্বাস ভুল প্রতিপন্ন হইল)। আবার বৈজ্ঞানিক, অর্থনীতিবিৎ ইত্যাদি যখন স্ব স্ব বিষয়ে কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা করেন, তখন ঐরূপ কল্পনার সহিত বিশ্বাস থাকে।

অপরপক্ষে, **এমন অনেক 'বিষয়' আছে যাহা আমরা কল্পনা করিতে পারি, কিন্তু যাহার অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাস করি না।** যেমন, যখন আমরা রূপকথার কাহিনী পাঠ করি, তখন ঐ কাহিনীর রাজকন্যা, রাজকুমারী, পক্ষীরাজ ঘোড়া, সোনার কাঠি, রূপার কাঠি ইত্যাদি সবই কল্পনা করিতে পারি, কিন্তু উহাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না। শিশুরা পরিণতবয়স্কদের অপেক্ষা অধিকতর কল্পনাপ্রবণ এবং বাস্তব-অবাস্তবের

কথা বিশেষ চিন্তা করে না—এইজন্য তাহারা রূপকথার কাহিনী, ঈশপের গল্প (Æsop's Fables) ইত্যাদি সহজেই বিশ্বাস করে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আমরা যাহা খুশী কল্পনা করিতে পারি ; কিন্তু কল্পনা করিলেই সে বিশ্বাস আসিবে তাহা নহে, কারণ বাস্তবতার ভিত্তিতে বিশ্বাস রচিত হয়। (পৃঃ ৬৬৫)।

৫। অস্বভাবী কল্পনা (Abnormal Imagination) :

আমরা যখন কল্পনা করি, তখন এই ধারণা থাকে যে, কল্পনার প্রতিরূপগুলি মনঃসৃষ্ট—উহারা সম্মুখে নাই এবং উহাদের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ হইতেছে না। ইহাই হইল স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণতবয়স্কদের কল্পনার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মধ্যে মধ্যে এইরূপ হয় যে, আমরা কল্পনার প্রতিরূপগুলিকে প্রতিরূপ বলিয়া মনে করি না, বরং মনে হয় উহারা যেন সম্মুখে অস্তিত্বশীল 'বস্তু'। আবার ইহাও ঘটিতে পারে যে, কোন প্রকৃত বস্তুর উপর কোন কিছু অধ্যস্ত হইতে পারে এবং তখন সমগ্র বস্তুর স্বরূপ আবৃত হইয়া যায় এবং উহা তখন বাস্তব বলিয়া মনে হয়।

অস্বভাবী কল্পনা বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে ; যথা, ভ্রান্তপ্রত্যক্ষ (illusion), অমূল প্রত্যক্ষ (hallucination), স্বতঃক্রিয় চিন্তন, দিবাস্বপ্ন, এবং স্বপ্ন।

(ক) ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ ও অমূল্য প্রত্যক্ষ (Illusion & Hullucination)—

ভ্রান্ত প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষগোচর কোন বস্তুর উপর উহার যে বৈশিষ্ট্য নাই, তাহা আরোপ করা হয় এবং প্রত্যক্ষকারী ঐ সকল অলীক গুণসম্পন্ন বস্তুগুলিকে বাস্তব বলিয়া মনে করে ; যেমন, রজ্জুতে সর্পভ্রম। অমূল প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে কোথাও নিছু নাই, অথচ কোন কিছু প্রত্যক্ষগোচর হইতেছে বলিয়া মনে হয়। [আমরা ৫৮৯-৯৩ পৃষ্ঠায় এই দুই প্রকার অস্বভাবী কল্পনার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিয়াছি ; সুতরাং পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।]

(খ) স্বতঃক্রিয় চিন্তন (Automatic or autistic thinking)—

এই প্রকার চিন্তনের ক্ষেত্রে মনের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না এবং একটি ধারণা-পরম্পরা স্বতঃই চলিতে থাকে। স্বভাবী লোক যখন দিবাস্বপ্নে নিমগ্ন

থাকে অথবা খেদোন্মত্ত বাতুল (schizophrenic patient) যখন নিজের মনে অবাস্তব, উদ্ভট চিন্তায় নিমগ্ন থাকে, তখন তাহাকে স্বতঃক্রিয় চিন্তনের প্রকাশ বলা যায়। ব্লয়লার (Bleuler) এই বিষয় লইয়া আলোচনা করেন; এই প্রকার চিন্তায় নিমগ্ন ব্যক্তি সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, সে যেন রূপকথায় বর্ণিত জীবন বাস্তবে যাপন করিতে চাহে![৯] মনঃসমীক্ষণ-বাদীরা মনে করেন যে, এই প্রকার চিন্তন কেবলমাত্র নির্জ্ঞানস্তরের বাসনা দ্বারা প্রেষিত (পৃঃ ৩৮৬ দ্রষ্টব্য); কিন্তু ব্লয়লারের মতে এই প্রকার চিন্তন নির্জ্ঞান ও সংজ্ঞান উভয় স্তরের বাসনাদ্বারাই প্রেষিত হইতে পারে—যৌক্তিক চিন্তনের সহিত ইহার প্রধান পার্থক্য হইল যে, ইহা উদ্দেশ্যবিহীন, এলোমেলো গতিতে চলিতে থাকে। এইজন্য এই প্রকার চিন্তনকে বাস্তবের সহিত সম্পর্কহীন বলিয়া মনে হয়। এই প্রকার চিন্তনের ফলে যে সকল অবাস্তব, অলীক প্রতিরূপের সৃষ্টি হয়, তাহার মাধ্যমে ব্যক্তি-বিশেষ অপূরিত বাসনাকে পূরণ, বাস্তবজীবনের কোন অশান্তি বা তিক্ত অভিজ্ঞতা ইত্যাদির হাত হইতে নিষ্কৃতি, সুখের আস্বাদন ইত্যাদি পাইতে চাহে। এইজন্য সে মনঃসৃষ্টি (phantasy)-এর মধ্যে কালাতিপাত করিতে চাহে।[১০] এই প্রকার চিন্তন যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং বাহ্য জগতের সমালোচনা হইতে মুক্ত।[১১]

(গ) দিবাস্বপ্ন (Day Dream, Brown Study, Reverie)—ইহা হইল জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্নতুল্য ভাব।[১২] যে সকল বাসনা-কামনা স্বাভাবিক অবস্থায় পূরিত হয় না, সেইগুলি ব্যক্তি-বিশেষ যেন নিজেই এক কাল্পনিক

৯ Bleuler-এর ভাষায়: "He does not tell a fairy tale, he does not read one, he *lives his fairy-tale*."

১০ W. E. Vinacke, *Psychology of Thinking*, Ch. XI দ্রষ্টব্য।

১১ Woodworth-এর ভাষায়: "(Autistic thinking) means thinking which does not care about the real world. Autistic thinking gratifies some desire and that is enough for it. It does not submit to criticism from other persons nor from the individual himself, nor does it seek to square itself with reality." (*Psychology*, p. 519).

১২ সুতরাং এই বিশেষ পারিভাষিক অর্থ (technical sense)-এ দিবাস্বপ্ন দিনের বেলায় নিদ্রাকালীন স্বপ্ন বুঝায় না; দিবাস্বপ্ন যে দিবাভাগেই ঘটে তাহা নহে—রাত্রিকালে নিদ্রাবিহীন অবস্থাতেও ইহা ঘটিতে পারে।

জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার দ্বারা পূরণের চেষ্টা করে। দিবাস্বপ্নের কাল্পনিক প্রতিরূপগুলি গঠন করিবার জন্য ব্যক্তি-বিশেষকে কোন চেষ্টা করিতে হয় না। এই হিসাবে স্বপ্নের সহিত দিবাস্বপ্নের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু পার্থক্য হইল যে, স্বপ্ন নিদ্রাকালীন অবস্থা, কিন্তু দিবাস্বপ্ন হইল জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্নকালীন অবস্থা। তাহা ছাড়া, একই প্রকার দিবাস্বপ্ন ব্যক্তি-বিশেষ বার বার দেখিতে পারে; তখন ক্রমশঃ ক্রমশঃ ব্যক্তি-বিশেষের অমূল প্রত্যয় (**delusion**) জন্মিয়া যায়—সে আকাশকুসুম রচনা করিয়া চলে এবং উহার বাস্তবতায় বিশ্বাসী হইয়া উঠে ও তদনুরূপ প্রতিক্রিয়া করে*। কিন্তু একই স্বপ্নের পৌনঃপুনিকতা সাধারণতঃ ঘটে না। আবার, দিবাস্বপ্ন সাধারণতঃ সুখদায়ক, কিন্তু স্বপ্ন সর্বদাই যে সুখানুভূতির সৃষ্টি করে তাহা নহে।

দিবাস্বপ্নের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল এইরূপ: **(১) অতিরিক্ত দিবাস্বপ্ন-বিলাসী বাস্তব ঘটনার সহিত দিবাস্বপ্নের প্রতিরূপগুলি এমনভাবে মিশাইয়া ফেলে যে, সে অনেক সময় ইহাদের মধ্যে পার্থক্য করিতে পারে না। (২) দিবাস্বপ্ন ক্রমশঃ অমূল প্রত্যয় সৃষ্টি করে। (৩) দিবাস্বপ্নের মূলে আছে অপূরিত বাসনা। (৪) দিবাস্বপ্নের যে সব 'ঘটনা' ব্যক্তি-বিশেষ "প্রত্যক্ষ" করে তাহাদের প্রধান ভূমিকার অংশ গ্রহণ করে স্বপ্নদর্শনকারী নিজেই।**

দিবাস্বপ্নের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হইল আরব্য উপন্যাসের আল্‌নাস্কারের গল্প। সে বেচারা নিতান্ত গরীব—কাঁচের বাসন বিক্রয় করিয়া তাহার দিন চলে। কিন্তু সে তাহার দারিদ্র্যকে স্বীকার করিয়া লইতে পারে নাই। সে কল্পনা করে যে, সে একদিন ধনী হইবেই। একদিন সে শ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম করিতেছে, আর তাহার কল্পনার জাল বুনিতেছে। এইভাবে সে হঠাৎ কল্পনা করিতে লাগিল যে, তাহার দারিদ্র্যের অবসান হইয়াছে—সে রীতিমত ধনী হইয়া উঠিয়াছে এবং একজন ধনীলোকের কন্যা বিবাহ করিয়াছে; যদি তাহার স্ত্রী অবাধ্য হয়, সে তাহাকে পদাঘাত করিবে। বেচারী বাসনবিক্রেতা কল্পনায় এমনই বিভোর হইয়া উঠিল যে, তাহার সম্মুখে যে স্ত্রী নাই, সে যে তখনও নিতান্ত গরীব, সে কথা সে ভুলিয়া গেল এবং সে তাহার পা ছুঁড়িতেই তাহার কাঁচের বাসনগুলি পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল! এখানে দেখা যাইতেছে যে, (ক) বাসন-বিক্রেতা কল্পনায় এমনই মগ্ন ছিল যে, সে বাস্তব ও অলীকের

মধ্যে পার্থক্য করিতে পারিল না; (খ) যাহা আকাশকুসুম মাত্র তাহাকেই সে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিল; (গ) তাহার অপূরিত বাসনাই দিবাস্বপ্নের পথে তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল; (ঘ) যে সকল ঘটনা সে কল্পনা করিয়াছিল, তাহাতে প্রধান ভূমিকার অংশ সে নিজেই গ্রহণ করিয়াছিল; (ঙ) এই কল্পনাবিলাসে সে আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়াছিল।

বলা বাহুল্য, অতিরিক্ত দিবাস্বপ্ন আমাদের মনের পক্ষে ক্ষতিকর। শিশুদের মনের প্রচয় (development)-এর পক্ষে একটা সীমা পর্যন্ত দিবাস্বপ্নের প্রয়োজন হইতে পারে; কিন্তু অতিরিক্ত পরিমাণে হইলে মনের ক্ষতি হয়। বয়ঃসন্ধিক্ষণে দিবাস্বপ্ন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষতিকারক—এমনও দেখা গিয়াছে যে, দিবাস্বপ্নে মগ্ন তরুণ-তরুণী অপরাধমূলক কার্যে লিপ্ত হইয়াছে।[১৩]

(ঘ) স্বপ্ন (Dream)—স্বপ্ন আমরা সবাই দেখি, কিন্তু স্বপ্ন তবুও এক অনির্বচনীয় অনুপম ঘটনা। নিদ্রাকালীন অচেতন অবস্থার ভিতর মধ্যে মধ্যে যেন চেতনার আলোক বিচ্ছুরিত হয়—আর সেই সময় আমরা কতকগুলি প্রতিরূপ 'প্রত্যক্ষ' করি ও তাহাদের বাস্তব বলিয়া গ্রহণ করি। ইহাকেই আমরা স্বপ্ন বলিয়া আখ্যা দিই।

স্বপ্ন লইয়া বহুবিধ মতবাদ প্রচলিত হইয়াছে।[১৪] কিন্তু ইহার স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত হয় নাই। স্বপ্ন-প্রতিরূপগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, সবগুলি একজাতীয় নহে—উহারা বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে:

(১) **কতকগুলি স্বপ্ন-প্রতিরূপ হইল স্মৃতি-প্রতিরূপ**। আমরা জাগ্রত অবস্থায় যে সকল কার্য করি, যে বিষয় লইয়া চিন্তা করি, সেই সকল বিষয় লইয়া নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখি। পরীক্ষার সময় জাগ্রত অবস্থায় পরীক্ষা-সংক্রান্ত বিবিধ বিষয় চিন্তা করার ফলে নিদ্রাবস্থায় ছাত্রছাত্রীরা ঐ বিষয় স্বপ্ন দেখে। জাগ্রত অবস্থায় ফুটবল খেলা দেখিয়া স্বপ্নাবস্থায় কে হয়ত' খেলা সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখিল, এমন কি 'গোল', 'গোল' বলিয়া চীৎকার পর্যন্ত করিয়া উঠিল।

১৩ McDougall, *Outline of Abnormal Psychology*, p. 214 দ্রষ্টব্য।

১৪ আমাদের দেশে জ্যোতিষশাস্ত্র স্বপ্নফলের তাৎপর্য লইয়া বহু রকম অনুমান করে এবং জনসাধারণও ঐ বিষয় নানা জল্পনা-কল্পনা করে।

(২) কিন্তু স্বপ্নাবস্থার সকল প্রতিরূপ স্মৃতি-প্রতিরূপ না হইতে পারে। কতকগুলি প্রতিরূপ থাকে সেগুলি হইল ভ্রান্ত প্রত্যক্ষজনিত অভিজ্ঞতা (illusory experience)-এর ফল। যেমন, এমন হইতে পারে যে. শীতের রাত্রে একজনের পা' হইতে লেপ সরিয়া গিয়াছে এবং পায়ে ঠাণ্ডা বাতাস লাগিতেছে —ইহার ফলে সে হয়ত' স্বপ্ন দেখিল যে, সে ঠাণ্ডা জলে সাঁতার কাটিয়া যাইতেছে। এখানে নিদ্রাবস্থায় বাতাসকে জল বলিয়া মনে হইল ; সুতরাং ইহাকে 'ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ' বলা যায়। হর্টন (Horton) মনে করেন যে, বাহনিয়ামক যন্ত্রের প্রতিক্রিয়া (vasomotor reaction)-জনিত সংবেদন এবং চেষ্টাবেদন (kinaesthetic sensation)-এর অপব্যাখ্যার ফলে স্বপ্নকালীন অবস্থায় নানারূপ প্রতিরূপের সৃষ্টি হয়। অনেক সময় ইহার ফলে কেহ কেহ দেহকে হাল্কা বোধ করে এবং উড়িবার স্বপ্ন দেখে।

(৩) আবার স্বপ্ন-প্রতিরূপসমূহের অনেকগুলিই স্মৃতি-প্রতিরূপও নহে, ভ্রান্তপ্রত্যক্ষও নহে—সেগুলি অমূলপ্রত্যক্ষ (hallucination)। অর্থাৎ, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার (নূতন বা পুরাতন) মধ্যে ইহাদের কোন কারণ পাওয়া যায় না। এইজন্য স্বপ্নের রহস্য যেন আরও বাড়িয়া যায়। প্রশ্ন উঠে : কেন এইরূপ অমূল প্রত্যক্ষের সৃষ্টি হয়? এই সমস্যার পূর্ণ মীমাংসা আজও হয় নাই।

স্বপ্নদৃষ্ট প্রতিরূপগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহারা অনেক সময়ই অত্যন্ত অসংবদ্ধ বা এলোমেলো থাকে এবং ইহাদের মধ্যে সংহতির একান্ত অভাব। যেহেতু স্বপ্নদৃষ্ট প্রতিরূপগুলি মন সজ্ঞানে ইচ্ছাপূর্বক সৃষ্টি করে না, সেইজন্য ইহাদের সাধারণতঃ নিশ্চেষ্ট কল্পনা (passive imagination)-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। স্বপ্নদৃষ্ট প্রতিরূপগুলিকে স্বপ্নকালীন অবস্থায় যদিও সত্য ঘটনা বা বস্তু বলিয়া মনে হয়, নিদ্রাভঙ্গের পর বাস্তবের সহিত তুলনায় উহাদের অসারত্ব বা অলীকত্ব প্রমাণিত হয়।

৬। স্বপ্ন সম্বন্ধে ফ্রয়েডীয় মতবাদ (Freud's Theory of Dreams) :

আধুনিক লেখদের মধ্যে স্বপ্ন সম্বন্ধে মনঃসমীক্ষণবাদী ফ্রয়েডের মতবাদকে নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী বলা চলে। ফ্রয়েডের মতবাদ স্বপ্নসম্বন্ধে প্রচলিত বিশ্বাস পরিহার করিয়া নূতন মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছে।

ফ্রয়েডের মতানুসারে **স্বপ্ন হইল অতৃপ্ত বাসনার পূরণ** (wish fulfilment)। সুতরাং **স্বপ্নের সময় মন নিষ্ক্রিয় থাকে না—স্বপ্ন-প্রতিরূপগুলি সাধারণতঃ মনের নির্জ্ঞানস্তর দ্বারা প্রেষিত** (motivated)। যখনই আমরা নিদ্রা যাই, তখনই আমরা স্বপ্ন দেখি—স্বপ্ন নিদ্রাবিঘ্নকারী নহে, বরং নিদ্রার সহায়ক।

অপূরিত বাসনাগুলি বিভিন্ন উপায়ে স্বপ্নের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে; সুতরাং স্বপ্নপ্রতিরূপগুলি বিভিন্ন প্রকারের হয়:

(ক) শিশুদের যে সকল বাসনা অপূর্ণ থাকে, সেইগুলি তাহারা অবদমন (repress) করে না। সুতরাং স্বপ্নের মাধ্যমে সোজাসুজি বা প্রকাশ্যভাবে (directly বা openly) ঐ বাসনাগুলি পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া তাহারা স্বপ্ন দেখে। যেমন, একজন শিশু অধিক রাত্রে হঠাৎ সন্দেশ খাইতে চাহিল—বাড়িতে সন্দেশ নাই, কিনিয়া আনিবারও সুবিধা নাই। তাহার মা তাহাকে মিষ্ট কথায় প্রথমে বুঝাইলেন; কিন্তু সে শান্ত হইল না। ফলে সে খুব তিরস্কৃত হইল এবং শেষ পর্যন্ত কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমের মধ্যে সে হয়ত' স্বপ্ন দেখিল যে, তাহার মাসীমা তাহাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছেন এবং তাঁহার হাতে আছে সন্দেশের একটি বড় বাক্স! এরূপ ক্ষেত্রে বলা যায় যে, শিশু তাহার ইচ্ছাকে অন্যায় মনে করে নাই—অতএব, উহাকে অবদমনের কোন প্রশ্ন উঠে না। আর সেইজন্য সে যাহা ইচ্ছা করিয়াছিল তাহাই পাইয়াছে বলিয়া স্বপ্ন দেখিল।

এই প্রকার 'ইচ্ছাপূরণ'-কে **'অনবদমিত বাসনার মুখ্য উপায়ে পূরণ'** (direct fulfilment of unrepressed wishes) বলা যায়।

(খ) মানুষ ক্রমশঃ বুঝিতে পারে যে, সমাজে তাহার সকল ইচ্ছা পূরিত হইবার নহে। সামাজিক অনুশাসনের ভয়ে ব্যক্তি-বিশেষ এইগুলিকে অবদমিত করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু বাসনাকে অবদমন করিলে বা চাপিয়া দিলেই সেগুলি মন হইতে বিদায় গ্রহণ করে না এবং মনের নির্জ্ঞানস্তর হইতে সেইগুলি মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। (পৃ: ৩৮৪-৮৯)।

পরিণতবয়স (adult life)-এর কতকগুলি বাসনা এইরূপ হইতে পারে যে, বাসনাগুলিকে অবদমিত করিলেও সেগুলি বিশেষ আত্মগোপন না করিয়াই নিজেদের স্বপ্নাবস্থায় প্রকাশিত করিয়া তৃপ্তির সন্ধান খুঁজে।

যেমন, ধরা যাউক্ একজন ব্যক্তি হয়ত' কোন কারণে ব্যাঙ্কে গেল। সেখানে অনেকগুলি তাড়াবাঁধা নোট দেখিল এবং তাহার লোভ হইল। কিন্তু সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় অনুশাসনের ফলে ঐগুলি আত্মসাৎ করিবার ইচ্ছা সে দমন করিল। পরে হয়ত' নিদ্রাবস্থায় সে স্বপ্ন দেখিল যে, তাহার এক ধনী আত্মীয় মারা গিয়াছেন এবং তিনি মৃত্যুকালে তাঁহাকে বহুটাকার সম্পত্তি 'উইল' করিয়া গিয়াছেন। এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি প্রচুর অর্থ পাইতে চাহিয়াছিল এবং স্বপ্নাবস্থায় অর্থপ্রাপ্তিরই স্বপ্ন দেখিল।

এই প্রকার ইচ্ছাপূরণকে বলা যায় **'অবদমিত ইচ্ছার সাক্ষাৎ বা মুখ্য উপায়ে পূরণ'** (direct fulfilment of repressed wishes)।

(গ) কিন্তু পরিণত বয়সের অধিকাংশ ইচ্ছাই এরূপ সামাজিক নীতি-বিরোধী যে, সেগুলিকে অবদমিত করিতে ত' হয়ই, আবার স্বপ্নের মাধ্যমে তাহাদের সাক্ষাৎ উপায়ে পূরণ করিবার চেষ্টা করিতেও মন যেন সাহস পায় না। কারণ অধিশাস্তা মনের প্রহরী (censor)-রূপে সর্বদাই সজাগ থাকে এবং নীতিবিরোধী বাসনাগুলি আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করিলে তাহাদের বাধা দেয় (পৃঃ ১১২)। এই অসুবিধা এড়াইবার জন্য মন তাহার নীতিবিরোধী বাসনাগুলিকে এমনভাবে গোপন করিয়া রাখে যে, তাহাদের সহজে বুঝা যায় না। এইজন্য স্বপ্নমাত্রেই দুইটি দিক্ আছে—একটি হইল ইহার **ব্যক্তরূপ** (**manifest content**), আর একটি **অব্যক্ত রূপ** (**latent content**)। যাহা 'ব্যক্তরূপ' তাহা যেন 'অদস্' (id) আর 'অধিশাস্তা' (super-ego) এই দুইয়ের দাবীর 'আপোষ-মীমাংসা' (compromise formulation)। সুতরাং এই ব্যক্তরূপ বুঝিয়া কখনও স্বপ্নের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝা যায় না—স্বপ্নের মাধ্যমে নির্জ্ঞান বাসনার স্বরূপ জানিতে হইলে উহার অব্যক্ত রূপটি বুঝিতে হইবে (পৃঃ ১১১)।

ফ্রয়েড্-প্রদত্ত একটি উদাহরণ লওয়া যাউক্। একবার এক অবিবাহিতা তরুণী স্বপ্ন দেখেন যে, তাহার এক ভগিনীর পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি তাঁহার ভগিনীপুত্রকে খুবই স্নেহ করিতেন, সুতরাং তাহার মৃত্যু কখনও তাঁহার কাম্য হইতে পারে না। ফ্রয়েড্ তাঁহার স্বপ্নবিশ্লেষণ করিয়া স্বপ্নের অব্যক্ত রূপ তথা প্রকৃত তাৎপর্য উদ্ঘাটন করেন। ইহার ফলে নিম্নলিখিত তথ্যটি প্রকাশ পায়: তরুণীটি এক যুবকের প্রতি প্রণয়াসক্তা ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের মিলনের পথে যথেষ্ট বাধা ছিল—এমন কি দেখাসাক্ষাৎ পর্যন্ত সাময়িকভাবে স্থগিত ছিল। তরুণীটি কয়েক বার ঐ যুবককে কেবলমাত্র দূর

হইতে দেখিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। পূর্বে ঐ তরুণীটির ভগ্নীর অপর এক পুত্রের মৃত্যু হইয়াছিল এবং তখন ঐ যুবক শোক জ্ঞাপন করিতে আসিয়াছিলেন। তরুণীটি আশা করিতেছিলেন (অবশ্য নির্জ্ঞানস্তরে) যে, এই ছেলেটির যদি মৃত্যু হয়, তাহা হইলে খুব সম্ভব ঐ যুবক সমবেদনা জানাইতে আসিবেন এবং তাঁহাকে দেখিবার আবার সুযোগ মিলিবে ![১৫]

এই স্বপ্নটির মাধ্যমে যে ইচ্ছাপূরণের চেষ্টা হইয়াছে, তাহাকে **'গৌণ বা পরোক্ষ উপায়ে অতৃপ্ত বাসনাকে পূরণ'** (indirect fulfilment of repressed wishes ') বলা যায়।

পরিণত বয়সের অবদমিত বাসনাগুলি স্বরূপতঃ কামজ (libidinous) এবং এইগুলির প্রকৃত উৎস নিহিত থাকে ঈডিপাস গূঢ়ৈষার স্তরে।

নির্জ্ঞানের বাসনা যখন আত্মপ্রকাশ করে, তখন নিজেদের স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখিবার জন্য উহারা কতকগুলি **'প্রতীক' (symbol)**-এর সাহায্য গ্রহণ করে। ফ্রয়েড বিভিন্ন প্রতীকের এক বিরাট্ তালিকা দিয়াছেন। 'রাজা-রাণী' পিতামাতার প্রতীক ; 'কুকুর', 'বিড়াল', 'ইঁদুর' ও অন্যান্য ইতর জীবেরা ছোট-ছোট ভাইবোনেদের প্রতীক ; 'সর্প', 'কলম' 'পেন্সিল' ইত্যাদি পুংত্বের প্রতীক ; 'জাহাজ', 'বাক্স' ইত্যাদি নারীত্বের প্রতীক।

'প্রতীক' (symbol)-এর সাহায্য গ্রহণ ব্যতীত অন্য উপায়েও প্রকৃত ইচ্ছাকে গোপন করিবার চেষ্টা করা হয়। **সংক্ষেপণ (condensation)** প্রক্রিয়া অব্যক্ত অংশের বিভিন্ন বাসনাকে সংমিশ্রিত করিয়া একটি সংক্ষিপ্ত আকার দেয় এবং তাহার ফলে ব্যক্ত অংশ অদ্ভুত বলিয়া প্রতীত হয়। **অভিক্রান্তি (displacement)**-প্রক্রিয়ার ফলে যেটি অব্যক্ত অংশের প্রধান বিষয় সেটির উপর গুরুত্ব আরোপ না করিয়া একটি অপ্রধান বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং ঐভাবে উহা ব্যক্ত হয়। ফলে ব্যক্ত অংশে প্রকৃত ইচ্ছা সহজে ধরা পড়ে না। আবার স্বপ্ন-প্রতিরূপগুলি **নাটকীয় ভঙ্গিমায় (dramatization** দ্বারা) নিজেদের প্রকাশ করে ; সেইজন্য ইহারা সাধারণতঃ অসংবদ্ধ, অসংযত অবস্থায় থাকে এবং ইহাদের তাৎপর্য নির্ধারণ দুরূহ হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া, এই প্রতিরূপগুলি সম্বন্ধে স্বপ্নদ্রষ্টা যতই সচেতন হইয়া উঠে, ততই সে উহাদের সুসংবদ্ধ উপায়ে সম্প্রসারিত বা বিস্তারিত

১৫ Freud, *Interpretation of Dreams*, p. 129 দ্রষ্টব্য।

করিতে থাকে—ইহাকে বলে **'গৌণ সম্প্রসারণ'** (**secondary elaboration**); কিন্তু ইহার ফলে ব্যক্ত-অংশ অব্যক্ত-অংশের প্রকৃত তাৎপর্য হইতে যেন অনেক দূরে সরিয়া যায়। কুশলী মনঃসমীক্ষণবিৎ এই সব প্রক্রিয়া দ্বারা সৃষ্ট তমসা ভেদ করিয়া স্বপ্নের প্রকৃত অর্থ বাহির করিবার চেষ্টা করেন।

ফ্রয়েডীয় স্বপ্নতত্ত্ব আধুনিক চিন্তাজগতে এক বিরাট্ আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার মূল প্রত্যয়গুলি সর্ববাদিসম্মত নহে, এ কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। পরিণত বয়সের সকল স্বপ্নের মূলে যে কাম আছে এবং সেই সকল কামজ বাসনা যে ঈডিপাস স্তরের বাসনার সহিত যুক্ত, এই মত সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে।[১৬] অনেক স্থলে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যাকে কষ্টকল্পনা-প্রসূত বলিয়া মনে হয়। আমরা সংক্ষেপে এই মন্তব্য করিতে পারি যে, পরিণত বয়সের কতকগুলি স্বপ্নের মূলে অতৃপ্ত যৌন বাসনা থাকে; কিন্তু সকল সময় সকল স্বপ্ন যে যৌন বাসনা দ্বারা প্রেষিত তাহা মনে হয় না[১৭]।

পরিশেষে প্রশ্ন উঠিতে পারে: স্বপ্নের কি কোন মূল্য আছে? সাধারণ লৌকিক বিশ্বাস আছে যে, স্বপ্ন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত করে, স্বপ্নের মাধ্যমে দেবতার প্রত্যাদেশ ঘটে ইত্যাদি। আমরা সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা না করিয়া আধুনিক মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে এইটুকু মাত্র বলিলে পারি যে, স্বপ্নের মাধ্যমে যদি ব্যক্তিবিশেষের বাসনাগুলি পরোক্ষভাবেও আত্মপ্রকাশ করে, তাহা হইলে স্বপ্নদর্শনের ফলে বাসনার গুরুভার কিছু পরিমাণ কমিয়া যায়। তাহা ছাড়া, স্বপ্নবিশ্লেষণ করিয়া ব্যক্তিবিশেষের নির্জ্ঞান সম্বন্ধে আভাস পাওয়া যায় এবং তাহার ফলে তাহার ব্যক্তিত্বের স্বরূপ জানার সুবিধা হয়। আবার এইভাবে অস্বভাবী (abnormal) ব্যক্তির মনোরোগ চিকিৎসারও সুবিধা হয়।

১৬ মনোবিৎ য়ুঙ্ (Jung) ফ্রয়েডীয় দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন না। তিনি মনে করেন যে, স্বপ্নবিশ্লেষণ করিয়া ব্যক্তি-বিশেষের জীবনে সুদূর অতীতে কিভাবে বাসনার দ্বন্দ্ব ঘটিয়াছিল এবং কোন্ কোন্ বাসনা অপূরিত ছিল, তাহা অপেক্ষা ব্যক্তি-বিশেষ বর্তমানে কি কি সমস্যায় সম্মুখীন হইয়াছে তাহা জানা যায়। তাহা ছাড়া, য়ুঙ্ 'নির্জ্ঞান' ও 'কাম' পদের ব্যাপকতর সংজ্ঞা দান করেন—'নির্জ্ঞান' বলিলে তিনি 'ব্যক্তিগত নির্জ্ঞান' ব্যতীত 'জাতিগত নির্জ্ঞান' এবং 'কাম' বলিতে কোন যৌন কামনা না বলিয়া যে-কোন 'জৈব শক্তি' বুঝেন। এইজন্য তিনি স্বপ্নবিশ্লেষণের সময় জাতীয় ঐতিহ্য কাহিনী ইত্যাদির অনুসন্ধানের প্রয়োজন বোধ করেন এবং স্বপ্নদৃষ্ট প্রতিরূপগুলি সকল সময়ই যৌন কামনার প্রতীক বলিয়া মনে করেন না।

১৭ তুলনীয়: "...Freud's formula for the interpretation of dreams may be true of some dreams...and sometimes sexual organs and functions may be symbolised in a dream; but there is no sufficient ground for trying to *force* the interpretation of every dream to fit the formula." (McDougall, *Outline of Abnormal Psychology*, pp. 186-87).

দ্বাবিংশ অধ্যায়

বিশ্বাস

আমাদের দেশের অনেক ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিবার দিন সকালে রসগোল্লা খাইতে চাহে না; যেহেতু রসগোল্লার গোলাকৃতির সহিত 'শূন্য'-এর গোলাকৃতির মিল আছে, সেইহেতু তাহাদের বিশ্বাস যে রসগোল্লা খাইলে পরীক্ষার খাতায় তাহারা শূন্য পাইবে! এ বিশ্বাসের মূলে তথাকথিত যুক্তির অসারতা তাহারা বুঝিতে পারে, তথাপি তাহাদের বিশ্বাস দূর হইতে চাহে না। অবশ্য বিশ্বাস মাত্রই যে অসার হইবে তাহা নহে, বিশ্বাস বাস্তব ও অবাস্তব উভয় সম্বন্ধেই থাকিতে পারে। বিশ্বাসের মূল বা উৎস যেরূপই হউক না কেন, ইহা আমাদের কর্মে প্রবৃত্ত করে এবং বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে সহায়তা করে।

১। বিশ্বাসের স্বরূপ (Nature of Belief):

আমাদের প্রত্যেকেরই জীবন বহুবিধ বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত; অথচ বিশ্বাসের স্বরূপ কী তাহা যথাযথভাবে বর্ণনা করা দুরূহ।

বিশ্বাস বলিতে বুঝায় কোন কিছুর যাথার্থ্য বা বাস্তবতা সম্বন্ধে ধারণা; এই ধারণা তর্কশাস্ত্রসম্মত উপায়ে প্রমাণিত না হইতে পারে, কিন্তু অনুভূতির ন্যায় কেমন যেন স্বতঃই ইহা উৎপন্ন হয়[১]। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন কিছু বিশ্বাস করে, যে কোন প্রকারেই হউক তাহার এই ধারণা জন্মিয়াছে যে বিশ্বাসের বিষয়বস্তু যথার্থ। যে বস্তুর বাস্তবতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ আছে, সে সম্বন্ধে বিশ্বাস জন্মে না।

বিশ্বাসের মধ্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি বিদ্যমান:

(ক) বিশ্বাসের মধ্যে কতকগুলি নির্দিষ্ট ধারণা বিদ্যমান। যাহা বিশ্বাস করা যায়, তাহা কী সে সম্বন্ধে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট যে-কোন রূপ ধারণা

১ James-এর ভাষায় "Belief, *the sense of reality*, feels like itself—that is about as much as we can say." (*Principles of Psychology*, Vol. II, p. 286).

থাকে। যেমন, যে ভূত-প্রেত ইত্যাদিতে বিশ্বাস করে, তাহার ঐ সম্বন্ধে কতকগুলি ধারণা জন্মিয়াছে। সেইরূপ, যে ভগবানে বিশ্বাস করে, তাহার ভগবান্ সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু ধারণা আছে।

(২) বিশ্বাসমাত্রই কিছু না কিছু অনুভূতির সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে। বিশ্বাসের মধ্যে একদিকে থাকে একটা 'বাধ্যবাধকতার ভাব' (feeling of compulsion), আর একদিকে থাকে একটা 'স্বস্তির ভাব' (feeling of relief)। বিশ্বাসের মধ্যে বাধ্যবাধকতার ভাব থাকে—এইজন্য আমরা যাহা খুশী বিশ্বাস করিতে পারি না; কিন্তু কল্পনায় আমাদের ঐরূপ স্বাধীনতা থাকে (যদিও কল্পনার বিভিন্ন উপাদানগুলির জন্য আমাদের পুরাতন অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিতে হয়)। যেমন, আমার সম্মুখে ঘট নাই—ঐরূপ ঘটের অস্তিত্ব আমি কল্পনা করিতে পারি; কিন্তু ইচ্ছা করিলেই আমার সম্মুখে উহার অস্তিত্ব বিশ্বাস করিতে পারি না। আমাদের বিশ্বাসমাত্রেরই পশ্চাতে কোন কিছুর বাস্তবতা সম্বন্ধে ধারণা থাকে এবং এই ধারণা বিশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করে[২]।

আবার, বিশ্বাসের মধ্যে একটা 'স্বস্তির ভাব' বা 'নিশ্চিন্ত হওয়ার ভাব' থাকে। যেমন, যখন কোন কিছু সম্বন্ধে সন্দেহ (doubt) থাকে এবং ঐ বিষয় কিছু স্থির করা যায় না, তখন মনোমধ্যে অস্বস্তির ভাব থাকে; কিন্তু যখন ঐ সন্দেহ দূর হয় এবং কোন কিছুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস জন্মে, তখন একটা স্বস্তির ভাব (feeling of relief) আসে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে; যদি বিশ্বাসের ফলে কোন অশান্তিকর বা দুঃখজনক বিষয়ে বিশ্বাস জন্মে, তাহা হইলে ঐ স্বস্তির ভাব চাপা পড়িয়া যায়। যেমন, পরীক্ষা দিবার পর একজন ছাত্র উত্তীর্ণ হইবে, কি অনুত্তীর্ণ হইবে, সেই বিষয়ে সে অনিশ্চয়তার মধ্যে আছে। কিন্তু পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইতে দেখা গেল যে, সে অনুত্তীর্ণ হইয়াছে—এখানে অনিশ্চয়তা-জনিত অস্বস্তি দূর হইলেও কোন স্বস্তি বা শান্তির ভাব আসিল না। ইহার কারণ

২ তুলনীয়: "All belief involves objective control of subjective activity." (Stout, *Manual of Psychology*, p. 601).

অনেক সময় আমাদের কোন কিছু নষ্ট হইলে (যেমন, টাকা চুরি যাইলে), বন্ধুবান্ধবেরা সান্ত্বনার সুরে বলিয়া থাকে, "মনে কর ঐ টাকা তুমি কোন সৎকার্যে ব্যয় করিয়াছ"—কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা জানি যে, ঐরূপ "মনে করা" বা বিশ্বাস করা ইচ্ছা করিলেই সম্ভব হয় না।

এই যে অনিশ্চয়তা দূর হইতে না হইতেই অকৃতকার্যতা-জনিত দুঃখানুভূতি আসিয়া বিশ্বাস-জনিত স্বস্তির ভাবের প্রকাশকে রুদ্ধ করিয়া দিল।

(৩) বিশ্বাসের তীব্রতার পরিমাণের তারতম্য ঘটিতে পারে। বিশ্বাস যত সুদৃঢ় হয়, ততই আমরা ঐ বিশ্বাসের ভিত্তিতে নিশ্চিন্ত হইয়া কার্য করিতে পারি।

দৈনন্দিন জীবনে প্রতি মুহূর্তেই বিশ্বাসের ভিত্তিতে আমরা কাজ করিয়া থাকি; যেমন, জল পান করিলে তৃষ্ণা যাইবে, বৈদ্যুতিক আলোর বোতাম টিপিলে আলো জ্বলিবে, আকাশে লাল রঙের মেঘ দেখা দিলে ঝড় উঠিবে, ঔষধ সেবন করিলে রোগ নিরাময় হইবে, আমাদের বন্ধু আমাদিগকে প্রতারণা করিবে না ইত্যাদি বহুবিধ বিশ্বাস অনুসারে আমরা প্রতিনিয়তই কার্য করি।

অনেক সময় বদ্ধমূল বিশ্বাসের বশে আমরা ভয়ঙ্কর কোন কার্যও করিয়া ফেলি (যেমন, ব্যক্তি-বিশেষ নিজেকে অপরাধী বিশ্বাস করিয়া আত্মহত্যা করিয়া বসিল অথবা নিজের জিহ্বা কর্তন করিয়া ফেলিল এরূপ সংবাদ আমরা মধ্যে মধ্যে পাই)।

কতকগুলি বিশ্বাস আবার আমাদের জীবনাদর্শ (ideals and ideologies) গঠনে সাহায্য করে এবং তদনুযায়ী আমরা আমাদের জীবনকে পরিচালিত করি। যেখানে সুদৃঢ় বিশ্বাসের অভাব সেখানে সংহতিপূর্ণভাবে কার্যচালনার অসুবিধা[৩]।

২। বিশ্বাস, প্রতিন্যাস, জ্ঞান, বিচার ও অবিশ্বাস (Belief, Attitude, Knowledge, Judgment & Disbelief):

বিশ্বাসের স্বরূপ বুঝিবার জন্য ইহাকে প্রতিন্যাস (attitude), জ্ঞান (knowledge), বিচার (judgment) ও অবিশ্বাস (disbelief) হইতে পার্থক্য করা প্রয়োজন।

(ক) বিশ্বাস ও প্রতিন্যাস—

বিশ্বাসের মূলে আছে বাহ্যজগতের কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে কতকগুলি নির্দিষ্ট ধারণা। প্রতিন্যাসের মধ্যে বিশেষ কোন মনোভাবের পরিচয়

৩ অবশ্য সাধারণ লোকের সকল সময় যে কোন সুদৃঢ় জীবনাদর্শ গড়িয়া উঠে তাহা নহে—তাহাদের বিবিধ বিশ্বাসের মধ্যে সঙ্গতি অপেক্ষা অসঙ্গতিরই প্রাধান্য।

স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় এবং উহার মধ্যে ভাবাবেগ (emotion) এবং প্রতিক্রিয়ামুখিতা (reactive tendency)-র সমধিক প্রকাশ থাকে। অর্থাৎ বিশ্বাসের ফলে আমরা বাহ্যজগতের কোন কিছুর উপর যে অর্থ (meaning) আরোপ করি, তাহা হইতেই ঐ বস্তুর প্রতি একটি বিশেষ প্রতিন্যাস দেখা দেয়। এইজন্য আমরা বিশ্বাসকে প্রতিন্যাসের পূর্ববর্তী পর্যায় বলিতে পারি। আবার কোন কিছুতে বিশ্বাস থাকিলেই যে ঐ বিষয়ে কোন বিশেষ প্রতিন্যাস গড়িয়া উঠিবে এমন কোন অর্থ নাই। যেমন, এ্যাটম্ বোমার অস্তিত্বে আমরা সবাই বিশ্বাস করি, কিন্তু ঐ বিষয় সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই যে কোন প্রতিন্যাস গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা নহে—এমন অনেকে আছেন যাঁহারা ঐ বিষয় নির্বিকার বা উদাসীন[৪]।

(খ) বিশ্বাস ও জ্ঞান—

জ্ঞান বলিতে আমরা বুঝি এমন কতকগুলি ধারণা (ideas) যাহার যাথার্থ্য ব্যক্তি-বিশেষ প্রমাণিত (verified) হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করে।[৫] সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যেখানে জ্ঞান আছে, সেখানে বিশ্বাস আছে; কিন্তু যে বিষয় বিশ্বাস আছে, সে বিষয় জ্ঞান নাও থাকিতে পারে।[৬] যেমন, জড়দ্রব্যকে যদি ধরিয়া রাখিবার কিছু না থাকে, তাহা হইলে উহা পড়িয়া যাইবে—এ বিষয়ে ব্যক্তি-বিশেষের জ্ঞান জন্মাইয়াছে বলা যায়। সেইরূপ, প্রমাণ-মাধ্যমে জ্যামিতির ছাত্রের জ্ঞান জন্মাইয়াছে যে, ত্রিভুজের তিনটি কোণের যোগফল হইবে দুই সমকোণ। এ সকল জ্ঞানের সহিত বিশ্বাস জড়িত আছে। কিন্তু এমন অনেক বিষয় আছে যাহাদের সম্বন্ধে বিশ্বাস আছে, কিন্তু উহা প্রমাণিত হয় নাই বলিয়া উহা জ্ঞানের পর্যায়ে উঠে নাই। যেমন, অনেক সময় কোন ব্যক্তিকে দেখিয়াই বিশ্বাস হইতে পারে যে, সে কোন একটি বিশেষ কার্যসাধনে সক্ষম—এ বিশ্বাসের সপক্ষে হয়ত' যুক্তি দেখান যায় না, কিন্তু বিশ্বাস আছে। বিবিধ কুসংস্কারে আমাদের বিশ্বাস

৪ Krech & Crutchfield, *Theory and Problems of Social Psychology*, Ch. V, দ্রষ্টব্য।

৫ বলা বাহুল্য সাধারণ লোকে যাহাকে উপযুক্ত বা পর্যাপ্ত প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে তাহা পর্যাপ্ত নাও হইতে পারে।

৬ এইজন্য বলা হয়: "All knowledge is belief, but all belief is not knowledge."

থাকিতে পারে, কিন্তু উহাদের যাথার্থ্য সম্বন্ধে জ্ঞান নাই। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, জ্ঞানের দ্বারা কোন নূতন বিশ্বাস জন্মাইতে পারে, অথবা কোন পুরাতন বিশ্বাস দূরীভূত হইতে পারে। কোন পুরাতন বিশ্বাস নূতন জ্ঞানের আলোকে দূর হইবে কি না, তাহা অনেকাংশে নির্ভর করে বিশ্বাসের দৃঢ়তার উপর ; যেমন, জ্ঞানের উদয় হওয়া সত্ত্বেও কুসংস্কারে বিশ্বাস যাইতে চাহে না।

(গ) বিশ্বাস ও বিচার—

বিশ্বাস ও বিচার পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। আমরা কোন বিষয়ে যেরূপ বিশ্বাস করি ও যেভাবে আমাদের প্রতিন্যাস গড়িয়া উঠে, তাহা ঐ বিষয় আমাদের বিচারকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে ; অল্পসংখ্যক লোকই সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে (অর্থাৎ ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও প্রতিন্যাস হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইয়া) বিচার করিতে পারে। যেমন, যদি কেহ বিশ্বাস করে যে, ব্যবসায়ী মাত্রই ব্যক্তিগত স্বার্থদ্বারা পরিচালিত হয়, তখন সেই ব্যক্তি যে-কোন ব্যবসায়ীর যে-কোন কার্যকে যখন বিচার করিবে, তাহাতেই স্বার্থের গন্ধ পাইবে। অপরপক্ষে, যখন কোন ব্যক্তি কোন বিষয় বিচার-বিবেচনাপূর্বক কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তখন সে ঐ বিষয়ের যাথার্থ্য সম্বন্ধে বিশ্বাস করে ; অথবা পূর্বের বিশ্বাস পরিবর্তন করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এক দিক্ হইতে বিশ্বাস বিচারকে এক বিশেষ রূপ দেয় এবং অপর দিক্ হইতে বিচার বিশ্বাস ও প্রতিন্যাস গঠনে বা পরিবর্তনে সহায়তা করে।

(ঘ) বিশ্বাস ও অবিশ্বাস—

'অবিশ্বাস' বিশ্বাসের বিপরীত নহে। বিশ্বাসের বিপরীত হইল 'সন্দেহ' (doubt)। কোন একটি বিষয় কাহারও অবিশ্বাস আছে, ইহার অর্থ হইল যে, উহার বিপরীত বিষয় তাহার বিশ্বাস আছে। যেমন, আমি যদি কাহারও সাধুতায় অবিশ্বাসী হই, তাহা হইলে উহার অর্থ হইবে যে, আমি ঐ ব্যক্তির অসাধুতায় বিশ্বাসী। সেইরূপে যে নাস্তিক বা ভগবানের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী, সে ভগবানের অনস্তিত্বে এবং সম্ভবতঃ জড়াণুর স্বয়ং-সম্পূর্ণতায় বিশ্বাসী। কিন্তু যদি এমন হয় যে, কোন বিষয় সম্বন্ধে কোন্‌টি যথার্থ, কোন্‌টি অযথার্থ ঠিক করা যাইতেছে না, তাহা হইলে উহা হইবে সন্দেহের

অবস্থা। যেমন, রাত্রিবেলায় হলুদ রঙের উজ্জ্বল ধাতু দেখিয়া যদি কেহ স্থির করিতে না পারে যে উহা স্বর্ণ কিংবা স্বর্ণ নহে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির মন সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমান বলা যায়। কিন্তু যদি সে স্থির করিতে পারে যে, উহা স্বর্ণ, তাহা হইলে সন্দেহ দূর হইবে এবং ঐ ধাতুর স্বর্ণত্বে বিশ্বাস জন্মাইবে।

৩। **বিশ্বাসের কারণ (Grounds of Belief) :**

বিবিধ কারণে বিবিধ ক্ষেত্রে বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। আমরা এখানে সংক্ষেপে বিশ্বাসের কয়েকটি প্রধান প্রধান কারণ উল্লেখ করিব :

(১) **প্রত্যক্ষ**—আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করি, তাহা আমরা বিশ্বাস করি। যে জিনিষ আমরা চক্ষু দ্বারা দেখিতেছি, বা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিতেছি বা বা যাহার ঘ্রাণ গ্রহণ করিতেছি বা যাহাকে আস্বাদ করিতেছি বা যাহার শব্দ শুনিতেছি, তাহার অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাস করি। আমাদের প্রত্যক্ষের ভিতর ভ্রান্তি থাকিতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ আমরা সে সম্ভাবনার কথা চিন্তা না করিয়াই যাহা প্রত্যক্ষগোচর হইতেছে তাহাতে বিশ্বাস করি। প্রত্যক্ষ-গোচর বিষয়বস্তুর প্রতি আমাদের অগাধ বিশ্বাস।[৭] আমরা অনেক সময় অপরের সহিত বিবাদ বা ঝগড়া করিবার সময় বলি, "কী ! আমি এটা নিজের চোখে দেখেছি বা নিজের কাণে শুনেছি। আমি কী করে এটা অবিশ্বাস করব ?"

(২) **স্মৃতি**—আমরা নিজেদের স্মৃতি প্রতিরূপগুলির যাথার্থ্যেতে যথেষ্ট আস্থাবান্। যখন আমরা স্মৃতির সাহায্যে কোন কিছু পুনরুজ্জীবিত করিয়াছি বলিয়া মনে করি, তখন উহাতে যথেষ্ট বিশ্বাস স্থাপন করি। এক্ষেত্রেও স্মৃতিবিভ্রান্তির সম্ভাবনার কথা আমরা সাধারণতঃ চিন্তা করি না। অপরের সহিত কোন বিষয় বিতর্কের সময় আমরা বলিয়া থাকি, "আমার ওমুক জিনিষ স্পষ্ট মনে পড়ছে ; আমি বিশ্বাস না করে কি করব ?"

(৩) **অনুমান**—আমরা যাহা সঠিকভাবে অনুমান করিয়াছি বলিয়া মনে করি, তাহা আমরা বিশ্বাস করি। যেমন, দূর হইতে আমরা যদি দেখি যে কোন বাড়ীর ভিতর হইতে খুব বেশী ধূঁয়া উঠিতেছে, তাহা হইলে

৭ এইজন্য দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে বাস্তববাদ (Realism) লোকে যত সহজে গ্রহণ করে, ভাববাদ (Idealism) তত সহজে গ্রহণ করে না।

অনুমানের ভিত্তিতে বিশ্বাস করি যে, সেখানে আগুন লাগিয়াছে এবং এই বিশ্বাস অনুযায়ী কার্য করি (যেমন, জলের বাল্‌তি লইয়া দৌড়াইয়া যাই, দমকলের ব্যবস্থা থাকিলে সেখানে খবর পাঠাই ইত্যাদি)।

(৪) **অভিভাবন** (suggestion [৮])—যদি অপর লোকে কোন বিষয় আমাদের নিকট বার বার বলিতে থাকে বা আকারে ইঙ্গিতে বা কার্যে বার বার ঐ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিতে থাকে, তাহা হইলে ঐ বিষয়ের যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস জন্মাইতে পারে। এমন কি মিথ্যা বা অবাস্তব বিষয় যদি সুকৌশলে প্রচার (propaganda) করা যায়, তাহা হইলেও অভিভাবনের ফলে বিশ্বাস উৎপন্ন হইতে পারে। রামবাবু হয়ত' একজন নিরীহ ভদ্রলোক; কিন্তু তাঁহার কর্মস্থলে তাঁহার কয়েকজন স্বার্থান্বেষী সহকর্মী হয়ত' তাঁহার বিরুদ্ধে নানা কথা বলিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং শেষ পর্যন্ত হয়ত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করিলেন যে, রামবাবু সত্যই একজন অকর্মণ্য, অসাধু লোক ![৯]

(৫) **অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ** (Inseparable association)—যদি আমরা দুই বা ততোধিক ঘটনা, বস্তু বা গুণ একই সঙ্গে বহুবার দেখি, তাহা হইলে উহাদের ভিতর একটা অনুষঙ্গের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং উহা হয়ত' এত দৃঢ়ভাবে মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে যে উহার বিপরীত কল্পনা করা যায় না। শ্যামদেশের এক রাজার সম্বন্ধে গল্প আছে যে, তিনি কখনও বরফ দেখেন নাই, অর্থাৎ তিনি সর্বদাই জল এবং তারল্য একই সঙ্গে দেখার ফলে তাঁহার মনে জলত্ব ও তারল্যের এক অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হয়; ফলে, জল যে জমাট বাঁধিয়া বরফ হইতে পারে ইহা তিনি বিশ্বাস করিতে চাহেন নাই। সেইরূপ, আমরা 'আল্‌কাতরা'কে একপ্রকার কালো দুর্গন্ধযুক্ত চট্‌চটে দ্রব্য বলিয়াই জানি—সুতরাং তাহা হইতে পরিশোধিত করিয়া যে মিষ্ট বড়ি

---

৮ Suggestion বলিতে বুঝায় : "a mental process which results in the uncritical acceptance, and realization, in act or belief, of ideas arising in the mind, as the effect of the words or acts of another person, or other persons." (Drever's *Dictionary*).

৯ এইজন্য প্রবাদবাক্য হইয়াছে : "দশচক্রে ভগবান্‌ ভূত।"

(যাহাকে saccharin বলে) হইতে পারে, তাহা আমরা সহজে বিশ্বাস করি না। আবার যাহাকে আমরা অসৎ লোক বলিয়া জানি, সে যদি হঠাৎ সৎ প্রস্তাব করে, বা মন্দ কাজকে নিন্দা করে, তাহা হইলে উহা আমরা সহজে বিশ্বাস করি না এবং 'ভূতের মুখে রাম নাম'-এর মতন শুনায়। মোট কথা, আমরা সচরাচর যাহাদের একত্রে অনুষঙ্গবদ্ধ বলিয়া জানি বা দেখি, তাহাদের বিপরীত কোন কিছু মন সহজে বিশ্বাস করে না।

(৬) **অনুভূতি ও আবেগ**—অনেক ক্ষেত্রে বিবিধ অনুভূতি ও আবেগ বিভিন্ন বিষয় নানারূপ বিশ্বাসের সৃষ্টি করে। প্রেম, ভক্তি, স্নেহ, ক্রোধ, ভয় ইত্যাদি আবেগের প্রভাবে আমরা সহজেই কোন কিছুর অনুকূলে বা প্রতিকূলে কিছু বিশ্বাস করি। যেমন, কেহ কেহ গুরুভক্তির আধিক্যে গুরু যাহাই বলেন তাহাই নির্বিচারে বিশ্বাস করে—গুরু যে একজন মানুষ, তাঁহারও যে ভুলভ্রান্তি হইতে পারে, এ কথা মনে আসে না। সেইরূপ স্নেহান্ধ মাতা বিশ্বাস করেন না যে, তাঁহার পুত্র বা তাঁহার কন্যা কোন কিছু অন্যায় করিতে পারে। আবার ক্রোধের বশে আমরা যাহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছি, সে যে মন্দ করিয়াছে, তাহা বিশ্বাস করি; কিন্তু সে যে ভাল করিতে পারে, তাহা বিশ্বাস করি না। আবার ভয় বা আতঙ্কের প্রভাবে আমরা অতি সাধারণ বা তুচ্ছ ঘটনাকেও আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া মনে করি বা বিশ্বাস করি।

(৭) **ইচ্ছা বা সঙ্কল্প**—আমরা যাহা ইচ্ছা করি, তাহা সত্য বা সেইরূপ ঘটিবে বা ঘটিয়াছে ইহা আমরা বিশ্বাস করি। পরীক্ষার পূর্বে অনেক ছাত্রছাত্রী ইচ্ছা করে যে, পরীক্ষার দিন পিছাইয়া যাউক্; সেইজন্য সামান্য উত্তেজনাকর কোন ঘটনা সহরে ঘটিলেই তাহারা বিশ্বাস করে যে, পরীক্ষা আরম্ভের দিন নিশ্চয়ই পিছাইয়া যাইবে। আবার কেহ কোন কার্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলে ঐ কার্যসাধনের পথে যত বাধা আছে তাহা দূরীভূত হইবেই এইরূপ বিশ্বাস সে করে।

(৮) **শিক্ষণ ও প্রাক্তন অভিজ্ঞতা**—আমরা শিক্ষণের ফলে পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিশ্বাস করি যে, অমুক কার্যটি করিলে অমুক ফল হইবে; যেমন, মোটর গাড়ী চালনা যে শিক্ষা করিয়াছে সে বিশ্বাস করে যে, যদি

কোন যান্ত্রিক গোলযোগ না থাকে, তাহা হইলে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় গাড়ীটি বিশেষ বিশেষ ভাবে চলিবে। সেইরূপ একব্যক্তি পূর্বে অনেকবার ভদ্র আচরণ করিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস হইতে পারে যে, ভবিষ্যতেও তাহার নিকট অনুরূপ ব্যবহার পাওয়া যাইবে।

(৯) **সামাজিক পরিবেশের প্রভাব**—আমরা যে সমাজে বাস করি, সেই সমাজে যে সকল আদর্শ, সংস্কার, ধারণা ইত্যাদি প্রচলিত থাকে, তাহা আমাদের বিশ্বাসকে প্রভাবিত করে। যেমন আমাদের বাঙ্গালী সমাজে কতকগুলি সামাজিক রীতিনীতি, আদর্শ ইত্যাদি চলিত আছে—সেইগুলি আমরা সামাজিক শিক্ষার প্রভাবে সহজেই বিশ্বাস করি ও তাহাদের যৌক্তিকতা থাকুক্ বা নাই থাকুক্ অনেক সময় উহাদের আমরা গ্রহণ করি। কেবল বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশ নহে, ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠীর প্রভাবও আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না—সেইজন্য যে পরিবারে আমাদের জন্ম, যে বিদ্যায়তনে আমাদের শিক্ষা, যে সকল বন্ধুবান্ধবের দলে আমরা মিশি, তাহাদের সকলেরই বিবিধ আদর্শ, সংস্কার ইত্যাদি আমাদের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

৪। বিশ্বাসের প্রকারভেদ (Kinds of Belief) :

বিশ্বাসের উৎপত্তির কারণের তারতম্য অনুসারে বিশ্বাসের প্রকারভেদ ঘটিতে পারে :

(১) সরল বিশ্বাস (Pristine confidence)—ইহা সাধারণতঃ আবেগ, অনুভূতি ইত্যাদির দ্বারা নির্ধারিত হয়। শিশুর বিশ্বাস, ধর্মান্ধ ব্যক্তির বিশ্বাস, ভক্তের বিশ্বাস ইত্যাদি এই গোষ্ঠীভুক্ত। ইহাতে নিরপেক্ষ যুক্তির স্থান নাই।

(২) সাধারণ দ্বিধাহীন বিশ্বাস (Unquestioning credence)—যাহা আমরা প্রত্যক্ষ করি বা যাহা যেভাবে জানিতে আমরা অভ্যস্ত হইয়াছি, সেই সকল বিষয় কোনরূপ অনুসন্ধান না করিয়া আমরা বিনা দ্বিধায় বা নিঃসঙ্কোচে বিশ্বাস করি।

(৩) অভিজ্ঞতাজনিত বিশ্বাস (Practical certainty)—যে যে-বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছে, সেই বিষয়ে সে যাহা সিদ্ধান্ত করে তাহা

সহজেই বিশ্বাস করে। যেমন, অভিজ্ঞ চিকিৎসক কোন রোগীর কয়েকটি লক্ষণ দেখিয়াই সিদ্ধান্ত করেন যে, সে অমুক রোগে আক্রান্ত হইয়াছে এবং ঐ সিদ্ধান্ত তিনি বিশ্বাস করেন।

(৪) যৌক্তিক বিশ্বাস (Rational belief)—আলোচ্য বিষয়ের ভালমন্দ বিচার-বিবেচনা করিয়া যুক্তিতর্কের সাহায্যে এই প্রকার বিশ্বাসে উপনীত হওয়া যায়।

অবশ্য সকল সময়ই যে আমাদের প্রত্যেক বিশ্বাসকে নির্দিষ্ট শ্রেণীভুক্ত করা যায়, তাহা নহে। অনেক সময়ই আবেগ, অভিজ্ঞতা, যুক্তি ইত্যাদি মিলিতভাবে বিশ্বাসের সৃষ্টি করে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

চিন্তন

আরিষ্টটলের যুগ হইতে মানুষের সংজ্ঞা দেওয়া যাইতেছে যে, সে যুক্তিশক্তিসম্পন্ন বা চিন্তাশীল প্রাণী। মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে এই সংজ্ঞা সম্পূর্ণ না হইতে পারে, কিন্তু চিন্তার আলোচনা ব্যতীত মানুষের মনের আলোচনা সম্পূর্ণ হইতে পারে না। চিন্তন ব্যতীত মানুষের মনের কৃষ্টি সম্ভব হয় না, সে কোন উচ্চতর বিষয়ের আলোচনা করিতে সক্ষম হয় না, কোন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করিতে পারে না, বিবিধ বস্তুর পারস্পরিক সম্বন্ধ বুঝিতে পারে না। মোট কথা, মানুষের সকল কার্যের মধ্যেই অল্পবিস্তর চিন্তনের পরিচয় পাওয়া যায়।

১। চিন্তনের স্বরূপ (Nature of Thinking):

যদিও আমরা সকলেই অল্পবিস্তর চিন্তা করি, তাহা হইলেও চিন্তনের যথাযথ স্বরূপ বর্ণন করা দুরূহ। 'চিন্তন' পদটি ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিলে প্রত্যক্ষ, স্মৃতি, কল্পনা, বিশ্বাস, অনুমান ইত্যাদি সকল প্রক্রিয়াকেই বুঝায়; যেমন, কেহ বলিতে পারে, "কবে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ঠিক মনে পড়ছে না; দাঁড়াও চিন্তা করে দেখি"—এখানে 'চিন্তা' অর্থে 'স্মরণ করা'। আবার, কোন চিত্রশিল্পী বলিতে পারেন, "আমি এবার যে ছবিটি আঁক্‌ব তা' চিন্তা কর্‌ছি"—এখানে 'চিন্তা' অর্থে 'কল্পনা করা'। সেইরূপ, এক ব্যক্তি আর ব্যক্তিকে বলিতে পারে, "আপনি এবারে শীল্ডের খেলায় মোহনবাগানের জয়লাভ সম্বন্ধে কি চিন্তা করেন?"—এখানে 'চিন্তা' অর্থে 'বিশ্বাস করা', 'কোন মতবাদ পোষণ করা'। অনেক সময় আবার আদেশের সুরে বলা হয় 'ভাল করে চিন্তা করে দেখ, তোমার পক্ষে এ কাজ করা ঠিক হ'বে কি না' —। এখানে 'চিন্তা' বলিতে বুঝায় 'কোন কার্যের ভাল মন্দ, দোষগুণ বিচার করা'।

সঙ্কীর্ণ অর্থে 'চিন্তন' বলিতে বুঝায় **যে চিন্তন আমরা কোন কিছু সম্যক্ অবধারণের জন্য বা কোন সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করি। চিন্তন-কার্য ভাবধারার মাধ্যমে সাধিত হয়।**[১] এই সকল ভাব (idea) কোন কিছুর **প্রতীক** (symbol)-স্বরূপ। পূর্ব অভিজ্ঞতা, অনুষঙ্গ, পারস্পরিক সম্বন্ধ, সামাজিক প্রথা বা ঐতিহ্যের ফলে প্রতীকগুলি কোন কিছু (যেমন, সাধারণ ধর্ম, বিশেষ কোন বস্তু বা গুণ) নির্দেশ

১ তুলনীয়: "(Thinking is), in the narrower and stricter sense, a course of ideas initiated by a problem." (Drever's *Dictionary*).

করে।[২] চিন্তার মধ্যে থাকে এই সকল প্রতীকের পারম্পর্য (sequence of symbolic processes)। বলা বাহুল্য, স্বাভাবিক, সুষ্ঠু চিন্তার মধ্যে যে প্রতীক-পারম্পর্য দেখা যায়, সেগুলি অর্থোদ্দীপক বা অর্থবোধক। সাধারণতঃ আমরা ভাষার সাহায্যে চিন্তা করি এবং ভাষা হইল কতকগুলি অর্থপূর্ণ প্রতীক (meaningful symbols)-এর সমন্বয়। প্রত্যক্ষ ও স্মৃতি হইতে সঙ্কীর্ণ অর্থে চিন্তনের প্রভেদ হইল যে, প্রত্যক্ষ ও স্মৃতি বিশেষ (particular) ব্যক্তি, বস্তু বা ঘটনার সম্পর্কে হয়, কিন্তু চিন্তন 'বিশেষ' ব্যতীত 'সামান্য' (universal) সম্বন্ধেও হয়। এইজন্য আমরা সমগ্র শ্রেণীর সাধারণ ধর্ম সম্বন্ধে চিন্তা করিতে পারি। তাহা ছাড়া, প্রত্যক্ষ ও স্মৃতি কেবলমাত্র মূর্ত বস্তু (concrete object) সম্বন্ধে হয়, কিন্তু চিন্তন মূর্ত বস্তু ব্যতীত বিমূর্ত ধারণা (abstract idea) সম্বন্ধেও হইয়া থাকে।

২। চিন্তনকার্যের সহায়ক (Tools of Thinking):

পূর্ব অনুচ্ছেদের আলোচনা হইতে দেখিলাম যে, চিন্তারূপ কার্য কতকগুলি প্রতীক (symbols)-এর সাহায্যে সাধিত হয়। এই প্রতীকগুলি হইল কোন কিছুর নির্দেশক (signs)। এই প্রতীকগুলি যাহা নির্দেশ করে তাহা হইল কতকগুলি 'সামান্য' বা সাধারণ গুণ (class essence) অথবা বিশেষ কোন বস্তু। এই বিশেষকে বুঝিবার জন্য সামান্যের প্রয়োজন হয়, আবার বিশেষের সাহায্যেই সামান্য সম্বন্ধে চিন্তা সম্ভব হয়। সামান্যকে নির্দেশকারী সাধারণ ধারণাগুলি (general ideas)-কে বলে **প্রত্যয়** (concept)।

সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, চিন্তন প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজন **বস্তু (object), প্রত্যয় (concept), এবং প্রতীক (symbols)**।

(১) **বস্তু**—বস্তু তিন প্রকারের হইতে পারে—প্রত্যক্ষগোচর, স্মৃতিলব্ধ এবং কল্পনাপ্রসূত। আবার বস্তুকে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখা যাইতে পারে। বস্তু বলিতে বিশেষ কোন বস্তু (যেমন, বিশেষ কোন টেবিল, চেয়ার, কলম) বুঝাইতে পারে। আবার 'বস্তু' বলিতে কোন সাধারণ সংজ্ঞার উদাহরণ বুঝাইতে পারে (যেমন, জ্যামিতিতে

২ 'Symbol'-পদের অর্থ হইল: "that which suggests something else by reason of relationship, association, convention, etc," (Webster).

আমরা যখন কোন ত্রিভুজ আঁকিয়া কিছু প্রমাণ করি, তখন উহা হইল ত্রিভুজ সম্বন্ধে যে সাধারণ ধারণা বা সংজ্ঞা আছে তাহারই একটি বিশেষ উদাহরণ বা প্রয়োগ)। সেইরূপ 'বস্তু' বলিতে কোন 'সহায়ক বস্তু'-ও বুঝায় অর্থাৎ কোন উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করে এইরূপ কোন বস্তু; যেমন, মোটর চালনারূপ উদ্দেশ্যের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে 'পেট্রোল' বলিতে এমন এক 'বস্তু' বা পদার্থ বুঝি যাহা জ্বালানীবস্তু রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

(২) **প্রত্যয়**—চিন্তন কেবলমাত্র বিশেষ কোন বস্তুর ধারণার মধ্যেই সীমিত থাকে না। চিন্তনের ফলে আমরা একই শ্রেণীর সাধারণ (common) গুণ (যাহাকে 'সামান্য' বলা হয়) লইয়া একটি প্রত্যয় (concept) গঠন করি। অবশ্য সামান্য ও বিশেষের ধারণা পরস্পর হইতে পৃথক্ থাকিতে পারে না—বিভিন্ন ফুল দেখিয়া আমরা 'ফুল' সম্বন্ধে একটি 'সাধারণ ধারণা' গঠন করিয়াছি, আবার 'ফুল' সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা আছে বলিয়া আমরা বিশেষ কোন ফুলকে দেখিয়া ফুল বলিয়া উহাকে বুঝিতে পারি। সাধারণ ধারণা বা প্রত্যয় গঠিত হওয়ার ফলে আমরা প্রত্যক্ষের ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া সমগ্র শ্রেণী সম্বন্ধে চিন্তা করিতে পারি—ইহাতে চিন্তন দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত হইতে পারে। তাহা ছাড়া, প্রত্যয়গুলি গঠিত হওয়ার ফলে আমরা অতীত অভিজ্ঞতা ও শিক্ষণের ফল বর্তমানে প্রয়োগ করিতে পারি এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে পারি।

এ ক্ষেত্রে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা প্রথমে কতকগুলি প্রত্যয় গঠন করিয়া তাহার পর চিন্তা বা বিচার করি তাহা নহে। কারণ বিবিধ প্রত্যয় সম্বন্ধে ধারণা কতকগুলি সরল বিচার (simple judgments)-এর মাধ্যমে হইয়া থাকে। যেমন, 'কুকুরের চারিটি পা আছে', 'উহার লোম আছে', 'উহা ঘেউ ঘেউ করে', ইত্যাদি বিচারের মাধ্যমে 'কুকুর'-প্রত্যয়টি সুগঠিত ও সুনির্ধারিত হয়। (পৃঃ ৬৮৪-৮৫)। আবার প্রত্যয় সুনির্ধারিত হইলে সেইগুলি নূতন বিচারের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়। এইজন্য অনেকে বলেন যে, বিচার-ই হইল চিন্তার 'একক' (Judgment is the unit of thought)—ক্ষুদ্র, অস্পষ্ট, সরল বিচার হইতে আমাদের চিন্তাধারা ক্রমশঃ স্পষ্ট, ব্যাপক ও জটিল বিচারের পথে অগ্রসর হয়।

(৩) **প্রতীক ও নির্দেশ** (symbols and signs)—বিবিধ ধারণা মনোমধ্যে সংরক্ষণ, উহা লইয়া আলোচন, অপরের নিকট উহা প্রকাশ

ইত্যাদি সম্ভব হয় কতকগুলি প্রতীকের মাধ্যমে। ঐ প্রতীকগুলি আবার কোন কিছু নির্দেশ করে। যেমন, যখন আমরা বলিলাম 'কলম', তখন এই শব্দসমষ্টি একটি অর্থবোধক প্রতীকরূপে কাজ করিল এবং সমগ্র 'কলম' শ্রেণী অথবা বিশেষ কোন কলমকে নির্দেশ করিল।[৩] তাহা ছাড়া, বিবিধ প্রকার দেহভঙ্গিমার দ্বারা আমরা চিন্তনকে প্রকাশ করিতে পারি। (যাহারা মূক-বধির তাহাদের চিন্তাধারা প্রকাশ করিবার ইহাই একমাত্র উপায়।) আবার শিক্ষণের ফলে বিবিধ প্রতীক বিবিধ অর্থের নির্দেশক হইয়াছে; যেমন, শহরে গাড়ী চালাইবার সময় 'লাল' আলো গাড়ী থামাইবার এবং 'সবুজ' আলো চালাইবার প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়। সেইরূপ 'ক্রস্'-এর চিহ্ন সেবাধর্ম, চিকিৎসা ইত্যাদির প্রতীকরূপে গণ্য হয়।

৩। ভাষা ও চিন্তন (Language and Thought):

ভাষা হইল কতকগুলি প্রতীকের সমন্বয়। সুদূর অতীতে মানুষ তাহার মনোভাবকে অঙ্গভঙ্গীর মাধ্যমেই প্রকাশ করিত। তাহার পর যখন বিবিধ অর্থজ্ঞাপক শব্দের প্রচলন হইল, তখন বাচিক ভাষা (word language)-এর প্রচলন হইল। ইহা লিখিত এবং কথিত (written and spoken) উভয় প্রকারেরই হয়। লিখিত ভাষার উৎপত্তির প্রারম্ভে সাধারণতঃ বিভিন্ন বস্তুর ছবি লইয়া বর্ণমালা রচিত হয়।[৪] তাহা ছাড়া, বিশেষ বিশেষ কার্যের জন্য বিভিন্ন সঙ্কেতের উৎপত্তি হইয়াছে; এইগুলিও বিবিধ অর্থ-নির্দেশক। (যেমন, টেলিগ্রাফের কার্যের জন্য বিবিধ সঙ্কেত ব্যবহৃত হয়।)

ভাষার বিবর্তনের ফলে চিন্তার ধারক ও বাহক ভাবে ভাষাই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। বিশেষতঃ সাধারণ ধারণা বা প্রত্যয়ের জন্য যে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের প্রয়োজন, তাহা ভাষার সাহায্যে সুষ্ঠুভাবে সাধিত হয়।[৫]

৩ সার্বিক প্রতীকের মাধ্যমে চিন্তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় বীজগণিত বা (algebra)-তে।

৪ ইহাকে বলে 'hieroglyphic art'। প্রাচীন মিশরীয় ভাষার বর্ণমালা এই প্রথায় রচিত।

৫ এইজন্য Stout ভাষাকে বলিয়াছেন: "an instrument of conceptual analysis and synthesis." (*Groundwork of Psychology*, p. 149). ভাষার উৎপত্তি কিরূপে ঘটিয়াছে সে বিষয়ে নানা মতবাদ গঠিত হইয়াছে। কেহ বলেন কতকগুলি প্রাথমিক গতি-ভঙ্গিমা এবং আকার-ইঙ্গিত ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছে; আবার কেহ কেহ বলেন যে, কতকগুলি প্রাথমিক শব্দ-ভঙ্গিমা বা ধ্বনি হইতে ভাষার উৎপত্তি ঘটিয়াছে [ম্যাক্স মুলার ইহাদের পু-পু (pooh-pooh) মতবাদ, বাও-ভাও (bow-wow) মতবাদ এবং ডিং-ডং (ding-dong) মতবাদ নাম দিয়াছেন।] (Stout, *Manual*, pp. 539-557 দ্রষ্টব্য।)

ভাষার জন্যই একজন অপরের মনের নিকট মনোভাব সহজেই প্রকাশ করিতে পারে। সুতরাং ভাষা মনোভাব জ্ঞাপন (communication)-এ সহায়তা করে। ভাষার এই ক্ষমতা থাকার জন্য ভাষার সাহায্যে অন্যের সহিত আলোচনা করিয়া তাহাকে স্বদলে আনা (বা persuade করা) যায় এবং অন্যকে ক্ষেত্র-বিশেষে কোন কার্য করিতে উত্তেজিত (incite) করা যায়।

তাহা ছাড়া, ব্যক্তি-বিশেষ যখন কোন কারণে কোন রাগ বা উত্তেজনা (tension বা excitement) বোধ করে, তখন সে নিজের মনের কথা ভাষার সাহায্যে অন্যের নিকট প্রকাশ করিয়া আবেগের ভার কতকটা লঘু করিতে পারে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষার প্রয়োজনীয়তা আমরা সম্যক্ বুঝিতে পারি। ভাষা আছে বলিয়াই অতীতের চিন্তাধারা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ইত্যাদি সংরক্ষিত হইতে পারে এবং তাহা হইতে আমরা শিক্ষালাভ করিতে পারি। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া চিন্তার প্রবাহ অব্যাহত আছে ভাষার মাধ্যমে।

মোটকথা, ভাষা আছে বলিয়াই আমরা সুসংবদ্ধভাবে চিন্তা করিতে সক্ষম হই। ভাষাই চিন্তাকে উহার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হইতে সহায়তা করে। ভাষারই সাহায্যে আমরা আমাদের পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা মনোমধ্যে করিয়া রাখিতে পারি এবং প্রতিক্রিয়াকালে ঐরূপ ধারণা আমাদের যথেষ্ট সহায়তা করে। মনুষ্যেতর জীবেরাও বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে ধারণা করে; কিন্তু ভাষার অভাবে উহা স্থায়ী রূপ গ্রহণ করিতে পারে না—বাহ্য জগৎসম্বন্ধে তাহাদের যে ধারণা তাহা নিতান্ত সাময়িক ও পরিবর্তনশীল উদ্দীপকের অধীন।

যদিও ভাষা চিন্তার প্রধান সহায়ক, তাহা হইলেও **ভাষা ও চিন্তন সমব্যাপক** (co-extensive) **নহে।** চিন্তন কোন একটি ভাষার মধ্যে সীমিত নহে। একই বিষয় আমরা বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ভাবে চিন্তা করিতে পারি। (যেমন, 'আমার বই', 'মেরী কিতাব', 'my book', 'mein Buch' একই অর্থ বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করিতেছে)। যদিও বিমূর্ত চিন্তা ভাষা ব্যতীত অসম্ভব হইয়া পড়িত, তাহা হইলেও যখনই আমরা চিন্তা করি, তখনই যে একমাত্র ভাষাই ব্যবহার করি, তাহা নহে। কোনরূপ ভাষা বা প্রতিরূপের সাহায্য ব্যতীতও যে চিন্তন কার্য কতকাংশে চলিতে পারে, তাহার প্রমাণ এই যে আমরা মধ্যে মধ্যে চিন্তনকে প্রকাশ করিবার উপযুক্ত ভাষা পাই না। তাহা ছাড়া, যাহারা

বাক্-বিস্মৃতি (aphasia) রোগে ভুগে, তাহারা নিজেদের চিন্তাকে ভাষায় রূপ দিতে পারে না। এরূপ রোগীর ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, যে, পাশাখেলার কাজ তাহারা অনায়াসে চালাইতে পারে—এই খেলার জন্য যথেষ্ট চিন্তা-শক্তির প্রয়োজন, অথচ তাহারা উপযুক্ত শব্দের সাহায্যে নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করিতে গেলে গোলমাল করিয়া ফেলে।[৬]

এইজন্য বলা যাইতে পারে যে, যদিও ভাষা ব্যতীত অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্পষ্ট, সুসংবদ্ধভাবে চিন্তা করা যায় না, এবং ভাষা ব্যবহারের ফলে চিন্তা বিস্তৃতি লাভ করে, তাহা হইলেও চিন্তা করার ক্ষমতা এবং ভাষা প্রয়োগের ক্ষমতা এক নহে।[৭]

৪। চিন্তন ও প্রতিরূপ (Thought and Images):

চিন্তন কার্য ঠিক কী ভাবে সাধিত হয় তাহা লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে। চিন্তন মাত্রই প্রতীকের সাহায্য অবলম্বন করে; কিন্তু এই প্রতীকগুলির স্বরূপ কী? এইগুলি কি প্রতিরূপ (images)? অর্থাৎ আমরা যখন চিন্তা করি, তখন কি একমাত্র প্রতিরূপের সাহায্যেই চিন্তা করি?

এ বিষয়ে বিভিন্ন মনোবিৎ-সম্প্রদায় বিভিন্ন মত পোষণ করেন। আমরা কয়েকটি প্রধান মতের উল্লেখ করিব।

(১) ভুয়েরৎসবুর্গ সম্প্রদায়ের মত—

জার্মানীর অন্তর্গত ভুয়েরৎসবুর্গ (Würzburg)-এ কয়েকজন মনোবিৎ (যথা, Külpe, Watt, Ach, Marbe ইত্যাদি) চিন্তন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে পরীক্ষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে গবেষণা করেন। তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ন যে, **কোন বিষয় চিন্তা করিবার জন্য প্রতিরূপ (images) অবশ্য প্রয়োজনীয় নহে।**

পরীক্ষণ-পাত্রকে দুইটি বিভিন্ন ওজনের বস্তু দিয়া বিচার করিতে বলা হইত কোন্‌টি বেশী ভারী; এবং বিচারকালে তাঁহার কি মানসিক অভিজ্ঞতা .

৬ Head, 'Aphasia & Kindred Diseases of Speech' দ্রষ্টব্য।

৭ তুলনীয়: "Thought cannot simply be identified with language. Yet it is possible that language is a necessary condition for acquiring and developing many drills and skills which are necessary for the sophisticated types of thinking." (R. Thomson, *Psychology of Thinking*, p. 165).

হয় তাহাও বলিতে বলা হইত। দেখা গেল যে, পরীক্ষণ-পাত্র স্বীয় বিচার (judgment)-কে বিশ্লেষণ করিবার কালে কোন প্রতিরূপ-গঠনের অভিজ্ঞতার সংবাদ দিতেন না।

সেইরূপ পরীক্ষণ-পাত্রকে কোন একটি 'উদ্দীপক পদ' (stimulus word) প্রদান করিয়া উহার প্রত্যুত্তরে একটি 'প্রতিক্রিয়া-পদ' (response word) দিতে বলা হইত এবং উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার অন্তর্বর্তীকালীন চিন্তন-প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করিতে বলা হইত। সাধারণতঃ পরীক্ষণ-পাত্রের এই অবস্থাটি অবিশ্লেষণীয় "সচেতন প্রতিন্যাস" (conscious attitude) বলিয়া বর্ণিত হইত। কেহ কোনরূপ প্রতিরূপের আশ্রয়গ্রহণের কথা বলিতেন না।

আবার, পরীক্ষণ-পাত্রকে কোন একটি বিশেষ বস্তু, যেমন একটি ফলের নাম করিতে বলা হইত। পরীক্ষণ-পাত্র হয়ত' উত্তরে বলিতেন, 'আম', 'আপেল' অথবা অন্য কোন ফল; কিন্তু এইরূপ উত্তর দিবার কালে ঐরূপ ফলের প্রতিরূপ গঠনের কোন প্রয়োজনীয়তা কেহ বোধ করিতেন না।

তাহা ছাড়া, এই সকল পরীক্ষণের ফলে চিন্তনের আরও দুইটী বৈশিষ্ট্য জানা যায়। প্রথমতঃ, চিন্তন-প্রক্রিয়ার সকল কার্য সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট চেতনা থাকে না; এইগুলি অনেকাংশে অবচেতনস্তরে সাধিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, চিন্তন-প্রক্রিয়াটি চিন্তন-পূর্ব মানসিক 'প্রস্তুতি' (*einstellung* বা 'set') দ্বারা প্রভাবিত হয়।

(২) অবয়ববাদী সম্প্রদায়ের মত—

অবয়ববাদী টিচেনার (Titchener) ইত্যাদির মতে সকল জটিল মানসিক অবস্থাই তিনটি সরল উপাদান—সংবেদন, অনুভূতি ও প্রতিরূপ—দ্বারা গঠিত। সুতরাং চিন্তার ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না; উহার মধ্যেও সংবেদন, অনুভূতি ও প্রতিরূপ এই তিনটির সমন্বয় ঘটিয়াছে। সুতরাং টিচেনারের মতে **প্রতিরূপবিহীন চিন্তা** (imageless thought) **সম্ভব নহে**।

ভুয়েরৎস্‌বুর্গ্‌ সম্প্রদায়ের মনোবিদ্‌গণ বলিতেন যে, অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে বিশ্লেষণের ফলে চিন্তন-প্রক্রিয়ার ভিতর কতকগুলি অবিশ্লেষণীয় প্রতিরূপবিহীন

মানসিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। এইগুলিকে তাঁহারা নাম দিয়াছিলেন 'চেতন প্রতিন্যাস' (conscious attitudes), 'পারস্পরিক সম্বন্ধ বিষয়ক চেতনা' (consciousness of relation) ইত্যাদি। টিচেনার কিন্তু দাবী করেন যে, এই সকল অবস্থাগুলি অবিশ্লেষণীয় নহে—ইহাদের বিশ্লেষণ করা যায়, এবং করিলে সংবেদন, অনুভূতি ও প্রতিরূপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়[৮]।

সুতরাং টিচেনার সিদ্ধান্ত করেন যে, **যখনই আমরা চিন্তা করি, তখনই কোন-না-কোন প্রতিরূপের সাহায্য গ্রহণ করি**। সেইজন্য টিচেনারের মনোবিদ্যায় অর্থ (meaning) সম্বন্ধীয় আলোচনার স্থান নাই। তিনি বার বার তাঁহার গবেষণাগারে পরীক্ষণ-পাত্রদের সতর্ক করিয়া দিতেন যে, তাহারা যেন 'উদ্দীপক-সংক্রান্ত ভ্রান্তি' (stimulus error) না করে। তাহাদের নিজেদের মানসিক অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ না করিয়া তাহারা যদি কোন্ উদ্দীপক উদ্দীপনের সৃষ্টি করিতেছে তাহা ভাবিতে থাকে, তাহা হইলে এই প্রকার ভ্রান্তি ঘটিবে। অন্তর্দর্শন কালে ইহা সর্বদা পরিত্যাজ্য।

(৩) **আধুনিক সম্প্রদায়ের মত—**

পরবর্তী কালে বিনে (Binet), উড্ওয়ার্থ (Woodworth), সেলৎস্ (Selz) ইত্যাদি যে সকল গবেষণা করেন, তাহাতে ভুয়েরৎস্বুর্গ সম্প্রদায়ের অভিমতই সমর্থিত হয়। তাহা ছাড়া গেস্টাল্ট্বাদীরাও এই মতই সমর্থন করেন।

সাধারণ মন্তব্য :

আমরা পরিশেষে এই মন্তব্য করিতে পারি যে, যদিও আমরা অনেক ক্ষেত্রে চিন্তার সময় প্রতিরূপের সাহায্য গ্রহণ করি বা প্রতিরূপের মাধ্যমে চিন্তা করিতে পারি, তাহা হইলেও ইহা চিন্তার অপরিহার্য অঙ্গ নহে।

যেখানে চিন্তার বিষয়-বস্তু কোন মূর্ত বস্তু (concrete object),

৮ তথাকথিত অবিশ্লেষণীয় conscious attitude-এর উল্লেখ করিয়া Titchener মন্তব্য করিয়াছেন : "All the reports show the same features—visual images, pictorial and symbolic ; internal speech ; kinæsthetic sensation, general or local, and kinæsthetic images ; organic sensations. Nowhere a sign of the imageless content." (*A Text-book of Psychology*, p. 516).

সেখানে আমরা চিন্তাকালে প্রতিরূপের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু সেরূপ ক্ষেত্রেও যে আমরা সর্বদাই প্রতিরূপের সাহায্যে চিন্তা করি, তাহা নহে। ভাষার মাধ্যমে আমরা যখন চিন্তা করি, তখন উহার অর্থের বোধগম্যতার উপরই চিন্তার গতি নির্ভর করে।

তাহা ছাড়া, যেখানে আমাদের চিন্তার বিষয়-বস্তু কোন বিমূর্ত ধারণা (যেমন, আত্মা, ব্রহ্ম ইত্যাদি সম্বন্ধীয় ধারণা বা কোন সাধারণ প্রত্যয়), সেখানে কোন প্রতিরূপ গঠন সম্ভব নহে।

সুতরাং **প্রতিরূপবিহীন চিন্তন (imageless thought)-এর সম্ভাব্যতা স্বীকার করিতে হইবে**। সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, চিন্তন ক্রিয়ার সকল বৈশিষ্ট্য সংজ্ঞান :স্তরে সাধিত হয় না এবং এই জন্য ঠিক কী ভাবে আমরা চিন্তা করি তাহা চেতনার আলোকে সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না।[১]

৫। চিন্তন ও পেশী সঞ্চালন (Thought and Muscular movements):

আমরা এইমাত্র সিদ্ধান্ত করিলাম যে, প্রতিরূপ ব্যতীত চিন্তন সম্ভব। তাহা হইলে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, প্রতিরূপ ব্যতীত 'অন্য কিছু' চিন্তন কার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে। কিন্তু এই "অন্য কিছু"-টি কী? একদল মনোবিৎ মনে করেন যে, ইহা হইল পেশীর ক্রিয়া। ওয়াট্‌সন্‌ প্রমুখ ব্যবহারবাদীরা এই মত সমর্থন করেন। ওয়াট্‌সনের মতে চিন্তন হইল 'অনুচ্চারিত বাক্‌', অর্থাৎ যখনই আমরা চিন্তা করি, তখনই বাক্‌যন্ত্র অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবেও কার্য করে। (পৃঃ ১০১ দ্রষ্টব্য)। যেহেতু অবয়ববাদীরা প্রতিরূপ-গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং প্রতিরূপগঠন গুরুমস্তিষ্কের ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে, ওয়াট্‌সন্‌ অবয়ববাদীদের মতবাদের নাম দিয়াছিলেন 'মস্তিষ্কাধিষ্ঠান মতবাদ' (Central Theory of Thinking); এবং যে মতবাদ সমগ্র দেহ,' বিশেষতঃ পেশী সঞ্চালনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে তাহার তিনি নাম দিয়াছিলেন 'প্রান্তীয় মতবাদ' (Peripheral Theory of Thinking)।

---

১ Vinacke, *The Psychology of Thinking*, p. 52 দ্রষ্টব্য।

চিন্তনকালে পেশীসমূহ সূক্ষ্মভাবে[১০] কার্য করে কি না, তাহার যাথার্থ্য নির্ধারণের জন্য সাম্প্রতিক কালে কয়েকটি পরীক্ষণ করা হইয়াছে।[১১]

পরীক্ষণ-পাত্রকে একটি অন্ধকার কক্ষে শায়িত অবস্থায় রাখা হইল। তাহাকে বলা হইল যে, পেশীসমূহ সে যেন শ্লথ (relaxed) অবস্থায় রাখে। একটি সঙ্কেত পাইবামাত্র সে যেন ডান হাতটি ভাঁজ করিবার বা মুড়িবার কথা চিন্তা করে। ডান হাতের সহিত ইলেক্‌ট্রোড (electrode) সংযুক্ত করিয়া রাখা হয়; উহা আবার গ্যাল্‌ভানোমিটার (galvanometer)-এর সহিত যুক্ত থাকে। উহার সাহায্যে দেখা গেল যে, হাতটি মুড়িবার চিন্তা করার ফলে অতি সূক্ষ্মভাবে পেশীচালনা সুরু হয়। আবার ডান হাতটি মুড়িতে হইবে না, অথবা বাম হাতটি মুড়িতে হইবে, এইরূপ কোন নির্দেশ দিলে দেখা যায় যে, ডান হাতের সহিত সংযুক্ত বৈদ্যুতিক মাপযন্ত্রে কোন পরিবর্তন সূচিত হয় না।

চিন্তনের সহিত শিক্ষণ (learning)-এর ঘনিষ্ঠ যোগ আছে এবং শিক্ষণের সহিত ক্রিয়ার সম্পর্ক আছে। সুতরাং চিন্তনের সহিত যে পেশীচালনার একটি সম্পর্ক থাকিতে পারে, সে প্রকল্প সত্য হইলেও হইতে পারে—এইরূপ অভিমত অনেকে প্রকাশ করেন। যাহা হউক, চিন্তনের সহিত সূক্ষ্ম পেশীচালনের কোন যোগসূত্র থাকিলেও কেবল ইহার মাধ্যমে চিন্তনের স্বরূপকে বুঝা যায় না। **চিন্তনের প্রধান প্রকাশ বা পরিচয় ভাব বা ধারণা (idea)-এর মধ্যে; সুতরাং দেহযন্ত্রের ক্রিয়ার সহিত চিন্তন-ক্রিয়াকে সমার্থক করা যুক্তিযুক্ত নয়।**

৬। প্রত্যয় (Concept):

আমরা চিন্তন কার্য চালাইবার জন্য যে সকল ভাব বা ধারণার আশ্রয় গ্রহণ করি, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি হইল সাধারণ ধারণা (general notions), যেমন, 'মানুষ' পদটির দ্বারা সমগ্র মানবজাতিকে বুঝায় এবং সকল মানুষের সাধারণ গুণের নির্দেশ করে। জাতিনির্দেশক বা জাতির

১০ পেশীসমূহ 'সূক্ষ্মভাবে' (implicitly) কার্য করা অর্থে বুঝিতে হইবে যে, পেশীচালনা এত মৃদুগতিতে হয় যে, বাহির হইতে পেশীচালনা বিশেষ বোধগম্য হয় না।

১১ L. E. Jacobson, 'The electrophysiology of mental activities', *American Journal of Psychology* (1932), pp. 677-684 দ্রষ্টব্য।

সাধারণগুণ নির্দেশক এই পদগুলিকে **প্রত্যয়** (concept) বলে। প্রত্যয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল নিম্নলিখিতরূপ :

(১) প্রত্যয়ের বিষয়-বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয় সংযোগ হয় না অর্থাৎ এইগুলি সংবেদন-উপাত্ত (sensory data) নহে। কিন্তু এইগুলি গঠনের মূলে সংবেদন তথা প্রত্যক্ষজনিত অভিজ্ঞতা আছে।

(২) আমরা যখন প্রত্যয় প্রয়োগ করি, তখন পুরাতন অভিজ্ঞতাকে নূতন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি।

(৩) প্রত্যয় দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ প্রত্যক্ষজনিত অভিজ্ঞতার মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়।

(৪) প্রত্যয়ের অর্থের দুইটি দিক্ আছে একটি হইল সাধারণ অর্থ আর একটি হইল ব্যক্তিগত অর্থ। যেমন, যদি 'কুকুর' এই প্রত্যয়টি ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে সকলেই এক বিশেষ প্রকারের জীবকে বুঝে, আবার কুকুর বলিতে ঐ প্রত্যয় ব্যবহারকারীর মনে বিরাগ বা অনুরাগ বা অন্য কোন প্রকার ভাবের উদয় হইতে পারে।

(৫) সকল প্রত্যয়ই যে যুক্তিসঙ্গত তাহা নহে। যেমন, 'ডাইনীবুড়ী'-সম্বন্ধীয় ধারণা বা প্রত্যয়। ইহা আমরা শিশুদের ভয় দেখাইবার জন্য ব্যবহার করি, কিন্তু ইহা যে ঠিক কী তাহা আমরা নিজেরাই জানি না।

(৬) সকল প্রত্যয় আমরা সকল সময় চেষ্টাপূর্বক গঠন করি না ; আবার উহাদের প্রয়োগে প্রতিক্রিয়া করিবার সময়ও যে বিশেষ চিন্তা করি তাহা নহে। বারবার ব্যবহারের ফলে কতকটা অভ্যাসবশে ইহা সাধিত হয়।

এখন প্রশ্ন হইল : **প্রত্যয়গুলি কিভাবে সংগঠিত হয় ?** এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই বলিতে হইবে যে, প্রত্যয়গুলি গঠনের মূলে অভিজ্ঞতা আছে। শৈশব হইতেই আমরা কিছু না কিছু প্রত্যয় গঠন করিতেছি। আমরা প্রথমে শিশুমনে কিভাবে প্রত্যয় গঠিত হয়, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

শিশু তাহার পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু লইয়া যখন ব্যবহার করিতে বা নাড়াচাড়া করিতে আরম্ভ করে, তখন হইতেই ঐ সকল বস্তু সম্বন্ধে সে ধারণা গঠন করিতে শেখে। ঐ সব বস্তুর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সম্বন্ধে তাহার মনে একটা অস্পষ্ট ধারণা জন্মে। তাহার পর সে যতই ভাষা আয়ত্ত করিতে থাকে, ততই বিভিন্ন বস্তু এবং তাহাদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের

সহিত ভাষাকে সংযুক্ত করিতে শিক্ষা করে। সুতরাং ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন শব্দ বিভিন্ন বস্তুর ও উহাদের গুণের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে।

একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বস্তুকে যখন শিশু পর্যবেক্ষণ করে, তখন ঐ সকল বস্তুর মধ্যে শ্রেণীগত যে সাধারণ ধর্ম আছে, তাহা তাহার মনের উপর রেখাপাত করে। যেমন, একটি শিশু কিভাবে 'কুকুর' সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা গঠন করে দেখা যাউক্। সে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কুকুর দেখিল। ইহার ফলে ঐ সকল কুকুরের যেগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য সেইগুলি প্রতিবারেই তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল; সে প্রতিবারেই দেখিল যে, কুকুরের চারিটি পা আছে, গায়ে লোম আছে, সে মাংস খায়, সে দাঁত দিয়া কামড়াইতে পারে, ঘেউ ঘেউ শব্দ করে ইত্যাদি। সুতরাং এই সকল সাধারণ বৈশিষ্ট্য তাহার মনের উপর রেখাপাত করিল। শিশুমনকে যেমন সাদৃশ্যগুলি আকর্ষণ করে, সেইরূপ হঠাৎ কোন বৈসাদৃশ্যও উহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেমন, শিশুটি হঠাৎ আবিষ্কার করিল যে, কুকুরের রঙ্ কালো, সাদা, বাদামী ইত্যাদি হইতে পারে, উহা আকারে বড় হইতে পারে আবার ছোট হইতে পারে। সুতরাং সাদৃশ্যসমূহ তাহার মনে স্পষ্ট হইয়া উঠিল এবং ঐ সকল বৈসাদৃশ্য তাহার মনে অস্পষ্ট আকার ধারণ করিল ও ক্রমশঃ সেইগুলি 'কুকুর'-রূপ প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে অবলুপ্ত হইয়া গেল।[১২]

উপরের এই মতবাদে প্রত্যয় গঠনের সহায়ক বিবিধ বস্তুর সাদৃশ্যগুলিকে পৃথকীকরণ (abstraction)-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

একটি উপমা দ্বারা ইহা বুঝা যাইতে পারে। যদি একটি কাগজের উপর 'অশোক', 'অণিমা', 'অরুণ', 'অলকা', এইরূপ পদগুলি একটির উপর একটি লেখা যায়, তাহা 'অ' অক্ষরটি খুব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে, কিন্তু অন্য অক্ষরগুলি বিভিন্ন হওয়ার জন্য এবং একটির উপর আর একটি লেখার জন্য অস্পষ্ট (বা 'হিজিবিজি') হইয়া যাইবে। সেইরূপ প্রত্যয় গঠনের ক্ষেত্রে সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি স্পষ্ট হইবে; যেগুলি সাধারণ নহে (অর্থাৎ uncommon)

১২ তুলনীয়: "...the features common to a class of objects summate their impressions on the observer, who, thus, gradually acquires a picture in which the common features stand out strongly while the variable characterstics are washed out." (Woodworth, *Experimental Psychology*, 801).

সেইগুলি অস্পষ্ট হইয়া যাইবে এবং ক্রমে তাহারা অবলুপ্ত হইয়া যাইবে। এই ক্ষেত্রে আলোকচিত্রেরও একটি উপমা দেওয়া যাইতে পারে। যদি ক্যামেরায় একই প্লেটের উপর ১০ জন ব্যক্তির ছবি তোলা হয় এবং প্রতি ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যে সময় নেওয়া হয় তাহার $\frac{1}{10}$ সময় লওয়া হয়, তাহা হইলে যে অদ্ভুত ছবিটি উঠিবে, তাহাতে ঐ দশ ব্যক্তির মুখের চেহারার যে অংশটুকু সাধারণ অর্থাৎ যে যে বিষয়ে উহাদের মুখাবয়বের সাদৃশ্য আছে, সেই অংশগুলির 'ছাপ' স্পষ্ট হইবে এবং যে যে বিষয়ে বৈসাদৃশ্য আছে সেইগুলি 'অবলুপ্ত' হইয়া যাইবে।[১৩]

প্রত্যয়-গঠন সম্বন্ধে আর একটি অভিমত হইল যে, শিশুমন যখন বাহ্য জগতে বিভিন্ন বস্তুর উপর প্রতিক্রিয়া করে, তখন ঐ সকল বস্তু যে যে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সেই সকল শ্রেণী সম্বন্ধে একটি 'সাময়িক ধারণা' করিয়া লইয়া সে অগ্রসর হয়। যদি বাস্তবক্ষেত্রে ঐ শ্রেণীসম্বন্ধীয় ধারণা কার্যকরী বা সার্থক হয়, তাহা হইলে ঐ ধারণাকে সত্য বা যথার্থ বলিয়া শিশুমন গ্রহণ করে। আর যে সকল ধারণা সার্থক বা সফল হইল না, সেই সকল ধারণাকে মার্জিত বা পরিবর্তিত করিয়া লইতে হয়, অথবা একেবারে পরিহার করিতে হয়। এই মতবাদকে 'বাস্তব কার্যকারিতা মতবাদ' (Active-search Theory) এবং 'প্রকল্প ও প্রমাণ মতবাদ' (Hypothesis and Verification Theory) নামে অভিহিত করা হয়।

এই দুইটি মতবাদের মধ্যেই আংশিক সত্যতা আছে।[১৪] কতকগুলি ক্ষেত্রে শিশুমন অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয়ভাবে বাহ্য জগতের উদ্দীপকগুলি গ্রহণ করে এবং উহাদের মধ্যে যে সকল গুণ সাধারণ (common) সেইগুলি মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। আবার অন্য কতকগুলি ক্ষেত্রে কোন একটি শ্রেণীর সাধারণ গুণ সম্বন্ধে প্রকল্প করিয়া উহা বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় এবং সেইভাবে উহার যাথার্থ্য মিলাইয়া দেখা হয়।

---

১৩ এই প্রক্রিয়াকে বলে 'composite photography' ; যেহেতু এই মতবাদে আলোকচিত্র বা ফোটোর উপমা লওয়া হইয়াছে, সেই হেতু ইহাকে 'composite-photograph theory' বলে। ইহার অপর নাম 'Theory of isolation by varying concomitants'।

১৪ হাইডব্রেডার (Heidbreder) ইত্যাদি শিশুমনে প্রত্যয় গঠন সম্বন্ধে যে সকল পরীক্ষণ করেন, তাহাতে এই দুইটি মতবাদেরই সত্যতা প্রমাণিত হয়। তাঁহারা মনে করেন যে, প্রত্যয়-গঠনের মধ্যে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ (analysis and synthesis) উভয় প্রক্রিয়াই থাকে।

শিশুমনের চিন্তনের বৈশিষ্ট্য :

শিশুমনের প্রত্যয়ের বৈশিষ্ট্য লইয়া জঁ৷ পিয়াজে (Jean Piaget) প্রভৃত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি এই বিষয়ে যে অনুসন্ধান কার্য চালাইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি লক্ষ্য করেন যে, শিশুমনের চিন্তনের বৈশিষ্ট্য হইল' তিনটি—

(১) শিশুমন বাস্তব ও অবাস্তবের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য করে না। যাহা সে প্রত্যক্ষ করে এবং যাহা সে কল্পনা করে দুইটিকেই সে অনেক সময় সমশ্রেণীভুক্ত মনে করে—দুইটিকেই সে সমভাবে বাস্তব বলিয়া মনে করে।

(২) শিশু-মন সকল বস্তুকে প্রাণবান্ মনে করে। সে সকল বস্তুরই প্রাণ আছে বলিয়া মনে করে—চন্দ্র, সূর্য, পর্বত, নদী ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার খেলনা পর্যন্ত সকল বস্তুকেই সে নিজের মতন করিয়া মনে করে।

(৩) তাহা ছাড়া, সকল বস্তুকেই সে কোন না কোন মানুষের সৃষ্টি বলিয়া মনে করে ; যেমন, সে মনে করে যে, গাছপালা ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার ভাইবোন সকলকেই এখন তাহারা যেরূপ অবস্থায় আছে সেই ভাবেই কেহ না কেহ সৃষ্টি করিয়াছে।[১৫]

৭। চিন্তনের প্রকারভেদ (Different Kinds of Thinking) :

মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে চিন্তনকে দুইটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : (১) **উদ্দেশ্য-প্রণোদিত (Directed or goal-oriented) চিন্তা** এবং (২) **অবাধ বা অনিয়ন্ত্রিত চিন্তা** (Free thinking)।

উদ্দেশ্যপ্রণোদিত চিন্তা বলিতে আমরা বুঝি যে, চিন্তনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য মনের সংজ্ঞান স্তর স্বেচ্ছায় নির্বাচন করিয়া লইয়া তাহা লইয়া আলোচনা করে। ইহা আবার দুই প্রকারের হইতে পারে—বিচারমূলক (critical) এবং সৃজনকারী (creative) চিন্তন। বিচারমূলক চিন্তার ক্ষেত্রে আমরা চিন্তার সত্যাসত্য বা যাথার্থ্য নির্ণয়ের চেষ্টা করি, বা উহার বিষয়-বস্তুর মূল্য নির্ধারণের চেষ্টা করি, অর্থাৎ কোন্‌টি ভাল কোন্‌টি মন্দ তাহা বিচার করিবার চেষ্টা করি। সৃজনকারী চিন্তনের সাহায্যে আমরা নূতন আবিষ্কারের চেষ্টা করি, কোন সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবন করি, শিল্প সৃষ্টি করি ইত্যাদি।

---

১৫ উপরে বর্ণিত এই তিনটি বৈশিষ্ট্যকে পিয়াজে যথাক্রমে realism, animism ও artificialism নামে অভিহিত করেন। (Piaget, *The Child's Conception of the World* দ্রষ্টব্য)।

অবাধ বা অনিয়ন্ত্রিত চিন্তার উপর মনের চেতন স্তরের কোন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকে না। ইহা নানা প্রকারের হইতে পারে। অবাধ ভাবানুষঙ্গের ক্ষেত্রে ব্যক্তি-বিশেষের মনে একটি পর একটি ভাব স্বতঃই দেখা দেয়। মনঃসমীক্ষণ-বাদীরা যখন অভিস্ফোট বা বিরেচন (abreaction বা catharsis) পদ্ধতি চিকিৎসাকালে অবলম্বন করেন, তখন চিকিৎসাধীন রোগীকে অবাধে তাহার মনে যে ভাব উঠিতেছে তাহাই বলিয়া যাইতে বলা হয়। আবার এই অনুষঙ্গকে বিশেষ উপায়ে নিয়ন্ত্রিত করা যায়; যেমন, পরীক্ষণ-পাত্রকে একটি উদ্দীপক-বাক্য প্রয়োগ করিয়া উহার উত্তরে একটি প্রতিক্রিয়া-বাক্য ব্যবহার করিতে বলা হয়। (পৃঃ ৩০৮-৩০৯ দ্রষ্টব্য)। তাহা ছাড়া, স্বতঃচিন্তন, দিবাস্বপ্ন বা আকাশকুসুম রচনা, স্বপ্ন এইগুলিও অনিয়ন্ত্রিত চিন্তনের শ্রেণীভুক্ত। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, এইগুলিতে যৌক্তিক চিন্তা অপেক্ষা স্বাধীন কল্পনারই প্রাধান্য (পৃঃ ৬৫৫-৫৯)।

৮। শুদ্ধ ও অশুদ্ধ চিন্তা (Correct & Incorrect Thinking) ঃ

বাস্তব সত্যের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে চিন্তনকে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়া থাকে। যদি চিন্তনের বিষয়বস্তু যথার্থ হয়, তখন উহাকে শুদ্ধ চিন্তন বলা যায়; অপর পক্ষে, উহার সহিত যদি বাস্তব ঘটনার মিল না থাকে, অথবা যদি চিন্তাধারার মধ্যেই অসামঞ্জস্য থাকে, তাহা হইলে ঐ চিন্তনকে অশুদ্ধ বলা যায়।

চিন্তার যাথার্থ্য (validity) বিচার করা যুক্তিশাস্ত্রের কার্য। মানুষ কেন অশুদ্ধভাবে চিন্তা করে, অর্থাৎ অশুদ্ধ চিন্তার[১৬] পশ্চাতে কি কি মানসিক কারণ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব থাকিতে পারে, তাহাই আমরা মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আলোচনা করিব।

এ কথা প্রথমে স্বীকার করিতে হইবে যে, চিন্তাশক্তির বৈষম্য অনেক পরিমাণে ব্যক্তিগত পার্থক্যের উপর নির্ভর করে—অর্থাৎ সকল লোকের সমানভাবে চিন্তা করিবার ক্ষমতা থাকে না। কাহারও চিন্তাশক্তি প্রখর এবং কাহারও বা দুর্বল। ইহার মূলে জাতিগত ও বংশগত পার্থক্যও

১৬ এ ক্ষেত্রে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সকল সময় সকল মানুষ অশুদ্ধ চিন্তাকে অশুদ্ধ বলিয়া বুঝিতে পারে না। অশুদ্ধ চিন্তাকে যদি শুদ্ধ মনে করিয়া মানুষ তাহা দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহা হইলে উহা তাহার পক্ষে ক্ষতিকর হয়।

থাকিতে পারে। কিন্তু জন্মগত কোন মানসিক দুর্বলতা ব্যতীত অন্য নানা কারণে ভ্রান্ত বা অশুদ্ধ চিন্তন দেখা দেয় :

(১) সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করিবার জন্য প্রথম হইতে মানসিক দঢ়তা বা সঙ্কল্পের প্রয়োজন। অনেক সময় এমন হয় যে, সামান্য চিন্তা করিয়া ব্যক্তি-বিশেষ হঠাৎ একটি বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় এবং উহাকে পরিত্যাগ করিতে চাহে না। কোন জটিল বিষয়ে একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য যে প্রকারের ধীর চিন্তন, ধৈর্য ও অনুসন্ধানের প্রয়োজন সেগুলি না করিয়াই সে সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলে। যেমন, ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য অনেক সময় অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে, অথবা একদল স্বার্থান্বেষী লোক ধর্মের নামে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা করে—কেবলমাত্র এইরূপ দু'একটি ঘটনা লক্ষ্য করিয়াই কেহ হয়ত' সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলেন : "ধর্মের ন্যায় ক্ষতিকারক আর কিছুই নাই!" অথচ ধর্মের যে কত উন্নততর দিক্ আছে তাহা লক্ষ্য করিবার বা সে বিষয় আলোচনার ধৈর্য তাঁহার নাই। সুতরাং সুষ্ঠু চিন্তা করিবার সঙ্কল্প বা প্রেষণার অভাব (lack of will or motivation) অশুদ্ধ চিন্তার একটি কারণ। এরূপ ক্ষেত্রে অনেক সময় উপযুক্ত বা সুষ্ঠু প্রমাণ ব্যতীত আমরা অনেক বিষয় গ্রহণ করি বলিয়া মিথ্যা ধারণার সৃষ্টি হয়।

(২) অনেক সময় কোন কোন ব্যক্তি একটি বিশেষ পদ্ধতিতে চিন্তা করিতে অভ্যস্ত হয়, কিন্তু উহা যে সকল সময় বা সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না, তাহা ব্যক্তি-বিশেষ বুঝিতে পারে না এবং উহার ফলে অতি সাধারণ বিষয়েও সে ঠিকমত চিন্তা করিতে পারে না বা চিন্তা করিতে যাইয়া অযথা সময় নষ্ট করে বা সরল বিষয়কে কঠিন করিয়া ফেলে। যেমন, অনেকের "অঙ্কের বাতিক" আছে এবং ইঁহারা হয়ত' অতি সাধারণ হিসাব করিবার জন্যও এক জটিল 'গ্রাফ' আঁকিয়া ফেলেন বা বীজগণিতের সাঙ্কেতিক চিহ্নে উহাকে রূপান্তরিত করিয়া ফেলেন। সেইরূপ কোন কোন মনোবিদের সকল ক্ষেত্রেই মনোবিদ্যার কোন বিশেষ প্রত্যয় ব্যবহার করিবার 'বাতিক' আছে ; যেমন, একটি শিশু যখন ক্ষুধার তাড়নায় কাঁদিতেছে, সেই সময় হয়ত' তিনি ভাবিতে বসিলেন, "তাই ত' কি উদ্দীপকের জন্য এইরূপ প্রতিক্রিয়া হইতেছে?" অথবা "শিশুর কি অপপ্রতিযোজন হইতেছে?" অথবা "উহার মনে কী 'কম্প্লেক্স' হইয়াছে?" ইত্যাদি। এইভাবে সরল বিষয়বস্তুর

ক্ষেত্রে জটিল প্রক্রিয়ায় চিন্তা করিলে অশুদ্ধ যুক্তি দেখা দিবার সম্ভাবনা ঘটে।

(৩) মধ্যে মধ্যে আমরা চিন্তা করিবার কালে নানাপ্রকার বাক্-চাতুরীর কবলে পড়িয়া যাই। একই কথার বিভিন্ন অর্থ থাকিতে পারে এবং হয়ত' তাহা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আমরা উহা লক্ষ্য না করিয়া অনেক সময় যুক্তি করিয়া যাই বলিয়া শুদ্ধভাবে চিন্তা করিতে পারি না।[১৭]

(৪) তাহা ছাড়া, শুদ্ধচিন্তার জন্য যুক্তিশাস্ত্রে যে সকল নিয়মের উল্লেখ আছে, সেগুলি লঙ্ঘন করিলে হেত্বাভাস (fallacy) হয় এবং শুদ্ধ যুক্তি সম্ভব হয় না।

(৫) আমাদের মনের অপূরিত বাসনা আমাদের চিন্তাকে প্রভাবিত করে। স্বতঃচিন্তন, দিবাস্বপ্ন ইত্যাদিতে যে অশুদ্ধ চিন্তা প্রকাশ পায় তাহাতে অপূরিত অবদমিত বাসনার পরিচয় পাওয়া যায়। (পৃঃ ৬৫৭)।

(৬) অনেক সময় একদেশদর্শিতা (prejudice)-এর প্রভাবেও আমরা শুদ্ধভাবে বা নিরপেক্ষ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী হইতে চিন্তা করিতে পারি না।

(৭) ক্রোধ. ভয় ইত্যাদি তীব্র আবেগের ফলে শুদ্ধচিন্তার ক্ষমতা সাময়িকভাবে যেন লোপ পায় এবং সেই কারণ শুদ্ধচিন্তা সম্ভব হয় না।

(৮) কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ইত্যাদির প্রভাব হইতে আমরা সম্পূর্ণরূপে নিজেদের মুক্ত করিতে পারি না বলিয়া অনেক সময় অশুদ্ধ চিন্তা করি। (পৃঃ ৬৬৮)।

(৯) নির্জ্ঞান স্তরের বাসনা দ্বারা প্রেষিত হইয়া আমরা অশুদ্ধভাবে চিন্তা করি; কিন্তু প্রকৃত বাসনাকে চাপা দিবার জন্য আমরা মিথ্যা যুক্তিজালের অবতারণা করি। বলা বাহুল্য, এইগুলি সুযুক্তি নহে—যুক্ত্যাভাস (rationalization) মাত্র। (পৃঃ ৩৮৮)

বিশুদ্ধভাবে চিন্তা করিবার জন্য ধৈর্য, শিক্ষণ ও অভ্যাসের প্রয়োজন এবং যতদূর সম্ভব মনকে কুসংস্কার, তীব্র আবেগ ইত্যাদির প্রভাব হইতে মুক্ত রাখা উচিত। তবে চেষ্টা সত্ত্বেও প্রতি ব্যক্তিই অল্পবিস্তর ইহাদের প্রভাবে আসিয়া পড়ে এবং সেইজন্য সকল সময় শুদ্ধভাবে চিন্তা করা সম্ভব নহে।

১৭ এই প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য যুক্তিশাস্ত্রের Fallacy of Ambiguity বা ভারতীয় স্থায়-শাস্ত্রের ছল, জাতি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

পরিশিষ্ট (ক)

পরিসংখ্যান পদ্ধতি

আমরা বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা এবং সংবেদনের পরিমাণ বৃদ্ধির আলোচনা কালে দেখিয়াছি যে, মনঃ-সম্বন্ধীয় আলোচনার ক্ষেত্রে গাণিতিক পরিমাপের প্রচেষ্টা হইয়া থাকে। (পৃঃ ২১৪-২২, ৩১৪-১৯ এবং ৫৩০-৩৩ দ্রষ্টব্য)। গাণিতিক পরিমাপের একটা যথার্থতা (exactitude) আছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি ; তাই বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হইবার পর হইতে মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে পরীক্ষণের ফলাফল সংখ্যার আকারে প্রকাশের চেষ্টা দেখা দেয়। এইজন্য মনোবিদ্‌গণ পরিসংখ্যান বিজ্ঞান (Statistics)-এর সাহায্য গ্রহণ করেন, এবং মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান পদ্ধতি (statistical method)-এর প্রবর্তন করেন।

পরিসংখ্যান বিজ্ঞান বলিতে আমরা এমনই এক অঙ্কশাস্ত্রীয় বিজ্ঞান বুঝি যাহা কোন বিরাট্ জনসমষ্টি বা বস্তুসমষ্টি সম্বন্ধে সংখ্যার দ্বারা নির্দেশযোগ্য কতকগুলি তথ্য বা ঘটনার সংগ্রহ, সমাকলন ও শ্রেণীকরণের কার্যে নিযুক্ত থাকে এবং তাহার সাহায্যে সংখ্যায় প্রকাশযোগ্য নূতন উপাত্তের উপর আলোকপাত করে। সুতরাং **পরিসংখ্যান পদ্ধতি** বলিতে এমন এক পদ্ধতি বুঝায় যাহা সংখ্যার দ্বারা প্রদর্শিতব্য এবং প্রমাণযোগ্য তথ্যাবলীর ভিত্তিতে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে অনুসন্ধান কার্য চালাইয়া থাকে।

মনোবিদ্‌গণ ব্যক্তিগত পার্থক্য (individual differences)-এর বিচার ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান পদ্ধতি প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি পরীক্ষার জন্য আদর্শ মান (norm) নির্ধারণ এবং গোষ্ঠীমধ্যে ব্যক্তি-বিশেষের স্থান নিরূপণের জন্য এই পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগ ঘটিতে থাকে। ক্রমশঃ মনোবিদ্যার বিবিধ ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হইতে থাকে।

আমরা এখানে অতি সংক্ষেপে এই পদ্ধতির কয়েকটি মূল প্রত্যয়ের আলোচনা করিব।

আমরা যখনই কোন ব্যক্তির মান নির্ণয় করিতে চাই, তখনই প্রশ্ন উঠে : অপরের সহিত তুলনায় তাহার স্থান কোথায়? সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ব্যক্তি-বিশেষের মান নির্ণয়ের দ্বারা আমরা অনুসন্ধান করি যে, তাহার কার্যাবলী

সে যে দলভুক্ত সেই দলেরই অন্য সকলের মতন অথবা তাহার কার্যের বা আচরণের একটু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে যাহা অন্য সকলের নাই—অন্য সকলের যে দিকে 'প্রবণতা', তাহারও কি সেই দিকেই প্রবণতা অথবা ইহার বিপরীত। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে প্রশ্ন উঠে: কোন দল বা গোষ্ঠীর এই 'সাধারণ আচরণ বা ব্যবহার'-টি কী? কোন দল বা গোষ্ঠীর 'কেন্দ্রীয় প্রবণতা' (central tendency) বলিতে কি বুঝায়? উহাকে কি ভাবে নিরূপণ করা যাইবে? পরিমাপ বা গাণিতিক সংখ্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ইহা তিন উপায়ে নিরূপণ করা যাইতে পারে; যথা, গড়পড়তা বা সমক (average বা mean)-নির্ণয়, ভূষক (mode)-নির্ণয় এবং মধ্যক (median)-নির্ণয়।

ধরা যাউক্, রাম কোন এক পরীক্ষায় মনোবিদ্যায় ৪৬ নম্বর পাইয়াছে। আমরা কেবলমাত্র এই সংবাদের ভিত্তিতে রামের স্থান বা মান (rank) নির্ণয় করিতে পারি না—আমাদের জানিতে হইবে রামের সমদলীয় অন্য সকলে কিরূপ নম্বর বা সাফল্যাঙ্ক পাইয়াছে[১] মনে করা যাউক্, আমরা নিম্নলিখিত তথ্য সংগ্রহ করিলাম:

পরীক্ষার্থী		সাফল্যাঙ্ক (মার্কস্ বা নম্বর)	পরীক্ষার্থী		সাফল্যাঙ্ক
ক	...	৭০	ঝ	...	৪৬
খ	...	৫৮	ঞ	...	৪৬
গ	...	৫২	ট	...	৪৪
ঘ	...	৪৮	ঠ	...	৪৪
ঙ	...	৪৮	ড	...	৪০
চ	...	৪৬	ঢ	...	৩৪
ছ	...	৪৬	ণ	...	২২
জ (রাম)	...	৪৬			

মোট—১৫ জন পরীক্ষার্থী···৬৯০

১ Woodworth-এর ভাষায়: "A raw score becomes meaningful when it is compared with the scores of other individuals in the test." (*Psychology*, p. 59).

এই হিসাব হইতে বলা যায় যে, যেহেতু ১৫ জন ছাত্র মোট ৬৯০ সাফল্যাঙ্ক পাইয়াছে, **গড়পড়তা** (average) হিসাবে তাহারা ৬৯০ ÷ ১৫ = ৪৬ সাফল্যাঙ্ক পাইয়াছে। এই গড়ের হিসাবকে **সমক** (mean) বলে। বিভিন্ন ব্যক্তি কোন ক্ষেত্রে যে যে সাফল্যাঙ্ক (score) অর্জন করিয়াছে সেইগুলিকে যোগ করিয়া সমষ্টিকে ব্যক্তি-সংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে গড় বা সমকের হিসাব পাওয়া যায়। এই 'সমক' হইল কেন্দ্রীয় প্রবণতার অন্যতম নির্দেশক। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বলা যায় যে, যেহেতু রামও ৪৬ পাইয়াছে, তাহার মান (rank) মাঝারি (average); কিন্তু 'ক'-এর মান উহার অনেক ঊর্ধ্বে এবং 'ণ'-এর মান উহার অনেক নিম্নে।

আবার 'কেন্দ্রীয় প্রবণতা' নির্ধারণের জন্য অপর এক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে প্রশ্ন করা যাইতে পারে : কোন্ অঙ্ক সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ছাত্র পাইয়াছে? উপরের তালিকা হইতে দেখা যায় যে, পাঁচটি ছাত্র ৪৬ সাফল্যাঙ্ক পাইয়াছে। যে অঙ্ক বেশী বার কোন ক্ষেত্রে ঘটে, তাহাকে উহার **ভূষক** (mode) বলে।[২] এই দিক্ হইতেও বলা যায় যে, রাম 'মধ্যম মান' বা মাঝারী স্থান অধিকার করিয়াছে।

আর একভাবে 'কেন্দ্রীয় প্রবণতা' অনুসন্ধান করা যাইতে পারে—প্রশ্ন করা যাইতে পারে : অঙ্কগুলি যদি ক্রমানুসারে সাজান যায়, তাহা হইলে ঠিক মধ্যবর্তী সংখ্যাটি কী হইবে? এই মধ্যবর্তী সংখ্যাটিকে বলে **মধ্যক** (median)।[৩] উপরের উদাহরণে 'জ' বা রামের সাফল্যাঙ্ক (অর্থাৎ ৪৬) একদিকে 'ক' হইতে 'ছ' এবং অপরদিকে 'ঝ' হইতে 'ণ'-কে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং এই সংখ্যাকে বর্তমান ক্ষেত্রে মধ্যকের নির্দেশক বলা যায়। সুতরাং এই দিক্ হইতেও বলা যায় যে, রামের সাফল্যাঙ্ক ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে আছে।[৪]

২ এইজন্য ইহাকে 'fashion in cases' বা 'most *frequent* score' বলা হয়।

৩ এইজন্য মধ্যক (median)-কে বলা হয় "midpoint in the series" (অবশ্য এই সারি বা series-টি ক্রমানুসারে সাজান বা 'arranged in order of size' হওয়া চাই)।

৪ আমরা উপরে যে সকল উদাহরণগুলি লইয়াছি, তাহাদের মোট সংখ্যা হইল বিজোড় (আলোচ্য ক্ষেত্রে, ১৫) ; সুতরাং এখানে মধ্যক নির্ণয়ের সুবিধা আছে। কিন্তু যদি উহা জোড় সংখ্যা হয়, তাহা হইলে মধ্যক কিভাবে স্থিরীকৃত হইবে? এরূপ ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী দুইটি অঙ্ক লইয়া তাহাদের আবার সমক সংখ্যা গ্রহণ করিতে হইবে। ধরা যাউক, কোন একটি পরীক্ষণে ছয়জন ব্যক্তির সাফল্যাঙ্ক যথাক্রমে ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, সুতরাং এ ক্ষেত্রে মধ্যক হইবে ১০ ও ১১-এর মাঝামাঝি, অর্থাৎ ১০'৫।

আমরা উপরে যে উদাহরণ গ্রহণ করিয়াছি তাহাতে সমক, ভূষক ও মধ্যক (mean, mode ও median) সবগুলিই একই অঙ্কের হইয়াছে। যেখানে বণ্টনের হার (frequency distribution) নির্দিষ্ট পরিমাণে ধীরে ধীরে উঠিয়াছে এবং মধ্যবিন্দুতে পৌঁছাইয়া ধীরে ধীরে ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণে নামিয়া আসিয়াছে, সেইখানেই ইহা সম্ভব। এই অবস্থাকে গ্রাফে বিভিন্ন বিন্দু দ্বারা চিহ্নিত করিয়া উহাদের সংযুক্ত করিলে একটি ঘণ্টাকৃতি প্রতিসাম্যবিশিষ্ট বক্ররেখা (bell-shaped symmetrical curve) গঠিত হইবে। ইহাই হইল আদর্শ স্বাভাবিকতার নির্দেশক (ইহাকে বলা হয় **Normal Curve** ; পৃঃ ৭৬ দ্রষ্টব্য)। যে কোন প্রলক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই বক্ররেখার শীর্ষক-কে কেন্দ্র করিয়াই অধিকাংশ আছে ; ইহাকে কেন্দ্র করিয়া ইহার যত নিকটে যে থাকিবে, সে তত স্বভাবী (normal) এবং ইহা হইতে যে যত দূরে সরিয়া যাইবে, সে সেই পরিমাণ অস্বভাবী (abnormal)। অবশ্য অ-স্বভাবী আবার দুইটি বিপরীত প্রকারের হয়—এক প্রকারের অস্বভাবী হইল যাহাদের মধ্যে আলোচ্য প্রলক্ষণ সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে আছে (ইহাদের সাফল্যাঙ্ক খুব বেশী) এবং আর এক প্রকারের অস্বভাবীদের মধ্যে ঐ প্রলক্ষণটি অতি অল্প পরিমাণে আছে (ইহাদের সাফল্যাঙ্ক খুবই কম)। (উপরের উদাহরণে 'ক' ও 'খ'-এর সাফল্যাঙ্কের সহিত 'ণ' ও 'ঢ'-এর সাফল্যাঙ্কের তুলনা করা যাইতে পারে)।

এ ক্ষেত্রে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সকল সময়ই যে কোন প্রলক্ষণের বণ্টন স্বাভাবিকতার আদর্শানুগ হইবে তাহা নহে—কতকগুলি ব্যক্তির ক্ষেত্রে কোন প্রলক্ষণের পরিমাণ খুব বেশী থাকিতে পারে ; অথবা মাত্র কয়েকজনের ঐ প্রলক্ষণ খুব কম থাকিতে পারে। এরূপক্ষেত্রে বক্ররেখাটি একদিকে অসমভাবে বক্র (skewed) হইয়া যাইবে। বলা বাহুল্য এরূপস্থলে সমক-টি মধ্যক বা ভূষকের সহিত এক হইবে না। কল্পনা করা যাউক্ যে, উপরের উদাহরণে 'ক' মনোবিদ্যায় ৯৫, 'খ' ৭৮ এবং 'গ' ৬৭ পাইয়াছে এবং অন্য সকলের অঙ্ক অপরিবর্তিত আছে ; তাহা হইলে গড় বা সমক বাড়িয়া হইতেছে ৫০, কিন্তু মধ্যক ও ভূষক ৪৬-ই আছে। বাস্তবিক গোষ্ঠী যত বিস্তৃত হইবে, ততই সমক, মধ্যক ও ভূষকের অঙ্ক পৃথক্ হইবার সম্ভাবনা।

গোষ্ঠী যেখানে খুব বিস্তৃত বা বিরাট্ সেখানে সকলের সাফল্যাঙ্ক বিচার

করা সম্ভব নহে। এরূপ ক্ষেত্রে নমুনা (sample)[৫] গ্রহণ করিতে হইবে। অবশ্য ইহা সতর্কতার সহিত নির্বাচন করা উচিত।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, ব্যক্তি-বিশেষের যোগ্যতা তুলনামূলক বিচারের উপর নির্ভর করে। এই যোগ্যতা বিচারের জন্য আমাদের অনুসন্ধান করিতে হয় যে ব্যক্তি-বিশেষের সাফল্যাঙ্ক গড় বা সমক হইতে কত দূরে; অর্থাৎ আমাদের অনুসন্ধানের বিচার্য বিষয় হইল ব্যক্তি-বিশেষ মাঝারীর তুলনায় কতটা ভাল বা কতটা মন্দ। এইজন্য 'মাঝারী' বা 'কেন্দ্রীয় প্রবণতা' হইতে ব্যক্তি-বিশেষের 'দূরত্ব' বা 'বিচ্যুতি' জানা প্রয়োজন।

সমক-দূরত্ব, সমক-বিচ্যুতি বা 'ব্যত্যয় সমক' (Mean Deviation বা Average Deviation, সংক্ষেপে MD বা AD) নিম্নলিখিতভাবে হিসাব করা হয়। ধরা যাউক্, কোন এক ক্ষেত্রে ৫ ব্যক্তির সাফল্যাঙ্ক যথাক্রমে ১০, ১২, ১৪, ১৬ ও ১৮: এস্থলে সমক বা গড় হইল সাফল্যাঙ্কগুলির সমষ্টি বা ৭০÷৫, অর্থাৎ ১৪। এই সমক হইতে প্রথম ব্যক্তির দূরত্ব বা বিচ্যুতি ৪ কম, বা −৪, দ্বিতীয় ব্যক্তির দূরত্ব −২, তৃতীয় ব্যক্তির দূরত্ব নাই অর্থাৎ ০, চতুর্থ ব্যক্তির দূরত্ব ২ বেশী বা +২ এবং পঞ্চম ব্যক্তির দূরত্ব +৪; যোগ-বিয়োগের বা বেশী-কমের চিহ্ন অগ্রাহ্য করিলে ইহাদের যোগফল ৪+২+০+২+৪ =১২; ইহাকে ৫ দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল হইবে ২·৪—ইহাই হইল প্রতি ব্যক্তির সমক হইতে বিচ্যুতির বা দূরত্বের নির্দেশক (বা MD)।

আদর্শ বিচ্যুতি (Standard Deviation বা সংক্ষেপে SD) নির্ধারণের নিয়ম হইল এইরূপ। এ ক্ষেত্রে প্রতি ব্যক্তির সাফল্যাঙ্ক সমক-অঙ্ক হইতে কতদূর তাহা হিসাব করিয়া প্রত্যেকটি মূল্যের বর্গ করিতে হইবে। উপরের উদাহরণটি গ্রহণ করিলে এই সংখ্যাগুলি হইবে যথাক্রমে $(-৪)^২$, $(-২)^২$, $০^২$, $২^২$, $৪^২$ —ইহাদের যোগফল হইবে ১৬+৪+০+৪+১৬=৪০; যেহেতু ৫ জনের সাফল্যাঙ্কের বিচার করা হইতেছে, সেই হেতু ইহাকে ৫ দ্বারা ভাগ করিতে হইবে। ভাগফল হইল ৪০÷৫=৮; ইহার আবার

৫ Sampling-প্রক্রিয়ার সংজ্ঞা হইল: "The selection, usually at random, of a limited number from a large group of a population, for testing or statistical treatment, on the assumption that the sample may be taken as representative, for the particular purpose, of the whole group." (Drever's *Dictionary of Psychology.*)

বর্গমূল লইলে আদর্শ-বিচ্যুতির অঙ্ক পাওয়া যাইবে।[৬] অর্থাৎ এখানে SD হইল $\sqrt{৮}$ বা ২'৮৩।

আবার আর এক প্রকার উপায়ে ব্যক্তি-বিশেষের মান নির্ধারণ করা হয়। ইহাতে দেখা হয় ব্যক্তি-বিশেষ তাহার সমদলীয়দের সহিত তুলনায় শতকরা কত জনের অনুরূপ। ইহাকে 'শতকরা মান-নির্ধারণ' (Percentile Rating) বলে (পৃঃ ২২১ দ্রষ্টব্য)।

ইহা ব্যতীত ব্যক্তি-বিশেষের বিবিধ প্রলক্ষণ বা গুণাবলীর পারস্পর্যের বিচার করা হয়। একই ব্যক্তির মধ্যে বিবিধ প্রলক্ষণের সমাবেশ থাকে —যেমন, একজন বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ, সাধু ও পরিশ্রমী হইতে পারে। সুতরাং এখানে বিচার্য বিষয় হইল একটি প্রলক্ষণের অস্তিত্ব হইতে আর একটির সম্ভাবনা কতদূর আশা বা অনুমান করা যাইতে পারে। এইজন্য একই গোষ্ঠী আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে ঐ সব বিবিধ প্রলক্ষণ পরস্পরের সহিত সম্বন্ধযুক্তভাবে কী হারে বর্তমান আছে। যেখানে দুইটি প্রলক্ষণের মধ্যে পূর্ণ মিল থাকে অর্থাৎ একটি থাকিলে আর একটি থাকিবার পূর্ণ সম্ভাবনা, সেখানে উহাকে +১'০০ চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়, যেখানে উহার বিপরীত অর্থাৎ একটি থাকিলে অপরটি থাকিবে না, সেখানে উহাকে −১'০০ চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যেখানে দুইটির যোগসূত্র নিতান্তই আকস্মিক (purely accidental), সেখানে উহাকে '০' (শূন্য) দ্বারা প্রকাশ করা হয় (পৃঃ ১৯৭-পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে এই পারস্পর্যের হিসাবের বিশেষ তাৎপর্য আছে। ছাত্রদের ক্ষেত্রে বিষয়-নির্বাচন, ব্যক্তি-বিশেষের ভবিষ্যৎ বৃত্তি-নির্বাচন ইত্যাদি ব্যাপারে ইহা আলোকপাত করে। ব্যক্তি-বিশেষের দৈর্ঘ্যের সহিত তাহার ওজনের কী সম্পর্ক? বুদ্ধির সহিত অপরাধপ্রবণতার কি পারম্পর্য আছে? পিতামাতার এক সন্তান যাহারা তাহারা কি কঠোর পরিশ্রমের অনুপযুক্ত? স্থূল-দেহিত্বের সহিত রসিকতার কী সম্বন্ধ? স্কুলে যে ছাত্র ভাল ছিল, সে কি কলেজেও পরীক্ষার ফল ভাল করিবে? যে পদার্থবিদ্যায় ভাল ছাত্র, সে কি

[৬] Standard Deviation-এর সংজ্ঞা হইল: "The square root of the mean of the squares of individual *deviations* from the mean in a series." (Drever's *Dictionary of Psychology*)। ইহাকে গ্রীক সিগ্‌মা (σ) অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

ইংরাজী সাহিত্যে ভাল করিবে? যে H. S. বা I. A. পরীক্ষায় তর্কশাস্ত্রে ভাল ফল পাইয়াছে, সে B. A. পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রেও কি ভাল ফল পাইবে? —ইত্যাদি প্রশ্নের সদুত্তরের জন্য পারস্পর্যের বিচারের প্রয়োজন হয়।

সুতরাং যদি দুইটি প্রলক্ষণ বা যোগ্যতা (trait বা ability)-এর পারস্পর্য হয় +'৭০, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে, ঐ দুইটি প্রলক্ষণ বা যোগ্যতার মধ্যে পূর্ণ ঐক্য না থাকিলেও, উহাদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে এবং উহাদের সহ-অবস্থিতির সম্ভাবনা অধিক। কিন্তু যদি ঐ দুইটির মধ্যে পারস্পর্যের হার হয় +'২০, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, উহাদের মধ্যে বিরোধিতা না থাকিলেও উহাদের সাদৃশ্য খুবই কম।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা[৭] হইতে দেখা যায় যে, মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান পদ্ধতির প্রয়োগের ফলে ব্যক্তি-বিশেষকে বুঝিবার ও জানিবার অনেক সুবিধা হয়।

৭ পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের মূল বিষয়ের আলোচনার জন্য Lindquist, *A First Course in Statistics* দ্রষ্টব্য। মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান পদ্ধতির আলোচনার জন্য Garrett, *Statistics in Psychology and Education* দ্রষ্টব্য।

পরিশিষ্ট (খ)

দর্শন ও মনোবিদ্যা

দর্শনের সহিত মনোবিদ্যার সম্বন্ধ সুনিবিড়। অতীতে মনোবিদ্যা দর্শনের অঙ্গস্বরূপ ছিল; কিন্তু সাম্প্রতিক কালে মনোবিদ্যা দর্শন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। সুতরাং বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে: দর্শন ও মনোবিদ্যার সম্বন্ধ কি?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে দর্শন কী তাহা জানা প্রয়োজন; কিন্তু দুঃখের বিষয় দর্শনের স্বরূপ লইয়া দার্শনিকদের নিজেদের মধ্যেই যথেষ্ট মতভেদ আছে।[১] মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, দর্শন মানুষের জ্ঞানের উৎপত্তি, সীমা, মূল্য ও সত্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বিশ্বের চরম ব্যাখ্যা দানের প্রচেষ্টা করে[২]; একদল দার্শনিক ঈশ্বর, আত্মা ইত্যাদি ইন্দ্রিয়োত্তর তত্ত্বের সত্যতা স্বীকার করিয়া উহাদের স্বরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হ'ন; একদল ঐ তত্ত্বজ্ঞানের সম্ভাবনা সম্বন্ধে মৌনভাব অবলম্বন করেন; আবার আর একদল উহাদের অস্তিত্ব সরাসরি অস্বীকার করেন। সাধারণভাবে বলিতে গেলে দর্শনের দুইটি বিভাগ আছে: জ্ঞানবিদ্যা (Epistemology) এবং তত্ত্ববিদ্যা বা পরাবিদ্যা (Ontology)।

১ "কেহ কেহ দর্শনকে সাধারণ বিজ্ঞানের পর্যায়ে টানিয়া আনিয়াছেন এবং দর্শন বলিতে বিভিন্ন বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানের সঙ্কলন ও সমন্বয় বুঝিয়াছেন; কেহ কেহ বলিয়াছেন দর্শন ও বিজ্ঞান সম্পূর্ণ বিপরীতগামী—দুইটির আলোচ্য বিষয়বস্তু এবং আলোচনার প্রক্রিয়া ও ধারা বিভিন্ন। কেহ কেহ মনে করেন দর্শনের আলোচনাক্ষেত্র হইতে তত্ত্ববিদ্যাকে (Metaphysics) বহিষ্কার করা প্রয়োজন; আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন তত্ত্ববিদ্যাই প্রকৃত দর্শন। কাহারও কাহারও দর্শন জ্ঞানবিদ্যায় (Epistemology) পরিসমাপ্ত হইয়াছে, আবার কেহ বা ইহা লইয়া বিশেষ আলোচনা করেন নাই। কেহ কেহ দর্শনের আলোচনাক্ষেত্র সুদূরপ্রসারী মনে করেন এবং জ্ঞানবিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা, তত্ত্ববিদ্যা ব্যতীতও মনোবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি সমস্ত কিছুই দর্শনের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। আবার দর্শনের উদ্দেশ্য লইয়াও মতভেদ আছে। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের নিকট দর্শন কেবলমাত্র বুদ্ধির তৃপ্তিদানই করে না, ইহা সত্যের স্বরূপ বুঝিবার অন্তর্দৃষ্টি দান করে এবং মোক্ষলাভে সহায়তা করে—এইজন্য দর্শন মোক্ষশাস্ত্রও বটে।" ('দর্শন', বৈশাখ, ১৩৬২, গ্রন্থকার-রচিত 'দার্শনিক ব্যাখ্যা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

মনোবিদ্যার সহিত দর্শনের সম্বন্ধ আলোচনা করিতে হইলে জ্ঞানবিদ্যা ও তত্ত্ববিদ্যা উভয়েরই সহিত দর্শনের সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে হইবে।

মনোবিদ্যার যে অংশ চিন্তন লইয়া আলোচনা করে (ইংরাজীতে যাহাকে বলে Psychology of Thought) সেই অংশ হইতে জ্ঞানবিদ্যার অভ্যুদয়। জ্ঞানবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হইল: জ্ঞানের স্বরূপ কি? জ্ঞান কি একটি ক্রিয়া-বিশেষ, অথবা ইহা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়র মধ্যে একটি সম্বন্ধমাত্র? ইহার উপাদান কি কি? আমাদের প্রত্যক্ষ দ্বারা কি আমরা বাস্তবজগৎ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান পাই? সত্যজ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞানের পার্থক্য কোথায়? বলা বাহুল্য, জ্ঞান সম্বন্ধীয় এই বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য মনোবিদ্যার সাহায্য একান্ত প্রয়োজন।

আবার বিশ্ব সম্বন্ধে চরম ব্যাখ্যা দিবার জন্য দর্শন বিভিন্ন বিজ্ঞান হইতে উপাদান সংগ্রহ করে; সেই হিসাবে মনোবিদ্যা হইতেও দর্শন যথেষ্ট সাহায্য পাইয়া থাকে। যেহেতু দর্শন জ্ঞানের স্বরূপ, আত্মা ইত্যাদি বিষয় লইয়া আলোচনা করে, সেই হেতু অন্যান্য বিজ্ঞান অপেক্ষা মনোবিদ্যার সহিত দর্শনের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর। মন সম্বন্ধে মনোবিদ্যা যে আলোচনা করে, সেই আলোচনার ভিত্তিতে দর্শন মনের স্বরূপ জানিবার চেষ্টা করে। মনের বিভিন্ন পরিবর্তনশীল অবস্থার পশ্চাতে কোন স্থায়ী সত্তা আছে কি না, তাহা আলোচনা করিবার সময় 'মন' সম্বন্ধে মনোবিদ্যার অভিমত দার্শনিকের জানা প্রয়োজন। 'মন' সম্বন্ধে মনোবিদ্যার অভিমত জ্ঞান, চেতনা ও আত্মা সম্বন্ধে দার্শনিকের অভিমতকে প্রভাবিত করে।[২]

আবার দর্শন কেবলমাত্র মনোবিদ্যার নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণই করে না, মনোবিদ্যাকেও যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে। একথা সত্য মনোবিদ্যা আজ স্বাধীন হইয়াছে; কিন্তু এই স্বাধীনতার অর্থ ইহা নহে যে, মনোবিদ্যা দর্শন হইতে সম্পূর্ণ সংস্রবহীন থাকিবে। প্রত্যেক বিজ্ঞানই এক হিসাবে অসম্পূর্ণ—

২ দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল (Bertrand Russell) বলিয়াছেন: "I am interested in psychology not so much for its own sake, as for the light that it may throw on the problem of knowledge." (*The Analysis of Mind*, p. 15).

বার্ট্রাণ্ড রাসেল এবং বিশেষতঃ আমেরিকার নব্য বাস্তববাদী (Neo-Realists), যথা, হোল্ট (Holt) ব্যবহারবাদ বা চেষ্টিতবাদ দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

কোন বিজ্ঞানই বিশ্বের চরম ব্যাখ্যা দিবার প্রয়াস করে না ; প্রত্যেক বিজ্ঞানই তাহার সীমিত ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকে। তাহা ছাড়া, বিজ্ঞান কতকগুলি চরম বিষয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লয়, উহা লইয়া কোন আলোচনা করে না (যেমন, স্থান, কাল ইত্যাদি)। আবার এক একটি বিশেষ বিজ্ঞান এক একটি বিশেষ বিষয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লয় ; যেমন, পদার্থবিদ্যা জড়পদার্থের অস্তিত্ব প্রথম হইতেই মানিয়া লয়। সেইরূপ, অধিকাংশ মনোবিৎই মানসিক সত্তা স্বীকার করিয়া লইয়া মনের বিভিন্ন প্রকাশ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হ'ন। বিজ্ঞানের দ্বারা বিনা যুক্তিতে স্বীকৃত এই বিভিন্ন সত্তার স্বরূপ লইয়া আলোচনা করেন দার্শনিক ; সুতরাং দার্শনিকের নিকট বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক জানিতে পারেন তাঁহাদের বিভিন্ন 'স্বতঃসিদ্ধ' সত্তার অস্তিত্ব কল্পনা করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে মনোবিদ্যাও দার্শনিকের নিকট ঋণী। অনেক মনোবিৎই পরিবর্তনশীল অভিজ্ঞতার পশ্চাতে আপেক্ষিকভাবে স্থায়ী একটি মানসিক সত্তার অস্তিত্ব বিনাযুক্তিতে গ্রহণ করেন ; তাঁহাদের এই স্বীকৃতি কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহা বিচার করিবেন দার্শনিক।[৩] তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, স্বীয় অনুসন্ধানের সম্পূর্ণতা লাভের জন্য এবং বিনা যুক্তিতে গৃহীত ধারণাসমূহের যৌক্তিকতা বিচার করিবার জন্য দর্শনের নিকট অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় মনোবিদ্যাও সাহায্যপ্রার্থী।

তবে এই ব্যাপারে মনোবিদ্যা দর্শনের নিকট বিশেষ প্রকারের সাহায্য পাইতে পারে। মনোবিদ্যা স্বাধীন হইবার পর হইতে মনোবিদ্যার রাজত্বে এত বিভিন্ন রকমের মতবাদ দেখা দিয়াছে যে, সেখানে শান্তি ও শৃঙ্খলার একান্ত অভাব। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, সকল বিজ্ঞানেই নানারকম মতবাদ আছে। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি বিজ্ঞানে সম্ভবতঃ এই প্রকার গভীর মতভেদ নাই ; যেমন, আধুনিক কালের পদার্থ-বিদ্‌রা সকলেই তথাকথিত জড়বাদ পরিত্যাগ করিয়া শক্তিবাদ (যাহা 'ইলেকট্রনিক মতবাদ' নামে খ্যাত) গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রকারের মতৈক্য মনোবিদ্যায় নাই ; আধুনিক মনোবিদ্‌গণের মধ্যে কত যে মতবাদ প্রচলিত

৩ কোন কোন লেখক মনে করেন : "The existence of the self is the minimum metaphysical assumption of Psychology."

আছে, তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য। আধুনিক মতগুলির মধ্যে কয়েকটির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: ব্যবহারবাদ (Behaviorism), গেস্টাল্ট্ মতবাদ (Gestalt Theory), উদ্দেশ্যসাধনবাদ (Hormic Theory), মনঃসমীক্ষণবাদ (Psychoanalytic view)—ইহাদের আবার বিভিন্ন উপশাখা আছে।[৪] মনোবিদ্যার রাজত্বে এতপ্রকার মতভেদের কারণ এই যে, ইহা নিতান্ত তরুণ বিজ্ঞান। মানুষ যতপ্রকার শাস্ত্রের আলোচনা করে, দর্শন তাহার মধ্যে প্রবীণতম। এই প্রবীণতম শাস্ত্রের সাহায্য লইলে তরুণ বিজ্ঞান মনোবিদ্যা স্বীয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতবাদের আলোচনা করিয়া ঐক্য স্থাপন করিতে পারিবে, ইহা আশা করা যায়।[৫]

পরিশেষে আমরা বলিব যে, দর্শন ও মনোবিদ্যা আজ পরস্পর হইতে পৃথক্ হইলেও তাহারা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না বা বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করাও উচিত নহে। মনোবিদ্যার ভিত্তিতে দর্শনের অনেক মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে[৬], আবার দর্শন মনোবিদ্যার মূল ধারণাগুলির স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে

---

৪ আধুনিক মনোবিদ্যায় কতপ্রকার মতভেদ আছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণের জন্য বর্তমান গ্রন্থের ৪র্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৯২৫ ও ১৯৩০ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত যে সমস্ত মতবাদ সাম্প্রতিক কালে প্রচলিত হয় তাহার বিবরণী *Psychologies of 1925* ও *Psychologies of 1930*, এই দুই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে।

৫ Indian Philosophical Congress-এর ১৯৫০ সালের মনোবিদ্যা-শাখার সভাপতি শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার ভাষণে বলেন: "There is to-day no psychology, but psychologies, to all appearance, warring creeds that tend more and more to fall apart. Philosophy by applying its great canon of knowledge and of criticism, namely, the principle of consistency may remove their incongruities, curb down their excesses, smoothen their irregularities and co-ordinate and unite them into a single system." (*Proceedings of the Congress*, p. 58).

এই প্রসঙ্গে *Psychological Review*, Vol. 55, G. A. Balz-রচিত 'Relations between Philosophy and Psychology'-নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৬ তুলনীয়: "...a great number of apparently psychological discussions are really philosophical discussions in disguise. Because of their interest in the tools and methods of knowledge philosophers have been always extremely interested in the mind...Over and over again we find epistemological and logical questions about different classes of assumptions disguised as psychological questions about the eqipment and workings of the mind." (Brett's *History of Psychology*, p. 29).

পারে এবং বিভিন্ন মতবাদের যুক্তিসম্মত বিচার করিয়া শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে পারে। সুখের বিষয় মনোবিদ্যা পরীক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবার পর দর্শন ও মনোবিদ্যার মধ্যে যে প্রভেদ সৃষ্টি হইয়াছিল, মনোবিদ্যাকে কৃষ্টি-সম্পর্কীয় বিজ্ঞান করিবার সমর্থকেরা, গেষ্টাণ্টবাদীরা এবং পরা-মনোবিদ্যা (Parapsychology)-এর সমর্থকেরা সেই বিভেদ আজ অনেকটা দূর করিয়াছেন।[৭]

৭ দর্শনের প্রতি মনোবিদ্যার আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী বর্ণনা প্রসঙ্গে মারফি (Murphy) বলিয়াছেন : "...whereas contemporary British, French and American psychology can be portrayed in some degree of detachment from prevalent philosophical systems, no such separation is possible in relation to contemporary German psychology. Germany is witnessing in many quarters a widespread revolt against experimentalism and a recourse to methods which are as fully philosophical as they are psychological." (*An Historical Introduction to Modern Psychology* Preface, p. xii).

পরিশিষ্ট (গ)

প্রশ্নমালা

প্রথম অধ্যায় (মনোবিদ্যার স্বরূপ)

1. Explain the implications of the following statement: "The standpoint of present-day Psychology is scientific." Does the standpoint of Psychology differ from that of natural sciences?

2. Explain the nature of Psychology as a science. Should it be called a *natural science*?

3. What is meant by the expression 'cultural science'? Why is Psychology characterised by some writers as a cultural science?

4. Examine the following definitious of Psychology:
   (*a*) Psychology is the science of soul;
   (*b*) Psychology is the science of mind;
   (*c*) Psychology is the science of consciousness;
   (*d*) Psychology is the science of behaviour.

5. Critically consider McDougall's definition of Psychology as "the positive science of the behaviour of living things."

6. Describe the scope (or subject-matter) of Psychology as a science.

7. In what sense is the standpoint of Psychology *individualistic*? If Psychology is individualistic in its outlook, can it give us *universal* laws relating to mind?

8. It has been said that so many men, so many minds. How, then, can you expect to establish the *science* of Psychology?

9. Explain fully the mutual relations of Thinking, Feeling and Willing.

10. "A psychology which has no place for the concepts of meaning and value cannot be complete psychology." (Koffka). Do you agree? Compare this attitude with Titchener's.

দ্বিতীয় অধ্যায় (পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি)

1. What is meant by 'data' in Psychology, and what are the methods of their study?

2. What is Introspection? What are its disadvantages? How can they be overcome? "All introspection is retrospection." Do you agree?

3. What is Objective Method (or, Inspection)? What are its merits and demerits? Is it sufficient by itself?

4. Discuss the attitude of the Behaviorists to Introspection.

5. What is Experimental Method? How can experiments be successfully applied in the field of Psychology?

6. How far is experimental method applicable to Psychology? Discuss, with reference to the methods adopted, how far Psychology can be regarded a science.

7. Write notes on:

(*a*) Genetic Method, (*b*) Clinical Method, (*c*) Case History Method, (*d*) Analytic Method.

তৃতীয় অধ্যায় (মনোবিদ্যার শাখা)

1. What is Animal Psychology? How can animal minds be studied? How does the study of *animal* mind help the study of *human* mind?

2. Explain the subject-matter of Child Psychology. How does the study of child mind help the study of adult mind?

3. State the scope of Social Psychology. Show how it plays an important role in the field of present-day Psychology.

4. Give a short account of the scope and development of Educational Psychology.

5. What is Industrial Psychology? Give a short account of the different problems with which it is concerned.

6. Explain the concept of 'Abnormal.' How does the abnormal differ from the normal? Describe in this connection the scope of Abnormal Peychology. "The field of Abnormal Psychology, as its pioneers defined the subject, is now a matter of interest only to the historian of psychology."—Discuss.

7. What is Physiological Psychology? What is the importance of the study ef Psychology in psychological discussions?

8. What is Experimental Psychology? Give a short account of its development with special reference to the contri-

butions of Wundt. Show how the scope of Experimental Psychology has expanded now-a-days. Is it proper to look upon Experimental Psychology as a *separate branch* of Psychology ?

চতুর্থ অধ্যায় (মনোবিদ্‌গণের বিভিন্ন সম্প্রদায়)

1. What are the points at issue between Structuralism and Fuctionalism (or, Dynamism) ? What is the value of Structuralism in contemporary Psychology ?

2. Give a critical account of Behavioristic Psychology. Show how the Behaviorists try to explain all mental phenomena in terms of S→R formula.

3. Give a short account of the development of Gestalt Psychology. What are the contributions of Gestalt Psychology in the fields of Perception and Learning ?

4. Both Behaviorism and Gestalt Psychology protested against Associationism, but from different standpoints. Discuss.

5. What are the main tenets of Freudian Psychology ? How do Adler and Jung differ from Freud ?

6. Explain after Freud the concept of the Unconscious. What, according to him, are the different levels of mind ? Compare Freud's view with Jung's.

7. Give a critical review of McDougall's Hormic Psychology.

পঞ্চম অধ্যায় (মনোবিদ্যা পাঠের উপকারিতা)

1. Examine the following statement : "Psychology is a useless study, inasmuch as people who study Psychology cannot improve their mind."

2. Explain the utility of the study of Psychology. Mention some of the problems of individual life to the solution of which Psychology may offer some aid.

3. Explain the utility of Psychology in social life with special reference to its applications to the solutions of educational, industrial and general social problems.

ষষ্ঠ অধ্যায় (স্নায়ুতন্ত্র)

1. What is a neuron? What are its different parts? Explain their structure and function. Give suitable diagrams.

2. State the nature and character of nervous impulse. Explain All-or-None Law.

3. Describe the structure of the Spinal Cord. Show how it functions as a conduction path and as a reflex centre.

4. Describe by means of suitable diagrams the ascending and descending tracts.

5. State the functions of the Cerebellum with special reference to the recent experimental and clinical findings.

6. Give a diagrammatic sketch of the Cerebrum, and point out its different areas. Describe the functions of the different parts or areas of the cerebrum.

7. Are different functions localised in different areas of the Cerebrum, or does it act as a whole? (or, Is there a rigid division of labour in the brain?)

8. What is Autonomic Nervous System? What are its two main divisions? What are their different functions?

9. Explain the Mind-Body problem from the psychological standpoint. "It is the *teleological* point of view which is distinctive of Psychology; and whether we adhere to the hypothesis of parallelism or to that of interaction, this teleological point of view remains unaffected." —Discuss.

10. Explain how mental processes are related to bodily processes. Give examples.

11. Write short notes on:

(*a*) Synapse, (*b*) Neurone, (*c*) Bell-Magendie Law, (*d*) Reflex Arc, (*e*) Medulla Oblongata, (*f*) Thalamus, (*g*) Silent Areas of the cerebrum, (*h*) Cranial Nerves.

সপ্তম অধ্যায় (বুদ্ধির পরীক্ষা ও পরিমাপ)

1. Examine the following definitions of intelligence:

(*a*) Intelligence is a general capacity of an individual consciously to adjust his thinking to new requirements.

(*b*) Intelligence means intellect put to use.

(c) Intelligence is the capacity to learn.
(d) Intelligence is ability to carry out abstract thinking.
(e) Intelligence is only a functional resultant, a behaviour value.
(f) Intelligence is a function of the Central Nervous System.

2. Show your acquaintance with some of the methods of testing and measuring intelligence. What is I. Q. ? How is it determined ? Give illustrations.

3. Explain how Spearman distinguishes between 'G' and 'S' of intelligence.

4. How can different Standard Tests for intelligence be determined ? What are the criteria for standardization ?

5. Is there any correlation between intelligence and delinquency ? Discuss fully.

6. What is feeble-mindedness ? What are its different grades ? Give illustrations.

7. What is the importance of Intelligence Tests ? Discuss with special reference to their applicability in the fields of education and vocational selection.

8. In what sense can we speak of measurement of intelligence ? Can there be any *real measurement* of it ?

অষ্টম অধ্যায় (ব্যক্তিত্বের স্বরূপ ও উপাদান)

1. Explain fully what you mean by 'personality'. Discuss in this connection the following definitions of personality :

(a) Personality implies the quality of an individual's adaptation to the social features of his environment.
(b) Personality is the social stimulus value of an individual.
(c) Personality is the sumtotal of different traits.
(d) Personality is what personality does.
(e) Personality is what a man really is.

2. Give a short account of the different current theories of personality.

3. What is personality? What are its main factors? Is personality a product (or, resultant) of heredity or of environment or of both?

4. What is heredity? How are hereditary characteristics transmitted? Are acquired characteristics inherited?

5. Describe the main features of ductless glands. What are their influences on personality?

6. What is meant by integration and dissociation of personality? Illustrate some forms of dissociation.

7. Write short notes on:

(*a*) Monadistic Theory of Personality, (*b*) Chromosomes & Genes, (*c*) Personality of twins, (*d*) Mendel's Law, (*e*) Hormone, (*f*) Acromegaly, (*g*) Cretinism, (*h*) Myxœdema, (*i*) Influence of Family Life on an individual.

নবম অধ্যায় (ব্যক্তিত্বের শ্রেণী-বিভাগ ও প্রলক্ষণ)

1. Distinguish, after Jung, between Introvert and Extrovert. How far is the distinction tenable?

2. Give a short account of the Personality Types described by Kretschmer and Sheldon on the basis of physiological characteristics.

3. What is meant by Personality Traits? Mention some important personality traits. In personality-study which is more advantageous—determination of Personality Types or of Traits?

4. Describe some of the important methods of testing and measuring personality. Can personality be really *measured*?

5. Write notes on:

(*a*) Pyknic, Aesthenic & Athletic Types, (*b*) Schizoid & Cycloid, (*c*) Projection Technique, (*d*) Rorschach Test, (*e*) TAT, (*f*) Performance Tests, (*g*) Rating Scale, (*h*) Personality Profile.

দশম অধ্যায় (চেতন ও অবচেতন স্তর)

1. Explain the nature of Consciousness. What does William James mean by 'stream of consciousness'?

2. Distinguish between focus and margin of consciousness? What is Subconsciousness? Is mind co-extensive with consciousness?

4. What is meant by the Unconscious? What are the grounds of your belief in the Unconscious?

5. State and explain the different forms of the Law of Relativity of Consciousness.

একাদশ অধ্যায় (প্রতিক্রিয়া)

1. What is meant by Reaction-time? Illustrate the method of measuring Reaction-time.

2. State some of Cattell's findings in the field of Reaction-time Experiments. What is the practical value of the results of Reaction-time Experiments?

3. Distinguish between Simple Reflex and Conditioned Reflex. How is C. R. (Conditioned Reflex) established? How, again, can it be extinguished?

4. What are the factors affecting establishment of C. R.? What is meant by 'stimulus generalisation' and 'stimulus discrimination' in this connection? What is meant by 'experimental neurosis'?

5. Write notes on :

(*a*) Delayed Reaction (or, Trace Reflex), (*b*) Positive & Negative Conditioning, (*d*) Higher-order Conditioning, (*e*) Operant Conditioning.

দ্বাদশ অধ্যায় (প্রেষণা)

1. What is Motive? Is it the same as stimulus and incentive? How does it differ from drives and needs?

2. State and illustrate the marks of motivated behaviour.

3. Distinguish between Learned Motives and Unlearned Motives. Explain the characteristics of the following human needs and motives : (*a*) Hunger, (*b*) Sex, (*c*) Aggression, (*d*) Maternal drive.

4. Mention some important human motives and drives, and discuss their relative strength.

5. How do we react to frustration ? Show how reactions to frustrations may sometimes operate as motives.

6. What does Freud mean by Unconscious Motivation ? Give some examples of Unconscious Motivation. Would you accept the proposition that even errors and slips are motivated ?

ত্রয়োদশ অধ্যায় (ঐচ্ছিক ক্রিয়া)

1. Analyse fully a Voluntary Action from the stage of its inception to that of its completion.

2. What is meant by the expression 'Conflict of Desires' ? Is this expression a happy one ?

3. Distinguish with illustrations between (*a*) Motive and Intention, (*b*) Desire and Wish, (*c*) Wish and Will.

4. State briefly the physiological characteristics of the muscles. What are the different kinds of muscles ? What is meant by reciprocal innervation of antagonistic muscles ?

চতুর্দশ অধ্যায় (অনৈচ্ছিক ক্রিয়া)

1. Explain with illustrations the distinction between
(*a*) Simple Reflex and Conditioned Reflex,
(*b*) Instinctive Acts and Reflex Acts,
(*c*) Habits and Instincts,
(*d*) Habit and C. R.,
(*e*) Voluntary Action and Ideo-motor Action.

2. Discuss whether the concepts of Chain Reflex and Tropism can adequately explain all complex behaviour.

3. Discuss the views of Wundt and Spencer on the origin of Instincts.

4. Explain fully McDougall's theory of Instincts. How, according to him, are instincts related to emotions ?

5. Explain the importance of McDougall's Theory of Instincts in Contemporary Psychology. Compare the view of McDougall with those of James and Freud. What is the recent attitude to the practice of explantion of mental acts in terms of instincts ?

6. What is Habit ? How are habits formed ? What are the uses and abuses of habit-formation ?

পঞ্চদশ অধ্যায় (শিক্ষা)

1. What is learning ? Explain the main points of difference between mechanical and teleological approaches to the problem of learning.

2. Explain fully Thorndike's theory of learning by trial and error. How does Thorndike's theory differ from Pavlov's theory of learning by conditioning ?

3. State and explain fully Thorndike's Laws of Learning. How far are they acceptable ?

4. Explain fully the Gestalt Theory of Learning and compare it with Thorndike's Trial & Error Theory of Learning. What do the Gestaltists mean by the expression 'insight' in connection with the problem of learning ?

5. Give a short account of Tolman's theory of Sign Learning.

6. How does human learning differ from animal learning ? How do human beings learn ? (Does man learn by trial and error, or by conditioning, or by insight ?)

ষোড়শ অধ্যায় (মনোযোগ)

1. Explain fully the nature of Attention. (*a*) Attention is identical with sensorial clearness ; (*b*) Attention is active apprehension—Which of these two views would you accept ?

2. Explain and illustrate the conditions of Attention. Show how these conditions are made use of (*a*) by an educationist, and (*b*) by an advertiser.

3. What is meant by the positive and negative aspects of Attention ? Is the act of attending on the same level with the act of perceiving and act of thinking ?

4. What are the different types (or, kinds) of attention ? Explain and illustrate.

5. How many things can we attend to at the same time ? (Or, What is the range or span or field of attention ?)

6. Write notes on :
(*a*) Accommodation of Attention, (*b*) Duration of Attention,
(*c*) Expectant Attention, (*d*) Attention and Distraction,
(*e*) Inattention, (*f*) Aprosexia, Hyperprosexia & Paraprosexia.

সপ্তদশ অধ্যায় (অনুভূতি ও আবেগ)

1. Explain the characteristics of feelings. What are the conditions of Feelings? (State the Laws of Pleasure and Pain.)

2. Explain and examine Wundt's Tridimensional theory of Feeling.

3. Discuss the possibility of Mixed Feeling and Neutral Feeling.

4. What are the chief characteristics of emotion? Mention some important bodily changes during emotional states, specially during anger and fear.

5. Explain and examine James-Lange Theory of Emotion. (Do bodily expressions precede emotional feelings?—Discuss.)

6. How does Cannon criticise James-Lange Theory of Emotion? What alternative theory does he propose in place of James's theory?

7. Give a comparative account of James-Lange Theory (Peripheral theory) of emotion and Cannon-Bard Theory (Central theory or Thalamic theory) of emotion. Which of the two theories would you accept?

8. Distinguish between
(*a*) Emotion and Emotional Mood,
(*b*) Emotional Mood and Emotional Disposition,
(*c*) Emotion and Sentiment,
(*d*) Sentiment of the Sublime & Sentiment of the Ludicrous,
(*e*) Temperament and Passion.

7. Explain the psychological causes of laughter.

অষ্টাদশ অধ্যায় (সংবেদন)

1. What is Sensation? What is the place of sensation in the writings of Structuralists like Titchener? Why is the concept of sensation regarded as *abstract* by many recent writers?

2. A sensation always depends on a stimulus. Are there exceptions to this? (Can there be a sensation without a stimulus? Under what circumstances does sensation continue even after the withdrawal of the stimulus?)

3. State and explain the attributes of Sensation.

4. Discuss: (a) Sensation is a kind of feeling;
(b) Feeling is an attribute of sensation.

5. Does every increase in stimulus mean increase in sensation? Explain and examine fully Weber-Fechner Law (or, the law of Psychophysics).

6. Give illustrations of some fields of practical application of Weber-Fechner Law.

7. Distinguish between Organic and Special Sensation. Give examples.

8. What are the different kinds of Cutaneous Senses? Mention some important skin receptors. Show your acquaintance with the researches leading to the discovery of punctiform distribution of cutaneous senses.

9. Explain the main features of Gustatory and Olfactory sensations. Show how they often co-operate with each other.

10. State the findings of Head and Rivers relating to Protopathic and Epicritic Sensibility.

11. Describe with suitable diagrams the organ of hearing. Explain how we hear by means of ear.

12. Explain the structure of the organ of Corti. Discuss in this connection the Piano theory (or, Resonance Theory or Helmholz's theory) of Audition.

13. Draw a diagram of an eye and describe its different parts. State the functions of the retina. Explain how we see by means of eyes. How far is the organ of vision analogous to a camera?

14. Explain and examine Young-Helmholtz's theory of Colour Vision, and compare it with Hering's Theory.

15. Explain the theories of vision as formulated by Ladd-Franklin, Von Kries and Hecht.

16. Write notes on :

(*a*) Intensity and extensity of sensations, (*b*) Local character, (*c*) Müller's Theory of Specific Energy of Nerves, (*d*) Height and threshold of sensibility, (*e*) j. n. d., (*f*) Semicircular canal, (*g*) Blind spot, (*h*) Fovea Centralis, (*i*) Inverted Retinal Image, (*j*) Primary Colours, (*k*) Colour Pyramid, (*l*) Colour Contrast, (*m*) Colour Blindness, (*n*) Rod Cells & Cone Cells, (*o*) Retinal zones, (*p*) Synaesthesia.

ঊনবিংশ অধ্যায় (প্রত্যক্ষ)

1. What is Perception ? Distinguish between Sensation and Perception. Are pure sensations possible in adult life ? ("A pure sensation is a psychological myth"—Discuss.)

2. How is the object of perception constructed ? How much is really *objective* in the object of perception ?

3. What is Acquired Perception ? Explain and illustrate.

4. Do we *see* distance ? Discuss. (Explain how we perceive distance visually. Discuss with special reference to the view of Berkeley.)

5. Explain the part played by eyes in the perception of distance and solidity.

6. How do we have visual perception of Up and Down, Right and Left ?

7. State the importance of (*a*) binocular vision and (*b*) binaural hearing in the perception of distance and direction.

8. How do we perceive movement ? What is apparent movement (Phi-phenomenon) ?

9. Distinguish between Perception, Illusion and Hallucination. What is Müller-Lyer illusion ? Give some illustrations of geometrical optical illusions.

10. Explain how we derive the notion of time.

11. Give a short account of the Gestalt Theory of Perception.

বিংশ অধ্যায় (স্মৃতি)

1. What is an Image? Distinguish it from a Percept.

2. What is an Eidetic Image? State its main features.

3. What is Memory? What are its conditions?

4. Explain how past experiences are retained in the form of traces and how, again, they are revived.

5. Explain fully the Laws of Association. What is the attitude of contempoıary writers to the traditional laws?

6. What are the marks of good memory? What are the principles of economy in learning?

7. State the findings of Ebbinghaus's experiments on Memory.

8. State the merits and demerits of Part Method and Whole Method of Learning.

9. How do emotions & attitudes influence memory? Discuss.

10. What are the grounds of forgetfulness? Explain in this connection some diseases of memory. Can there be illusions of memory?

11. Write notes on :

(*a*) Positive & Negative After-image, (*b*) Primary memory Image, (*c*) Recurrent or Resilient image, (*d*) Aphasia, (*e*) Amnesia, (*f*) Hypermnesia, (*g*) Rote Memory, (*h*) Memory Span.

একবিংশ অধ্যায় (কল্পনা)

1. What is Imagination? Explain the distinction between image of imagination and image of memory.

2. What is the value of imagination in child mind and adult mind?

3. Explain and illustrate different kinds of imagination.

4. What is Abnormal Imagination? Illustrate its different forms.

5. What is Day-dreaming? What are its possible causes?

6. Give a critical review of Freud's theory of dreams.

7. Write notes on:

(*a*) Autistic thinking, (*b*) Brown Study (Reverie), (*c*) Latent Content and Manifest Content of dreams, (*d*) Dream Symbols, (*e*) Imagination and Belief.

দ্বাবিংশ অধ্যায় (বিশ্বাস)

1. What is Belief? Explain fully its nature. What is meant by saying that there is an objective control of subjective belief?

2. Distinguish between
   (*a*) Belief and Disbelief,
   (*b*) Belief and Doubt,
   (*c*) Belief and Judgment,
   (*d*) Belief and Attitude.

3. Explain and illustrate the main grounds of Belief. What are its different kinds?

4. "All knowledge is belief, but all belief is not knowledge" —Discuss. What is the influence of belief on our mental life?

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় (চিন্তন)

1. Explain psychologically the nature of Thought.

2. Is imageless thought possible? Discuss fully with special reference to the views of Würzburg School and Structuralistic School.

3. Discuss whether thought can be explained in terms of muscular movements.

4. What is a concept? How is a concept formed psychologically?

5. Explain fully the relation between
Language.

6. State some of the important factors
for incorrect thinking.